اشرف الهداية

আশরাফুল হিদায়া

বাংলা

৬

লেখকবৃন্দ

মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আবূ বকর
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর

মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

মাওলানা বশীরুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা

সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকবৃন্দের প্রয়াস

। মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান

كتاب الكفالة -এর শুরু থেকে كتاب الحوالة -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা আবূ বকর

كتاب ادب القاضى -এর শুরু থেকে كتاب الشهادات -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ

كتاب الوكالة -এর শুরু থেকে باب الوكالة بالخصومة والقبض -এর পূর্ব পর্যন্ত।

। মাওলানা বশীরুল্লাহ

باب الوكالة بالخصومة والقبض : كتاب الوكالة -এর শুরু থেকে كتاب الدعوى -এর পূর্ব পর্যন্ত।

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين . اما بعد :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষ্য প্রণীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুখের কথা যে, একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালোভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাহেব একজন বড় ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি বিশাল সাহস নিয়ে হিদায়া'র একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতোমধ্যে হিদায়া আউয়ালাইনের তিন খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিদায়া আখেরাইনের ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে আমার তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে আমি তাঁকে আখেরাইনের জন্য উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ না করে হিদায়া'র প্রধান আরবি ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' ও 'আল-বিনায়া' সামনে রেখে প্রয়োজনবোধে উর্দু আশরাফুল হিদায়া থেকে সাহায্য নিয়ে একখানা মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করানোর পরামর্শ দেই। সে মোতাবেক তিনি আমাকে ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া ও উর্দু আশরাফুল হিদায়া– এ তিনটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহ করেন। আমি গ্রন্থখানির একটি মৌলিক ভাষ্য প্রণয়নের কিছু মূলনীতি তৈরি করি এবং এ কাজের জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও এক সময়কার মেধাবী ছাত্র, যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করে তাঁদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করি। তাঁরা হলেন, মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান, মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা; মাওলানা আবূ বকর, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর; মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা এবং মাওলানা বশীরুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা।

তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে হিদায়া'র একখান সহজবোধ্য, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। সুতরাং হিদায়া আউয়ালাইনের ভাষ্যগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া বাংলা সংস্করণ' উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ হলেও আখেরাইনের ভাষ্য অংশটি উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ নয়; বরং এটি হিদায়া আখেরাইনের একখানা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ।

এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণের ব্যাপারে আমার একটুখানি কৈফিয়ত আছে। একটি স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এর আশরাফুল হিদায়া নামকরণে আমার জোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনাব প্রকাশক মহোদয়ের আবদার ছিল 'আশরাফুল হিদায়া' নামটি ধরে রাখার। কারণ তিনি ইতঃপূর্বে 'আশরাফুল হিদায়া' নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ নামে আউয়ালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র তিন খণ্ডের অনুবাদ

প্রকাশও করে ফেলেছেন। তাই তাঁর আবদার রক্ষার্থে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণে সম্মত হই। অবশ্য এর পক্ষে একটি যুক্তিও পেয়ে যাই যে, কখনো দেখা যায়, দুজন পৃথক পিতার দু সন্তানের নাম একই হয়ে থাকে, তাই বলে দু সন্তান তো আর এক হয়ে যায় না। পূর্ববর্তীদের রচনাবলিতেও আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, একই নামে পৃথক দুই বা ততোধিক লেখক পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণকে অনুচিত বলা যায় না। অন্যের রাখা কোনো একটি নাম কারও পছন্দ হলে সে নামটি তো অন্য কেউ ধার করেও নিতে পারে। সমাজের অনেকে এমন তো নেয়ও। এতে তেমন অসুবিধার তো কিছু নেই।

হিদায়া গ্রন্থখানি এমনিতেই একটি সমুদ্র। তার একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য লেখকবৃন্দ, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই অটুট ধৈর্য, নিরলস শ্রম ও পর্যাপ্ত সময় এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার তৌফিকপ্রাপ্তির বড় প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই।

হে মহান করুণাময় আল্লাহ! আমাদের সবাইকে এবং সকল মানুষকে সকল নেক কাজে ইখলাস দান করুন। বিশেষ করে এ বিশাল কাজটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন, তাদের সবার শ্রমটুকু কেবল দুনিয়ার জন্য না বানিয়ে আপনার প্রিয় দীনের উপকারার্থে কাজে লাগিয়ে সকলের পরকালের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তিই বড় প্রাপ্তি। আমাদের শ্রম-সুনাম সবটুকু আপনার জন্য কবুল করে নিন। আপনি আমাদের কাউকে পরকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা সবাই আপনার অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি একমাত্র দয়ালু দাতা।

আরজগুজার

[মাওলানা আহমদ মায়মূন]

মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب الكفالة অধ্যায় : কাফালাহ	৭
فصل : في الضمان অনুচ্ছেদ : জামানত	৯৩
باب كفالة الرجلين পরিচ্ছেদ : দু ব্যক্তির কাফালাহ	১০৬
باب كفالة العبد وعنه পরিচ্ছেদ : গোলামের কাফীল হওয়া এবং গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হওয়া	১১৫
كتاب الحوالة অধ্যায় : হাওয়ালাহ	১২২
كتاب ادب القاضي অধ্যায় : বিচারকের নীতিমালা	১৩৫
فصل في الحبس অনুচ্ছেদ : আসামিদের আটক করা প্রসঙ্গ	১৭৬
باب كتاب القاضي الى القاضي পরিচ্ছেদ : বিচারকের কাছে বিচারকের পত্র প্রেরণ	১৮৮
فصل اخر আরেকটি অনুচ্ছেদ	২০৭
باب التحكيم পরিচ্ছেদ : সালিস নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা	২২৯
مسائل شتى من كتاب القضاء বিচার অধ্যায়ের বিবিধ মাসআলা	২৩৯
فصل في القضاء بالمواريث অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকারীদের মাঝে বিচারকের রায় প্রদান প্রসঙ্গে	২৬৯
فصل اخر আরেকটি অনুচ্ছেদ	৩০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب الشهادات অধ্যায় : শাহাদাত	৩১১
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل **পরিচ্ছেদ** : কাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর কাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়	৩৬২
باب الاختلاف فى الشهادة **পরিচ্ছেদ** : সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ	৪১১
فصل فى الشهادة على الارث **অনুচ্ছেদ** : উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান	৪৩২
باب الشهادة على الشهادة **পরিচ্ছেদ** : সাক্ষ্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান	৪৩৯
كتاب الرجوع عن الشهادات **অধ্যায়** : সাক্ষ্য প্রত্যাহার	৪৬৪
كتاب الوكالة অধ্যায় : ওয়াকালাহ	৫০১
باب الوكالة بالبيع والشراء পরিচ্ছেদ : বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে উকিল নিযুক্ত করা	৫৩৩
فصل فى الشراء **অনুচ্ছেদ** : ক্রয় সংক্রান্ত	৫৩৩
فصل فى التوكيل بشراء نفس العبد **অনুচ্ছেদ** : গোলাম কর্তৃক আপন সত্তা ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্তকরণ	৫৮৬
فصل فى البيع **অনুচ্ছেদ** : বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ প্রসঙ্গে	৫৯৬
باب الوكالة بالخصومة والقبض **পরিচ্ছেদ** : দাবি উত্থাপন এবং কবজা করার জন্য উকিল নিয়োগ	৬৩৩
باب عزل الوكيل **পরিচ্ছেদ** : উকিলের অপসারণ	৬৭১

كِتَابُ الْكَفَالَةِ
অধ্যায় : কাফালাহ

'কাফালাহ' শব্দটি জামিনদারি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আদালতের কাছে বিবাদীর পক্ষে তৃতীয় ব্যক্তির জামিন হওয়া কিংবা পাওনাদারের জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে জামিন হওয়ার বিষয়টি সমাজে প্রচলিত। বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে বিচারের জন্য পাওয়া যাবে কিনা? এ বিষয়ে বিচারক সন্দিহান হলে বিবাদীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আদালতের কাছে নির্ভরযোগ্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জামিন হয়। এরূপভাবে পাওনাদার পাওনা উসুলের ব্যাপারে সন্দিহান হলে তার পাওনা আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে জামিন হওয়ার নিয়ম আছে। তদ্রূপ বিক্রেতার পণ্য সোর্পদ করার ব্যাপারে ক্রেতা সন্দিহান হলে বিক্রেতার পক্ষে জামিন হওয়ার নিয়ম আছে। মূলত এটাই 'কাফালাহ'।

'কাফালাহ' অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি কাজ। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর আসামীকে বিচারের জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না– এ আশঙ্কায় যদি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই বিবাদীকে গ্রেফতার করা হয় এবং আটকে রাখা হয় তাহলে তা তার জন্য কষ্টকর, আশঙ্কাজনক ও ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণের মাধ্যমে জামিনদার বিবাদীকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে বড় উপকার করে। এরূপভাবে যে পাওনাদার টাকা মার যাওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত, জামিনদারের জামানত তার চিন্তামুক্তির কারণ হয়।

কুরআনে কারীমেও 'কাফালাহ'কে একটি প্রশংসনীয় কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর প্রতিপালনের বিষয়ে ইরশাদ করেন– وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا অর্থাৎ 'তিনি [আল্লাহ] তাঁকে যাকারিয়্যার কাফালাতে দিলেন।' –[সূরা মারইয়াম : আয়াত– ৩৭]।

হযরত যাকারিয়্যা (আ.)-এর মতো একজন মহান নবীকে 'কাফীল' তথা জামিন হিসেবে কুরআনে কারীম উল্লেখ করায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'কাফালাহ' একটি প্রশংসনীয় কাজ। তাছাড়া কুরআনে কারীম অন্য একজন নবীকে 'যুল কিফল' নামে অভিহিত করেছে। কারণ, তিনি একদল নবীর পক্ষে 'কাফীল' অর্থাৎ জামিন হয়েছিলেন।

'কাফালাহ'-এর বৈধতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় ইরশাদ হচ্ছে– وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ অর্থাৎ 'যে তা এনে দেবে সে এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার জামিন।' –[সূরা ইউসুফ : আয়াত– ৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ জামিনদার দায়বদ্ধ হবে। এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফ ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী ও তাবারানী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে একই সাহাবী থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ধার নেওয়া জিনিস প্রত্যর্পণযোগ্য, পারিশ্রমিক আদায়যোগ্য, ঋণ পরিশোধযোগ্য আর জামিনদার দায়বদ্ধ। –[ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৫৩]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস 'কাফালাহ'-এর বৈধতা প্রমাণ করে। এর বৈধতার পক্ষে উম্মতের ইজমাও রয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর আল ফারগানী (র.) কাফালাহ অধ্যায়কে ক্রয়বিক্রয় অধ্যায়ের পরে এনেছেন। কেননা ক্রয়বিক্রয়ের পরেই সাধারণত কাফালাহ-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ, অনেক সময় বিক্রেতা ক্রেতার মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। তখনই তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জামানতের প্রয়োজন পড়ে। কিংবা ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করার ব্যাপারে বিক্রেতার পক্ষ থেকে নিশ্চিত হতে পারে না, তখন এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন পড়ে, যে ক্রেতাকে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। যেহেতু অস্তিত্ব (وجود) লাভের ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়টি আগে হয়ে থাকে, তাই تَعْلِيْم তথা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও ক্রয়বিক্রয়কে আগে আনা হয়েছে।

ক্রয়বিক্রয় অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ হয় (بَابُ الصَّرْفِ)। কাফালাহকে এর পরে আনার যৌক্তিকতাও বোধগম্য। কেননা 'সারফ'-এর মতো কাফালাহও অবশেষে একটি লেনদেনে পরিণত হয়। জামিনদার নিজের পক্ষ থেকে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করার পর যখন দায়গ্রস্ত ব্যক্তি থেকে তা উসুল করে তখন তা লেনদেন বৈ কি। লেনদেন হওয়ার দিক থেকে কাফালাহ ও সারফ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। তবে যেহেতু সারফ ক্রয়বিক্রয় অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাই সারফকে আগে আর কাফালাহকে পরে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জামিনদার ব্যক্তিকে ফিকহের পরিভাষায় কাফীল (كَفِيْل), যার পক্ষ থেকে কাফালাহ হয় তাকে মাকফূল আনহু (مَكْفُوْل عَنْهُ), যার জন্য কাফালাহ হয় তাকে মাকফূল লাহু (مَكْفُوْل لَهُ) এবং যে বস্তু বা জিনিসের কাফালাহ হয় তাকে মাকফূল বিহী (مَكْفُوْل بِهِ) বলা হয়। উদাহরণত শরীফ আরীফ থেকে পাঁচশ টাকা পাবে। শামীল আরীফের পক্ষ থেকে শরীফের জন্য এ পাঁচশ' টাকার জামিন হলো। তাহলে শামীল হলো কাফীল, আরীফ হলো মাকফূল আনহু, শরীফ হলো মাকফূল লাহু, আর পাঁচশ' টাকা হলো মাকফূল বিহী। মাকফূল আনহুকে আসীল (أَصِيْل)ও বলা হয়।

এছাড়া কাফীলকে জামিন (ضَامِنٌ), মাকফূল আনহুকে মাজমূন আনহু (مَضْمُوْن عَنْهُ), মাকফূল লাহুকে মাজমূন লাহু (مَضْمُوْن لَهُ) এবং মাকফূল বিহীকে মাজমূন বিহী (مَضْمُوْن بِهِ) -ও বলা হয়।

قَالَ : اَلْكَفَالَةُ هِيَ الضَّمُّ لُغَةً، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ثُمَّ قِيْلَ : هِيَ ضَمُّ الذِّمَّةِ اِلَى الذِّمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ، وَقِيْلَ فِي الدَّيْنِ، وَالْاَوَّلُ أَصَحُّ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'কাফালাহ' -এর আভিধানিক অর্থ হলো সংযুক্তকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তাঁকে [মারইয়াম (আ.)] যাকারিয়্যাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। কারো কারো মতে [শরিয়তের পরিভাষায়] কাফালাহ-এর অর্থ হলো দাবির ক্ষেত্রে [দায়গ্রস্ত ব্যক্তির] দায়ের সাথে [দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির] দায়কে যুক্ত করা। কারো কারো মতে ঋণের দায়কে যুক্ত করা। তবে প্রথমোক্ত অভিমত বিশুদ্ধতম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْكَفَالَةُ هِيَ الضَّمُّ الخ : আলোচ্য ইবারতে হিদায়া গ্রন্থকার কাফালার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা আলোচনা করেছেন। কাফালার আভিধানিক অর্থ হলো সংযুক্তকরণ (اَلضَّمُّ)। কুরআন কারীমে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا অর্থাৎ এবং তিনি [আল্লাহ] তাঁকে যাকারিয়্যার সাথে যুক্ত করে দিলেন। -[সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৩৭]

ফুকাহায়ে কেরাম দুভাবে কাফালার পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা-

১. اَلْكَفَالَةُ هِيَ ضَمُّ الذِّمَّةِ اِلَى الذِّمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ কাফালাহ হলো দাবির ক্ষেত্রে মাকফূল আনহু (مَكْفُوْلٌ عَنْهُ) -এর দায়ের সাথে কাফীলের দায়কে যুক্ত করা।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী মাকফূল আনহুর জিম্মায় যে দায় ছিল তা কাফীলের জিম্মায় আসবে না। তবে পাওনাদার তার পাওনা মাকফূল আনহুর কাছে যেভাবে দাবি করতে পারবে, তেমনি কাফীলের কাছেও দাবি করতে পারবে। উদাহরণত শরীফ আরীফের কাছে একশ' টাকা পাবে। শামীল আরীফের পক্ষে কাফীল হলো। কাফীল হওয়ার কারণে আরীফের মতো শামীল একশ' টাকার দায়গ্রস্ত হবে না। তবে শরীফ তার পাওনা একশ' টাকা আরীফের কাছে যেমন দাবি করতে পারবে তেমনি শামীলের কাছেও দাবি করতে পারবে। যদি শরীফের দাবির প্রেক্ষিতে শামীল একশ' টাকা শরীফকে পরিশোধ করে তাহলে সে একশ' টাকা আরীফ থেকে ফেরত পাবে। হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম এ মত পোষণ করেন।

২. اَلْكَفَالَةُ ضَمُّ الذِّمَّةِ اِلَى الذِّمَّةِ فِيْ أَصْلِ الدَّيْنِ অর্থাৎ কাফালাহ হলো মূল ঋণের ক্ষেত্রে মাকফূল আনহু (مَكْفُوْلٌ عَنْهُ) -এর দায়ের সাথে কাফীলের দায়কে যুক্ত করা। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী মাকফূল আনহুর জিম্মায় যে ঋণ বা দায় ছিল তা কাফীলের জিম্মায়ও আসবে অর্থাৎ কাফীলও ঋণগ্রস্ত ও দায়বদ্ধ বিবেচিত হবে। তবে মাকফূল আনহুর জিম্মা থেকে তা খারিজ হবে না এবং দু'জনের যে কোনো একজন পরিশোধ করবে। যে কোনো একজন পরিশোধ করলে উভয়েই দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। উদাহরণত শরীফ আরীফ থেকে একশ' টাকা পাবে। শামীল আরীফের পক্ষে কাফীল হলো। এ সুরতে আরীফ যেমন একশ' টাকা দায়গ্রস্ত তেমনি শামীলও একশ' টাকা দায়গ্রস্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত এটি। -[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূতে এ দু'টি সংজ্ঞাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনোটিকে প্রাধান্য (تَرْجِيْح) দেননি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, প্রথমোক্ত অভিমত বিশুদ্ধতম। দু' সংজ্ঞার মৌলিক পার্থক্য হলো, প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী কাফীল দায়গ্রস্ত (مَدْيُوْنٌ) হবে না। মাকফূল লাহু কাফীলকে শুধুমাত্র এটুকু বলতে পারবে যে, আপনি মাকফূল আনহুর পক্ষে জিম্মাদারি নিয়েছেন। এখন আমার দায় পরিশোধ করুন! অর্থাৎ মাকফূল লাহু কাফীলের কাছে দাবি করতে পারবে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী মাকফূল আনহুর মতো কাফীলও দায়গ্রস্ত (مَدْيُوْنٌ) হবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, কাফীলের জিম্মায় দায় সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি দুটি মাসআলা থেকেও প্রমাণিত হয়–

১. যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে ঋণের টাকাগুলো হাদিয়া করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হয় এবং কাফীল এ টাকাগুলো মাকফূল আনহু থেকে উসূল করে। যদি কাফীলের জিম্মায় দায় সাব্যস্ত না হতো তাহলে এ হাদিয়া শুদ্ধ হতো না। কারণ, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত নয় তাকে ঋণ হাদিয়া করা জায়েজ নেই।

২. যদি মাকফূল লাহু তার ঋণের বিনিময়ে কাফীল থেকে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ আছে। যদি কাফীলের জিম্মায় ঋণ সাব্যস্ত না হতো তাহলে তা জায়েজ হতো না। কারণ, যার উপর ঋণ নেই তার থেকে ঋণের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করাও জায়েজ নেই। অতএব, প্রমাণিত হলো কাফীলের জিম্মায়ও দায় (دَيْن) সাব্যস্ত হবে। –[প্রাগুক্ত]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রথমোক্ত মতকে বিশুদ্ধতম বলেছেন। আল্লামা আইনী (র.)-এর দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন–

১. কাফালাহ যেরূপ মালের ক্ষেত্রে হয় তেমনি দেহসত্তার (نَفْس) ক্ষেত্রেও হয়। দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহসত্তার কাফালাহ (كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ) কাফালার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২. দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কাফিলের জিম্মায় দায় (دَيْن) সাব্যস্ত হয় এবং আসীল (أَصِيْل) দায় থেকে মুক্ত না হয় তাহলে দায় দু'টি হয়ে যাচ্ছে; এক হাজার টাকার দায় দু'হাজার টাকা হয়ে যাচ্ছে।

কাফীলের জিম্মায় যে দায় সাব্যস্ত হয় এর প্রমাণে পেশ করা উপরিউক্ত দু'টি মাসআলার জবাবে আল্লামা আইনী (র.) বলেন, পাওনাদার (رَبُّ الدَّيْن) যখন কাফীলকে দায় (دَيْن) হাদিয়া করেন তখন তাদের এ লেনদেনকে শুদ্ধতা দেওয়ার প্রয়োজনে কাফীলের জিম্মায় দায় সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সুরতে যেহেতু এর প্রয়োজন নেই, তাই সেখানে কাফীলের জিম্মায় দায় সাব্যস্ত হবে না। –[বিনায়া. খ. ৭, পৃ. ৫৩৭]

رُكْنُ الْكَفَالَةِ **[কাফালার রুকন]** : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাফালার রুকন হলো ইজাব ও কবুল (اَلْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সর্বশেষ মত, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ এবং এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো কাফালার রুকন শুধু ইজাব। কাফীলের সম্মতি ও ইজাবেই কাফালাহ চুক্তি সম্পাদিত হবে; মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে কবুল পাওয়া যাক বা না যাক।

شَرْطُ الْكَفَالَةِ **[কাফালার শর্ত]** : কাফালার জন্য শর্ত হলো কাফীল বালেগ, আকেল, সুস্থ ও চুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে এবং ঋণ (دَيْن) সাধারণ ঋণ (دَيْن صَحِيْح) হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল এবং অসুস্থ ব্যক্তি কাফীল হতে পারবে না এবং চুক্তিবদ্ধ গোলামের পক্ষে বদলে কিতাবত [চুক্তির অর্থ] পরিশোধের কাফালাহ বৈধ হবে না। কারণ, বদলে কিতাবত সাধারণ ঋণ নয়।

حُكْمُ الْكَفَالَةِ **[কাফালার হুকুম]** : কাফালার হুকুম হলো– ثُبُوْتُ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمَكْفُوْلِ لَهُ مَتٰى شَاءَ سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ الْاَصِيْلِ أَوْلَا কাফালাহ -এর মাধ্যমে মাকফূল লাহুর জন্য কাফীলের কাছে দাবি করার অধিকার সাব্যস্ত হয়; চাই মাকফূল আনহুর কাছে দাবি করা অসাধ্য হোক বা না হোক। ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, মাকফূল আনহুর কাছে দাবি করা অসাধ্য হলে তবেই কাফীলের কাছে দাবি করতে পারবে।

قَالَ : اَلْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ، وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ، فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ، وَالْمَضْمُوْنُ بِهَا اِحْضَارُ الْمَكْفُوْلِ بِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : لَا تَجُوْزُ، لِاَنَّهُ كَفَلَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهِ، اِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلٰى نَفْسِ الْمَكْفُوْلِ بِهِ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ، لِاَنَّ لَهُ وَلَايَةً عَلٰى مَالِ نَفْسِهِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ، وَهٰذَا يُفِيْدُ مَشْرُوْعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهَا، وَلِاَنَّهُ يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهِ بِطَرِيْقِهِ بِاَنْ يَعْلَمَ الطَّالِبُ مَكَانَهُ، فَيُخَلِّيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اَوْ يَسْتَعِيْنَ بِاَعْوَانِ الْقَاضِيْ فِيْ ذٰلِكَ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اِلَيْهِ، وَقَدْ اَمْكَنَ تَحْقِيْقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ فِيْهِ، وَهُوَ الضَّمُّ فِي الْمُطَالَبَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'কাফালাহ [জামিনদারি] দু প্রকার। কাফালাহ বিন নাফস [মানুষের দেহসত্তার জামিনদারি] এবং কাফালাহ বিল মাল [মালের জামিনদারি]। কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ আছে। এ প্রকার কাফালার দায় হলো মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করা।' ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ নেই। কেননা, সে এমন একটি জিনিসের কাফীল হয়েছে যা সোপর্দ করার ক্ষমতা তার নেই। কারণ, মাকফূল বিহীর সত্তার উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কাফালাহ বিল মাল ভিন্নতর। কেননা, তার নিজের মালের উপর তার কর্তৃত্ব আছে। আমাদের দলিল হলো, হুজুর ﷺ বলেন, কাফীল দায়বদ্ধ। হুজুর ﷺ -এর এ উক্তি উভয় প্রকার কাফালাহ- এর বৈধতা সাব্যস্ত করে। তাছাড়া কাফীল মাকফূল বিহীকে এই পদ্ধতিতে সোর্পদ করতে সক্ষম যে, সে মাকফূল লাহুকে মাকফূল আনহুর অবস্থানস্থল জানিয়ে দিবে এবং উভয়ের মাঝে [সাক্ষাতের] অন্তরায় দূর করবে। কিংবা কাফীল এ ব্যাপারে কাজীর অধীনস্থ লোকদেরকে সাহায্য করবে। এ প্রকার কাফালার প্রয়োজনও আছে। এতে কাফালার অর্থকে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভব। আর তা হলো দাবির ক্ষেত্রে জিম্মাকে মিলানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ الخ **: কাফালার প্রকারভেদ :** কাফালা দুপ্রকার- ১. কাফালাহ বিন নাফস ও ২. কাফালাহ বিল মাল। উভয় প্রকার কাফালাই বৈধ। কাফালাহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে কাফীল এই মর্মে জামিনদারি গ্রহণ করে যে, সে যথাসময়ে মাকফূল বিহীকে বিচারের জন্য কিংবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য কিংবা দায় মীমাংসার জন্য উপস্থিত করবে। আর কাফালাহ বিল মালের ক্ষেত্রে কাফীল এই মর্মে জামিনদারি গ্রহণ করে যে, কাফীল মাকফূল আনহুর দায় পরিশোধ করবে।

উল্লেখ্য যে, কাফালাহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে মাকফূল আনহু এবং মাকফূল বিহী একই ব্যক্তি হয়। কিন্তু কাফালাহ বিল মালে মাকফূল আনহু হলো দায়গ্রস্ত ব্যক্তি। আর দায়টি হলো মাকফূল বিহী।

হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'কাফালাহ বিন নাফস' জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো, তিনি বলেন, কাফাল্যহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে কাফীল মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করার

জামিনদার হয়। আর মাকফূল বিহীর সত্তার উপর যেহেতু কাফীলের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই, তাই তাকে কাজির দরবারে উপস্থিত করা কিংবা মাকফূল লাহুর কাছে সোর্পদ করার ক্ষমতা তার নেই। আর যে জিনিসের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই তার জামিনদার হওয়াও জায়েজ নেই। অতএব, কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ নেই।

পক্ষান্তরে কাফালাহ বিল মাল জায়েজ আছে। কাফালাহ বিল মালের ক্ষেত্রে কাফীল মাকফূল আনহুর দায় পরিশোধের জামিনদার হয়। আর কাফীলের নিজের অর্থ-সম্পদের উপর যেহেতু তার অধিকার ও কর্তৃত্ব আছে তাই মাকফূল লাহুর দাবির প্রেক্ষিতে সে নিজস্ব সম্পদ থেকে মাকফূল বিহী তথা দায় পরিশোধ করতে সক্ষম। তাই তার জামিনদারি জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ الخ :

আমাদের দলিল : আহনাফের পক্ষে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ উমামা (র.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ কাফীল [জামিনদার] দায়বদ্ধ হবে। হযরত ইবনে আদী (র.) সংকলিত কামিল গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মুতলাক (مُطْلَقٌ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফালার দুপ্রকারের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। তাই তা উভয় প্রকারের বৈধতাকে সাব্যস্ত করে।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهٖ بِطَرِيْقِهٖ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, কাফালাহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে কাফীল মাকফূল বিহীকে সোর্পদ করতে সক্ষম নয় বলে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয়; বরং কাফীল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সোর্পদ করতে সক্ষম। তা হলো, মাকফূল বিহী কোথায় আছে এবং কিভাবে মাকফূল লাহু তার কাছে পৌঁছতে পারবে তা কাফীল মাকফূল লাহুকে জানিয়ে দিবে। কিংবা কাজীর পক্ষ থেকে পাঠানো পুলিশকে মাকফূল বিহীর গ্রেফতারের জন্যে কাফীল সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এভাবে মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে সোর্পদ করবে। যেহেতু কাফীল মাকফূল বিহীকে সোর্পদ করতে সক্ষম, তাই এ প্রকার কাফালাহও বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَيْهِ وَقَدْ اَمْكَنَ تَحْقِيْقُ الخ : গ্রন্থকার (র.) কাফালাহ বিন নাফসের বৈধতা সম্পর্কে আরেকটি দলিল পেশ করেছেন যে, কাফালাহ বিল মাল-এর যেরূপ প্রয়োজন আছে তেমনি কাফালাহ বিন নাফসেরও প্রয়োজন আছে। তাছাড়া কাফালাহ বিন নাফসের মাঝে কাফালার অর্থ পাওয়া যায়। কাফীল যেভাবে স্বীয় জিম্মাকে মাকফূল আনহুর জিম্মার সাথে মালের দাবী (مُطَالَبَةٌ) -এর ক্ষেত্রে যুক্ত করতে পারে তেমনি মাকফূল আনহুকে উপস্থিত করার দাবির ক্ষেত্রেও যুক্ত করতে পারে। মোটকথা, কাফালাহ বিন নাফসের মাঝে যখন কাফালার অর্থ পাওয়া যায় এবং এর প্রয়োজনও আছে, তাই কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'কাফালাহ বিন নাফস' জায়েজ নেই বলে যে কথা ব্যক্ত করেছেন, আল্লামা ইবনে হুমাম ও আল্লামা আইনী (র.) তার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ আছে। –[ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৫৬; বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৫৩৭]

قَالَ : وَتَنْعَقِدُ إِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ أَوْ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِرُوْحِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ وَكَذَا بِبَدَنِهِ وَبِوَجْهِهِ، لِاَنَّ هٰذِهِ اَلْاَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْبَدَنِ، إِمَّا حَقِيْقَةً اَوْ عُرْفًا عَلٰى مَا مَرَّ فِى الطَّلَاقِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ بِنِصْفِهِ أَوْ بِثُلُثِهِ اَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ، لِاَنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةَ فِىْ حَقِّ الْكَفَالَةِ لَا تَتَجَزّٰى، فَكَانَ ذِكْرُ بَعْضِهَا شَائِعًا كَذِكْرِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِيَدِ فُلَانٍ اَوْ بِرِجْلِهِ، لِاَنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْبَدَنِ، حَتّٰى لَا يَصِحَّ اِضَافَةُ الطَّلَاقِ اِلَيْهِمَا، وَفِيْمَا تَقَدَّمَ يَصِحُّ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির দেহসত্তার বা তার গর্দানের বা তার প্রাণের বা তার দেহের কিংবা তার মাথার কাফীল হলাম; এরূপভাবে যদি বলে যে, তার শরীরের বা তার মুখমণ্ডলের কাফীল হলাম তাহলে ‘কাফালাহ্ বিন নাফস’ চুক্তি সংঘটিত হবে। কেননা এসব শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থে কিংবা প্রচলিত অর্থে মানবসত্তাকে বুঝায়; যেরূপ তালাক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এরূপ হুকুম হবে যদি কেউ বলে যে, [আমি] অমুক ব্যক্তির অর্ধেকের বা এক তৃতীয়াংশের বা তার একাংশের [কাফিল হলাম]। কেননা, কাফালাহ -এর ক্ষেত্রে একটি মানবসত্তা বিভাজ্য নয় [যে, একাংশের কাফীল হবে আর অবশিষ্টাংশের কাফীল হবে না।] সুতরাং অনির্ধারিত অংশ বিশেষের উল্লেখ সমগ্র সত্তার উল্লেখ বলে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি বলে যে, আমি অমুকের হাতের বা তার পায়ের কাফীল হলাম তাহলে তা ভিন্নতর। [অর্থাৎ এ ধরনের শব্দ দ্বারা ‘কাফালাহ্ বিন নাফস’ সংঘটিত হবে না।] কেননা, এ অঙ্গদ্বয় দ্বারা সমগ্র মানবসত্তা বুঝায় না। তাই তো তালাককে এ অঙ্গদ্বয়ের দিকে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ নয়; কিন্তু পূর্বোক্ত অঙ্গসমূহের দিকে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَنْعَقِدُ إِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ الخ : কোন ধরনের শব্দ দ্বারা ‘কাফালাহ বিন নাফস’ চুক্তি সংঘটিত হয় আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) তাই আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। যেসব শব্দ মানুষের সমগ্র দেহসত্তাকে বুঝায়, চাই প্রকৃত অর্থ (حَقِيْقَةً) হিসেবে বুঝাক বা প্রচলিত অর্থ (عُرْفًا) হিসেবে বুঝাক তা দ্বারা ‘কাফালাহ বিন নাফস’ চুক্তি সংঘটিত হবে। এ ধরনের কয়েকটি শব্দ হলো– ১. نَفْس সত্তা ২. رُوْح প্রাণ ৩. جَسَدْ [দেহ] ৪. رَقَبَةٌ [গর্দান] ৫. رَأْس [মাথা] ৬. بَدَنٌ [শরীর] ৭. وَجْه [মুখমণ্ডল]।

উপরিউক্ত শব্দগুলোর প্রথম তিনটি প্রকৃত অর্থেই সমগ্র দেহসত্তা বুঝায়। আর অবশিষ্টগুলো প্রচলিত অর্থে সমগ্র দেহসত্তা বুঝায়। এসব শব্দের দিকে যদি কাফেলাকে সম্বন্ধ করা হয় উদাহরণত কেউ বলল– تَكَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের দেহসত্তার কাফীল হলাম, কিংবা বলল– تَكَفَّلْتُ بِرَقَبَةِ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের গর্দানের কাফীল হলাম, কিংবা বলল– تَكَفَّلْتُ بِرَأْسِ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের মাথার কাফীল হলাম, তাহলে ‘কাফালাহ বিন নাফস’ সংঘটিত হবে।

তালাক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, তালাকের বিষয়টিও এরূপ। যদি কেউ এ ধরনের শব্দের দিকে তালাককে সম্বন্ধ করে, উদাহরণত কেউ তার স্ত্রীকে বলল– نَفْسُكِ طَالِقٌ অর্থাৎ তোমার দেহসত্তা তালাক, কিংবা বলল– بَدَنُكِ طَالِقٌ তোমার শরীর তালাক, কিংবা বলল– جَسَدُكِ طَالِقٌ তোমার দেহ তালাক, তাহলে তালাক সংঘটিত হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ بِنِصْفِهِ أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ الخ : এরূপভাবে কাফালাহকে যদি দেহসত্তার অনির্ধারিত অংশ বিশেষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, যেমন কেউ বলল– تَكَفَّلْتُ بِنِصْفِ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের অর্ধেকের কাফীল হলাম, কিংবা বলল– تَكَفَّلْتُ بِثُلُثِ فُلَانٍ تَكَفَّلْتُ بِجُزْءٍ مِنْ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের একাংশের কাফীল হলাম, কিংবা বলল– অর্থাৎ আমি অমুকের এক তৃতীয়াংশের কাফীল হলাম, তাহলে এর দ্বারা 'কাফালাহ বিন নাফস' চুক্তি সংঘটিত হবে। কেননা, কাফালাহ -এর ক্ষেত্রে একটি মানবসত্তা বিভাজ্য (مُتَجَزِّى) হয় না যে, একাংশের কাফালাহ হবে আর অবশিষ্টাংশের কাফালাহ হবে না। সুতরাং অনির্ধারিত অংশ বিশেষের উল্লেখ সমগ্র সত্তার উল্লেখ বলে গণ্য হবে।

এর উপমা (نَظِيْر) হলো তালাক। অর্থাৎ তালাককে যেরূপ দেহসত্তার অনির্ধারিত কোনো অংশের দিকে সম্বন্ধ করা হলেও তালাক সংঘটিত হয় তেমনি কাফালাহকে যদি দেহসত্তার অনির্ধারিত কোনো অংশের দিকে সম্বন্ধ করা হয় তাহলে তাও সংঘটিত হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِيَدِ الخ : যেসব শব্দ মানুষের সমগ্র দেহসত্তা বুঝায় না, যেমন– হাত, পা ইত্যাদি, এ শব্দের দিকে কাফালাহকে সম্বন্ধ করা হলে কাফালাহ সংঘটিত হবে না। যেমন, কেউ বলল– تَكَفَّلْتُ بِيَدِ فُلَانٍ আমি অমুকের হাতের কাফীল হলাম, কিংবা বলল– تَكَفَّلْتُ بِرِجْلِ فُلَانٍ আমি অমুকের পায়ের কাফীল হলাম, তাহলে কাফালাহ সংঘটিত হবে না। কারণ হাত, পা বলে মানুষের সমগ্র দেহসত্তাকে ব্যক্ত করা হয় না। আর তাই তালাককে এসব অঙ্গের দিকে সম্বন্ধ করা হলে তালাক সংঘটিত হয় না।

وَكَذَا إِذَا قَالَ ضَمِنْتُهُ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُوجِبِهِ، أَوْ قَالَ هُوَ عَلَيَّ لِأَنَّهُ صِيغَةُ الْإِلْتِزَامِ، أَوْ قَالَ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى عَلَيَّ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ عِيَالًا فَإِلَيَّ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَنَا زَعِيْمٌ بِهِ أَوْ قَبِيْلٌ، لِأَنَّ الزَّعَامَةَ هِيَ الْكَفَالَةُ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِيْهِ، وَالْقَبِيْلُ هُوَ الْكَفِيْلُ، وَلِهٰذَا سُمِّيَ الصَّكُّ قُبَالَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ، لِأَنَّهُ اِلْتِزَامُ الْمَعْرِفَةِ دُوْنَ الْمُطَالَبَةِ.

অনুবাদ : তদ্রূপ কেউ যদি বলে যে, আমি তার জামিন হলাম [তাহলে কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে]। কেননা, জামিন হওয়াই কাফালাহ চুক্তির অনিবার্য পরিণতি। কিংবা যদি বলে যে, সে আমার জিম্মায়; কেননা, এ শব্দটি নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়ার অর্থ প্রদান করে। কিংবা বলে যে, তার বিষয়টি আমার কাছে [তাহলে কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।] কেননা, এ ক্ষেত্রে 'আমার কাছে' (إِلَيَّ) শব্দটি 'আমার জিম্মায়' (عَلَيَّ) অর্থে ব্যবহৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেউ যদি সম্পদ ছেড়ে যায় তাহলে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ব্যক্তি এতিম সন্তান বা কোনো পোষ্য রেখে যায় তার দায়িত্ব আমার কাছে। [এ হাদীসে 'আমার কাছে' (إِلَيَّ) শব্দটি 'আমার জিম্মায় (عَلَيَّ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।] তদ্রূপ কেউ যদি বলে যে, আমি তার জামিনদার (زَعِيْم) কিংবা তদারককারী (قَبِيْل) [তাহলে কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।] কেননা, জামিনদারিই (اَلزَّعَامَةُ) কাফালাহ। এ সম্পর্কিত হাদীস আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর তদারককারী (قَبِيْل) মানে কাফীল। এ কারণেই দলিল-দস্তাবেজ– চেককে তদারকিপত্র (قُبَالَةٌ) বলা হয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে যে, আমি তাকে সনাক্ত করার জামিন হলাম [তাহলে এর দ্বারা কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে না]। কেননা, সে এর দ্বারা সনাক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, দাবি পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ ضَمِنْتُهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারতে যা দ্বারা কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হয় এমন কিছু দ্ব্যর্থবোধক (صَرِيْح) শব্দের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি মোট পাঁচটি শব্দের উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. কেউ বলল– أَنَا ضَمِنْتُ فُلَانًا অর্থাৎ, আমি অমুকের জামিন হলাম। কাফালাহ চুক্তির অনিবার্য পরিণতি (مُوْجَبْ) হলো কাফীল জামিন হবে। আর পরিণতি (مُوْجَبْ) উল্লেখ করার দ্বারা চুক্তি সংঘটিত হয়। যেমন– বিক্রয় চুক্তির অনিবার্য পরিণতি হলো মালের বা মূল্যের মালিক হওয়া। আর মালিকানা (تَمْلِيْك) শব্দ দ্বারা বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হয়। অতএব, আমি জামিন হলাম (ضَمِنْتُ) বলার দ্বারা কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।

২. কেউ বলল– هُوَ عَلَيَّ অর্থাৎ সে আমার জিম্মায়। 'আমার জিম্মায়' (عَلَيَّ) শব্দটি যেহেতু নিজের উপর কিছু আবশ্যক করা বুঝায় তাই এর দ্বারাও কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে।

৩. কেউ বলল– هُوَ اِلَيَّ অর্থাৎ তার দায়িত্ব আমার কাছে। 'আমার কাছে' (اِلَيَّ) শব্দটি এসব ক্ষেত্রে 'আমার জিম্মায়' (عَلَيَّ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মাঝে 'আমার কাছে (اِلَيَّ) শব্দটি 'আমার জিম্মায়' (عَلَيَّ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا اَوْ عِيَالاً فَاِلَيَّ অর্থাৎ কেউ যদি সম্পদ ছেড়ে যায় তাহলে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ব্যক্তি এতিম সন্তান বা কোনো পোষ্য রেখে মারা যায় তার দায়িত্ব আমার কাছে। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) থেকে এ হাদীসটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَاِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ وَاَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهٗ –

৪. কেউ যদি বলে– اَنَا زَعِيْمٌ بِهٖ অর্থাৎ আমি তার জামিনদার; এ শব্দ দ্বারাও কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে। কেননা, জামিনদারিই (اَلزَّعَامَةُ) তো কাফালাহ। পূর্বে একটি হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি; তাতে কাফীলকে জামিনদার (اَلزَّعِيْمُ) বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ জামিনদার অর্থাৎ কাফীল দায়বদ্ধ।

৫. কেউ বলল– اَنَا قَبِيْلٌ بِهٖ অর্থাৎ আমি তার তদারকি গ্রহণকারী; এ শব্দ দ্বারাও কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে। কেননা, তদারকি গ্রহণকারী (قَبِيْلٌ) আর কাফীল-এর একই অর্থ। এ কারণেই দলিল-দস্তাবেজ ও চেককে তদারকিপত্র অর্থাৎ قَبَالَةٌ বলা হয়। মানুষ দলিলপত্রে বা চেকে যা কিছু লেখে তা নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। আর নিজের উপর আবশ্যককারীকে কাফীল বলা হয়। সুতরাং আমি কাফীল (اَنَا كَفِيْلٌ) ও আমি তদারকি গ্রহণকারী (اَنَا قَبِيْلٌ) -এর অর্থ এক।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهٖ الخ : পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে যে, আমি তাকে সনাক্ত করার জামিন হলাম তাহলে এর দ্বারা কাফালাহ চুক্তি সংঘটিত হবে না। কেননা, এ সুরতে কাফীল সনাক্ত করার জিম্মা নিয়েছে। মাকফূল লাহুর দায় পরিশোধের জিম্মা নেয়নি। আর দাবি পরিশোধের জিম্মা নেওয়াই হলো কাফালাহ।

قَالَ : فَإِنْ شَرَطَ فِى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ تَسْلِيْمَ الْمَكْفُوْلِ بِهٖ فِىْ وَقْتٍ بِعَيْنِهٖ لَزِمَهٗ إِحْضَارُهٗ، إِذَا طَالَبَهٗ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهٗ، فَإِنْ أَحْضَرَهٗ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِامْتِنَاعِهٖ عَنْ إِيْفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحِقٍّ عَلَيْهِ، وَلٰكِنْ لَا يَحْبِسُهٗ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَعَلَّهٗ مَا دَرٰى لِمَاذَا يَدَّعِىْ، وَلَوْ غَابَ الْمَكْفُوْلُ بِنَفْسِهٖ أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةَ ذِهَابِهٖ وَمَجِيْئِهٖ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ يَحْبِسُهٗ لِتَحَقُّقِ امْتِنَاعِهٖ عَنْ إِيْفَاءِ الْحَقِّ، قَالَ : وَكَذَا إِذَا ارْتَدَّ، وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَهٰذَا لِأَنَّهٗ عَاجِزٌ فِى الْمُدَّةِ فَيُنْظَرُ كَالَّذِىْ أَعْسَرَ، وَلَوْ سَلَّمَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ بَرِئَ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّهٗ، فَيَمْلِكُ إِسْقَاطَهٗ، كَمَا فِى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কাফালাহ বিন নাফস-এর মাঝে মাকফূল বিহী অর্থাৎ জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে সোপর্দ করার শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে মাকফূল লাহুর দাবির প্রেক্ষিতে ঐ সময় মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করা কাফীলের উপর আবশ্যক। যাতে কাফীল যে দায় গ্রহণ করেছে তা পূর্ণ হয়। যদি কাফীল তাকে [যথাসময়ে] উপস্থিত করে [তাহলে ভালো]। অন্যথায় তার উপর আরোপিত অন্যের হক আদায় না করার কারণে কাজি তাকে আটক করবে। অবশ্য কাজি তাকে প্রথমবার আটক করবে না। কারণ, তার জানা নাও থাকতে পারে যে, কেন তাকে ডাকা হয়েছে। যদি মাকফূল বিহী গায়েব থাকে [আর তার অবস্থানস্থল কাফীলের জানা থাকে] তাহলে কাজি কাফীলকে তার যাওয়া ও আসার সময় পরিমাণ অবকাশ দিবেন। যদি এ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু কাফীল মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করেনি তাহলে অন্যের হক আদায় করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় কাজি তাকে আটক করবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে যদি, আল্লাহ না করুন, মাকফূল বিহী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় [তাহলে কাফীলকে অবকাশ দেওয়া হবে।] এটা এ জন্য যে, কাফীল নির্দিষ্ট সময় [তাকে উপস্থিত করতে] অপারগ। সুতরাং দরিদ্র ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মতো তাকে অবকাশ দেওয়া হবে। যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে সোপর্দ করে দেয় তাহলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, নির্ধারিত মেয়াদটি তার হক। সুতরাং সে তা রহিত করার অধিকার রাখে, যেমন [অধিকার রাখে] মেয়াদী ঋণের [মেয়াদ রহিত করার] ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ فَإِنْ شَرَطَ فِى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الخ : উল্লেখ্য যে, কাফালাহ বিন নফসের ক্ষেত্রে মাকফূল আনহুই মাকফূল বিহী হয়ে থাকে এবং কাফীল মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করার জামিন হয়। যদি কাফালাহ চুক্তির মাঝে মাকফূল বিহীকে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত করার শর্তারোপ করা হয় তাহলে কাফীলের উপর ঐ সময় মাকফূল বিহীকে যথাস্থানে উপস্থিত করা আবশ্যক। যাতে তার জামিনদারি পূর্ণ হয়। তবে শর্ত হলো মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীর উপস্থিতি দাবি করতে হবে। যদি কাফীল যথাস্থানে এবং যথাসময়ে মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করে তাহলে ভালো; সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

আর যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে উপস্থিত না করে তাহলে কাজি কাফীলকে গ্রেফতার করবে। কেননা, জামিনদারি গ্রহণ করায় তার উপর যে হক অনিবার্য হয়েছিল সে তা আদায় করেনি। ফলে সে জালিম সাব্যস্ত হবে। আর কয়েদ ও জেল হলো জালিমের শাস্তি। অবশ্য নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কাজি কাফীলকে প্রথমবারেই গ্রেফতার করবে না। কারণ, হতে পারে কাজি কেন তাকে গ্রেফতার করছে তা-ই কাফীলের জানা নেই। আর জানা না থাকার ক্ষেত্রে সে জালিম সাব্যস্ত হবে না। আর জালিম সাব্যস্ত না হলে তাকে গ্রেফতারও করা হবে না। হ্যাঁ, কাফীলকে বিষয়টি জানানোর পর যদি সে মাকফূল বিহীকে উপস্থিত না করে তাহলে কাজি তাকে গ্রেফতার করবে। তবে উপস্থিত না করার পিছনে যদি কাফীলের অপারগতা থাকে তাহলেও কাজী তাকে গ্রেফতার করবে না।

কি কি কারণে অপারগতা হতে পারে?

১. মাকফূল বিহী গায়েব।

২. মাকফূল বিহী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ غَابَ الْمَكْفُوْلُ بِنَفْسِهِ اَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ الخ : যদি মাকফূল বিহী গায়েব থাকে তাহলে তার দু-সুরত। ১. মাকফূল বিহী কোথায় আছে তা কাফীল জানে। ২. কাফীল তা জানে না। যদি মাকফূল বিহী গায়েব থাকে এবং তার ঠিকানা কাফীলের জানা থাকে তাহলে কাজি কাফীলকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করবে না; বরং মাকফূল বিহীর কাছে যেতে এবং তাকে নিয়ে আসতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় ততটুকু সময় তাকে অবকাশ দিবে; যদি এ সময়ের ভিতরে কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করে তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও তাকে হাজির না করে তাহলে কাজি কাফীলকে গ্রেফতার করবে। কারণ, তার উপর আরোপিত হক আদায় করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সে জালিম সাব্যস্ত হবে। আর জালিমের শাস্তি হলো গ্রেফতার।

আর যদি মাকফূল বিহী কোথায় আছে তা কাফীলের জানা না থাকে এবং মাকফূল লাহুও বিষয়টি মেনে নেয় তাহলে কাফীল অপারগ বলে গণ্য হবে। তাই যতদিন পর্যন্ত মাকফূল বিহীর ঠিকানা অজ্ঞাত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার উপর থেকে দাবি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কাফীল মাকফূল বিহীর ঠিকানা জানে না- এ বিষয়টি যদি মাকফূল লাহু মেনে না নেয়; বরং কাফীল জানে বলে সে দাবি করে তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যদি মাকফূল বিহীর সফরের স্থানও ব্যবসার জন্য তার গমনাগমনের বিষয়টি লোকদের জানা থাকে এবং সে কোথায় যেতে পারে, তা লোকদের সাধারণ ধারণা থাকে তাহলে মাকফূল লাহুর কথা ধর্তব্য হবে। তাই কাজি কাফীলকে ঐ স্থানে গমনের নির্দেশ দিবে। কারণ, মাকফূল লাহুর কথা বাহ্যিক অবস্থার অনুকূল হওয়ায় সে হবে বিবাদী আর কাফীল হবে বাদী। আর বাদী দলিল পেশ করতে অপারগ হলে বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

আর যদি মাকফূল বিহীর সফরের স্থান ও ব্যবসার জন্য তার গমনাগমনের বিষয়টি লোকদের জানা না থাকে এবং সে কোথায় যেতে পারে, তা লোকদের সাধারণ ধারণা না থাকে তাহলে কাফীলের কথা ধর্তব্য হবে। কারণ, বাহ্যিক অবস্থা কাফীলের অনুকূল হওয়ায় সে বিবাদী, আর মাকফূল লাহু বাদী সাব্যস্ত হবে। আর বাদী দলিল পেশ করতে অপারগ হলে বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। তাই এ সুরতে কাফীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ وَلَحِقَ الخ : আর যদি, আল্লাহ না করুন, মাকফূল বিহী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, আর দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সাথে এ ধরনের চুক্তি থাকে যে, তারা দারুল ইসলামে আসতে পারে এবং দারুল ইসলামের অধিবাসীরা দারুল হরবে যেতে পার তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে মাকফূল বিহীকে হাজির করতে না পারায় কাজী কাফীলকে গ্রেফতার করবে না; বরং দারুল হরবে যেতে ও আসতে যে সময় লাগবে এতটুকু সময় কাফীলকে অবকাশ প্রদান করবে। কেননা, তার আগে কাফীল মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করতে অপারগ। আর অপারগ ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া হয়। যেমন কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধের ওয়াদা করল, কিন্তু অভাবের কারণে সে ঐ তারিখে পরিশোধ করতে অপারগ হলো, তাহলে তাকে অবকাশ প্রদান করা হয়। অতএব, কাফীলকেও অবকাশ প্রদান করা হবে।

যদি ঐ সময়ের ভিতরে কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করতে পারে তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি হাজির করতে না পারে তাহলে কাজী তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় ঢুকাবে। কেননা, তার উপর আরোপিত হক আদায় করা থেকে তার বিরত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

আর যদি দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সাথে এ ধরনের কোনো চুক্তি না থাকে তাহলে কাজী তাকে গ্রেফতার করবে না। কেননা, মাকফূল বিহীকে হাজির করার বিষয়ে কাফীল সম্পূর্ণ অপারগ। তাই তার উপর মাকফূল বিহীকে হাজির করার দাবি রহিত হয়ে যাবে এবং মাকফূল বিহীর দারুল ইসলামে ফেরা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ سَلَّمَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ بَرِئَ لِاَنَّ الْاَجَلَ الخ : যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাফীল মাকফূল বিহীকে সোর্পদ করে দেয় তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, নির্দিষ্ট মেয়াদটি তার হক। আর হকদার তার হক রহিত করার অধিকার রাখে। যেমন– মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হক। সে যদি তার হককে রহিত করে দেয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে তা করতে পারে। অতএব, আলোচ্য মাসআলায়ও কাফীল যদি মেয়াদের আগেই মাকফূল বিহীকে সোর্পদ করে দেয় তাহলে সে তা করতে পারে।

قَالَ : وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا الْتَزَمَهُ وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ التَّسْلِيمَ إِلَّا مَرَّةً ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি [কাফালাহ বিন নাফস-এর মাঝে] কাফীল মাকফূল বিহীকে এমন স্থানে হাজির করে এবং তাকে সোপর্দ করে যেখানে মাকফূল লাহু তার বিরুদ্ধে মামলায় লড়তে পারে, যেমন কোনো শহরে, তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, যে দায় সে গ্রহণ করেছিল তা সে পূর্ণ করেছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। এটা এ জন্য যে, কাফীল একবার মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করার দায় গ্রহণ করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِيْ مَكَانٍ الخ : কাফালাহ বিন নাফস-এর মাঝে কাফীল মাকফূল বিহীকে কোথায় সোপর্দ করবে উপরিউক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) তাই আলোচনা করেছেন। কাফীল যদি মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে এমন স্থানে সোপর্দ করে যেখানে মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করতে পারে, যেমন– কোনো শহরে, তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, কাফীল মাকফূল বিহীকে একবার সোর্পদ করার জামিনদারি গ্রহণ করেছিল এবং সে তা পূর্ণ করেছে এবং এর দ্বারা কাফালাহ- এর উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়েছে। কাফালাহ বিন নাফসের উদ্দেশ্য হলো, মাকফূল বিহীকে কাজির আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা। তাই কাফীল যখন মাকফূল বিহীকে এমন স্থানে সোপর্দ করবে যেখানে মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করতে পারে তখন উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। আর শহরে সাধারণত কাজি থাকেন তাই শহরে সোপর্দ করার দ্বারা কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফীল মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে শহরে সোপর্দ করার দ্বারা কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তা যে শহরেই হোক। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে কাফীল যে শহরে কাফালাহ গ্রহণ করেছে সেই শহরে মাকফূল বিহীকে সোর্পদ করতে হবে। কেননা, বাহ্যত মাকফূল লাহুর জন্য সে শহরে মামলা চালানো সহজ হবে। তার সাক্ষীদেরও সেখানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা বেশি। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ মতকেই শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৬০]

وَإِذَا كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِئَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا لَا يَبْرَأُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْامْتِنَاعِ لَا عَلَى الْإِحْضَارِ، فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا، وَإِنْ سَلَّمَهُ فِي بَرِّيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيهَا، فَلَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ، وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَادٍ لِعَدَمِ قَاضٍ يَفْصِلُ الْحُكْمَ فِيهِ، وَلَوْ سَلَّمَ فِي مِصْرٍ اٰخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِي كَفَلَ فِيهِ بَرِئَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيهِ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ شُهُودُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السِّجْنِ وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُ الطَّالِبِ لَا يَبْرَأُ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيهِ.

অনুবাদ : যদি কেউ মাকফূল বিহীকে কাজির মজলিসে সোপর্দ করার শর্তে কাফীল হয়, অতঃপর সে তাকে বাজারে সোপর্দ করে তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার কারণে কাফীল [কাফালাহ থেকে] মুক্ত হয়ে যাবে। কারো কারো মতে আমাদের যুগে [এ সুরতে] কাফীল মুক্ত হবে না। কেননা, [এখন] সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে আসামীকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করা, হাজির করার ব্যাপারে সাহায্য করা নয়। সুতরাং এই শর্তারোপ অর্থবহ। তদ্রূপ যদি কাফীল তাকে কোনো ময়দান বা জঙ্গলে সোপর্দ করে তাহলে সে [কাফালাহ থেকে] মুক্ত হবে না। কেননা, মাকফূল লাহু সেখানে মামলা লড়তে সক্ষম নয়। সুতরাং কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। অনুরূপভাবে কাফীল যদি তাকে কোনো গ্রামে [যেখানে কাজি নেই] সোপর্দ করে [তাহলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না]। কারণ, সেখানে ফয়সালা দেওয়ার মতো কোনো কাজি নেই। যে শহরে কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করেছে তা ছাড়া অন্য কোনো শহরে যদি [মাকফূল বিহীকে] সোপর্দ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, [মাকফূল লাহু] সেখানে [তাকে] বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম। সাহেবাইন (র.)-এর মতে কাফীল মুক্ত হবে না। কেননা, হতে পারে তার সাক্ষীগণ ঐ শহরে, যে শহর সে ধার্য করেছে। যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে জেলখানায় [বন্দীদশা অবস্থায়] সোপর্দ করে, অথচ মাকফূল লাহু ছাড়া অন্য কেউ তাকে বন্দী করেছে তাহলে কাফীল মুক্ত হবে না। কেননা, মাকফূল লাহু সেখানে [তাকে] বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে কাজির মজলিসে সোপর্দ করার শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করে। আর সে তাকে বাজারে সোপর্দ করে তাহলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। 'শামিল' গ্রন্থে আছে যে, যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে শহরের বড় মসজিদে সোপর্দ করার শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করে আর পরে তাকে বাজারে সোপর্দ করে তাহলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। −[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৫৪৪] কেননা, এতে কাফালার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কাফালাহ বিন নাফসের উদ্দেশ্য হলো, মাকফূল বিহীকে কাজির আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা। তাই কাফীল যখন মাকফূল বিহীকে এমন স্থানে সোপর্দ করবে যেখানে মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করতে পারে তখন কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। শহরের বাজার যেহেতু শহরেরই অংশ তাই এখানে সোপর্দ করার দ্বারা সহজেই মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে কাজির আদালতে নিয়ে গিয়ে বিচারের সম্মুখীন করতে পারে। তাছাড়া পুরো শহরটি একটি ভূখণ্ডের ন্যায়। সুতরাং বাজারে সোপর্দ করা বড় মসজিদে বা কাজির মজলিসে সোপর্দ করারই নামান্তর। গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের যুগে কাজির মজলিসে সোপর্দ করার শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করার পর বাজারে সোপর্দ করলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, বর্তমান যুগ হলো ফিতনা-ফাসাদের যুগ। এ যুগে যদি কাফীল মাকফূল

বিহীকে বাজারে সোপর্দ করে তাহলে মাকফূল লাহু তাকে কাজির মজলিসে বিচারের সম্মুখীন করতে পারবে না। কেননা, মাকফূল বিহী চিৎকার করে লোক জড়ো করবে এবং তাদের কাছে সে নিজেকে অত্যাচারিত ও মজলুম বলে প্রকাশ করবে। এতে মানুষ সত্য তালাশের পরিবর্তে তাকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। কাজির মজলিসে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে না। ফলে মাকফূল লাহুর পক্ষে তাকে কাজির মজলিসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই বর্তমান যুগে কাজির মজলিসে সোপর্দ করার শর্ত করা হলে তা অর্থবহ হবে অর্থাৎ কাজির মজলিসেই তাকে সোপর্দ করতে হবে।

শামীল গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আল্লামা আইনী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ ধরনের একটি অভিমত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এর উপরই বর্তমানে ফতোয়া। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَإِنْ سَلَّمَهُ فِىْ بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّهُ الخ : যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে ময়দান বা জঙ্গলে সোপর্দ করে তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, ময়দান বা জঙ্গলে কাজি থাকে না। তাই সেখানে সোপর্দ করার দ্বারা মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম নয়। ফলে কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না এবং কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ায় কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِىْ سَوَادٍ لِعَدَمِ قَاضٍ الخ : অনুরূপভাবে যদি কাফীল মাকফূল বিহিকে গ্রামে সোপর্দ করে তাহলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। কারণ গ্রামে কাজি না থাকায় মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রামে সোপর্দ করার দ্বারা কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ فِىْ مِصْرٍ اٰخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِىْ الخ : যে শহরে কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করেছে তাছাড়া অন্য কোনো শহরে যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, প্রত্যেক শহরেই কাজি থাকে। যে কোনো কাজির কাছেই মকদ্দমা দায়ের করা যায়। তাই মাকফূল বিহীকে যে কোনো শহরে সোপর্দ করা হোক মাকফূল লাহু সেখানে তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম। এতে কাফালাহর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। তাই কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। এটা আইম্মায়ে ছালাছা [ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)]-এরও অভিমত। কেননা, হতে পারে মাকফূল লাহুর সাক্ষীগণ ঐ শহরে, যে শহর সে নির্দিষ্ট করেছে। তাই সে শহর ছাড়া অন্য কোনো শহরে সোপর্দ করলে মাকফূল লাহু তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে পারবে না। ফলে কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। অতএব যে শহরে কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করেছে তা ছাড়া অন্য কোনো শহরে কাফীল মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, কারো কারো মতে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে দলিল ও হুজ্জতের ভিন্নতার কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়নি; বরং যুগের পরিবর্তনই এ মতপার্থক্যের কারণ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগ ছিল খায়রুল কুরুন তথা কল্যাণময় যুগ। মানুষের মাঝে তাকওয়া ও পরোপকারের মানসিকতা ছিল। ঘুষ ও দুর্নীতি ছিল না। কাজি ও শাসকগণ আল্লাহভীরু ছিলেন। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর যুগে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেক পাল্টে যায়। মানুষের মাঝে খোদাভীরুতা ও পরোপকারের মানসিকতা হ্রাস পায়। শাসক ও কাজিগণ ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আঞ্চলিক শাসক ও কাজিগণ খলিফার নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় সকল কাজিকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। এসব দর্শনে সাহেবাইন (র.) যে শহরে কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করেছে সে শহরেই সোর্পদ করার ফতোয়া দিয়েছেন। -[বিনায়া: প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪৪]

قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِى السِّجْنِ وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُ الخ : যদি কাফীল মাকফূল বিহীকে জেলখানায় বন্দীদশা অবস্থায় মাকফূল লাহুর কাছে সোপর্দ করে অথচ মাকফূল লাহু ছাড়া অন্য কেউ তাকে বন্দী করেছে তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, তৃতীয় ব্যক্তি তাকে বন্দী করার কারণে মাকফূল লাহু সেখানে তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে সক্ষম নয়। তাই কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। অতএব, জেলখানায় বন্দীদশা অবস্থায় সোপর্দ করলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, বন্দীদশা অবস্থায় সোপর্দ করলেও কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যে কাজির মজলিসে মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীকে বিচারের সম্মুখীন করবে, যদি ঐ কাজির বন্দীশালায় বন্দী অবস্থায় কাফীল মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করে তাহলে কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে। অন্যথায় মুক্ত হবে না। -[প্রাগুক্ত]

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيْلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ، لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِهِ، وَلِأَنَّهُ سَقَطَ الْحُضُورَ عَنِ الْأَصِيْلِ فَيَسْقُطُ الْإِحْضَارَ عَنِ الْكَفِيْلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيْلُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيْمِ الْمَكْفُوْلِ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ لَا يَصْلُحُ لِإِيْفَاءِ هٰذَا الْوَاجِبِ، بِخِلَافِ الْكَفِيْلِ بِالْمَالِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُوْلُ لَهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَارِثِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি [কাফালাহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে] মাকফূল বিহী মারা যায় তাহলে কাফীল বিন নাফস [দেহসত্তার জামিনদার] কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, সে মাকফূল বিহীকে হাজির করতে অক্ষম হয়ে গেছে। তাছাড়া হাজির হওয়ার বিয়য়টি মাকফূল বিহী থেকেই রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং কাফীল থেকেও তাকে হাজির করা [-র জিম্মা] রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ কাফালাহ রহিত হয়ে যাবে যদি কাফীল মারা যায়। কেননা, কাফীলের মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করার সক্ষমতা অবশিষ্ট নেই এবং তার সম্পদ এ ওয়াজিব কর্ম সম্পাদনের যোগ্য নয়। কিন্তু কাফীল বিল মালের [অর্থসম্পদের জামিনদার] বিষয়টি ভিন্ন। আর যদি মাকফূল লাহু মারা যায় তাহলে ওসী [মাকফূল লাহু কর্তৃক অসিয়তকৃত ব্যক্তি] -এর কাফীলের কাছে [মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করার] দাবি করার অধিকার থাকবে। আর যদি [মৃত মাকফূল লাহুর] ওসী না থাকে তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের অধিকার থাকবে। কারণ, তারা মৃত মাকফূল লাহুর স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُوْلُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيْلُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কাফালাহ বিন নাফসের ক্ষেত্রে মাকফূল বিহী মারা যায় তাহলে কাফীল বিন নাফস কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ কথাই বলেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও এটি। তবে বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, যদি মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীর উত্তরাধিকারীদের সামনে সাক্ষী পেশ করতে চায় তাহলে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত সে কাফীলের কাছে মাকফূল বিহীর মরদেহ হাজির করার দাবি করতে পারে।

গ্রন্থকার (র.) আমাদের মাযহাবের সমর্থনে দুটি দলিল পেশ করেছেন। যথা–

১. কাফালাহ বিন নাফস -এর স্থায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কাফীল ও মাকফূল বিহী জীবিত থাকে। তাদের কোনো একজনের বা উভয়ের মৃত্যু কাফালাহকে রহিত (سَاقِطْ) করে দেয়। কেননা, যখন মাকফূল বিহী মৃত্যুবরণ করে তখন কাফীল তাকে হাজির করতে অক্ষম হয়ে যায়। আর যখন কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন কাফালাহ রহিত (سَاقِطْ) হয়ে যায়। তাই আলোচ্য সুরতে কাফালাহ রহিত হয়ে যাবে এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

২. মৃত্যুবরণ করার কারণে মাকফূল বিহীর উপর থেকে হাজির হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়। তাই কাফীলের উপরও তাকে হাজির করার বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে। কারণ, আসীল (أَصِيْل) তথা মাকফূল বিহীর মুক্ত হওয়াটা (بَرَاءَةٌ) কাফীলের মুক্তিকেও আবশ্যক করে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الخ : আর যদি কাফীল মৃত্যুবরণ করে তাহলেও কাফালাহ রহিত হয়ে যাবে এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, কারণ মৃত্যুবরণ করার কারণে সে মাকফূল বিহীকে হাজির করতে অক্ষম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَالُه لَا يَصْلُحُ لِإِيْفَاءِ هٰذَا الْوَاجِبِ الخ : এ ইবারতে গ্রন্থকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কাফীলের মৃত্যুবরণ করার কারণে কাফালাহ রহিত না হওয়া উচিত। কারণ, কাফীলের পরিত্যক্ত সম্পদ আছে। মাকফূল লাহু মাকফূল বিহীর কাছে যে দায় পাবে তা ঐ পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করা হবে।

গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, কাফালাহ বিল মালের ক্ষেত্রে এ কথা ঠিক আছে। কেননা, কাফালাহ বিল মালে কাফীল মাকফূল বিহীর কাছে মাকফূল লাহু যে দায় (دَيْن) তথা মাল পাবে তার জামিন হয়। সুতরাং কাফীলের মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মাকফূল লাহুর দায় পরিশোধ করা হবে। আর কাফীলের উত্তরাধিকারীরা এ পরিমাণ অর্থ বা মাল মাকফূল বিহী থেকে ফেরত নিবে; যদি কাফীল মাকফূল বিহীর নির্দেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কাফালাহ বিন নাফসের মাঝে কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করা এবং মাকফূল লাহুর কাছে সোপর্দ করার জামিন হয়। আর মৃত্যুবরণ করার কারণে এ থেকে কাফীল অক্ষম হয়ে গেছে। তার পরিত্যক্ত সম্পদ মাকফূল বিহীকে হাজির করার বিকল্প বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কারণ, কাফীল মাল-সম্পদের দায় গ্রহণ করেনি, মাকফূল বিহীকে উপস্থিত করার দায় গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মাল-সম্পদ দেহসত্তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাই কাফীলের পরিত্যক্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কাফালাহ রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُوْلُ لَهُ فَلِلْوَصِيِّ اَنْ يُطَالِبَ الخ : যদি মাকফূল লাহু মৃত্যুবরণ করে তাহলে কাফালাহ বাতিল হবে না; বরং তার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ওসী কাফীলের কাছে মাকফূল বিহীকে যথাস্থানে হাজির করার দাবি (مُطَالَبَةٌ) জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করবে। আর যদি ওসী না থাকে তাহলে উত্তরাধিকারীরা এ অধিকার লাভ করবে। কেননা, মৃত ব্যক্তির অবর্তমানে ওসী এবং উত্তরাধিকারীগণ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তাই ওসী ও উত্তরাধিকারী উভয়েই ক্রমান্বয়ে মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে কাফীলের কাছে দাবি জানানোর অধিকার পাবে।

قَالَ : وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ أٰخَرَ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَأَنَا بَرِئٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بَرِئَ، لِأَنَّهُ مُوْجَبُ التَّصَرُّفِ فَيَثْبُتُ بِدُوْنِ التَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُوْلُ الطَّالِبِ التَّسْلِيْمَ كَمَا فِيْ قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُوْلُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كِفَالَتِهِ صَحَّ، لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْخُصُوْمَةِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ، وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَكِيْلُ الْكَفِيْلِ أَوْ رَسُوْلُهُ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামিউস সাগীরে] বলেন, কেউ যদি কোনো ব্যক্তির দেহসত্তার কাফীল হয়, কিন্তু [কাফালাহ চুক্তির সময় মাকফূল লাহুকে] এ কথা বলেনি যে, যখন আমি তোমার কাছে [মাকফূল বিহীকে] অর্পণ করব তখন আমি মুক্ত হয়ে যাব, এরপর সে মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করে তাহলে সে [কাফালাহ থেকে] মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, কাফালাহ চুক্তির এটাই অনিবার্য ফল। সুতরাং তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়াই সাব্যস্ত হবে। [মাকফূল বিহীকে] অপর্ণ করার পর [কাফীলের কাফালাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য] মাকফূল লাহুর কবুল করা শর্ত নয়; যেমন ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে [কবুল করা শর্ত নয়]। যদি মাকফূল বিহী কাফীলের পক্ষ থেকে নিজেই নিজেকে অর্পণ করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা, বিবাদের ক্ষেত্রে সে-ই স্বয়ং বিবাদী। সুতরাং [বিবাদ] প্রতিরোধের অধিকার তার থাকবে। এরূপভাবে তাকে যদি কাফীলের উকিল বা দূত মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করে [তাহলে তাও শুদ্ধ হবে।] কেননা, তারা উভয়ে কাফীলের স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ أٰخَرَ الخ : উপরিউক্ত মাসআলাটি জামিউস সাগীরের। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি অপর কোনো ব্যক্তির দেহসত্তা (نَفْس)-এর কাফীল হয় কিন্তু কাফালাহ চুক্তির সময় মাকফূল লাহুকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেনি যে, যখন আমি তোমার কাছে মাকফূল বিহীকে অর্পণ করব তখন আমি মুক্ত হয়ে যাব (إِذَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَأَنَا بَرِئٌ) এরপর সে মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করে তাহলে সে কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এ মাসআলার দলিল হিসেবে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, কোনো চুক্তি (عَقْد)-এর অনিবার্য ফল বা পরিণতি (مُوْجَبْ) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য চুক্তির সময় ঐ ফল বা পরিণতি (مُوْجَبْ) -এর উল্লেখ করা জরুরি নয়। যেমন, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির অনিবার্য ফল হলো, ক্রেতা বিক্রীত পণ্যের এবং বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক হবে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের পর পণ্যের বা বিনিময় মূল্যের মালিক হওয়ার জন্য চুক্তি করার সময় এ কথা বলে নেওয়া জরুরি নয় যে, আমি ক্রয়-চুক্তির পর পণ্যের বা বিনিময় মূল্যের মালিক হব। তদ্রূপ বিবাহ চুক্তি (عَقْد نِكَاحْ)-এর অনিবার্য ফল হলো স্ত্রী-সম্ভোগ (اِسْتِمْتَاعْ) বৈধ হওয়া। সুতরাং বিবাহের পর স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ হওয়ার জন্য বিবাহ-চুক্তির সময় এটা বলে নেওয়া জরুরি নয় যে, বিবাহের পর আমার জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ হবে।

আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ চুক্তির অনিবার্য ফল (مُوْجَبْ) হলো কাফীল বিন নাফস মাকফূল বিহীকে অর্পণ করার দ্বারা কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং অর্পণের পর কাফালাহ থেকে মুক্ত (بَرِئَ) হওয়ার জন্য কাফালাহ চুক্তির সময় এ কথা বলে নেওয়া জরুরি নয় যে, আমি মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করার পর মুক্ত হয়ে যাব।

قَوْلُهُ وَلَا يَشْتَرِطُ قَبُوْلَ الطَّالِبِ التَّسْلِيْمَ الخ : কাফীল মাকফূল বিহীকে মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করার দ্বারাই কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তার কাফালাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐ অর্পণকে মাকফূল লাহুর কবুল করা শর্ত নয়। উদাহরণত কাফীল মাকফূল বিহীকে যথাস্থানে ও যথাসময়ে মাকফূল লাহুর সামনে হাজির করে বলল, আমি মাকফূল বিহীকে তোমার কাছে অর্পণ করলাম। কিন্তু মাকফূল লাহু তাকে কবুল করল না। এতেও কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কবুল করা শর্ত।

–[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৫৪৬]

আমাদের দলিল হলো, কাফীল যে জিনিসের জিম্মা গ্রহণ করে তা অর্পণের পর কাফালাহ থেকে তার মুক্ত হওয়াটা মাকফূল লাহুর কবুলের উপর মওকুফ থাকে না। কেননা, যদি মাকফূল লাহুর কবুলের উপর মওকুফ রাখা হয় আর কখনো মাকফূল লাহু কবুল করা থেকে বিরত থাকে তাহলে কাফীলের ক্ষতি হবে। আর ইসলাম সকলকেই ক্ষতি থেকে যথাসাধ্য রক্ষা করে। তাই কাফীলকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাকফূল লাহুর কবুলের সাথে কাফীলের মুক্ত হওয়াকে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি।

এর দৃষ্টান্ত (نَظِيْرٌ) হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারকে ঋণের টাকা অর্পণ করে এবং তা কব্জা করার ক্ষেত্রে পাওনাদারের কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

চাই পাওনাদার তা কব্জা করুক বা না করুক। এরূপভাবে ছিনতাইকারী (غَاصِبْ) যদি ছিনতাইকৃত মাল মালিকের কাছে ফেরত দেয়, মালিক কব্জা করুক বা না করুক, ছিনতাইকারী মালের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি বিক্রীত পণ্য ক্রেতার কাছে সোপর্দ করে, ক্রেতা তা কব্জা করুক বা না করুক, বিক্রেতা বিক্রীত পণ্য অর্পণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُوْلُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كِفَالَتِهِ الخ : যদি মাকফূল বিহী কাফীলের পক্ষ থেকে নিজেই নিজেকে অর্পণ করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, মাকফূল লাহু যেরূপ কাফীলের কাছে দায় পরিশোধের দাবি জানানোর অধিকার রাখে তেমনি মাকফূল বিহীর কাছেও দাবি জানানোর অধিকার রাখে। অর্থাৎ সেও মকদ্দমায় একজন বিবাদী। আর বাদীর মকদ্দমা প্রতিরোধ করার অধিকার বিবাদীর থাকে। তাই তার নিজেকে সোপর্দ করা শুদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য যে, মাকফূল বিহীর উপর নিজেকে সোপর্দ করা দু'দিক থেকে ওয়াজিব– নিজের পক্ষ থেকে এবং কাফীলের পক্ষ থেকে। যদি মাকফূল বিহী নিজেই নিজেকে সোপর্দ করে এবং এটা প্রকাশ না করে যে, আমি নিজেকে কাফীলের পক্ষ থেকে সোপর্দ করছি, তাহলে এ সোপর্দ কাফীলের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে না এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না; কিন্তু সে যদি এটা প্রকাশ করে যে, আমি আমাকে কাফীলের পক্ষ থেকে অর্পণ করছি তাহলে এ অর্পণ কাফীলের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এরূপভাবে মাকফূল বিহীকে যদি কাফীলের উকিল বা দূত মাকফূল লাহুর কাছে অর্পণ করে তাহলে তাও শুদ্ধ হবে এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত (بَرِئَ) হয়ে যাবে। কেননা, উকিল ও দূত কাফীলের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর স্থলাভিষিক্তের কাজ মূল ব্যক্তির কাজ বলে গণ্য হয়। তাই তাদের কাজও কাফীলের কাজ বলে গণ্য হবে।

قَالَ : فَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلٰى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ إِلٰى وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَلْفٌ، فَلَمْ يَحْضُرْهُ إِلٰى ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ، لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُوَافَاةِ، وَهٰذَا التَّعْلِيْقُ صَحِيْحٌ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَهُ الْمَالُ، وَلَا يَبْرَأُ عَنِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، لِأَنَّ وُجُوْبَ الْمَالِ عَلَيْهِ بِالْكَفَالَةِ لَا يُنَافِي الْكَفَالَةَ بِنَفْسِهِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّوَثُّقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُّ هٰذِهِ الْكَفَالَةُ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْقُ سَبَبِ وُجُوْبِ الْمَالِ بِالْخَطَرِ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَلَنَا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَيُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ اِلْتِزَامٌ، فَقُلْنَا : لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِمُطْلَقِ الشَّرْطِ، كَهُبُوْبِ الرِّيْحِ وَنَحْوِهِ، وَيَصِحُّ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ عَمَلًا بِالشُّبْهَيْنِ، وَالتَّعْلِيْقُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ مُتَعَارَفٌ، وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، وَقَالَ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ، فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُوْلُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কাফীল কোনো ব্যক্তির দেহসত্তার এই শর্তে কাফীল হয় যে, যদি সে তাকে অমুক সময়ের মধ্যে হাজির না করে তাহলে সে তার কাছে প্রাপ্য অর্থের জামিন হবে। আর প্রাপ্য অর্থ হলো এক হাজার দিরহাম। অতঃপর সে তাকে উক্ত সময়ের মধ্যে হাজির করল না তাহলে তার উপর উক্ত অর্থের জামানত অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা, অর্থের জামানত [কাফালাহ বিল মাল] [মাকফূল বিহীকে] হাজির না করার শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। আর এ সম্পৃক্ততা শুদ্ধ আছে। সুতরাং যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন তার উপর উক্ত অর্থ অবশ্য সাব্যস্ত হবে। তবে কাফীল দেহসত্তার কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, কাফালাহ- সূত্রে তার উপর অর্থ-দায় অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া দেহসত্তার কাফালাহ গ্রহণের বিরোধী নয়। কেননা, উভয় প্রকার কাফালাহ-এর উদ্দেশ্য হলো নির্ভরতা দান করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ কাফালাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা, অর্থ অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণকে অর্থাৎ কাফালাহ বিল মালকে একটি অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তা ক্রয়-বিক্রয় সদৃশ হলো। [বিক্রয় চুক্তিতে মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং এখানেও তা বৈধ হবে না।] আমাদের দলিল হলো, এটা যেমন বিক্রয় চুক্তির সদৃশ, তেমনি নজর ও মানতের সদৃশও; এ হিসেবে যে, এটা হচ্ছে আবশ্যক নয়, এমন কোনো বিষয়কে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের সাথে আমল হিসেবে আমরা বলেছি যে, [বিক্রয় চুক্তির সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে] সাধারণ ও অনির্ধারিত শর্ত যেমন, মওসুমী বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে [মানতের সাথে সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে] প্রচলিত শর্তের সম্পৃক্ততা শুদ্ধ হবে। আর হাজির না করার শর্তের সাথে সম্পৃক্ততা একটি প্রচলিত বিষয়। কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তির দেহসত্তার কাফীল হয় এবং বলে যে, যদি সে তাকে আগামীকাল হাজির না করে, তাহলে তার উপর মাল আবশ্যক হবে। এরপর যদি মাকফূল আনহু মারা যায় তাহলে শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় অর্থাৎ হাজির না করায় [কাফীল] মালের জামিন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَاِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلٰى أَنَّهُ اِنْ لَمْ يُوَافِ الخ : যদি কাফীল কোনো ব্যক্তির নফসের কাফালাহ এই শর্তে গ্রহণ করে যে, যদি সে তাকে অমুক সময়ের মধ্যে হাজির না করে তাহলে সে তার কাছে প্রাপ্য মালের জামিন হবে অর্থাৎ কাফীল বিল মাল হবে। আর প্রাপ্য মাল হলো এক হাজার দিরহাম। অতঃপর সে তাকে উক্ত সময়ের মধ্যে হাজির করল না তাহলে তার উপর মালের কাফালাহ আবশ্যক হবে। তবে নফসের কাফালাহ থেকে কাফীল মুক্ত হবে না; বরং মাকফূল বিহীকে হাজির করার জিম্মা পূর্বের মতো অবশিষ্ট থাকবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে দুটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে–

১. কাফালাহ বিল মাল শুদ্ধ এবং কাফীলের উপর মালের কাফালাহ আবশ্যক।

২. মালের দায় পরিশোধ করার পরও কাফালাহ বিন নাফস বাতিল হবে না এবং কাফীল কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না।

প্রথমোক্ত মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এ সুরতে মালের কাফালাহ শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِ عَدَمِ المُوافَاةِ الخ : প্রথম মাসআলায় আমাদের দলিল হলো, কাফালাহ বিল মাল মাকফূল বিহীকে হাজির না করার শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। আর এ শর্তযুক্ততা শুদ্ধ আছে। কেননা, লোক সমাজে এ ধরনের শর্তযুক্ততা প্রচলিত আছে। আর প্রচলিত শর্তের সাথে কাফালাহকে শর্তযুক্ত করা বৈধ। সুতরাং যখম প্রচলিত শর্তের সাথে কাফালাহকে শর্তযুক্ত করা হলো এবং শর্ত পাওয়া গেল অর্থাৎ কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করল না, তখন তার উপর মালের কাফালাহ আবশ্যক হবে। কেননা, নিয়ম হলো, إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ الْمَشْرُوْطُ যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন শর্তের সাথে যুক্ত বিষয়টিও পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ وُجُوْبَ الْمَالِ عَلَيْهِ بِالْكَفَالَةِ لَا يُنَافِيْ الخ : আর দ্বিতীয় মাসআলায় আমাদের দলিল হলো, উভয় কাফালার উদ্দেশ্য হলো মাকফূল লাহুকে তার দায় প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করা। উদ্দেশ্য এক হওয়ায় কাফালাহ বিল মাল ও কাফালাহ বিন নাফসের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। সুতরাং দুটো একসাথে হতে পারে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি একই সাথে কাফীল বিল মালও হতে পারে, আবার কাফীল বিন নাফসও হতে পারে। অতএব, কাফালাহ বিল মাল কাফালাহ বিন নাফসকে বাতিল করবে না। তাই কাফীল মালের দায় পরিশোধ করার পরও কাফালাহ বিন নাফস থেকে মুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ هٰذِهِ الْكَفَالَةُ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত সুরতে কাফালাহ বিল মালকে শুদ্ধ বলেন না। তাঁর দলিল হলো, আলোচ্য সুরতে কাফালাহ বিল মালকে শর্তযুক্ত করা মানে মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ (سَبَبٌ) -কে একটি অনিশ্চিত বিষরে সাথে শর্তযুক্ত করা। কাফালাহ বিল মাল, মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এ জন্য যে, মালের কাফালাহ গ্রহণ করার কারণেই কাফীলের উপর মাল আবশ্যক হচ্ছে। আর অনিশ্চিত বিষয়টি হলো মাকফূল বিহীকে হাজির করা বা না করা। মোটকথা, মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণকে অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তা বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হলো।

বিক্রয় চুক্তির সাথে সাদৃশ্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রেতা নিজ সম্মতিতে ক্রেতার কাছে মাল বিক্রি করে এবং ক্রেতা তার থেকে মাল গ্রহণ করে। আলোচ্য মাসআলায়ও কাফীল মাকফূল আনহুর সম্মতিতে কাফালাহ গ্রহণ করেছে এবং মাকফূল লাহুকে মাল পরিশোধ করার পর উক্ত মাল সে মাকফূল বিহী থেকে ফেরত নিচ্ছে। কাফালাহ যখন বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হলো তখন বিক্রয় চুক্তিতে যা নিষেধ তা কাফালাতেও নিষেধ হবে। আর বিক্রয় চুক্তিতে মাল (مَبِيْعٌ) অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণকে অর্থাৎ বিক্রয় চুক্তিকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। যেমন কেউ বলল, যদি তুমি শহরে যাও তাহলে তোমার কাছে আমি এ দ্রব্যটি একশ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করব। এ উদাহরণে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়াকে একটি অনিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ শহরে যাওয়া বা না যাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এ শর্তযুক্ততা বৈধ নয়। কেননা, মাল অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তথা سَبَبٌ -কে অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করাটা জুয়া। আর জুয়া শরিয়তে হারাম। সুতরাং এ শর্ত অনুযায়ী ক্রেতা শহরে গেলেও বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হবে না।

কাফালাহ বিক্রয় চুক্তির সদৃশ হওয়ায় বিক্রয় চুক্তির মতো কাফালাহকেও অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা বৈধ হবে না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ বিল মাল শুদ্ধ নয়। কেননা, মাকফূল বিহীকে হাজির করা, না করার সাথে কাফালাহ বিল মালকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَيُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, কাফালাহ বিল মাল যেমন বিক্রয় চুক্তির সদৃশ, তেমনি তা নজর ও মানতের সদৃশও। বিক্রয় চুক্তির সদৃশ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। মানতের সদৃশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মানত (نَذْر) হলো– আবশ্যক নয় এমন কিছুকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। যেমন কেউ মানত করল যে, যদি আমার পুত্র হজ থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে তাহলে আমি তিন দিন রোজা থাকব। নফল রোজা মানতকারীর উপর আবশ্যক ছিল না। কিন্তু সে তা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। কাফালাহ বিল মালের বিষয়টিও এরূপ। মাকফূল বিহীর কাছে প্রাপ্য দায় কাফীলের উপর আবশ্যক ছিল না। সে কাফালাহ গ্রহণ করে তা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। মোটকথা, কাফালাহ বিল মাল বিক্রয় চুক্তির সদৃশও, আবার মানতের সদৃশও। শুরু হিসেবে মানতের সদৃশ আর ফলাফল হিসেবে বিক্রয় চুক্তির সদৃশ।

শর্ত দু প্রকার–

১. شَرْط مُتَعَارَفْ প্রচলিত শর্ত যেমন– মাকফূল বিহীকে হাজির করার শর্ত।

২. شَرْط مُطْلَق সাধারণ ও অনির্ধারিত শর্ত যেমন– তুফান আসা, বৃষ্টি আসা, মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার শর্ত। বিক্রয় চুক্তিকে কোনো ধরনের শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েজ নেই। আর মানতকে উভয় প্রকার শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েজ আছে। অতএব, বিক্রয় চুক্তির সাথে কাফালাহ বিল মালের সাদৃশ্য হওয়ার দাবি হলো, কাফালাহ বিল মালকেও কোনো প্রকার শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েয হবে না। আর মানতের সাথে সাদৃশ্যের দাবি হলো উভয় প্রকার শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েজ হবে। আমরা উভয় সাদৃশ্যকে আমলে আনার জন্য বলেছি যে, বিক্রয় চুক্তির সাথে সদৃশতার ভিত্তিতে সাধারণ ও অনিধারিত শর্ত (شَرْط مُطْلَق) যেমন, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির সাথে কাফালাহ বিল মালকে সম্পৃক্ত করা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে মানতের সাথে সদৃশতার প্রেক্ষিতে প্রচলিত শর্তের (شَرْط مُتَعَارَفْ) সাথে সম্পৃক্ততা শুদ্ধ হবে। আর মাকফূল বিহীকে হাজির না করার শর্ত যেহেতু প্রচলিত তাই কাফালাহ বিল মালকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে। যখন কাফালাহ বিল মালকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ তখন কাফালাহ বিল মাল বৈধ ও শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ الخ : কেউ যদি কোনো ব্যক্তির নফসের কাফালাহ গ্রহণ করে এবং বলে যে, যদি আমি তাকে আগামীকাল হাজির না করি তাহলে তার কাছে প্রাপ্য মাল আমি পরিশোধ করব। এরপর মাকফূল মারা গেল। তাহলে কাফীল মালের জামিন হবে। এর দলিল হলো, কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির না করার শর্তের সাথে মালের জামিনদারিকে যুক্ত করেছে। আর নিয়ম হলো, শর্ত পাওয়া গেলে শর্তের সাথে যুক্ত বিষয়টিও পাওয়া যাবে। অতএব, যখন কাফীল মাকফূল বিহীকে হাজির করেনি তখন শর্ত পাওয়া যাওয়ায় তার উপর মালের জামিনদারি আবশ্যক হবে। তবে কাফীল যদি মাকফূল বিহীর নির্দেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে তাহলে মাকফূল বিহীর উত্তরাধিকারীদের থেকে উক্ত মাল ফেরত নিবে।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, বাহ্যিকভাবে মনে হয় আলোচ্য মাসআলা ও পূর্বোক্ত মাসআলায় কোনো পার্থক্য নেই। শুধু এটুকুই যে, পূর্বোক্ত মাসআলায় মাকফূল বিহীর মৃত্যুর উল্লেখ নেই। আর এ মাসআলায় তার উল্লেখ আছে; কিন্তু এটা তেমন কোনো পার্থক্য নয়। কেননা, মাকফূল বিহীর মৃত্যু হোক না হোক উভয় সুরতেই কাফীলের উপর মাল আবশ্যক হবে।

তবে গভীরভাবে দেখলে পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রথম পার্থক্য হলো, পূর্বোক্ত মাসআলায় মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করার যে সময়সীমা কাফীল দিয়েছিল ততদিন পর্যন্ত মাকফূল বিহী জীবিত ছিল এবং নির্ধারিত সময়ে কাফীল তাকে সোপর্দ করেনি; কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় কাফীল যে সময়সীমা ধার্য করেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মাকফূল বিহী জীবিত ছিল না। যার কারণে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাফীল মাকফূল বিহীকে সোপর্দ করেনি এ বিষয়টি আলোচ্য মাসআলায় অনুপস্থিত। প্রথম মাসআলায় নির্ধারিত সময়ে হাজির না করার পিছনে অক্ষমতা ছিল তা বলা যাবে না; কিন্তু দ্বিতীয় মাসআলায় হাজির করতে না পারার অক্ষমতা সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় পার্থক্য যে, পূর্বোক্ত মাসআলাটি কুদূরীর। আর আলোচ্য মাসআলাটি জামিউস সাগীরের। জামিউস সাগীরের কোনো কোনো নুসখায় غَدًا 'আগামীকাল' শব্দটি নেই। এ হিসেবে প্রথমোক্ত মাসআলায় হাজির না করার শর্তটি নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় হাজির না করার শর্তটি নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। –[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৪৫৯]

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ مِائَةَ دِيْنَارٍ بَيَّنَهَا اَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا حَتّٰى تَكَفَّلَ بِنَفْسِهٖ رَجُلٌ عَلٰى اَنَّهٗ اِنْ لَمْ يُوَافِ بِهٖ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهٖ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) : وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا حَتّٰى تَكَفَّلَ بِهٖ رَجُلٌ ثُمَّ ادَّعٰى بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ اِلٰى دَعْوَاهُ، لِاَنَّهٗ عَلَّقَ مَالًا مُطْلَقًا بِخَطَرٍ. اَلَا يَرٰى اَنَّهٗ لَمْ يَنْسِبْهُ اِلٰى مَا عَلَيْهِ، وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ وَاِنْ بَيَّنَهَا، وَلِاَنَّهٗ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوٰى مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، فَلَمْ يَجِبْ اِحْضَارُ النَّفْسِ، وَاِذَا لَمْ يَجِبْ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فَلَا تَصِحُّ بِالْمَالِ، لِاَنَّهٗ بِنَاءٌ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا بَيَّنَ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কারো নিকট একশ দিনার [পাওনার] দাবি করে; দিনারের [গুণগত মান] বর্ণনা করুক বা না করুক, এরপর [তৃতীয়] এক ব্যক্তি এই শর্তে তার দেহসত্তার কাফীল হলো যে, যদি সে তাকে আগামীকাল [মজলিসে] হাজির না করে তাহলে উক্ত একশ' দিনার তার জিম্মায়। অতঃপর সে তাকে পরদিন হাজির করল না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর উক্ত একশ' দিনার পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদিও বাদী দিনারের [গুণগত মান] বর্ণনা না করে, আর কোনো ব্যক্তি তার কাফীল হয়, এরপর বাদী [নির্দিষ্ট গুণের] দাবি করে তাহলে তার দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। কেননা, কাফীল অনির্ধারিত মালকে একটি অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছে। দেখুন না! উক্ত দিনারগুলোকে কাফীল মাকফূল আনহুর কাছে প্রাপ্য দিনার হিসেবে সম্বন্ধিত করেনি। আর এ পদ্ধতিতে দিনারের [গুণগত মান] বর্ণনা করলেও কাফালাহ শুদ্ধ হয় না। তাছাড়া দিনারের [গুণগত মান] বর্ণনা ছাড়া দাবিই শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং [মাকফূল বিহীর] দেহসত্তাকে হাজির করানো অবশ্য সাব্যস্ত হয়নি। যখন [মাকফূল বিহীর] দেহসত্তাকে হাজির করানো অবশ্য সাব্যস্ত হয়নি তখন কাফালাহ বিন নাফসও শুদ্ধ হয়নি। আর কাফালাহ বিন নাফস যেহেতু শুদ্ধ হয়নি তাই কাফালাহ বিল মালও শুদ্ধ হয়নি। কেননা, তার উপরই কাফালাহ বিল মালের ভিত্তি। কিন্তু [দাবি করার সময় দিনারের গুণগত মান] বর্ণনা করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ الخ :

মাসআলাটির বিবরণ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে আটক করল এবং তার কাছে একশ' দিনার পাবে বলে দাবি করল। দিনারের গুণগত মান অর্থাৎ তা উৎকৃষ্ট, না নিম্নমানের কিংবা তা বুখারী দিনার, না সমরকন্দী, তা উল্লেখ করেছে বা করেনি। তৃতীয় ব্যক্তি বাদীকে বলল, তুমি তাকে ছেড়ে দাও; আমি আগামী কাল তাকে হাজির করার কাফীল হলাম। যদি আগামী কাল আমি তাকে তোমার কাছে হাজির ও সোপর্দ না করি তাহলে (فَعَلَىَّ الْمِائَةُ) একশ' দিনার আমার জিম্মায়। বাদী এ কথায়

সম্মত হলো এবং বিবাদীকে ছেড়ে দিল; কিন্তু কাফীল পরদিন তাকে হাজির ও সোপর্দ করল না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাহলে উভয় সুরতে কাফীলের উপর একশ' দিনার প্রদান করা আবশ্যক হবে এবং বাদী যে গুণের একশ' দিনার দাবি করবে তা তাকে দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দাবি করার সময় বাদী দিনারের গুণ বর্ণনা না করে, কাফীলের কাফালাহ গ্রহণ করার পর সে দিনারের গুণ বর্ণনা করে তাহলে তার দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ عَلَّقَ مَالاً مُطْلَقاً بِخَطَرٍ اَلاَ يَرٰى الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) তার মতের পক্ষে দু'ভাবে দলিল পেশ করেছেন। ১. তিনি বলেন, কাফীল অনির্ধারিত মালকে (اَلْمَالُ الْمُطْلَقُ) একটি অনিশ্চিত বিষয়ের সাথে সংযুক্ত (تَعْلِيْقٌ) করেছে। অনিশ্চিত বিষয় মানে হচ্ছে বাদীকে হাজির করা, না করা। আর অনির্ধারিত মাল মানে তৃতীয় ব্যক্তি নিজের উপর যে একশ' দিনার আবশ্যক করেছে তা বিবাদীর কাছে বাদীর প্রাপ্য একশ' দিনার কিনা তা উল্লেখ করেনি। এভাবে বলেনি যে, تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ "তুমি তার কাছে যা পাবে আমি তার কাফীল হলাম।" এভাবে উল্লেখ না করায় দু'ধরনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ১. তৃতীয় ব্যক্তি বিবাদীর কাছে প্রাপ্য একশ' দিনারের কাফীল হয়েছে। ২. তৃতীয় ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বিবাদীকে ছাড়ানোর জন্য বাদীকে ঘুষ (رِشْوَةٌ) হিসেবে একশ' দিনার প্রদানের ওয়াদা করেছে। ঘুষ শরিয়ত হারাম করেছে। তাই দ্বিতীয় সম্ভাবনা হিসেবে একশ' দিনার প্রদান তৃতীয় ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে না। আর দু'ধরনের সম্ভাবনা থাকায় পরবর্তীতে গুণ বর্ণনা করে দিলেও কাফালাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা, কাফালাহ গ্রহণের আগে কাফীলের উপর নিশ্চিতভাবে মাল আবশ্যক হয় না; কাফালাহ গ্রহণের মাধ্যমে তা আবশ্যক হয়। আর নিয়ম আছে اَلْيَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بِالشَّكِّ "সন্দেহপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় বিষয় দ্বারা নিশ্চিত বিষয় রহিত হয় না।" তাই এ ধরনের সম্ভাবনাময় কথার দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির উপর নিশ্চিতভাবে যে একশ' দিনার আবশ্যক নয় তা রহিত হয়ে তদস্থলে একশ' দিনার আবশ্যক হবে না। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এ বক্তব্য অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হবে, কিন্তু কাফালাহ বিল মাল শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ কাফীলের উপর একশ' দিনার আবশ্যক হবে না। –[ফাতহুল কাদীর : খ. ৭, পৃ. ১৬৬]

وَلاَنَّهُ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوٰى مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ الخ : আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ বিন নাফস বাতিল। কেননা, তার শুদ্ধতা নির্ভরশীল শুদ্ধ দাবির উপর। আর দাবিকৃত বিষয় অজ্ঞাত থাকলে দাবি শুদ্ধ হয় না। তাই বাদীর একশ' দিনারের গুণ বর্ণনা না করার সুরতে তার দাবি শুদ্ধ হয়নি। আর দাবি শুদ্ধ না হওয়ায় কাফীলের উপর তাকে কাজির মজলিসে হাজির করা ওয়াজিব নয়। আর হাজির করা ওয়াজিব না হলে কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হয় না। আর আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ বিল মাল তথা একশ' দিনারের কাফালাহ যেহেতু কাফালাহ বিন নাফস -এর উপর নির্ভরশীল তাই কাফালাহ বিল মালও শুদ্ধ হয়নি। তবে দাবির সাথে যদি বাদী একশ' দিনারের গুণ বলে দেয় তাহলে দাবি শুদ্ধ হবে এবং দাবি শুদ্ধ হলে কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হবে। আর কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হলে তার উপর নির্ভরশীল কাফালাহ বিল মালও শুদ্ধ হবে।

وَلَهُمَا اَنَّ الْمَالَ ذَكَرَ مُعَرَّفًا فَيَنْصَرِفُ اِلَى مَا عَلَيْهِ، وَالْعَادَةُ جَرَتْ بِاِجْمَالٍ فِى الدَّعَاوِىْ، فَتَصِحُّ الدَّعَاوِىْ عَلَى اِعْتِبَارِ الْبَيَانِ، فَاِذَا بَيَّنَ اِلْتَحَقَ الْبَيَانُ بِاَصْلِ الدَّعْوٰى، فَتَبَيَّنَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ الْاُوْلٰى، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ ـ

অনুবাদ : শায়খাইন [ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)] -এর দলিল হলো, কাফীল একশ' দিনার মালকে [আলিফ-লাম -এর মাধ্যমে] নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করেছে। সুতরাং এটা ঐ মালের অভিমুখী হবে যা মাকফূল আনহুর জিম্মায় রয়েছে। আর দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন একটি প্রচলিত বিষয়। সুতরাং পরবর্তী বর্ণনার উপর নির্ভরশীল হিসেবে দাবি শুদ্ধ হবে। অতএব, পরবর্তীতে যখন সে বিবরণ প্রদান করবে, এ বিবরণটি মূল দাবির সাথে সংযুক্ত হবে। সুতরাং প্রথম কাফালাহ [কাফালাহ বিন নাফস] -এর শুদ্ধতা প্রমাণিত হলো। তাই তার উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় কাফালাহ [কাফালাহ বিল মাল] শুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُمَا اَنَّ الْمَالَ ذَكَرَ مُعَرَّفًا فَيَنْصَرِفُ الخ :

শায়খাইন [ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)]-এর প্রথম দলিল : এ দলিলটি শায়খাইন (র.)-এর মতের পক্ষে দলিলও এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রথম দলিলের জবাবও। গ্রন্থকার (র.) বলেন, কাফীল যে একশ' দিনারের জিম্মা গ্রহণ করেছে তা বিবাদীর কাছে বাদীর প্রাপ্য একশ দিনারই। কেননা, কাফীল একশ' দিনারের উল্লেখ (فَعَلَيَّ الْمِائَةُ) আলিফ-লাম মাধ্যমে নির্ধারিত আকারে (مُعَرَّفًا بِاللَّامِ) উল্লেখ করেছে। সুতরাং এটা ঐ একশ' দিনারকেই বুঝায়, যা বিবাদীর কাছে বাদীর প্রাপ্য। অতএব, ঘুষের কোনো সম্ভাবনা নেই। যখন অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই তখন কাফালাহ -এর ভিত্তিতে কাফীলের উপর এ একশ দিনার আবশ্যক হবে এবং কাফালাহ বিল মাল শুদ্ধ হবে।

শায়খাইন (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দ্বিতীয় দলিলের জবাবও বটে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, দাবির সাথে একশ' দিনারের গুণ বর্ণনা না করায় দাবির শুদ্ধতায় সমস্যা হয়নি; বরং বাদীর একশ' দিনার প্রাপ্তির দাবী শুদ্ধ হয়েছে। কেননা ঝামেলা এড়াতে কাজীর মজলিস ছাড়া অন্যত্র দাবির ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাজে প্রচলিত আছে। কাজির মজলিসে যখন প্রয়োজন হয় কিংবা কাজি জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন দাবির সব দিক খুলে বর্ণনা করা হয় এবং এ বর্ণনাকে মূল দাবির সংযুক্তি বা পরিপূরক ধরা হয়। আলোচ্য মাসআলায়ও পরে একশ' দিনারের গুণ বর্ননা করা হবে এ বিবেচনায় দাবি শুদ্ধ হয়ে গেছে। পরে যখন গুণ বর্ণনা করা হলো, তা মূল দাবির সাথে সংযুক্ত হলো এবং দাবি পূর্ণতা পেল। দাবি যখন শুদ্ধ হলো তখন কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হয়েছে। আর কাফালাহ বিন নাফস শুদ্ধ হওয়ায় তার উপর নির্ভরশীল কাফালাহ বিল মালও শুদ্ধ হয়েছে। অতএব, কাফীলের উপর বাদীর পরবর্তীতে বর্ণিত গুণসম্পন্ন একশ' দিনার আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ)، مَعْنَاهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، وَقَالَا : يُجْبَرُ فِىْ حَدِّ الْقَذْفِ، لِاَنَّ فِيْهِ حَقَّ الْعَبْدِ، وَفِىْ الْقِصَاصِ لِاَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ، بِخِلَافِ الْحُدُوْدِ الْخَالِصَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى، وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا كَفَالَةَ فِىْ حَدٍّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِاَنَّ مَبْنَى الْكُلِّ عَلَى الدَّرْءِ، فَلَا يَجِبُ فِيْهَا الْاِسْتِيْثَاقُ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوْقِ، لِاَنَّهَا لَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، فَيَلِيْقُ بِهَا الْاِسْتِيْثَاقُ، كَمَا فِى التَّعْزِيْرِ، وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِهِ يَصِحُّ بِالْاِجْمَاعِ، لِاَنَّهُ اَمْكَنَ تَرْتِيْبُ مُوْجِبِهِ عَلَيْهِ، لِاَنَّ تَسْلِيْمَ النَّفْسِ فِيْهَا وَاجِبٌ فَيُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيْلُ، فَيَتَحَقَّقُ الضَّمُّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হদ ও কিসাসে কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ নেই। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] এর অর্থ হলো, তাঁর মতে বিবাদী অর্থাৎ যার উপর হদ বা কিসাসের দাবি উত্থাপন করা হয় তাকে কাফালাহ বিন নাফসের উপর বাধ্য করা যাবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, হদ্দুল কযফ [ব্যভিচারের অপবাদের হদ]-এর ক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে। কেননা, তাতে বান্দার হক রয়েছে। কিসাসের ক্ষেত্রেও বাধ্য করা যাবে। কেননা, কিসাস সম্পূর্ণ বান্দার হক। কিন্তু যেসব হদ সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর হক সেগুলোর কথা ভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– 'কোনো হদ-এর ক্ষেত্রে কাফালাহ নেই।' এ হাদীসে হদ-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া যেহেতু সকল হদের ভিত্তি রহিতকরণের উপর থাকে, তাই কাফালাহ-এর মাধ্যমে [তাকে] সুদৃঢ় করা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু অন্যান্য হকের কথা ভিন্ন। কেননা, তা সন্দেহসমূহের দ্বারা রহিত হয় না। সুতরাং সেগুলোকে [কাফালাহ -এর মাধ্যমে] সুদৃঢ় করা সঙ্গত হবে। যেরূপ [শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয় এরূপ] শাস্তির ক্ষেত্রে। অবশ্য বিবাদী যদি স্বেচ্ছায় কাফীল পেশ করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা শুদ্ধ হবে। কেননা, কাফালাহ-চুক্তির ফলশ্রুতিকে তার উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। কারণ, এসব ক্ষেত্রে বিবাদীর নিজেকে সোপর্দ করা ওয়াজিব। সুতরাং [কাফালাহ-চুক্তির মাধ্যমে] কাফীলকেও এ বিষয়ে দায়বদ্ধ করা যাবে। এতে [কাফালাহ -এর অর্থ] দায়সংযুক্তিও সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَجُوْزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হদ ও কিসাসে কাফালাহ বিন নাফস জায়েজ নেই। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর এ কথার অর্থ হলো, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হদ বা কিসাসের দাবি উত্থাপন করা হবে, তার কাছে যদি কাফীল বিন নাফস তলব করা হয়, যে কাফীল তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবি প্রমাণের জন্য তাকে কাজির মজলিসে হাজির করবে– আর বিবাদী কাফীল প্রদানে

অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও তাকে কাফীল প্রদানে বাধ্য করা হবে না। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুদূরীর ইবারত হওয়া উচিত ছিল- وَلَا يَجُوزُ إِجْبَارُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فِى الْحُدُودِ الخ ; ইমাম আহমদ (র.) এ মতই পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ মতের পক্ষে একটি রেওয়ায়েত আছে।-[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৫৫১]

قَوْلُهُ وَقَالَا : يُجْبَرُ فِى حَدِّ الْقَذْفِ، لِأَنَّ فِيهِ الخ : সাহেবাইন (র.) বলেন, হদ্দে কযফ [ব্যভিচারের অপবাদের হদ] -এর ক্ষেত্রে বাধ্য করা হবে অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফের দাবি উত্থাপন করা হবে তার কাছে কাফীল বিন নফস তলব করা যাবে। যদি সে কাফীল প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে কাফীল প্রদানে বাধ্য করা যাবে। এটা ইমাম মালেক (র.)-এরও অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ মতের পক্ষে একটি রেওয়ায়েত আছে। -[প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩]

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, হদ্দে কযফ বান্দার হক। যে ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করা হয় সে অপবাদ দূর করার অধিকার রাখে। এটা তার শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার। অবশ্য হদ প্রয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষকে অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত রাখা এবং ফাসাদ ও অন্যায় থেকে দুনিয়াকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তাই তা আল্লাহর হকও বটে। যাহোক, হদ্দে কযফের মাঝে বান্দার হক সুপ্রমাণিত। এ কারণেই তা প্রমাণ ও প্রয়োগ করার জন্য অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির দাবি করা শর্ত। যদি হদ্দে কযফ অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির হক না হতো তাহলে হদ প্রমাণ ও প্রয়োগ করার জন্য তার দাবি করা শর্ত হতো না। দাবি করা শর্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় তা বান্দার হক। আর অনেক সময় অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হদ প্রমাণের জন্য সাক্ষীগণ ও অপবাদ আরোপকারীকে কাজির দরবারে একত্র করতে চায়, কিন্তু অপবাদ আরোপকারী আত্মগোপন করে থাকে। এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপকারীকে কাজির মজলিসে হাজির করার জন্য কাফীল বিন নাফসের প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এবং বাদীর উপর থেকে অপবাদ দূর করার হক প্রতিষ্ঠায় বিবাদীকে কাফীল প্রদানে বাধ্য করা হবে; যেরূপ অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে বিবাদীকে তার পক্ষে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা হয়। -[প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩]

قَوْلُهُ وَفِى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ الخ : সাহেবাইন (র.) বলেন, কিসাসের ক্ষেত্রেও বিবাদীকে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা হবে। এর দলিল হিসেবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, কিসাস সম্পূর্ণ বান্দার হক। এ কারণেই নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ হত্যাকারীকে মাফ করে দেওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করার এখতিয়ার রাখেন। যেহেতু কিসাস সম্পূর্ণ বান্দার হক তাই অপরাপর বান্দার হকের মতো এক্ষেত্রেও বিবাদীকে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা হবে।

পক্ষান্তরে যেসব হদ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হক যেমন- মদ পানের হদ, ব্যভিচারের হদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হদের উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার পক্ষে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা হবে না। যদি বিবাদী অর্থাৎ যার উপর হদ ওয়াজিব সে স্বেচ্ছায় কাফীল বিন নাফস প্রদানে সম্মত হয় তাহলেও তা গ্রহণ করা হবে না; মদ পান বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য সাক্ষী কায়েম হওয়ার পূর্বেও গ্রহণ করা হবে না, পরেও গ্রহণ করা হবে না। পূর্বে গ্রহণ করা হবে না এজন্য যে, শুধুমাত্র দাবির প্রেক্ষিতে বিবাদীর উপর কাজির মজলিসে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়া কারো বিরুদ্ধে মদ পান ও ব্যভিচারের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যখন আসীল (أَصِيْل) তথা বিবাদীর উপর কাজির মজলিসে হাজির হওয়া ওয়াজিব নয় তখন কাফীলের উপর তাকে হাজির করা কিভাবে ওয়াজিব হবে? আর যখন কাফীলের উপর বিবাদীকে হাজির করা ওয়াজিব হয় না, তখন কাফালাহ বিন নাফস কিভাবে জায়েজ হবে?

সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পর কাফালাহ বিন নাফস এজন্য জায়েজ নেই যে, সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের পর বিবাদীকে কয়েদ করা হয়। কয়েদ করার কারণে বিবাদীর নিজেকে আত্মগোপন করে রাখার বা সময়মতো কাজির মজলিসে হাজির না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই তাকে হাজির করার জন্য কাফালাহ বিন নাফসেরও প্রয়োজন থাকে না। কারণ, কাফালাহ বিন নাফসের উদ্দেশ্যই হলো, সময়মতো বিবাদীকে কাজির মজলিসে হাজির করা। আর কয়েদ করায় কাফালাহ ছাড়াই এ উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে। তাই কাফালাহ-এর কোনো প্রয়োজন নেই। যখন প্রয়োজন নেই তখন জায়েজও নেই।

قَوْلُهُ : وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ "কোনো হদের ক্ষেত্রে কাফালাহ নেই।"

এ হাদীসটি বায়হাকী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ .

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হদসমূহের মাঝে পার্থক্য করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো হদেই কাফালাহ নেই; চাই তা আল্লাহর হক হোক কিংবা বান্দার হোক, তা হদ্দে কযফ হোক কিংবা কিসাস হোক।

উল্লেখ্য যে, বায়হাকী ও আল-কামিল গ্রন্থে এ হাদীসটি যে সনদে বর্ণিত হয়েছে তার উপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম কালাম করেছেন। খাস্সাফ (র.) আদাবুল কাজী অধ্যায়ে এ হাদীসটিকে হযরত শুরাইহ (র.)-এর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সদরুশ শাহীদ (র.) হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। –[প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪]

قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ مَبْنَى الْكُلِّ عَلَى الدَّرْءِ، فَلَا يَجِبُ فِيْهَا الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে আকলী দলিল : গ্রন্থকার (র.) বলেন, সকল হদের ব্যাপারেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, (اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ) তা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ সন্দেহ পাওয়া গেলে তা রহিত হয়ে যায়। যা সামান্য সন্দেহে রহিত হয়ে যায়, বুঝা যায় তার নিজের মাঝেই দৃঢ়তা নেই। অতএব কাফালাহ -এর মাধ্যমে তাকে দৃঢ় করা কিভাবে ওয়াজিব হবে? তাই কাফালাহ -এর মাধ্যমে হদ -এর মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে কথা ভিন্ন। যেমন– অর্থসম্পদের হক। কারণ, এগুলো সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না। সুতরাং কাফালাহ -এর মাধ্যমে এগুলোকে দৃঢ় করা সঙ্গত। ইসলামি আদালত কর্তৃক ধার্য করা শাস্তিও (تَعْزِيْر) এ ধরনের একটি হক। যার উপর এ ধরনের শাস্তি ওয়াজিব হবে তাকে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা হবে। কারণ, এটা সম্পূর্ণ বান্দার হক। সন্দেহের কারণে এটা রহিত হয় না; বরং সন্দেহ সত্ত্বেও এটা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং কাফালাহ দ্বারা এটাকে দৃঢ় করা সঙ্গত।

قَوْلُهُ وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِهِ يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الخ : হদ্দে কযফ ও কিসাসে বিবাদীকে কাফীল প্রদানে বাধ্য করা হবে না, এ ব্যাপারে সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকলে একমত যে, বিবাদী যদি স্বেচ্ছায় কাফীল বিন নাফস পেশ করে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা, কাফালাহ চুক্তির ফলশ্রুতি (مُوْجَبٌ) -কে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। বিবাদীর উপর নিজেকে কাজির মজলিসে সোপর্দ করা আবশ্যক (وَاجِبٌ)। কাফীল বিন নাফস নিয়োগ করে বিবাদী এ আবশ্যকতাকে কাফীলের উপরও আরোপ করল অর্থাৎ বিবাদীকে কাজির মজলিসে হাজির করার দায়ভার কাফীলের উপরও বর্তাবে। এতে কাফালাহ -এর অর্থ ضَمُّ الذِّمَّةِ اِلَى الذِّمَّةِ তথা দায়সংযুক্তিও সাব্যস্ত হয়। তাই স্বেচ্ছায় বিবাদী কাফীল বিন নাফস পেশ করলে তা শুদ্ধ হবে।

قَالَ : وَلَا يُحْبَسُ فِيهَا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ اَوْ شَاهِدٌ عَدْلٌ يَعْرِفُهُ الْقَاضِىْ، لِاَنَّ الْحَبْسَ لِلتُّهْمَةِ هٰهُنَا، وَالتُّهْمَةُ تَثْبُتُ بِاَحَدِ شَطْرَىِ الشَّهَادَةِ، اِمَّا الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ، بِخِلَافِ الْحَبْسِ فِىْ بَابِ الْاَمْوَالِ، لِاَنَّهُ اَقْصٰى عُقُوْبَةٍ فِيْهِ، فَلَا تَثْبُتُ اِلَّا بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ، وَ ذُكِرَ فِىْ اَدَبِ الْقَاضِىْ اَنَّ عَلٰى قَوْلِهِمَا لَا يُحْبَسُ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ لِحُصُوْلِ الْاِسْتِيْثَاقِ بِالْكَفَالَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হদের ক্ষেত্রে বিবাদীকে আটক করা যাবে না, যতক্ষণ না দুজন অপরিচিত সাক্ষী সাক্ষ্য দিবে কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী যাকে কাজি চিনেন, সাক্ষ্য দেবে। কেননা, হদের ক্ষেত্রে আটক করা হয় অপরাধের অভিযোগের কারণে। আর অভিযোগ সাব্যস্ত হয় সাক্ষ্য প্রদানের দুঅংশের যে কোনো একটি দ্বারা; হয় সংখ্যা দ্বারা কিংবা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা। কিন্তু অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে আটকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেক্ষেত্রে আটকই সর্বোচ্চ শাস্তি। সুতরাং তা পূর্ণাঙ্গ দলিল-প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। [মাবসূত কিতাবের] আদাবুল কাজী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাহেবাইন (র.)-এর উক্তি অনুযায়ী হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদীকে আটক করা যাবে না। কেননা, কাফালাহ -এর মাধ্যমে [বিবাদীর কাজির মজলিসে উপস্থিতির বিষয়টি] নিশ্চিত করা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا يُحْبَسُ فِيْهَا الخ : فِيْهَا -এর স্থলে কোনো কোনো নুসখায় فِيْهِمَا আছে। فِيْهَا পড়া হলে هَا -এর অর্থ হবে حُدُوْد অর্থাৎ হদের ক্ষেত্রে বিবাদীকে আটক করা হবে না। আর فِيْهِمَا পড়া হলে هُمَا -এর অর্থ হবে حَدَّ الْقَذَفِ وَالْقِصَاصْ অর্থাৎ হদ্দে কযফ ও কিসাসের ক্ষেত্রে বিবাদীকে আটক করা হবে না।

মাসআলার বিবরণ : প্রকাশ থাকে যে, শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিকে 'হদ' বলে। শরিয়ত বিশেষ কিছু অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন– চুরির শাস্তি হাত কাটা, হত্যার শাস্তি কিসাস, মদ পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত ইত্যাদি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সাগীরে লিখেছেন, কারো বিরুদ্ধে কাজির কাছে হদ আবশ্যক হয়, এমন কোনো অভিযোগ দায়ের হলে বিবাদীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটক করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবাদী উক্ত অপরাধ সংঘটিত করেছে মর্মে দুজন অপরিচিত ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَةٌ) বা ফাসেক হওয়া (فِسْقٌ) কোনোটাই প্রমাণিত নয়– সাক্ষ্য দিবে কিংবা এমন একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে– কাজি যার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত। এ দু সুরত ছাড়া কাজি বিবাদীকে আটক করতে পারবে না।

দলিল হলো, এখানে দু'টি বিষয়। ১. অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া। ২. অপরাধের অভিযোগ সাব্যস্ত বা গ্রহণযোগ্য হওয়া। হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে আটক করা হয় অপরাধ (فَسَادٌ) -এর অভিযোগের কারণে। অভিযোগ দূর করা (مِنْ بَابِ الدِّيَانَاتِ) দিয়ানতী বিষয়। আর দিয়ানতী বিষয় সাব্যস্ত হয় পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) -এর একাংশের দ্বারা। পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্যের দুটি অংশ। যথা– ১. সংখ্যা (عَدَدٌ) অর্থাৎ সাক্ষী দুজন হওয়া। ২. ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَةٌ) অর্থাৎ সাক্ষী একজন হলে

ন্যায়পরায়ণ হওয়া। অতএব একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা এমন দুজন ব্যক্তি যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কাজি অবগত নন তারা সাক্ষ্যদান করলে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য বা সাব্যস্ত হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের প্রেক্ষিতে তিনি মদ খাওয়ার অভিযোগে একবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। নেশা কেটে যাওয়ার পর আটককৃত ব্যক্তিকে অপরাধ প্রমাণের জন্য জনসম্মুখে হাজির করেন। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা এমন দুজন ব্যক্তি যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কাজি অবগত নয় তাদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে অভিযোগ সাব্যস্ত হলে কাজি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করবে। হযরত বাহয ইবনে হাকীম তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَبَسَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন। -[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৫৫৫]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَبْسِ فِيْ بَابِ الْاَمْوَالِ، لِاَنَّهُ أَقْصَى الخ : অবশ্য অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কারো বিরুদ্ধে অর্থ-সম্পদ সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ দায়ের হলে কাজি তাকে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা এমন দুজন ব্যক্তি যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কাজি অবগত নয় তাদের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) ছাড়া আটক করতে পারবে না। কেননা, এক্ষেত্রে আটক হলো চূড়ান্ত শাস্তি। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর বিবাদীকে মাল পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং এজন্য একটি সময় বেঁধে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে মাল পরিশোধ করা না হলে তবেই চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে কাজী বিবাদীকে আটক করবে। চূড়ান্ত শাস্তির উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) আবশ্যক। অর্থ-সম্পদ সম্পর্কিত হকের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) হলো দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান। অতএব অর্থ-সম্পদের হকের ক্ষেত্রে বিবাদীকে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা এমন দুজন ব্যক্তির যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কাজি অবগত নয় তাদের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে আটক করা যাবে না। পক্ষান্তরে হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি হলো হাত কাটা, কিসাস, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। চূড়ান্ত শাস্তির উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) আবশ্যক। কিন্তু আটক করা হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে একটি মামুলি ও প্রাথমিক শাস্তি। তা প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণ (شَهَادَةٌ كَامِلَةٌ) জরুরি নয়। তাই পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য-প্রমাণের একাংশ দ্বারা অর্থাৎ একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর দ্বারা বা এমন দু-ব্যক্তি যাদের ন্যায়পরায়ণতা জানা নেই তাদের সাক্ষ্য দ্বারা এটি সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَ ذَكَرَ فِيْ اَدَبِ الْقَاضِيْ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাবসূত কিতাবের আদাবুল কাজী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাহেবাইন [ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)] -এর উক্তি অনুযায়ী হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদীকে আটক করা যাবে না। কারণ, তাঁদের মতে হদ্দে কযফ ও কিসাসের ক্ষেত্রে বিবাদীকে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বাধ্য করা জায়েজ। কাফীল বিন নাফসের মাধ্যমে বিবাদীকে নির্দিষ্ট সময়ে কাজির মজলিসে হাজির করা এবং বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব, তাই বিবাদীকে আটক করার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কাফীল বিন নাফস প্রদানে বিবাদীকে বাধ্য করা জায়েজ নেই, তাই যথাসময়ে বিচারের সম্মুখীন করা এবং বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার জন্য বিবাদীকে কয়েদ করার প্রয়োজন আছে।

قَالَ : وَالرَّهْنُ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَانِ فِى الْخِرَاجِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مُمْكِنُ الْاِسْتِيْفَاءِ فَيُمْكِنُ تَرْتِيْبُ مُوْجَبِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খিরাজ-এর ক্ষেত্রে বন্ধক এবং কাফালাহ জায়েজ। কেননা, খিরাজ একটি ঋণ যা [বান্দার পক্ষ থেকে] দাবিযোগ্য এবং [বন্ধকের মাধ্যমে] উসুলযোগ্য। সুতরাং বন্ধক ও কাফালাহ উভয়টির ক্ষেত্রেই চুক্তির ফলশ্রুতিকে খিরাজের উপর কার্যকর করা সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالرَّهْنُ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَانِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, খিরাজ (خِرَاجٌ) ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিম নাগরিকদের উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্য করা একটি কর। জামে সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খিরাজের ক্ষেত্রে বন্ধক (رَهْن) ও কাফালাহ উভয়টি জায়েজ অর্থাৎ কোনো জিম্মির উপর যদি খিরাজ ওয়াজিব হয় এবং তার পক্ষে থেকে কেউ তার কাফীল হয় কিংবা সে খিরাজের বিনিময়ে কিছু বন্ধক রাখে, তাহলে তা জায়েজ আছে। কাফালাহ জায়েজ এজন্য যে, কাফালাহ বলা হয় ضَمُّ الذِّمَّةِ اِلَى الذِّمَّةِ فِى الْمُطَالَبَةِ দাবির ক্ষেত্রে মাকফূল আনহু (مَكْفُوْل عَنْهُ) এর দায়ের সাথে কাফীলের দায়কে যুক্ত করা। আর খিরাজও একটি দায় (دَيْن)। অন্যান্য দায় (دَيْن) যেরূপ বান্দাদের পক্ষ থেকে পরিশোধের দাবি করা হয়, তেমনি খিরাজও বান্দাদের পক্ষ থেকে পরিশোধের দাবি করা হয় (مُطَالَبٌ بِهِ)। অন্যান্য দায় পরিশোধ করা না হলে যেরূপ দায়গ্রস্ত ব্যক্তির পিছু ছাড়া হয় না তেমনি খিরাজ পরিশোধ করা না হলেও জিম্মির পিছু ছাড়া হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, খিরাজ সাধারণ দায়ের মতো একটি দায় যা বান্দাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। আর যে দায় বান্দাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় তার কাফালাহ জায়েজ আছে। অতএব খিরাজের কাফালাহও জায়েজ হবে।

আর বন্ধক জায়েজ এজন্য যে, বন্ধক দায় বা ঋণ উসুলের একটি মোক্ষম হাতিয়ার। অর্থাৎ ঋণ দানের বিপরীতে যদি কিছু বন্ধক রাখা হয়, তাহলে ঋণ উসুলের সম্ভাবনা ও আশা-ভরসা থাকে। এমনিভাবে খিরাজের বিপরীতে যদি কিছু বন্ধক রাখা হয়, তাহলে খিরাজ উসূল করাও সম্ভব (مُمْكِنُ الْاِسْتِيْفَاءِ) তাই দায় বা ঋণের সুরতে বন্ধক রাখা যেরূপ জায়েজ তেমনি খিরাজের সুরতেও বন্ধক রাখা জায়েজ হবে।

মোটকথা, দায় বা ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক ও কাফালাহ-চুক্তি যে ফায়দা ও ফলাফল দেয়, খিরাজের ক্ষেত্রেও এ উভয় চুক্তি সে ফলাফল দিতে পারে। তাই খিরাজের ক্ষেত্রেও এ উভয় চুক্তি জায়েজ হবে।

قَالَ : وَمَنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ كَفِيْلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفِيْلًا اٰخَرَ فَهُمَا كَفِيْلَانِ، لِاَنَّ مُوْجِبَهُ اِلْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، وَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْمَقْصُوْدُ التَّوَثُّقُ، وَبِالثَّانِيَةِ يَزْدَادُ التَّوَثُّقُ فَلَا يَتَنَافِيَانِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে তার দেহসত্তার একজন কাফীল গ্রহণ করে, এরপর [সেখান থেকে উঠে] গিয়ে তার থেকে আরেকজন কাফীল গ্রহণ করে, তাহলে এ উভয়েই কাফীল হবে। কেননা, কাফালাহ-চুক্তির ফলশ্রুতি হলো দাবিকে নিজের উপর আবশ্যক করা। [একাধিক কাফীল হলে] দাবি একাধিক হলো। আর [কাফালাহ-চুক্তির] উদ্দেশ্য হলো, [কাজির মজলিসে বিবাদীর যথাসময়ে উপস্থিতি] নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কাফালাহ-চুক্তির মাধ্যমে তা আরো দৃঢ় হলো। সুতরাং দুটোয় কোনো বৈপরীত্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একসাথে কিংবা একের পর এক একাধিক ব্যক্তির কাফীল হওয়া জায়েজ আছে কিনা? ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীরের উপরিউক্ত ইবারত থেকে প্রমাণিত হয় জায়েজ আছে। তিনি বলেন, বাদী বিবাদীর পক্ষ থেকে একজন কাফীল বিন নাফস গ্রহণ করার পর যদি দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তিকে কাফীল গ্রহণ করে, তাহলে উভয় ব্যক্তিই বিবাদী তথা মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে কাফীল হবে। এমনকি একজন যদি মাকফূল আনহুকে কাজির মজলিসে হাজির করে, তাহলে অপরজন কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না। উদাহরণত ফরীদ মাকফূল লাহু এবং খলিল মাকফূল আনহু। ফরীদ খলিল থেকে হাফিজকে কাফীল গ্রহণ করল অর্থাৎ হাফীজ দায়গ্রস্ত খলিলকে কাজির মজলিসে হাজির করার জিম্মা নিল। এরপর ফরীদ খলিল থেকে শামিলকেও কাফীল গ্রহণ করল। অর্থাৎ তাকে ও খলিলকে কাজির মজলিসে হাজির করার জিম্মাদার বানাল। এটা জায়েজ আছে এবং হাফীজ ও শামিল উভয়ে মাকফূল আনহু অর্থাৎ খলিলকে কাজির মজলিসে হাজির করার কাফীল হবে। একজনের হাজির করার দ্বারা অপরজন কাফালাহ থেকে মুক্ত হবে না।

দলিল হলো, কাফালাহ-চুক্তির ফলাফল (مُوْجِبٌ) হলো, কাফীল মাকফূল বিহীকে কাজির মজলিসে হাজির করার মাকফূল লাহুর দাবিকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। একাধিক ব্যক্তি কফীল হলে একাধিক ব্যক্তি নিজের উপর মাকফূল লাহুর দাবিকে আবশ্যক করে নিল। এতে কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া কাফালাহ-এর উদ্দেশ্য হলো, কাজির মজলিসে মাকফূল বিহীর যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কাফালাহ-চুক্তির দ্বারা তা আরো দৃঢ় হলো। সুতরাং আলাদাভাবে দুজনের এক ব্যক্তির কাফীল হওয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই। যখন বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ নেই, তখন উভয় কাফালাহ জায়েজ হতে বাধা নেই।

وَاَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ، مَعْلُوْمًا كَانَ الْمَكْفُوْلُ بِهٖ اَوْ مَجْهُوْلًا، اِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيْحًا، مِثْلَ اَنْ يَقُوْلَ تَكَفَّلْتُ عَنْهُ بِاَلْفٍ اَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ اَوْ بِمَا يُدْرِكُكَ فِىْ هٰذَا الْبَيْعِ، لِاَنَّ مَبْنَى الْكَفَالَةِ عَلَى التَّوَسُّعِ، فَيَحْتَمِلُ فِيْهَا الْجَهَالَةَ، وَعَلَى الْكَفَالَةِ بِالدَّرْكِ اِجْمَاعٌ، وَكَفٰى بِهٖ حُجَّةً، وَصَارَ كَمَا اِذَا كَفَلَ بِشَجَّةٍ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ، وَاِنِ احْتَمَلَتِ السِّرَايَةَ وَالْاِقْتِصَارَ، وَشُرِطَ اَنْ يَكُوْنَ دَيْنًا صَحِيْحًا، وَمُرَادُهٗ اَنْ لَا يَكُوْنَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ، وَسَيَأْتِيْكَ فِىْ مَوْضِعِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

অনুবাদ : কাফালাহ বিল মাল জায়েজ; মাকফুল বিহীর পরিমাণ জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত হোক; যদি মাকফূল বিহী বিশুদ্ধ ঋণ হয়। যেমন– কেউ বলল, আমি তার [মাকফূল আনহুর] পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের কাফীল হলাম কিংবা [মাকফূল লাহুকে বলল,] তুমি তার কাছে যা পাও কিংবা এ ক্রয়-বিক্রয়ে তোমার যা প্রাপ্য হয় [আমি তার কাফীল হলাম]। কেননা, কাফালাহ-চুক্তির ভিত্তি হলো উদারতার উপর। সুতরাং তাতে [মাকফূল বিহীর পরিমাণের] অজ্ঞতা সহনীয়। তাছাড়া 'কাফালাহ বিদ দারক' [কারো পক্ষ থেকে কোনো ঝুঁকির দায় গ্রহণ করা, উদাহরণত কেউ বলল, পণ্যের মাঝে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমি বিক্রেতা থেকে মূল্য উসুলের জামিন হলাম] এর [বৈধতা সম্পর্কে] ইজমা রয়েছে। আর প্রমাণরূপে এটাই যথেষ্ট। আর বিষয়টি মাথায় আঘাতের কাফালাহ গ্রহণ করার মতো হলো। [এক্ষেত্রে] কাফালাহ শুদ্ধ। অথচ আঘাত সংক্রমিত [হয়ে প্রাণঘাতি] হওয়া কিংবা সীমিত থাকা উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। [কাফালাহ বিল মাল জায়েজ হওয়ার জন্য] শর্ত হলো, মাকফূল বিহী বিশুদ্ধ ঋণ হওয়া। এর উদ্দেশ্য হলো, মাকফূল বিহী যেন কিতাবত-চুক্তির বিনিময় না হয়। ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে এ আলোচনা আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الخ : গ্রন্থকার (র.) কাফালাহ অধ্যায়ের শুরুতে কাফালাহকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. কাফালাহ বিন নাফস (كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ) ২. কাফালাহ বিল মাল (كَفَالَةٌ بِالْمَالِ)। কাফালাহ বিন নাফসের আহকামসমূহ আলোচনার পর উপরিউক্ত ইবারত থেকে তিনি কাফালাহ বিল মালের আলোচনা শুরু করেছেন।

কাফালাহ বিল মাল মানে মালের জামিনদারি গ্রহণ করা। এর স্বরূপ হলো, রাশেদ যায়েদ থেকে একশ' টাকা পাবে। ওমর যায়েদের পক্ষ থেকে রাশেদের জন্য ঐ একশ' টাকার এ মর্মে জামিন হলো যে, যায়েদ একশ' টাকা পরিশোধ না করলে তার দায়-দায়িত্ব আমার; আমি তা পরিশোধ করব। এ উদাহরণে রাশেদ মাকফূল লাহু, যায়েদ মাকফূল আনহু, ওমর কাফীল এবং একশ' টাকা মাকফূল বিহী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ বিল মাল জায়েজ আছে। মাকফূল বিহির পরিমাণ জ্ঞাত (مَعْلُوْم) হোক বা অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হোক। তবে শর্ত হলো বিশুদ্ধ দায় (دَيْنٌ صَحِيْحٌ) হতে হবে। বিশুদ্ধ দায় মানে মাকফূল বিহী কিতাবত-চুক্তির বিনিময় (بَدَلُ كِتَابَةٍ) না হওয়া। ইমাম মালেক ইবনে আনাস ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতই পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মত এটিই ছিল। তাঁর সর্বশেষ মত হলো, যদি মাকফূল বিহী অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হয় তাহলে কাফালাহ জায়েজ নেই।

মাকফূল বিহি জ্ঞাত (مَعْلُوْم) হওয়ার সুরত হলো, কাফীল বলল, تَكَفَّلْتُ عَنْ رَاشِدٍ لِحَامِدٍ بِالْأَلْفِ [আমি রাশেদের পক্ষ থেকে হামিদের জন্য এক হাজার টাকার কাফীল হলাম]। এ উদাহরণে মাকফূল বিহী জ্ঞাত জিনিস; এক হাজার টাকা। মাকফূল বিহী অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হওয়ার সুরত হলো, কাফীল মাকফূল লাহুকে বলল, تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَىٰ رَاشِدٍ তুমি রাশেদের কাছে যা পাবে আমি তার কাফীল হলাম। কিংবা কাফীল ক্রেতাকে বলল, تَكَفَّلْتُ بِمَا يُدْرِكُكَ فِيْ هٰذَا الْبَيْعِ [তুমি দ্রব্যটি কিনে নাও, তোমার জিম্মায় মূল্য যা আসে আমি তার কাফীল হলাম]। এ উদাহরণে বিক্রেতা মাকফূল লাহু, ক্রেতা মাকফূল আনহু, দ্রব্যমূল্য মাকফূল বিহী। কেউ কেউ تَكَفَّلْتُ بِمَا يُدْرِكُكَ فِيْ هٰذَا الْبَيْعِ -এর এই অর্থ বলেছেন যে, ক্রেতা বিক্রীত পণ্য অন্য কারো মালিকানাধীন কিনা এ বিষয়ে সংশয়ে আছে। ভাবছে ক্রয়ের পর পণ্যের অন্য কোনো মালিক প্রকাশ পেলে তার টাকা আবার মার যায় কিনা। তখন তাকে কাফীল এই বলে আশ্বস্ত করছে যে, তুমি দ্রব্যটি কিনে নাও। দ্রব্যে কোনো সমস্যা দেখা গেলে আমি মূল্য ফেরতের কাফীল হলাম। এ অর্থ হিসেবে ক্রেতা মাকফূল লাহু, বিক্রেতা মাকফূল আনহু, বিক্রয়মূল্য মাকফূল বিহী। শেষোক্ত দু উদাহরণের মাঝে কাফালাহ-চুক্তির সময় মাকফূল বিহী অজ্ঞাত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সর্বশেষ মত অনুযায়ী মাকফূল বিহী অজ্ঞাত হলে কাফালাহ বিল মাল জায়েজ নেই। তিনি মাকফূল বিহীকে দ্রব্যমূল্য (ثَمَنْ) -এর উপর কিয়াস করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যমূল্য (ثَمَنْ) অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) থাকলে যেরূপ বিক্রয় চুক্তি জায়েজ নেই তেমনি মাকফূল বিহী অজ্ঞাত হলে কাফালাহ জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল :

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ -যে ব্যক্তি [হারানো] পানপাত্র এনে দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার কাফীল। –[সূরা ইউসুফ : আয়াত– ৭২]

এ আয়াতে মাকফূল বিহী হলো حِمْلُ بَعِيْرٍ তথা উষ্ট্র বোঝাই মাল; কিন্তু তার পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُوْل)। কেননা, উটের তারতম্যের কারণে উষ্ট্র বোঝাই মালের পরিমাণে তারতম্য হয়। যদি উট ছোট কিংবা দুর্বল ও কৃশকায় হয়, তাহলে তার পিঠে বোঝাই করা মালের পরিমাণ কম হবে। যদি উট বড় এবং শক্তিশালী হয়, তাহলে তার পিঠে বোঝাই করা মালের পরিমাণ বেশি হবে। অতএব মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত হলে কাফালাহ-চুক্তি জায়েজ এ আয়াত তা-ই প্রমাণ করে। আয়াতের বিষয়বস্তু ও বিধান যদিও ইসলামের পূর্ববর্তী শরিয়ত সম্পর্কিত, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কুরআন যদি ইসলামের পূর্ববর্তী শরিয়তের আহকামসমূহ বর্ণনা করার পর তা সম্পর্কে নিষিদ্ধতা আরোপ (نَكِيْر) না করে, তাহলে সে আহকাম আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

২. আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ - জামিনদার [কাফীল] দায়বদ্ধ হবে। এ হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফ ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, তাবারানী প্রভৃতি গ্রন্থে হাদীসটি আরেকটু বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মুতলাক (مُطْلَقْ) তথা মাকফূল বিহীর পরিমাণ সম্পর্কে কয়েদমুক্ত। মাকফূল বিহীর পরিমাণ জ্ঞাত হলে কাফালাহ জায়েজ হবে, অজ্ঞাত হলে জায়েজ হবে না; এ ধরনের কোনো কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। তাই প্রমাণিত হয় উভয় সুরতেই কাফালাহ জায়েজ।

৩. **আকলি দলিল :** لِاَنَّ مَبْنَى الْكَفَالَةِ عَلَى التَّوَسُّعِ فَيَحْتَمِلُ فِيْهَا الْجَهَالَةَ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, কাফালাহ-এর ভিত্তি উদারতার উপর। কেননা, কাফীলের উপর কাফালাহ গ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কাফীল মাকফূল আনহু ও মাকফূল লাহু উভয়ের উপকারার্থে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর যে জিনিসের ভিত্তি উদারতার উপর তাতে কিছুটা অজ্ঞতা সহনীয়। তাই কাফালাহ-চুক্তিও মাকফূল বিহীর পরিমাণ সম্পর্কিত সামান্য অজ্ঞতা সয়ে নেবে।

৪. كَفَالَةُ بِالدَّرْكِ وَعَلَى الْكَفَالَةِ بِالدَّرْكِ إِجْمَاعٌ، وَكَفٰى بِهٖ حُجَّةً : চতুর্থ দলিল হলো, কাফালাহ বিদ দারক (كَفَالَةُ بِالدَّرْكِ) জায়েজ হওয়া সম্পর্কে ইজমা আছে। অথচ এতে মাকফূল বিহীর পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। 'কাফালাহ বিদ দারক' হলো, কাফীল ক্রেতাকে বলবে, তুমি দ্রব্যটি কিনে নাও। পরে যদি দ্রব্যের কোনো সমস্যা দেখা দেয় কিংবা এ দ্রব্য অন্য কারো মালিকানাধীন বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি বিক্রেতার পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য (ثَمَنٌ) ফেরতের কাফীল হলাম। এ চুক্তিতে মাকফূল বিহী হলো দ্রব্যমূল্য (ثَمَنٌ)। এর পরিমাণ সম্পর্কে কয়েক ধরনের অজ্ঞতা (جَهَالَةٌ) আছে। প্রথমত কাফালাহ-ই অজ্ঞাত। কারণ, অন্য কেউ দ্রব্যটির মালিক প্রমাণিত হলে কাফীল হবে, তা না হলে নয়। অন্য কেউ দ্রব্যটির মালিক প্রমাণিত হবে কিনা, তাই তো অজ্ঞাত। দ্বিতীয়ত অন্য কেউ যদি মালিক প্রমাণিত হয়– পুরো দ্রব্যটির মালিক প্রমাণিত হবে, নাকি অর্ধেক, নাকি একাংশের মালিক প্রমাণিত হবে, তাও অজ্ঞাত। পুরোটার মালিক প্রমাণিত হলে পূর্ণ দ্রব্যমূল্যের কাফীল হবে, একাংশের মালিক প্রমাণিত হলে একাংশের দ্রব্যমূল্যের কাফীল হবে। এক্ষেত্রে মাকফূল বিহী অজ্ঞাত। মোটকথা, কাফালাহ বিদ দারক-এর মাঝে মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকলের ইজমা আছে। আর ইজমা শরিয়তের একটি দলিল। অতএব কাফালাহ বিদ দারক -এর অজ্ঞতা বেশি থাকা সত্ত্বেও যখন তা জায়েজ, তখন কাফালাহ এর যেসব সুরতে তার চেয়ে কম অজ্ঞতা আছে, তা অবশ্যই জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَفَلَ بِشَجَّةٍ صَحَّتِ الْكَفَالَةُ الخ : মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত থাকলেও কাফালাহ জায়েজ হবে– এর পক্ষে গ্রন্থকার (র.) একটি দৃষ্টান্ত (نَظِيْر) পেশ করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এক ব্যক্তি মাথার জখমের কাফীল হলো। উদাহরণত ভুলক্রমে (خَطَاءً) শরীফ আরীফের মাথায় জখম করল। শাহিদ আরীফকে বলল, এ জখমের কারণে তুমি দিয়ত হিসেবে যে মাল পাবে আমি তার কাফীল হলাম। এখানে মাকফূল বিহী হলো দিয়তের মাল। কিন্তু তার পরিমাণ অজ্ঞাত। কারণ এখানে দুধরনের সম্ভবনা আছে– ১. জখম মারাত্মক আকার ধারণ করবে এবং অবশেষে আরীফ মৃত্যুবরণ করবে। ২. জখম শুকিয়ে আসবে এবং আরীফ সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রথম সুরতে শরীফের উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে জখমের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় ও জরিমানা ওয়াজিব হবে। সুতরাং জখমের কারণে যে মাল ওয়াজিব হবে কাফালাহ গ্রহণকালে তার পরিমাণ অজ্ঞাত ছিল অর্থাৎ মাকফূল বিহী পূর্ণ দিয়তও হতে পারে, জখমের চিকিৎসা ব্যয় ও জরিমানাও হতে পারে; কিন্তু এ অজ্ঞতা সত্ত্বেও এর কাফালাহ জায়েজ। অতএব কাফালাহ-এর অন্যান্য সুরতেও মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হলে কাফালাহ-চুক্তি জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, আমরা ভুলক্রমে (خَطَاءً) জখম করার কথা উল্লেখ করেছি। কারণ, যদি ইচ্ছাকৃত (عَمْدًا) জখম করা হয় এবং তা প্রাণঘাতি হয়, তাহলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা জখম করার সুরতে জখমকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর কিসাসের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফালাহ জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَشَرْطُ أَنْ يَكُوْنَ دَيْنًا صَحِيْحًا الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, কাফালাহ -এর শর্ত হলো, মাকফূল বিহী বিশুদ্ধ ঋণ (دَيْن صَحِيْح) হতে হবে। বিশুদ্ধ ঋণ (دَيْن صَحِيْح) -এর মর্মার্থ হলো তা বদলে কিতাবত (بَدْل كِتَابَتْ) অর্থাৎ কিতাবত-চুক্তির বিনিময় না হওয়া। কারণ, বিশুদ্ধ ঋণ বলা হয় ঐ ঋণকে যা উসুলের জন্য বান্দার পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা হয় এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যা রহিত করতে পারে না। কিন্তু বদলে কিতাবত এমন ঋণ যা ঋণগ্রস্ত গোলাম রহিত করতে পারে। মোটকথা, কাফালাহ বিল মাল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাকফূল বিহী বিশুদ্ধ ঋণ হওয়া। সুতরাং চুক্তিবদ্ধ গোলামের পক্ষে বদলে কিতাবত [চুক্তির অর্থ] পরিশোধের কাফালাহ বৈধ হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে মাকফূল বিহী বদলে কিতাবত; বিশুদ্ধ ঋণ (دَيْن صَحِيْح) নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ মুকাতাব অধ্যায়ে আসবে।

قَالَ : وَالْمَكْفُوْلُ لَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْأَصْلُ، وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيْلَهُ، لِاَنَّ الْكَفَالَةَ ضَمُّ الذِّمَّةِ إِلَى الذِّمَّةِ فِى الْمُطَالَبَةِ، وَ ذٰلِكَ يَقْتَضِىْ قِيَامَ الْاَوَّلِ لَا الْبَرَاءَةَ عَنْهُ، إِلَّا إِذَا شُرِطَ فِيْهِ الْبَرَاءَةُ فَحِيْنَئِذٍ تَنْعَقِدُ حَوَالَةً اِعْتِبَارًا لِلْمَعَانِىْ، كَمَا أَنَّ الْحَوَالَةَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْرَأَ بِهَا الْمُحِيْلُ يَكُوْنُ كَفَالَةً ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাকফূল লাহুর এখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে মূল ঋণ যার জিম্মায় সে তাকে [ঋণ পরিশোধের জন্য] তাগাদা দিবে, ইচ্ছা করলে তার কাফীলকে তাগাদা দিবে। কেননা, তাগাদার ক্ষেত্রে [ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির] জিম্মার সাথে [কাফীলের] জিম্মাকে যুক্ত করাই হলো কাফালাহ। আর তা প্রথম জিম্মার বিদ্যমানতাকে দাবি করে; জিম্মামুক্ত হওয়াকে দাবি করে না। তবে যখন কাফালাহতে প্রথম জিম্মার অর্থাৎ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণমুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্ত করা হয় তখন অর্থের বিবেচনায় কাফালাহ-চুক্তিটি হাওয়ালা চুক্তিরূপে সম্পন্ন হবে যেরূপ হাওয়ালাকারী অর্থাৎ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না এ শর্তে কৃত হাওয়ালা-চুক্তি কাফালাহ-চুক্তি বলে গণ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْمَكْفُوْلُ لَهُ بِالْخِيَارِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ বিল মালে মাকফূল লাহুর এখতিয়ার আছে যে, সে ঋণ পরিশোধের জন্য মাকফূল আনহুকেও তাগাদা দিতে পারে, তার কাফীলকেও তাগাদা দিতে পারে, একসাথে উভয়কেও তাগাদা দিতে পারে। দলিল হলো, তাগাদার ক্ষেত্রে এক জিম্মার সাথে অপর জিম্মাকে যুক্ত করাই হলো কাফালাহ অর্থাৎ কাফালাহ-চুক্তির মাধ্যমে কাফীলের জিম্মা আসীল (أَصِيْل) তথা মাকফূল আনহুর জিম্মার সাথে মিলে যায়। আর এ মিলে যাওয়া আসীলের জিম্মা বাকি থাকার দাবি করে অর্থাৎ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের জিম্মা থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, যদি আসীল জিম্মামুক্ত হয়ে যায়, তাহলে কাফালাহ -এর অর্থ 'সংযুক্তি' (اَلضَّمّ) অর্থাৎ এক জিম্মার সাথে অপর জিম্মার সংযুক্তি পাওয়া যাবে না। আর তা না পাওয়া গেলে কাফালাহই হবে না।

অবশ্য কাফালাহ-চুক্তিতে যদি মাকফূল আনহু তথা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মা মুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্ত করা হয় যেমন মাকফূল আনহু কাফালাহ-চুক্তির সময় বলল, আমি ঋণের জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যাব কিংবা কাফীল এ শর্তের সাথে কাফীল হলো যে, মাকফূল আনহু ঋণের জিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর মাকফূল লাহু তা মেনে নিল, তাহলে আসীল তথা মাকফূল আনহু জিম্মামুক্ত হয়ে যাবে; কিন্তু সেটা মূলে কাফালাহ-চুক্তি হবে না, বরং উদ্দেশ্য ও অর্থের বিবেচনায় হাওয়ালা (اَلْحَوَالَةُ) চুক্তিরূপে সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ নামে কাফালাহ হলেও মূলে তা হাওয়ালা। কারণ হাওয়ালা ও কাফালাহ عُقُوْد [চুক্তি]-এর অন্তর্ভুক্ত। আর عُقُوْد -এর মাঝে উদ্দেশ্য ও অর্থ বিবেচ্য হয়, শব্দ বিবেচ্য হয় না। 'জিম্মামুক্ত হয়ে যাওয়া' হাওয়ালা-চুক্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং জিম্মামুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্তে কাফালাহ-চুক্তি হাওয়ালা-চুক্তিরূপে সম্পন্ন হবে। যেরূপ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জিম্মামুক্ত হবে না এ শর্তে হাওয়ালা-চুক্তি শব্দগত বিচারে হাওয়ালা হলেও মূলে কাফালাহ-চুক্তিরূপে সম্পন্ন হয়। কারণ, জিম্মামুক্ত না হওয়া কাফালাহ -এর উদ্দেশ্য ও অর্থ; হাওয়ালার নয়। যেহেতু عُقُوْد -এর মাঝে উদ্দেশ্য ও অর্থ বিবেচ্য হয়, তাই মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জিম্মামুক্ত হবে না এ শর্তে হাওয়ালা-চুক্তি মূলত কাফালাহ-চুক্তি।

সারকথা হলো, হাওয়ালা (حَوَالَة) ও কাফালাহ -এর মাঝে পার্থক্য হলো, কাফালাহ-এর মাঝে আসীল ও কাফীল উভয়ে জিম্মাদার হয় আর হাওয়ালাতে আসীল জিম্মামুক্ত হয়ে যায়, মুহতাল আলাই (مُحْتَالٌ عَلَيْهِ) জিম্মাদার হয়। তবে কাফালাহ -এর শব্দে হাওয়ালা এবং হাওয়ালার শব্দে কাফালাহ-চুক্তি সম্পন্ন হয়। তাই কাফালাহ-এর মাঝে আসীল জিম্মামুক্ত হয়ে যাবে– এরূপ শর্ত করা হলে তা হাওয়ালা এবং হাওয়ালাতে আসীল জিম্মামুক্ত হবে না– এরূপ শর্ত করা হলে তা কাফালাহ হবে।

وَلَوْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا، لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الضَّمُّ بِخِلَافِ الْمَالِكِ إِذَا اخْتَارَ تَضْمِيْنَ أَحَدِ الْغَاصِبَيْنِ، لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ أَحَدَهُمَا يَتَضَمَّنُ التَّمْلِيْكَ مِنْهُ، فَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْلِيْكُ مِنَ الثَّانِي، أَمَّا الْمُطَالَبَةُ بِالْكَفَالَةِ لَا يَتَضَمَّنُ التَّمْلِيْكَ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

অনুবাদ : যদি মাকফূল লাহু দুজনের কোনো একজনের কাছে তাগাদা করে, তাহলে অপরজনের কাছে তাগাদা করার তার অধিকার আছে। তার এ অধিকারও আছে যে, সে উভয়ের কাছে [একসঙ্গে] তাগাদা করবে। কেননা, কাফালাহ চুক্তির দাবি হলো 'সংযুক্ততা'। পক্ষান্তরে [জবরদখলকৃত বস্তুর] মালিক যদি জবরদখলকারী দুজনের [একজন মালিক থেকে জবরদখলকারী, অপরজন জবরদখলকারী থেকে জবরদখলকারী] কোনো একজন থেকে জরিমানা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, [তাহলে অপরজনের কাছে জরিমানা দাবি করতে পারবে না]। কেননা, তাদের একজন থেকে [জরিমানা গ্রহণের] সিদ্ধান্ত করা মালিকের পক্ষ থেকে [তাকে] মালিকানা প্রদান করাকে শামিল করে। তাই মালিকের জন্য অপরজনকে [সেই বস্তুর] মালিক বানানো সম্ভব হবে না; কিন্তু কাফালাহর ভিত্তিতে তাগাদা করা মালিকানা প্রদানকে শামিল করে না। সুতরাং [দু মাসআলায়] পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ طَالَبَ أَحَدَهُمَا لَهُ الخ : মাসআলা হলো, যদি মাকফূল লাহু, মাকফূল বিহী ও কাফীল এ দুজনের কোনো একজনের কাছে তার ঋণ পরিশোধের তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) করে, তাহলে অপরজনের কাছে তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) করার তার অধিকার আছে। কেননা, তাদের একজনকে তাগাদা করা অপরজনের কাছে তাগাদা করাকে রহিত করে না। মাকফূল লাহুর এ অধিকারও আছে যে, সে উভয়ের কাছে একসঙ্গে তাগাদা করবে। কেননা, কাফালাহ-চুক্তির দাবি হলো তাগাদার ক্ষেত্রে জিম্মার সাথে জিম্মার 'সংযুক্ততা'। আর এটা প্রথম জিম্মা অর্থাৎ মাকফূল আনহুর জিম্মা বিদ্যমান থাকাকে দাবি করে। যখন উভয়ের জিম্মা বিদ্যমান থাকবে তখন মাকফূল লাহু উভয়কেই তাগাদা করতে পারবে।

কিন্তু নিম্নোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। মাসআলাটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তির মাল কেউ জবরদখল (غَصْبٌ) করে এবং ঐ জবরদখলকারী (غَاصِبٌ) থেকে আরেকজন জবরদখল করে, তাহলে মালিকের এখতিয়ার আছে যে, ইচ্ছা করলে সে জবরদখলকৃত বস্তুর (مَغْصُوْبٌ بِهٖ) ক্ষতিপূরণ প্রথম জবরদখলকারী (غَاصِبٌ) থেকে গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় জবরদখলকারী (غَاصِبُ الْغَاصِبِ) থেকে গ্রহণ করতে পারে। যদি প্রথমজন (غَاصِبٌ) থেকে গ্রহণ করে, তাহলে সে দ্বিতীয়জন (غَاصِبُ الْغَاصِبِ) থেকে উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ বা মাল ফেরত নিবে। যদি দ্বিতীয়জন থেকে গ্রহণ করে, তাহলে সে প্রথমজন থেকে কিছু ফেরত পাবে না। মোটকথা, মালিকের দু জবরদখলকারীর যে কোনো একজন থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার অধিকার আছে।

যদি মালিক কাজির বিচারের ভিত্তিতে কিংবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জবরদখলকারী দুজনের কোনো একজন থেকে জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে সে অপর জবরদখলকারীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য একজনকে নির্বাচিত করা মালিকের পক্ষ থেকে তাকে জবরদখলকৃত বস্তুর মালিকানা প্রদান করার নামান্তর। তাই মালিকের জন্য অপরজনকে সেই বস্তুর মালিক বানানো সম্ভব হবে না। কারণ, একই সময়ে একটি বস্তুর পুরোটার পৃথকভাবে দুজনকে মালিক বানানো সম্ভব নয়; কিন্তু কাফালাহর ভিত্তিতে তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) করা মূল ঋণের মালিকানা প্রদানকে শামিল করে না। সুতরাং কাফীলকে তাগাদা করার এ অর্থ নয় যে, মাকফূল লাহু কাফীলকে মূল ঋণের মালিক বানাতে চায়। কারণ, মূল ঋণের মালিকানা তো মাকফূল আনহুর আছে। যে জিম্মাদারি কাফীল গ্রহণ করেছে তার কাছে শুধু তা পূরণের তাগাদা। তাই একজনকে তাগাদা করা অপরজনকে তাগাদা করার প্রতিবন্ধক নয়। অতএব, দু মাসআলায় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল।

قَالَ : وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُّرُوطِ، مِثْلُ اَنْ يَقُولَ : مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَيَّ، وَمَا ذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ، اَوْ مَا غَصَبَكَ فَعَلَيَّ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَاَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَالْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلٰى صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرْكِ، ثُمَّ الْاَصْلُ اَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ لَهَا، مِثْلُ اَنْ يَكُوْنَ شَرْطًا لِوُجُوْبِ الْحَقِّ، كَقَوْلِهِ : إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيْعُ، اَوْ لِاِمْكَانِ الْاِسْتِيْفَاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ : إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَهُوَ مَكْفُوْلٌ عَنْهُ، اَوْ لِتَعَذُّرِ الْاِسْتِيْفَاءِ، مِثْلُ قَوْلِهِ : إِذَا غَابَ عَنِ الْبَلْدَةِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرُوْطِ فِيْ مَعْنٰى مَا ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহকে বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েজ আছে। যেমন কেউ বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে যা বেচাকেনা করবে তা [-র দায়] আমার উপর, অথবা তার কাছে তুমি যা প্রাপ্য হবে তার দায়ভার আমার উপর, কিংবা অমুক ব্যক্তি তোমার থেকে যা ডাকাতি/ছিনতাই করবে তার দায় আমার উপর। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَاَنَا بِهِ زَعِيمٌ 'যে ব্যক্তি [হারানো] পরিমাপ পাত্র এনে দিবে সে এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাবে; এবং আমি তার কাফীল।' তাছাড়া 'কাফালাহ বিদ দারক' -এর বৈধতা সম্পর্কে ইজমা রয়েছে। আর [শর্তের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে] মূলনীতি হলো, কাফালাহকে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শর্তের সাথে যুক্ত করা বৈধ। উদাহরণত হক ওয়াজিব হওয়ার শর্ত; যেমন [বিক্রয়চুক্তির সময় ক্রেতাকে] কেউ বলল, বিক্রেয়দ্রব্যের যদি কোনো দাবিদার বের হয় [তাহলে মূল্য ফেরত দেওয়ার দায় আমার উপর] কিংবা এমন শর্ত যার দ্বারা হক উসুল করা সম্ভব হয়; যেমন– কেউ বলল, মাকফূল আনহু যায়েদ যদি আগমন করে [তাহলে আমি কাফীল] কিংবা এমন শর্ত যা হক উসুল করাকে অসম্ভব করে; যেমন কেউ বলল, যদি মাকফূল আনহু শহর থেকে গায়েব হয়ে যায় [তাহলে আমি কাফীল]। যেসব শর্ত আলোচ্য মাসআলায় আলোচিত হয়েছে সেগুলো আমাদের উল্লিখিত শর্তসমূহের সমশ্রেণিভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহকে বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত (تَعْلِيقٌ) করা জায়েজ আছে। যেমন কেউ বলল, مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَيَّ 'তুমি অমুক ব্যক্তির সাথে যা বেচাকেনা করবে তার দায় আমার উপর', অথবা وَمَا ذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ 'তার কাছে তুমি যা প্রাপ্য হবে তার দায়ভার আমার উপর' কিংবা اَوْ مَا غَصَبَكَ فَعَلَيَّ 'অমুক ব্যক্তি তোমার থেকে যা ডাকাতি/ ছিনতাই করবে তার দায় আমার উপর'।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, কাফালাহকে শর্তের সাথে যুক্ত করা জায়েজ। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: 'যে ব্যক্তি [হারানো] পানপাত্র এনে দিবে সে এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাবে; এবং আমি তার কাফীল।' এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়–

১. মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত হলেও কাফালাহ-চুক্তি জায়েজ। কেননা, উটের তারতম্যের কারণে উষ্ট্র-বোঝাই করা মালের পরিমাণে তারতম্য হয়। যদি উট ছোট কিংবা দুর্বল ও কৃশকায় হয়, তাহলে তার পিঠে বোঝাই করা মালের পরিমাণ

কম হবে। যদি উট বড় এবং শক্তিশালী হয়, তাহলে তার পিঠে বোঝাই করা মালের পরিমাণ বেশি হবে। অতএব, মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত হলেও কাফালাহ-চুক্তি জায়েজ।

২. কাফালাহকে শর্তের সাথে যুক্ত করা বৈধ। আলোচ্য আয়াতে কাফালাহকে পরিমাপ পাত্র আনার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ পরিমাপ পাত্র উপস্থিত করে, তাহলে আমি কাফীল। আর উপস্থিত না করলে আমি এক উষ্ট্র-বোঝাই মালের কাফীল নই। আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ও বিধান যদিও ইসলাম-পূর্ব শরিয়তের, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কুরআন যদি ইসলাম-পূর্ব শরিয়তের আহকামসমূহ বর্ণনা করার পর তা সম্পর্কে নিষিদ্ধতা আরোপ (تَنْكِير) না করে, তাহলে সে আহকাম আমাদের জন্যও প্রযোজ্য।

قَوْلَهُ وَالْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلٰى صِحَّةِ ضِمَانِ الدَّرْكِ : দ্বিতীয় দলিল হলো, 'কাফালাহ বিদ দারক' -এর বৈধতা সম্পর্কে ইজমা রয়েছে। 'কাফালাহ বিদ দারক' হলো, কাফীল ক্রেতাকে বলবে, তুমি দ্রব্যটি কিনে নাও। পরে যদি দ্রব্যের কোনো সমস্যা দেখা দেয় কিংবা এ দ্রব্য অন্য কারো মালিকানাধীন বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি বিক্রেতার পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য (ثَمَنْ) ফেরতের কাফীল হলাম। এ চুক্তিতে কাফালাহকে সমস্যা দেখা দেওয়া কিংবা দ্রব্যে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلَهُ ثُمَّ الْاَصْلُ اَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيْقُهَا بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ لَهَا الخ : কাফালাহকে শর্তের সাথে যুক্ত (تَعْلِيْق) করা জায়েজ; কিন্তু শর্তের শ্রেণীভেদ রয়েছে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, যেসব শর্ত কাফালাহ-চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তার সাথে কাফালাহকে যুক্ত (تَعْلِيْق) করা জায়েজ। এ ধরনের শর্ত তিন শ্রেণিভুক্ত। যথা–

১. বাদী অর্থাৎ মাকফূল লাহুর হক (حَقْ) বিবাদী অর্থাৎ মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। যেমন– বিক্রয়চুক্তির সময় ক্রেতাকে কেউ বলল, বিক্রেয়দ্রব্যের যদি কোনো দাবিদার বের হয় এবং সে বিক্রেয়দ্রব্য নিয়ে নেয়, তাহলে মূল্য ফেরত দেওয়ার দায় আমার উপর। এ উদাহরণে ক্রেতা মাকফূল লাহু, বিক্রেতা মাকফূল আনহু, দ্রব্যমূল্য (ثَمَنْ) মাকফূল বিহী আর শর্ত হলো দাবিদার বের হওয়া। এ শর্ত বিক্রেতার উপর ক্রেতার হক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য (ثَمَنٌ) ফেরত দেওয়াকে ওয়াজিব করে।

২. এমন শর্ত যার দ্বারা হক উসুল করা সম্ভব হয়; যেমন কেউ বলল, মাকফূল আনহু যায়েদ যদি আগমন করে, তাহলে আমি কাফীল। এ সুরতে শর্ত হলো যায়েদের আগমন। যায়েদের আগমন হলে তার থেকে মাকফূল লাহুর দায় উসুল করে মাকফূল লাহুকে অর্পণ করা সম্ভব। কিংবা কাফীল যায়েদের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ মাকফূল লাহুর দায় পরিশোধ করে দিবে এবং পরে তার থেকে উসুল করে নিবে।

৩. এমন শর্ত যা মাকফূল লাহুর হক উসুল করাকে অসম্ভব করে। যেমন– কেউ মাকফূল লাহুকে বলল, যদি মাকফূল আনহু শহর থেকে গায়েব হয়ে যায় কিংবা সহায়-সম্পদ না রেখে মারা যায়, তাহলে আমি তোমার হক পরিশোধের কাফীল হলাম। উদাহরণত ফরীদ খলীলের কাছে একশ' টাকা পাবে। ফরীদ খলীলের কাছে কাফীল চাইল। ওয়াহিদ এ শর্তে কাফীল হলো যে, এখন তুমি নিজেই খলীলের কাছে তোমার পাওনা পরিশোধের দাবি (مُطَالَبَةْ) কর। হ্যাঁ, যদি খলীল শহর ছেড়ে যায় কিংবা সহায়-সম্পদ না রেখে মারা যায়, তাহলে আমি তোমার একশ' টাকার কাফীল হব। এ শর্তও কাফালাহ-চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আলোচ্য মাসআলার আলোচনায় যেসব শর্ত উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَيَّ اَوْ مَا ذَابَ لَكَ فَعَلَيَّ الخ ইত্যাদি তাও কাফালাহ-চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর যেসব শর্ত কাফালাহ-চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাফালাহ-চুক্তিকে যেহেতু সেসব শর্তের সাথে যুক্ত (تَعْلِيْق) করা জায়েজ, তাই উল্লিখিত শর্তের সাথে কাফালাহকে যুক্ত করাও জায়েজ হবে।

فَأَمَّا لَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ، كَقَوْلِهِ : إِنْ هَبَّتِ الرِّيْحُ اَوْ جَاءَ الْمَطَرُ، وَكَذَا إِذَا جَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَجَلًا، إِلَّا اَنَّهُ يَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا، لِاَنَّ الْكَفَالَةَ لَمَّا صَحَّ تَعْلِيْقُهَا بِالشَّرْطِ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ . فَإِنْ قَالَ : تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيْلُ، لِاَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً فَيَتَحَقَّقُ مَا عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِهِ، وَاِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيْلِ مَعَ يَمِيْنِهِ فِىْ مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ، لِاَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُوْلُ عَنْهُ بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلٰى كَفِيْلِهِ، لِاَنَّهُ اِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَيُصَدَّقُ فِىْ حَقِّ نَفْسِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهَا .

অনুবাদ : তবে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন শর্তের সাথে [কাফালাহকে] যুক্ত করা বৈধ নয়। যেমন– কেউ বলল, যখন বায়ু প্রবাহিত হবে কিংবা যখন বৃষ্টি আসে [তখন আমি কাফীল হব]। তদ্রূপ এ দুটির কোনো একটিকে কাফালাহ -এর মেয়াদরূপে উল্লেখ করলেও তা শুদ্ধ হবে না। তবে কাফালাহ শুদ্ধ হবে এবং মাল নগদ আবশ্যক হবে। কেননা, কাফালাহকে যখন শর্তের সাথে যুক্ত করা বৈধ তখন ফাসিদ শর্তের কারণে তা ফাসিদ হবে না; যেমন তালাক ও দাসমুক্তি ফাসিদ হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি [অপর কোনো ব্যক্তিকে] বলে যে, তুমি মাকফুল আনহুর কাছে যা পাবে আমি তার কাফীল হলাম, অতঃপর মাকফুল আনহুর কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে মর্মে সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়, তাহলে কাফীল ঐ এক হাজার দিরহামের জামিন হবে। কেননা, সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের মতো। সুতরাং [সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে] কাফীলের জিম্মায় যা সাব্যস্ত হবে তার জামিন হওয়া শুদ্ধ হবে। আর যদি সাক্ষ্য উপস্থাপিত না হয় [এবং মাকফুল আনহুর কাছে পাওনা মাল বা অর্থের পরিমাণ নিয়ে কাফীল ও মাকফুর লাহুর মাঝে মতানৈক্য হয়] তাহলে কাফীল যে পরিমাণের কথা স্বীকার করবে সে বিষয়ে কসমের সঙ্গে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে। [আর নিয়ম হলো অতিরিক্ত পরিমাণ অস্বীকারকারীর কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়।] আর যদি মাকফুল আনহু তার চেয়ে বেশি পরিমাণের কথা স্বীকার করে, তাহলে তা তার কাফীলের বিপক্ষে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এটি অন্যের বিরুদ্ধে একটি স্বীকারোক্তি; আর অন্যের উপর [কোনো জিনিস আরোপ করার] অধিকার তার নেই। তবে তার নিজের ব্যাপারে তা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কারণ, তার নিজের উপর [কোনো কিছু আরোপ করার] তার অধিকার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَأَمَّا لَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ الخ : তবে যেসব শর্ত কাফালাহ-চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন শর্তের সাথে কাফালাহকে যুক্ত করা বৈধ নয়। যেমন– কেউ বলল, যখন ঘূর্ণিঝড় আসবে কিংবা যখন বৃষ্টি আসবে তখন আমি কাফীল হব। তদ্রূপ এ দুটির কোনো একটিকে কাফালাহ-এর মেয়াদস্বরূপ উল্লেখ করলেও তা শুদ্ধ হবে না। উদাহরণত কেউ বলল, আমি ঘূর্ণিঝড় বা তুফান আসা পর্যন্ত একশ' টাকার কাফীল হলাম; এরপর কাফীল থাকব না– তাহলে এ মেয়াদ বাতিল হয়ে

যাবে, তবে কাফালাহ শুদ্ধ হবে এবং একশ' টাকার কাফালাহ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক হবে। এর দলিল হিসেবে গ্রন্থকার (র.) যে কথা বলেছেন অর্থাৎ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَمَّا صَحَّ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الخ তাতে একটু জটিলতা আছে। তার বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, কাফালাহকে যখন প্রচলিত ও নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে যুক্ত করা বৈধ তখন ফাসিদ তথা অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) মেয়াদের সাথে যুক্ত করার কারণে কাফালাহ ফাসিদ হবে না; বরং স্বয়ং মেয়াদটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– তালাক ও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে যদি কোনো অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) মেয়াদ উল্লেখ করে, যেমন– কেউ বলল, যেদিন হাজী সাহেব আসবে সেদিন আমার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে অথবা বলল, আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে তাহলে এ মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে– এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রী তালাক বা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ : تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ الخ : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি মাকফূল আনহুর কাছে যা পাবে আমি তার কাফীল হলাম। এ কাফালহ-চুক্তিতে মাকফূল বিহী অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হওয়া সত্ত্বেও কাফালাহ শুদ্ধ হবে। পূর্বে আলোচনা গেছে যে, কাফালার মাঝে সামান্য অজ্ঞতা (اَلْجَهَالَةُ الْيَسِيْرَةُ) সহনীয়।

এরপর যদি মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুর কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে মর্মে সাক্ষ্য উপস্থিত করে, তাহলে কাফীল ঐ এক হাজার দিরহামের জামিন হবে। দলিল হলো, সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি চাক্ষুষ প্রমাণিত বিষয়ের মতো। চাক্ষুষভাবে যদি কাফীল দেখে যে, মাকফূল আনহুর কাছে মাকফূল লাহু এক হাজার দিরহাম পাবে, তাহলে যেরূপ সে এক হাজার দিরহামের জামিন হবে– সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি সেরূপ হওয়ায় আলোচ্য সুরতেও কাফীল তেমনি এক হাজার দিরহামের জামিন হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيْلِ الخ : আর যদি মাকফূল আনহুর কাছে কত দিরহাম পাবে এ বিষয়ে মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা না হয় এবং মাকফূল আনহুর কাছে পাওনা মাল বা অর্থের পরিমাণ নিয়ে কাফীল ও মাকফূল লাহুর মাঝে মতানৈক্য হয়, তাহলে কাফীল যে পরিমাণের কথা স্বীকার করবে সে বিষয়ে কসমের সঙ্গে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল হলো, কাফীল অতিরিক্ত পাওনার বিষয়টি (اَلزِّيَادَةُ) অস্বীকার করছে। আর নিয়ম হলো, অতিরিক্ত পরিমাণ অস্বীকারকারীর কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়।

তাছাড়া আলোচ্য সুরতে মাকফূল বিহীর পরিমাণ অজ্ঞাত। কাফীল স্বেচ্ছায় এ পরিমাণ অর্থ বা মাল নিজের উপর আবশ্যক করেছে। আর স্বেচ্ছায় নিজের উপর কেউ মাল আবশ্যক করলে এবং পরিমাণ অজ্ঞাত হলে পরিমাণের ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন– কেউ স্বীকার (اِقْرَار) করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে একশ' দিরহাম পাবে, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও কাফীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُوْلُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ الخ : কাফীল মাকফূল বিহীর যে পরিমাণের স্বীকারোক্তি দিয়েছে, যদি মাকফূল আনহু এর চেয়ে বেশি পরিমাণের কথা স্বীকার করে, তাহলে তা তার কাফীলের বিপক্ষে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। দলিল হলো, মাকফূল বিহীর স্বীকারোক্তির মাঝে দুটি বিষয় আছে। যথা– ১. ঐ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজের উপর কিছু আরোপ করা। ২. কাফীলের উপর কিছু আরোপ করা। যেহেতু নিজের উপর কিছু আরোপ করার অধিকার তার রয়েছে, তাই তার স্বীকারোক্তিকে নিজের বেলায় সত্য বলে গ্রহণ করা হবে এবং এর কারণে অতিরিক্ত পরিমাণটি তার উপর আরোপিত হবে; কিন্তু অন্যের উপর কোনো জিনিস আরোপ করার অধিকার যেহেতু তার নেই, তাই তার স্বীকারোক্তিকে কাফীলের বিপক্ষে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না এবং এর কারণে কাফীলের উপর অতিরিক্ত পরিমাণটি আরোপিত হবে না।

قَالَ : وَتَجُوْزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، وَهُوَ تَصَرُّفٌ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ، وَفِيْهِ نَفْعُ الطَّالِبِ، وَلَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ بِثُبُوْتِ الرُّجُوْعِ، إِذْ هُوَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর নির্দেশক্রমে এবং তার নির্দেশ ছাড়া উভয় সুরতে কাফালাহ বৈধ। কেননা, আমাদের বর্ণিত রেওয়ায়েতটি নিঃশর্ত। তাছাড়া কাফালাহ দায়গ্রহণকে অনিবার্য করার নাম। আর এটা [কাফীলের] নিজ অধিকারের সাথে জড়িত। এতে বাদীর [মাকফূল লাহুর] উপকার রয়েছে এবং [কাফীল কর্তৃক] পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নেওয়া [-র অধিকার] সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিবাদীর [মাকফূল আনহু] কোনো ক্ষতি নেই। কারণ ফেরত নেওয়ার অধিকার তার আদেশ প্রদানের সময়ই সাব্যস্ত হয়েছে এবং এতে সে সম্মত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَجُوْزُ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ মাকফূল আনহুর নির্দেশক্রমে এবং তার নির্দেশ ছাড়া উভয় সুরতে বৈধ। উদাহরণত মাকফূল আনহু কাউকে বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফীল বা জামিনদার হও- এটা জায়েজ আছে। তদ্রূপ মাকফূল আনহুর নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়াই যদি কেউ তার পক্ষে কাফীল হয়, তাহলে তাও জায়েজ। হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারগানী (র.)-এর সমর্থনে দুটি দলিল পেশ করেছেন। যথা– ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ববর্ণিত اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ [জামিনদার দায়বদ্ধ] হাদীসটি মুতলাক তথা নিঃশর্ত। আর মুতলাক তথা নিঃশর্তকে নিঃশর্ত অবস্থায় রাখাই নিয়ম (اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلَى إِطْلَاقِهِ)। তাই তা মাকফূল আনহুর নির্দেশক্রমে কিংবা নির্দেশ ছাড়া (بِأَمْرِ الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ أَمْرِهِ) উভয় প্রকার কাফালাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে প্রমাণিত হয় উভয় প্রকার কাফালাহ বৈধ।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، وَهُوَ تَصَرُّفٌ فِيْ حَقِّ الخ : দ্বিতীয় দলিল হলো, নিজের উপর তাগাদার দায় আরোপকে কাফালাহ বলে। কাফালাহ-চুক্তিতে কাফীল নিজের উপর তাগাদার দায় আরোপ করে। আর তাগাদার দায় আরোপ কাফীলের নিজ অধিকারের সাথে জড়িত। এতে অন্যের কোনো ক্ষতি (ضَرَرٌ) নেই। আর যে দায় আরোপ নিজ অধিকারের সাথে জড়িত তা যদি অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়, তাহলে তা অনিবার্য (لَازِمٌ) হয়। এ মাসআলায় কাফীলের নিজের উপর দায় আরোপ (تَصَرُّفٌ) -এর কারণে মাকফূল আনহু বা মাকফূল লাহুর কোনো ক্ষতি হয় না; বরং এতে মাকফূল লাহুর উপকার (نَفْعٌ) আছে। কারণ, কাফালাহ-চুক্তির পূর্বে মাকফূল লাহু কেবল মাকফূল আনহুকেই তার দায় পরিশোধের তাগাদা দিতে পারত। আর কাফালাহ-চুক্তির কারণে সে কাফীলকেও তাগাদা দেওয়ার অধিকার লাভ করে। এটা স্পষ্টত তার উপকার। মাকফূল আনহুরও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, যদি কাফীল মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে পরিশোধকৃত অর্থ/মাল মাকফূল আনহু থেকে শরিয়তসম্মত কোনো উপায়ে কাফীল ফেরত নিতে পারবে না। যেহেতু মাকফূল আনহুর কিছু দিতে হচ্ছে না, তাই এ সুরতে মাকফূল আনহুর কোনো ক্ষতি নেই। হ্যাঁ, যদি তার আদেশক্রমে কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে যদিও ঋণ পরিশোধের পর কাফীলকে উল্লিখিত ঋণের অর্থ/মাল ফেরত দিতে হবে তথাপি এটা ক্ষতি বলে গণ্য নয়। কারণ, কাফালাহ গ্রহণের আদেশই প্রমাণ করে মাকফূল আনহু এ ক্ষতি বহনে সম্মত আছে। আর যে ক্ষতি বহনে মানুষ সম্মত থাকে তা ক্ষতি বলে গণ্য হয় না।

فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ، وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّيْهِ، لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ، وَقَوْلُهُ رَجَعَ بِمَا أَدَّى مَعْنَاهُ إِذَا أَدَّى مَا ضَمِنَهُ، أَمَّا إِذَا أَدَّى خِلَافَهُ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ، لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الطَّالِبِ، كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْإِرْثِ، وَكَمَا إِذَا مَلَكَهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَوَالَةِ، بِخِلَافِ الْمَأْمُوْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْلِكَ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ الْكَفِيْلُ الطَّالِبَ عَنِ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَبْرَأَ الْكَفِيْلَ.

অনুবাদ : যদি তার আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ/সম্পদ [তার থেকে] ফেরত নিবে। কেননা, কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে তার ঋণ পরিশোধ করেছে। আর যদি মাকফূল আনহুর আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে সে যা পরিশোধ করছে তা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, তা পরিশোধের ক্ষেত্রে কাফীল হলো স্বেচ্ছাদাতা। গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারবে মর্মে ইমাম কুদূরী (র.) যে কথা বলেছেন তার অর্থ হলো, কাফীল যে জিনিসের দায় গ্রহণ করেছে তাই যদি পরিশোধ করে। যদি সে তার বিপরীত কিছু পরিশোধ করে, তাহলেও সে তাই ফেরত নিবে যার দায় সে গ্রহণ করেছে। কেননা, পরিশোধের মাধ্যমে কাফীল নিজেই এখন ঋণের মালিক হয়েছে। সুতরাং তাকে পাওনাদারের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে; যেরূপ গণ্য করা হয় [মাকফূল লাহু কর্তৃক] হেবা বা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে কাফীল মাকফূল বিহীর মালিকানা লাভ করলে। তদ্রূপ হাওয়ালা অধ্যায়ে উল্লিখিত কোনো একটি সূত্রে হাওয়ালার দায় গ্রহণকারী ঋণের মালিক হলে। তবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন অর্থাৎ সে যা পরিশোধ করে তাই ফেরত নিতে পারে। কেননা, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করার মাধ্যমে সে ঋণের মালিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কিছুই আবশ্যক হয় না। তদ্রূপ কাফীল যদি মাকফূল লাহুর সাথে এক হাজারের বিপরীতে পাঁচশ'র উপর সন্ধি করে, তাহলে এ বিষয়টিও ভিন্ন [অর্থাৎ যা সে পরিশোধ করবে তাই ফেরত নিতে পারবে]। কেননা, এটা হলো [ঋণের কিছু অংশ] রহিতকরণ। সুতরাং এটা কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেওয়ার মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ الخ : যদি কাফীল মাকফূল আনহুর নির্দেশে কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে মাকফূল লাহুর তাগাদার কারণে যে মাল সে পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে সে দুটি শর্তে ফেরত নিতে পারবে। যথা– ১. মাকফূল আনহু এমন ব্যক্তি যার কারবার শুদ্ধ হয়। যদি মাকফূল আনহু শিশু হয় বা গোলাম হয়, তাহলে কাফীল পরিশোধকৃত অর্থ/মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে না। ২. কাফালাহ আদেশ সংবলিত মাকফূল আনহুর বাক্যটিতে 'আমার পক্ষ থেকে' (عَنِّيْ) কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে। উদাহরণত মাকফূল আনহু কাফীলকে বলল, اُكْفُلْ عَنِّيْ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফীল হও' কিংবা اِضْمَنْ عَنِّيْ لِفُلَانٍ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে অমুকের জন্য জামিনদার হও'। যদি 'আমার পক্ষ থেকে' উল্লেখ না থাকে, উদাহরণত মাকফূল আনহু কাফীলকে বলল, اُكْفُلْ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ 'তুমি অমুকের জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার কাফীল হও' তাহলে কাফীল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধের পর মাকফূল আনহু থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না। মোটকথা, কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করলে মাকফূল লাহুর তাগাদার কারণে যে মাল সে পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে সে ফেরত নিতে পারবে। এর দলিল হলো, কাফীল অন্য এক ব্যক্তির ঋণ তার নির্দেশে পরিশোধ করেছে। আর অন্য কোনো ব্যক্তির ঋণ তার আদেশক্রমে পরিশোধ করা হলে যেহেতু পরিশোধকারী তার থেকে তা

ফেরত নিতে পারে, তাই কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ/মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে। -[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৫৬৬]

قَوْلُهُ وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّيْهِ : আর যদি কাফীল মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে যা পরিশোধ করবে তা ফেরত নিতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও এটি। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদ (র.)ও এ অভিমত পোষণ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার মতো এ সুরতেও কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ/মাল ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, যখন মাকফূল লাহু কাফীল থেকে তার ঋণ উসুল করেছে তখন যেন সে কাফীলকে তার ঋণমূল্যে প্রাপ্য মালের মালিক বানিয়ে দিয়েছে অথবা মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে তার ঋণ উসূলের জন্য কাফীলকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে। আর এ দু-সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। কারণ, প্রথম সুরতে কাফীল নিজেই মালিক আর দ্বিতীয় সুরতে মালিকের স্থলাভিষিক্ত। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মালিকও তার মাল গ্রহণ করতে পারে এবং তার স্থলাভিষিক্তও গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করলেও মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধকৃত অর্থ/মাল ফেরত নিতে পারবে। -[ফাতহুল কাদীর : খ. ৭, পৃ. ১৭৭]

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ঐ ঋণের মালিক বানানো জায়েজ নেই। অর্থাৎ মাকফূল লাহু কাফীলকে তার ঋণমূলে প্রাপ্য মালের মালিক বানাতে পারবে না। কেননা, এ সুরতে মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে কাফীলকে এমন জিনিসের মালিক বানানো অনিবার্য হবে যা সে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। তাই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তথা মাকফূল আনহু ছাড়া অন্য কাউকে ঋণের মালিক বানানো জায়েজ নেই। যখন কাফীলকে মালিক বানানো জায়েজ নেই তখন কাফীলের জন্য মাকফূল আনহু থেকে ঐ ঋণের তাগাদা করাও জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীলের জন্য মাকফূল আনহুর উপর এভাবে মাল আবশ্যক হয় যেভাবে মাকফূল লাহুর জন্য কাফীলের উপর আবশ্যক হয়। তবে এতটুকু প্যার্থক্য যে, কাফীলের হক তার পরিশোধ করা পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। অর্থাৎ মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের পর কাফীলের তাগাদা করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর এ বিষয়টি যেহেতু মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে আসছে না অর্থাৎ কাফীলের জন্য মাকফূল আনহুর উপর মাল আবশ্যক হয় না, তাই মাকফূল আনহু থেকে কাফীলের মাল তাগাদা করার অধিকারও সাব্যস্ত হয় না। -[ফাতহুল কাদীর : খ. ৭, পৃ. ১৭৮]

قَوْلُهُ رَجَعَ بِمَا اَدّٰى عَلَيْهِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্তি رَجَعَ بِمَا اَدّٰى عَلَيْهِ -এর মর্মার্থ হলো, কাফীল কাফালাহ- চুক্তির মাধ্যমে মাকফূল আনহুর নির্দেশক্রমে যে দায় পরিশোধের জামিন হয়েছিল তাই যদি পরিশোধ করে, তাহলে পরিশোধকৃত মাল/অর্থ মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু যে অর্থ/ মাল পরিশোধের জামিন হয়েছিল তা ভিন্ন অন্য কিছু যদি পরিশোধ করে, তাহলে এ সুরতে কাফীল مَا اَدّٰى অর্থাৎ পরিশোধকৃত অর্থ/মাল ফেরত নিতে পারবে না; বরং مَا ضَمِنَ অর্থাৎ যে মাল পরিশোধের জামিন হয়েছিল তা ফেরত নিতে পারবে। উদাহরণত মাকফূল আনহুর জিম্মায় পাঁচ মন রদ্দি খেজুর ঋণ আছে, কিন্তু কাফীল মাকফূল লাহুকে পাঁচ মন ভালো খেজুর পরিশোধ করল, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে ভালো খেজুর ফেরত নিতে পারবে না; বরং তাকে রদ্দি খেজুরই নিতে হবে। কিংবা মাকফূল আনহুর জিম্মায় পাঁচ মন ভালো খেজুর ঋণ আছে, কিন্তু কাফীল মাকফূল লাহুকে পাঁচ মন রদ্দি খেজুর পরিশোধ করল এবং মাকফূল লাহু তা মেনে নিল। এ সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে ভালো খেজুর ফেরত নিবে। কারণ সে ভালো খেজুর পরিশোধের জামিন হয়েছিল। তদ্রূপ মাকফূল আনহুর জিম্মায় এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা ঋণ আছে। কাফীল মাকফূল লাহুকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধ করল। এ সুরতে কাফীল একশ' স্বর্ণমুদ্রা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে না; বরং এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা ফেরত নিবে। কারণ- সে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা পরিশোধের জামিন হয়েছিল।

এর দলিল হলো, اِنَّ الْكَفِيْلَ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْاَدَاءِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الطَّالِبِ অর্থাৎ 'কাফীল মাকফূল আনহুর ঋণ পরিশোধ করার মাধ্যমে ঐ ঋণের মালিক হয়েছে। যেন সে মাকফূল লাহু থেকে এ মাল ক্রয় করে নিয়েছে।' যখন কাফীল মাকফূল লাহুর মাকফূল ঋণমূলে প্রাপ্য মালের মালিক হলো, তখন কাফীল মাকফূল লাহুর স্থলবর্তী হলো। আর মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে ঐ মালের তাগাদা (مُطَالَبَة) করতে পারে যা মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব। অতএব কাফীলও মাকফূল লাহুর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মাকফূল আনহু থেকে ঐ মালের তাগাদা করতে পারবে যা তার উপর ওয়াজিব ছিল; কাফীল অন্য কিছু পরিশোধ করে থাকলে তার তাগাদা সে করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ : আমাদের দলিল হলো, মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টি মাকফূল আনহুর প্রতি কাফীলের একটি ইহসান ও অনুগ্রহ। আর অনুগ্রহকারী তার অনুগ্রহ ফেরত নেওয়ার শরিয়তসম্মত অধিকার রাখে না। তাই মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে যদি তার ঋণ পরিশোধ করে, তাহলে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْإِرْثِ الخ : কাফীল مَا أَدَّى অর্থাৎ পরিশোধকৃত মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে না; বরং مَا ضَمِنَ অর্থাৎ যে মাল পরিশোধের জামিন হয়েছিল তা ফেরত পাবে– এ বিষয়ে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) তিনটি কিয়াস পেশ করেছেন। যথা–

১. এটা কাফীলের হেবা সূত্রে মাকফূল বিহীর মালিক হওয়ার মতো হলো। অর্থাৎ মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে ঋণমূলে যে মাল পাবে তাই যদি কাফীলকে হেবা করে দেয়, তাহলে কাফীল ঐ মালের মালিক হয় এবং মাকফূল আনহু থেকে তাই উসূল করে, অন্য কোনো জিনিস উসূল করার অধিকার রাখে না। উদাহরণত মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে পাবে একশ' রদ্দি (زُيُوْف) স্বর্ণমুদ্রা। হেবা সূত্রে কাফীল একশ' রদ্দি মুদ্রার মালিক হয় এবং মাকফূল আনহু থেকে একশ' রদ্দি স্বর্ণমুদ্রা উসুল করে; তার ভালো (جِيَادٌ) স্বর্ণমুদ্রা উসুল করার অধিকার থাকে না।

আল্লামা আইনী (র.) এ কিয়াসের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঐ ঋণ হেবা করা যায় না। কারণ, হেবা এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বৈধ যা হেবাকারী হেবাগ্রহিতাকে অর্পণ করতে সক্ষম। অথচ মাকফূল লাহু মাকফূল বিহী কব্জা করার পূর্বে কাফীলকে তা অর্পণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং হেবা সূত্রে কাফীল মাকফূল বিহির মালিক হবে– এ কথা শুদ্ধ নয়।

আল্লামা আইনী (র.) নিজেই আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঐ ঋণ তখনি হেবা করা যায় না যখন হেবাকারী হেবাগ্রহিতাকে এ ঋণ কব্জা করার অনুমতি দেয় না। যদি অনুমতি দেয় তাহলে ইসতিহসান হিসেবে ঐ হেবা শুদ্ধ। –[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৫৬৬]

২. মাকফূল লাহু মৃত্যুবরণ করল এবং কাফীল উত্তরাধিকার সূত্রে মাকফূল বিহীর মালিক হলো। এক্ষেত্রে কাফীল মাকফূল লাহুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে মাকফূল আনহু থেকে তাই উসূল করবে যার সে মালিক হয়েছে। অন্য কিছু উসূল করার অধিকার রাখে না। উদাহরণত মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে এক মন রদ্দি খেজুর পেত, তাহলে কাফীল এক মন রদ্দি খেজুরই পাবে। সে এক মন ভালো খেজুর উসূল করার অধিকার লাভ করবে না।

৩. হাওয়ালার ক্ষেত্রে মুহতাল আলাই (مُحْتَالٌ عَلَيْهِ) মাহীল (مُحِيْل) -এর পক্ষ থেকে মুহতাল লাহু (مُحْتَالٌ لَهُ) -কে যে অর্থ– মাল পরিশোধের জামিন হয় সে মাহীল থেকে তাই ফেরত নিতে পারে; সে অন্য কিছু পরিশোধ করে থাকলেও। উদাহরণত রাশেদ মাহীল বা ঋণগ্রস্ত, খালেদ মুহতাল লাহু বা পাওনাদার, ফরীদ মুহতাল আলাইহি বা জামিনদার আর মুহতাল বিহী বা পাওনা হলো একশ' স্বর্ণমুদ্রা। ফরীদ রাশেদের পক্ষ থেকে খালেদকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধের দায় গ্রহণ করল। কিন্তু সে খালেদকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা না দিয়ে আটশ' রৌপ্যমুদ্রা দিল এবং খালেদ তা মেনে নিল। এ সুরতে দায় (مَا ضَمِنَ) ছিল একশ' মুদ্রা আর ফরীদ পরিশোধ করল (مَا أَدَّى) আটশ' রৌপ্যমুদ্রা। আটশ' রৌপ্যমুদ্রা পরিশোধ করা হলেও ফরীদ রাশেদ থেকে ফেরত পাবে একশ' স্বর্ণমুদ্রা।

মোটকথা, কাফীল হেবা বা উত্তরাধিকার সূত্রে মাকফূল বিহীর মালিক হলে মাকফূল আনহু থেকে এবং হাওয়ালার ক্ষেত্রে মুহতাল আলাইহি পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে পাওনার মালিক হলে মাহীল থেকে যেরূপ مَا ضَمِنَ অর্থাৎ যে মালের জামিন হয়েছিল উক্ত মাল ফেরত নিতে পারে, আলোচ্য মাসআলায়ও কাফীল মাকফূল লাহুর ঋণমূলে প্রাপ্য মালের মালিক হয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মাকফূল আনহু থেকে مَا ضَمِنَ অর্থাৎ দায়গ্রহণকৃত মাল ফেরত নিতে পারবে; مَا أَدَّى অর্থাৎ কাফীল অন্য কিছু পরিশোধ করে থাকলে তার তাগাদা সে করতে পারবে না। সুতরাং মাকফূল বিহী যদি এক মন রদ্দি খেজুর হয়, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে এক মন রদ্দি খেজুর ফেরত নিতে পারবে। সে এক মন ভালো খেজুর পরিশোধ করে থাকলে তা ফেরত পাবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَأْمُوْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মাকফূল আনহু থেকে কাফীল তখনি মাল/অর্থ ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করে যখন কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে ঋণ পরিশোধ করে। এদিক থেকে কাফীল এবং ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

কারণ, ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তিও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নির্দেশে ঋণ পরিশোধ করে এবং মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণকারীও ঋণগ্রস্ত তথা মাকফূল আনহুর নির্দেশে ঋণ পরিশোধ করে। অতএব ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের পর যেরূপ مَا أَدَّى অর্থাৎ পরিশোধকৃত মাল ফেরত নিতে পারে; পরিশোধকৃত মাল ঋণমূলে পাওনা মাল হোক বা অন্য কিছু হোক, তদ্রূপ কাফীলেরও مَا أَدَّى অর্থাৎ পরিশোধকৃত মাল ফেরত নেওয়ার অধিকার হওয়া উচিত; পরিশোধকৃত মাল যাই হোক; مَا ضَمِنَ অর্থাৎ দায়গ্রহণকৃত মাল হোক বা অন্য কিছু হোক। অথচ উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, কাফীল মাকফূল আনহু থেকে مَا ضَمِنَ অর্থাৎ দায়গ্রহণকৃত মাল ফেরত নিতে পারবে, অন্য কিছু পরিশোধ করলে তা ফেরত নিতে পারবে না। -[বিনায়া : খ. ৭. পৃ. ৫৬৭]

গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কিছু ওয়াজিব নয়; বরং সে সানন্দে অনুগ্রহার্থে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করেছে। তাই ঋণ পরিশোধ করার কারণে সে ঋণের মালিক হয়নি। যখন ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তি ঋণের মালিক হয়নি তখন সে পাওনাদারদের স্থলবর্তীও হয়নি। পাওনাদারদের স্থলবর্তী না হওয়ায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব ছিল তা ফেরত নেওয়ার অধিকার সে লাভ করবে না; বরং যা পরিশোধ করেছে তা ফেরত নিতে পারবে। পক্ষান্তরে মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণকারী কাফালাহ- চুক্তির মাধ্যমে নিজের উপর ঋণের মাল পরিশোধ করার বিষয়টি আবশ্যক করে। যখন কাফীলের উপর ঋণের মাল পরিশোধ করা ওয়াজিব, তখন পরিশোধের পর সে ঐ মালের মালিক হবে। ঋণের মালিক হয়ে মাকফূল লাহু তথা পাওনাদারদের স্থলবর্তী হবে। মাকফূল লাহু যেভাবে মাকফূল আনহু থেকে ঐ মালের তাগাদা করার অধিকার রাখে যে মাল মাকফূল আনহুর জিম্মায় ওয়াজিব তেমনি কাফীলও ঋণগ্রস্ত তথা মাকফূল আনহু থেকে ঐ মালের তাগাদা করার অধিকার পাবে যে মাল মাকফূল আনহুর জিম্মায় ওয়াজিব এবং কাফীল যার জামিন হয়েছিল। অন্য কোনো মাল পরিশোধ করে থাকলে তার তাগাদা করার অধিকার পাবে না। মোটকথা, কাফীল এবং ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য আছে। তাই কাফীলকে ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তির উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, গ্রন্থকার (র.)-এর حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى এ বক্তব্যে ভুল হয়েছে। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তি সর্বাবস্থায় بِمَا أَدَّى অর্থাৎ পরিশোধকৃত মাল ফেরত নিতে পারে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং مُؤَدَّى অর্থাৎ পরিশোধকৃত মাল যদি مَأْمُورٌ بِهِ অর্থাৎ আদেশকৃত মালের সমপরিমাণ বা কম হয়, তাহলে مَا أَدَّى তথা পরিশোধকৃত মাল ফেরত নিতে পারে। আর যদি পরিশোধকৃত মাল আদেশকৃত মালের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আদেশকৃত মাল ফেরত নিতে পারে; পরিশোধকৃত মাল ফেরত নিতে পারে না। উদাহরণত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় রদ্দি দিরহাম ঋণ, কিন্তু ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তি ভালো দিরহাম পরিশোধ করল। তাহলে ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তি রদ্দি দিরহাম আদেশদাতা তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে ফেরত নিতে পারবে; ভালো দিরহাম ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, 'ভালো' (جَوْدَةٌ) ঋণের অতিরিক্ত বিষয়। ঋণ পরিশোধে আদিষ্ট ব্যক্তিকে এটা পরিশোধের আদেশ করা হয়নি। সে নিজ থেকে تَبَرُّعًا এটা পরিশোধ করেছে। আর تَبَرُّعًا যা পরিশোধ করা হয় তা ফেরত নিতে পারে না। তাই সে ভালো দিরহাম ফেরত নিতে পারবে না; রদ্দি দিরহাম ফেরত পাবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিদায়ার ইবারত حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى পুরোপুরি শুদ্ধ নয়। -[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৫৬৭]

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَنِ الْأَلْفِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি ঋণের পরিমাণ এক হাজার দিরহাম হয়, কিন্তু কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে পাঁচশ' দিরহামে সন্ধি করে, তাহলে এ সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে مَا أَدَّى অর্থাৎ পাঁচশ' দিরহাম ফেরত নিতে পারবে; مَا ضَمِنَ অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। পাঁচশ দিরহামে সন্ধি করার অর্থ হলো মাকফূল লাহু পাঁচশ' দিরহাম রহিত করে দিয়েছে। আর যা রহিত হয় তা মূল ঋণ থেকে রহিত হয় এবং অংশ ফেরত নেওয়ার অধিকার কাফীলের নেই। অতএব, পাঁচশ দিরহাম থেকে মাকফূল আনহু মুক্ত হয়ে যাবে।

এটা মাকফূল লাহু কর্তৃক কাফীলকে দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া (إِبْرَاءٌ) -এর মতো হলো। যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে সম্পূর্ণ ঋণ থেকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারে না। যদি একাংশ থেকে মুক্ত করে, তাহলে যেটুকু সে পরিশোধ করবে কেবল সেটুকুই মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারে। সন্ধির সুরতেও কাফীল যেটুকু পরিশোধ করবে সেটুকু ফেরত নিতে পারবে।

قَالَ : وَلَيْسَ لِلْكَفِيْلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ يَرْجِعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ، لِأَنَّهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ. قَالَ : فَإِنْ لُوْزِمَ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ حَتّٰى يُخَلِّصَهُ وَكَذَا إِذَا حُبِسَ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ مَا لَحِقَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَيُعَامِلُهُ بِمِثْلِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে মাল পরিশোধ করার পূর্বে তার কাছে কাফীলের মাল দাবি করার অধিকার নেই। কেননা পরিশোধ করার পূর্বে কাফীল মালের মালিক হয় না। কিন্তু ক্রয় সংক্রান্ত উকিলের বিষয়টি ভিন্ন। সে মূল্য পরিশোধের পূর্বেই [মুআক্কিলের কাছে] মূল্য চাইতে পারে। কেননা উকিল ও মুয়াক্কিলের মাঝে একটি আইনগত বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মালের জন্য কাফীলের পিছনে লেগে থাকা হয় তাহলে তারও মাকফূল আনহুর পিছনে লেগে থাকার অধিকার রয়েছে ; যতক্ষণ না সে তাকে দায়মুক্ত করে। তদ্রূপ যদি কাফীলকে কয়েদ করা হয় তাহলে তারও অধিকার রয়েছে মাকফূল আনহুকে কয়েদ করানোর। কেননা কাফীল যা কিছুর সম্মুখীন হয়েছে তা মাকফূল আনহুর কারণেই। সুতরাং সেও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَيْسَ لِلْكَفِيْلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُوْلَ عَنْهُ الخ : মাসআলা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মাকফূল আনহু থেকে কাফীলের মাল দাবি করার অধিকার নেই। দলিল হলো, কাফীল মাকফূল আনহু থেকে পরিশোধকৃত মাল তখনই ফেরত নিতে পারে, যখন পরিশোধের মাধ্যমে কাফীল ঋণের মালিক হয়। পরিশোধের পূর্বে যেহেতু কাফীল ঋণের মালিক হয় না, তাই মাকফূল আনহু থেকে উক্ত মাল দাবি করার সে সঙ্গত অধিকার লাভ করে না। অতএব মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের পূর্বে তার থেকে মাল দাবি করার কাফীলের অধিকার নেই। তবে ক্রয় সংক্রান্ত উকিলের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেউ যদি কাউকে কোনো জিনিস ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে তাহলে উকিলের এ অধিকার আছে যে, সে বিক্রেতাকে দ্রব্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে নিজ মুয়াক্কিল থেকে দ্রব্যমূল্য উসুল করবে। কেননা উকিল ও মুয়াক্কিলের মাঝে একটি আইনগত বিনিময় বা বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হয়। ফলে উকিল বিক্রেতার পর্যায়ে এবং মুয়াক্কিল ক্রেতার পর্যায়ে গণ্য হয়। যেহেতু দ্রব্য হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতা দ্রব্যমূল্য দাবি করার অধিকার রাখে, সেহেতু উকিল নিজ মুয়াক্কিল থেকে দ্রব্যমূল্য দাবি করার অধিকার লাভ করবে; উকিল নিজ বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে থাকুক বা না থাকুক।

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ لُوْزِمَ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ أَنْ يُلَازِمَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মাকফূল লাহু স্বীয় ঋণ উসুল করার জন্য কাফীলের পিছনে লেগে থাকে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মাকফূল আনহু কাফীলকে দায়মুক্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফীলেরও মাকফূল আনহুর পিছনে লেগে থাকার অধিকার রয়েছে। তবে শর্ত হলো, কাফীল মাকফূল আনহুর কাছে উক্ত ঋণ পরিমাণ মাল ঋণগ্রস্ত না হতে হবে। কেননা মাকফূল আনহুই কাফীলকে এ সমস্যায় নিপতিত করেছে। অতএব, সমস্যা থেকে উদ্ধারও মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব হবে।

যদি মাকফূল লাহু নিজ ঋণের কারণে কাফীলকে কয়েদ করায় তাহলে কাফীলেরও মাকফূল আনহুকে কয়েদ করানোর অধিকার রয়েছে; যদি কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে। এটি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এর পক্ষে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, মাকফূল আনহুকে কয়েদ করার অধিকার কাফীলের নেই। দলিল হলো, ঋণ পরিশোধের পূর্বে মাকফূল আনহুর উপর কাফীলের কোনো হক ওয়াজিব হয় না। যখন ঋণ পরিশোধের পূর্বে মাকফূল আনহুর উপর কাফীলের কোনো হক ওয়াজিব হয় না তখন মাকফূল আনহুকে কয়েদ করানোর অধিকারও কাফীল লাভ করবে না।

আমাদের দলিল হলো, কাফীল যে সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা মাকফূল আনহুর কারণেই হয়েছে। তাই কাফীলকে সমস্যামুক্ত করার দায়িত্ব মাকফূল আনহুর উপরই বর্তায়। যদি মাকফূল আনহু কাফীলকে সমস্যা থেকে উদ্ধার না করে অর্থাৎ মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করে না দেয় তাহলে মাকফূল লাহু কাফীলের সাথে যে আচরণ করবে, তদ্রূপ আচরণ মাকফূল আনহুর সাথে করার অধিকার কাফীলও লাভ করবে।

وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ أَوِ اسْتَوْفَى مِنْهُ بَرِئَ الْكَفِيْلُ، لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيْلِ تُوْجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيْلِ، لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيْحِ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيْلَ لَمْ يَبْرَأْ الْأَصِيْلَ عَنْهُ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ عَلَى الْأَصِيْلِ بِدُوْنِهِ جَائِزٌ، وَكَذَا إِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ عَنِ الْأَصِيْلِ فَهُوَ تَأْخِيْرٌ عَنِ الْكَفِيْلِ، وَلَوْ أَخَّرَ عَنِ الْكَفِيْلِ لَمْ يَكُنْ تَأْخِيْرًا عَنِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْأَصْلُ، لِأَنَّ التَّأْخِيْرَ إِبْرَاءٌ مُوَقَّتٌ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَّدِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَفَلَ بِالْمَالِ الْحَالِ مُؤَجَّلًا إِلَى شَهْرٍ، فَإِنَّهُ يَتَأَجَّلُ عَنِ الْأَصِيْلِ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إِلَّا الدَّيْنَ حَالَ وُجُوْدِ الْكَفَالَةِ فَصَارَ الْأَجَلُ دَاخِلًا فِيْهِ، أَمَّا هٰهُنَا فَبِخِلَافِهِ.

অনুবাদ : যদি মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দেয় কিংবা তার কাছ থেকে নিজের হক উসূল করে নেয়, তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা মাকফূল আনহুর দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তিকে অবধারিত করে। কারণ, বিশুদ্ধ মতানুসারে ঋণের দায় মাকফূল আনহুর উপরই। আর যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না। কারণ, কাফীল হচ্ছে তার অনুবর্তী। কেননা কাফীলের উপর শুধু তাগাদার দায় আরোপিত হয়েছে। আর তাগাদার দায় ব্যতিরেকে মাকফূল আনহুর উপর ঋণ বহাল থাকা জায়েজ। তদ্রূপ মাকফূল লাহু যদি মাকফূল আনহুকে 'অবকাশ' দেয় তাহলে তা কাফীলকেও 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি কাফীলকে মাকফূল লাহু 'অবকাশ' দেয় তাহলে তা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে না। কেননা অবকাশ দান করার অর্থ হলো সাময়িকভাবে দায়মুক্ত করা। তাই তাকে স্থায়ী দায়মুক্তির উপর কিয়াস করা হবে। পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মালের যদি এক মাস পর্যন্ত মেয়াদে কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে তা মাকফূল লাহু থেকেও মেয়াদি বলে গণ্য হবে। কেননা কাফালাহ চুক্তি থাকা অবস্থায় [মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত] ঋণ ছাড়া আর কোনো হক মাকফূল লাহুর নেই। কারণ, [মেয়াদকে মূল ঋণের দিকে সম্বন্ধ করায়] মেয়াদের শর্তটি মূল ঋণের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আর উপরিউক্ত মাসআলাটি এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ أَوِ اسْتَوْفَى مِنْهُ الخ : মাসআলা হলো, যদি মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত (إبرا) করে দেয় কিংবা তার কাছ থেকে নিজের হক উসূল করে নেয় তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করা মানে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করা। কারণ, মূল ঋণ মাকফূল আনহুর উপরই। আর মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তি আবশ্যক করে। তাই মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হলে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়মুক্তি কাফীলের দায়মুক্তিকে এজন্য আবশ্যক করে যে, বিশুদ্ধ মতানুসারে ঋণ মাকফূল আনহুর উপর

ওয়াজিব; কাফীলের উপর ওয়াজিব নয়। কাফীলের উপর শুধু তাগাদা ওয়াজিব। অতএব, মাকফূল লাহুর দায়মুক্ত করে দেওয়ার কারণে মাকফূল আনহু থেকে যখন দায় রহিত হয়ে গেল তখন মাকফূল আনহুর উপর দায়ের তাগাদাও অবশিষ্ট থাকল না। যখন মাকফূল আনহুর উপর দায়ের তাগাদা অবশিষ্ট থাকল না তখন কাফীলের উপরও দায়ের তাগাদা অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, কাফীল মাকফূল আনহুর অনুবর্তী (تَابِعٌ)। আর অনুবর্তী জিনিস মূল জিনিসের অনুগমন করে। অতএব, মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দিলে কিংবা মাকফূল লাহু তার দায় উসুল করে নিলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيْلَ لَمْ يَبْرَأِ الْاَصِيْلُ عَنْهُ الخ : আর যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তথা মাকফূল আনহু ঋণ থেকে দায়মুক্ত হবে না। কেননা কাফীল মাকফূল আনহুর অনুবর্তী (تَابِعٌ)। যদি কাফীলকে দায়মুক্ত করার কারণে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হয়ে যায় তাহলে আসলকে নিজ অনুবর্তী বিষয়ের অনুবর্তী হওয়া অনিবার্য হবে। অথচ এটা শুদ্ধ নয়। তাই কাফীলকে দায়মুক্ত করার দ্বারা মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, কাফীলের উপর শুধু দায়ের তাগাদা ওয়াজিব হয়; মূল ঋণ ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে মাকফূল আনহুর জিম্মায় মূল ঋণ কাফীলের কাফালাহ গ্রহণ করার পূর্বেও ওয়াজিব ছিল এবং কাফীলের মৃত্যুবরণ করার পরও তা ওয়াজিব থাকে; মৃত্যুবরণ করার দ্বারা মাকফূল আনহু থেকে ঋণের দায় রহিত হয় না। অতএব, মাকফূল আনহুর উপর তখনও ঋণ বহাল থাকবে যখন কাফীলকে তাগাদা থেকে দায়মুক্ত করে দেওয়া হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কাফীলকে দায়মুক্ত করার কারণে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ عَنِ الْاَصِيْلِ فَهُوَ تَأْخِيْرٌ الخ : যদি মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুকে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের 'অবকাশ' দেয় তাহলে তা কাফীলকেও 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে। তাই নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে মাকফূল লাহু কাফীলকেও দায় পরিশোধের তাগাদা দিতে পারবে না। কিন্তু যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে 'অবকাশ' দেয় তাহলে তা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মাকফূল আনহুকে 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে না। দলিল হলো, যেহেতু অবকাশ দান করার অর্থ হলো নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত তাগাদা রহিত করা, সেহেতু এটা সাময়িকভাবে দায়মুক্ত (إِبْرَاءٌ مُوَقَّتٌ) করা হলো। আর সাময়িক দায়মুক্তিকে স্থায়ী দায়মুক্তি (إِبْرَاءٌ مُؤَبَّدٌ) -এর উপর কিয়াস করা হবে। স্থায়ী দায়মুক্তির সুরতে যেহেতু মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করার কারণে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যায় এবং কাফীলকে দায়মুক্ত করার কারণে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হয় না, সেহেতু সাময়িক দায়মুক্তির সুরতেও মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করার কারণে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কাফীলকে দায়মুক্ত করার কারণে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা আইনী (র.) সাময়িক দায়মুক্তিকে স্থায়ী দায়মুক্তির উপর কিয়াস করার বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সাময়িক দায়মুক্তি ও স্থায়ী দায়মুক্তির মাঝে বেশ পার্থক্য আছে। তা হলো, স্থায়ী দায়মুক্তিকে কাফীল যদি প্রত্যাখ্যান (رَدّ) করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত (رَدٌّ) হয় না; বরং দায়মুক্তি কার্যকরী হয় এবং কাফীল থেকে তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) রহিত (سَاقِطٌ) হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাময়িক দায়মুক্তি কাফীলের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় এবং জামিন নেওয়া বিষয়ের তাগাদা তার উপর ওয়াজিব থেকে যায়। স্থায়ী দায়মুক্তি ও সাময়িক দায়মুক্তির মাঝে এত বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা আইনী (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর পক্ষ থেকে বলেন, কিয়াস করার জন্য সব দিক থেকে مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه -এর এক হওয়া শর্ত নয়; বরং কোনো একদিক থেকে সমতা ও ঐক্য পাওয়া যাওয়াও কিয়াসের জন্য যথেষ্ট। আর এটুকু ঐক্য স্থায়ী দায়মুক্তি ও সাময়িক দায়মুক্তির মাঝে আছে। তা হলো স্থায়ী দায়মুক্তির মাঝেও তাগাদা রহিত হয়ে যায় এবং সাময়িক দায়মুক্তির মাঝেও তাগাদা রহিত হয়। তাগাদা রহিত হওয়ার দিক থেকে مَقِيْس عَلَيْه ও مَقِيْس এক; যদিও

স্থায়ী দায়মুক্তির মাঝে তাগাদা স্থায়ীভাবে রহিত হয়, আর সাময়িক দায়মুক্তির মাঝে তাগাদা সাময়িকভাবে রহিত হয়। যখন একদিক থেকে ঐক্য পাওয়া গেল তখন সাময়িক দায়মুক্তিকে স্থায়ী দায়মুক্তির উপর কিয়াস করতে কোনো সমস্যা নেই।

তবে কথা হলো, স্থায়ী দায়মুক্তি কাফীলের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা কেন প্রত্যাখ্যাত হয় না এবং সাময়িক দায়মুক্তি কেন প্রত্যাখ্যাত হয়? এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো, কাফীলের ক্ষেত্রে স্থায়ী দায়মুক্তি হলো শুধুই রহিতকরণ (إِسْقَاطٌ); এতে মালিকানা প্রদানের কোনো ব্যাপার নেই এবং রহিতকরণ (إِسْقَاطٌ) প্রত্যাখ্যান (رَدٌّ) -কে গ্রহণ করে না। তাই স্থায়ী দায়মুক্তি কাফীলের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় না। পক্ষান্তরে সাময়িক দায়মুক্তি হলো কেবল তাগাদা বিলম্বিত করা; রহিতকরণ নয়। আর যা রহিতকরণভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। তাই সাময়িক দায়মুক্তি প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। -[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَفَلَ بِالْمَالِ الْحَالِ مُؤَجَّلًا الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে 'অবকাশ' দেয় অর্থাৎ কাফীল থেকে তাগাদাকে সাময়িক সময়ের জন্য বিলম্বিত করে তাহলে তা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মাকফূল আনহুকে 'অবকাশ' দান বলে গণ্য হবে না এবং তার থেকে তাগাদা বিলম্বিত হবে না। অথচ বিষয়টি শুদ্ধ নয়। কারণ কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য কোনো মালের এক মাস অবকাশ লাভের শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করে; উদাহরণত ফরীদের কাছে শামীল তাৎক্ষণিকভাবে একশ' টাকা পাবে, কিন্তু যুবায়ের এক মাস অবকাশের শর্তে তার কাফালাহ গ্রহণ করল, সে বলল, আমি একশ' টাকার কাফীল হলাম, কিন্তু এক মাসের পূর্বে তার তাগাদা দেওয়া যাবে না, তাহলে এ সুরতে কাফীল থেকে যেরূপ তাগাদা বিলম্বিত হয় তেমনি মাকফূল আনহু থেকেও তাগাদা বিলম্বিত হয়। তাই মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুকেও নির্ধারিত মেয়াদ তথা এক মাসের পূর্বে উক্ত একশ' টাকার তাগাদা দিতে পারে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি কাফীল থেকে তাগাদাকে সাময়িক সময়ের জন্য বিলম্বিত করা হয় তাহলে মাকফূল আনহু থেকেও তাগাদা বিলম্বিত হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য কোনো মালের এক মাস অবকাশ লাভের শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে ঋণ ছাড়া মাকফূল লাহুর অন্য কোনো হক নেই। কারণ, এক মাস অবকাশ লাভের শর্তে কাফালাহ গ্রহণ করায় কাফীলের উপর এখনও তাগাদা আবশ্যক হয়নি। কাফীল এক মাসের অবকাশকে মূল ঋণের দিকে সম্বন্ধ করায় তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য ঋণ মেয়াদি ঋণ (اَلدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ) -এ পরিণত হয়েছে। ঋণ যেহেতু মাকফূল আনহুর জিম্মায় ওয়াজিব তাই এ মেয়াদ মাকফূল আনহু ও কাফীল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মাসআলায় কাফীল প্রথমে কাফালাহ গ্রহণ করেছে, এরপর মাকফূল লাহু তার থেকে তাগাদা বিলম্বিত করেছে। এর দ্বারা মূল ঋণের মেয়াদি হওয়া আবশ্যক হয় না। যখন মূল ঋণ মেয়াদি হয়নি, তখন মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে নিয়ম মাফিক তাৎক্ষণিক তাগাদা করতে পারবে। আর কাফীল থেকে যেহেতু তাগাদা বিলম্বিত করে দিয়েছে তাই তার কাছে তাৎক্ষণিক তাগাদা করতে পারবে না।

فَإِن صَالَحَ الْكَفِيْلَ رَبَّ الْمَالِ عَنِ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ فَقَدْ بَرِئَ الْكَفِيْلُ وَالَّذِيْ عَلَيْهِ الْأَصْلُ، لِأَنَّه أَضَافَ الصُّلْحَ إِلَى الْأَلْفِ الدَّيْنِ، وَهِيَ عَلَى الْأَصِيْلِ، فَبَرِئَ عَنْ خَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّه إِسْقَاطٌ، وَبَرَاءَتُه تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيْلِ، ثُمَّ بَرِئَا جَمِيْعًا عَنْ خَمْسِ مِائَةٍ بِأَدَاءِ الْكَفِيْلِ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيْلُ عَلَى الْأَصِيْلِ بِخَمْسِ مِائَةٍ، إِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ، لِأَنَّه مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ فَمَلَكَه فَيَرْجِعُ بِجَمِيْعِ الْأَلْفِ، وَلَوْ كَانَ صَالَحَه عَمَّا اسْتَوْجَبَ بِالْكَفَالَةِ لَا يَبْرَأُ الْأَصِيْلُ، لِأَنَّ هٰذَا إِبْرَاءُ الْكَفِيْلِ عَنِ الْمُطَالَبَةِ ـ

অনুবাদ : যদি কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে এক হাজারের বিপরীতে পাঁচশ' দিরহামের উপর সন্ধি করে তাহলে কাফীল এবং মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি [মাকফূল আনহু] উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা কাফীল সন্ধিকে ঋণের এক হাজারের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর এ এক হাজার ছিল মাকফূল আনহুর উপর। সুতরাং সে পাঁচশ' দিরহাম থেকে মুক্ত হয়ে গেল। কেননা এ সন্ধি হলো রহিতকরণ। আর মাকফূল আনহুর দায়মুক্ত হওয়া কাফীলের দায়মুক্ত হওয়াকে আবশ্যক করে। অতঃপর কাফীলের পরিশোধের কারণে উভয়ে পাঁচশ' দিরহাম থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং কাফীল মাকফূল আনহু থেকে পাঁচশ দিরহাম ফেরত নেবে; যদি তার আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে। তবে কাফীল যদি [এক হাজার দিরহামের বিপরীতে] অন্য কোনো শ্রেণির দ্রব্যের উপর সন্ধি করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা [সে ক্ষেত্রে] সন্ধি একটি আইনগত বিনিময়। ফলে কাফীল এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে যাবে এবং [মাকফূল আনহু থেকে] পূর্ণ এক হাজার দিরহাম ফেরত নেবে। আর যদি কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে ঐ হকের বিপরীতে সন্ধি করে যা কাফালাহ চুক্তির কারণে তার উপর আবশ্যক হয়েছিল তাহলে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না। কেননা এটা হলো তাগাদা থেকে কাফীলকে দায়মুক্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ صَالَحَ الْكَفِيْلُ رَبَّ الْمَالِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলাটির চার সুরত। যথা– ১. কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে এক হাজারের বিপরীতে পাঁচশ' দিরহামের উপর সন্ধি করেছে এবং মাকফূল আনহু ও কাফীল উভয়ের দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত করেছে। ২. অথবা, বিশেষভাবে মাকফূল আনহুর দায়মুক্তির শর্ত করেছে। ৩. অথবা, বিশেষভাবে কাফীলের দায়মুক্তির শর্ত করেছে। ৪. অথবা, কোনো শর্ত করেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় সুরতে মাকফূল আনহু এবং কাফীল উভয়ে পাঁচশ' দিরহাম থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে আর অবশিষ্ট পাঁচশ দিরহামের তাগাদা মাকফূল লাহু কাফীলের কাছেও করতে পারবে, মাকফূল আনহুর কাছেও করতে পারবে। তৃতীয় সুরতে পাঁচশ দিরহাম থেকে শুধু কাফীল দায়মুক্ত হবে, মাকফূল আনহুর জিম্মায় পূর্বের মতোই এক হাজার দিরহাম অবশিষ্ট থাকবে এবং মাকফূল লাহুর এ অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম মাকফূল আনহু থেকে উসুল করতে পারবে, ইচ্ছা করলে পাঁচশ দিরহাম কাফীল থেকে এবং পাঁচশ দিরহাম মাকফূল আনহু থেকে উসুল করতে পারবে।

চতুর্থ সুরতটি উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যদি কাফীল মাকফূল লাহুকে বলে যে, আমি তোমার সাথে এক হাজার দিরহামের বিপরীতে পাঁচশ' দিরহামের উপর সন্ধি করলাম এবং সে কোনো শর্তের উল্লেখ করল না তাহলে কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ে পাঁচশ' দিরহাম থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা কাফীল সন্ধিকে ঋণের এক হাজার দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর এক হাজার দিরহাম ঋণ মাকফূল আনহুর উপর; কাফীলের উপর নয়। তাই সন্ধির কারণে মাকফূল আনহুর জিম্মা থেকে পাঁচশ দিরহাম রহিত হয়ে যাবে এবং মাকফূল আনহু তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর পূর্বে গেছে যে, মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হলে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু মাকফূল আনহুর দায়মুক্ত হওয়ার দ্বারা কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যায় সেহেতু পাঁচশ' দিরহাম থেকে কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পাঁচশ' দিরহাম মাকফূল আনহুর জিম্মায় বাকি থাকবে। যখন কাফীল পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করে দেবে তখন এ পাঁচশ' দিরহাম থেকেও উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে কাফীল যদি মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে তাহলে মাকফূল আনহু থেকে কাফীলের পাঁচশ' দিরহাম ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে তাহলে ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না। −[আশরাফুল হিদায়া (উর্দু) খ. ৯, পৃ. ২০৪]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَىٰ جِنْسٍ اٰخَرَ الخ : যদি কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে এক হাজার দিরহামের বিপরীতে ঋণের শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণির দ্রব্যের উপর সন্ধি করে, উদাহরণত এক হাজার দিরহামের বিপরীতে কাফীল এক থান কাপড়ের উপর সন্ধি করল এবং তা মাকফূল লাহুকে দিয়ে দিল তাহলে এটা আইনগত (حُكْمًا) বিনিময় (مُبَادَلَةٌ) হলো অর্থাৎ এ সুরতে এটা বলা যাবে যে, কাফীল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক থান কাপড় দিয়েছে। যখন কাফীল মাকফূল লাহুকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এক থান কাপড় দিয়ে দিল তখন কাফীল এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে গেল। যখন কাফীল এক হাজার দিরহামের মালিক হলো তখন সে এ এক হাজার দিরহাম মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে; যদি তার আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করে থাকে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে ঋণ এবং কাপড়ের থানের মাঝে যেটার মূল্য কম হবে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে তা ফেরত নেবে। উদাহরণত থানের মূল্য আটশ' দিরহাম আর ঋণ এক হাজার দিরহাম তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে আটশ' দিরহাম ফেরত নেবে। আর যদি থানের মূল্য বারোশ' দিরহাম আর ঋণ এক হাজার দিরহাম হয় তাহলে এক হাজার দিরহাম ফেরত নেবে। −[প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ صَالَحَهُ عَمَّا اسْتَوْجَبَ بِالْكَفَالَةِ الخ : আর যদি কাফীল মাকফূল লাহুর সাথে ঐ হকের বিপরীতে সন্ধি করে যা কাফালাহ চুক্তির কারণে তার উপর আবশ্যক হয়েছিল, উদাহরণত কাফীল মাকফূল আনহুকে দু'শ দিরহাম দিয়ে অনুরোধ করল যে, আমাকে কাফালাহ থেকে দায়মুক্ত করে দিন কিংবা কিছু না দিয়েই তাকে কাফালাহ থেকে দায়মুক্ত করার অনুরোধ করল এবং মাকফূল লাহু তাকে দায়মুক্ত করে দিল তাহলে মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হবে না; বরং মাকফূল আনহুর জিম্মায় ঋণ এবং ঋণের তাগাদা পূর্বের মতোই বহাল থাকবে। কেননা কাফীলকে তাগাদা থেকে দায়মুক্ত করা মূলত কাফালাহ চুক্তি রহিত করা; মূল ঋণ রহিত করা নয়। যেহেতু এটা কাফালাহ চুক্তি রহিতকরণ, মূল ঋণ রহিতকরণ নয়, তাই কাফালাহ চুক্তির কারণে কাফীলের উপর যে তাগাদার দায় আবশ্যক হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে; কিন্তু মাকফূল আনহু থেকে মূল ঋণ এবং তার তাগাদার দায় রহিত হবে না। অবশ্য কাফীল যে দু'শ দিরহামের উপর মাকফূল লাহুর সাথে সন্ধি করেছে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে; যদি কাফালাহ তার আদেশক্রমে হয়ে থাকে। আর মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে অবশিষ্ট আটশ' দিরহাম উসুল করবে। আর যদি কাফীল কিছু ছাড়াই সন্ধি করে তাহলে এ সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না, মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে পুরো এক হাজার দিরহাম উসুল করবে।

قَالَ : وَمَنْ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ مَالًا قَدْ بَرِئْتَ إِلَىَّ مِنَ الْمَالِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، مَعْنَاهُ بِمَا ضَمِنَ لَهُ بِأَمْرِهِ، لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الَّتِي ابْتِدَاءُهَا مِنَ الْمَطْلُوبِ وَانْتِهَاءُهَا إِلَى الطَّالِبِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْإِيفَاءِ، فَيَكُونُ هٰذَا إِقْرَارًا بِالْأَدَاءِ، فَيَرْجِعُ، وَإِنْ قَالَ : أَبْرَأْتُكَ لَمْ يَرْجِعِ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ بَرَاءَةٌ لَا تَنْتَهِي إِلَى غَيْرِهِ، وَذٰلِكَ بِالْإِسْقَاطِ، فَلَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا بِالْإِيفَاءِ، وَلَوْ قَالَ بَرِئْتَ، قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : هُوَ مِثْلُ الثَّانِي، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَرَاءَةَ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِ وَالْإِبْرَاءَ، فَيَثْبُتُ الْأَدْنَى، إِذْ لَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) : هُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَرَائَةٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنَ الْمَطْلُوبِ، وَإِلَيْهِ الْإِيفَاءُ دُونَ الْإِبْرَاءِ، وَقِيلَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، إِذَا كَانَ الطَّالِبُ حَاضِرًا يَرْجِعُ فِي الْبَيَانِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُجْمِلُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মালের দায়গ্রহণকারী কাফীলকে যদি মাকফূল লাহু বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে মালের দায়মুক্ত হয়েছ তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে। অর্থাৎ কাফীল তার নির্দেশে মাকফূল লাহুর জন্য যে মালের জামিন হয়েছিল [তা ফেরত নিতে পারবে]। কেননা যে দায়মুক্তির সূচনা হয় মাকফূল আনহু থেকে এবং সমাপ্তি হয় মাকফূল লাহুর কাছে তা [পাওনা] পরিশোধ ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং এ বক্তব্য হচ্ছে পাওনা পরিশোধের স্বীকারোক্তি। তাই কাফীল [মাকফূল আনহু] থেকে তা ফেরত নিবে। আর যদি মাকফূল লাহু বলে যে, আমি 'তোমাকে দায়মুক্ত করলাম' তাহলে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা এটা এমন দায়মুক্তি যা মাকফূল লাহু ছাড়া অন্য কারো অভিমুখী হয়ে সমাপ্ত হচ্ছে না। আর এটা হয় রহিতকরণের মাধ্যমে। সুতরাং এটা কাফীলের পরিশোধ করার স্বীকারোক্তি হবে না। আর যদি মাকফূল লাহু বলে যে, 'তুমি দায়মুক্ত' তাহলে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটা দ্বিতীয় বক্তব্যের অনুরূপ। কেননা এ বক্তব্যে মাকফূল লাহুর কাছে পরিশোধের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়া এবং মাকফূল লাহুর দায়মুক্ত করে দেওয়া- উভয়টার সম্ভাবনাই আছে। সুতরাং দুটির নিম্নতরটি সাব্যস্ত হবে। কেননা সন্দেহের অবস্থায় কাফীল ফেরত নিতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা প্রথম বক্তব্যের অনুরূপ। কেননা মাকফূল লাহু এমন দায়মুক্তির স্বীকারোক্তি করেছে যার সূচনা কাফীলের দিক থেকে : আর কাফীলের দিক থেকে কেবল পরিশোধ হতে পারে, দায়মুক্তকরণ হতে পারে না। কারো কারো মতে উল্লিখিত সকল সুরতে যদি মাকফূল লাহু উপস্থিত থাকে তাহলে ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার কাছে রুজু করা হবে। কেননা সে-ই হলো বক্তব্য সংক্ষেপণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ স্থানে দায়মুক্তকরণ সম্পর্কিত তিনটি মাসআলা আলোচনা করেছেন।

প্রথম মাসআলা : وَمَنْ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ مَالًا الخ : মাকফূল লাহু কাফীলকে–যে কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে মাকফূল লাহুর জন্য কাফালাহ গ্রহণ করেছিল– তাকে বলল, بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে মালের দায়মুক্ত হয়েছ', তাহলে এ সুরতে কাফীল যে মালের জামিন হয়েছিল তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

কারণ, بَرِئْتَ [তুমি দায়মুক্ত হয়েছ] শব্দে কাফীলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর দায়মুক্তির সমাপ্তি হয়েছে মাকফূল লাহুর কাছে। কেননা إِلَيَّ [আমার পক্ষ থেকে] শব্দটি সমাপ্তি (اِنْتِهَاءُ، اَلْغَايَةُ) বুঝায়। আর আলোচ্য বক্তব্যে সমাপ্তি (مُنْتَهٰى) হলো মাকফূল লাহু। অতএব, বুঝা গেল এ বক্তব্যে কাফীল হলো দায়মুক্তির সূচনা (اِبْتِدَاءُ), আর মাকফূল লাহু হলো সমাপ্তি। আর এ ধরনের দায়মুক্তি যার সূচনা হয় কাফীল থেকে আর সমাপ্তি হয় মাকফূল লাহুর কাছে তা কেবল পাওনা পরিশোধের দ্বারাই হয়। সুতরাং এটা যেন মাকফূল লাহুর এ বক্তব্যের মতো হলো যে, মাকফূল লাহু বলল, دَفَعْتَ اِلَىَّ الْمَالَ 'তুমি আমার কাছে মাল অর্পণ করেছ' অথবা বলল, قَبَضْتُهُ مِنْكَ 'আমি তোমার থেকে মাল কব্জা করেছি।' যেন মাকফূল লাহু এ কথার স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে, কাফীল যে মালের জামিন হয়েছিল তা পরিশোধ করেছে। যখন মাকফূল লাহু মাল পরিশোধের স্বীকারোক্তি দিল তখন কাফীল ও মাকফূল আনহু কারো কাছে তাগাদার অধিকার তার থাকল না। আর কাফালাহ যেহেতু মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে হয়েছে তাই কাফীল যে মালের জামিন হয়েছিল তা সে মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : وَاِنْ قَالَ اَبْرَأْتُكَ لَمْ يَرْجِعِ الْكَفِيْلُ الخ : মাকফূল লাহু কাফীলকে বলল, اَبْرَأْتُكَ 'আমি তোমাকে দায়মুক্ত করলাম', তাহলে এ সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে না। তবে মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে স্বীয় ঋণের তাগাদা করতে পারবে। দলিল হলো, এটা এমন এক দায়মুক্তি যা শুধু মাকফূল লাহুর দিকে অভিমুখী হয়– অন্য কারো অভিমুখী হয় না। অতএব, এর সূচনা হয়েছে মাকফূল লাহু থেকে– কাফীল থেকে নয়; বরং কাফীলের উপর তা সমাপ্ত হয়েছে। কারণ, মাকফূল লাহু তাকে বলেছে যে, আমি তোমাকে দায়মুক্ত করে দিলাম অর্থাৎ দায়মুক্তির সূচনা হয়েছে আমার দিক থেকে এবং সমাপ্ত হয়েছে তোমার উপর। আর যে দায়মুক্তির সূচনা মাকফূল লাহু থেকে হয় এবং সমাপ্তি কাফীলের উপর হয় তা রহিতকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেন মাকফূল লাহু এ কথা বলেছে যে, আমি তোমার থেকে আমার তাগাদা রহিত করলাম। আর মাকফূল লাহুর কাফীল থেকে তাগাদা রহিতকরণের কারণে এটা অনিবার্য হয় না যে, মাকফূল লাহু কাফীল কর্তৃক মাল পরিশোধ করার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। যখন কাফীল কর্তৃক মাল পরিশোধের স্বীকারোক্তি হয়নি তখন কাফীলের মাকফূল আনহু থেকে তা ফেরত নেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না। কারণ, মাকফূল আনহু থেকে কাফীল তখনি মাল ফেরত নিতে পারে যখন কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে মাকফূল বিহী পরিশোধ করে দেয়। আর যেহেতু কাফীলের দায়মুক্ত হওয়ায় মাকফূল আনহুর দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক হয় না, তাই এ সুরতে মাকফূল লাহু মাকফূল আনহু থেকে স্বীয় মাল পরিশোধের তাগাদা করার অধিকার রাখবে।

তৃতীয় মাসআলা : وَلَوْ قَالَ بَرِئْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) هُوَ مِثْلُ الثَّانِيْ الخ : আর যদি মাকফূল লাহু কাফীলকে বলে– بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত', তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা দ্বিতীয় বক্তব্যের অনুরূপ হবে অর্থাৎ اَبْرَأْتُكَ 'তোমাকে মুক্ত করলাম' বলার সুরতে যেরূপ কাফীল তাগাদার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে না, তেমনি بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' সুরতে কাফীল তাগাদার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে না।

দলিল হলো, بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' - এ বক্তব্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. 'তুমি দায়মুক্ত হয়েছ', কারণ তুমি মাল পরিশোধ করে দিয়েছ।

২. 'তুমি দায়মুক্ত হয়ে গেছ'। কারণ আমি তোমাকে দায়মুক্ত করে দিয়েছি। অর্থাৎ بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' এ কথাটি بَرَاءَةٌ بِالْأَدَاءِ তথা কাফীল কর্তৃক মাল পরিশোধের মাধ্যমে কাফীলের দায়মুক্তির স্বীকারোক্তিও হতে পারে আবার بَرَاءَةٌ بِالْإِبْرَاءِ তথা মাল পরিশোধ ছাড়াই মাকফূল লাহু কর্তৃক কাফীল থেকে তাগাদার দায় রহিতকরণও হতে পারে। এ দুই সম্ভাবনার মধ্যে بَرَاءَةٌ

بِالْإِبْرَاءِ অর্থাৎ কাফীল থেকে মাকফূল লাহুর তাগাদার দায় রহিতকরণটা নিম্নতর (أَدْنَى)। আর নিম্নতরটি যেহেতু নিশ্চিত হয় তাই নিম্নতরটা সাব্যস্ত হবে। কেননা যখন أَدْنَى এবং أَعْلَى অথবা কম এবং বেশি উভয়টার সম্ভাবনা থাকে তখন কমটা নিশ্চিত বিষয় হওয়ায় কমটাই সাব্যস্ত হয়। উদাহরণত নামাজরত ব্যক্তির যদি কত রাকাত নামাজ আদায় করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে বিধান হলো সে কমটা হিসাব করবে। কারণ, কমটা নিশ্চিত। তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও নিম্নতরটা সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ বলা হবে যে, কাফীল মাকফূল লাহুর তাগাদা রহিতকরণের দ্বারা দায়মুক্ত হয়েছে। আর কাফীল থেকে মাকফূল লাহুর তাগাদা রহিতকরণের সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারে না এবং মাকফূল আনহুর উপর পূর্বের মতোই ঋণ ও ঋণের তাগাদা বহাল থাকে। তাই بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' বলার সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, بَرِئْتَ'তুমি দায়মুক্ত' এ বক্তব্যে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, কাফীল দায়মুক্ত হয়ে গেছে; তা মাকফূল লাহু কর্তৃক দায় রহিতকরণের দ্বারা হোক বা কাফীল কর্তৃক মাল পরিশোধের দ্বারা হোক। কিন্তু মাকফূল আনহু থেকে কাফীল মাল ফেরত নিতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, যদি রহিতকরণের কারণে দায়মুক্ত হয় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি পরিশোধের কারণে দায়মুক্ত হয় তাহলে ফেরত নিতে পারবে। আর সন্দেহ থাকা অবস্থায় কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারে না। তাই এ সুরতে কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' এ বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যের অনুরূপ হবে অর্থাৎ بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে মালের দায়মুক্ত হয়েছ' বলার সুরতে যেরূপ কাফীল এবং মাকফূল আনহু উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যায় এবং কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারে, তেমনি بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' বলার সুরতেও কাফীল এবং মাকফূল আনহু উভয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে। দলিল হলো, মাকফূল লাহু بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' বলে এমন দায়মুক্তির স্বীকারোক্তি দিয়েছে যার সূচনা কাফীল থেকে। কেননা মাকফূল লাহু সম্বোধনসূচক শব্দ (تَاءْ) ব্যবহার করেছে। সুতরাং দায়মুক্তি এমন একটি কর্ম (فِعْل) হবে যা একান্তই কাফীলের দিকে সম্বন্ধিত হবে। আর কাফীলের সাধারণ কর্ম হলো পরিশোধ করা, দায়মুক্ত করা নয়। যখন এ দায়মুক্তি কাফীলের দিক থেকে হচ্ছে, আর যে দায়মুক্তি কাফীলের দিক থেকে হয় তা যেহেতু পরিশোধ করার দ্বারাই হয় তাই এ দায়মুক্তিও কাফীলের পরিশোধ করার দ্বারা অর্জিত হবে। আর যে দায়মুক্তি কাফীলের পরিশোধ করার দ্বারা অর্জিত হয় তাতে যেহেতু কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারে তাই بَرِئْتَ 'তুমি দায়মুক্ত' বলার সুরতেও কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাল ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ فِيْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَا إِذَا كَانَ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, কোনো কোনো মাশায়েখের মতে উপরিউক্ত মাসআলা তিনটির বর্ণিত বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মাকফূল লাহু উক্ত কথা বলার পর গায়েব হয়ে যায়। যদি মাকফূল লাহু উপস্থিত থাকে তাহলে তিনো মাসআলার ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার দিকে রুজু করা হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে মাকফূল বিহী কব্জা করেছে কিনা। কেননা সেই হলো বক্তব্য সংক্ষেপণকারী। আর নিয়ম হলো, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিবরণ স্বয়ং সংক্ষেপণকারীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়। যেহেতু উপরিউক্ত মাসআলাগুলোতে এক ধরনের বক্তব্য সংক্ষেপণ রয়েছে, তাই তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে সংক্ষেপণকারী তথা মাকফূল লাহুকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَرَاءَاتِ، وَيُرْوَى أَنَّهُ يَصِحُّ، لِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ دُونَ الدَّيْنِ فِي الصَّحِيحِ، فَكَانَ إِسْقَاطًا مَحْضًا كَالطَّلَاقِ، وَلِهٰذَا لَا يَرْتَدُّ الْإِبْرَاءُ عَنِ الْكَفِيلِ بِالرَّدِّ، بِخِلَافِ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ থেকে দায়মুক্ত করাকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। কারণ, অন্য সকল দায়মুক্তকরণের মতো এতেও মালিক বানানোর অর্থ আছে। এক বর্ণনায় আছে যে, এটা শুদ্ধ। কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে কাফীলের উপর শুধু তাগাদার দায় রয়েছে; ঋণের দায় নয়। সুতরাং তালাকের ন্যায় এটাও নিছক রহিতকরণ। এ কারণেই প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা কাফীল থেকে দায়মুক্তকরণ প্রত্যাখ্যাত হয় না। কিন্তু মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্তকরণের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ থেকে দায়মুক্ত করাকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। উদাহরণত মাকফূল লাহু বলল, إِذَا جَاءَ غَدًا فَأَنْتَ بَرِيءٌ 'যদি কালকের দিন আসে তাহলে তুমি মুক্ত।' দলিল হলো, কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণ নিছক দায় রহিতকরণ নয়; বরং এতে অন্য সকল দায়মুক্তকরণের ন্যায় মালিক বানানোর অর্থ আছে অর্থাৎ কাফালাহ চুক্তির কারণে মাকফূল লাহু কাফীলের কাছে তাগাদা করার মালিক ছিল। কিন্তু যখন কাফীলকে দায়মুক্ত করে দিল তখন যেন কাফীলকে তাগাদার মালিক বানিয়ে দিল। আর মালিক বানানোকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত (مُعَلَّقٌ) করা বৈধ নয়, তাই কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, যদি মালের কাফালাহ গ্রহণকারী মাকফূল লাহুকে বলে যে, যদি আমি কালকে মাল পরিশোধ করে দেই তাহলে দায়মুক্ত হয়ে যাব। এরপর শর্ত অনুসারে কাফীল মাল পরিশোধ করে, তাহলে কাফীল মাল এবং তাগাদা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, কাফালাহ থেকে দায়মুক্তিকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ শর্ত কাফালাহ চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরে যে শর্তের সাথে সম্পৃক্ততাকে বৈধ নয় বলা হয়েছে তা অসামাঞ্জস্যপূর্ণ শর্তের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তের সাথে কাফালাহ থেকে দায়মুক্তিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ, কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তের সাথে কাফালাহ থেকে দায়মুক্তিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।
–[ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৮৭]

গ্রন্থকার (র.) বলেন, নাওয়াদেরের (نَوَادِرٌ) বর্ণনা অনুসারে কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েজ। দলিল হলো, কাফীলকে কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণের বিষয়টি তালাকের মতো নিছক রহিতকরণ (إِسْقَاطٌ مَحْضٌ)। কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে কাফীলের উপর শুধু তাগাদার দায় রয়েছে; ঋণের দায় নয়। আর কাফীলকে দায়মুক্তকরণের কারণে শুধু তাগাদা রহিত হয়। যেহেতু কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণ (بَرَاءَةٌ مِنَ الْكَفَالَةِ) নিছক তাগাদা রহিতকরণ, তাই প্রত্যাখ্যান (رَدٌّ) করার দ্বারা কাফীল থেকে দায়মুক্তকরণ প্রত্যাখ্যাত (رَدٌّ) হয় না। যদি কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর কোনো ব্যাপার থাকত তাহলে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা দায়মুক্তকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেত। এ থেকে বুঝা যায় যে, কাফালাহ থেকে দায়মুক্তকরণ নিছক রহিতকরণ। আর নিছক রহিতকরণকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। কিন্তু মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্তকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মাকফূল আনহুকে দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে। আর সে কারণেই মাকফূল আনহু দায়মুক্তকরণকে প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

وَكُلُّ حَقٍّ لَا يُمْكِنُ اِسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيْلِ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ، مَعْنَاهُ بِنَفْسِ الْحَدِّ لَا بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لِاَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اِيْجَابُهُ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْعُقُوْبَةَ لَا يَجْرِىْ فِيْهَا النِّيَابَةُ۔

অনুবাদ : যে সকল হক কাফীল থেকে উসুল করা সম্ভব নয়, তার কাফালাহ শুদ্ধ নয়। যেমন যাবতীয় হদ ও কিসাস। অর্থাৎ স্বয়ং হদ ও কিসাসের কাফালাহ গ্রহণ [বৈধ নয়]; হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহসত্তার কাফালাহ [গ্রহণের বৈধতাকে নাকচ করা উদ্দেশ্য] নয়। কেননা কাফীলের উপর হদ ও কিসাস প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ, অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা চলে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ حَقٍّ لَا يُمْكِنُ اِسْتِيفَاؤُهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারতে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে সকল হক শরিয়তসম্মত উপায়ে কাফীল থেকে উসুল করা সম্ভব নয়, যেমন স্বয়ং হদ ও কিসাস, তার কাফালাহ শুদ্ধ নয়। এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অবশ্য যে ব্যক্তির উপর হদ বা কিসাস ওয়াজিব তাকে বিচারকের আদালতে হাজির করার কাফালাহ গ্রহণ যদিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নয়; কিন্তু সাহেবাইন ও জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে জায়েজ। স্বয়ং হদ ও কিসাসের কাফালাহ গ্রহণ করার সুরত হলো, উদাহরণত হেলাল বলল, যদি খালেদ ব্যভিচারের হদ বা কিসাসের শাস্তি গ্রহণ না করে তাহলে আমি তার পক্ষ থেকে কাফীল হলাম; আমার উপর হদ বা কিসাস প্রয়োগ করা হবে। এটা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো, কাফীলের উপর হদ বা কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা কাফীলের উপর হদ বা কিসাস হয়তো মূলগতভাবে (اِصَالَةً) ওয়াজিব হবে অথবা মাকফূল আনহুর স্থলবর্তী (نَائِبْ) হিসেবে হবে। যেহেতু অপরাধ কাফীল করেনি, অপরাধ করেছে অন্যজন তাই মূলগতভাবে তার উপর হদ বা কিসাস ওয়াজিব হতে পারে না। আবার স্থলবর্তীর হিসাবেও ওয়াজিব হয় না। কারণ, অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা (نِيَابَةً) চলে না। শাস্তির ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা এজন্য চলে না যে, শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা। স্থলবর্তীকে শাস্তি দেওয়ার দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধন হয় না। মোটকথা, যেহেতু কাফীলের উপর কোনোভাবেই হদ ও কিসাস ওয়াজিব হয় না, অথচ কাফালাহ দ্বারা কাফীলের জিম্মায় ওয়াজিব করা উদ্দেশ্য হয় তাই হদ ও কিসাসের কাফালাই শুদ্ধ নয়।

وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ جَازَ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ كَسَائِرِ الدُّيُوْنِ، وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيْعِ لَمْ تَصِحَّ، لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَضْمُوْنٌ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ، وَالْكَفَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُوْنَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَصِحُّ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لٰكِنْ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُوْنَةِ بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيْعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَالْمَقْبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالْمَغْصُوْبِ، لَا بِمَا كَانَ مَضْمُوْنًا بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيْعِ وَالْمَرْهُوْنِ، وَلَا بِمَا كَانَ أَمَانَةً كَالْوَدِيْعَةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ، وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بِتَسْلِيْمِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَى الرَّاهِنِ أَوْ بِتَسْلِيْمِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَ فِعْلًا وَاجِبًا ـ

অনুবাদ : যদি কেউ ক্রেতার পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্যের কাফীল হয় তাহলে তা জায়েজ আছে। কেননা দ্রব্যমূল্য অন্য সকল ঋণের মতোই একটি ঋণ। আর যদি কেউ বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় দ্রব্যের কাফীল হয় তাহলে তা শুদ্ধ নয়। কেননা বিক্রয়দ্রব্য হচ্ছে একটি নির্ধারিত বস্তু, যা তা থেকে ভিন্ন কিছু দ্বারা অর্থাৎ ধার্য মূল্য দ্বারা দায়বদ্ধ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের বিপরীতে আমাদের মতে দায়বদ্ধ নির্ধারিত বস্তুর কাফালাহ যদিও শুদ্ধ, কিন্তু তা হুবহু নিজ সত্তা দ্বারা দায়বদ্ধ নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন ফাসিদ বিক্রয় চুক্তির বিক্রয়দ্রব্য, দরদামের পর্যায় কব্জাকৃত দ্রব্য ও ডাকাতি / ছিনতাই / চুরি করা দ্রব্য। যেসব নির্ধারিত বস্তু তা থেকে ভিন্ন কিছুর বিপরীতে দায়বদ্ধ সেগুলোর ক্ষেত্রে কাফালাহ আমাদের মতেও শুদ্ধ নয়। যেমন– বিক্রয়দ্রব্য, বন্ধকী দ্রব্য। তদ্রূপ আমানতরূপে গণ্য এমন নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রেও নয়। যেমন– গচ্ছিত দ্রব্য, ধারে নেওয়া দ্রব্য, ভাড়ায় নেওয়া দ্রব্য এবং মুদারাবা ও শিরকতের ভিত্তিতে গ্রহণকৃত মাল। যদি কেউ কব্জা করার পূর্বে [ক্রেতার কাছে] বিক্রয় দ্রব্য অর্পণের কিংবা ঋণের দখল গ্রহণের পর বন্ধকি দ্রব্য বন্ধকদাতার কাছে অর্পণের কিংবা ভাড়ায় নেওয়া বস্তুটি ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে অর্পণের কাফালাহ গ্রহণ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা কাফীল একটি ওয়াজিব কর্মের দায় গ্রহণ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ جَازَ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতার জন্য দ্রব্যমূল্যের কাফীল হয় তাহলে তা জায়েজ আছে। দলিল হলো, দ্রব্যমূল্য বিশুদ্ধ ঋণ। আর কাফীল থেকে তা উসুল করা সম্ভব। সুতরাং অন্যসব ঋণের মতো এর কাফালাহ জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيْعِ لَمْ تَصِحَّ الخ : যদি কেউ বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতার জন্য বিক্রয়দ্রব্যের কাফীল হয়, উদাহরণত কাফীল ক্রেতাকে বলল, যদি বিক্রয়দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি তার জামিন হলাম, তাহলে এ কাফালাহ শুদ্ধ হবে না।

গ্রন্থকার (র.) যে দলিল পেশ করেছেন তা উল্লেখ করার পূর্বে একটি ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। বস্তু (أَعْيَان) দু প্রকার–

১. أَعْيَانٌ غَيْرُ مَضْمُوْنَةٍ 'দায়বদ্ধতামুক্ত বস্তু'। এ প্রকার বস্তু যেমন– গচ্ছিত দ্রব্য, ধারে নেওয়া দ্রব্য, ভাড়ায় নেওয়া দ্রব্য, মুদারাবা এবং শিরকতের ভিত্তিতে গ্রহণকৃত দ্রব্য। এসব দ্রব্য বিনষ্ট হলে জরিমানা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং গচ্ছিত দ্রব্য

আমানত গ্রহীতার কাছ থেকে, ধারে নেওয়া দ্রব্য ধারে গ্রহণকারীর কাছ থেকে, ভাড়ায় নেওয়া বস্তু ভাড়ায় গ্রহণকারীর কাছ থেকে, মুদারাবার মাল মুদারিব থেকে, অংশীদারি দ্রব্য কোনো অংশীদারের কাছ থেকে বাড়াবাড়ি (تَعَدِّىْ) ও হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفْ) ছাড়া বিনষ্ট হয়ে গেলে কব্জা বা দখলকারির উপর তার জরিমানা ওয়াজিব হয় না।

২. أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ 'দায়বদ্ধ বস্তু'। এটা আবার দু প্রকার–

১. مَضْمُوْنَةْ بِنَفْسِهٖ 'নিজ সত্তার দ্বারা দায়বদ্ধ বস্তু।' এ প্রকার দ্রব্য হলো ফাসিদ বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার কব্জাকৃত বিক্রয় দ্রব্য, দরদামের পর্যায় কব্জাকৃত দ্রব্য যেমন– এক ব্যক্তি ক্রয়ের ইচ্ছায় বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রয় দ্রব্য কব্জা করল। উভয় পক্ষের দরাদরিতে দাম ঠিক হয়েছে। ক্রেতা বলল, যদি পরিবারস্থ লোকদের পছন্দ হয় তাহলে আমি কিনে নেব এবং ডাকাতি / ছিনতাই / চুরিকৃত দ্রব্য। এসব দ্রব্য مَضْمُوْنْ بِنَفْسِهٖ অর্থাৎ নিজ সত্তার দ্বারা দায়বদ্ধ। যদি উপরিউক্ত সুরতে এসব দ্রব্য হুবহু বিদ্যমান থাকে তাহলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। আর বিনষ্ট হয়ে গেলে এগুলোর কীমত [বাজার দর] ওয়াজিব হয়।

২. مَضْمُوْنْ بِغَيْرِهٖ 'ভিন্ন কিছু দ্বারা দায়বদ্ধ বস্তু'। এ প্রকার দ্রব্য যেমন– শুদ্ধ বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রেতার কব্জায় থাকা বিক্রয় দ্রব্য, বন্ধকগ্রহীতার কব্জায় থাকা বন্ধকি দ্রব্য, বিক্রেতার কব্জায় থাকা বিক্রয় দ্রব্য ধার্যমূল্য (ثَمَنْ) -এর বিপরীতে দায়বদ্ধ অর্থাৎ বিক্রয় দ্রব্যের দায় হলো ধার্যমূল্য আর বন্ধকগ্রহীতার কব্জায় থাকা বন্ধকি দ্রব্য ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ। যদি বন্ধকি দ্রব্য বন্ধকগ্রহীতার (مُرْتَهِنْ) কব্জায় থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয় তাহলে তার বিপরীতে বন্ধকদাতা (رَاهِنْ) -এর দায় থেকে উক্ত দ্রব্যের মূল্য পরিমাণ ঋণ রহিত হয়ে যাবে।

দ্রব্য যে প্রকারভুক্ত হোক; أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ হোক বা أَعْيَانْ غَيْرُ مَضْمُوْنَةْ হোক, مَضْمُوْنْ بِنَفْسِهٖ হোক বা مَضْمُوْنْ بِغَيْرِهٖ হোক- এর কাফালাতের দু সুরত হতে পারে–

১. এসব দ্রব্যের কাফীল হবে।

২. এসব দ্রব্য অর্পণের কাফীল হবে। যদি এসব দ্রব্যের কাফীল হয় তাহলে أَعْيَانْ غَيْرُ مَضْمُوْنَةْ অর্থাৎ আমানতের মাল, ধারে নেওয়া মাল, ভাড়ায় নেওয়া মাল ইত্যাদি এবং أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ بِغَيْرِهَا অর্থাৎ বিক্রয়দ্রব্য এবং বন্ধকি দ্রব্যের কাফালাহ আহনাফ ও শাফেয়ী মতাবলম্বীদের কারো মতেই জায়েজ নেই। أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ بِنَفْسِهَا অর্থাৎ ফাসিদ বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার কব্জাকৃত বিক্রয়দ্রব্য, দরদামের পর্যায় কব্জাকৃত দ্রব্য, চুরি-ডাকাতিকৃত দ্রব্যের কাফালাহ আমাদের মতে জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে এ প্রকার দ্রব্যের কাফালাহও জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দ্রব্যের কাফালাহ, তা أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ بِنَفْسِهَا হোক বা أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ بِغَيْرِهَا হোক এজন্য জায়েজ নেই যে, তাঁর মতে কাফালাহ চুক্তি কাফীলের উপর মূল ঋণের দায়কে ওয়াজিব করে। তিনি মনে করেন, কাফালার ক্ষেত্র হলো ঋণ; বস্তু নয়। যেহেতু কাফালাহ-এর ক্ষেত্র বস্তু নয়; বরং ঋণ, সেহেতু বস্তুর কাফালাহ শুদ্ধ হতে পারে না। তাছাড়া কাফালার শুদ্ধতার জন্য কাফীলের মাকফূল বিহী নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকা শর্ত। ঋণের ক্ষেত্রে তো এ শর্তের বাস্তবায়ন হতে পারে কিন্তু দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ শর্তের বাস্তবায়ন সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই দ্রব্যের কাফালাহ শুদ্ধ নয়।

আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর দলিলের জবাব হলো, আমাদের মতে কাফালাহ হলো তাগাদার বিষয়ে এক জিম্মাকে আরেক জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত করা। আর তাগাদার দাবি হলো তাগাদার বস্তুটি মাকফূল আনহুর জিম্মায় দায়বদ্ধ হবে। অথচ আমানতের মাল, ধারে নেওয়া মাল অর্থাৎ أَعْيَانْ غَيْرُ مَضْمُوْنَةْ দায়বদ্ধ হয় না।

আমানতের মাল অথবা ধারে নেওয়া মাল যদি আমানত গ্রহীতা বা ধারগ্রহীতার কব্জায় থাকাকালে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এজন্য কোনো জরিমানা দিতে হয় না। এমনিভাবে أَعْيَانْ مَضْمُوْنَةْ بِغَيْرِهَا অর্থাৎ বিক্রয়দ্রব্য, যা ধার্যমূল্যের বিপরীতে দায়বদ্ধ হয় এবং বন্ধকি দ্রব্য, যা ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ হয়- এগুলো মাকফূল আনহুর কব্জায় দায়বদ্ধ হয় না। যদি বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয় তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হয় না; বরং ধার্যমূল্য (ثَمَنْ) রহিত হয়ে যায় এবং বিক্রয় চুক্তি ভেঙে যায় এবং বন্ধকি দ্রব্য যদি বন্ধকগ্রহীতার কব্জায় থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার জরিমানা দিতে হয় না; বরং বন্ধকি দ্রব্যের মূল্য সমপরিমাণ ঋণ কাটা যায় এবং বিক্রেতা ও বন্ধকগ্রহীতার উপর তাগাদার দায় আবশ্যক হয় না। যখন বন্ধক

তাদের উপর তাগাদার দায় আবশ্যক হয় না, তখন কাফীলের উপর তাগাদার দায় কিরূপে আবশ্যক হবে? আর যখন কাফীলের উপর তাগাদার দায় আবশ্যক হয় না, তখন এ দু সুরতে কাফালাহ কিভাবে শুদ্ধ হবে ?

أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِنَفْسِهَا -এর ক্ষেত্রে যেহেতু মাকফূল আনহুর উপর তাগাদার দায় আবশ্যক হয়, তাই ফাসিদ বিক্রয়ের সুরতে বিক্রেতার কাছে হুবহু বিক্রয় দ্রব্য ফেরত দেওয়ার তাগাদা করা হবে। আর যদি হুবহু বিক্রয় দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার মূল্যের তাগাদা করা হবে। এমনিভাবে দরদামের পর্যায় কব্জাকৃত দ্রব্য ও চুরি / ডাকাতিকৃত দ্রব্য যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার মূল্যের তাগাদা করা হবে। শর্ত হলো উক্ত দ্রব্য مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ অর্থাৎ এমন দ্রব্য হতে হবে যার মতো হুবহু দ্রব্য নেই। যখন أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِنَفْسِهَا -এর তাগাদা মাকফূল আনহু থেকে হতে পারে তখন এর তাগাদা কাফীল থেকেও হতে পারবে। আর যখন কাফীল থেকে তার তাগাদা করা যাবে তখন তার কাফালাহও শুদ্ধ হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِغَيْرِهَا -এর কাফালাহ জায়েজ আর أَعْيَانٌ بِغَيْرِ مَضْمُوْنَةٍ এবং أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِنَفْسِهَا -এর কাফালাহ্ জায়েজ নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পর আমাদের বক্তব্য হলো, বিক্রেতার পক্ষ থেকে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল ক্রেতাকে বলবে যে, যদি বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি তার হুবহু দ্রব্যের কাফীল হলাম। এটা জায়েজ নয়। কেননা বিক্রয় দ্রব্য مَضْمُوْنٌ بِغَيْرِهٖ অর্থাৎ এমন বস্তু যা তার থেকে ভিন্ন কিছুর দ্বারা দায়বদ্ধ। আর একটু পূর্বে গেছে যে, أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِغَيْرِهَا -এর কাফালাহ্ আমাদের মতে জায়েজ নেই। তাই বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতার জন্য বিক্রয়দ্রব্যের কাফালাহ্ গ্রহণ শুদ্ধ নয়।

আর যদি أَعْيَانٌ مَضْمُوْنَةٌ بِغَيْرِهَا অর্থাৎ ভিন্ন কিছুর দ্বারা দায়বদ্ধ বস্তুকে অর্পণের কাফালাহ্ গ্রহণ করে আর বস্তুটিও এমন হয় যা অর্পণ করা ওয়াজিব (وَاجِبُ التَّسْلِيْمِ), উদাহরণত এক ব্যক্তি শুদ্ধ বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতার জন্য বিক্রয় দ্রব্য অর্পণের কাফীল হলো, অথবা বন্দকগ্রহীতার ঋণের মাল কজা করার পর বন্দকদাতার কাছে বন্ধকি দ্রব্য অর্পণের কাফীল হলো, অথবা ভাড়ায় নেওয়া জিনিস ভাড়ায় নেওয়া ব্যক্তির কাছে অর্পণ করার কাফীল হলো তাহলে এ কাফালাহ্ জায়েজ আছে। যদি বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে কাফীলের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ, এ সুরতে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিক্রেতার উপর ধার্যমূল্য (ثَمَنٌ) ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে।

এমনিভাবে ঋণ উসুল করার পর যদি বন্ধকি দ্রব্য বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে কাফীলের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে বন্ধকগ্রহীতার উপর ঋণের টাকা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে; যদি ঋণ বন্ধকি দ্রব্যের মূল্যের সমান হয় বা বন্ধকি দ্রব্যের মূল্য (قِيْمَةٌ) ঋণের চেয়ে বেশি হয়। কেননা ঋণের চেয়ে বন্ধকি দ্রব্যের মূল্য যেটুকু বেশি হবে তা বন্ধকগ্রহীতার কাছে আমানত হবে। আর আমানতের মাল আমানতকারীর বাড়াবাড়ি ছাড়া বিনষ্ট হলে তার জরিমানা দিতে হয় না।

এমনিভাবে যদি ভাড়ায় নেওয়া জিনিস ভাড়ায় দানকারী ব্যক্তির কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে কাফীলের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ সুরতে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মোটকথা, বস্তু যদি এমন হয় যা অর্পণ করা ওয়াজিব (وَاجِبُ التَّسْلِيْمِ) তাহলে তা অর্পণ করার কাফালাহ্ জায়েজ হবে। কেননা কাফীল নিজের উপর এমন কর্মের দায় আরোপ করেছে যা স্বয়ং মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব। বিক্রেতার উপর বিক্রয় দ্রব্য অর্পণ করা, বন্ধকগ্রহীতার উপর স্বীয় ঋণ উসুলের পর বন্ধকি দ্রব্য বন্ধকদাতার কাছে অর্পণ করা এবং ভাড়ায় দানকারীর উপর ভাড়ায় নেওয়া জিনিস অর্পণ করা ওয়াজিব। কাফীল ঐ কর্মকেই নিজের উপর ওয়াজিব করেছে যা তার মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব। আর যে কর্ম মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব হয় তার কাফীল হওয়া যেহেতু জায়েজ তাই যেসব বস্তু অর্পণ করা ওয়াজিব এমন বস্তুসমূহ অর্পণের কাফীল হওয়াও জায়েজ হবে।

আর যদি বস্তু এমন হয় যা অর্পণ করা স্বয়ং মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব নয়, যেমন আমানতের মাল, মুদারবা ও শিরকতের মাল, তাহলে এ ধরনের বস্তু অর্পণের কাফালাহ জায়েজ নয়। কেননা আমানতের মাল, মুদারাবা ও শিরকতের মালে তলবের সময় এটা ওয়াজিব যে, আমানতগ্রহীতা মালের মালিককে, মুদারিব রাব্বুল মালকে এবং এক অংশীদার অন্য অংশীদারকে কজা করা থেকে বাধা দেবে না; আমানতগ্রহীতা, মুদারিব এবং অংশীদারের নিজেদের অর্পণ করা ওয়াজিব নয়। যেহেতু অর্পণ করা স্বয়ং মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব নয়, সেহেতু কাফীলের উপরও অর্পণ ওয়াজিব হবে না। যখন কাফীলের উপর অর্পণ করা ওয়াজিব হবে না, তখন অর্পণের কাফীল হওয়াও শুদ্ধ হবে না।

وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ، وَالْحَمْلُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، وَكَذَا مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِخِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : কেউ যদি বহনের উদ্দেশ্যে কোনো পশু ভাড়া করে, আর তা যদি নির্দিষ্ট পশু হয় তাহলে বহনের কাফালাহ বৈধ হবে না। কেননা কাফীল এ থেকে অপারগ। আর যদি পশু অনির্দিষ্ট হয় তাহলে কাফালাহ জায়েজ। কেননা কাফীলের জন্য নিজস্ব পশুর উপরে বহন করা সম্ভব, আর বহনই ওয়াজিব হয়েছে। তদ্রূপ কেউ যদি সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো গোলাম ভাড়া করে, অতঃপর তার জন্য অপর কোনো লোক ঐ গোলামের সেবা প্রদানের কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে তা আমাদের পূর্ব বর্ণিত কারণে বাতিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ الخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি বহনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো পশু ভাড়া নেয়, আর অপর কেউ ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ভাড়ায় নেওয়া নির্দিষ্ট ঐ পশুর উপর বহনের কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে এ বহনের কাফালাহ জায়েজ হবে না। দলিল হলো, নির্দিষ্ট ঐ পশু যেহেতু কাফীলের মালিকানাধীন নয় তাই কাফীল নির্দিষ্ট ঐ পশুর উপর বহনে অপারগ। আর কাফীল যে কাজ করতে অপারগ তার কাফালাহ গ্রহণ যেহেতু বৈধ নয়, তাই নির্দিষ্ট পশুর উপর বহনের কাফালাহ গ্রহণও বৈধ হবে না। যদি পশু অনির্ধারিত হয় তাহলে বহনের কাফালাহ বৈধ হবে। কেননা এ কাফালাহ -এর কারণে বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো ওয়াজিব। আর কাফীল যেহেতু নিজস্ব পশুর উপর বহন করে বোঝা পৌছানোর সামর্থ্য রাখে, তাই এ কাফালাহ দুরস্ত হবে।

তদ্রূপ কেউ যদি খেদমতের উদ্দেশ্যে কোনো গোলাম ভাড়া নেয় আর অপর এক ব্যক্তি অনির্দিষ্ট গোলামের খেদমতের কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে এ কাফালাহ জায়েজ। কেননা এ কাফালাহ দ্বারা খেদমত ওয়াজিব হয়। আর কাফীল নিজস্ব গোলামের দ্বারা খেদমত করাতে সক্ষম। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট গোলামের খেদমতের কাফীল হয় তাহলে কাফালাহ জায়েজ হবে না। কেননা নির্দিষ্ট ঐ গোলাম কাফীলের মালিকানাধীন নয়, তাই কাফীল নির্দিষ্ট ঐ গোলামের দ্বারা খেদমত করাতে অপারগ। আর কাফীল যে কাজ করতে অপারগ তার কাফালাহ গ্রহণ যেহেতু বৈধ হয় না, তাই নির্দিষ্ট গোলামের খেদমতের কাফালাহ গ্রহণও বৈধ হবে না।

قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ اِلَّا بِقَبُوْلِ الْمَكْفُوْلِ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجُوْزُ اِذَا بَلَغَهُ فَأَجَازَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ الْاِجَازَةَ، وَالْخِلَافُ فِى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيْعًا، لَهُ أَنَّهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامٍ فَيَسْتَبِدُّ بِهِ الْمُلْتَزِمُ، وَهٰذَا وَجْهُ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَوَجْهُ التَّوَقُّفِ مَا ذَكَرْنَا فِى الْفُضُوْلِىْ فِى النِّكَاحِ، وَلَهُمَا أَنَّ فِيْهِ مَعْنَى التَّمْلِيْكِ، وَهُوَ تَمْلِيْكُ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ، فَيَقُوْمُ بِهِمَا جَمِيْعًا، وَالْمَوْجُوْدُ شَطْرُهُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ শুদ্ধ হবে না, যদি না মাকফূল লাহু মজলিসেই তা কবুল করে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কাফালাহ জায়েজ হবে, যদি তার কাছে সংবাদটি পৌছে যায় এবং সে তা অনুমোদন করে। কুদূরীর কোনো কোনো অনুলিপিতে অনুমোদনের শর্ত আরোপ করা হয়নি। উপরিউক্ত মতপার্থক্য কাফালাহ বিন নাফস এবং কাফালাহ বিল মাল উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, কাফালাহ চুক্তি স্বেচ্ছা দায়গ্রহণের একটি পদক্ষেপ। সুতরাং এ ব্যাপারে স্বেচ্ছা দায়গ্রহণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এ বর্ণনার এটাই দলিল। আর মাকফূল লাহুর অনুমোদনের উপর কাফালাহ চুক্তি মওকূফ থাকবে এর দলিল তাই যা আমরা বিবাহ অধ্যায়ে ফুযূলী [অনাহূত ব্যক্তি] সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, কাফালাহ চুক্তির মাঝে মালিকানা [ক্ষমতা] প্রদানের অর্থ রয়েছে। তা হলো মাকফূল লাহুকে কাফীলের পক্ষ থেকে তাগাদার মালিকানা [ক্ষমতা] প্রদান করা। আর এ চুক্তি উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হবে। অথচ এখানে চুক্তির অর্ধাংশ উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং মজলিসের পরবর্তী সময়ের উপর তা নির্ভরশীল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ اِلَّا بِقَبُوْلِ الْمَكْفُوْلِ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ বিল মাল হোক বা কাফালাহ বিন নাফস হোক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কাফালাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাকফূল লাহুর ঐ কাফালাহকে মজলিসের ভিতরে কবুল করতে হবে। যদি কাফালাহ -এর মজলিসে মাকফূল লাহু উক্ত কাফালাহকে কবুল না করে তাহলে কাফালাহ দুরস্ত হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একটি অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে যদি মাকফূল লাহু কাফালাহ -এর মজলিসে উপস্থিত না থাকে তাহলে কাফালাহ -এর বৈধতা তার অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকবে। যে মজলিসে তার কাছে এই কাফালাহ -এর সংবাদ পৌছবে ঐ মজলিসে যদি সে তা অনুমোদন করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। যদি অনুমোদন না করে তাহলে কাফালাহ শুদ্ধ হবে না। গ্রন্থকার (র.)-এর وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجُوْزُ اِذَا بَلَغَهُ فَأَجَازَ এ বক্তব্যের এটাই মর্মার্থ। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তিও অনুরূপ। দ্বিতীয় বর্ণনাটি তরফাইন (র.)-এর

মতের অনুরূপ অর্থাৎ কাফালাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মাকফূল লাহুর কবুল করা এবং তার অনুমোদন করা শর্ত নয়। শুধু কাফীলের উক্তি দ্বারাই তা সম্পন্ন হবে।

قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ تَصَرُّفُ اِلْتِزَامٍ فَيَسْتَبِدُّ بِهِ الْمُلْتَزِمُ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, কাফালাহ হলো কাফীলের নিজের উপর স্বেচ্ছা দায়গ্রহণের একটি পদক্ষেপ। আর স্বেচ্ছা দায়গ্রহণের সকল পদক্ষেপের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা দায়গ্রহণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ (مُسْتَقِلْ) ও স্বেচ্ছাধিকারী (مُسْتَبِدٌّ) হয়। এতে অন্য কারো প্রয়োজন হয় না। যেমন স্বীকারোক্তিকারী مُقِرٌّ স্বীকারোক্তি দান (اِقْرَارٌ) -এর মাধ্যমে নিজের উপর দায়গ্রহণ করে। অথচ স্বীকারোক্তি দানের ক্ষেত্রে সে স্বেচ্ছাধিকারী হয়। যার জন্য স্বীকারোক্তি (مُقَرٌّ لَهُ) তার তা কবুলের প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ মানতকারী মানতের মাধ্যমে নিজের উপর দায় আরোপ করে। অথচ মানতের ক্ষেত্রে সে স্বয়ং স্বেচ্ছাধিকারী। তা কারো কবুল করার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে কাফীলও নিজের উপর দায় আরোপ করে। সুতরাং কাফালাহ -এর ক্ষেত্রে সেও স্বেচ্ছাধিকারী হবে। মাকফূল লাহুর তা কবুল করার প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ وَوَجْهُ التَّوَقُّفِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْفُضُوْلِيْ فِي النِّكَاحِ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম বর্ণনার দলিল তা-ই যা আমরা বিবাহ অধ্যায়ে ফুযূলি [অনাহূত ব্যক্তির] ব্যাপারে উল্লেখ করেছি।' আর তা হলো, চুক্তি (عَقْدٌ) ইজাব ও কবুলের সমষ্টির নাম। তাই কাফালাহ চুক্তিতেও কাফীলের ইজাবের পর অর্থাৎ মাকফূল লাহুর কবুল করা আবশ্যক। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেহেতু চুক্তির অর্ধাংশ অর্থাৎ কবুল মজলিসের পরবর্তী সময়ের উপর মওকুফ হতে পারে তাই মাকফূল লাহুর কবুল করা ও অনুমোদন দেওয়াও মজলিসের পরবর্তী সময়ের উপর মওকুফ হতে পারে। তাই মাকফূল লাহু যদি কাফালাহ -এর মজলিসে উপস্থিত না থাকে তাহলে যে মজলিসে তার কাছে কাফালাহ -এর সংবাদ পৌছবে ঐ মজলিসে যদি কবুল করে এবং অনুমোদন দেয় তাহলে কাফালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ فِيْهِ مَعْنَى التَّمْلِيْكِ وَهُوَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, কাফালাহ চুক্তির মাঝে মালিকানা [ক্ষমতা] প্রদানের ব্যাপার আছে। কাফীল কাফালাহ চুক্তির মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে মাকফূল লাহুকে তাগাদার মালিকানা [ক্ষমতা] প্রদান করে। আর যে চুক্তিতে মালিকানা প্রদানের ব্যাপার থাকে তা মালিকানা প্রদানকারী এবং মালিকানা লাভকারী উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হবে। তাই কাফালাহ চুক্তি কাফীল ও মাকফূল লাহু উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হবে। যখন কাফালাহ চুক্তি কাফীল ও মাকফূল লাহু উভয়ের দ্বারা সম্পন্ন হবে তখন কাফীলের ইজাব এবং মাকফূল লাহুর কবুল দুটোই আবশ্যক হবে। আর তারফাইন (র.)-এর মতে চুক্তির অর্ধাংশ মজলিসের পরবর্তী সময়ের উপর মওকুফ থাকে না। চুক্তির উভয় অংশ মজলিসের ভিতরে পাওয়া গেলে চুক্তি শুদ্ধ হবে। তাই কাফালাহ চুক্তির মজলিসে কাফীল ও মাকফূল লাহু উভয়ের উপস্থিতি জরুরি এবং কাফীলের ইজাবের পর মাকফূল লাহুর কবুল আবশ্যক। অবশ্য মাকফূল লাহু যদি কাফালাহ -এর মজলিসে উপস্থিত না থাকে কিন্তু তার পক্ষ থেকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কাফীলের ইজাবকে কবুল করে এবং এ সংবাদ মাকফূল লাহুর কাছে পৌছার পর সে তা অনুমোদন করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে কাফালাহ জায়েজ হবে। আর যদি মজলিসে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিও ইজাবকে কবুল না করে তাহলে পরবর্তীতে মাকফূল লাহুর অনুমোদন কোনো কাজে আসবে না। -[আশরাফুল হিদায়া [উর্দু] খ. ৯ পৃ. ২১৭] মোটকথা, তারফাইন (র.)-এর মতে কাফালাহ-এর মজলিসে কাফীলের ইজাবের পর তা কবুল করা কাফালাহ চুক্তির শুদ্ধতার জন্য শর্ত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَالَ : إِلَّا فِىْ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِىَ أَنْ يَقُوْلَ الْمَرِيْضُ لِوَارِثِهِ : تَكَفَّلْ عَنِّىْ بِمَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ فَكَفَلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ جَازَ، لِأَنَّ ذٰلِكَ وَصِيَّةٌ فِى الْحَقِيْقَةِ، وَلِهٰذَا تَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَكْفُوْلَ لَهُمْ، وَلِهٰذَا قَالُوْا : إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ يُقَالُ : إِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّالِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ تَفْرِيْغًا لِذِمَّتِهِ، وَفِيْهِ نَفْعُ الطَّالِبِ، كَمَا إِذَا حَضَرَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُوْلُ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّحْقِيْقُ دُوْنَ الْمُسَاوَمَةِ ظَاهِرًا فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ، فَصَارَ كَالْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ، وَلَوْ قَالَ الْمَرِيْضُ ذٰلِكَ لِأَجْنَبِىٍّ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অবশ্য একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন। তা হলো, মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তি তার ওয়ারিশকে বলল যে, আমার উপর যে ঋণের দায় আছে তুমি আমার পক্ষ থেকে তার কাফীল হও। অতঃপর সে পাওয়নাদারদের অনুপস্থিতিতে উক্ত ঋণের কাফীল হলো তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা এটা মূলত অসিয়ত। এ কারণেই মাকফূল লাহুগণের নাম উল্লেখ ছাড়াই শুদ্ধ হবে। আর এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন যে, এ কাফালাহ চুক্তি শুদ্ধ হবে যদি অসুস্থ ব্যক্তির মাল থাকে। কিংবা বলা যায় যে, অসুস্থ ব্যক্তির ঋণ থেকে দায়মুক্তির প্রয়োজনে সে মাকফূল লাহুর স্থলবর্তী হবে। এতে মাকফূল লাহুরও ফায়দা আছে। সুতরাং মাকফূল লাহু স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যেরূপ কাফালাহ চুক্তি শুদ্ধ হয় তেমনি এ চুক্তিও শুদ্ধ হবে। অসুস্থ ব্যক্তির এ বক্তব্যে কাফালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং কবুলের শর্ত আরোপ করা হবে না। কেননা এ অবস্থায় বাহ্যতঃ এটাই স্বাভাবিক যে, চুক্তিটি বাস্তবায়নই তার উদ্দেশ্য, টালাবাহানা করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এটা বিবাহের আদেশের মতো হলো। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তি এ কথা ওয়ারিশ নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে বলে, সে ক্ষেত্রে এর শুদ্ধতা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতভিন্নতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ إِلَّا فِىْ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِىَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফালাহ চুক্তির শুদ্ধতার জন্য কাফালাহ-এর মজলিসে কাফীলের ইজাবের পর মাকফূল লাহুর তা কবুল করা শর্ত-এ বিধান কেবল একটি মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে তারফাইন (র.)-এর মতেও কাফালাহ - এর শুদ্ধতার জন্য কাফালাহ -এর মজলিসে মাকফূল লাহুর কবুল করা শর্ত নয়। তা হলো, মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তি তার ওয়ারিশকে বলল যে, আমার উপর যে ঋণের দায় আছে তুমি আমার পক্ষ থেকে তার কাফীল হও। অতঃপর সে পাওনাদারদের অনুপস্থিতিতে উক্ত ঋণের কাফীল হলো তাহলে তা ইসতিহসান হিসেবে (اِسْتِحْسَانًا) জায়েজ হবে। অবশ্য কিয়াস হিসেবে জায়েজ নেই। কারণ, সুস্থ ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিশকে বলে যে, আমার উপর যে ঋণের দায় আছে তুমি আমার পক্ষ থেকে তার কাফীল হও। অতঃপর সে পাওনাদারদের অনুপস্থিতিতে উক্ত ঋণের কাফীল হয় তাহলে তা জায়েজ হয় না। অতএব, মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তির বেলায়ও মাকফূল লাহুর মজলিসের ভিতরে কবুল করা ছাড়া কাফালাহ জায়েজ হবে না।

ইসতিহসানের যুক্তি দুটি−

১. ওয়ারিশকে লক্ষ্য করে মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তির এই বক্তব্য যে, تَكَفَّلْ عَنِّىْ بِمَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ 'আমার উপর যে ঋণের দায় আছে তুমি আমার পক্ষ থেকে তার কাফীল হও' এটা মূলত কাফালাহ নয়; বরং অসিয়ত অর্থাৎ تَكَفَّلْ عَنِّىْ -এর অর্থ اِقْضُوْا دُيُوْنِىْ 'আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।' আর ওয়ারিশগণের বক্তব্য− تَكَفَّلْنَا بِهَا 'আমরা ঋণের কাফীল হলাম' বলে যে উক্তি করেছে তার অর্থ হলো نَقْضِىْ دُيُوْنَكَ 'আমরা তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেব'। যেহেতু এ কাফালাহ

চুক্তিটি মূলত অসিয়ত (وَصِيَّةٌ) তাই পাওনাদারদের কাফালাহ-এর মজলিসে কবুল করা শর্ত নয়। কেননা, অসিয়তের শুদ্ধতার জন্য যাদের জন্য অসিয়ত করা হয় তাদের কবুল করা শর্ত নয়। তদ্রূপ মাকফূল লাহুগণের নামোল্লেখ ছাড়াই এ কাফালাহ শুদ্ধ হবে। অথচ কাফালাহ চুক্তিতে মাকফূল লাহু অজ্ঞাত হলে কাফালাহ ফাসিদ হয়ে যায়। এ কাফালাহ চুক্তি যেহেতু অসিয়ত এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, এ কাফালাহ তখনি দুরস্ত হবে যখন অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার এই পরিমাণ পরিত্যক্ত মাল থাকে যা দ্বারা অছি তথা ওয়ারিশ তার অসিয়ত কার্যকর করতে পারে। যদি মৃত্যুর সময় তার কাছে এ পরিমাণ মাল না থাকে তাহলে ওয়ারিশগণ থেকে তার ঋণ আদায় করা হবে না। অথচ কাফালাহ -এর জন্য এটা শর্ত নয় যে, মাকফূল আনহুর কাছে মাল থাকতে হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ কাফালাহ মূলত কাফালাহ নয়; বরং অসিয়ত। আর অসিয়তের জন্য যেহেতু যাদের জন্য অসিয়ত করা হয় (مُوْصٰى لَهٗ) তাদের কবুল করা শর্ত নয়, তাই এ কাফালাহ -এর শুদ্ধতার জন্যও মাকফূল লাহুগণের কবুল করা শর্ত নয়।

قَوْلُهٗ اَوْ يُقَالُ اِنَّهٗ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّالِبِ الخ :

২. ইহতিহসানের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, এ কাফালাহ চুক্তিতে একটি বিশেষ প্রয়োজনে অসুস্থ ব্যক্তিই মাকফূল লাহুর স্থলবর্তী। বিশেষ প্রয়োজন হলো ঋণ থেকে অসুস্থ ব্যক্তির জিম্মা দায়মুক্ত হওয়া। আর এ স্থলবর্তিতায় মূল মাকফূল লাহুর ফায়দা আছে। এভাবে তার ঋণ পরিশোধের একটি ব্যবস্থা হয়। সুতরাং এটা মাকফূল লাহুর স্বয়ং হাজির থাকার মতো হলো। মাকফূল লাহু স্বয়ং হাজির থেকে যদি অসুস্থ ব্যক্তির ওয়ারিশকে (وَارِثٌ) বলত, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে আমার জন্য কাফীল হও তাহলে যেরূপ এ কাফালাহ দুরস্ত হতো তেমনি আলোচ্য সুরতেও অসুস্থ ব্যক্তি মাকফূল লাহুর স্থলবর্তী হওয়ায় এ কাফালাহ দুরস্ত হবে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا يَصِحُّ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُوْلُ الخ : ইসতিহসানের উপরিউক্ত যুক্তির উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, কাফালাহ-এর শুদ্ধতার জন্য মাকফূল লাহুর যেরূপ কবুল করা শর্ত তেমনি মাকফূল লাহুর স্থলবর্তী হিসেবে অসুস্থ ব্যক্তির تَكَفَّلْ عَنِّيْ بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ বলার পর কাফালাহকে কবুল করাও শর্ত হওয়া উচিত। অন্যান্য মাসআলায়ও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে- بِعْنِيْ هٰذَا السَّمَكَ بِمِائَةٍ [তুমি আমার কাছে একশ টাকার বিনিময়ে এ মাছটি বিক্রি কর], উত্তরে বিক্রেতা যদি বলে, بِعْتُكَ [তোমার কাছে বিক্রি করলাম], এতেই বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয় না; বরং এরপর ক্রেতাকে বলতে হয় قَبِلْتُ [আমি কবুল করলাম]। তা না হলে এ বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। অতএব, আলোচ্য কাফালাহ চুক্তিও তখন শুদ্ধ হওয়া উচিত যখন অসুস্থ ব্যক্তির تَكَفَّلْ عَنِّيْ بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ বক্তব্যের জবাবে অছি تَكَفَّلْنَا বলে, এরপর অসুস্থ ব্যক্তি قَبِلْتُ [আমি কবুল করলাম] বলে।

উত্তর : গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির মুমূর্ষু অবস্থা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে কাফালাহ চুক্তি সম্পাদনের সুদৃঢ় ইচ্ছা করেছে। কেবল টালবাহানা বা দরাদরি করা তার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এটা বিবাহের আদেশের মতো। এক ব্যক্তি জনৈকা মহিলাকে বলল, زَوِّجِيْنِيْ نَفْسَكِ 'তুমি তোমাকে আমার বিবাহে দাও।' মহিলাটি দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলল, زَوَّجْتُ 'আমি বিবাহে দিলাম।' তাহলে দুজনের মাঝে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। মহিলার زَوَّجْتُ বলার পর পুরুষটির قَبِلْتُ 'আমি কবুল করলাম' বলার কোনো প্রয়োজন হয় না; বরং মহিলার زَوَّجْتُ 'আমি আমাকে তোমার বিবাহে দিলাম' এ কথাই ইজাব ও কবুল উভয়টার স্থলবর্তী হয়। কেননা বিবাহের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বিবাহ সম্পন্ন করা উদ্দেশ্য হয়, দরাদরি বা টালবাহানা উদ্দেশ্য হয় না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু নিশ্চিতভাবে কাফালাহ চুক্তি সম্পাদন উদ্দেশ্য তাই অসুস্থ ব্যক্তির تَكَفَّلْ عَنِّيْ بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ কথাই কাফালাহ-এর শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিক্রয় চুক্তি (بَيْعٌ) -এর ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা বিক্রয় চুক্তিতে দরাদরি করা হয়, তাই ক্রেতার بِعْنِيْ هٰذَا السَّمَكَ بِمِائَةٍ বক্তব্যটি তার কবুল করার স্থলবর্তী হবে না।

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ الْمَرِيْضُ ذٰلِكَ لِاَجْنَبِيٍّ الخ : যদি অসুস্থ ব্যক্তি تَكَفَّلْ عَنِّيْ بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ এ কথাটি ওয়ারিশ ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বলে তাহলে কাফালাহ চুক্তি শুদ্ধ হবে কিনা? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে শুদ্ধ হবে, আর কারো কারো মতে শুদ্ধ হবে না।

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالاَ : تَصِحُّ، لِاَنَّهُ كَفَلَ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ، لِاَنَّهُ وَجَبَ لِحَقِّ الطَّالِبِ، وَلَمْ يُوْجَدِ الْمُسْقِطُ، وَلِهٰذَا يَبْقٰى فِىْ حَقِّ أَحْكَامِ الْاٰخِرَةِ وَلَوْ تَبَرَّعَ بِهٖ اِنْسَانٌ يَصِحُّ وَكَذَا يَبْقٰى اِذَا كَانَ بِهٖ كَفِيْلٌ اَوْ مَالٌ وَلَهٗ اَنَّهٗ كَفَلَ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ، لِاَنَّ الدَّيْنَ هُوَ الْفِعْلُ حَقِيْقَةً، وَلِهٰذَا يُوْصَفُ بِالْوُجُوْبِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং কোনো সম্পদ রেখে না যায়, অতঃপর তার পক্ষ থেকে পাওনাদারদের জন্য কেউ কাফীল হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ কাফালাহ শুদ্ধ নয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, শুদ্ধ হবে। কেননা লোকটি [শরিয়তের দৃষ্টিতে এখনও বিদ্যমান ও] সাব্যস্ত একটি ঋণের কাফীল হয়েছে। সাব্যস্ত এজন্য যে, তা মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় মাকফূল লাহুর হকরূপে ওয়াজিব হয়েছে এবং এর রহিতকারী পাওয়া যায়নি। আর এ কারণেই তা আখেরাতের বিধানের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে। আর কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় এ ঋণ পরিশোধ করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির ঋণ তখনও অবশিষ্ট থাকে যদি ঋণের কোনো কাফীল থাকে বা মৃত ব্যক্তির সম্পদ থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কাফালাহ গ্রহণকারী একটি রহিত ঋণের কাফালাহ গ্রহণ করেছে। কেননা ঋণ মূলত একটি কর্ম। এ কারণেই তা ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ الخ : মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং কোনো সম্পদ রেখে না যায়, অতঃপর তার পক্ষ থেকে পাওনাদারদের জন্য ওয়ারিশদের কেউ বা তৃতীয় কোনো লোক কাফীল হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ কাফালাহ শুদ্ধ নয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, শুদ্ধ হবে। এটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কাফালাহ গ্রহণকারী শরিয়তের দৃষ্টিতে এখনো মৃত ব্যক্তির জিম্মায় বিদ্যমান ও সাব্যস্ত একটি ঋণের কাফীল হয়েছে। আর মাকফূল আনহুর জিম্মায় সাব্যস্ত ও বিদ্যমান ঋণের কাফালাহ সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। অতএব, এই কাফালাহও জায়েজ হবে।

মৃতব্যক্তির জিম্মায় ঋণ সাব্যস্ত এজন্য যে, তা মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় মাকফূল লাহুর হকরূপে ওয়াজিব হয়েছে এবং এর রহিতকারী পাওয়া যায়নি। যে ঋণ কারো জিম্মায় ওয়াজিব হয় তার রহিতকারী তিন জিনিস–

১. পাওনাদার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দিল।

২. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করে দিল।

৩. যে কারণে ঋণ ওয়াজিব হয়েছিল তা দূর হয়ে গেল। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুবরণ করার কারণে এ তিনটি বিষয়ের কোনোটিই পাওয়া যায়নি। যখন ঋণ রহিতকারী কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি তখন ঋণ মৃত ব্যক্তির জিম্মায় বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর

এ কারণেই তা আখেরাতের বিধানের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে। তাই কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে এবং ঋণ রহিতকারী কোনো জিনিস পাওয়া না গেলে আখেরাতে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এজন্য সে গুনাহগার হবে। যখন আখেরাতের বিধানের ক্ষেত্রে ঋণ অবশিষ্ট থাকে তখন দুনিয়ার বিধানেও অবশিষ্ট থাকবে।

ঋণ রহিতকারী কোনো জিনিস পাওয়া না গেলে দুনিয়ার বিধানেও মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ অবশিষ্ট থাকে এর একটি দলিল এটাও যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হয়। যদি মৃত্যুবরণ করার কারণে নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মা থেকে ঋণ রহিত হয়ে যেত তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় পরিশোধ করলে তার থেকে ঋণের অর্থ গ্রহণ করা পাওনাদারদের জন্য হালাল ও শুদ্ধ হতো না। অথচ সর্বসম্মতভাবে তা হালাল ও শুদ্ধ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রহিতকারী পাওয়া না গেলে ঋণ মৃত ব্যক্তির জিম্মায় বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকে।

এমনিভাবে মৃত্যুর পূর্ব থেকে যদি ঐ ঋণের কোনো কাফীল থাকে তাহলে মৃত্যুবরণ করার পরও ঋণ অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বসম্মতভাবে কাফীল থেকে ঐ ঋণ উসুল করা হয়। যদি মাল না রেখে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুবরণ করার কারণে ঋণ রহিত হয়ে যেত তাহলে কাফীলের জিম্মা থেকেও রহিত হয়ে যেত। কেননা মাকফূল আনহুর জিম্মা থেকে ঋণ রহিত হয়ে যাওয়া কাফীলের দায়মুক্ত হওয়াকে ওয়াজিব করে। অথচ কাফীল থেকে এ ঋণের তাগাদা রহিত হয় না। অতএব কাফীল থেকে মৃত ব্যক্তির ঋণ রহিত না হওয়াটা এ কথার প্রমাণ যে, মাল না রেখে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার কারণে ঋণ রহিত হয়ে যায় না; বরং বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকে।

এমনিভাবে যদি মৃত ব্যক্তির কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে তাহলে ঋণ পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে উসুল করা হয়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকে। মোটকথা, পরিত্যক্ত সম্পদ না রেখে যাওয়ার সুরতেও যেহেতু মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকে তাই তার পক্ষ থেকে কেউ কাফীল হলে তা শুদ্ধ হবে।

সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ 'জামিনদার দায়বদ্ধ'। এ হাদীসটি ব্যাপক। মাকফূল আনহুর জীবদ্দশায় কাফীল হোক বা মৃত্যুবরণ করার পর কাফীল হোক উভয় সুরতে কাফীল দায়বদ্ধ হবে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى بِجَنَازَةِ اَنْصَارِيٍّ فَقَالَ هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَقَالُوْا نَعَمْ دِرْهَمَانِ اَوْ دِيْنَارَانِ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَقَامَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَقَالَ هُمَا عَلَيَّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একজন আনসারী সাহাবীর জানাজা আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ সাথীর উপর কি কোনো ঋণ আছে? উপস্থিত লোকেরা বললেন, হ্যাঁ, দুই দিরহাম বা দুই দিনার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাজার নামাজ পড়, [আমি পড়ব না]। তখন হযরত আবূ কাতাদা (রা.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ঐ দুই দিরহাম বা দিনার আমার জিম্মায় অর্থাৎ আমি তার কাফীল হলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার নামাজ পড়লেন। –[মেশকাত]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পদ না রেখে মৃত্যুবরণ করে তার পক্ষ থেকে পাওনাদারদের জন্য কাফীল হওয়া জায়েজ। যদি জায়েজ না হতো তাহলে হযরত আবূ কাতাদা (রা.) -এর কাফালাহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মৃত আনসারী সাহাবীর জানাজা নামাজ পড়তেন না। কিন্তু যেহেতু কাফালাহ শুদ্ধ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন, তাই তিনি আনসারী সাহাবীর জানাজার নামাজ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَهُ اِنَّهُ كَفَلَ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ لِاَنَّ الدَّيْنَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (রা.) -এর দলিল হলো, ঋণের কাফালাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা মাকফূল আনহুর জিম্মায় বিদ্যমান ও সাব্যস্ত (ثَابِتٌ) হতে হবে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় মৃত নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত (ثَابِتٌ) নয়; বরং রহিত (سَاقِطٌ)। মৃত ব্যক্তির জিম্মা থেকে ঋণ রহিত এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে ঋণ মাল হয় না; বরং একটি কর্ম হয় অর্থাৎ পাওনাদারকে মাল পরিশোধ করা। তাকে মালের মালিক বানানো এবং মাল অর্পণ করার নাম হলো ঋণ। যেহেতু ঋণ প্রকৃতপক্ষে একটি কর্ম তাই ঋণকে ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত করা হয়; বলা হয় دَيْنٌ وَاجِبٌ 'ওয়াজিব ঋণ'। যেমন নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়– صَلٰوةٌ وَاجِبَةٌ 'ওয়াজিব নামাজ'। কারণ ওয়াজিব হওয়া বা মোস্তাহাব হওয়া এটা কর্ম (فِعْلٌ) -এর সিফত, বস্তু বা দ্রব্যের সিফত নয়। কেননা কোনো জিনিস ওয়াজিব হওয়ার মানে হলো ঐ জিনিস পালন করা আবশ্যক, পরিত্যাগ করা হলে পরিত্যাগকারী গুনাহগার হবে। পালন বা পরিত্যাগ কর্ম (فِعْلٌ) -এর ক্ষেত্রে হতে পারে, বস্তুর ক্ষেত্রে হতে পারে না। কারণ, বস্তু বান্দার ক্ষমতার ভিতরে নয়। আলোচ্য মাসআলায় পরিশোধ করা এবং মালের মালিক বানানো ছাড়া এমন কোনো কর্ম (فِعْلٌ) নেই যাকে ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। তাই এটা প্রমাণিত হয় যে, ঋণ একটি কর্ম, মাল নয়। মাল পরিশোধ করা এবং পাওনাদারকে তার মালিক বানানো এবং তার কাছে মাল অর্পণ করার নাম ঋণ। যেহেতু ঋণ একটি কর্ম আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করায় এবং তার স্থলবর্তী না থাকায় অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব থেকে কাফীল না থাকায় কিংবা সম্পদ রেখে না যাওয়ায় এ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয় এবং এর পরিণতিতে পাওনাদারদের পাওনা উসুল করার কোনো অবকাশ নেই, তাই অনিবার্যত দুনিয়াবি বিধানের হিসেবে তা মৃত ব্যক্তির জিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। যদি মৃত্যুর পূর্ব থেকে ঋণের কাফীল থাকত তাহলে কাফীলের মাধ্যমে এ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতো কিংবা যদি মাল রেখে যেত তাহলে ওয়ারিশগণের মাধ্যমে এ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতো। মাল রেখে না যাওয়ায় ওয়ারিশদের উপর মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা শরিয়ত কর্তৃক আবশ্যক নয়। মোটকথা, যখন মৃত ব্যক্তির জিম্মা থেকে ঋণ রহিত হয়ে গেল তখন এর কাফীল হওয়াও দুরস্ত নয়। কেননা মাকফূল আনহুর জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত না হলে কাফালাহ দুরস্ত হয় না।

لٰكِنَّهٗ فِى الْحُكْمِ مَالٌ، لِاَنَّهٗ يَؤُوْلُ اِلَيْهِ فِى الْمَالِ، وَقَدْ عَجَزَ بِنَفْسِهٖ، وَبِخَلْفِهٖ فَفَاتَ عَاقِبَةُ الْاِسْتِيْفَاءِ فَيَسْقُطُ ضَرُوْرَةً، وَالتَّبَرُّعُ لَا يَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ، وَاِذَا كَانَ بِهٖ كَفِيْلٌ اَوْ لَهٗ مَالٌ فَخَلْفُهٗ اَوِ الْاِفْضَاءُ اِلَى الْاَدَاءِ بَاقٍ ـ

অনুবাদ : অবশ্য আইনগত দিক থেকে ঋণ হলো মাল। কেননা পরিণতিতে তা সেদিকেই গড়ায়। আর লোকটি নিজে কিংবা স্থলবর্তী দ্বারা কর্মটি সম্পাদনে অপারগ হয়ে গেছে। সুতরাং তা উসুলের আর কোনো সুরত অবশিষ্ট থাকেনি। তাই অনিবার্যত তা রহিত হয়ে যাবে। আর অন্য কোনো ব্যক্তির স্বেচ্ছায় পরিশোধ করা ঋণের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে না। আর যদি ঋণের কোনো কাফীল থাকে অথবা মৃত ব্যক্তির সম্পদ থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির স্থলবর্তী অবশিষ্ট থাকল কিংবা পরিশোধের অবকাশ অবশিষ্ট থাকল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لٰكِنَّهٗ فِى الْحُكْمِ مَالٌ لِاَنَّهٗ يَؤُوْلُ اِلَيْهِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, পূর্বে গেছে যে, কর্ম (فِعْل) ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত হয়, বস্তু বা দ্রব্য ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত হয় না। অথচ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, মালও ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত হয়। বলা হয় اَلْمَالُ وَاجِبٌ 'মাল ওয়াজিব', 'অমুকের উপর এক হাজার টাকা ওয়াজিব।'

উত্তর : এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে যেহেতু মালকে রূপকার্থে (مَجَازًا) ঋণ বলা হয় তাই মালও ওয়াজিব বিশেষণে বিশেষিত হয়। অর্থাৎ ঋণ একটি কর্মেরই নাম কিন্তু ঐ কর্মের ফলশ্রুতিতে যেহেতু মাল লাভ হয় তাই রূপকার্থে মালকে ঋণ বলা হয়। যখন মালকে রূপকার্থে ঋণ বলা হয় তখন মালকে রূপকার্থে ওয়াজিব বিশেষণেও বিশেষিত করা হয়।

قَوْلُهٗ وَالتَّبَرُّعُ لَا يَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ : গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বেচ্ছায় নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা শুদ্ধ এটা এ কথার দলিল নয় যে, মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত। কেননা স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করার শুদ্ধতা মাকফূল আনহুর জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকার উপর মওকূফ নয়; বরং স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধকারী অর্থাৎ কাফীলের জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকার উপর মওকূফ। উদাহরণত ফরীদ বলল, শরীফ আরীফের কাছে এক হাজার টাকা পাবে এবং আমি তার কাফীল। মাকফূল আনহু অর্থাৎ আরীফ যদি এক হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত হওয়ার কথা অস্বীকারও করে তাহলেও এ সুরতে কাফালাহ শুদ্ধ হবে এবং কাফীল অর্থাৎ ফরীদের উপর এক হাজার টাকা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। অথচ এ সুরতে মাকফূল আনহুর জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বেচ্ছায় মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ মাকফূল আনহুর জিম্মায় বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকা জরুরি নয়। যেহেতু স্বেচ্ছায় মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ মাকফূল আনহুর জিম্মায় বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকা জরুরি নয়, তাই নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ শুদ্ধ হওয়া এ কথার দলিল নয় যে, নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ بِهِ كَفِيْلٌ أَوْ لَهُ مَالٌ الخ : وَكَذَا يَبْقَى إِذَا গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে সাহেবাইন (র.) -এর দ্বিতীয় দলিল- كَانَ بِهِ كَفِيْلٌ أَوْ مَالٌ -এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঋণ একটি কর্ম। এ কর্ম সম্পাদনের জন্য সক্ষমতা শর্ত, চাই মাকফূল আনহু স্বয়ং এ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হোক বা তার স্থলবর্তী ও প্রতিনিধির মাধ্যমে সক্ষম হোক। মৃত্যুর পূর্বে নিয়োগকৃত কাফীল ও পরিত্যক্ত সম্পদ মৃত মাকফূল আনহুর স্থলবর্তী বলে গণ্য। তাই মৃত্যুর পূর্ব থেকে যদি কাফীল থাকে অথবা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে তাহলে মাকফূল লাহু যদিও স্বয়ং উক্ত কর্ম সম্পাদনে সক্ষম নয়; কিন্তু তার স্থলবর্তীর মাধ্যমে উক্ত কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। যদি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব থেকে কাফীল থাকে তাহলে কাফীল থেকে ঋণ উসূল করা হয়। আর যদি কাফীল না থাকে, কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পদ থাকে তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ উসূল করা হয়। যেহেতু এ দু সুরতে ঋণ-কর্ম সম্পাদনে মৃত ব্যক্তি সক্ষম, তাই তার জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত থাকবে। যদি পূর্ব থেকে কাফীল না থাকে কিংবা পরিত্যক্ত সম্পদ না থাকে তাহলে যেহেতু মৃত ব্যক্তি তার ঋণ-কর্ম সম্পাদনে কোনোভাবেই সক্ষম নয়, তাই তার জিম্মায় ঋণ বিদ্যমান ও সাব্যস্ত হবে না; বরং রহিত (سَاقِطٌ) হবে। আর রহিত ঋণের যেহেতু কাফালাহ শুদ্ধ নয়, তাই আলোচ্য সুরতে অর্থাৎ নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে কেউ কাফালাহ গ্রহণ করলে তা শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে সাহেবাইন (র.)-এর পেশকৃত প্রথম হাদীসের জবাব হলো, اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ 'কাফীল দায়বদ্ধ' এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, কাফীল যে জিনিসের শুদ্ধভাবে কাফালাহ গ্রহণ করবে সে তার দায়বদ্ধ হবে। আর একটু পূর্বেই গেছে যে, মৃত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে না গেলে তার পক্ষ থেকে কাফালাহই শুদ্ধ হবে না। অতএব, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের বিপক্ষে দলিল প্রদান সঠিক নয়।

দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ আছে কিনা? এ জিজ্ঞাসার জবাবে উপস্থিত সাহাবীগণ দুই দিরহাম বা দুই দিনার ঋণ থাকার কথা বলেছেন। মৃত আনসারী সাহাবী এ দুই দিরহাম পরিশোধের ব্যবস্থা করে যাননি মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাজার নামাজ পড়তে অস্বীকৃতি জানালেন তখন হযরত আবূ কাতাদা (রা.) জানালেন, মৃত সাহাবী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে গেছেন এবং আমাকে কাফীল বানিয়েছেন। মূলত হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর কথা هُمَا عَلَيَّ তার সাবেক কাফালাতের স্বীকারোক্তি (إِقْرَارٌ), তাৎক্ষণিক কাফালাহ গ্রহণ করা নয়। অতএব, আলোচ্য হাদীস থেকে নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফালাহ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

قَالَ : وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ فَقَضَاهُ الْأَلْفَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْقَابِضِ عَلَى احْتِمَالِ قَضَائِهِ الدَّيْنَ فَلَا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ مَا بَقِيَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ، كَمَنْ عَجَّلَ زَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إِلَى السَّاعِي وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا نَذْكُرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ، لِأَنَّهُ تَمَحَّضَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، وَإِنْ رَبِحَ الْكَفِيلُ فِيهِ فَهُوَ لَهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ أَمَّا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا قَضَى الْمَطْلُوبُ بِنَفْسِهِ وَثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلطَّالِبِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ أُخِّرَتِ الْمُطَالَبَةُ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَلِهٰذَا لَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ الْمَطْلُوبَ قَبْلَ أَدَائِهِ يَصِحُّ، فَكَذَا إِذَا قَبَضَهُ يَمْلِكُهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ نَوْعَ خُبْثٍ نُبَيِّنُهُ، فَلَا يَعْمَلُ مَعَ الْمِلْكِ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার জিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়, অতঃপর পাওনাদারকে উক্ত এক হাজার দিরহাম প্রদানের পূর্বেই মাকফূল আনহু তাকে তা পরিশোধ করে দেয় তাহলে মাকফূল আনহু এক হাজার দিরহাম ফেরত গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা কাফীল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রদত্ত এক হাজার দিরহামের সাথে কজাকারী কাফীলের হক জড়িত হয়ে গেছে। সুতরাং এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত [উক্ত এক হাজার দিরহাম ফেরত] চাওয়া জায়েজ নয়। যেমন কেউ [বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে] আগেভাগে জাকাত আদায় করল এবং জাকাতের মাল দায়িত্বপ্রাপ্ত উসুলকারীর কাছে হস্তান্তর করল। [এ সুরতেও জাকাত প্রদানকারী মাল ফেরত চাইতে পারে না।] তাছাড়া দখল গ্রহণের মাধ্যমে কাফীল উক্ত এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে গেছে, যেমন পরবর্তীতে আমরা তা উল্লেখ করব। কিন্তু কাফীলের কাছে [এক হাজার দিরহাম] হস্তান্তর যদি বাহক হিসেবে হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে উক্ত দিরহাম কাফীলের হাতে নিছক আমানত হবে। যদি কাফীল কজাকৃত এক হাজার দিরহাম দ্বারা মুনাফা করে তাহলে সেটা তারই হবে, তা সদকা করে দিতে হবে না। কেননা যখন সে দখল গ্রহণ করেছে তখন সে তার মালিক হয়ে গেছে। যদি সে ঋণ পরিশোধ করে থাকে তাহলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি মাকফূল আনহু নিজেই [ঋণ] পরিশোধ করে দেয় এবং তার জন্য [উক্ত এক হাজার দিরহাম কাফীল থেকে] ফেরত নেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়। কেননা কাফীলের উপর মাকফূল লাহুর জন্য যা ওয়াজিব কাফীলের জন্যও মাকফূল আনহুর উপর তা ওয়াজিব। তবে [মাকফূল আনহু থেকে] তাগাদাকে [কাফীলের মাকফূল লাহুকে] পরিশোধ করা পর্যন্ত সময়ের জন্য বিলম্বিত করা হয়েছে। সুতরাং [মাকফূল আনহুর কাছে] কাফীলের পাওনাকে মেয়াদি ঋণ [দাইনে মুআজ্জাল] বলে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই যদি কাফীল ঋণ পরিশোধের পূর্বেই মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে। তদ্রূপ যদি সে উক্ত দিরহামগুলো কজা করে তাহলে তার মালিক হয়ে যাবে। তবে এতে সামান্য দোষ আছে, পরে আমরা তা বর্ণনা করব। কিন্তু যে মাল নির্ধারণযোগ্য নয়, মালিকানা থাকলে তাতে সেই দোষ বিবেচ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ الخ - মাসআলা : কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার জিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়, অতঃপর পাওনাদারকে উক্ত এক হাজার দিরহাম প্রদানের পূর্বেই মাকফূল আনহু তাকে তা পরিশোধ করে দেয় তাহলে মাকফূল আনহু কাফীল থেকে এক হাজার দিরহাম ফেরত চাইতে পারবে না। উদাহরণত ওয়াহিদ ঋণগ্রস্ত, শামীল তার কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। ওয়াহিদ ফরীদকে বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে শামীলের জন্য এক হাজার দিরহামের কাফীল হও। ফরীদ কাফীল হলো। কিন্তু শামীলকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করার পূর্বেই ওয়াহিদ ফরীদকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিল। এখন যদি ওয়াহিদ ফরীদকে প্রদত্ত এক হাজার দিরহাম ফেরত নিতে চায় তা তার জন্য বৈধ হবে না। গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলার পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন–

১. قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْقَابِضِ عَلَى احْتِمَالِ الخ : কাফীল মাকফূল লাহুকে ঋণের এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দিয়েছে এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক হাজার দিরহামের দখল বুঝে নেওয়ায় তার সঙ্গে কাফীলের হক জড়িত হয়ে গেছে। বিপরীত সম্ভাবনাও এ ক্ষেত্রে রয়েছে। অর্থাৎ কাফীল ঋণের এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করেছে এর যেমন সম্ভাবনা আছে তেমনি পরিশোধ করেনি এর সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি পরিশোধ করেনি এ সম্ভাবনার দিক দেখা হয় তাহলে প্রদত্ত এক হাজার দিরহামের সঙ্গে কাফীলের হক জড়িত হয় না। আর যদি পরিশোধ করেছে এ সম্ভাবনার দিক দেখা হয় তাহলে কাফীলের হক জড়িত হয়। যেহেতু কোনোটাই নিশ্চিত নয়; বরং পরিশোধ করেছে এর সম্ভাবনা বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফীলের কাছে মাকফূল আনহু তার প্রদত্ত এক হাজার দিরহাম ফেরত চাইতে পারবে না। এ সম্ভাবনা দূর হওয়ার একটি সুরত হলো মাকফূল আনহু স্বয়ং তার ঋণ মাকফূল লাহুকে পরিশোধ করে দেওয়া। তাই কাফীলকে এক হাজার দিরহাম প্রদানের পর মাকফূল আনহু নিজেই যদি তার ঋণ মাকফূল লাহুকে পরিশোধ করে তাহলে কাফীলকে প্রদত্ত এক হাজার দিরহামের সাথে কাফীলের হক জড়িত হবে না। কাজেই মাকফূল আনহু তার কাছ থেকে উক্ত এক হাজার দিরহাম ফেরত নিতে পারবে।

এর উপমা হলো, এক ব্যক্তি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে জাকাত আদায় করল এবং জাকাতের মাল দায়িত্বপ্রাপ্ত উসুলকারীর কাছে হস্তান্তর করল। তাহলে জাকাত প্রদানকারী এ মাল ফেরত নিতে পারবে না। কেননা উক্ত মালের সঙ্গে এ অর্থে কব্জাকারী অর্থাৎ জাকাত উসুলকারীর হক জড়িত হয়ে গেছে যে, সম্ভবত পূর্ণ নিসাবের মালিক রূপেই জাকাত প্রদানকারীর বছর অতিক্রান্ত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাত প্রদানকারী জাকাত উসুলকারী থেকে তার প্রদত্ত মাল ফেরত নিতে পারবে না।

২. قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا نَذْكُرُ : কাফীল কব্জা করার কারণে এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে গেছে। আর এটা স্বীকৃত বিষয় যে, কেউ অপরের মালিকানাধীন জিনিস ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে না। সুতরাং মাকফূল আনহুও তার প্রদত্ত এক হাজার দিরহাম ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না।

কব্জা করার কারণে কাফীল এক হাজার দিরহামের মালিক হয়ে গেছে। কারণ, কাফালাহ চুক্তির কারণে কাফীলের উপর মাকফূল লাহুর জন্য যে মাল ওয়াজিব হয়, কাফীলের জন্যও মাকফূল আনহুর উপর ঐ পরিমাণ মাল ওয়াজিব হয়। তবে মাকফূল আনহু থেকে কাফীলের তাগাদাকে কাফীলের মাকফূল লাহুকে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে এবং মাকফূল আনহুর কাছে কাফীলের পাওনাকে মেয়াদি ঋণ [দাইনে মুআজ্জাল] বলে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই যদি কাফীল ঋণ পরিশোধের পূর্বেই মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে। যদি কাফীলের জন্য মাকফূল আনহুর উপর কোনো মাল ওয়াজিব না হতো তাহলে মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করা শুদ্ধ হতো না। অতএব, মাকফূল আনহুর উপর কাফীলের জন্য যে মাল ওয়াজিব তা তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত হলে কাফীলের কব্জা পাওয়া গেলে কাফীল মালিক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الدَّفْعُ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ الخ : হ্যাঁ, যদি মাকফূল আনহু কাফীলকে নিছক বাহক হিসেবে এক হাজার টাকা প্রদান করে, উদাহরণত মাকফূল আনহু কাফীলকে বলল,'এই এক হাজার টাকা নাও, মাকফূল লাহুকে দিয়ে আস', তাহলে কব্জা করার পর কাফীল এ এক হাজার টাকার মালিক হবে না; বরং এ টাকা কাফীলের হাতে আমানত হবে। আর আমানতের টাকা মালিক যখন ইচ্ছা ফেরত চাইতে পারে। তাই মাকফূল আনহু কাফীল থেকে এ এক হাজার টাকা ফেরত চাইতে পারে।

قَوْلُهُ وَإِنْ رَبِحَ الْكَفِيلُ فِيهِ فَهُوَ لَهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الخ : যদি মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করার পূর্বেই কাফীলকে মাকফূল আনহু এক হাজার টাকা প্রদান করে এবং কাফীল উক্ত টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা করে তাহলে এ মুনাফা কাফীলের জন্য হালাল হবে, এটা সদকা করা কাফীলের উপর ওয়াজিব নয়। দলিল হলো, কাফীল এক হাজার টাকা কব্জা করায় তার মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং সে তার মালিকানাধীন মাল ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা করেছে। মালিকানাধীন মাল থেকে অর্জিত মুনাফা যেহেতু মালিকের জন্য হালাল হয় এবং তার উপর তা সদকা করা ওয়াজিব নয়, তাই আলোচ্য মাসআলায় কাফীলের জন্য উক্ত এক হাজার টাকা দ্বারা অর্জিত মুনাফা হালাল হবে এবং তার উপর তা সদকা করা ওয়াজিব হবে না।

তবে প্রশ্ন হলো, কাফীল এক হাজার টাকা কব্জা করায় তার মালিক কেন হয়? গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি কাফীল মাকফূল আনহুর ঋণ পরিশোধ করে থাকে তাহলে মালিক হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা সে ক্ষেত্রে কাফীলের কব্জাকৃত এক হাজার দিরহাম হলো ঐ মাল যা কাফালাহ চুক্তির কারণে মাকফূল আনহুর উপর কাফীলের জন্য ওয়াজিব হয়েছিল। আর কোনো ব্যক্তি যদি এমন মাল কব্জা করে যা সে অন্যের কাছে পাওনা ছিল, তাহলে কব্জা করার সাথে সাথেই সে তার মালিক হয়ে যায়। অতএব, মাকফূল আনহু প্রদত্ত এক হাজার টাকা কব্জার পূর্বেই যদি কাফীল মাকফূল আনহুর ঋণ পরিশোধ করে থাকে তাহলে কাফীল এক হাজার টাকা কব্জা করতেই তার মালিক হয়ে গেছে।

আর যদি মাকফূল আনহুর দেওয়া টাকা কব্জার পরে মাকফূল আনহু নিজেই মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করে দেয় এবং কাফীলকে দেওয়া মাল ফেরত নেওয়ার ক্ষমতা লাভ করে, এ সুরতে কাফীল উক্ত টাকা কব্জা করার দ্বারা এজন্য মালিক হবে যে, শুধু কাফালাহ চুক্তির কারণেই কাফীলের উপর মাকফূল লাহুর জন্য যে ঋণ পরিশোধ ওয়াজিব হয় কাফীলের জন্যও মাকফূল আনহুর উপর উক্ত ঋণ পরিমাণ মাল ওয়াজিব হয়। তবে মাকফূল আনহু থেকে কাফীলের তাগাদাকে কাফীলের মাকফূল লাহুকে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়। তাই মাকফূল আনহুর কাছে কাফীলের পাওনাকে মেয়াদি ঋণ [দাইনে মুআজ্জাল] বলে গণ্য করা হয়েছে। মেয়াদি ঋণ থেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেহেতু দায়মুক্ত করা যায়, এ কারণেই যদি কাফীল ঋণ পরিশোধের পূর্বে মাকফূল আনহুকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হয়। মেয়াদি ঋণ যেরূপ মেয়াদান্তে দেওয়া যায়, তেমনি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেও দেওয়া যায়। মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধের পূর্বে মাকফূল আনহু কর্তৃক কাফীলকে প্রদত্ত এক হাজার টাকা মূলত ঐ মেয়াদি ঋণই পরিশোধ করা, তবে পরিশোধটা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে হয়েছে। আর কোনো ব্যক্তি যদি এমন মাল কব্জা করে, যা সে অন্যের কাছে পাওনা ছিল তাহলে কব্জা করার সাথে সাথেই সে তার মালিক হয়ে যায়। অতএব, মাকফূল আনহু প্রদত্ত এক হাজার টাকা কব্জার পূর্বে যদি কাফীল মাকফূল আনহুর ঋণ পরিশোধ নাও করে থাকে তাহলেও কাফীল উক্ত টাকা কব্জা করতেই তার মালিক হয়ে যাবে।

অবশ্য মাকফূল আনহু যদি নিজেই মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করে দেয় আর কাফীল মাকফূল আনহু কর্তৃক দেওয়া এক হাজার টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবানুসারে উক্ত মুনাফায় কিছুটা দোষ আছে। সামনের মাসআলায় তা আলোচিত হবে। তবে এ দোষ নির্ধারণযোগ্য নয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর নয়, যদি মুনাফা লাভকারী ঐ জিনিসের মালিক হয়। মুদ্রা ও টাকা-পয়সা নির্ধারণযোগ্য জিনিস নয়। অতএব, মাকফূল আনহু প্রদত্ত এক হাজার টাকা থেকে অর্জিত মুনাফা কাফীলের জন্য হালাল হবে। আর যদি নির্ধারণযোগ্য জিনিস হয় তাহলে উক্ত দোষ কার্যকরী প্রভাব রাখে। সামনের মাসআলায় এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে। ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের ফাসিদ বিক্রয় পরিচ্ছেদে এর বিস্তারিত আলোচনা গেছে।

وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ فَقَبَضَهَا الْكَفِيلُ فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيهَا فَالرِّبْحُ لَهُ فِي الْحُكْمِ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَهُ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ الْكُرَّ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ : أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح)، هُوَ لَهُ : وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، لَهُمَا أَنَّهُ رِبْحٌ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فَيُسَلَّمُ لَهُ، وَلَهُ أَنَّهُ تَمَكَّنَ الْخُبْثُ مَعَ الْمِلْكِ، أَمَّا لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنَ الْاِسْتِرْدَادِ بِأَنْ يَقْضِيَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ عَلَى اعْتِبَارِ قَضَاءِ الْكَفِيلِ، فَإِذَا قَضَاهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ، وَهٰذَا الْخُبْثُ يَعْمَلُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ، فِي رِوَايَةٍ، وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ، لِأَنَّ الْخُبْثَ لِحَقِّهِ، وَهٰذَا أَصَحُّ، لٰكِنَّهُ اِسْتِحْبَابٌ لَا جَبْرٌ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি কাফালাহ এক ধামা গমের হয়, কাফীল তাই কজা করে বিক্রি করে এবং তাতে মুনাফা করে তাহলে আইনের বিচারে মুনাফা তারই হবে। কেননা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, সে মালিক হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমার পছন্দ হলো মুনাফাটা তার কাছেই ফেরত দেওয়া, যে এক ধামা গম তাকে দিয়েছিল। তবে আইনের বিচারে এটা তার উপর ওয়াজিব নয়। জামিউস সাগীরের বর্ণনা অনুসারে এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এই মুনাফা তারই এবং তা ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে না, যে তাকে এক ধামা গম দিয়েছে। এটাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেকটি বর্ণনা হলো, কাফীল এ মুনাফা সদকা করে দেবে। সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, আমরা ইতঃপূর্বে যে সূত্র বর্ণনা করেছি সেই সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার মাল দ্বারা কাফীল মুনাফা অর্জন করেছে। সুতরাং তা তার জন্য নিরাপদ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মালিকানা থাকা সত্ত্বেও মুনাফাতে দোষ সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়তো এজন্য যে, মাকফূল আনহু স্বয়ং মাকফূল লাহুকে এক ধামা গম পরিশোধ করে দেওয়ায় এই এক ধামা গম ফেরত নেওয়ার অধিকার তার অর্জিত হয়েছে। কিংবা এজন্য যে, মাকফূল আনহু কাফীলের মালিক হওয়ার উপর এজন্য সম্মত হয়েছিল যে, কাফীল মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু যখন মাকফূল আনহু নিজেই তা পরিশোধ করল তখন সে কাফীলের মালিক হওয়ার উপর সম্মত নয়। আর এ দোষ নির্ধারণযোগ্য মালের ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রভাব রাখে। তাই এক বর্ণনা মতে, তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় হলো সদকা করে দেওয়া। অপর বর্ণনা মতে, কাফীল মাকফূল আনহুকে মুনাফা ফেরত দেবে। কেননা মাকফূল আনহুর হকের কারণেই দোষ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। অবশ্য এ হুকুম মোস্তাহাব, বাধ্যতামূলক নয়। কেননা হক তো তারই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنْطَةٍ الخ : যদি এমন জিনিসের কাফালাহ হয় যা নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়, উদাহরণত এক ব্যক্তি এক ধামা (كر) গমের কাফীল হলো। কাফীল মাকফূল লাহুকে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাকফূল আনহু কাফীলকে এক ধামা গম দিল। অথচ কাফীল ঋণ পরিশোধ করেনি। কাফীল মাকফূল আনহু কর্তৃক প্রাপ্ত এই এক ধামা গমে ব্যবসা করে কিছু মুনাফা অর্জন করল। এ মুনাফা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

১. মাবসূত গ্রন্থের বিক্রয় পর্বে আছে যে, অর্জিত মুনাফা কাফীলের। এটা সদকাও করতে হবে না, মাকফূল আনহুকে ফেরতও দিতে হবে না। এটাই সাহেবাইন (র.) -এর মাযহাব।

২. মাবসূতের কাফালাহ পর্বের বর্ণনা হলো, অর্জিত মুনাফা কাফীলের জন্য জায়েজ নেই। তাই সে তা সদকা করে দেবে।

৩. জামিউস সাগীরের বর্ণনা হলো, অর্জিত মুনাফা কাফীলের। তবে তাঁর পছন্দ হলো, কাফীল মুনাফা মাকফূল আনহুকে ফেরত দেবে।

প্রথম বর্ণনা ও সাহেবাইন (র.) -এর মাযহাবের দলিল হলো, لَهُمَا اَنَّهُ رَبِحَ فِيْ مِلْكِهِ عَلَى الخ : কাফীল নিজ মালিকানাধীন জিনিসের ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করেছে। আর কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন জিনিসের ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করলে তা তারই হয়। তাই এক ধামা গম দ্বারা কাফীল যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তারই হবে, তা সদকা করাও তার উপর ওয়াজিব হবে না এবং মাকফূল আনহুকেও তা ফেরত দিতে হবে না। কাফীল এক ধামা গমের মালিক কিভাবে হচ্ছে তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, وَلَهُ اَنَّهُ تَمَكَّنَ الْخُبْثُ مَعَ الْمِلْكِ اَمَّا الخ : এক ধামা গমের মালিকানা কাফীলের হওয়া সত্ত্বেও দুটির যে কোনো একটি কারণে মুনাফায় দোষ (خُبْث) সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো, মাকফূল আনহু থেকে প্রাপ্ত এক ধামা গমে কাফীলের মালিকানা সন্দেহপূর্ণ (مُتَرَدَّدٌ) অর্থাৎ এ গমে তার মালিকানা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কেননা হতে পারে কাফীলকে এক ধামা গম দেওয়ার পর মাকফূল আনহু নিজেই মাকফূল লাহুকে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। ফলে সে কাফীলকে দেওয়া গমগুলো ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করেছে। সে ক্ষেত্রে গমে কাফীলের মালিকানা থাকবে না। এ ধরনের সম্ভাবনা থাকায় উক্ত গমে কাফীলের মালিকানা সন্দেহপূর্ণ। আর এ ধরনের মালিকানা হলো অসম্পূর্ণ মালিকানা (اَلْمِلْكُ الْقَاصِرُ)। সুতরাং যেন কাফীল অসম্পূর্ণ মালিকানার মাল দ্বারা মুনাফা অর্জন করেছে। যদি কাফীল অন্যের মালিকানার মাল দ্বারা মুনাফা অর্জন করত তাহলে তা দোষযুক্ত (خُبْث) ও হারাম হতো। কিন্তু অসম্পূর্ণ মালিকানা থাকায় তাতে দোষের সম্ভাবনা (شُبْهَةُ الْخُبْثِ) আছে। আর দোষের সম্ভাবনাও দোষের মতো পরিত্যজ্য। তাই কাফীল উক্ত মুনাফা সদকা করে দেবে।

অপরটি হলো, এক ধামা গমে মাকফূল আনহু কাফীলের মালিক হওয়ার উপর এজন্য সম্মত হয়েছিল যে, কাফীল মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু যখন মাকফূল আনহু নিজেই তা পরিশোধ করল তখন সে কাফীলের মালিক হওয়ার উপর সম্মত নয়। তাই যেন কাফীল অন্যের মালিকানার মাল দ্বারা মুনাফা অর্জন করেছে। আর অন্যের মালিকানার মাল দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয় তা দোষযুক্ত (خُبْث) ও হারাম হয়। তাই কাফীলের অর্জিত মুনাফা দোষযুক্ত (خُبْث) হবে। আর যে মাল নির্ধারণযোগ্য (قَابِلُ التَّعْيِيْنِ) অর্থাৎ নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়– যেমন বস্তু সামগ্রী (اَعْيَانٌ), তার ক্ষেত্রে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও দোষ (خُبْث) কার্যকরী প্রভাব রাখে। এক ধামা গম যেহেতু নির্ধারণযোগ্য মাল তাই তার মুনাফায় দোষ কার্যকরী প্রভাব রাখে অর্থাৎ মুনাফা দোষযুক্ত হবে। আর যে মাল দোষযুক্ত হয় তাকে সদকা করে দিতে হয়, তাই এ মুনাফা কাফীলের জন্য হালাল হবে না বরং এটা সদকা করে দিতে হবে। –[বিনায়া : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭-৫৮৯]

তৃতীয় বর্ণনার দলিল হলো, উক্ত মুনাফাতে যে দোষ (خُبْث) সৃষ্টি হয়েছে তা মাকফূল আনহুর হকের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, শরিয়তের হকের কারণে নয়। যেহেতু মাকফূল আনহুর হকের কারণে তাতে দোষ সৃষ্টি হয়েছে তাই তা মাকফূল আনহুকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মাকফূল আনহুকে ফেরত দেওয়ার দ্বারা হক স্বীয় হকদারের কাছে পৌছে যাবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, তৃতীয় বর্ণনা বিশুদ্ধতম। তবে মাকফূল আনহুকে উক্ত মুনাফা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি মোস্তাহাব, এতে বাধ্যবাধকতা নেই। তাই বিচারক উক্ত মুনাফা মাকফূল আনহুকে ফেরত দানের ক্ষেত্রে কাফীলকে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ, ব্যাপার যাই হোক এক ধামা গমের মালিক কাফীলই।

قَالَ : وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِاَلْفٍ عَلَيْهِ بِاَمْرِهٖ فَاَمَرَهُ الْاَصِيْلُ اَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَرِيْرًا فَفَعَلَ فَالشِّرَاءُ لِلْكَفِيْلِ، وَالرِّبْحُ الَّذِىْ رَبِحَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ الْاَمْرُ بِبَيْعِ الْعِيْنَةِ، مِثْلُ اَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ تَاجِرٍ عَشَرَةً فَيَتَابٰى عَلَيْهِ، وَيَبِيْعُ مِنْهُ ثَوْبًا يُسَاوِىْ عَشَرَةً بِخَمْسَةِ عَشَرَ مَثَلًا رَغْبَةً فِىْ نَيْلِ الزِّيَادَةِ لِيَبِيْعَهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِعَشَرَةٍ، وَيَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ خَمْسَةً سُمِّىَ بِهٖ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاِعْرَاضِ عَنِ الدَّيْنِ اِلَى الْعَيْنِ، وَهُوَ مَكْرُوْهٌ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاِعْرَاضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْاِقْرَاضِ مُطَاوَعَةً لِمَذْمُوْمِ الْبُخْلِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার জিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়, এরপর মাকফূল আনহু কাফীলকে তার দায়িত্বে এক থান রেশমি বস্ত্রের 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করার আদেশ করে, আর কাফীল তাই করে তাহলে এ ক্রয় কাফীলের নিজের জন্য হবে এবং বিক্রেতা যে মুনাফা অর্জন করল তার দায়ও কাফীলের উপর বর্তাবে। 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করার আদেশের মর্মার্থ হলো, কাফীল কোনো ব্যবসায়ী থেকে উদাহরণত দশ দিরহাম ঋণ চাইল। ব্যবসায়ী ঋণ দিতে অস্বীকার করল, তবে অতিরিক্ত লাভের লোভে সে তার কাছে দশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় উদাহরণত পনের দিরহাম মূল্যে [বাকিতে] বিক্রি করল। যাতে উক্ত কাপড়টি দেনাদার [কাফীল] [অন্য একজনের কাছে] দশ দিরহামে বিক্রি করে [প্রার্থিত দশ দিরহাম যোগাড় করে] এবং পাঁচ দিরহামের লোকসান নিজে বহন করে। এটাকে 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় এজন্য বলা হয় যে, এতে ঋণ থেকে বিমুখ হয়ে বস্তুর দিকে ধাবিত হওয়ার দিক রয়েছে। এ ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ। কারণ, এ ক্রয়বিক্রয়ে ঋণ প্রদানের পুণ্য কাজ থেকে বিমুখ হয়ে নিন্দনীয় কৃপণতার অনুসরণের দিক রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِاَلْفٍ الخ - **মাসআলা :** কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার জিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফীল হয়, এরপর মাকফূল আনহু কাফীলকে তার দায়িত্বে এক থান রেশমি বস্ত্রের 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করার আদেশ করে, আর কাফীল তাই করে তাহলে এ ক্রয় কাফীলের নিজের জন্য হবে এবং বিক্রেতা যে মুনাফা অর্জন করল তার দায়ও কাফীলের উপর বর্তাবে অর্থাৎ 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ে যে লোকসান হবে কাফীলই তার দায় বহন করবে। উদাহরণত আরীফ এক হাজার টাকার ঋণগ্রস্ত। শরীফ পাওনাদার। শামীল আরীফের নির্দেশে শরীফের জন্য এক হাজার টাকার কাফীল হলো। এরপর আরীফ শামীলকে বলল, তুমি আমার দায়িত্বে একটি রেশমি বস্ত্রের 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় কর। শামীম তাই করল। তাহলে এ ক্রয় শামীলের নিজের জন্য হবে এবং 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ে যে লোকসান হবে তার দায়ও শামীলের উপর বর্তাবে।

قَوْلُهُ وَمَعْنَاهُ الْاَمْرُ بِبَيْعِ الْعِيْنَةِ مِثْلُ اَنْ يَسْتَقْرِضَ الخ : গ্রন্থকার (রা.) 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ের সুরত এ ইবারতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ের সুরত হলো, কাফীল কোনো ব্যবসায়ী থেকে উদাহরণত দশ দিরহাম ঋণ চাইল। ব্যবসায়ী ঋণ দিতে অস্বীকার করল, তবে অতিরিক্ত পাঁচ দিরহাম লাভের লোভে সে তার কাছে দশ দিরহাম মূল্যের একটি

কাপড় উদাহরণত পনের দিরহাম মূল্যে বাকিতে বিক্রি করল, যাতে উক্ত কাপড়টি দেনাদার তথা কাফীল অন্য একজনের কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করে তার প্রার্থিত দশ দিরহাম যোগাড় করে এবং মাকফূল লাহুর ঋণ পরিশোধ করে। আর পাঁচ দিরহামের লোকসান নিজে বহন করে।

কেউ কেউ 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ের সুরত এটা বলেছেন যে, কাফীল কোনো ব্যবসায়ী থেকে উদাহরণত দশ দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় পনের দিরহাম মূল্যে বাকিতে ক্রয় করে অন্য এক ব্যক্তির কাছে কাপড়টি নগদ দশ দিরহামে বিক্রি করল। এ ব্যক্তি আবার কাপড়টি নগদ দশ দিরহামে প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রি করল। এ সুরতেও ব্যবসায়ী পাঁচ দিরহাম লাভ পাচ্ছে।

'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ের এ উদাহরণে তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, যদি কাফীল ব্যবসায়ী থেকে পনের দিরহামে কাপড়টি ক্রয় করার পর উক্ত ব্যবসায়ীর কাছেই কাপড়টি দশ দিরহামে বিক্রি করে তাহলে شِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ অর্থাৎ বিক্রীত দ্রব্য মূল্য পরিশোধের পূর্বেই বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করা আবশ্যক হবে। আর এটা জায়েজ নেই। অথচ 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় জায়েজ, তবে মাকরূহ।

قَوْلُهُ سُمِّىَ بِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاَعْرَاضِ الخ - 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়-এর নামকরণ : 'ইনাহ'(عِيْنَةٌ) শব্দটি عَيْنٌ থেকে গঠিত। عَيْنٌ অর্থ– বস্তু বা দ্রব্য। যেহেতু 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ে ঋণ প্রদান থেকে বিমুখ হয়ে বস্তুর অভিমুখী হওয়ার দিক রয়েছে অর্থাৎ ঋণ না দিয়ে বস্তু [কাপড়] দেওয়া হয় তাই 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়কে 'ইনাহ' বলা হয়।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় মাকরূহ। কারো কারো মতে মাকরূহে তাহরীমী। কারো কারো মতে মাকরূহে তানযীহী। মাকরূহ এজন্য যে, এ ক্রয়বিক্রয়ে ব্যবসায়ী ঋণ প্রদানের নেক কাজ থেকে বিমুখ হয়ে নিন্দনীয় কৃপণতার অনুসরণ করে এবং লোভের কারণে লাভের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ ঋণ দেওয়া একটি নেক কাজ। কিন্তু তা ছেড়ে কৃপণতা প্রদর্শন করা হয়, যা একটি গুনাহ ও নিন্দনীয় কাজ।

উল্লেখ্য যে, 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ে মাকরূহ সামষ্টিক বিচারে। তা না হলে ঋণ না দেওয়াটাও মাকরূহ নয় এবং ব্যবসায় লাভ চাওয়ায় যে কৃপণতার প্রকাশ ঘটে তাও মাকরূহ নয়। কারণ, তাই যদি হতো তাহলে যে কোনো বস্তুই লাভে বিক্রয় মাকরূহ হতো। তবে উভয়টার একসাথে উপস্থিতির কারণে মাকরূহ হয়। এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার হৃদয়ে 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয় পাহাড়ের মতো একটি বোঝা। এ পদ্ধতি সুদখোরদের আবিষ্কৃত। নবী করীম ﷺ এর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন,

اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَقِيْلَ اِيَّاكَ وَالْعِيْنَةَ فَاِنَّهَا لِعِيْنَةٍ .

যখন তোমরা 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলদের লেজের পিছনে হাঁটবে অর্থাৎ জিহাদ ছেড়ে কৃষি ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তখন মন্দ চরিত্রের লোকদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন, তোমাদের সৎ ব্যক্তিগণ দোয়া করবেন কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হবে না। সাবধান! তোমরা 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় থেকে বেঁচে থাক। কারণ, তোমাদের উপর বিপদাপদ এজন্যই আসে। –[বিনায়া : খ. ৭ম, পৃ. ৫৯০]

ثُمَّ قِيْلَ : هٰذَا ضِمَانٌ لِمَا يَخْسَرُ الْمُشْتَرِىْ، نَظْرًا اِلٰى قَوْلِهٖ : عَلَىَّ، وَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَيْسَ بِتَوْكِيْلٍ وَقِيْلَ : هُوَ تَوْكِيْلٌ فَاسِدٌ، لِاَنَّ الْحَرِيْرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، وَكَذَا الثَّمَنُ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ لِجَهَالَةِ مَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ وَكَيْفَ مَا كَانَ فَالشِّرَاءُ لِلْمُشْتَرِىْ، وَهُوَ الْكَفِيْلُ، وَالرِّبْحُ اَىِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، لِاَنَّهُ الْعَاقِدُ .

অনুবাদ : কারো কারো মতে মাকফূল আনহুর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতা যে লোকসান উঠাবে তার দায়গ্রহণ। এ মতটি হলো মাকফূল আনহুর উক্তি 'আমার দায়িত্বে'-এদিকে লক্ষ্য করে। অথচ এটা ফাসিদ দায়গ্রহণ। এটা উকিল নিযুক্তকরণও নয়। কারো কারো মতে এটা ফাসিদ উকিল নিযুক্তকরণ। কেননা রেশমি বস্ত্র নির্ধারিত নয়। তদ্রূপ ঋণের অতিরিক্তটা অজ্ঞাত হওয়ায় বিনিময়মূল্যও অজ্ঞাত। যাহোক, এ ক্রয় ক্রেতা তথা কাফীলের নিজের জন্য হবে। আর অতিরিক্ত লাভের দায়ও তার উপর বর্তাবে। কেননা সেই চুক্তিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ قِيْلَ هٰذَا ضِمَانٌ لِمَا يَخْسَرُ الْمُشْتَرِىْ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় মাকফূল আনহু কাফীলকে 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ের যে আদেশ করেছে যে, 'তুমি আমার দায়িত্বে 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় কর' এ বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলেছেন, মাকফূল আনহুর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয়ে ক্রেতা যে লোকসান (خَسَارَةٌ) উঠাবে তার দায়গ্রহণ করা। অথচ এটা ফাসিদ দায়গ্রহণ (ضِمَانٌ فَاسِدٌ)। কেননা দায়গ্রহণ (ضِمَانٌ) ঐ জিনিসের হয় যা দায়বদ্ধ (مَضْمُوْنٌ)। আর লোকসান কোনো দায়বদ্ধ জিনিস নয়। উদাহরণত কেউ বলল, তুমি বাজারে গিয়ে বেচাকেনা কর। দিনভর তোমার যা লোকসান হবে তার দায় আমার। তাহলে এ দায়গ্রহণ শুদ্ধ নয়। তাই 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ে মাকফূল আনহুর লোকসানের দায়গ্রহণও শুদ্ধ হবে না।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্তকরণও নয়। কেননা যদি উকিল নিযুক্তকরণের ব্যাপার হতো তাহলে মাকফূল আনহুর বক্তব্যে (عَلَىَّ) 'আমার দায়িত্বে' না থেকে (لِىْ) 'আমার জন্য' থাকত। তাই এটা উকিল নিযুক্তকরণও নয়।

কারো কারো মতে, এটা ফাসিদ উকিল নিযুক্তকরণ (تَوْكِيْلٌ فَاسِدٌ)। কেননা রেশমি বস্ত্রের পরিমাণ নির্ধারিত নয় এবং রেশমি বস্ত্রের মূল্যও অজ্ঞাত। কারণ, মাকফূল আনহু 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধের আদেশ করেছে। তার ঋণ নির্ধারিত উদাহরণত দশ দিরহাম। কিন্তু 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয়ে রেশমি বস্ত্রের মূল্য কত হবে এবং কত টাকা লোকসান দিতে হবে তা জানা না থাকায় রেশমি বস্ত্রের মূল্যও অজ্ঞাত। আর ক্রয়বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে দ্রব্য (مَبِيْعٌ) ও মূল্য (ثَمَنٌ) অজ্ঞাত হলে উকিল নিযুক্তকরণ ফাসিদ হয়। তাই এ ক্ষেত্রে এটা ফাসিদ উকিল নিযুক্তকরণ (تَوْكِيْلٌ فَاسِدٌ) হবে।
গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর বক্তব্য 'তুমি আমার দায়িত্বে 'ইনাহ' ক্রয়-বিক্রয় কর' এটা ফাসিদ উকিল নিযুক্তকরণ হোক বা ফাসিদ দায়গ্রহণ হোক উভয় সুরতে এই 'ইনাহ' ক্রয়বিক্রয় ক্রেতা অর্থাৎ কাফীলের নিজের জন্য হবে এবং এতে যে লোকসান হবে তার দায়ও তার উপরই বর্তাবে। কেননা কাফীলই চুক্তিকারী। আর যে চুক্তিকারী হয় ক্রয়-বিক্রয়ে লোকসান তার উপরই বর্তায়। তাই লোকসানের দায়ও কাফীলের উপর বর্তাবে।

قَالَ : وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْكَفِيلِ بِأَنَّ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمْ يُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالٌ مَقْضِى بِهِ، وَهٰذَا فِي لَفْظَةِ الْقَضَاءِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي الْأُخْرٰى، لِأَنَّ مَعْنٰى ذَابَ تَقَرَّرَ وَهُوَ بِالْقَضَاءِ، أَوْ مَالٌ يُقْضٰى بِهِ، وَهٰذَا مَاضٍ أُرِيْدَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ، كَقَوْلِهِ : أَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَكَ، وَالدَّعْوٰى مُطْلَقَةٌ عَنْ ذٰلِكَ، فَلَا تَصِحُّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার জন্য যা সাব্যস্ত হয়েছে কিংবা তার বিপক্ষে যে পরিমাণ মালের ফয়সালা করা হবে তার কাফীল হয়, এরপর মাকফূল আনহু গায়েব হয়ে যায়, আর বাদী [মাকফূল লাহু] কাফীলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মাকফূল আনহুর উপর তার এক হাজার দিরহামের দায় রয়েছে তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ কাফালাহ চুক্তিতে মাকফূল বিহী হলো বিচারক কর্তৃক ফয়সালাকৃত মাল। 'ফয়সালা' (قَضٰى) শব্দের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার। তদ্রূপ অপর বক্তব্যের ক্ষেত্রেও। কেননা 'যা সাব্যস্ত হয়েছে' (مَا ذَابَ) -এর অর্থ হলো দায়ভুক্ত হওয়া (تَقَرَّرَ وَوَجَبَ), আর তা আদালতের মাধ্যমেই হয় কিংবা এমন মাল যার আদেশ করা হবে। শব্দ দুটি অতীতবাচক হলেও ভবিষ্যৎবাচক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَكَ 'আল্লাহ তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন'। কিন্তু দাবিদারের দাবি যেহেতু এ ব্যাপারে নিঃশর্ত তাই তা শুদ্ধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِمَا ذَابَ لَهُ الخ : মাসআলা : কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে এ শব্দে কাফীল হয় যে, 'তার জন্য যা সাব্যস্ত হয়েছে' কিংবা 'তার বিপক্ষে যে পরিমাণ মালের ফয়সালা করা হয়', সে তার কাফীল, এরপর মাকফূল আনহু গায়েব হয়ে যায় আর বাদী [মাকফূল লাহু] কাফীলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মাকফূল আনহুর উপর তার এক হাজার দিরহামের দায় রয়েছে, তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণত আরীফ বলল, শামীলের জন্য শরীফের উপর যে মাল সাব্যস্ত হয়েছে আমি শরীফের পক্ষ থেকে ঐ মালের কাফীল হলাম অথবা আরীফ বলল, শামীলের জন্য শরীফের উপর যে মালের ফয়সালা করা হয় আমি শরীফের পক্ষ থেকে তার কাফীল হলাম। এরপর শরীফ গায়েব হয়ে গেল। আর শামীল আরীফের বিরুদ্ধে এই মর্মে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল যে, সে শরীফের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে। তাহলে শামীলের এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

এর দলিল হলো, সাক্ষ্য-প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা দাবি শুদ্ধতা (صِحَّةُ الدَّعْوٰى) -এর উপর মওকুফ। অর্থাৎ যদি দাবি শুদ্ধ হয় তাহলে বাদীর উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়, যদি দাবি শুদ্ধ না হয় তাহলে তার উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় বাদী অর্থাৎ মাকফূল লাহুর দাবি শুদ্ধ নয়। কেননা দাবি এবং মাকফূল বিহীর মাঝে মিল নেই। অথচ এ ক্ষেত্রে দাবির শুদ্ধতার জন্য দাবি এবং মাকফূল বিহীর মাঝে মিল থাকা অপরিহার্য। মাকফূল বিহী এবং দাবিতে মিল এজন্য নেই যে, আলোচ্য কাফালাহ চুক্তিতে মাকফূল বিহী হয়তো এমন মাল যা কাফালাহ গ্রহণ করার পূর্বেই মাকফূল

আনহুর উপর আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে, কিংবা কাফালাহ গ্রহণের পর আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হবে। কেননা কাফীল যে শব্দে কাফালাহ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ مَا قَضَى لَهُ عَلَيَّ অথবা مَا ذَابَ لَهُ عَلَيَّ তা দুটি বিষয় বুঝায়–

১. কাফীল যে মালের কাফালাহ গ্রহণ করেছে তা আদালত কর্তৃক মাকফূল আনহুর উপর সাব্যস্ত। قَضَى 'ফয়সালাকৃত' শব্দের মাঝে এ বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ قَضَى শব্দটি قَضَاءٌ মূলধাতু থেকে নির্গত, এর অর্থই হলো যা আদালত কর্তৃক ফয়সালাকৃত। আর ذَابَ শব্দের অর্থ تَقَرَّرَ وَوَجَبَ 'স্থিরকৃত ও আবশ্যক'। আর মাল স্থিরকৃত ও আবশ্যক আদালতের ফয়সালা দ্বারাই হয়। তাই কাফীল যে মাকফূল বিহীর কাফালাহ গ্রহণ করেছে, তা আদালত কর্তৃক ফয়সালাকৃত। আর বাদী [মাকফূল লাহু] যে মাকফূর বিহীর দাবি করছে তা আদালত কর্তৃক ফয়সালাকৃত নয়।

২. কাফীল যে মাকফূল বিহীর কাফালাহ গ্রহণ করেছে তা মাকফূল আনহুর উপর কাফালাহ গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই সাব্যস্ত কিংবা কাফালাহ গ্রহণ করার পর সাব্যস্ত হবে। কারণ, ذَابَ ও قَضَى অতীতবাচক হলেও ভবিষ্যৎবাচক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَكَ 'আল্লাহ তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন' এ বাক্যে اَطَالَ অতীতবাচক হলেও তা ভবিষ্যৎবাচক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, কাফীল যে মাকফূল বিহীর কাফালাহ গ্রহণ করেছে, তা অতীতে আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বাদী তথা মাকফূল লাহুর দাবি এ ব্যাপারে নিঃশর্ত। তার দাবিতে এসব ব্যাপার না থাকায় তার দাবি ও মাকফূল বিহীর মাঝে মিল নেই। তাই তার দাবি শুদ্ধ নয়। আর দাবি শুদ্ধ না হলে ঐ দাবির উপর যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় মাকফূল লাহু যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَمَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا، وَأَنَّ هٰذَا كَفِيْلٌ عَنْهُ بِاَمْرِهِ، فَاِنَّهُ يَقْضِىْ بِهٖ عَلَى الْكَفِيْلِ وَعَلَى الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ، وَاِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ يُقْضٰى عَلَى الْكَفِيْلِ خَاصَّةً، وَاِنَّمَا تُقْبَلُ لِاَنَّ الْمَكْفُوْلَ بِهٖ مَالٌ مُطْلَقٌ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَاِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالْاَمْرِ وَعَدَمِهٖ، لِاَنَّهُمَا يَتَغَايَرَانِ، لِاَنَّ الْكَفَالَةَ بِاَمْرٍ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً وَمُعَاوَضَةٌ اِنْتِهَاءً، وَبِغَيْرِ اَمْرٍ تَبَرُّعٌ اِبْتِدَاءً وَاِنْتِهَاءً، فَبِدَعْوَاهُ اَحَدَهُمَا لَا يُقْضٰى لَهٗ بِالْاٰخَرِ، وَاِذَا قُضِىَ بِهَا بِالْاَمْرِ ثَبَتَ اَمْرُهٗ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْاِقْرَارَ بِالْمَالِ، فَيَصِيْرُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ وَالْكَفَالَةُ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ لَا تَمَسُّ جَانِبَهٗ، لِاَنَّهٗ تَعْتَمِدُ صِحَّتُهَا قِيَامَ الدَّيْنِ فِىْ زَعْمِ الْكَفِيْلِ، فَلَا يَتَعَدّٰى اِلَيْهِ، وَفِي الْكَفَالَةِ بِاَمْرِهٖ يَرْجِعُ الْكَفِيْلُ بِمَا اَدّٰى عَلَى الْاٰمِرِ، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) : لَا يَرْجِعُ، لِاَنَّهٗ لَمَّا اَنْكَرَ فَقَدْ ظُلِمَ فِىْ زَعْمِهٖ، فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهٗ، وَنَحْنُ نَقُوْلُ : اِنَّهٗ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا، فَبَطَلَ مَا فِىْ زَعْمِهٖ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, অমুকের কাছে তার এত পাওনা আছে, আর এ ব্যক্তি তার নির্দেশে তার পক্ষ থেকে কাফীল হয়েছে তাহলে কাফীল এবং [অনুপস্থিত] মাকফূল আনহুর বিপক্ষে উক্ত মালের ফয়সালা করা হবে। আর যদি কাফালাহ মাকফূল আনহুর নির্দেশ ছাড়া হয় তাহলে বিশেষভাবে কাফীলের বিপক্ষে ঐ মালের ফয়সালা করা হবে। [বাদীর] সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, এখানে মাকফূল বিহী হলো শর্তমুক্ত মাল। কিন্তু পূর্বের মাসআলাটি ভিন্ন। মাকফূল আনহুর আদেশের কারণে এবং আদেশ না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হবে। কারণ, তাতে কাফালার গুণগত পার্থক্য হয়। কেননা আদেশক্রমে যে কাফালাহ হয় তা সূচনা পর্বে হয়– স্বেচ্ছা কর্ম আর সমাপ্তি পর্বে হয় বিনিময়। পক্ষান্তরে বিনা আদেশে যে কাফালাহ হয় তা সূচনা ও সমাপ্তি উভয় পর্বে স্বেচ্ছা কর্ম হয়। সুতরাং দুটোর কোনো একটির দাবির প্রেক্ষিতে অপরটির ফয়সালা হতে পারে না। যখন আদেশক্রমে সাব্যস্ত কাফালাহ সম্পর্কে ফয়সালা করা হলো তখন তার আদেশ প্রদানও সাব্যস্ত হয়ে গেল। আর আদেশ ঋণের স্বীকারোক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তার বিপক্ষে ফয়সালা সাব্যস্ত হবে। আর তার আদেশবিহীন কাফালাহ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা কাফালার শুদ্ধতা কাফীলের ধারণায় [মাকফূল আনহুর জিম্মায়] ঋণের বিদ্যমানতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ঋণের বিষয়টি মাকফূল আনহুর দিকে যাবে না। আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল যা পরিশোধ করবে, তা আদেশদাতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফেরত নিতে পারবে না। কেননা কাফীল যখন কাফালাহকে অস্বীকার করেছে তখন তার ধারণা মতে সে [বাদীর পক্ষ থেকে] জুলুমের স্বীকার হয়েছে। সুতরাং সে অন্যের প্রতি জুলুম করতে পারে না। আমরা বলি যে, [কাফীল কাফালাহকে অস্বীকার করেছে] কিন্তু সে শরিয়ত কর্তৃক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার ধারণায় যা ছিল তা বাতিল হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّ لَهُ الخ - মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি উদাহরণত আরীফ শরীফের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে মেয়াদি ঋণের কাফীল হলো। এরপর মাকফূল আনহু অর্থাৎ শরীফ গায়েব হয়ে গেল। তারপর মাকফূল লাহু উদাহরণত শামীল বিচারকের আদালতে দাবি করল এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল যে, আমি শরীফের কাছে এক হাজার টাকা পাব এবং আরীফ তার নির্দেশে তার পক্ষ থেকে কাফীল হয়েছে, তাহলে মাকফূল লাহুর এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারক কাফীল ও মাকফূল আনহুর বিপক্ষে উক্ত এক হাজার টাকার রায় দেবেন। এ রায় কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ের উপর কার্যকর হবে। আর যদি মাকফূল লাহু তার দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করে যে, আমি মাকফূল আনহু শরীফের কাছে এক হাজার টাকা পাব এবং আরীফ তার নির্দেশ ছাড়াই তার পক্ষে কাফীল হয়েছে, তাহলে বিচারকের ফয়সালা শুধু কাফীলের উপর প্রযোজ্য হবে, মাকফূল আনহুর উপর কোনো দায় আসবে না।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا تُقْبَلُ لِاَنَّ الْمَكْفُوْلَ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ الخ : আলোচ্য মাসআলায় মাকফূল লাহুর সাক্ষ্য-প্রমাণ কেন গ্রহণযোগ্য হবে গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে তার দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা দাবি শুদ্ধতা (صِحَّةُ الدَّعْوٰى) -এর উপর মওকুফ। অর্থাৎ যদি দাবি শুদ্ধ হয় তাহলে বাদীর উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়, যদি দাবি শুদ্ধ না হয় তাহলে তার উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয় না। আলোচ্য মাসআলায় বাদী অর্থাৎ মাকফূল লাহুর দাবি শুদ্ধ। কেননা দাবি এবং মাকফূল বিহীর মাঝে মিল আছে। মাকফূল লাহুর দাবি হলো মাকফূল বিহী আদালত কর্তৃক মাকফূল আনহুর উপর সাব্যস্ত নয়। আর প্রকৃতপক্ষেও কাফীল যে মাকফূল বিহীর কাফালাহ গ্রহণ করেছে, তা আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত নয়। যেহেতু মাকফূল লাহুর দাবি ও মাকফূল বিহীর মাঝে মিল পাওয়া গেছে তাই মাকফূল লাহুর দাবি শুদ্ধ। আর যেহেতু দাবি শুদ্ধ হলে দাবির পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়, তাই আলোচ্য মাসআলায় মাকফূল লাহুর উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মাসআলায় মাকফূল লাহুর দাবি ও মাকফূল বিহীর মাঝে মিল ছিল না, তাই মাকফূল লাহুর দাবি শুদ্ধ ছিল না। ফলে তার পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়নি।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالْاَمْرِ وَعَدَمِهِ لِاَنَّهُمَا يَتَغَيَّرَانِ الخ : মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ (كَفَالَةٌ بِالْاَمْرِ) এবং তার নির্দেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ (كَفَالَةٌ بِغَيْرِ الْاَمْرِ) -এর মাঝে হুকুমের দিক থেকে কেন পার্থক্য হবে? আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে বিচারকের রায় কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। আর আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে শুধু কাফীলের উপর বিচারকের রায় কার্যকর হবে, মাকফূল আনহুর উপর কার্যকর হবে না। এ পার্থক্যের কারণ হলো, আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ এবং আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ এ দুটো পরস্পর ভিন্ন বিষয়। আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণের বিষয়টি সূচনা পর্বে (اِبْتِدَاءً) স্বেচ্ছাকর্ম বিষয় (تَبَرُّعٌ) অর্থাৎ কাফীল কাফালাহ গ্রহণে বাধ্য নয়, সে স্বেচ্ছায় নিজের উপর দায় আরোপ করে আর সমাপ্তি পর্বে (اِنْتِهَاءً) তা বিনিময় (مُعَاوَضَةٌ) অর্থাৎ মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফীল মাকফূল লাহুকে যে ঋণ পরিশোধ করে তার বিনিময়ে সে ঐ পরিমাণ মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নেয়। আর আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণের বিষয়টি সূচনা পর্বেও স্বেচ্ছাকর্ম (تَبَرُّعٌ) এবং সমাপ্তি পর্বেও স্বেচ্ছাকর্ম অর্থাৎ মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফীল যে ঋণ পরিশোধ করে তা স্বেচ্ছাদান হিসেবে পরিশোধ করে। এ পরিমাণ মাল কাফীল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পায় না। আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ আর আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণের এ ভিন্নতার কারণে মাকফূল লাহু এ দুটোর কোনো একটির দাবি করলে তার জন্য অপরটির ফয়সালা করা হবে না। কেননা বাদী কর্তৃক যেরূপ দাবি হয়, বিচারক তদনুযায়ী রায় প্রদান করে। যদি বাদী দাবি করে যে, আমি এ জিনিসের মালিক হয়েছি ক্রয় সূত্রে তাহলে বিচারকের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে বাদীর মালিকানার ফয়সালা করবে হেবা সূত্রে। তাই মাকফূল লাহু যখন আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণের দাবি করল এবং

সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণের রায় দিল তখন এটা সাব্যস্ত হলো যে, কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফীল হয়েছে। আর কাফালাতের আদেশ করার অর্থ হলো, মাকফূল আনহু তার জিম্মায় দায় থাকার বিষয় স্বীকার (اِقْرَارْ) করে নিচ্ছে। কেননা মাকফূল আনহু কাফীলকে তার পক্ষ থেকে মাল পরিশোধের আদেশ তখনি করতে পারে যখন তার জিম্মায় মাকফূল লাহুর দায় থাকে। অতএব, বিচারকের রায়ে এ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে, মাকফূল আনহু মাকফূল লাহুর জন্য দায় স্বীকার করছে। তাই বিচারকের রায় কাফীল ও মাকফূল আনহু উভয়ের উপর কার্যকর হবে। অর্থাৎ মাকফূল আনহু ও কাফীল উভয়ে দায়বদ্ধ সাব্যস্ত হবে।

আর যদি মাকফূল লাহু মাকফূল আনহুর আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণের দাবি করে এবং এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে তাহলে এর অর্থ হলো, মাকফূল আনহু তার জিম্মায় মাকফূল লাহুর দায় আছে এ কথা স্বীকার করেনি। কাফীল তার ধারণায় মাকফূল আনহুর জিম্মায় ঋণ আছে মনে করে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কাফীল হয়েছে। আর কাফালাহ -এর বৈধতার জন্য মাকফূল আনহুর জিম্মায় দায় আছে, কাফীলের এ ধারণাই যথেষ্ট। অতএব, বিচারকের রায় মাকফূল আনহুকে স্পর্শ করবে না; বরং শুধু কাফীলের উপরই তা কার্যকর হবে।

قَوْلَهُ وَفِى الْكَفَالَةِ بِاَمْرِهٖ يَرْجِعُ الْكَفِيْلُ بِمَا اَدّٰى الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে বিচারকের রায়ের প্রেক্ষিতে কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে মাকফূল লাহুকে যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা মাকফূল আনহুই তার ঋণ পরিশোধের আদেশদাতা। আর কেউ অন্যের ঋণ তার আদেশে পরিশোধ করলে তার থেকে তা ফেরত নিতে পারে। তাই কাফীলও যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরতে নিতে পারবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতেও কাফীল মাকফূল লাহুকে যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে না। দলিল হলো, কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করেছে এ বিষয়টি সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন তখন পড়ে যখন বিবাদী বাদীর দাবিকে অস্বীকার করে। এ থেকে বুঝা যায় কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। যেহেতু কাফীল কাফালাহ গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করেছে সেহেতু তার ধারণায় সে বিচারকের রায়ে মাকফূল লাহু কর্তৃক জুলুমের স্বীকার হয়েছে। মূলত সে কাফীল হয়নি, অন্যায়ভাবে মাকফূল লাহু তাকে কাফীল সাব্যস্ত করেছে। আর মজলুম অন্য কারো উপর জুলুম করার অধিকার রাখে না। তাই কাফীল মাকফূল লাহুকে যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে না।

আমাদের দলিল হলো, যখন বিচারক কাফীলের বিপক্ষে রায় দিয়ে কাফালাহ গ্রহণের বিষয়টি সাব্যস্ত করেছে তখন কাফীল তার কাফালাহ গ্রহণ না করার বক্তব্যে শরিয়ত কর্তৃক মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সে জুলুমের স্বীকার হয়েছে এ ধারণাটিও আর থাকে না। এ থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, মাকফূল আনহুর জিম্মায় দায় ছিল এবং সে তার নির্দেশে কাফালাহ গ্রহণ করেছে। আর মাকফূল আনহুর নির্দেশে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে যেহেতু কাফীল মাকফূল লাহুকে যা পরিশোধ করে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারে, তাই আলোচ্য মাসআলায়ও কাফীল মাকফূল আনহু থেকে মাকফূল লাহুকে পরিশোধ করা মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত পাবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا وَكَفَلَ رَجُلٌ عَنْهُ بِالدَّرْكِ فَهُوَ تَسْلِيمٌ، لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِى الْبَيْعِ فَتَمَامُهُ بِقَبُولِهِ، ثُمَّ بِالدَّعْوَى يَسْعَى فِى نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ اِحْكَامُ الْبَيْعِ وَتَرْغِيبُ الْمُشْتَرِى فِيْهِ، إِذْ لَا يَرْغَبُ فِيْهِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْاِقْرَارِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ، قَالَ : وَلَوْ شَهِدَ وَخَتَمَ وَلَمْ يَكْفُلْ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَكُوْنُ مَشْرُوطَةً فِى الْبَيْعِ، وَلَا هِىَ إِقْرَارًا بِالْمِلْكِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ مَرَّةً يُوْجَدُ مِنَ الْمَالِكِ، وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَ لِيَحْفَظَ الْحَادِثَةَ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، قَالُوا : إِذَا كَتَبَ فِى الصَّكِّ : بَاعَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ، أَوْ بَيْعًا بَاتًا نَافِذًا، وَهُوَ كَتَبَ شَهِدَ بِذٰلِكَ فَهُوَ تَسْلِيمٌ، إِلَّا إِذَا كَتَبَ الشَّهَادَةَ عَلَى إِقْرَارِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি বাড়ি বিক্রি করে, আর অপর কেউ তার পক্ষ থেকে [ক্রেতার জন্য] 'কাফীল বিদ দারক' হয় তাহলে এটা [বিক্রেতার মালিকানার] স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। কেননা কাফালাহ যদি বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তির সম্পন্নতা কাফীলের [কাফালাহ] গ্রহণ করার উপর নির্ভরশীল। এরপর দাবি উথাপনের অর্থ হলো, যে চুক্তি নিজের পক্ষ থেকে সম্পন্নতা লাভ করেছে তা ভাঙ্গার চেষ্টা করা। আর যদি 'কাফালাহ বিদ দারক' বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় না হয় তাহলে কাফালাহ এর উদ্দেশ্য হলো বিক্রয় চুক্তিকে দৃঢ়তা দান করা এবং ক্রেতাকে এ বিক্রয়ে উৎসাহিত করা; যখন কাফালাহ ব্যতিরেকে ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহবোধ করে না। সুতরাং কাফালাহ গ্রহণকে বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তির পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যদি কেউ [বিক্রয়ের লিখিত] সাক্ষী দেয় এবং মোহরাঙ্কিত করে, কিন্তু কাফালাহ গ্রহণ না করে তাহলে এটা [বিক্রেতার মালিকানার] স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না। কেননা সাক্ষ্য বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় হয় না এবং সাক্ষ্য মালিকানার স্বীকারোক্তিও নয়। কেননা বিক্রি কখনো মালিকের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, আবার কখনো মালিক ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকেও সংঘটিত হয়। তাই সম্ভবত সে ঘটনাটিকে সংরক্ষিত করার জন্য সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। ফকীহগণ বলেছেন, যদি বিক্রিপত্রে এরূপ লেখা হয় যে, বিক্রেতা মালিক থাকা অবস্থায় এ বাড়িটি বিক্রি করেছে বা বিক্রেতা স্বত্ব ত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বিক্রয় সম্পন্ন করেছে, আর সে এ মর্মে সাক্ষী হয়েছে বলে লিখে থাকে তাহলে এটা বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। অবশ্য চুক্তিকারীদের [ক্রেতা ও বিক্রেতা] স্বীকারোক্তি মোতাবেক সাক্ষী যদি সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে সে ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ دَارًا وَكَفَلَ رَجُلٌ عَنْهُ الخ : **মাসআলা** : কেউ যদি একটি বাড়ি বিক্রি করে আর অপর কেউ তার পক্ষ থেকে ক্রেতার জন্য 'কাফীল বিদ দারক' (كَفَالَةُ بِالدَّرْكِ) হয় অর্থাৎ কাফীল ক্রেতাকে বলল যে, এ বাড়িটি আপনি ক্রয় করতে পারেন। যদি ক্রয়ের পর কোনো দাবিদার বের হয় বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আপনার মূল্য ফেরত

দেওয়ায় দায় আমি গ্রহণ করলাম, তাহলে কাফীলের এ বক্তব্যটি বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি (اِقْرَارٌ) বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যেন কাফীল এ বক্তব্যের মাধ্যমে স্বীকার করে নিল যে, বিক্রেতা বিক্রয়- আলোচনাধীন বাড়িটির মালিক। এরপর ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কাফীল দাবি করে যে, আমি বাড়িটির মালিক, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় 'কাফালাহ বিদ দারক' বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় (مَشْرُوطٌ فِى الْبَيْعِ) হবে অথবা শর্তভুক্ত বিষয় হবে না। শর্তভুক্ত হওয়ার অর্থ হলো, বিক্রেতা বাড়িটি এ শর্তে বিক্রয় করেছে যে, অমুক ব্যক্তি ক্রেতার জন্য বিক্রেতার পক্ষে 'কাফীল বিদ দারক' হবে। যদি 'কাফালাহ বিদ দারক' বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তির সম্পন্নতা কাফীলের কবুল করার উপর মওকুফ হবে অর্থাৎ যখন কাফীল 'কাফালাহ বিদ দারক' গ্রহণ করবে তখন বিক্রয় সম্পন্ন হবে। সুতরাং যেন কাফীলই বিক্রয় চুক্তিকে ওয়াজিব ও অনিবার্যকারী। এরপর যদি কাফীল এ দাবি করে যে, বাড়িটি আমার এবং আমিই সেটার মালিক, তাহলে এর অর্থ হলো, যে বিক্রয় চুক্তি তার পক্ষ থেকে সম্পন্নতা লাভ করেছে সে নিজেই তা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। আর নিজের দ্বারা সম্পন্নতা লাভকারী চুক্তি ভাঙ্গার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আলোচ্য মাসআলায় 'কাফালাহ বিদ দারক' গ্রহণ করার পর কাফীল স্বয়ং বাড়িটির মালিক এ মর্মে তার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

আর যদি 'কাফালাহ বিদ দারক' বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় (مَشْرُوطٌ فِى الْبَيْعِ) না হয় তাহলে কাফালাহ-এর উদ্দেশ্য হলো বিক্রয় চুক্তিকে দৃঢ়তা দান করা এবং ক্রেতাকে এ বিক্রয়ে উৎসাহিত করা। কেননা অনেক সময় জমি বা বাড়ির অন্য কোনো দাবিদার আছে এ আশঙ্কায় কাফালাহ ব্যতীত বাড়ি বা জমি ক্রয়ে ক্রেতারা উৎসাহ বোধ করে না। তাই ক্রেতাকে নিশ্চয়তা দানের জন্য কাফীল 'কাফালাহ বিদ দারক' গ্রহণ করে এবং বলে, নিশ্চিন্ত মনে ক্রয় করতে পারেন। যদি কোনো দাবিদার বের হয় তাহলে মূল্য ফেরত প্রদানের দায় আমার। এ সুরতেও বিক্রেতাই বিক্রয়-আলোচনাধীন বাড়িটির মালিক এ মর্মে কাফীল কর্তৃক একপ্রকার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি দেয় তার জন্য পরবর্তীতে ঐ পণ্যের মালিকানা দাবি করা জায়েজ নেই।

মোটকথা, 'কাফালাহ বিদ দারক' বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় হোক বা শর্তভুক্ত বিষয় না হোক উভয় সুরতেই পূর্ববর্তী দাবির সাথে বিক্রয়োত্তর কাফীলের নিজের মালিকানা দাবির বিষয়টি সাংঘর্ষিক (مُتَنَاقِضٌ) হওয়ায় তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ شَهِدَ وَخَتَمَ وَلَمْ يَكْفُلْ لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمًا الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যদি কেউ বিক্রয়ের লিখিত সাক্ষ্য (شَهَادَةٌ) দেয় এবং মোহরাঙ্কিত করে, কিন্তু কাফালাহ গ্রহণ করে না; উদাহরণত আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহর কাছে একটি বাড়ি বিক্রি করল, আব্দুর রহিম বাড়িটি বিক্রি হয়েছে এ মর্মে সাক্ষী হলো এবং সাক্ষ্যপত্রে স্বাক্ষর করে সিলমোহর প্রদান করল কিন্তু সে কাফীল বিদ দারক হলো না, তাহলে এটা বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ আব্দুর রহীমের সাক্ষ্যপ্রদান ও সিলমোহর প্রদান এ কথার দলিল হবে না যে, সে বিক্রয়-আলোচনাধীন বাড়িটির বিক্রেতাই মালিক এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। সুতরাং এরপর যদি সাক্ষী অর্থাৎ আব্দুর রহীম এ দাবি করে যে, আমি বাড়িটির মালিক তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

দলিল হলো, لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَكُونُ مَشْرُوطَةً فِى الْبَيْعِ الخ : সাক্ষ্য (شَهَادَةٌ) বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয়ও হয় না এবং মালিকানার স্বীকারোক্তিও নয়। বিক্রয়ের শর্তভুক্ত বিষয় এজন্য হয় না যে, সাক্ষ্য বিক্রয় চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি এজন্য নয় যে, বিক্রি কখনো মালিকের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, মালিক নিজেই কারো কাছে তার মালিকানাধীন পণ্য বিক্রি করে, আবার কখনো মালিক ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকেও সংঘটিত হয়। মালিকের পক্ষ থেকে তার উকিল (وَكِيلٌ) বা মালিকের অনুমতি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি (فُضُولِيٌّ) বিক্রি করে। তাই বাড়ি বিক্রি হয়েছে এ মর্মে সাক্ষী হওয়া এ কথার প্রমাণ নয় যে, বিক্রেতা নিজ মালিকানাধীন জিনিস বিক্রি করেছে। আর যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি নয় তখন সাক্ষী যদি পরবর্তীতে নিজেকে ঐ বাড়িটির মালিক বলে দাবি করে তাহলে তার দাবি সাংঘর্ষিক (مُتَنَاقِضٌ) হবে না। আর যখন দাবি বিপরীত বা সংঘর্ষমূলক হবে না তখন তার মালিকানার দাবি

কিন্তু পূর্বোক্ত কাফালাহ বিদ দারক-এর মাসআলাটি এর চেয়ে ভিন্ন। কারণ, কাফালাহ বিদ দারক কাফীলের পক্ষ থেকে বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি। আর 'কাফীল বিদ দারক' একবার যখন বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তখন তার পক্ষে নিজের মালিকানা দাবির কোনো সুযোগ থাকে না। যদি দাবি করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তবে এখানে প্রশ্ন হলো, বাড়ি বিক্রি হয়েছে এ মর্মে সাক্ষী হওয়াটা যখন বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি নয়; তখন এ সাক্ষ্যের ফায়দা কি? গ্রন্থকার (র.) বলেন, সম্ভবত সাক্ষী বাড়ি বিক্রি হওয়ার ঘটনাটিকে সংরক্ষিত করার জন্য এবং ভবিষ্যতে বিক্রেতা যাতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পুনরায় এ জমিটি অন্য কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে না পারে সে জন্য সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছে।

قَوْلُهُ قَالُوْا إِذَا كَتَبَ فِي الصَّكِّ بَاعَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাশায়েখগণ বলেছেন, যদি বিক্রিপত্র বা দলিলে এরূপ লেখা হয় যে, বিক্রেতা ক্রয় / উত্তরাধিকার / হেবা সূত্রে এ বাড়িটির মালিক এবং তার ভোগ-দখলে ও মালিকানায় থাকা অবস্থায় সে বাড়িটি বিক্রি করেছে কিংবা দলিলে এটা লেখা হয় যে, বিক্রেতা স্বত্ব ত্যাগপূর্বক পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বিক্রয় সম্পন্ন করেছে, আর সাক্ষী এ মর্মে লিখিত সাক্ষী হয় এবং স্বাক্ষর ও সিলমোহর দান করে তাহলে এটা বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। কেননা পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বিক্রি তখনই হয় যখন বিক্রেতা বিক্রয় পণ্যের মালিক হয়। অতএব, এ মর্মে সাক্ষী হওয়ার পর 'আমি বাড়িটির মালিক' সাক্ষ্যদাতার এ ধরনের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

অবশ্য সাক্ষী যদি তার সাক্ষ্যে এ কথা লিখেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, চুক্তিকারীগণ [ক্রেতা ও বিক্রেতা] আমার সামনে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে যে; বিক্রেতা বাড়িটির মালিক, তাহলে এটা সাক্ষীর পক্ষ থেকে বিক্রেতার মালিকানার স্বীকারোক্তি হবে না। কেননা চুক্তিকারীদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রকৃত মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

فَصْلٌ : فِى الضَّمَانِ

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ أَوْ مُضَارِبٌ ضَمِنَ ثَمَنَ مَتَاعِ رَبِّ الْمَالِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْكَفَالَةَ اِلْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، وَهِيَ إِلَيْهِمَا ، فَيَصِيْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، وَلِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِى أَيْدِيْهِمَا ، وَالضَّمَانُ تَغْيِيْرٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ كَاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْمُوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيْرِ، وَكَذَا رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ، لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الضَّمَانُ مَعَ الشَّرْكَةِ يَصِيْرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ وَلَوْ صَحَّ فِى نَصِيْبِ صَاحِبِهِ خَاصَّةً يُؤَدِّى إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَا بِصَفْقَتَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا شَرْكَةَ، أَلَا تَرٰى أَنَّ لِلْمُشْتَرِىْ أَنْ يَقْبَلَ نَصِيْبَ أَحَدِهِمَا وَيَقْبِضَ، إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ وَإِنْ قَبِلَ الْكُلَّ ـ

অনুচ্ছেদ : জামানত

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [উকিলরূপে] কারো বস্ত্র বিক্রি করে এবং তার জন্য মূল্যের জামানত [দায়] গ্রহণ করে কিংবা মুদারিব যদি রাব্বুল মাল -এর [বিক্রয়কৃত] পণ্যের মূল্যের জামানত গ্রহণ করে তাহলে এ জামানত গ্রহণ বাতিল হবে। কেননা কাফালাহ [জামানত] হলো তাগাদার দায় গ্রহণ করার নাম। অথচ [বিক্রয় সূত্রে] তাগাদা তাদের কাছেই হবে। সুতরাং উভয়ের প্রত্যেকে নিজেই নিজের দায়গ্রহণকারী হবে। তাছাড়া [বিক্রেতা ও মুদারিব] উভয়ের কাছে [মুআক্কিল ও রাব্বুল মাল -এর] মাল আমানতরূপে রয়েছে। সুতরাং জামানত গ্রহণ করার অর্থ হলো শরিয়তের বিধানকে পরিবর্তন করা। সুতরাং আমানত গ্রহণকারী ও ধারে গ্রহণকারীর বিপক্ষে জামানতের শর্ত আরোপ করার মতো এ জামানতও প্রত্যাখ্যাত হবে। এরূপভাবে দু ব্যক্তি একটি গোলামকে অভিন্ন চুক্তিতে বিক্রি করল এবং উভয়ের একে অপরের জন্য তার অংশের মূল্যের জামানত গ্রহণ করল [তাহলে তা বাতিল হবে]। কেননা যদি শরিকানার অবস্থায় জামানত গ্রহণ বৈধ হয় তাহলে সে নিজেই নিজের জামানত গ্রহণকারী হবে। আর যদি বিশেষভাবে অপরজনের অংশের ব্যাপারে জামানত গ্রহণ বৈধ হয় তাহলে কব্জা করার পূর্বে ঋণকে বণ্টন করা আবশ্যক হবে। আর এটা জায়েজ নয়। তবে দু ব্যক্তির [একটি গোলাম] বিক্রয় দুই ভিন্ন চুক্তিতে হলে সে ক্ষেত্রে মাসআলাটি ভিন্ন হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে শরিকানার কোনো প্রশ্ন নেই। দেখুন না, ক্রেতার এ অধিকার আছে যে, সে দুজনের একজনের অংশের বিক্রয়কে কবুল করতে পারে। আবার সমগ্র গোলামের বিক্রয়কে গ্রহণ করা সত্ত্বেও শুধু একজনের অংশের মূল্য পরিশোধ করে সেটাকে কব্জা করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا وَضَمِنَ لَهُ الخ : আল্লামা আইনী (র.) বলেন, 'কাফালাহ' (كَفَالَةٌ) এবং 'জামানত' (ضَمَانٌ) সমার্থবোধক শব্দ। এ কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম তাদের গ্রন্থে 'পরিচ্ছেদ : কাফালাহ' (بَابُ الْكَفَالَةِ) -এর স্থলে 'পরিচ্ছেদ : জামানত' (بَابُ الضَّمَانِ) লিখেছেন। কিন্তু জামিউস সাগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যেহেতু কিছু মাসআলায় 'কাফালাহ'-এর স্থলে 'জামানত' শব্দ উল্লেখ করেছেন তাই হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ঐ মাসআলাগুলোকে পৃথক একটি অনুচ্ছেদে 'জামানত' শব্দে উল্লেখ করেছেন।

আলোচ্য ইবারতে বর্ণিত মাসআলায় দুটি সুরত রয়েছে– ১. উকিল (وَكِيْل) হিসেবে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উদাহরণত শামিল শাহেদের একটি কাপড় আমরের কাছে বিক্রি করল এবং উকিল অর্থাৎ শামিল নিজেই মুআক্কিল শাহেদের জন্য মূল্যের জামিন হলো। ২. মুদারিব (مُضَارِبٌ) মুদারাবার পণ্য বিক্রি করল এবং নিজেই রাব্বুল মাল (رَبُّ الْمَالِ) -এর জন্য মূল্যের জামিন হলো। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ দু সুরতে জামানত গ্রহণ করা বাতিল হবে। গ্রন্থকার (র.) এর পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন–

১. قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ اِلْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ وَهِيَ اِلَيْهِمَا الخ : কাফালাহ [জামানত] হলো নিজের উপর তাগাদার দায় আরোপ করার নাম। কাফীল কাফালাহ গ্রহণ করে মাকফূল লাহুকে এ অধিকার প্রদান করে যে, সে তার পাওনা মাকফূল আনহুর কাছে যেরূপ চাইতে পারে, তদ্রূপ এখন থেকে তার কাছেও চাইতে পারবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় উকিলের মুআক্কিলের জন্য এবং মুদারিবের রাব্বুল মাল-এর জন্য মূল্যের জামানত গ্রহণ করার অর্থ হলো, ক্রেতার কাছে যেরূপ বিক্রীত পণ্যের মূল্য দাবি করা যাবে তদ্রূপ উকিল ও মুদারিবের কাছেও মূল্য দাবি করা যাবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার যেহেতু চুক্তিকারীদ্বয় عَاقِدَيْن -এর দিকে রুজু হয় তাই ক্রেতা থেকে মূল্য দাবি করার অধিকার উকিল ও মুদারিবই লাভ করে। সুতরাং চুক্তিকারী হিসেবে যেহেতু উকিল ও মুদারিবই ক্রেতার কাছে মূল্য দাবিকারী তাই তাদের মূল্যের জামিন হওয়া মানে নিজের জন্য নিজের জামিন হওয়া। আর নিজের জন্য জামিন হওয়া যেহেতু শরিয়ত মতে বৈধ নয় তাই উকিলের মালিকের জন্য এবং মুদারিবরে রাব্বুল মাল -এর জন্য মূল্যের জামানত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এ কথাকে এভাবেও বলা যায় যে, বিক্রয়ের উকিল ও মুদারিব চুক্তিকারী (عَاقِدٌ) হওয়ার কারণে 'মুতালিব' (مُطَالِبٌ) [মূল্য দাবিকারী] এবং জামিন হওয়ার কারণে 'মুতালাব' (مُطَالَبٌ) [যার কাছে দাবি করা হয়।] এতে এক ব্যক্তির 'মুতালিব' এবং 'মুতালাব' উভয়টা হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ শরিয়তে একই ব্যক্তির 'মুতালিব' ও 'মুতালাব' হওয়া জায়েজ নেই। তাই এ জামানত গ্রহণও জায়েজ হবে না।

২. দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রয়ের উকিল (وَكِيْل بِالْبَيْعِ) ও মুদারিব -এর কাছে বিক্রয় পণ্য আমানত রূপে আছে। আর আমানত গ্রহণকারী (اَمِيْنٌ) আমানতের মালের জামিন হতে পারে না। কেননা আমানত গ্রহণকারীকে জামিন বানাতে গেলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। আর শরিয়তের হুকুম কারো পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তন হয় না। তাই উকিল ও মুদারিবের জামিন হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

যেরূপ গ্রহণযোগ্য নয় আমানত গ্রহণকারী (مُوْدَعٌ) ও ধারে গ্রহণকারী (مُسْتَعِيْرٌ) -এর জামানত গ্রহণ করার বিষয়টি। উদাহরণত শামিল শাহেদের কাছে কিছু গম আমানত রাখল এবং আমানত রাখার সময় শাহেদকে বলল, যদি এ গম হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তুমি জামিন। আমানত গ্রহণকারী [শাহেদ] এটা মেনে নিলেও এ শর্ত বাতিল হবে। এরপর যদি ঘটনাক্রমে উক্ত গম হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শাহেদকে উক্ত গমের জরিমানা দিতে হবে না। এরূপভাবে শাহেদ শামিল থেকে একটি কলম ধারে নিল। ধারে দেওয়ার সময় শামিল এ শর্ত দিল যে, কলমটি হারালে তুমি জামিন হবে, তাহলে এ শর্ত

বাতিল হবে। কারণ, শাহেদের কাছে গম ও কলম আমানতরূপে আছে। আর শরিয়তের বিধান হলো আমানত গ্রহণকারী আমানতের মালের জামিন হয় না। আমানত গ্রহণকারীকে জামিন বানাতে গেলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। আর শরিয়তের হুকুর কারো পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। তাই আমানত গ্রহণকারীকে জামিন বানানো যাবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً الخ : মাসআলা : দু ব্যক্তি একটি গোলামের মালিক এবং তারা উভয়ে অভিন্ন চুক্তির আওতায় গোলামটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল এবং উভয় বিক্রেতার প্রত্যেকে গোলামের অপরজনের অংশের মূল্যের জামানত গ্রহণ করল, উদাহরণত শামিল ও শাহেদ একটি গোলামের মালিক। তারা একই চুক্তিতে গোলামটিকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে শরীফের কাছে বিক্রি করল এবং উভয়ের প্রত্যেকে গোলামে অপরজনের যে অংশ আছে তার মূল্যের জামানত গ্রহণ করল অর্থাৎ প্রত্যেকেই অপরজনের পাঁচশ টাকার জামানত গ্রহণ করল, তাহলে এ জামানত বাতিল হবে। দলিল হলো, শরিকানার অবস্থায় উভয়ের একে অপরের জন্য জামিন হবে অথবা বিশেষভাবে একজন অপরজনের গোলামে যে অংশ রয়েছে তার ব্যাপারে জামিন হবে। যদি শরিকানার অবস্থায় জামিন হয় তাহলে যেহেতু উভয়ে গোলামটির মালিক তাই গোলামের মূল্যের প্রতিটি অংশে উভয়ে শরিক। সুতরাং অপরজনের অংশের মূল্যের তথা পাঁচশ টাকার জামিন হলে যেহেতু এ পাঁচশ টাকার প্রতিটি অংশে নিজেও শরিক তাই নিজেই নিজের জামিন হওয়া আবশ্যক হয়। আর নিজের জন্য জামিন হওয়া যেহেতু বাতিল তাই এ সুরতে জামানত গ্রহণ করা বাতিল হবে।

নিজের জন্য জামিন হওয়া এজন্য বাতিল যে, শরিক হওয়ার কারণে সে নিজেই তার অংশের মূল্য দাবি করবে। আর জামিন হওয়ার কারণে তার কাছেই দাবি করা হবে। এতে এক ব্যক্তি 'মুতালিব' (مُطَالِبٌ) [দাবিকারী] এবং 'মুতালাব' (مُطَالَبٌ) [যার কাছে দাবি করা হয়] হওয়া আবশ্যক হয়। আর এক ব্যক্তির মুতালিব ও মুতালাব হওয়া শরিয়তে বৈধ নয়। তাই নিজের জন্য জামিন হওয়াও বৈধ নয়।

আর যদি বিশেষভাবে একজন অপরজনের গোলামে যে অংশ রয়েছে তার ব্যাপারে জামিন হয় তাহলে এ সুরতে কব্জার পূর্বে দায়ন (دَيْنٌ) -কে বণ্টন করা অনিবার্য হবে। অথচ কব্জার পূর্বে দায়ন (دَيْنٌ) -কে বণ্টন করা জায়েজ নয়। তাই আলোচ্য সুরতে বিশেষভাবে অপরজনের অংশের ব্যাপারে জামিন হওয়া জায়েজ নয়।

কব্জার পূর্বে দায়ন (دَيْنٌ)-কে এজন্য বণ্টন করা জায়েজ নেই যে, অংশিদারী জিনিসে বণ্টন হলো প্রত্যেক অংশীদারের অংশকে পৃথক করা। আর পৃথক করা দ্রব্য (أَعْيَانٌ) ও দেহসত্তাসম্পন্ন জিনিসে কার্যকর হয়, কিন্তু গুণ (أَوْصَافٌ) -এর মাঝে কার্যকর হয় না। দায়ন (دَيْنٌ) একটি গুণ (وَصْفٌ), তাই দায়ন -এর মাঝে বণ্টন কার্যকর হয় না। তবে দায়নকে কব্জা করা হলে তা দ্রব্য ও দেহসত্তাসম্পন্ন জিনিসের আওতায় এসে পড়ে। আর দ্রব্যের বণ্টন যেহেতু জায়েজ, তাই কব্জা করার পরে দায়ন -এর বণ্টন জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَا بِصَفْقَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ الخ : অবশ্য যদি উভয় শরিক গোলামটিকে পৃথক দুটি চুক্তিতে অর্ধেক অর্ধেক করে বিক্রি করে উদাহরণত প্রথমে শামিল শরীফের কাছে তার অংশকে পাঁচশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল এরপর শাহেদ তার অংশকে ভিন্ন চুক্তিতে পাঁচশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল এবং শামিল ও শাহেদ একে অপরের মূল্যের জামানত গ্রহণ করল তাহলে এটা জায়েজ হবে। কেননা এ সুরতে প্রত্যেকের অংশ অপরজনের অংশ থেকে পৃথক ও আলাদা। তাই মূল্যে দুজনের শরিকানা সাব্যস্ত হবে না। যখন মূল্যে শরিকানা নেই তখন পূর্বোক্ত ত্রুটিও দেখা দেবে না। যখন পূর্বোক্ত ত্রুটি দেখা দেবে না তখন জামানত গ্রহণও বৈধ হবে।

এ সুরতে চুক্তি ভিন্নতার কারণে যেহেতু শরিকানার প্রশ্ন নেই, তাই ক্রেতার এ অধিকার থাকবে যে, সে দুজনের একজনের বিক্রয় কবুল করবে, অপরজনের বিক্রয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। যদি ক্রেতা পুরো গোলামে বিক্রি কবুল করে তাহলে একজনের অংশ সে তখনি কব্জা করার অধিকার লাভ করবে যখন ঐ অংশের মূল্য পরিশোধ করবে। যদি একটি চুক্তি হতো তাহলে একাংশের মূল্য পরিশোধ করে গোলামটি কব্জা করার অধিকার ক্রেতা পেত না।

قَالَ : وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ وَنَوَائِبَهُ وَقِسْمَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، أَمَّا الْخَرَاجُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ يُخَالِفُ الزَّكٰوةَ، لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ فِعْلٍ، وَلِهٰذَا لَا تُؤَدّٰى بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ إِلَّا بِوَصِيَّةٍ، وَأَمَّا النَّوَائِبُ فَإِنْ أُرِيْدَ بِهَا مَا يَكُوْنُ بِحَقٍّ كَكَرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَأَجْرِ الْحَارِسِ وَالْمُوَظَّفِ لِتَجْهِيْزِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الْأَسَارٰى وَغَيْرِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الْاِتِّفَاقِ، وَإِنْ أُرِيْدَ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقٍّ كَالْجِبَايَاتِ فِيْ زَمَانِنَا فَفِيْهِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ (رح)، وَمِمَّنْ يَمِيْلُ إِلَى الصِّحَّةِ الْإِمَامُ عَلِيُّ الْبَزْدَوِيُّ، وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدْ قِيْلَ : هِيَ النَّوَائِبُ بِعَيْنِهَا، أَوْ حِصَّةٌ مِنْهَا وَالرِّوَايَةُ بِأَوْ، وَقِيْلَ : هِيَ النَّائِبَةُ الْمُوَظَّفَةُ الرَّاتِبَةُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّوَائِبِ مَا يَنُوْبُهُ غَيْرَ رَاتِبٍ، وَالْحُكْمُ مَا بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার উপর ধার্য খেরাজ বা আপদকালীন ধার্য কর বা তার অংশ [কিসমাহ]-এর জামিন হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। খেরাজের বিষয়টি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তা জাকাত থেকে ভিন্ন। কেননা জাকাত মানে হলো নিছক একটি কর্ম সম্পাদন। এ কারণেই জাকাত ওয়াজিব এমন ব্যক্তির অসিয়ত ছাড়া তা তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা যায় না। আর আপদকালীন কর দ্বারা যদি ন্যায্য কর উদ্দেশ্য হয়, যেমন গণমালিকানার নদী খনন, চৌকিদারদের বেতন, সৈন্যবাহিনী সজ্জিতকরণ এবং বন্দীদের মুক্তিপণ বাবদ ধার্যকৃত কর ইত্যাদি, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এর কাফালাহ [জামানত] গ্রহণ বৈধ হবে। আর যদি আপদকালীন কর দ্বারা 'অন্যায় কর' উদ্দেশ্য হয়, যেমন বর্তমান যুগের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক কর, তাহলে এ বিষয়ে মাশায়েখদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। বৈধতার পক্ষে যারা মত প্রকাশ করেন তাদের অন্যতম হলেন ইমাম আলী আল বাযদবী (র.)। আর 'কিসমাহ' সম্পর্কে কারো কারো অভিমত হলো, এটা হুবহু আপদকালীন কর কিংবা একজনের উপর ধার্যকৃত তার অংশ। [এদের মতে জামিউস সাগীরের উপরিউক্ত] বর্ণনাটি أو অব্যয়যোগে হবে। আর কারো কারো মতে 'কিসমাহ' হলো নিয়মিত ও নির্ধারিত আপদকালীন কর। আর 'নাওয়ায়েব' (نَوَائِبُ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনিয়মিত ও অনির্ধারিত আপদকালীন কর। এর [কিসমাহ] বিধান তাই যা আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ آخَرَ خَرَاجَهُ الخ : প্রকাশ থাকে যে, খিরাজ (خَرَاجٌ) হলো ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ভূমির উৎপাদিত ফসলের কর। খিরাজ দু প্রকার। সামনে এর আলোচনা আসবে।

জিজিয়া (اَلْجِزْيَةُ) হলো ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা কর। নাওয়ায়েব (نَوَائِبُ) হলো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক আপদকালীন বা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বা গণকল্যাণমূলক কোনো কাজের জন্য ধার্যকৃত কর। নাওয়ায়েব দু প্রকার– ১. ন্যায্য কর, ২. অন্যায্য কর। সামনে এর বিবরণ আসবে।

আর 'কিসমাহ' (اَلْقِسْمَةُ) কাকে বলে এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এর আলোচনাও সামনে আসবে।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার উপর ধার্য খিরাজ [ভূমি কর] বা আপদকালীন ধার্য কর বা 'কিসমাহ' -এর জামিন হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, খিরাজের কাফালাহ গ্রহণ বৈধ– এ বিষয়টি আমরা পূর্বোক্ত কাফালাহ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

উল্লেখ্য যে, খিরাজ দু প্রকার– ১. খিরাজে মুকাসামা (خِرَاجٌ مُقَاسَمَةٌ) ২. খিরাজে মুআযযফ (خِرَاجٌ مُوَظَّفٌ)। খিরাজে মুকাসামা হলো, মুসলমান শাসক ভূমির উৎপাদিত ফসলকে দশ বা বিশভাগে ভাগ করে তা থেকে এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য নিয়ে যাবে। আর খিরাজে মুআযযফ হলো, ভূমি থেকে কতটুকু ফসল উৎপাদিত হতে পারে তা অনুমান করে ভূমি মালিকের জিম্মায় ধার্য করা যে, প্রতি বছর তুমি এই পরিমাণ ফসল খিরাজ দেবে। উপরিউক্ত ইবারতে খিরাজ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার খিরাজ উদ্দেশ্য অর্থাৎ খিরাজে মুআযযফের কাফালাহ বৈধ। কেননা খিরাজ মুআযযফ এমন একটি ঋণ (دَيْن), বান্দার পক্ষ থেকে যার তাগাদা করা বৈধ। আর বান্দার পক্ষ থেকে তাগাদা করা বৈধ এমন যে কোনো ঋণ (دَيْن) -এর কাফালাহ [জামানত] যেহেতু বৈধ তাই খিরাজে মুআযযফের কাফালাহ বৈধ হবে। পক্ষান্তরে খিরাজে মুকাসামা যেহেতু জিম্মায় ওয়াজিব হয় না, তাই তা ঋণ (دَيْن) নয়। আর যা ঋণ নয় তার কাফালাহ বৈধ নয়। তাই খিরাজে মুকাসামা -এর কাফালাহ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ يُخَالِفُ الزَّكٰوةَ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ فِعْلٍ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, খিরাজের হুকুম জাকাতের হুকুমের চেয়ে ভিন্ন অর্থাৎ খিরাজে মুআযযফ-এর কাফালাহ বৈধ, কিন্তু জাকাতের কাফালাহ বৈধ নয়। দুটোর মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, জাকাত নিছক একটি কর্ম অর্থাৎ বিনিময় ছাড়া কাউকে কিছু মালের মালিক বানানোর নাম হলো জাকাত। মাল এ ওয়াজিব কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র (مَحَلّ)। জাকাত একটি কর্ম– এ কারণেই যে ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব সে মারা গেলে অসিয়ত ছাড়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে জাকাত আদায় করা যায় না। তাছাড়া যে ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব হয় তার উপর জাকাতের মাল দায়বদ্ধ (مَضْمُوْن) হয় না। তাই যদি মাল ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর ঐ মালের জরিমানা ওয়াজিব হয় না। আর পূর্বে গেছে যে, ইবাদত বা কর্মের কাফালাহ বৈধ নয় এবং যে মাল দায়বদ্ধ নয় (غَيْرُ مَضْمُوْنَةٍ) তার কাফালাহও বৈধ নয়, তাই জাকাতের কাফালাহ বৈধ নয়। কিন্তু খিরাজে মুআযযফ যেহেতু একটি ঋণ (دَيْن), বান্দার পক্ষ থেকে তার তাগাদা করা বৈধ, আর বান্দার পক্ষ থেকে তাগাদা করা বৈধ এমন যে কোনো ঋণ (دَيْن) -এর কাফালাহ [জামানত] যেহেতু বৈধ তাই খিরাজে মুআযযফের কাফালাহ বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا النَّوَائِبُ فَإِنْ أُرِيْدَ بِهَا مَا يَكُوْنُ بِحَقٍّ الخ : নাওয়ায়েব বা আপদকালীন কর দু প্রকার–

১. আপদকালীন ন্যায্য কর। যেমন– গণ মালিকানার নদী খনন; মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান দেশের ব্যাপক জনগণের স্বার্থে একটি নদী খনন করার ইচ্ছা করলেন, যা ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন হবে না; বরং জনমালিকানাধীন হবে, কিন্তু তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বায়তুল মালে মওজুদ নেই। তখন তিনি সকল নাগরিকের উপর নদী খননের ব্যয় বাবদ নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করবেন, কিংবা পাহারাদারদের বেতন; নগর ও মহল্লার নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি কিছু পাহারাদার নিযুক্ত করবেন, কিন্তু তাদের বেতন প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বায়তুল মালে নেই, সেক্ষেত্রে তিনি নগর ও মহল্লার বাসিন্দাদের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করবেন, কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সজ্জিতকরণ ও তার রসদ-সামগ্রীর জন্য বায়তুল মাল শূন্য বিধায় জনগণের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করবেন, কিংবা মুসলিম বন্দীদের মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহের জন্য তিনি জনসাধারণের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করবেন। এ ছাড়া আরো যে সকল কর বৈধ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের উপর ধার্য করা হবে সেগুলোও এ প্রকারভুক্ত।

২. আপদকালীন অন্যায্য কর। যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক বর্তমান যুগের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক কর বা ভ্যাট যা অন্যায়ভাবে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে আজকাল প্রতিটি জিনিসের উপর সরকার ট্যাক্স বসিয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাউল, ডাল, আলু, তরি-তরকারির উপর বসিয়েছে ভ্যাট। এমনকি কোনো কোনো পেশাজীবীদের উপার্জনের উপরও ট্যাক্স বসিয়েছে। এসবই অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া ট্যাক্স।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামিউস সাগীরে উল্লিখিত 'নাওয়ায়েব' (نَوَائِبُ) দ্বারা যদি ন্যায্য কর উদ্দেশ্য হয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে এর কাফালাহ বৈধ হবে। কেননা যে সকল ট্যাক্স মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের উপর তাদের কল্যাণার্থে ধার্য করেন, তা পরিশোধ করা তাদের উপর ওয়াজিব। আর যা পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় তা ঋণ (دَيْن) হয়। আর ঋণ (دَيْن) -এর কাফালাহ যেহেতু জায়েজ তাই এ প্রকার করের কাফালাহ জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ধার্যকৃত কর মুসলমানদের উপর এজন্য পরিশোধ করা ওয়াজিব যে, মুসলমানদের উপর মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য ওয়াজিব। অতএব, তার বৈধ সকল আদেশ পালনও ওয়াজিব হবে।

আর যদি জামিউস সাগীরের ইবারতে উল্লিখিত 'নাওয়ায়েব' (نَوَائِبُ) দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার কর উদ্দেশ্য হয় যা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে মুসলিম জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এ প্রকার করের কাফালাহ -এর বৈধতা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কারো কারো মতে এর কাফালাহ বৈধ নয়। কেননা কাফালাহ ঐ জিনিসের তাগাদার দায় নিজের উপর আরোপ করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে যে জিনিস স্বয়ং মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব হয়। আর যেসব ট্যাক্স অন্যায্যভাবে ধার্য করা হয় তা মুসলমানদের উপর শরিয়তের বিধান মতে ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে কর স্বয়ং মুসলমান তথা মাকফূল আনহুর উপর শরিয়তের বিধান মতে ওয়াজিব নয় তার কাফালাহও জায়েজ নয়।

কারো কারো মতে, এরূপ করের কাফালাও বৈধ। ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী আল বাযদাবী (র.)-এর অভিমতও এটি। দলিল হলো, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের পক্ষ থেকে যে করই আরোপ করা হয়, তা ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তা ঋণ (دَيْن) হবে। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কর্তৃক তার তাগাদা করা হয়। আর কাফালাতে তাগাদাই বিবেচ্য বিষয়। কেননা কাফালাহ তাগাদার দায় আরোপ করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং সব ধরনের করের যেহেতু তাগাদা করা হয় সেহেতু সব ধরনের করের কাফালাহ বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدْ قِيْلَ هِيَ النَّوَائِبُ بِعَيْنِهَا الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'কিসমাহ' (اَلْقِسْمَةُ) -এর সংজ্ঞা নিয়ে ফকীহগণ থেকে দু ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, 'কিসমাহ' আর নাওয়ায়েব হুবহু এক। দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এ মতানুসারে জামিউস সাগীরের ইবারতে نَوَائِبُ এবং قِسْمَةٌ -এর মাঝে و অব্যয় হবে।

কারো কারো মতে, কিসমাহ হলো নাওয়াবের একটি অংশ। উদাহরণত দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু বিধ্বস্ত হয়েছে। এটার পুনর্নির্মাণ ব্যয়কে জনগণের উপর মাথাপিছু নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করা হলো। এতে প্রতিজনের উপর যে পরিমাণ কর ধার্য হলো তা হলো কিসমাহ। যদি কেউ অন্যের উপর ধার্য এরূপ অংশের কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে তা জায়েজ হবে। এ সুরতে জামিউস সাগীরের ইবারতে نَوَائِبُ ও قِسْمَةٌ -এর মাঝে اَوْ অব্যয় হবে।

কারো কারো মতে, কিসমাহ হলো এমন কর যা নিয়মিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায়যোগ্য। যেমন নগর বা মহল্লার নিরাপত্তা প্রহরী বা চৌকিদারের বেতন মহল্লা বা নগরবাসীদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে পরিশোধ করতে হয়। আর নাওয়ায়েব হলো আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা প্রয়োজনে ধার্য করা কর। যেমন হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে একটি এলাকা বিধ্বস্ত হলো। ঐ এলাকার লোকদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য সরকার কর্তৃক এককালীন কর আরোপ করা হলো।

মোটকথা, কিসমাহ হুবহু নাওয়ায়েব হোক বা নাওয়ায়েবের অংশ হোক বা নিয়মিত ও নিয়মতান্ত্রিক কর হোক এর হুকুম নাওয়ায়েবের হুকুমের মতোই। যদি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে এর কাফালাহ বৈধ হবে, আর যদি অন্যায্য হয় তাহলে তার কাফালার বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণের মতবিরোধ আছে।

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : لَكَ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ : هِيَ حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي، وَمَنْ قَالَ : ضَمِنْتُ لَكَ عَنْ فُلَانٍ مِائَةً إِلَى شَهْرٍ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ : هِيَ حَالَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الضَّامِنِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ، أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ ادَّعَى حَقًّا لِنَفْسِهِ، وَهُوَ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ إِلَى أَجَلٍ، وَفِي الْكَفَالَةِ مَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ، لِأَنَّ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ، إِنَّمَا اَقَرَّ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ الشَّهْرِ، وَلِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الدُّيُونِ عَارِضٌ، حَتَّى لَا يَثْبُتَ إِلَّا بِشَرْطٍ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَ الشَّرْطَ، كَمَا فِي الْخِيَارِ، أَمَّا الْأَجَلُ فِي الْكَفَالَةِ فَنَوْعٌ مِنْهَا، حَتَّى يَثْبُتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ، وَالشَّافِعِيُّ (رح) أَلْحَقَ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ، وَأَبُو يُوسُفَ (رح) فِيمَا يَرْوِي عَنْهُ أَلْحَقَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي، وَالْفَرْقُ قَدْ أَوْضَحْنَاهُ .

অনুবাদ : কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি আমার কাছে এক মাসের মেয়াদে একশ' দিরহাম পাবে, আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হলো সে নগদ পাওনা বলে দাবি করে তাহলে দাবিদারের দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক মাসের মেয়াদে একশ' দিরহামের জামিন হয়েছি, আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হলো সে বলল, এই জামানত গ্রহণ নগদ হয়েছে, তাহলে জামিনদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এ পার্থক্যের কারণ হলো, স্বীকারোক্তিকারী ঋণের স্বীকারোক্তি করেছে, এরপর নিজের জন্য একটি অধিকারের দাবি করেছে। আর তা হলো একটি মেয়াদ পর্যন্ত তাগাদা বিলম্বিত করা। পক্ষান্তরে কাফালাহ -এর সুরতে কাফীল ঋণের স্বীকারোক্তি করেনি। কেননা বিশুদ্ধ মতানুসারে তার উপর তো কোনো ঋণ নেই। সে শুধু এক মাস পর তাগাদার অধিকার স্বীকার করেছে। তাছাড়া ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ হলো আরোপিত বিষয়। তাই তা শর্তারোপ ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যে শর্ত অস্বীকার করবে তার বক্তব্য [শপথসহ] গ্রহণযোগ্য হবে। যেরূপ খেয়ারে শর্তের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কাফালাহ -এর ক্ষেত্রে মেয়াদ কাফালারই প্রকারবিশেষ। তাই তা শর্তারোপ ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। উদাহরণত মাকফূল আনহুর উপরই ঋণ মেয়াদি ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত মতে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সাথে যুক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা [উভয়েরটির মাঝে] পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَكَ عَلَيَّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন এবং উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

মাসআলা : ১. কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি আমার কাছে একশ দিরহাম পাবে, তবে তা পরিশোধের সময় এক মাস পরে, আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি (اِقْرَارٌ) করা হলো (مُقَرٌّ لَهُ) সে যদি বলে, তা নগদ পাব তাহলে নগদ পাওনার দাবিদার (مُقَرٌّ لَهُ) অর্থাৎ যে একশ' দিরহাম তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য বলে দাবি করেছে, শপথসহ তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

মাসআলা : ২. এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি অমুকের পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক মাসের মেয়াদে একশ' দিরহামের জামিন হয়েছি, আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হলো (مُقَرٌّ لَهٗ) সে বলল, এই জামানত গ্রহণ নগদ হয়েছে, তাহলে কাফীল (مُقِرٌّ) -এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

গ্রন্থকার (র.) এ দু' মাসআলায় পার্থক্যের দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন–

প্রথম কারণ : أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ ادَّعٰى حَقًّا لِنَفْسِهٖ الخ : ঋণের স্বীকারোক্তির সুরতে স্বীকারোক্তিকারী (مُقِرٌّ) ঋণের স্বীকার করেছে, এরপর নিজের জন্য এক মাস মেয়াদের দাবি করেছে। যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করেছে অর্থাৎ مُقَرٌّ لَهٗ ঋণপ্রাপ্তির বিষয়টি মেনে নিয়েছে, কিন্তু মেয়াদের বিষয়টি অস্বীকার করেছে। এতে স্বীকারকারী (مُقِرٌّ) হলো বিলম্বের দাবিদার (مُدَّعِىْ)/আর مُقَرٌّ لَهٗ হলো বিলম্বে পরিশোধের দাবি প্রত্যাখ্যানকারী বা মুনকির (مُنْكِرٌ)। আর বিলম্বের দাবিদার তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করতে অক্ষম। তাই মুনকিরের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ দাবিদারের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকার সুরতে মুনকিরের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। উল্লেখ্য যে, কিতাবের মূল ইবারতে فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِىْ -এর مُدَّعِىْ শব্দ দ্বারা নগদ পাওনার দাবিদার উদ্দেশ্য। যিনি প্রকৃতপক্ষে মেয়াদ প্রত্যাখ্যানকারী তথা মুনকির বটে।

পক্ষান্তরে কাফালাহ -এর সুরতে কাফালাহ স্বীকারকারী অর্থাৎ কাফীল ঋণের স্বীকারোক্তি করেনি। কারণ বিশুদ্ধ মতানুসারে কাফীলের উপর ঋণ ওয়াজিব হয় না; বরং তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) ওয়াজিব হয়। তাই সে তাগাদার অধিকার স্বীকার করেছে, কিন্তু তাও এক মাস পর। যেন সে এটুকু স্বীকার করেছে যে, মাকফূল লাহু এক মাস পর আমার কাছে তাগাদার অধিকার লাভ করবে। আর মাকফূল লাহু দাবি করেছে যে, সে এখনই তাগাদার অধিকার রাখে। মাকফূল লাহুর এ দাবি কাফীল প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে মাকফূল লাহু হলো বাদী আর কাফীল হলো মুনকির। আর বাদীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে মুনকিরের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। তাই এ সুরতে مُقِرٌّ তথা কাফীলের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় কারণ : আলোচ্য দু মাসআলায় পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ হলো একটি আরোপিত বিষয়। তাই তা শর্তারোপ ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। আর যে জিনিস শর্তারোপ করা ছাড়া সাব্যস্ত হয় না, তা যেহেতু আরোপিত বিষয় হয় তাই ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ আরোপিত বিষয়। এ কারণেই ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য, বিবাহে মহরানা এবং বিনষ্ট করা জিনিসের জরিমানা তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হয়। এগুলোতে শর্তারোপ ছাড়া মেয়াদ সাব্যস্ত হয় না। মোটকথা, যেহেতু ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ শর্তারোপ ছাড়া সাব্যস্ত হয় না তাই প্রথম মাসআলায় অর্থাৎ ঋণের স্বীকারোক্তির সুরতে স্বীকারকারী মেয়াদের শর্তের দাবি করেছে আর مُقَرٌّ لَهٗ তা অস্বীকার করেছে। এতে ঋণের স্বীকারকারী হয় বাদী আর যার অনুকূলে ঋণের স্বীকার করেছে সে হয় মুনকির। আর বাদী অর্থাৎ مُقِرٌّ -এর কাছে যেহেতু মেয়াদের শর্তের উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুদ নেই তাই মুনকির -এর বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। যেরূপ খেয়ার শর্তের মাঝে যদি চুক্তিকারীদের কোনো একজন খেয়ারে শর্তের দাবি করে, আর অপরজন তা অস্বীকার করে তাহলে বাদীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকার সুরতে অস্বীকারকারীর বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে মেয়াদ আরোপিত বিষয় নয়; বরং কাফালারই প্রকারবিশেষ। কাফালাহ দু প্রকার। যথা– ১. কাফালাহ মু'আজ্জাল (كَفَالَةٌ مُعَجَّلٌ) ২. কাফালাহ মুয়াজ্জাল (كَفَالَةٌ مُؤَجَّلٌ)। মেয়াদ কাফালাহ মুয়াজ্জাল (كَفَالَةٌ مُؤَجَّلٌ)-এর সত্তাগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই কাফালাহ মুয়াজ্জালে মেয়াদ শর্তারোপ ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ মাকফূল আনহুর উপরই যদি ঋণ মেয়াদি থাকে তাহলে কাফীলের ক্ষেত্রে মেয়াদ শর্ত ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। অতএব আলোচ্য মাসআলায় কাফীল যখন এক মাস মেয়াদে কাফালাহ গ্রহণের স্বীকারোক্তি প্রদান করে এর অর্থ হলো সে কাফালাহ মুয়াজ্জাল (كَفَالَةٌ مُؤَجَّلٌ) -এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। অতএব তার উপর কাফালাহ -এর অন্য প্রকার তথা কাফালাহ মু'আজ্জাল (كَفَالَةٌ مُعَجَّلٌ) -এর হুকুম সাব্যস্ত হবে না। যখন কাফালাহ -এর এক প্রকার তথা كَفَالَةٌ مُؤَجَّلٌ -এর স্বীকারোক্তি প্রদান

করলে অন্য প্রকার তথা كَفَالَةٌ مُعَجَّلٌ -এর হুকুম দেওয়া হবে না তখন কাফালাহ -এর সুরতে স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, مُقَرٌّ لَهُ -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) أَلْحَقَ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ وَأَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিতীয় মাসআলা অর্থাৎ কাফালাহ -এর মাসআলাকে প্রথম মাসআলা অর্থাৎ ঋণের স্বীকারোক্তির মাসআলার সাথে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে উভয় মাসআলায় مُقَرٌّ لَهُ -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথম মাসআলাকে দ্বিতীয় মাসআলার সাথে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে উভয় মাসআলায় مُقِرٌّ তথা স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের মাযহাব মতে দু মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে এবং পার্থক্যের কারণ উপরে সুস্পষ্টভাবে আমরা বর্ণনা করেছি।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.), আল্লামা ইবন হুমাম (র.) এবং হিদায়ার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন যে, হিদায়ার অধিকাংশ নোসখায় ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ বাস্তব হলো উল্টোটা। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলাকে প্রথম মাসআলার সাথে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে উভয় মাসআলায় مُقَرٌّ لَهُ -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথম মাসআলাকে দ্বিতীয় মাসআলার সাথে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে উভয় মাসআলায় مُقِرٌّ তথা স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

–[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬০২ ও ফাতহুল কাদীর : খ. ৭, পৃ. ২০৮]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল হলো, ঋণ দু প্রকার। ১. মেয়াদি (مِيْعَادِيٌّ) ২. মেয়াদ নির্ধারিত নয় (غَيْر مِيْعَادِيٌّ)। যদি মেয়াদি ঋণের স্বীকারোক্তি করে তাহলে স্বীকারকারীর উপর মেয়াদবিহীন ঋণ আবশ্যক হবে না; বরং মেয়াদি ঋণই আবশ্যক হবে। যখন স্বীকারকারীর উপর মেয়াদি ঋণই আবশ্যক হবে তখন তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যেরূপ কাফালাহ -এর সুরতে স্বীকারকারী তথা কাফীলের কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। –[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬০৩]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল হলো, দ্বিতীয় মাসআলায় কাফীল ও মাকফূল লাহু উভয়ে মাল ওয়াজিব হওয়ার উপর একমত হয় অর্থাৎ কাফীল এ কথার স্বীকারোক্তি দেয় যে, মাকফূল আনহু একশ' দিরহাম ঋণী, আর আমি তার কাফীল এবং মাকফূল লাহু এ স্বীকারোক্তিকে সত্যায়ন করে। এরপর তাদের একজন অর্থাৎ কাফীল মেয়াদের দাবি করে আর মাকফূল লাহু তা অস্বীকার করে। বাদী অর্থাৎ কাফীলের কাছে যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই তাই মুনকির তথা মাকফূল লাহুর বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, প্রথম মাসআলাকে দ্বিতীয় মাসআলার উপর কিয়াস করা যেরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন এবং দ্বিতীয় মাসআলাকে প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস করা যেরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) করেছেন– উভয়টাই ফাসিদ। কারণ আমাদের মতে উভয় মাসআলায় সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর উল্লিখিত পার্থক্য সত্ত্বেও একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা কোনোভাবেই শুদ্ধ নয়।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِالدَّرْكِ فَاسْتُحِقَّتْ لَمْ يَأْخُذِ الْكَفِيْلَ حَتّٰى يَقْضِىَ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الْاِسْتِحْقَاقِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ عَلٰى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُقْضَ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَى الْأَصِيْلِ رَدُّ الثَّمَنِ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيْلِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهَا لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْكَفِيْلِ، وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِالْاِسْتِحْقَاقِ فَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِهِ يَرْجِعُ بِمُجَرَّدِ الْاِسْتِحْقَاقِ، وَمَوْضِعُهُ أَوَائِلُ الزِّيَادَاتِ فِىْ تَرْتِيْبِ الْأَصْلِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, আর কোনো লোক তার অনুকূলে কোনো হকদার বের হলে মূল্য ফেরত প্রদানের কাফালাহ্ গ্রহণ করে, অতঃপর কোনো হকদার বের হয় তাহলে ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের ফয়সালা জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা কাফীল থেকে [মূল্য] গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা জাহেরি রেওয়ায়েতে অনুসারে শুধু হকদার বের হওয়ার দ্বারা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ হয় না, যে পর্যন্ত না ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের ফয়সালা না হয়। অতএব ক্রেতার অনুকূলে মাকফূল লাহু তথা বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদান ওয়াজিব নয়। তাই কাফীলের উপরও মূল্য ফেরত প্রদান ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে [বিক্রীত দাস বা দাসীর] স্বাধীনতার পক্ষে রায় প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা [সেক্ষেত্রে] বিক্রয় ক্ষেত্র না থাকায় শুধু রায় প্রদানের কারণেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং বিক্রেতার কাছ থেকে এবং কাফীলের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হকদার সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারাই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর বক্তব্য মতে শুধু হকদার সাব্যস্ত হওয়া মাত্র ক্রেতা [কাফীলের কাছ থেকে] মূল্য ফেরত নিতে পারে। মূল বিন্যাস অনুযায়ী এ মাসআলাটি [ইমাম মুহাম্মদ (র.) সংকলিত] যিয়াদাত গ্রন্থের প্রথম দিকে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ **: মাসআলা :** কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, আর কোনো লোক তার অনুকূলে কোনো হকদার বের হলে মূল্য ফেরত প্রদানের কাফালাহ্ গ্রহণ করে, উদারহণত কাফীল ক্রেতাকে বলল, তুমি দাসীটি ক্রয় করতে পার, যদি দাসীটির কোনো হকদার (مُسْتَحِقٌّ) সাব্যস্ত হয় তাহলে আমি মূল্য ফেরত প্রদানের কাফীল হলাম। অতঃপর কোনো হকদার সাব্যস্ত হলো এবং বিচারক (اَلْقَاضِىْ) দাবিদারের পক্ষে দাসীর রায় প্রদান করল তাহলে ক্রেতা কাফীলকে মূল্য ফেরত প্রদানের তাগাদা (مُطَالَبَةٌ) দেওয়ার অধিকার তখন পাবে, যখন বিচারক ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের রায় দেবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের রায় না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতার কাফীল থেকে মূল্য ফেরত প্রদানের তাগাদা করার অধিকার অর্জিত হবে না। যখন বিচারক ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদানের রায় দেবেন তখন ক্রেতা এ অধিকার লাভ করবে যে, ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত প্রদানের তাগাদা দেবে, ইচ্ছা করলে কাফীলকে তাগাদা দেবে।

এর দলিল হলো, জাহেরে রেওয়ায়েত অনুসারে শুধু হকদার বের হওয়ার দ্বারা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ হয় না। কেননা হতে পারে হকদার বিক্রেতার কৃত বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন করবে। বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ হয় যখন বিচারক ক্রেতার অনুকূলে বিক্রেতার প্রতিকূলে মূল্য ফেরত প্রদানের রায় প্রদান করেন। এ কারণেই হকদার সাব্যস্ত হওয়ার পরও যদি বিক্রেতা বিনিময়মূল্যে (ثَمَن) কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তা বৈধ হয়। উদাহরণত বিনিময়মূল্য ছিল একটি গোলাম। হকদার সাব্যস্ত হওয়ার পর বিক্রেতা গোলামটিকে মুক্ত করে দিল, তাহলে গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা, বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদানের রায় জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ না হওয়ায় মাকফূল লাহু তথা বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদান ওয়াজিব নয়। তাই কাফীলের উপরও মূল্য ফেরত প্রদান ওয়াজিব হবে না। যখন কাফীলের উপর মূল্য ফেরত প্রদান ওয়াজিব হবে না তখন ক্রেতা কাফীল থেকে মূল্য ফেরত প্রদানের তাগাদাও করতে পারবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলাতেই যদি দাসীটির হকদার সাব্যস্ত হওয়ার স্থলে দাসীটি নিজেকে স্বাধীনা বলে দাবি করে এবং দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে আর বিচারক তাকে স্বাধীনা বলে রায় প্রদান করেন তাহলে বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদানের রায় দেওয়া ছাড়াই ক্রেতা কাফীল থেকে মূল্য ফেরত প্রদানের দাবি করতে পারে। অথচ হকদার সাব্যস্ত হওয়ার সুরতে শুধু হকদার সাব্যস্ত হওয়ার রায় দ্বারা কাফীলের কাছে ক্রেতা মূল্য ফেরত প্রদানের দাবি করতে পারে না। এ দু মাসআলায় পার্থক্যের কারণ কি?

উত্তর : গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, হকদার সাব্যস্ত হওয়ার সুরতে বিচারকের রায়ের পর দাসীটি যদিও বিক্রেতা ছাড়া অন্য আরেকজনের মালিকানাধীন বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু তা বিক্রয়ের ক্ষেত্র (مَحَلّ), কিন্তু দাসীটি নিজেকে স্বাধীনা দাবির সুরতে বিচারকের রায় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দাসীটি বিক্রয় চুক্তির সময় বিক্রয়ের ক্ষেত্র (مَحَلّ) ছিল না। অতএব এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ই হয়নি। তাই দাসীটিকে স্বাধীনা বলে বিচারক কর্তৃক রায় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা কাফীল থেকে মূল্য ফেরত দেওয়ার দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে হকদার সাব্যস্ত হওয়ার সুরতে দাসীটি বিক্রয়ের ক্ষেত্র হওয়ায় তাতে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। হকদারের অনুকূলে রায় দেওয়াতে ঐ বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যায়নি। কেননা হতে পারে হকদার বিক্রেতার কৃত বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন করবে। তাই বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদানের রায় প্রদানের আগ পর্যন্ত ক্রেতা কাফীল থেকে মূল্য ফেরতের দাবি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ يُبْطِلُ الْبَيْعَ بِالْاِسْتِحْقَاقِ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে 'আমালী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বিচারক কর্তৃক শুধু হকদার সাব্যস্ত হওয়ার রায় প্রদানের দ্বারাই বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যায়। এ রেওয়ায়েত মতে যেহেতু শুধু হকদার সাব্যস্ত হওয়ার রায় প্রদানের দ্বারাই বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যায় তাই বিক্রেতার উপর মূল্য ফেরত প্রদানের রায় ছাড়াই ক্রেতা কাফীল থেকে মূল্য ফেরত প্রদানের দাবি করতে পারবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) সংকলিত 'যিয়াদাত' গ্রন্থের শুরুতে আছে।

ফায়দা : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লিখিত যেসব মাসআলা লেখান সেগুলো তিনি মাযূনের আলোচনা থেকে শুরু করেন। এসব মাসআলা সহকারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যখন 'যিয়াদাত' গ্রন্থ সংকলন করেন তখন বরকত লাভের উদ্দেশ্যে প্রচলিত সকল ফিকহ্ গ্রন্থের বিন্যাসের ব্যতিক্রম ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর 'আমালী' -এর অনুসরণে 'বাবুল মাযূন' দ্বারা গ্রন্থ শুরু করেন এবং তিনি তাঁর সংকলনে 'আমালী'কে মূল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদে পরিপূরক হিসেবে নিজের পক্ষ থেকে কিছু মাসআলা সংযোজন করেন। অবশ্য পরবর্তীতে শায়েখ যা'ফারানী (র.) 'যিয়াদাত' পুনঃবিন্যস্ত করেন। এতে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিন্যাসকে রক্ষা করেননি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আলোচ্য মাসআলার বরাত প্রসঙ্গে বলেন, এ মাসআলা 'যিয়াদাত'-এর শুরুতে আছে। এর দ্বারা তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক বিন্যস্ত 'যিয়াদাত'-কে বুঝিয়েছেন; শায়েখ যা'ফারানী (র.) কর্তৃক বিন্যস্ত যিয়াদাত নয়। –[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬০৪]

وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَضَمِنَ لَهُ رَجُلٌ بِالْعُهْدَةِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ هٰذِهِ اللَّفْظَةَ مُشْتَبِهَةٌ قَدْ تَقَعُ عَلَى الصَّكِّ الْقَدِيْمِ، وَهُوَ مِلْكُ الْبَائِعِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَقَدْ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلٰى حُقُوْقِهِ وَعَلَى الدَّرْكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، وَلِكُلٍّ ذٰلِكَ وَجْهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلَافِ الدَّرْكِ، لِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِيْ ضَمَانِ الْاِسْتِحْقَاقِ عُرْفًا، وَلَوْ ضَمِنَ الْخَلَاصَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ تَخْلِيْصِ الْمَبِيْعِ وَتَسْلِيْمِهِ لَا مَحَالَةَ، وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرْكِ، وَهُوَ تَسْلِيْمُ الْمَبِيْعِ أَوْ قِيْمَتِهِ فَيَصِحُّ ۔

অনুবাদ : কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে আর কোনো ব্যক্তি তার অনুকূলে 'উহদা'র জামিন হয় তাহলে এ জামানত বাতিল। কেননা এ শব্দটি সন্দেহজনক। কখনো এ শব্দটি পুরানো দলিল-দস্তাবেজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সেগুলো বিক্রেতার মালিকানাধীন। সুতরাং সেগুলোর জামানত গ্রহণ বৈধ নয়। কখনো শব্দটি চুক্তি অর্থে এবং চুক্তির দায়দায়িত্ব অর্থে এবং 'দারক' [বিক্রয়পণ্যের হকদার সাব্যস্ত হলে মূল্য ফেরত প্রদানের কাফালাহ] অর্থে এবং ইচ্ছাধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এগুলোর প্রতিটির যৌক্তিক দিক রয়েছে। সুতরাং এ শব্দের [অর্থ নির্দিষ্টকরণ অসম্ভব বিধায় এর সাথে] আমল করা অসম্ভব হবে। কিন্তু 'দারক' শব্দটির বিষয় ভিন্ন। কেননা শব্দটি প্রচলিত অর্থে [বিক্রয়পণ্যের] হকদার সাব্যস্ত হওয়ার জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আর যদি কেউ 'খালাস' এর জামানত গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা 'খালাস' -এর অর্থ হলো যে কোনো উপায়ে পণ্যকে [বিক্রেতার হাত থেকে] মুক্ত করে ক্রেতার কাছে অর্পণ করা অথচ জামিন এটা করতে সক্ষম নয়। সাহেবাইন (র.)-এর মতে 'খালাস' শব্দটি 'দারক' -এর পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ [সক্ষম হলে] বিক্রয়পণ্যকে [ক্রেতার কাছে] অর্পণ করা আর [সক্ষম না হলে] মূল্য ফেরত প্রদান করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَضَمِنَ لَهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) জামানত গ্রহণের দু'টি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন– ১. যামান বিল উহদা (ضَمَانٌ بِالْعُهْدَةِ) ২. যামান বিল খালাস (ضَمَانٌ بِالْخَلَاصِ)। প্রসঙ্গক্রমে জামানতের তৃতীয় আরেকটি ধরনের উল্লেখ হয়েছে। ৩. যামান বিদ দারক (ضَمَانٌ بِالدَّرْكِ)।

যামান বিল উহদা : যামান বিল উহদা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। বাতিলের কারণ হলো, 'উহদা' (عُهْدَةٌ) শব্দটির অর্থ একাধিক। প্রতিটি অর্থেরই যৌক্তিক দিক রয়েছে। কাফীলের বক্তব্যে শব্দটি ঠিক কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা অজ্ঞাত থাকায় সে মোতাবেক আমল করা সম্ভব নয়। তাই যামান বিল উহদা বাতিল হবে।

উল্লেখ্য যে, عُهْدَةٌ শব্দটি কখনো পুরানো দলিল-দস্তাবেজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো চুক্তি (عَقْد) অর্থে, কখনো চুক্তির দায়দায়িত্ব (حُقُوقُ الْعَقْد) অর্থে, কখনো 'দারক' [বিক্রয়পণ্যের হকদার সাব্যস্ত হলে মূল্য ফেরত প্রদানের কাফালাহ] অর্থে আবার কখনো খেয়ার (خِيَارٌ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরানো দলিল-দস্তাবেজ كِتَابُ الْعَهْد তথা চুক্তিপত্রের মতো একটি সনদ। তাই দলিল-দস্তাবেজকে عُهْدَةٌ বলা হয়। عُهْدَةٌ শব্দটি عَهْد থেকে নির্গত। عَهْد ও عَقْد [চুক্তি] যেহেতু একই জিনিস তাই عَقْد তথা চুক্তিকেও عُهْدَةٌ বলা হয়। চুক্তির দায়দায়িত্ব তথা حُقُوقُ عَقْد যেহেতু চুক্তিরই ফলশ্রুতি তাই চুক্তির দায়দায়িত্ব অর্থেও عُهْدَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর খেয়ারে শর্ত -এর অর্থে عُهْدَةٌ শব্দটি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় শব্দটিকে খেয়ার অর্থেও ব্যবহার করা হয়। হাদীসে এসেছে– عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ 'গোলামের খেয়ারে শর্ত তিনদিন।'

যদি 'উহদা' (عُهْدَةٌ) দ্বারা পুরানো দলিল-দস্তাবেজ উদ্দেশ্য হয় তাহলে ক্রেতার অনুকূলে 'যামান বিল উহদা' এজন্য জায়েজ নেই যে, পুরানো দলিল-দস্তাবেজ বিক্রেতার মালিকানাধীন এবং এগুলো দায়বদ্ধ (مَضْمُوْن) নয়। এ কারণেই যদি এসব দস্তাবেজ বিক্রেতার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা আরোপ হয় না। আর পূর্বে গেছে যে, যে জিনিস মাকফূল আনহুর উপর দায়বদ্ধ (مَضْمُوْن) হয় না তার কাফালাহ [জামানত] জায়েজ নেই। তাই এসব দলিল-দস্তাবেজের কাফালাহ তথা জামানত জায়েজ নেই। তাছাড়া এসব দলিল-দস্তাবেজ বিক্রেতার মালিকানাধীন এবং বিক্রেতার দখলে আছে। কাফীল বা জামিন এগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে ক্রেতাকে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। আর কাফীল যে জিনিসের ক্ষমতা রাখে না তার কাফালাহ যেহেতু বৈধ নয় তাই পুরানো দলিল-দস্তাবেজের কাফালাহও বৈধ নয়।

যামান বিদ দারক : যামান বিদ দারক হলো, কাফীল ক্রেতাকে একথা বলবে যে, তুমি পণ্যটি নিশ্চিন্তে ক্রয় করতে পার। যদি পণ্যের কোনো দাবিদার বের হয় এবং সে হকদার সাব্যস্ত হয় তাহলে আমি তোমাকে মূল্য ফেরত প্রদানের জামিন হলাম। এ জামিন সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। কারণ 'দারক' (دَرَك) -এর অর্থ নির্ধারিত। সুতরাং তার উপর আমল করা অসম্ভব নয়। যামান বিদ দারক -এর আলোচনা বিস্তারিতভাবে পূর্বে গেছে।

যামান বিল খালাস : যামান বিল খালাস হলো, কাফীল ক্রেতাকে বলল, আমি বিক্রেতার হাত থেকে পণ্য মুক্ত করে তোমার কাছে অর্পণ করার যামিন হলাম। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ যামান জায়েজ নেই। সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, 'খালাস' (خَلَاص) -এর অর্থ হলো পণ্যকে দাবিদার ইত্যাদি থেকে মুক্ত অবস্থায় ক্রেতার কাছে অর্পণ করা। অথচ কাফীল নিশ্চিতভাবে এটা করতে সক্ষম নয়। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে হকদার দাবি করে ঐ পণ্য নিয়ে নেবে। যদি নিয়ে যায় তাহলে কাফীল পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করতে সক্ষম হবে না। যখন কাফীল পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করতে সক্ষম হবে না তখন সে এমন জিনিসের কাফালাহ গ্রহণ করল যা সে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। আর যে জিনিস অর্পণ করতে সক্ষম নয় এমন জিনিসের জামানত গ্রহণ যেহেতু বৈধ নয় তাই যামান বিল খালাস বৈধ নয়।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, 'যামান বিল খালাস' 'কাফালাহ বিদ দারক' -এর পর্যায়ভুক্ত। কাফালাহ বিদ দারক -এ কাফীল যেরূপ ক্রেতার অনুকূলে পণ্যের হকদার সাব্যস্ত হলে মূল্য ফেরত দেওয়ার কাফীল হয় তেমনি যামান বিল খালাস -এও জামিন ক্রেতাকে বলে যে, যদি পণ্য অর্পণ করতে সক্ষম হই তাহলে পণ্য অর্পণ করব। আর যদি পণ্য অর্পণে সক্ষম না হই তাহলে মূল্য অর্পণ করব। যেহেতু যামান বিল খালাস কাফালাহ বিদ দারক -এর পর্যায়ভুক্ত তাই 'কাফালাহ বিদ দারক' যেরূপ সর্বসম্মতভাবে জায়েজ তেমনি যামান বিল খালাসও জায়েজ হবে।

بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَيَا عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى شَرِيكِهِ، حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ أَصِيلٌ، وَفِي النِّصْفِ الْآخَرِ كَفِيلٌ، وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ مَا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْأَصَالَةِ، وَبِحَقِّ الْكَفَالَةِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ دَيْنٌ وَالثَّانِيَ مُطَالَبَةٌ، ثُمَّ هُوَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ، فَيَقَعُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَفِي الزِّيَادَةِ لَا مُعَارَضَةَ، فَيَقَعُ عَنِ الْكَفَالَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَرْجِعَ، لِأَنَّ أَدَاءَ نَائِبِهِ كَأَدَائِهِ، فَيُؤَدِّيْ إِلَى الدَّوْرِ.

পরিচ্ছেদ : দু ব্যক্তির কাফালাহ

অনুবাদ : যদি ঋণ দুব্যক্তির উপর হয় এবং তাদের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয়, উদাহরণত দুজন একহাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করল এবং তাদের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হলো তাহলে দুজনের একজন যা আদায় করবে, সে তার শরিক থেকে তা ফেরত চাইতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আদায়কৃত মূল্যের পরিমাণ অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয়। তাহলে বেশি পরিমাণটা সে ফেরত চাইতে পারবে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই অর্ধেক [মূল্য] -এর ব্যাপারে মূল ব্যক্তি বা মাকফূল আনহু এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে কাফীল। আর মাকফূল আনহু হিসেবে তার উপর যে অর্ধেক সাব্যস্ত এবং কাফীল হিসেবে যে অর্ধেক সাব্যস্ত এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা প্রথমটি হলো ঋণ আর দ্বিতীয়টি হলো তাগাদা। তাছাড়া দ্বিতীয় অর্ধেক হলো প্রথম অর্ধেকের অনুবর্তী। তাই আদায়কৃত অর্ধেক প্রথমটির খাতেই সাব্যস্ত হবে। আর অতিরিক্ত আদায়কৃত অংশে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তাই তা কাফালাহ-এর খাতে সাব্যস্ত হবে। তাছাড়া পরিশোধকৃত অর্ধেক যদি অপরজনের পক্ষ থেকে গণ্য হয় এবং এই সুবাদে অপরজনের কাছ থেকে তা ফেরত নেয় তাহলে অপরজনেরও ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা তার নায়েব-এর আদায় করা নিজের আদায় করার মতো। সুতরাং তা চক্রবৎ গড়াতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : গ্রন্থকার (র.) এক ব্যক্তির কাফালাহ-এর আলোচনা থেকে অবসর হয়ে দুই ব্যক্তির কাফালাহ -এর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। যেহেতু দুই প্রকৃতগতভাবেই এক -এর পরে তাই দুই ব্যক্তির কাফালাহ -এর আলোচনা এক ব্যক্তির কাফালাহ -এর আলোচনার পরে এনেছেন। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এক ব্যক্তির কাফালাহ مُفْرَدٌ [একক] -এর পর্যায়ভুক্ত, আর দু ব্যক্তির কাফালাহ مُرَكَّبٌ [যৌগিক] -এর পর্যায়ভুক্ত। আর مُفْرَدٌ যেহেতু مُرَكَّبٌ-এর আগে হয় তাই এক ব্যক্তির কাফালাহ -এর আলোচনা আগে, আর দুই ব্যক্তির কাফালাহ -এর আলোচনা পরে পেশ করেছেন। -[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬০৭]

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اِثْنَيْنِ الخ : মাসআলা : যদি ঋণ দুব্যক্তির উপর হয়, উদাহরণত দুজন একহাজার টাকার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করল কিংবা দুজন মিলে একহাজার টাকা ঋণ করল এবং তাদের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হলো, এরপর দুজনের একজন যদি কিছু অর্থ পরিশোধ করে তাহলে সে ঐ অর্থ বা তার অংশবিশেষ তার শরিক থেকে ফেরত চাইতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি পরিশোধকৃত অর্থ মোট ঋণের অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অতিরিক্তটা সে শরিকের কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারবে। উদারহণত এক শরিক পাওনাদার বা বিক্রেতাকে সাতশ' টাকা পরিশোধ করল তাহলে সে অপর শরিক থেকে দু'শ টাকা ফেরত চাইতে পারবে। গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলার পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন।

প্রথম দলিল : قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى النِّصْفِ أَصِيْلٌ وَفِى النِّصْفِ الخ : তাদের প্রত্যেকেই অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ' টাকার ব্যাপারে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (أَصِيْل) এবং অবশিষ্ট অর্ধেক তথা দ্বিতীয় পাঁচশ টাকার ব্যাপারে কাফীল। অর্থাৎ প্রত্যেক শরিকের উপর মূলগতভাবে তথা মূল পাওনা হিসেবে পাঁচশ টাকা ওয়াজিব আর কাফীল হিসেবে পাঁচশ' টাকা ওয়াজিব। আর মূল পাওনা হিসেবে তার উপর যে অর্ধেক ওয়াজিব এবং কাফীল হিসেবে যে অর্ধেক ওয়াজিব - এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ (مُعَارَضَة) নেই। কেননা যে অর্থ মূল পাওনা হিসেবে ওয়াজিব তা বেশি শক্তিশালী (أَقْوٰى) আর যে অর্থ কাফালাহ হিসেবে ওয়াজিব তা তার তুলনায় দুর্বল (أَضْعَفُ)। কারণ যা মূল পাওনা রূপে ওয়াজিব তা তো ঋণ আর যা কাফালাহ হিসেবে ওয়াজিব তার শুধু তাগাদা ওয়াজিব, কাফীলের উপর ঋণ ওয়াজিব হয় না। আর এটা স্বীকৃত বিষয় যে, ঋণের তাগাদার তুলনায় ঋণ বেশি শক্তিশালী হয়। তাছাড়া ঋণের তাগাদা ঋণের অনুবর্তী (تَابِعٌ) হয়। কেননা ঋণের তাগাদা ঋণ ছাড়া সম্ভব নয়। তাহলে এটা সাব্যস্ত হলো যে, মূল পাওনা হিসেবে যা ওয়াজিব তা আসল। আর কাফালাহ হিসেবে যা ওয়াজিব তা অনুবর্তী (تَابِعٌ)। আর আসল অনুবর্তীর তুলনায় শক্তিশালী হয়। তাই শরিকের একজন মোট পাওনার অর্ধেক তথা পাঁচশ' টাকা পরিশোধ করলে তাকে অধিক শক্তিশালী অর্থাৎ মূল পাওনার খাতে ধরা হবে এবং বলা হবে যে, তার উপর যে পাঁচশ' টাকা ঋণ ছিল সে তা-ই পরিশোধ করেছে। যেহেতু সে নিজের পাওনা পাঁচশ' টাকা পরিশোধ করেছে তাই সে তার শরিকের কাছে পরিশোধকৃত অর্থ পূর্ণ বা অংশবিশেষ ফেরত চাইতে পারবে না। হ্যাঁ, শরিকের কোনো একজন যদি মোট ঋণের অর্ধেকের চেয়ে বেশি উদাহরণত সাতশ' টাকা পরিশোধ করে তাহলে মূল পাওনারূপে তার উপর যে পাঁচশ টাকা ওয়াজিব হয়েছে সেই হিসেবে ধরা হবে পাঁচশ টাকা আর অবশিষ্ট দুশ টাকা ধরা হবে কাফালাহ হিসেবে। বলা হবে যে, সে তার শরিকের পক্ষ থেকে দু'শ টাকা পরিশোধ করেছে। আর মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে তার আদেশক্রমে যদি কাফীল ঋণ পরিশোধ করে তাহলে কাফীল যেহেতু মাকফূল আনহুর কাছ থেকে উক্ত ঋণ পরিমাণ অর্থ ফেরত নিতে পারে তাই আলোচ্য সুরতে শরিকের কোনো একজন কাফালাহ হিসেবে অপর শরিকের পক্ষ থেকে যে দু'শ টাকা পরিশোধ করল তা তার কাছে ফেরত চাইতে পারবে।

দ্বিতীয় দলিল : وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِى النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ الخ : পরিশোধকৃত অর্ধেক যদি অপরজনের পক্ষ থেকে গণ্য হয় এবং এই সুবাদে অপরজনের কাছ থেকে তা ফেরত নেয় তাহলে বিষয়টি চক্রবৎ -এ গড়াবে। তা এভাবে যে, অর্ধেক ঋণ পরিশোধকারী তার শরিককে বলবে যে, আমি এ অর্ধেক ঋণ তোমার কাফীল হিসেবে তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছি। সুতরাং এ পরিমাণ অর্থ তুমি আমাকে ফেরত দাও। শরিক এ কথায় ঋণের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ বা মাল পরিশোধকারীকে ফেরত দেবে। এরপর শরিক পরিশোধকারীকে বলবে, তুমি ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে আমার নায়েব ছিলে। আর নায়েবের পরিশোধ করা মূলত মূল ব্যক্তির পরিশোধ করা। সুতরাং তুমি যে অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছ তা যেন আমিই পরিশোধ করেছি। আর আমি তোমার পক্ষ থেকে কাফীল হিসেবেই তা পরিশোধ করেছি। সুতরাং তুমি ঋণের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ বা মাল আমাকে ফেরত দাও। পরিশোধকারী অর্ধেক মাল বা অর্থ ফেরত দেওয়ার পর সেও একই বক্তব্য দেবে যে, তুমি তো ঋণ পরিশোধে আমার নায়েব। আর নায়েবের পরিশোধ করা মূল ব্যক্তির পরিশোধ করার মতো। অতএব যেন আমিই অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছি। আর পরিশোধ করেছি তোমার পক্ষ থেকে। সুতরাং অর্ধেক ঋণ পরিমাণ অর্থ বা মাল আমাকে ফেরত দাও। এভাবে বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্যের ধারা ক্রমাগত চলতে থাকবে। এতে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি চক্রবৎ (تَسَلْسُلْ) -এ গড়াবে। আর কোনো জিনিস চক্রবৎ (تَسَلْسُلْ) -এ গড়ানো বাতিল। তাই পরিশোধকৃত অর্ধেককে শরিকের পক্ষ থেকে গণ্য করাও বাতিল।

وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلٰى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلٌ عَنْ صَاحِبِهٖ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلٰى صَاحِبِهٖ بِنِصْفِهٖ قَلِيْلًا كَانَ أَوْ كَثِيْرًا، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فِي الصَّحِيْحِ أَنْ تَكُوْنَ الْكَفَالَةُ بِالْكُلِّ عَنِ الْأَصِيْلِ، وَبِالْكُلِّ عَنِ الشَّرِيْكِ، وَالْمُطَالَبَةُ مُتَعَدِّدَةٌ فَيَجْتَمِعُ الْكَفَالَتَانِ عَلٰى مَا مَرَّ، وَمُوْجَبُهَا اِلْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ، فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنِ الْكَفِيْلِ، كَمَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنِ الْأَصِيْلِ، وَكَمَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ مِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا عُرِفَ هٰذَا فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا وَقَعَ شَائِعًا عَنْهُمَا، إِذِ الْكُلُّ كَفَالَةٌ فَلَا تَرْجِيْحَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَيَرْجِعُ عَلٰى شَرِيْكِهٖ بِنِصْفِهٖ، وَلَا يُؤَدِّيْ إِلَى الدَّوْرِ، لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ الْإِسْتِوَاءُ، وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوْعِ أَحَدِهِمَا بِنِصْفِ مَا أَدّٰى، فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوْعِ الْآخَرِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصِيْلِ، لِأَنَّهُمَا أَدَّيَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بِنَفْسِهٖ وَالْآخَرُ بِنَائِبِهٖ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِالْجَمِيْعِ عَلَى الْمَكْفُوْلِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ كَفَلَ بِجَمِيْعِ الْمَالِ عَنْهُ بِأَمْرِهٖ ـ

অনুবাদ : যদি দুজন লোক অপর কোনো লোকের পক্ষে কোনো মালের এ শর্তে কাফীল হয় যে, তাদের দুজনের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে কাফীল তাহলে দুজনের যে কেউ যা কিছু আদায় করবে, তা অল্প হোক বা বেশি হোক, সে অপরজনের কাছ থেকে তার অর্ধেক ফেরত নেবে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মাসআলাটির অর্থ হলো, মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফালাহ হবে এবং সহ কাফীলের পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফালাহ হবে। আর তাগাদা হবে একাধিক। সুতরাং দুটি কাফালাহ একত্র হয়ে যাবে, যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কাফালার অনিবার্য ফল হলো তাগাদার দায়গ্রহণ তাই কাফীলের পক্ষ থেকেও কাফালাহ গ্রহণ শুদ্ধ হবে যেরূপ কাফালাহ শুদ্ধ হয় মূল দায়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং যেরূপ 'হাওয়ালা' শুদ্ধ হয় 'মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে। এটা যখন জানা গেল তখন আমাদের বক্তব্য হলো, দুজনের কোনো একজন যা আদায় করবে তা উভয়ের পক্ষ থেকে শরিকানারূপে সাব্যস্ত হবে। কেননা এখানে পরিশোধকৃত সমগ্রটাই কাফালাহ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং একজন অপরজনের উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। অতএব একজন যা কিছু আদায় করবে অপরজন থেকে সে তার অর্ধেক ফেরত নেবে এবং এটা চক্রবৎ -এ গড়াবে না। কেননা এ কাফালাহ চুক্তির দাবী হলো [উভয় কাফীলের] সমতা আর তা অর্জিত হয় একজনের পরিশোধকৃত মালের অর্ধেক [অপরজন থেকে] ফেরত নেওয়ার দ্বারা। সুতরাং প্রথমজনের কাছে অপরজনের ফেরত চাওয়া দ্বারা তা ভাঙ্গা যাবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। এরপর তারা উভয়েই [তাদের পরিশোধকৃত মাল] মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে ফেরত নেবে। কেননা, তারা দুজন তার পক্ষ থেকে [ঋণ] পরিশোধ করেছে। একজন স্বয়ং আর অন্যজন তার নায়েবের মাধ্যমে। আর ইচ্ছা করলে পরিশোধকৃত পুরো মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা সে তার আদেশে তার পক্ষ থেকে সমগ্র মালের কাফীল হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ الخ : **মাসআলা :** দুজন লোক অপর কোনো লোকের পক্ষে কোনো মালের এই শর্তে কাফীল হয় যে, তাদের দুজনের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে কাফীল, তাহলে দুজনের যে কেউ যা কিছু আদায় করবে, সে অপরজনের কাছ থেকে তার অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে, আদায়কৃত মাল অল্প হোক বা বেশি হোক।

উদাহরণ : শাহিদের কাছে আরীফ একহাজার টাকা পাবে। শামীল ও শরীফ শাহিদের পক্ষে এ একহাজার টাকার এই শর্তে কাফীল হলো যে, তাদের একজন অপরজনের পক্ষে কাফীল। এরপর যদি শামীল এক হাজার টাকা পরিশোধ করে তাহলে সে শরীফের কাছে তার অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ' টাকা ফেরত চাইতে পারবে।

قَوْلُهُ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فِى الصَّحِيْحِ أَنْ تَكُوْنَ الْكَفَالَةُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে এ মাসআলায় উভয় কাফীলের প্রত্যেকেই মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (أَصِيْل) তথা মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফীল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফীল। আর তাগাদা (مُطَالَبَة) একাধিক। তাগাদা একাধিক এভাবে যে, প্রত্যেক কাফীল নিজের উপর দুটি তাগাদার দায় আরোপ করেছে। একটি হলো ঐ তাগাদা যা মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে মাকফূল আনহুর কাছে ছিল। কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষে কাফীল হয়ে এ তাগাদার দায় নিজের উপর আরোপ করেছে। আরেকটি হলো ঐ তাগাদা যা কাফীলের পক্ষে কাফালাহ গ্রহণ করার কারণে নিজের উপর আরোপিত হয়েছে। এতে উভয় কাফীলের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দুটি করে কাফালাহ একত্র হয়েছে। একটি হলো মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফালাহ (كَفَالَةٌ عَنِ الْأَصِيْلِ), অন্যটি হলো কাফীলের পক্ষ থেকে কাফালাহ (كَفَالَةٌ عَنِ الْكَفِيْلِ)।

কাফীলের পক্ষ থেকে কাফালাহও মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফালাহ -এর মতো বৈধ আছে। কারণ কাফালাহ -এর অর্থ হলো নিজের উপর তাগাদার দায় আরোপ করা। আর তাগাদা মাকফূল লাহুর পক্ষ থেকে মাকফূল আনহুর কাছে যেরূপ হয় তেমনি কাফীলের কাছেও হয়। তাই মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে যেরূপ কাফীল হওয়া বৈধ, এমনিভাবে মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে হাওয়ালা যেরূপ বৈধ তেমনি কাফীলের পক্ষ থেকে কাফালাহও বৈধ হবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ বিষয়টি যখন জানা হলো অর্থাৎ উভয় কাফীলের প্রত্যেকেই মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (أَصِيْل) তথা মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফীল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকেও সমগ্র মালের কাফীল, তখন দুজনের একজন যা পরিশোধ করবে, তা যৌথভাবে উভয়ের পক্ষ থেকে পরিশোধ হবে। উদাহরণত শামীল আরিফকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করল। এটা শামীল ও শরীফ উভয়ের পক্ষ থেকে পরিশোধ হবে। বলা হবে, শামীল পাঁচশ' টাকা মাকফূল আনহু তথা শাহিদের পক্ষ থেকে কাফালাহ হিসেবে পরিশোধ করেছে আর পাঁচশ' টাকা পরিশোধ করেছে কাফীলের পক্ষ থেকে অর্থাৎ শরীফের পক্ষ থেকে কাফালাহ হিসেবে। আর কাফীলের পক্ষ থেকে কাফালাহ হিসেবে যা পরিশোধ করে তা ফেরত নিতে পারে। তাই শামীল যে এক হাজার টাকা পরিশোধ করেছে, শরীফ থেকে তার অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ' টাকা ফেরত নিতে পারবে।

দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় সবটাই কাফালাহ অর্থাৎ মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফালাহ হিসেবে যা ওয়াজিব হয় তাও কাফালাহ -এর ভিত্তিতে ওয়াজিব হয় এবং কাফীলের পক্ষ থেকে কাফালাহ হিসেবে যা ওয়াজিব হয় তাও কাফালাহ- এর ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মাসআলায় অর্ধেক ওয়াজিব হয় মূল ঋণগ্রস্ত (أَصِيْل) হিসেবে আর অর্ধেক ওয়াজিব হয় কাফালাহ -এর ভিত্তিতে। যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় উভয়টাই ওয়াজিব হয় কাফালাহ -এর ভিত্তিতে তাই একটির

অপরটির উপর প্রাধান্য (تَرْجِيْح) হবে না। যখন একটির অপরটির উপর প্রাধান্য (تَرْجِيْح) নেই তখন পরিশোধকৃত মাল অর্থাৎ একহাজার দিরহাম উভয় কাফীলের পক্ষ থেকে আদায় হবে অর্থাৎ পাঁচশ দিরহাম كَفَالَةٌ عَنِ الْأَصِيْلِ [মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাফালাহ] হিসেবে পরিশোধকারীর নিজের পক্ষ থেকে আদায় হবে আর পাঁচশ দিরহাম كَفَالَةٌ عَنِ الْكَفِيْلِ হিসেবে অপর কাফীলের পক্ষ থেকে পরিশোধ হবে। যেহেতু পরিশোধকৃত মাল উভয়ের পক্ষ থেকে আদায় হবে অর্থাৎ অর্ধেক অপরজন তথা অপর কাফীলের পক্ষ থেকে আদায় হবে তাই পরিশোধকারী অপর কাফীল থেকে অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ দিরহাম ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর এটা চক্রবৎ (دور) -এ গড়াবে না। কারণ উভয়ের প্রত্যেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পুরো মালের এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে পুরো মালের কাফীল হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, দুজন সমান। সুতরাং পরিশোধকারী অপরজন থেকে অর্ধেক ফেরত নিলে এই সমতা রক্ষা পায়। যদি অপরজনকে পুনরায় প্রথমজন থেকে অর্ধেকের অর্ধেক ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয় তাহলে এ সমতা রক্ষা হয় না। কারণ এ সুরতে এক পক্ষ থেকে সাতশ' পঞ্চাশ দিরহাম আদায় হবে আর অপরজন থেকে দু'শ পঞ্চাশ দিরহাম পরিশোধ হবে। তাই সমতা রক্ষার জন্য অপরজন প্রথমজন থেকে অর্ধেকের অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে না। যখন প্রথমজন থেকে অর্ধেকের অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে না তখন ফেরত নেওয়ার বিষয়টি চক্রবৎ -এ গড়াবে না তথা دور আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। সেক্ষেত্রে পরিশোধকৃত মালের অর্ধেককে যদি কাফালাহ -এর ভিত্তিতে পরিশোধকৃত বলে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি চক্রবৎ (دَوْر) -এ গড়ায়।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصِيْلِ لِأَنَّهُمَا الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, এরপর উভয় কাফীল পরিশোধকৃত মাল মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারে। কেননা উভয় কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধকারী। একজন স্বয়ং পরিশোধ করেছে আর অপরজন তার স্থলবর্তীর মাধ্যমে পরিশোধ করেছে। আর স্থলবর্তীর পরিশোধ করা যেহেতু স্বয়ং পরিশোধ করার মতো তাই যেন প্রত্যেকেই মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছে। যখন উভয়ের প্রত্যেকে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছে তাই প্রত্যেকেই মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِالْجَمِيْعِ عَلَى الْمَكْفُوْلِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে কাফীল মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে একহাজার দিরহাম পরিশোধ করেছে তার যেরূপ অপর কাফীল থেকে পাঁচশ' দিরহাম ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরো একহাজার দিরহামও মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা সে মাকফূল আনহুর নির্দেশে তার পক্ষ থেকে পুরো মালের কাফীল হয়েছিল। তাই যা সে পরিশোধ করেছে তার সবটুকুই সে মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারবে।

قَالَ : وَإِذَا أَبْرَأَ رَبُّ الْمَالِ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْآخَرَ بِالْجَمِيعِ، لِأَنَّ إِبْرَاءَ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ، فَبَقِيَ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى الْأَصِيلِ، وَالْآخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَلِهٰذَا يَأْخُذُهُ بِهِ قَالَ : وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِأَصْحَابِ الدُّيُونِ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَّهُمَا شَاؤُوا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، حَتّٰى يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لِمَا مَرَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি পাওনাদার দুজনের একজনকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে অপরজন থেকে সে সমগ্র মাল নিতে পারবে। কেননা কাফীলকে দায়মুক্ত করা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়মুক্তিকে আবশ্যক করে না। তাই সমগ্র মালই মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় বহাল রয়ে গেছে। আর অপরজন তার পক্ষ থেকে সমগ্র মালের কাফীল, যেরূপ আমরা বর্ণনা করেছি। তাই মাকফূল লাহু পুরো মাল কাফীলের কাছ থেকে নিতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ চুক্তি সম্পন্নকারী দুই পক্ষ যদি [চুক্তি প্রত্যাহারপূর্বক] পৃথক হয়ে যায় তাহলে পাওনাদারদের এ অধিকার আছে যে, তারা দুজনের যার কাছ থেকে ইচ্ছা সমগ্র পাওনা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা [শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ চুক্তিতে] দুজনের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয়ে থাকে, যেমন শিরকাহ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আর ঋণের অর্ধেকের অধিক আদায় না করা পর্যন্ত দু ব্যক্তির কাফালাহ প্রসঙ্গে আলোচিত দুই দলিলের কারণে এক শরিক অপরজনের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا أَبْرَأَ رَبُّ الْمَالِ الخ **: মাসআলা :** যদি দু ব্যক্তির প্রত্যেকে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (أَصِيلٌ) তথা মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে কাফীল হয় এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয় আর মাকফূল লাহু কোনো একজনকে কাফালাহ থেকে দায়মুক্ত (إِبْرَاء) করে দেয় তাহলে অপর কাফীল থেকে মাকফূল লাহু পুরো মাল নিতে পারবে। কেননা কাফীলকে দায়মুক্ত করা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়মুক্তিকে আবশ্যক করে না। তাই সমগ্র মালই মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় বহাল রয়ে গেছে। আর অপরজন তার পক্ষ থেকে সমগ্র মালের কাফীল। তাই মাকফূল লাহু পুরো মাল কাফীলের কাছ থেকে নিতে পারবে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا افْتَرَقَ الخ : উল্লেখ্য যে, শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ (شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ) হলো এমন দু ব্যক্তির অংশীদারি ব্যবসা যাতে উভয় অংশীদার মাল, স্বাধীনতা (حُرِّيَّة), বুদ্ধি (عَقْل) ও ধর্ম (دِيْن) -এর দিক থেকে সমান হয়। শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ ওকালত (وَكَالَة) এবং কাফালাহ (كَفَالَة) উভয়টাকেই শামিল করে। অর্থাৎ অংশীদারদের প্রত্যেকেই অপরজনের পক্ষ থেকে উকিলও হয়, কাফীলও হয়। 'মুফাওয়াযাহ' (مُفَاوَضَة) আরবি تَفْوِيْضٌ শব্দ থেকে নির্গত। تَفْوِيْضٌ অর্থ– অর্পণ করা। শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ -এ অংশীদারদের প্রত্যেকেই যেহেতু অপরজনকে লেনদেন অর্পণ করে তাই এর মুফাওয়াযাহ নাম রাখা হয়েছে।

উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলা হলো, শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ চুক্তি সম্পন্নকারী দুই পক্ষ যদি চুক্তি প্রত্যাহারপূর্বক পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের জিম্মায় মানুষের পাওনা থাকে তাহলে পাওনাদারদের এ অধিকার আছে যে, তারা দুজনের যার কাছ থেকে ইচ্ছা সমগ্র পাওনা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা শিরকাতুল মুফাওয়াযাহ চুক্তিতে দুজনের প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে কাফীল হয়ে থাকে। তাই তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক পাওনা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে এবং অর্ধেক পাওনা কাফীল হিসেবে ওয়াজিব হবে। মোটকথা, প্রত্যেকের উপর পুরো পাওনা ওয়াজিব। যেহেতু প্রত্যেকের উপর পুরো পাওনা ওয়াজিব সেহেতু প্রত্যেকের থেকে পুরো পাওনা পরিশোধ করা যেতে পারে। কিন্তু পাওনাদাররা যদি কোনো একজন থেকে তাগাদা করে পুরো পাওনা উসুল করে নেয় তাহলে অপরজন থেকে তার ফেরত নেওয়ার অধিকার তখন হবে যখন সে অর্ধেকের চেয়ে বেশি পাওনা পরিশোধ করবে। তাই অর্ধেক পাওনা পরিশোধ করার সুরতে অপরজন থেকে সে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। অর্ধেকের বেশি পরিশোধ করার সুরতে শুধু অর্ধেকের অতিরিক্ত অংশটুকু ফেরত নিতে পারবে। এ ব্যাপারে দু ব্যক্তির কাফালাহ প্রসঙ্গে দুটি দলিল উল্লিখিত হয়েছে। বিস্তারিত সেখানে দেখুন।

قَالَ : وَإِذَا كُوتِبَ الْعَبْدَانِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ هٰذَا الْعَقْدَ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصِيلًا فِي حَقِّ وُجُوبِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ عِتْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِأَدَائِهِ، وَيَجْعَلُ كَفِيلًا بِالْأَلْفِ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْمُكَاتَبِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَإِذَا عُرِفَ ذٰلِكَ فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلٰى صَاحِبِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ رَجَعَ بِالْكُلِّ لَا تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (রা.) বলেন, যদি দু গোলামকে এক অভিন্ন কিতাবাত চুক্তিতে মুকাতাব করা হয় এবং দুজনের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে কাফীল হয় তাহলে দুজনের কোনো একজন যা কিছু পরিশোধ করবে, তার অর্ধেক অপরজন থেকে সে ফেরত নিতে পারবে। এর কারণ হলো, এ ধরনের কাফালাহ চুক্তি সূক্ষ্ম কিয়াস [ইসতিহসান] মতে বৈধ। আর এ বৈধতার পদ্ধতি হলো, [যদি বদলুল কিতাবত একহাজার দিরহাম ধার্য হয়ে থাকে তাহলে] পুরো একহাজার ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে মূল ব্যক্তি বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে দাসত্ব থেকে উভয়ের মুক্তি পূর্ণ একহাজার দিরহাম পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে একহাজার দিরহামের কাফীল হবে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি আমরা কিতাবাত চুক্তিবদ্ধ গোলাম প্রসঙ্গে আলোচনা করব। যখন এ বিষয়টি জানা হলো তখন আমাদের বক্তব্য হলো, দুজন সমান হওয়ার কারণে দুজনের একজন যা কিছু পরিশোধ করবে, সে অপরজন থেকে তার অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে। যদি সম্পূর্ণটা ফেরত নেয় তাহলে সমতা রক্ষা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كُوتِبَ الْعَبْدَانِ كِتَابَةً الخ : প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো মনিব তার দু গোলামকে এক অভিন্ন কিতাবাত চুক্তিতে মুকাতাব করে যেমন– বলল, আমি তোমাদের দুজনকে এক বছর মেয়াদে একহাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাব করলাম এবং দুজনের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে মনিবের জন্য বদলুল কিতাবত [চুক্তিকৃত মুক্তিপণ] -এর কাফীল হয় তাহলে আমাদের কাছে এটা ইসতিহসান মতে জায়েজ; কিন্তু কিয়াস মতে জায়েজ নয়। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) কিয়াসকে গ্রহণ করেছেন।

যদি মনিব উভয় গোলামকে পৃথক পৃথক চুক্তিতে মুকাতাব করেন এবং তাদের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে মনিবের জন্য বদলুল কিতাবতের কাফীল হয় তাহলে তা ইসতিহসান ও কিয়াস উভয় হিসেবেই জায়েজ নয়। –[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬১১]

জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, কাফালাহ -এর জন্য শর্ত হলো মাকফূল আনহুর জিম্মায় যে ঋণ থাকবে তা বিশুদ্ধ ঋণ (دَيْن صَحِيْح) হতে হবে। আর বদলুল কিতাবত (بَدَل كِتَابَتْ) বিশুদ্ধ ঋণ নয়। তাই বদলুল কিতাবতের কাফালাহ বৈধ নয়। তাছাড়া মুকাতাবের জন্য বিশুদ্ধ ঋণের কাফীল হওয়াও জায়েজ নেই। কারণ কাফালাহ একটি স্বেচ্ছাধীন দায়িত্ব (تَبَرُّعْ)। আর মুকাতাব স্বেচ্ছাধীন দায়িত্বের মালিক হয় না। তাই পৃথক চুক্তিতে কিতাবত সম্পন্ন গোলামের বদলুল কিতাবতের কাফীল হওয়া কোনোভাবেই জায়েজ নেই।

ইসতিহসান মতে এক অভিন্ন চুক্তিতে দুগোলামকে মুকাতাব করা হলে একজনের পক্ষ থেকে অপরজনের কাফীল হওয়া জায়েজ। গ্রন্থকার (র.) বলেন, জায়েজের সুরত হলো, যদি বদলুল কিতাবত এক হাজার দিরহাম ধার্য হয়ে থাকে তাহলে পুরো একহাজার ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে মূল ব্যক্তি (أَصِيل) বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে উভয়ের দাসত্বমুক্তি পূর্ণ একহাজার দিরহাম পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং প্রত্যেকে অপরজনের পক্ষ থেকে একহাজার দিরহামের কাফীল হবে। যেন মনিব প্রত্যেককে এই কথা বলল যে, যদি তুমি এক হাজার দিরহাম পরিশোধ কর তাহলে তোমরা দুজন আজাদ হয়ে যাবে। এ সুরতে মনিব উভয়ের প্রত্যেকের কাছে এক হাজার দিরহাম তাগাদা করবে প্রত্যেকে মূল ব্যক্তি হিসেবে, কাফীল হিসেবে নয়। সুতরাং তাদের কেউ যদি একহাজার দিরহাম পরিশোধ করে দেয় তাহলে উভয়ে আজাদ হয়ে যাবে। এ সুরতে একহাজার দিরহাম মূলত বদলুল কিতাবত নয়; বরং একহাজার দিরহামের সাথে উভয়ের স্বাধীনতাকে শর্তযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আর স্বাধীনতাকে শর্তযুক্ত করা আর মুকাতাব বানানো এক জিনিস নয়। দুটির মাঝে স্পষ্টত পার্থক্য আছে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি আমরা চুক্তিবদ্ধ গোলাম প্রসঙ্গে আলোচনা করব। যেহেতু উভয়টার মাঝে পার্থক্য আছে তাই একহাজার দিরহাম পরিশোধের সঙ্গে স্বাধীনতাকে সংশ্লিষ্ট করার সুরতে গোলামদ্বয়কে মুকাতাব এবং একহাজার দিরহামকে বদলুল কিতাবত বলা যাবে না। এরপর যখন উভয়ের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে একহাজার দিরহামের কাফীল হবে, এটা বদলুল কিতাবাতের কাফালাহও হবে না, মুকাতাবের কাফীল হওয়াও আবশ্যক হবে না। অতএব নাজায়েজ হওয়ার উপরিউক্ত কারণ দুটি এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই এক অভিন্ন চুক্তিতে কিতাবত সম্পন্ন দু' গোলামের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে মুনিবের জন্য কাফীল হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বৈধতার একটি সুরত খুঁজে বের করার প্রয়োজনে আলোচ্য মাসআলায় দু গোলামের প্রত্যেকের উপর একহাজার দিরহাম ওয়াজিব ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উভয় গোলামের স্বাধীনতার বিনিময় হলো একহাজার দিরহাম, প্রত্যেকের উপর পাঁচশ করে ওয়াজিব হবে।

যখন দুজনের প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে কাফীল হবে তখন একজন মনিবকে যা কিছু পরিশোধ করবে, সে তার অর্ধেক তার সাথি থেকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা উভয়ের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ বদলুল কিতাবত ওয়াজিব হওয়ায় কিতাবত চুক্তিতে উভয়ে সমান এবং প্রত্যেকে অপরের পক্ষে পূর্ণ একহাজার দিরহামের কাফীল। দুজন সমান হওয়ার কারণে দুজনের একজন যা কিছু পরিশোধ করবে সে অপরজন থেকে তার অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে। যদি সম্পূর্ণটা ফেরত নেয় তাহলে সমতা রক্ষা হয় না। অদ্রূপ কিছু ফেরত না নিলেও সমতা রক্ষা হয় না।

قَالَ : وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّيَا شَيْئًا حَتّٰى اَعْتَقَ الْمَوْلٰى أَحَدَهُمَا جَازَ الْعِتْقُ لِمُصَادَفَتِهٖ مِلْكَهُ، وَبَرِئَ عَنِ النِّصْفِ، لِاَنَّهٗ مَا رَضِىَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ، اِلَّا لِيَكُوْنَ الْمَالُ وَسِيْلَةً اِلَى الْعِتْقِ، وَمَا بَقِىَ وَسِيْلَةً فَيَسْقُطُ، وَيَبْقَى النِّصْفُ عَلَى الْاٰخَرِ، لِاَنَّ الْمَالَ فِى الْحَقِيْقَةِ مُقَابِلٌ بِرَقَبَتِهِمَا، وَاِنَّمَا جُعِلَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِحْتِيَالاً لِتَصْحِيْحِ الضَّمَانِ، وَاِذَا جَاءَ الْعِتْقُ، اِسْتَغْنٰى عَنْهُ فَاعْتُبِرَ مُقَابِلاً بِرَقَبَتِهِمَا، فَلِهٰذَا يَتَنَصَّفُ، وَلِلْمَوْلٰى اَنْ يَأْخُذَ بِحِصَّةِ الَّذِىْ لَمْ يَعْتِقْ اَيَّهُمَا شَاءَ الْمُعْتَقَ بِالْكَفَالَةِ وَصَاحِبَهٗ بِالْاَصَالَةِ، فَاِنْ أَخَذَ الَّذِىْ أُعْتِقَ رَجَعَ عَلٰى صَاحِبِهٖ بِمَا يُؤَدِّىْ، لِاَنَّهٗ مُؤَدٍّ عَنْهُ بِاَمْرِهٖ، وَاِنْ أَخَذَ الْاٰخَرَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُعْتَقِ بِشَىْءٍ، لِاَنَّهٗ أَدّٰى عَنْ نَفْسِهٖ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (রা.) বলেন, আর যদি দুজনের কেউ কিছুই পরিশোধ না করে আর মনিব তাদের একজনকে মুক্ত করে দেয় তাহলে মুক্তকরণের বিষয়টি তার মালিকানার সাথে যুক্ত হওয়ায় মুক্তকরণ বৈধ হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম অর্ধেক বিনিময় থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে মালের দায় গ্রহণে শুধু এজন্য সম্মত হয়েছিল যে, তা মুক্তি লাভের উপায় হবে। অথচ এখন তা উপায় রূপে বহাল নেই। সুতরাং তা রহিত হয়ে যাবে। আর অর্ধেক মাল অপরজনের উপর বহাল থাকবে। কেননা পুরো মাল মূলত দুটি গোলামের বিনিময়ে। শুধু কাফালাহকে বৈধতা প্রদানের কৌশল হিসেবে পুরো মালকে স্বতন্ত্রভাবে উভয়ের প্রত্যেকের উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু যখন [একজনের] মুক্তি সাব্যস্ত হয়েছে তখন তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। তাই পুরো মালকে উভয়ের বিনিময়ে গণ্য করা হবে। এ কারণেই তা অর্ধেক হয়ে যাবে। আর মনিব যাকে আজাদ করেনি তার অংশ দুজনের যার কাছ থেকে ইচ্ছা আদায় করতে পারবে, মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে কাফালাহ -এর ভিত্তিতে আর অপরজন থেকে মূল চুক্তির ভিত্তিতে। যদি মনিব আজাদকৃত গোলামের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাহলে আজাদকৃত গোলাম যা পরিশোধ করবে তা অপরজন থেকে ফেরত নেবে। কেননা সে তার আদেশক্রমে তার পক্ষ থেকে আদায় করেছে। আর যদি মনিব অপরজন থেকে গ্রহণ করে তাহলে সে আজাদকৃত গোলাম থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কেননা সে নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّيَا شَيْئًا حَتّٰى اَعْتَقَ الْمَوْلٰى الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যদি দুজনের কেউ কিছুই পরিশোধ না করে, আর মনিব তাদের একজনকে মুক্ত করে দেয় তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম অর্ধেক বিনিময় থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। মুক্ত হবে এজন্য যে, বদলুল কিতাবত পূর্ণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত মুকাতাব মনিবের মালিকানাধীন থাকে। আর মালিকানাধীন গোলামকে মনিব মুক্ত করলে তা মুক্ত হয়ে যায়। আর অর্ধেক বিনিময় অর্থাৎ পাঁচশ দিরহাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম দায়মুক্ত হবে এজন্য যে, সে মালের দায় গ্রহণে শুধু এজন্য সম্মত হয়েছিল যে, তা মুক্তি লাভের উপায় হবে। অথচ এখন তা উপায়রূপে বহাল নেই; বরং সে অন্য মাধ্যমে মুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তা রহিত হয়ে যাবে। আর অর্ধেক মাল অপরজনের উপর বহাল থাকবে। কেননা পুরো মাল মূলত দুটি গোলামের বিনিময়ে। শুধু কাফালাহকে বৈধতা প্রদানের কৌশল হিসেবে পুরো মালকে স্বতন্ত্রভাবে উভয়ের প্রত্যেকের উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে; কিন্তু যখন একজনের মুক্তি সাব্যস্ত হয়েছে তখন তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। তাই পুরো মালকে উভয়ের বিনিময়ে গণ্য করা হবে। এ কারণেই তা পাঁচশ করে দুভাগে ভাগ হবে এবং যে গোলাম মুক্তি পায়নি তার উপর এক ভাগ অর্থাৎ পাঁচশ দিরহাম বহাল থাকবে।

এ পাঁচশ দিরহাম মনিব যাকে মুক্ত করেনি তার কাছ থেকেও নিতে পারে, মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের কাছ থেকেও নিতে পারে। যাকে মুক্ত করেনি তার কাছ থেকে নিতে পারে মূল ব্যক্তি হিসেবে, আর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে নিতে পারে কাফীল হিসেবে।

যদি মনিব মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের কাছ থেকে নেয় তাহলে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যা পরিশোধ করবে তা যাকে মনিব মুক্ত করেনি তার থেকে ফেরত নেবে। কেননা সে তার আদেশক্রমে তার পক্ষ থেকে আদায় করেছে। আর কাফীল মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে তার ঋণ পরিশোধ করলে তা মাকফূল আনহু থেকে ফেরত নিতে পারে। তাই মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামও পরিশোধকৃত পাঁচশ দিরহাম ফেরত নিতে পারবে।

আর যদি মনিব যাকে মুক্ত করেনি তার থেকে নেয় তাহলে সে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কেননা সে নিজের ঋণ নিজে পরিশোধ করেছে। আর নিজের ঋণ নিজে পরিশোধ করলে তা অন্য কারো কাছ থেকে ফেরত নিতে পারে না।

بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَعَنْهُ

وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْدٍ مَالًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتّٰى يُعْتَقَ، وَلَمْ يُسَمِّ حَالًا وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ حَالٌّ، لِأَنَّ الْمَالَ حَالٌّ عَلَيْهِ لِوُجُوْدِ السَّبَبِ وَقُبُوْلِ الذِّمَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ لِعُسْرَتِهِ، إِذْ جَمِيْعُ مَا فِيْ يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلٰى وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلُّقِهِ بِهِ فِي الْحَالِ، وَالْكَفِيْلُ غَيْرُ مُعْسِرٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ أَوْ مُفْلِسٍ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ بِمُؤَخِّرٍ ثُمَّ إِذَا أَدّٰى رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ، لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَكَذَا الْكَفِيْلُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ.

পরিচ্ছেদ : গোলামের কাফীল হওয়া এবং গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হওয়া

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো গোলামের পক্ষ থেকে এমন মালের কাফীল হয়, মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তার উপর যা পরিশোধ ওয়াজিব নয় এবং বর্তমান কিংবা অবর্তমান কোনো কিছু উল্লেখ না করে তাহলে এ কাফালাহ বর্তমান রূপে গণ্য হবে। কেননা গোলামের উপর কথিত মাল বর্তমানে ওয়াজিব, হেতু বিদ্যমান থাকার কারণে এবং দায় গ্রহণের উপযুক্ততা বিদ্যমান থাকার কারণে। তবে নিঃস্ব হওয়ার কারণে বর্তমানে তার কাছে তাগাদা করা হবে না। কেননা গোলামের অধিকারে যা কিছু আছে তা সবই মনিবের মালিকানাধীন। আর মনিব বর্তমানে গোলামের সাথে ঋণের সম্পৃক্ততায় সম্মত নয়। কিন্তু কাফীল তো নিঃস্ব নয়। সুতরাং বিষয়টি গায়েব বা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীল হওয়ার মতো হলো। পক্ষান্তরে মেয়াদী ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে এটি বিলম্বকারীর উপস্থিতির দরুন বিলম্বিত হয়। পর কথা হলো, যদি কাফীল [গোলামের পক্ষ থেকে] পরিশোধ করে দেয় তাহলে মুক্তি লাভের পর সে গোলাম থেকে তা ফেরত নেবে। কেননা তাগাদাকারী [মাকফূল লাহু] মুক্তি লাভের পরই শুধু গোলাম থেকে মাল ফেরত নিতে পারে। তাই কাফীলের বিষয়টিও তদ্রূপ হবে। কারণ কাফীল তার স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে স্বাধীন লোকের কাফীল হওয়া এবং স্বাধীন লোকের পক্ষ থেকে কাফীল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে গোলামের কাফীল হওয়া এবং গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। যেহেতু স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতগত বিষয় এবং স্বাধীন মানুষের মর্যাদা বেশি তাই গ্রন্থকার (র.) প্রথমে স্বাধীন মানুষের সাথে সম্পৃক্ত কাফালাহ -এর বিধানসমূহ আলোচনা করেছেন, এরপর গোলামের সাথে সম্পৃক্ত কাফালাহ -এর বিধানসমূহ উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْدٍ مَالًا الخ : **মাসআলা :** এক ব্যক্তি গোলামের পক্ষ থেকে এমন মালের কাফীল হলো যা বর্তমানে তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে, কিন্তু পরিশোধ ওয়াজিব হবে আজাদ হওয়ার পর এবং কাফালাহ চুক্তিতে এটা উল্লিখিত হয়নি যে, কাফীল থেকে এ মাল বর্তমানে তাগাদা করা হবে, নাকি গোলামের আজাদ হওয়ার পর তাগাদা করা হবে, তাহলে এ কাফালাহ বর্তমানরূপে গণ্য হবে এবং কাফীল থেকে এ মাল বর্তমানে বা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হবে। উদাহরণত মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বৈধ মনে করে গোলাম কোনো নারীকে বিবাহ করল এবং বৈধভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে মনে করে এ নারীর সাথে সঙ্গম করল, অথচ বিবাহ বৈধ হয়নি, তাই তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা (عُقْر)

ওয়াজিব হবে। তবে এ জরিমানা এখনি তার পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়; বরং আজাদ হওয়ার পর পরিশোধ ওয়াজিব হবে। এরূপভাবে গোলাম কারো মাল নষ্ট করার স্বীকারোক্তি দিল; কিন্তু মনিব তা অস্বীকার করল, এতে গোলামের জিম্মায় তাৎক্ষণিকভাবে নষ্ট করা মালের জরিমানা ওয়াজিব হয়, তবে পরিশোধ ওয়াজিব হবে আজাদ হওয়ার পর। গোলামের পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি যদি এ ধরনের মালের কাফীল হয়; কিন্তু কাফালাহ্ চুক্তিতে উক্ত মাল কাফীল থেকে কখন তাগাদা করা হবে তা বিশদভাবে উল্লিখিত না হয় তাহলে কাফীলের উপর এ মাল তাৎক্ষণিকভাবে আদায় ওয়াজিব হবে এবং তার থেকে মাকফূল লাহু তাৎক্ষণিকভাবে তাগাদা করতে পারবে।

গোলামের পক্ষ থেকে উক্ত মালের কাফালাহ্ বৈধ এজন্য যে, উক্ত মাল মূল ব্যক্তি তথা গোলামের উপর দায়বদ্ধ (مَضْمُوْن) আর কাফীল তা পরিশোধ করতে সক্ষম। আর যে মাল মূল ব্যক্তির উপর দায়বদ্ধ হয় এবং কাফীল পরিশোধ করতে সক্ষম হয় তার কাফালাহ্ বৈধ। অতএব গোলামের পক্ষ থেকে আলোচ্য মাসআলায় কাফালাহ্ বৈধ হবে।

আর কাফীলের কাছে বর্তমানে উক্ত মালের তাগাদা এজন্য বৈধ যে, মাকফূল আনহু অর্থাৎ গোলামের জিম্মায় মাল বর্তমানে ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিবের কারণ (سَبَبْ) অর্থাৎ মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ এবং বিবাহত্তোর সঙ্গম (وَطْئ) ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর মালের দায়গ্রহণের উপযুক্ততাও তার মাঝে বিদ্যমান আছে এবং মাল পরিশোধের কোনো মেয়াদ উল্লেখ নেই। এসব কারণে তার উপর বর্তমানে মাল ওয়াজিব। তবে একটি প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ তার নিঃস্বতার কারণে এখনি তার কাছ থেকে মালের তাগাদা করা হবে না। নিঃস্বতার কারণ হলো গোলামের অধিকারে যা কিছু থাকে তা সবই মনিবের মালিকানাধীন। আর মনিব বর্তমানে তার মালিকানাধীন জিনিস অর্থাৎ গোলামের সাথে ঋণের সম্পৃক্ততায় সম্মত নয়। তাই গোলাম থেকে তাগাদাকে বিলম্বিত করা হবে; কিন্তু কাফীল যেহেতু নিঃস্ব নয় তাই বর্তমানে তাগাদায় প্রতিবন্ধকতা না থাকায় এখনি তার কাছে তাগাদা করা যাবে। এটা গায়েব ও দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফালাহ্ গ্রহণ করার মতো হলো। অর্থাৎ কেউ যদি গায়েব ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীল হয় তাহলে কাফীল থেকে বর্তমানে তাগাদা করা হয়; যদিও মাকফূল আনহু থেকে তার অনুপস্থিতির কারণে বর্তমানে উসুল করা অসম্ভব হয়। তদ্রূপ কেউ যদি বিচারক কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফীল হয় তাহলে কাফীল থেকে বর্তমানে তাগাদা করা হয়, যদিও মাকফূল আনহু থেকে বর্তমানে তাগাদা করা যায় না। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও গোলাম থেকে বর্তমানে তাগাদা করা হবে না; কিন্তু কাফীল থেকে বর্তমানে তাগাদা করা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ بِمُؤَخِّرٍ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বক্তব্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যখন গোলামের উপর বর্তমানে মাল পরিশোধ ওয়াজিব নয়, তার মুক্তির পর পরিশোধযোগ্য, তখন এটাকে মেয়াদি ঋণ কেন সাব্যস্ত করা হয় না। মেয়াদি ঋণ সাব্যস্ত করা হলে গোলামের উপর যেরূপ বর্তমানে পরিশোধ ওয়াজিব হবে না তেমনি কাফীলের উপরও বর্তমানে পরিশোধ ওয়াজিব হবে না।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটাকে মেয়াদি ঋণ বলা যায় না। মেয়াদি ঋণ মাকফূল আনহু থেকে একটি বিলম্বিতকারীর উপস্থিতির দরুন বিলম্বিত হয়। আর তা হলো মেয়াদ ধার্যকরণ (تَأْجِيْل)। আর কাফীল মাকফূল আনহুর উপর যে ধরনের ঋণ ওয়াজিব সে ধরনের ঋণেরই দায়গ্রহণ করে। সুতরাং মাকফূল আনহুর উপর যে ঋণ ওয়াজিব তা যদি মেয়াদি হয় তাহলে কাফালাহ্ও মেয়াদি ঋণের হবে। আর কাফালাহ্ মেয়াদি ঋণের হলে কাফীল থেকে বর্তমানে তার তাগাদা হবে না; বরং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাগাদা করা হবে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় গোলামের উপর মাল বর্তমানে ওয়াজিব, তবে একটি প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমানে তার কাছে তাগাদা করা হবে না; কিন্তু কাফীলের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই বর্তমানে তার কাছে তাগাদা করা হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا أَدَّى رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি কাফীল গোলামের পক্ষ থেকে মাল পরিশোধ করে দেয় তাহলে গোলামের মুক্তি লাভের পর সে গোলাম থেকে তা ফেরত নেবে। কেননা তাগাদাকারী অর্থাৎ মাকফূল লাহু মুক্তি লাভের পরই শুধু গোলাম থেকে মাল ফেরত নিতে পারে। তাই কাফীলের বিষয়টিও তদ্রূপ হবে। কারণ কাফীল তার স্থলবর্তী।

وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى عَبْدٍ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيْلُ لِبَرَاءَةِ الْأَصِيْلِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْمَكْفُوْلُ بِنَفْسِهِ حُرًّا قَالَ : فَإِنِ ادَّعٰى رَقَبَةَ الْعَبْدِ وَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ضَمِنَ الْكَفِيْلُ قِيْمَتَهُ، لِأَنَّ عَلَى الْمَوْلٰى رَدَّهَا عَلٰى وَجْهٍ تَخْلُفُهَا قِيْمَتُهَا، وَقَدِ الْتَزَمَ الْكَفِيْلُ ذٰلِكَ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبْقَى الْقِيْمَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْأَصِيْلِ، فَكَذَا عَلَى الْكَفِيْلِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো গোলামের বিরুদ্ধে মালের দাবি করে আর কোনো লোক তার অনুকূলে গোলামের দেহসত্তার কাফীল হয়, অতঃপর গোলামটি মারা যায় তাহলে মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন দেহসত্তার দায় গ্রহণকৃত ব্যক্তি [মাকফূল বিনাফসিহী] স্বাধীন ব্যক্তি হলে [তার মৃত্যুজনিত কারণে কাফীল] দায়মুক্ত হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [বর্তমান দখলদারের বিরুদ্ধে] গোলামের মালিকানার দাবি করে আর কোনো লোক তার দেহসত্তার কাফীল হয়, এরপর গোলামটি মারা যায় এবং বাদী [বিচারকের সম্মুখে] এই মর্মে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, গোলামটি তারই ছিল, তাহলে কাফীল গোলামটির বাজারমূল্যের জামিন হবে। কেননা [দখলদার] মনিবের উপর আবশ্যক ছিল গোলামটিকে এমনভাবে ফেরত দেওয়া যে, অক্ষমতায় তার বাজারমূল্য তার স্থলবর্তী হবে। আর কাফীল এরই দায়গ্রহণ করেছে। আর মৃত্যুর পর বাজারমূল্য ফেরত দান মূল ব্যক্তির উপর ওয়াজিবরূপে বহাল থাকে। তাই কাফীলের উপরও তা বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى عَبْدٍ مَالًا الخ : এক ব্যক্তি গোলামের বিরুদ্ধে মালের দাবি করল আর কোনো লোক তার অনুকূলে গোলামের দেহসত্তার কাফীল হলো অর্থাৎ তাকে বিচারকের দরবারে উপস্থিত করার দায় গ্রহণ করল, অতঃপর গোলামটি মারা গেল তাহলে কাফীল দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা মৃত্যুবরণ করার কারণে মাকফূল আনহু তথা গোলামটি দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর মাকফূল আনহু দায়মুক্ত হয়ে গেলে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে যায়। যেমন– দেহসত্তার দায় গ্রহণকৃত ব্যক্তি অর্থাৎ মাকফূল বিনাফসিহী যদি গোলাম না হয়ে স্বাধীন ব্যক্তি হয় আর সে দায়মুক্ত হয়ে যায় তাহলে কাফীলও দায়মুক্ত হয়ে যায়। মোটকথা, মাকফূল বিনাফসিহী স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক, মৃত্যুবরণ করার দ্বারা বিচারকের দরবারে তার উপস্থিতির দায় রহিত হয়ে যায় বলে কাফীলও তাকে উপস্থিত করানোর দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنِ ادَّعٰى الخ - **মাসআলা :** কেউ যদি বর্তমান দখলদারের বিরুদ্ধে গোলামের মালিকানার দাবি করে যে, তোমার দখলে যে গোলামটি আছে তা আমার, আর কোনো লোক তার কাফীল হয় অর্থাৎ ঐ গোলামটিকে বিচারকের দরবারে হাজির করার দায় গ্রহণ করে, এরপর গোলামটি মারা যায় এবং দাবিদার বিচারকের সম্মুখে এই মর্মে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, গোলামটি তারই ছিল, তাহলে কাফীল গোলামটির قِيْمَةٌ তথা বাজারমূল্যের জামিন হবে। দলিল হলো, দখলদারের উপর ওয়াজিব হলো সে দাবিকৃত গোলামটি মূল মালিককে ফেরত দিবে। মৃত্যুবরণ করার কারণে দখলদার তথা মাকফূল আনহু গোলামটি মূল মালিককে ফেরত দিতে অক্ষম। তাই তার উপর জরিমানা হিসেবে قِيْمَةٌ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। আর মাকফূল আনহুর উপর জরিমানা হিসেবে قِيْمَةٌ ফেরত দান ওয়াজিব হলে কাফীলের উপরও তা ওয়াজিব হবে। কেননা কাফালাহ চুক্তির মাধ্যমে কাফীল নিজের উপর ঐ জিনিসের তাগাদার দায় আরোপ করেছে যার তাগাদা মাকফূল আনহুর উপর ওয়াজিব। অতএব মৃত্যুবরণ করার পর মাকফূল আনহুর উপর যেহেতু তার قِيْمَةٌ ফেরত দান ওয়াজিব তাই কাফীলের উপরও তা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। পূর্বের মাসআলায় মৃত্যুবরণ করার কারণে মাকফূল আনহুর উপর থেকেই বিচারকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার দায় রহিত হয়ে গেছে। তাই কাফীলের উপর থেকেও তাকে উপস্থিত করানোর দায় রহিত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ فَعُتِقَ فَأَدَّاهُ أَوْ كَانَ الْمَوْلٰى كَفَلَ عَنْهُ فَأَدَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) يَرْجِعُ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، حَتّٰى تَصِحُّ كَفَالَتُهُ بِالْمَالِ عَلَى الْمَوْلٰى، إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ، أَمَّا كَفَالَتُهُ عَنِ الْعَبْدِ فَتَصِحُّ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، لَهُ أَنَّهُ تَحَقَّقَ الْمُوْجِبُ لِلرُّجُوْعِ، وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ، وَالْمَانِعُ وَهُوَ الرِّقُّ قَدْ زَالَ، وَلَنَا أَنَّهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوْجِبَةٍ لِلرُّجُوْعِ، لِأَنَّ الْمَوْلٰى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلٰى عَبْدِهِ دَيْنًا، وَكَذَا الْعَبْدُ عَلٰى مَوْلَاهُ، فَلَا تَنْقَلِبُ مُوْجِبَةً أَبَدًا، كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি গোলাম তার মনিবের আদেশক্রমে তার পক্ষ থেকে কাফীল হয়, এরপর আজাদ হয়ে যায় এবং দায়বদ্ধ মাল পরিশোধ করে কিংবা মনিব যদি গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হয় এবং [গোলামের] আজাদ হওয়ার পর দায়বদ্ধ মাল পরিশোধ করে তাহলে তাদের দুজনের কেউ অপরজন থেকে ফেরত নিতে পারবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফেরত নিতে পারবে। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] প্রথমোক্ত সুরতের অর্থ হলো, গোলামের উপর আগে থেকে কোনো ঋণ না থাকলে মনিবের পক্ষ থেকে তার কাফালাহ বিল মাল বৈধ হবে; যদি মনিবের আদেশক্রমে হয়। তবে গোলামের পক্ষ থেকে মনিবের কাফীল হওয়াটা সর্বাবস্থায়ই শুদ্ধ হবে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারী বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে। তা হলো মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ। আর দাস হওয়ার যে প্রতিবন্ধকতা তা [মুক্তি লাভের মাধ্যমে] বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের দলিল হলো, এ কাফালাহ ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারী রূপে সম্পন্ন হয়নি। কেননা মনিব তার গোলামের কাছে কোনো ঋণের হকদার হয় না, অদ্রূপ গোলামও তার মনিবের কাছে কোনো ঋণের হকদার হয় না। সুতরাং পরবর্তীতে উক্ত কাফালাহ কখনো ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে পরিবর্তিত হবে না। যেমন– কেউ কারো পক্ষ থেকে তার বিনা আদেশে কাফীল হলো, এরপর মাকফূল আনহু তা অনুমোদন করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দু'টি মাসআলা উল্লিখিত হয়েছে–

১. গোলাম মুনিবের পক্ষ থেকে তার আদেশক্রমে কাফীল হবে। এর দু সুরত। যথা– ক. গোলামের উপর তার বাজারমূল্য সমান ঋণ আছে। খ. গোলামের উপর কোনো ঋণ নেই। প্রথম সুরতে পাওনাদারদের হক গোলামের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় মনিবের পক্ষ থেকে তার কাফীল হওয়া জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় সুরতে মনিবের পক্ষ থেকে গোলামের কাফীল হওয়া জায়েজ আছে, যদি মনিবের আদেশক্রমে হয়। উপরিউক্ত ইবারতে এ দ্বিতীয় সুরত আলোচিত হয়েছে।

২. মনিব গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হবে। এটা সর্বাবস্থায় জায়েজ আছে, কাফালাহ বিন নাফস হোক বা কাফালাহ বিল মাল হোক, গোলাম ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত না হয় এবং মনিবের আদেশক্রমে তার পক্ষ থেকে কাফীল হয়, এরপর আজাদ হয়ে যায় এবং মনিবের পক্ষ থেকে যে মালের দায় গ্রহণ করেছিল তা পরিশোধ করে কিংবা মনিব তার গোলামের পক্ষ থেকে কাফীল হয় এবং গোলামের আজাদ হওয়ার পর কাফালাহ -এর ভিত্তিতে গোলামের দায় পরিশোধ করে তাহলে প্রথম মাসআলায় গোলামের স্বীয় মনিব থেকে এবং দ্বিতীয় মাসআলায় মনিবের স্বীয় গোলাম থেকে পরিশোধকৃত দায়ের বিপরীতে কিছুই ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, প্রত্যেকের স্বীয় মাকফূল আনহু থেকে রুজু করার অর্থাৎ পরিশোধকৃত দায় পরিমাণ মাল ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে।

قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ تَحَقَّقَ الْمُوْجِبُ لِلرُّجُوْعِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ الخ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, মাকফূল আনহুর আদেশক্রমে কাফালাহ গ্রহণ করার সুরতে কাফীল মাকফূল লাহুকে মাকফূল আনহুর পক্ষ থেকে মাল পরিশোধ করার পর মাকফূল আনহু থেকে তা ফেরত নিতে পারে। আর ফেরত নিতে না পারার যে প্রতিবন্ধকতা (مَانِعٌ) ছিল অর্থাৎ গোলাম হওয়া, তা বিদূরিত (زَائِلٌ) হয়ে গেছে। কারণ মনিবের পক্ষ থেকে গোলামের কাফীল হওয়ার সুরতেও আজাদ হওয়ার পর গোলাম মাকফূল লাহুকে মাল পরিশোধ করেছে এবং মনিবের কাফীল হওয়ার সুরতেও গোলামের আজাদ হওয়ার পর মনিব মাকফূল লাহুর মাল পরিশোধ করেছে। অতএব উভয় মাসআলাতেই মাকফূল আনহু থেকে রুজু করার কারণ (سَبَبٌ) পাওয়া গেছে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট নেই। তাই প্রথম মাসআলায় গোলাম মনিব থেকে এবং দ্বিতীয় মাসআলায় মনিব গোলাম থেকে রুজু করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوْجِبَةٍ لِلرُّجُوْعِ : আমাদের দলিল হলো, উভয় মাসআলাতেই কাফালাহ ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারী (مُوْجِبٌ لِلرُّجُوْعِ) রূপে সম্পন্ন হয়নি অর্থাৎ গোলামের মনিব থেকে এবং মনিবের গোলাম থেকে মাল নেওয়ার কারণ (سَبَبٌ) বিদ্যমান নেই। কেননা মনিব তার গোলামের কাছে কোনো ঋণের হকদার হয় না, তদ্রূপ গোলামও তার মনিবের কাছে কোনো ঋণের হকদার হয় না। যখন কেউ ঋণের হকদার হয় না তখন এ কাফালাহ ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারী রূপে সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং পরবর্তীতে (اِنْتِهَاءً) উক্ত কাফালাহ কখনো ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে পরিবর্তিত হবে না। কারণ যে কাফালাহ সূচনায় ফেরত গ্রহণ আবশ্যকারীরূপে সম্পন্ন হয় না তা পরবর্তীতে ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে পরিবর্তিত হতে পারে না। যেহেতু এ কাফালাহ ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারী নয় তাই মাকফূল লাহুকে মাল পরিশোধ করার পর তা মাকফূল আনহু থেকে কাফীল ফেরত নিতে পারবে না; কাফীল মনিব হোক বা গোলাম হোক।

قَوْلُهُ كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ الخ : এটা কারো পক্ষ থেকে তার আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করার মতো হলো। কেউ যদি কারো পক্ষ থেকে তার আদেশ ছাড়া কাফালাহ গ্রহণ করে, এরপর মাকফূল আনহু তা জানতে পেরে কাফালাহকে অনুমোদন করে তাহলে মাকফূল লাহুকে কাফীল যে মাল পরিশোধ করবে তা মাকফূল আনহু থেকে কাফীল ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করে না। কেননা মাকফূল আনহু যদিও পরে অনুমোদন দিয়েছে; কিন্তু সূচনায় (اِبْتِدَاءً) অর্থাৎ কাফালাহ গ্রহণ করার সময় তার অনুমতি ছিল না। সূচনায় অনুমতি না থাকায় কাফালাহ ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে সম্পন্ন হয়নি। আর যা সূচনায় ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে সম্পন্ন হয় না তা পরে অনুমোদন দিলেও তা ফেরত গ্রহণ আবশ্যককারীরূপে পরিবর্তিত হতে পারে না।

وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ حُرٌّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي، فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ عَجَزَ نَفْسُهُ سَقَطَ، وَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيْلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُطْلَقًا يُنَافِي مَعْنَى الضَّمِّ، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِتِّحَادُ، وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الْكِتَابَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : কিতাবাত চুক্তির মালের দায়গ্রহণ করা বৈধ নয়; স্বাধীন ব্যক্তি তার দায়গ্রহণ করুক কিংবা গোলাম [দায়গ্রহণ করুক]। কেননা এটা এমন ঋণ, যা [দাসত্বের] প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাব্যস্ত হয়েছে। তাই কাফালাহ -এর বৈধতার ক্ষেত্রে এ ঋণের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না। তাছাড়া এটা এমন ঋণ, যদি গোলাম এটা পরিশোধে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে তা রহিত হয়ে যায়। আর এ প্রকৃতিসহ উক্ত ঋণ কাফীলের জিম্মায় সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এ প্রকৃতি ছাড়া ঋণকে [কাফীলের জিম্মায়] সাব্যস্ত করা কাফালাহ অর্থ তথা 'সংযুক্তি' অর্থের বিপরীত। কেননা সংযুক্তির শর্ত হলো অভিন্নতা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে পরিশ্রমের মাধ্যমে দায়বদ্ধ মাল কিতাবত চুক্তির মালের মতো। কেননা, তাঁর মতে সে মুকাতীবের অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ الخ : মাসআলা হলো, মুনিবের জন্য মুকাতাব [চুক্তিবদ্ধ গোলাম] -এর পক্ষ থেকে কিতাবতের মালের কাফালাহ জায়েজ নেই, চাই স্বাধীন ব্যক্তি কাফালাহ গ্রহণ করুক বা গোলাম কাফালাহ গ্রহণ করুক। কুদূরী গ্রন্থকার (র.) مَالُ الْكِتَابَةِ [কিতাবতের মাল] -এর কথা বলেছেন, بَدَلُ الْكِتَابَةِ [বদলুল কিতাবত]-এর কথা বলেননি। কারণ 'মালে কিতাবত' শব্দটি ব্যাপক, 'বদলুল কিতাবত'-কেও শামিল করে, বদলুল কিতাবত ছাড়া মুকাতীবের কাছে মনিবের প্রাপ্য অন্য ঋণকেও শামিল করে। মোটকথা, মনিবের জন্য মুকাতাবের পক্ষ থেকে বদলুল কিতাবতের কাফালাহও জায়েজ নয়, মনিবের প্রাপ্য অন্য কোনো ঋণের কাফালাহও জায়েজ নয়।

উল্লেখ্য যে, বদলুল কিতাবত (بَدَلُ الْكِتَابَةِ) হলো ঐ মাল যার বিনিময়ে মনিব তার গোলামকে আজাদ করার জন্য গোলামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ গোলামকে মুকাতাব (مُكَاتَبٌ) এবং চুক্তিকারী মুনিবকে মুকাতিব (مُكَاتِبٌ) বলা হয়। মুকাতাব বদলুল কিতাবতের সম্পূর্ণ অর্থ বা মাল পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত গোলামই থাকে। আর পূর্বে গেছে যে, গোলামের কাছে মুনিব কোনো ঋণের হকদার হয় না। কারণ মনিবের দাসত্বে থাকা আর গোলামের কাছে মনিব ঋণের হকদার হওয়া বিপরীতমুখী (مُنَافِيْ) বিষয়। তাই কিয়াসের দাবি হলো মুকাতাবের উপর বদলুল কিতাবাত ওয়াজিব করা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু কুরআনুল কারীমের আয়াত– فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ 'তোমরা কল্যাণ মনে করলে তাদেরকে মুকাতাব বানাও' -এর কারণে কিয়াসকে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ দাসত্ব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার উপর বদলুল কিতাবত ওয়াজিব করা হয়েছে। আর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যা সাব্যস্ত হয় তা অস্থিতিশীল (غَيْر مُسْتَقَرٌ) হয় অর্থাৎ এক হিসেবে সাব্যস্ত, আরেক হিসেবে সাব্যস্ত নয়। আর যে ঋণ অস্থিতিশীল (غَيْر مُسْتَقَرٌ) হয় এবং চূড়ান্ত সাব্যস্তকৃত না হয় তার কাফালাহ শুদ্ধ নয়। তাই বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ শুদ্ধ নয়।

বদলুল কিতাব অস্থিতিশীল ঋণ (دَيْن غَيْر مُسْتَقَرّ) এর আরেকটি দলিল হলো, যদি মুকাতাব বদলুল কিতাবত পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করে কিংবা অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে বদলুল কিতাবত রহিত হয়ে যায়। অথচ স্থিতিশীল ঋণ (دَيْن مُسْتَقَرّ) রহিত হয় পরিশোধ করার দ্বারা বা পাওনাদের দায়মুক্ত করার দ্বারা। আর বদলুল কিতাবত রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটোর কোনোটিই পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় বদলুল কিতাবত অস্থিতিশীল ঋণ। আর অস্থিতিশীল ঋণ বিশুদ্ধ ঋণ নয়। আর কাফালাহ বিশুদ্ধ ঋণের ক্ষেত্রেই বৈধ। তাই বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ বৈধ নয়।

বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ জায়েজ নেই, -এর পক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ জায়েজ হয় তাহলে তার দু সুরত–

১. মাকফূল আনহু তথা মুকাতাবের উপর বদলুল কিতাবাত যেভাবে সাব্যস্ত কাফীলের উপর বদলুল কিতাবাতের দায় অনুরূপ সাব্যস্ত হবে। আর মুকাতাবের উপর বদলুল কিতাবাত এভাবে সাব্যস্ত যে, যদি সে তা পরিশোধে অক্ষম তাহলে কিতাবাত চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং মুকাতাব দাসত্বে ফিরে যায়; কিন্তু কাফীলের বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ কাফীল যদি বদলুল কিতাবাত পরিশোধে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে সে দাসত্বে ফিরে যায় না। তাই মাকফূল আনহু তথা মুকাতাবের উপর বদলুল কিতাবাত যেভাবে সাব্যস্ত হয় কাফীলের উপর সেভাবে বদলুল কিতাবাতের দায় সাব্যস্ত করা যায় না।

২. কাফীলের উপর বদলুল কিতাবাতের দায় সাব্যস্ত হবে নিঃশর্ত। এটাও জায়েজ নেই। কেননা কাফালাহ - এর অর্থ হলো জিম্মার সাথে জিম্মার সংযুক্তি। আর এর জন্য শর্ত হলো মাকফূল আনহুর উপর যে গুণাগুণের সাথে ঋণ ওয়াজিব ও সাব্যস্ত ছিল কাফীলের উপরও সেই গুণাগুণের সাথে ঋণের দায় ওয়াজিব ও সাব্যস্ত হবে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় মুকাতাবের উপর বদলুল কিতাবাতের দায় শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) অর্থাৎ সক্ষম হলে সে তা পরিশোধ করবে, সক্ষম না হলে তা রহিত হয়ে যাবে এবং সে দাসত্বে ফিরে যাবে, আর কাফীলের উপর বদলুল কিতাবাতের দায় নিঃশর্ত। যখন শর্ত পাওয়া গেল না তখন কাফালাহও শুদ্ধ হবে না। অতএব প্রমাণিত হলো বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَبَدْلُ السِّعَايَةِ كَمَالُ الْكِتَابَةِ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে বদলুস সি'আয়াহ (بدل السعاية), কাফালাহ জায়েজ না হওয়ার ক্ষেত্রে মালে কিতাবাতের মত। অর্থাৎ বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ যেরূপ জায়েজ নেই তেমনি বদলুস সি'আয়ার কাফালাহও জায়েজ নেই। বদলুস সি'আয়াহ হলো, মনিব কর্তৃক গোলামের একাংশ আজাদ করে দেওয়ার পর গোলামের অবশিষ্টাংশ আজাদ হওয়ার জন্য শ্রমের বিনিময়ে অবশিষ্ট অংশের قِيْمَة গোলামকে পরিশোধ করতে হয়। যখন অবশিষ্ট অংশের قِيْمَة পরিশোধ হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশও আজাদ হয়ে যায়। এই শ্রম বিনিময়ই হলো বদলুস সি'আয়াহ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বদলুস সি'আয়াহ -এর কাফালাহ জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো তাঁর মতে শ্রমদাতা গোলাম মুকাতাবের মতো। মুকাতাব যেরূপ দুইয়ের অধিক বিবাহ করতে পারে না, তার সাক্ষ্য কবুল হয় না, তার ক্ষেত্রে হদ অর্ধেক, শ্রমদাতা গোলামের ক্ষেত্রে এসব বিধান একই। তাই মুকাতাবের পক্ষ থেকে যেরূপ বদলুল কিতাবাতের কাফালাহ জায়েজ নেই তেমনি শ্রমদাতা গোলামের পক্ষ থেকেও বদলুস সি'আয়ার কাফালাহ জায়েজ হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে বদলুস সি'আয়াহ -এর কাফালাহ জায়েজ আছে। কেননা বদলুস সি'আয়াহ স্থিতিশীল ঋণ। কারণ শ্রমদাতা গোলাম শ্রম দিতে অক্ষমও হয় না এবং বদলুস সি'আয়াহ তার থেকে রহিতও হয় না। তাই শ্রমদাতা গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মতো। স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেরূপ কাফালাহ জায়েজ তেমনি শ্রমদাতা গোলামের পক্ষ থেকেও বদলুস সি'আয়ার কাফালাহ জায়েজ হবে।

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

অধ্যায় : হাওয়ালাহ

'হাওয়ালাহ'(اَلْحَوَالَةُ) স্থানান্তর ও হস্তান্তর -এর অর্থ প্রদান করে। 'তাহবীল' (تَحْوِيْل) বলা হয় কোনো জিনিসকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা। শরিয়তের পরিভাষায় 'হাওয়ালাহ' হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মা থেকে ঋণকে দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির জিম্মায় স্থানান্তরিত করা। উদাহরণত শাহিদ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, শামীল তার কাছে এক হাজার টাকা পাবে। শরীফ শামীলকে বলল, 'শাহিদের কাছে তুমি যে এক হাজার টাকা পাবে তার দায় এখন থেকে আমি গ্রহণ করলাম; এই টাকা আমার কাছ থেকে নিও।' এ বক্তব্যে শাহিদের জিম্মা থেকে ঋণকে শরীফের জিম্মায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

'হাওয়ালাহ' প্রসঙ্গে চারটি শব্দ প্রণিধাণযোগ্য। যথা– ১. মুহীল (مُحِيْل) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ২. মুহতাল লাহু (مُحْتَالٌ لَهُ) : পাওনাদার, ৩. মুহতাল আলাইহি (مُحْتَالٌ عَلَيْهِ) : হাওয়ালাদার বা দায়গ্রহণকারী ও ৪. মুহতাল বিহী (مُحْتَالٌ بِهٖ) : হাওয়ালাকৃত মাল বা অর্থ। উপরিউক্ত উদাহরণে শাহিদ মুহীল, শামীল মুহতাল লাহু, শরীফ মুহতাল আলাইহি, আর এক হাজার টাকা মুহতাল বিহী।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ফকীহগণ এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, হাওয়ালাহ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মুহীল কি তাগাদা (مُطَالَبَة) এবং ঋণ (دَيْن) উভয়টা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়, না শুধু তাগাদা থেকে দায়মুক্ত হয়? কারো কারো মতে ঋণ এবং তাগাদা উভয়টা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়। কারো কারো মতে শুধু তাগাদা থেকে দায়মুক্ত হয়।

হাওয়ালাহ দু প্রকার। যথা–

১. হাওয়ালাহ মুতলাকাহ (اَلْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ) ও ২. হাওয়ালাহ মুকায়্যাদাহ (اَلْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ)। হাওয়ালাহ মুতলাকাহ হলো যে হাওয়ালাতে কোনো শর্ত নেই। এটা আবার দুপ্রকার। যথা–

১. মেয়াদি (مِيْعَادِيْ) ২. মেয়াদবিহীন (غَيْر مِيْعَادِيْ)। মেয়াদি হাওয়ালাহ (اَلْحَوَالَةُ الْمِيْعَادِيْ) হলো, মুহীলের কাছে এক ব্যক্তি এক বছর মেয়াদে একহাজার টাকা পাবে। মুহীল এ ঋণকে হাওয়ালাহ চুক্তির মাধ্যমে মুহতাল আলাইহির দিকে স্থানান্তরিত করল। এতে মুহতাল আলাইহির উপর এ ঋণ মেয়াদি সাব্যস্ত হবে। মেয়াদ পূর্তির আগে মুহতাল লাহু তার কাছে ঋণের তাগাদা করতে পারবে না। আর মেয়াদবিহীন হাওয়ালাহ হলো, মুহীলের কাছে এক ব্যক্তি বর্তমানে একহাজার টাকা পাবে। মুহীল হাওয়ালাহ চুক্তির মাধ্যমে এ ঋণকে মুহতাল আলাইহির দিকে স্থানান্তরিত করল। এতে মুহতাল আলাইহির উপরও এ ঋণ তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য রূপে সাব্যস্ত হবে।

হাওয়ালাহ মুকায়্যদাহ (اَلْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ) হলো মুহীলের কাছে ঋণগ্রস্ত এমন ব্যক্তির দিকে ঋণকে স্থানান্তরিত করা। যেমন শাহিদ শামীলের কাছে একহাজার টাকা পাবে। আর শামীল পাবে আরীফের কাছে পনেরশ' টাকা। শামীল আরীফকে বলল, তুমি আমার পাওনা থেকে একহাজার টাকা শাহিদকে দিয়ে দাও। এটাকে বলা হবে হাওয়ালাহ মুকায়্যদাহ।

হাওয়ালাহ মুকায়্যাদাহও দু প্রকার। যথা–

১. মুহতাল আলাইহির কব্জায় থাকা মালের হাওয়ালাহ করা, তা মুহতাল আলাইহির কব্জায় আমানতরূপে হোক বা গসবরূপে হোক। উদাহরণত মুহীল মুহতাল আলাইহির কাছে একহাজার টাকা আমানত রাখল। কিছু দিন পর মুহীল আমানতকারীকে বলল, তুমি এ একহাজার টাকা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ কর। কিংবা মুহতাল আলাইহি মুহীলের দশ মন গম গসব করেছে। মুহীল মুহতাল আলাইহিকে বলল, তুমি এ গম দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ কর।

২. মুহতাল আলাইহির কাছে মুহীল যে ঋণ পাবে হাওয়ালাকে তার সাথে শর্তযুক্ত করা। উদাহরণত মুহীল মুহতাল আলাইহি থেকে এক হাজার টাকা পাবে। মুহীল এ একহাজার টাকাকে হাওয়ালাহ করল; মুহতাল আলাইহিকে বলল, আমি তোমার কাছে যে একহাজার টাকা পাব তুমি তা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ কর।

হাওয়ালাহ এবং কাফালাহ -এর মাঝে বেশ মিল রয়েছে। কাফালাহ চুক্তিতে কাফীল মাকফূল আনহুর উপর যে ঋণ ওয়াজিব থাকে তার দায় গ্রহণ করে, আর হাওয়ালাহ চুক্তিতে মুহতাল আলাইহি মুহীলের উপর যে ঋণ ওয়াজিব হয় তার দায় গ্রহণ করে। উভয়ের উদ্দেশ্যও এক। উভয় চুক্তির উদ্দেশ্য হলো পাওনাদারকে তার পাওনা প্রাপ্তির ব্যাপারে নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা দান। কাফালাহতে মাকফূল লাহুকে নির্ভরতা ও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, আর হাওয়ালাহতে নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা দেওয়া হয় মুহতাল লাহুকে। হাওয়ালাহ যেহেতু মুহীলের দায়মুক্তিকে শামিল করে তাই তা مُرَكَّبْ -এর পর্যায়ে, আর কাফালাহ যেহেতু মাকফূল আনহুর দায়মুক্তিকে শামিল করে না তাই তা একক (مُفْرَدْ) -এর পর্যায়ে। আর (مُفْرَدْ) একক (مُرَكَّبْ) একাধিকের চেয়ে যেহেতু (مُقَدَّمْ) আগে হয়ে থাকে, তাই গ্রন্থকার কাফালাহ অধ্যায়কে আগে এবং হাওয়ালাহ অধ্যায়কে পরে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالدُّيُوْنِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ، وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ فَتَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ، وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ بِالدُّيُوْنِ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنِ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيْلِ، وَالتَّحْوِيْلُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ঋণের হাওয়ালাহ বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাউকে যদি সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালাহ করা হয় তাহলে সে যেন সচ্ছল ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়। তাছাড়া মুহতাল আলাইহি এমন ঋণের দায় গ্রহণ করেছে যা সে পরিশোধ করতে সক্ষম। সুতরাং কাফালাহ -এর ন্যায় এটাও শুদ্ধ হবে। হাওয়ালাকে ঋণের সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে, কারণ [অভিধানে] এ শব্দটি স্থানান্তর ও হস্তান্তর -এর অর্থ প্রদান করে। আর স্থানান্তর শুধু ঋণের ক্ষেত্রে হয়, বস্তুর ক্ষেত্রে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالدُّيُوْنِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে হাওয়ালাহ-এর বৈধতা সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) আকলী ও নকলী দলিল পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ 'কাউকে যদি সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালাহ করা হয় তাহলে সে যেন সচ্ছল ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।'

এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী (র.) তাঁর মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ সনদে এভাবে সংকলন করেছেন- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সম্পদশালী ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম। আর কাউকে যদি সচ্ছল ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় তাহলে সে যেন সচ্ছল ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।'

এ হাদীসটি হাওয়ালার বৈধতার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দলিল। হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদেও শব্দের কিছুটা পার্থক্যসহ সংকলিত হয়েছে। হাদীসটির সারমর্ম হলো, যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় ঋণকে কোনো সচ্ছল ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত করে এবং তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করে তাহলে স্বচ্ছল ব্যক্তি টালবাহানা না করে, বরং তা কবুল করে নেওয়া উচিত। আর স্বচ্ছল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জিম্মা গ্রহণ করলে তাতে সম্মত হতে ঋণদার তথা মুহতাল লাহুরও কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

আকলী দলিল হলো, মুহতাল আলাইহি নিজের উপর এমন দায় আরোপ করেছে যা পরিশোধে সে সক্ষম। আর যে দায় পরিশোধে দায় আরোপকারী সক্ষম তার দায় আরোপ বৈধ আছে। সুতরাং কাফালাহ -এর মতো হাওয়ালাও বৈধ হবে।

وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ بِالدُّيُوْنِ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) হাওয়ালার বৈধতাকে ঋণের সাথে কেন খাস করেছেন, আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, হাওয়ালাকে ঋণের সাথে খাস করা হয়েছে, কারণ অভিধানে এ শব্দটি স্থানান্তর (نَقْلٌ وَتَحْوِيْلٌ) -এর অর্থ প্রদান করে। আর স্থানান্তর ঋণ (دَيْن) -এর ক্ষেত্রে সম্ভব, বস্তু (أَعْيَانٌ) -এর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেননা, ঋণ (دَيْن) অনির্দিষ্ট হয়, তাই তা মুহতাল আলাইহিও পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বস্তু যেহেতু নির্দিষ্ট হয় তাই তা শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিশোধ করতে পারে যার কাছে তা থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণের হাওয়ালা জায়েজ, বস্তুর হাওয়ালা জায়েজ নয়।

قَالَ : وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِرِضَاءِ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، أَمَّا الْمُحْتَالُ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ حَقُّهُ، وَهُوَ الَّذِي يَنْتَقِلُ بِهَا وَالذِّمَمُ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَابُدَّ مِنْ رِضَاهُ، وَأَمَّا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ، وَلَا لُزُومَ بِدُوْنِ اِلْتِزَامِهِ، وَأَمَّا الْمُحِيلُ فَالْحَوَالَةُ تَصِحُّ بِدُوْنِ رِضَاهُ، ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَاتِ، لِأَنَّ الْتِزَامَ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَهُوَ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ بَلْ فِيْهِ نَفْعُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহীল, মুহতাল লাহু এবং মুহতাল আলাইহি [এ তিনজনের] সম্মতিক্রমে হাওয়ালাহ শুদ্ধ হয়। মুহতাল লাহুর সম্মতি এজন্য প্রয়োজন যে, ঋণ হচ্ছে তার হক। হাওয়ালার কারণে তা [এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে] স্থানান্তরিত হয়। আর বিভিন্ন ব্যক্তির দায়বহন পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং তার সম্মতি অপরিহার্য। আর মুহতাল আলাইহির সম্মতি এজন্য প্রয়োজন যে, ঋণের দায় তার উপর আরোপিত হবে। আর তার দায়গ্রহণ ছাড়া দায়বদ্ধতা নেই। আর মুহীল-এর বিষয়টি হলো, তার সম্মতি ছাড়াই হাওয়ালা শুদ্ধ হয়। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কেননা মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে ঋণের দায়গ্রহণের বিষয়টি নিজ অধিকারে একটি হস্তক্ষেপ। এর দ্বারা মুহীল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং এতে তার ফায়দা রয়েছে। কেননা যদি হাওয়ালা তার আদেশক্রমে না হয় তাহলে মুহতাল আলাইহি তার কাছে [পরিশোধকৃত ঋণের অর্থ বা মাল] ফেরত চাইতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِرِضَاءِ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) হাওয়ালার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কুদূরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাওয়ালাহ-এর শুদ্ধতার জন্য মুহীল, মুহতাল লাহু এবং মুহতাল আলাইহি এ তিনজনের সম্মতি অপরিহার্য। মুহতাল লাহুর সম্মতি অপরিহার্য এ ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই। কারণ ঋণ হচ্ছে তার হক। হাওয়ালা চুক্তির কারণে তা এক ব্যক্তি অর্থাৎ মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মা থেকে অন্য ব্যক্তির অর্থাৎ মুহতাল আলাইহির জিম্মায় স্থানান্তরিত হয়। আর সকলের দায়গ্রহণ সমান হয় না। কেউ অন্যের হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক হয়, টালবাহানার আশ্রয় নেয় না এবং ওয়াদামত পরিশোধ করে। আবার কেউ অন্যের হকের ব্যাপারে অত্যন্ত গাফেল হয়। তাই যার জিম্মায় মুহতাল লাহুর হক স্থানান্তরিত হবে তার প্রতি তার সম্মতি অপরিহার্য।

হাওয়ালা-এর বৈধতার জন্য মুহতাল আলাইহির সম্মতি সর্বাবস্থায় শর্ত কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। মুহতাল আলাইহি যদি মুহীলের কাছে ঋণগ্রস্ত না হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে মুহতাল আলাইহির সম্মতি শর্ত। যদি ঋণগ্রস্ত হয় তাহলেও আমাদের মতে মুহতাল আলাইহির সম্মতি শর্ত। তবে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এ সুরতে মুহতাল আলাইহির সম্মতি শর্ত নয়। -[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬২৩]

তাদের দলিল হলো, যখন মুহতাল আলাইহি মুহীলের কাছে ঋণগ্রস্ত তখন মুহীলের এ অধিকার আছে যে, সে স্বয়ং তার পাওনা পরিশোধ করবে কিংবা অন্য কারো দ্বারা পরিশোধ করাবে। আলোচ্য সুরতে মুহীল হাওয়ালার মাধ্যমে নিজ হক বা অধিকারে

হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفْ) করেছে। আর নিজের হকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অন্য কারো সম্মতি শর্ত নয়। তাই মুহতাল আলাইহি মুহীলের কাছে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সুরতে হাওয়ালার শুদ্ধতার জন্য মুহতাল আলাইহির সম্মতি শর্ত হবে না। এর উপমা হলো, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে কারো কাছে বিক্রি করল। এ বিক্রয় চুক্তির বৈধতার জন্য গোলামের সম্মতি শর্ত নয়। কারণ মনিব নিজ হকে হস্তক্ষেপ করেছে। আর নিজের হকে হস্তক্ষেপের জন্য অন্য কারো সম্মতি শর্ত নয়। –[প্রাগুক্ত]

আমাদের দলিল হলো, হাওয়ালাহ চুক্তির মাধ্যমে মুহীল মুহতাল আলাইহির উপর ঋণের দায় আরোপ করেছে। আর দায়গ্রহণ ছাড়া দায় আরোপিত হতে পারে না। কারণ দায়গ্রহণ ছাড়াই যদি দায় আরোপিত হয় তাহলে যে কেউ অপরের উপর যা ইচ্ছা আরোপ করবে। তাই মুহতাল আলাইহির উপর ঋণের দায় আরোপিত হওয়ার জন্য তার স্বেচ্ছা দায়গ্রহণ জরুরি। আর স্বেচ্ছা দায়গ্রহণ সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই হাওয়ালার বৈধতার জন্য মুহতাল আলাইহির সম্মতি শর্ত।

হাওয়ালার বৈধতার জন্য মুহীলের সম্মতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, মুহীলের সম্মতিও জরুরি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে লিখেছেন মুহীলের সম্মতি ছাড়াই হাওয়ালা শুদ্ধ হবে। এর দলিল হলো, মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে ঋণের দায়গ্রহণের বিষয়টি মুহতাল আলাইহির নিজ অধিকারে একটি হস্তক্ষেপ এবং এর দ্বারা মুহীল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং এতে তার ফায়দা রয়েছে। নগদ ফায়দা হলো তাৎক্ষণিভাবে তার থেকে ঋণের দায় রহিত হয়ে যায়। আর আসল ফায়দা হলো যদি হাওয়ালা তার আদেশক্রমে না হয় তাহলে মুহতাল আলাইহি তার কাছে পরিশোধকৃত ঋণের অর্থ বা মাল ফেরত চাইতে পারবে না। আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ আছে, যদি তা অপরের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, মুহীলের সম্মতি ছাড়াও হাওয়ালাহ হতে পারে। •

قَالَ : وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيْلُ مِنَ الدَّيْنِ بِالْقُبُوْلِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا يَبْرَأُ اِعْتِبَارًا بِالْكَفَالَةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ تَوَثُّقٍ، وَلَنَا أَنَّ الْحَوَالَةَ النَّقْلُ لُغَةً، وَمِنْهُ حَوَالَةُ الْغِرَاسِ، وَالدَّيْنُ مَتٰى اِنْتَقَلَ عَنِ الذِّمَّةِ لَا يَبْقٰى فِيْهَا، أَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِلضَّمِّ، وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَلٰى وِفَاقِ الْمَعَانِيْ اللُّغَوِيَّةِ، وَالتَّوَثُّقُ بِاخْتِيَارِ الْأَمْلَاءِ وَالْأَحْسَنِ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُوْلِ إِذَا نَقَدَ الْمُحِيْلُ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الْمُطَالَبَةِ إِلَيْهِ بِالتَّوٰى، فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন হাওয়ালাহ সম্পন্ন হবে তখন কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে মুহীল ঋণ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) কাফালাহ -এর উপর কিয়াস করে বলেন, মুহীল দায়মুক্ত হবে না। কেননা কাফালাহ ও হাওয়ালা দুটোই হচ্ছে [ঋণের প্রাপ্তি] নিশ্চিতকরণের চুক্তি। আমাদের দলিল হলো, হাওয়ালার আভিধানিক অর্থ হলো স্থানান্তর করা। এ থেকেই [গাছের] চারা স্থানান্তরের জন্য হাওয়ালাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঋণ যখন [কারো] জিম্মা থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন [তার] জিম্মায় তা অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে কাফালাহ হচ্ছে সংযুক্তকরণ। আর শরিয়তের বিধানসমূহ আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর নিশ্চিতকরণের বিষয়টি এখানে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি এবং [ঋণ] পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকতর সৎ ব্যক্তির দায়গ্রহণের দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। তবে মুহীল যদি [ঋণের অর্থ] পরিশোধ করে তাহলে মুহতাল লাহুকে তা কবুল করতে এজন্য বাধ্য করা হয় যে, ঋণের গচ্ছা যাওয়ার সুরতে মুহীলের দিকে তাগাদা প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সে স্বেচ্ছাদানকারী হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) হাওয়ালাহ-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন মুহতাল লাহু ও মুহতাল আলাইহি হাওয়ালা চুক্তিতে সম্মত হবে এবং হাওয়ালা চুক্তি সম্পন্ন হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে মুহীল তাগাদা ও ঋণ উভয়টা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) কাফালাহ-এর উপর কিয়াস করে বলেন, মুহীল তাগাদা এবং ঋণ কোনোটা থেকেই দায়মুক্ত হবে না। ফকীহগণের কারো কারো মতে মুহীল তাগাদা থেকে দায়মুক্ত হবে, তবে ঋণ থেকে দায়মুক্ত হবে না।

ইমাম যুফার (র.) হাওয়ালাকে কাফালাহ-এর উপর কিয়াস করেন। তিনি বলেন, কাফালাহ ও হাওয়ালা দুটোই হচ্ছে ঋণের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের চুক্তি (عَقْد تَوَثُّق)। অতএব, কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে কাফীলের দায়গ্রহণ সত্ত্বেও যেরূপ মাকফূল আনহু ঋণ ও তাগাদা থেকে দায়মুক্ত হয় না তেমনি হাওয়ালা -এর ক্ষেত্রেও মুহতাল আলাইহির দায়গ্রহণ সত্ত্বেও মুহীল তাগাদা ও ঋণ থেকে দায়মুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْحَوَالَةَ النَّقْلُ لُغَةً وَمِنْهُ حَوَالَةُ الخ : আমাদের দলিল হলো, হাওয়ালার আভিধানিক অর্থ হলো স্থানান্তর করা (اَلنَّقْلُ وَالتَّحْوِيْلُ) : এ থেকেই চারা স্থানান্তরের জন্য হাওয়ালা শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঋণ যখন কারো জিম্মা থেকে স্থানান্তরিত

হয়ে যায় তখন তার জিম্মায় তা আর অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে কাফালাহ হচ্ছে সংযুক্তকরণ (اَلضَّمُّ), মাকফূল আনহুর জিম্মার সাথে কাফীলের জিম্মা সংযুক্ত হয়, জিম্মা স্থানান্তরিত হয় না। আর শরিয়তের বিধানসমূহ আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই 'হাওয়ালাহ'-এর আভিধানিক অর্থের বিচারে মুহীল তাগাদা এবং ঋণ উভয়টা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে আর কাফালাহ -এর আভিধানিক অর্থের বিচারে মাকফূল আনহুর উপর উভয়টার দায় অবশিষ্ট থাকবে।

মুহীল ঋণ ও তাগাদার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায় এর আরেকটি দলিল হলো, যদি মুহতাল লাহু হাওয়ালা চুক্তির পর মুহীলকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হয় না; কিন্তু যদি মুহতাল আলাইহিকে দায়মুক্ত করে দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হয়। যদি মুহীলের জিম্মায় ঋণ অবশিষ্ট থাকত তাহলে তাকে দায়মুক্ত করা শুদ্ধ হতো। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাওয়ালা চুক্তির কারণে ঋণ মুহীলের জিম্মা থেকে মুহতাল আলাইহির জিম্মায় চলে আসে।

قَوْلُهُ وَالتَّوَثُّقُ بِاخْتِيَارِ الْأَمْلَاءِ وَالْأَحْسَنِ فِي الْقَضَاءِ : গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহতাল লাহুর ঋণের প্রাপ্তি নিশ্চয়করণের জন্য মুহীলের জিম্মায় তাগাদা ও ঋণ অবশিষ্ট থাকা জরুরি নয়; বরং মুহীলের তুলনায় অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকতর সৎ ব্যক্তির দায়গ্রহণের দ্বারা এখানে নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সাব্যস্ত হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ إِذَا نَقَدَ الْمُحِيْلُ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যদি মুহতাল আলাইহির পরিশোধ করার আগে মুহীল মুহতাল লাহুকে ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে তা গ্রহণে মুহতাল লাহুকে বাধ্য করা হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুহীলের জিম্মায় ঋণ অবশিষ্ট থাকে। কেননা যদি মুহীলের জিম্মায় ঋণ অবশিষ্ট না থাকত তাহলে মুহীল ঋণ পরিশোধে স্বেচ্ছাদানকারী (مُتَبَرِّعٌ) হতো। আর স্বেচ্ছাদানকারীর দান গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যায় না। মুহতাল লাহুকে গ্রহণে বাধ্য করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, মুহীল স্বেচ্ছাদারকারী নয়। যখন মুহীল স্বেচ্ছাদানকারী নয় তখন এটাই সাব্যস্ত হলো যে, তার জিম্মায় ঋণ অবশিষ্ট আছে, হাওয়ালা চুক্তির কারণে সে ঋণ থেকে দায়মুক্ত হয়নি।

উত্তর : গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, হাওয়ালা চুক্তির কারণে মুহীল ঋণ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায় এটা নিশ্চিত। তবে ঋণের গচ্চা যাওয়ার সুরতে, উদাহরণত মুহতাল আলাইহি হাওয়ালা চুক্তিকে অস্বীকার করল কিংবা সে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল কিংবা সে বিচারক কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলো, এসব সুরতে মুহীলের দিকে তাগাদা (مُطَالَبَة) প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা (اِحْتِمَالٌ) রয়েছে। আর ঋণের তাগাদা প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় মুহীল ঋণ পরিশোধে স্বেচ্ছাদানকারী হবে না। যেহেতু স্বেচ্ছাদানকারী হবে না তাই মুহতাল লাহুকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

তাছাড়া স্বেচ্ছাদানকারী (مُتَبَرِّعٌ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের উপর ইহসানের নিয়ত করে এবং তার দ্বারা নিজ থেকে ক্ষতি হটানো উদ্দেশ্য হয় না। অথচ মুহীলের ঋণ পরিশোধ দ্বারা নিজ থেকে ক্ষতি হটানোই উদ্দেশ্য। কারণ মুহীল ঋণ পরিশোধ করে তার কাছে মুহতাল লাহুর তাগাদার সম্ভাবনাকে রহিত করে এবং ভবিষ্যতে নিঃস্ব হয়ে গেলে ঋণের কারণে যেন বন্দিত্ব বরণ করতে না হয় তার সম্ভাবনা দূর করে।

قَالَ : وَلَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيْلِ إِلَّا أَنْ يَتْوٰى حَقُّهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ : لَا يَرْجِعُ وَإِنْ تَوٰى، لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ قَدْ حَصَلَتْ مُطْلَقَةً فَلَا يَعُوْدُ إِلَّا بِسَبَبٍ جَدِيْدٍ، وَلَنَا أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ، إِذْ هُوَ الْمَقْصُوْدُ، أَوْ تَفْسَخُ الْحَوَالَةُ لِفَوَاتِهِ، لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلْفَسْخِ، فَصَارَ كَوَصْفِ السَّلَامَةِ فِى الْمَبِيْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহতাল লাহু মাহীলের দিকে রুজু করতে পারবে না, যদি না তার হক গচ্ছা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গচ্ছা গেলেও মুহতাল লাহু রুজু করতে পারবে না। কেননা [মুহীলের] দায়মুক্তি নিঃশর্তরূপে অর্জিত হয়েছে। সুতরাং নতুন কোনো 'কারণ' ছাড়া তা ফিরে আসবে না। আমাদের দলিল হলো, মুহীলের দায়মুক্তি মুহতাল লাহুর হক নিরাপদ থাকার সাথে শর্তযুক্ত। কেননা [হাওয়ালা চুক্তির] এটাই উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য হারিয়ে যাওয়ায় হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ হাওয়ালা বাতিলযোগ্য চুক্তি। সুতরাং এটা বিক্রয় পণ্যের দোষমুক্ত হওয়ার গুণের মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الخ : মাসআলা : হাওয়ালাহ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মুহতাল লাহু মুহীলের কাছে ঋণ চাইতে পারবে না, যদি না তার হক গচ্ছা যায়। গচ্ছা যাওয়ার বিভিন্ন সুরত হতে পারে। উদাহরণত মুহতাল আলাইহি হাওয়ালাকে অস্বীকার করল কিংবা মারা গেল কিংবা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলো। সামনে গচ্ছা যাওয়ার সুরত সম্পর্কে বিবরণ আসবে। মুহতাল লাহু শুধু গচ্ছা যাওয়ার সুরতে মুহীল থেকে ঋণ চাইতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, মুহতাল লাহুর হক গচ্ছা যাওয়ার সুরতেও মুহতাল লাহু মুহীল থেকে ঋণ চাইতে পারবে না। ইমাম আহমদ (রা.)-এর মতও এটি। –[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৬২৬]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মুহীলের দায়মুক্তি (بَرَاءَة) নিঃশর্তরূপে (مُطْلَقًا) অর্জিত হয়েছে; তাতে এমন কোন শর্ত নেই যে, মুহতাল লাহুর হক গচ্ছা গেলে মুহীল দায়মুক্ত হবে না; বরং মুহতাল লাহু তার কাছে রুজু করতে পারবে। সুতরাং নতুন কোনো 'কারণ' (سَبَبٌ) ছাড়া দায় ফিরে আসবে না। উদাহরণত বিক্রয় চুক্তি বা হাওয়ালা চুক্তির মাধ্যমে যদি মুহীল নতুনভাবে দায়গ্রহণ করে তাহলে মুহতাল লাহু তার কাছে নতুন করে তাগাদা করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ إِذْ هُوَ الخ : আমাদের দলিল হলো, মুহীলের দায়মুক্তি মুহতাল লাহুর হক নিরাপদ থাকার সাথে শর্তযুক্ত। কেননা হাওয়ালা চুক্তির এটাই উদ্দেশ্য যে, মুহতাল লাহুর হক নিরাপদ ও তার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে। সুতরাং শর্ত পূরণ না হলে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে মুহতাল লাহুর হক মুহীলের উপর ফিরে আসবে। যখন মুহতাল লাহুর হক মুহীলের উপর ফিরে আসবে তখন মুহতাল লাহু মুহীলের কাছে তার হক চাইতে পারবে। শরিয়তের বিধানেও এর উদাহরণ আছে। যেমন– এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল। কিন্তু কব্জা করার পূর্বেই ক্রেতার হক তথা পণ্যটি ধ্বংস হয়ে গেল। এক্ষেত্রে ক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং মূল্যে ক্রেতার হক ফিরে আসে। তাই ক্রেতা বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারে। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও শর্ত পাওয়া না গেলে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং মুহতাল লাহুর হক মুহীলের উপর ফিরে আসবে। তাই মুহতাল লাহু মুহীলের কাছে রুজু করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাওয়ালা চুক্তি মুহতাল লাহুর হক নিরাপদ থাকার সাথে শর্তযুক্ত। শর্ত পাওয়া না গেলে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। গ্রন্থকার (র.)-এর মত এটিই। তবে ফকীহগণের কারো কারো মতে শর্ত পাওয়া না গেলে কিংবা হাওয়ালার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে হাওয়ালা চুক্তি এমনিতে বাতিল হবে না; বরং মুহতাল লাহু ও মুহীল উভয়ের সম্মতিতে হাওয়ালা চুক্তি বাতিল করতে হবে। তাহলে মুহতাল লাহুর হক মুহীলের উপর ফিরে আসবে এবং মুহতাল লাহু মুহীলের কাছে রুজু করতে পারবে। যেরূপ পণ্যে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা প্রথমে বিক্রয় চুক্তিকে ভেঙ্গে দেয়, এরপর বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করে।

قَالَ : وَالتَّوٰى عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمُوْتَ مُفْلِسًا، لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْوُصُوْلِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ التَّوٰى فِى الْحَقِيْقَةِ، وَقَالَا : هٰذَانِ الْوَجْهَانِ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى أَنَّ الْإِفْلَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ الْقَاضِىْ عِنْدَهُ، خِلَافًا لَهُمَا، لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [মুহতাল লাহুর হক] 'গচ্ছা' যাওয়ার সুরত দুটি বিষয়ের কোনো একটি। তা হলো, মুহতাল আলাইহি হাওয়ালা চুক্তিকে অস্বীকার করবে এবং [অস্বীকারের পক্ষে] কসম করবে আর তার বিরুদ্ধে মুহতাল লাহুর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই কিংবা মুহতাল আলাইহি নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। কেননা এ দুটি বিষয়ের উভয়টি দ্বারা [মুহতাল লাহুর প্রাপ্য হক] উসুলের ব্যাপারে অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। আর এটাই হলো মূলত হক নষ্ট হয়ে যাওয়া বা গচ্ছা যাওয়া। সাহেবাইন (র.) বলেন, এ দুটি বিষয়ের সাথে তৃতীয় আরেকটি বিষয় রয়েছে। তা হলো, মুহতাল আলাইহির জীবদ্দশায় বিচারক কর্তৃক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিচারকের রায় দ্বারা দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয় না। কেননা সম্পদ এমন জিনিস যা সকালে আসে সন্ধ্যায় চলে যায়। সাহেবাইন (র.) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالتَّوٰى عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ : **মাসআলা :** ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুহতাল লাহুর হক 'গচ্ছা' যাওয়ার সুরত দুটি। যথা–

১. মুহতাল আলাইহির হাওয়ালা চুক্তিকে অস্বীকার করা এবং অস্বীকারের পক্ষে কসম করা আর তার বিরুদ্ধে মুহতাল লাহুর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকা।

২. মুহতাল আলাইহির নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা এবং কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ বা তার পক্ষ থেকে কাউকে মুহতাল আলাইহি রেখে না যাওয়া। কেননা এ দুটি সুরতে মুহতাল লাহু তার প্রাপ্য হক উসুল করতে অক্ষম। প্রথম সুরতে মুহতাল লাহু মুহতাল আলাইহি থেকে তাগাদা করার ক্ষমতা রাখে না। আর দ্বিতীয় সুরতে এমন কেউ বর্তমান নেই যার সাথে তার হক জড়িত এবং তার কাছ থেকে সে তা উসুলে সক্ষম। বস্তুত এটাই হলো হক নষ্ট হয়ে যাওয়া বা গচ্ছা যাওয়া।

সাহেবাইন (র.) বলেন, এ দুটি সুরতের সাথে তৃতীয় আরেকটি সুরত আছে। তা হলো, মুহতাল আলাইহি জীবিত; কিন্তু বিচারক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। আর বিচারক কর্তৃক কাউকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হলে তার কাছে কারো তাগাদা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মুহতাল লাহু তার কাছে নিজ হকের ব্যাপারে তাগাদা করতে অক্ষম। এ সুরতেও মুহতাল লাহুর হক গচ্ছা যায়।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিচারকের রায় দ্বারা দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয় না। কেননা সম্পদ এমন জিনিস যা সকালে আসে সন্ধ্যায় চলে যায়। সুতরাং হতে পারে বিচারক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করল, কিন্তু ক'দিন পরই সে সম্পদশালী হয়ে গেল। আর বিচারকের রায় দ্বারা দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত না হলে মুহতাল লাহু তার কাছে তাগাদা করতে পারবে। আর তাগাদা করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় মুহতাল লাহুর হক গচ্ছা গেছে– এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সাহেবাইন (র.) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে বিচারকের রায় দ্বারা দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয়। তাই মুহতাল লাহু তার কাছে তাগাদা করতে অক্ষম।

قَالَ : وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ، فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُ بِدَيْنٍ لِيْ عَلَيْكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ، لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوْعِ قَدْ تَحَقَّقَ، وَهُوَ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِأَمْرِهِ، إِلَّا أَنَّ الْمُحِيلَ يَدَّعِيْ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَهُوَ مُنْكِرٌ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَلَا تَكُوْنُ الْحَوَالَةُ إِقْرَارًا مِنْهُ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ بِدُوْنِهِ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মুহতাল আলাইহি মুহীলের কাছে হাওয়ালার সমপরিমাণ মাল দাবি করে আর মুহীল বলে, আমি তোমার কাছে যে ঋণ পাব তার বিনিময়ে হাওয়ালা করেছি, তাহলে প্রমাণ ছাড়া তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তার উপর ঋণের সমপরিমাণ মাল [মুহতাল আলাইহিকে প্রদান] আবশ্যক হবে। কেননা [তার স্বীকারোক্তির কারণে তার কাছে] রুজু করার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো তার আদেশে তার ঋণ পরিশোধ করা। তবে মুহীল তার বিরুদ্ধে একটি ঋণের দাবি করেছে আর সে তা অস্বীকার করেছে। আর [বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুপস্থিতিতে শপথসহ] অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়। আর হাওয়ালা গ্রহণের অর্থ মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে দাবিকৃত ঋণের স্বীকারোক্তি নয়। কেননা হাওয়ালা তা ছাড়াও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الخ - **মাসআলা :** যদি মুহতাল আলাইহি মুহতাল লাহুর হক পরিশোধের পর মুহীলের কাছে হাওয়ালার সমপরিমাণ মাল দাবি করে আর মুহীল বলে, আমি তোমার কাছে যে ঋণ পাব তার বিনিময়ে হাওয়ালা করেছি অর্থাৎ হাওয়ালা চুক্তির সময় আমি তোমাকে এই কথা বলেছি যে, তোমার কাছে আমি যে ঋণ পাব তার দ্বারা তুমি আমার কাছে মুহতাল লাহু যে ঋণ পাবে তা পরিশোধ করে দাও, তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সে তার বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে মুহতাল আলাইহির বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুহীলের উপর ঋণের সমপরিমাণ মাল মুহতাল আলাইহিকে প্রদান আবশ্যক হবে।

দলিল হলো, মুহীলের কাছ থেকে ঋণের সমপরিমাণ মাল মুহতাল আলাইহির রুজু করার কারণ (سَبَبٌ) সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো তারই আদেশে মুহতাল আলাইহি তার ঋণ পরিশোধ করেছে। আর মুহীলের আদেশে মুহতাল আলাইহি তার ঋণ পরিশাধ করলে তার থেকে তা রুজু করার অধিকার মুহতাল আলাইহির থাকে। তাই আলোচ্য মাসআলায়ও মুহতাল আলাইহি তার কাছ থেকে ঋণের সমপরিমাণ মাল রুজু করতে পারবে। তবে কথা হলো মুহীল তার বিরুদ্ধে একটি ঋণের দাবি করেছে আর সে তা অস্বীকার করেছে। আর বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের অনুপস্থিতিতে শপথসহ অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়। তাই এক্ষেত্রেও অস্বীকারকারী তথা মুহতাল আলাইহির বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কেউ যদি বলে যে, হাওয়ালা গ্রহণ করার অর্থই তো হলো মুহতাল আলাইহির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে দাবিকৃত ঋণের স্বীকারোক্তি, তাহলে এর জবাব হলো, মুহতাল আলাইহি মুহীলের কাছে ঋণগ্রস্ত না হওয়ার সুরতেও হাওয়ালা হতে পারে। তাই হাওয়ালা গ্রহণ করার অর্থ এটা নয় যে, মুহতাল আলাইহি হাওয়ালা গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে দাবিকৃত ঋণের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে।

قَالَ : وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي، وَقَالَ الْمُحْتَالُ، لَا بَلْ أَحَلْتَنِي بِدَيْنٍ كَانَ لِي عَلَيْكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ، لِأَنَّ الْمُحْتَالَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَهُوَ يُنْكِرُ، وَلَفْظَةُ الْحَوَالَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْوَكَالَةِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, যদি মুহীল মুহতাল লাহুর কাছে হাওয়ালাকৃত মাল দাবি করে আর বলে যে, আমি তোমাকে আমার হয়ে কব্জা করার জন্য হাওয়ালা করেছিলাম; আর মুহতাল লাহু বলে যে, না, বরং তুমি আমাকে তোমার কাছে আমার প্রাপ্য ঋণের হাওয়ালা করেছ, তাহলে মুহীলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মুহতাল লাহু তার বিরুদ্ধে ঋণের দাবি করেছে আর সে তা অস্বীকার করেছে। আর হাওয়ালা শব্দটি ওকালাহ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই মুহীলের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الخ : প্রকাশ থাকে যে, 'হাওয়ালাহ' শব্দটি আভিধানিকভাবে স্থানান্তর অর্থ প্রদান করলেও রূপক অর্থে (مَجَازًا) 'ওকালত' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কেউ যদি 'হাওয়ালা' শব্দ দ্বারা 'ওকালত' উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহলে এর পক্ষে আলামত (قَرِيْنَة) বিদ্যমান থাকলে তা শুদ্ধ হবে।

উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা হলো, মুহতাল আলাইহি মুহতাল লাহুকে ঋণের মাল পরিশোধ করার পর মুহীল মুহতাল লাহুর কাছে উক্ত মাল দাবি করল এবং বলল, আমি মুহতাল আলাইহির কাছে ঋণ পেতাম, তোমাকে আমার হয়ে কব্জা করার জন্য সেই ঋণকে তোমার হাওয়ালা করেছিলাম, আর মুহতাল লাহু বলল, না; বরং তোমার কাছে আমার প্রাপ্য ঋণ উসুল ও কব্জা করার জন্য তুমি আমাকে হাওয়ালা করেছ, তাহলে মুহীলের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় দুটি বিষয় রয়েছে। যথা– ১. মুহীলের বক্তব্য হলো তার, মুহতাল লাহু ও মুহতাল আলাইহির সম্মতিতে সম্পন্ন হাওয়ালা চুক্তি মূলত ছিল ওকালত চুক্তি। আর এটা সম্ভব। কারণ হাওয়ালা শব্দটি ওকালত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২. মুহতাল লাহু মুহীলের বিরুদ্ধে ঋণের দাবি করেছে আর মুহীল তা অস্বীকার করেছে। আর দাবিকারী যদি তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শপথসহ অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়। তাই আলোচ্য মাসআলায় মুহীলের বক্তব্য শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুহতাল লাহুর উপর ঋণের সমপরিমাণ মাল মুহীলকে পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

قَالَ : وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَحَالَ بِهَا عَلَيْهِ أَخَرَ فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ لِتَقَيُّدِهَا بِهَا فَإِنَّهُ مَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إِلَّا مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْمَغْصُوْبِ، لِأَنَّ الْفَوَاتَ إِلَى خَلَفٍ كَلَا فَوَاتٍ، وَقَدْ تَكُوْنُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ أَيْضًا، وَحُكْمُ الْمُقَيَّدَةِ فِي هٰذِهِ الْجُمْلَةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيْلُ مُطَالَبَةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحْتَالِ عَلَى مِثَالِ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحِيْلِ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ لَهُ مُطَالَبَةٌ بِهِ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ لَبَطَلَتِ الْحَوَالَةُ، وَهِيَ حَقُّ الْمُحْتَالِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ، لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِحَقِّهِ بِهِ بَلْ بِذِمَّتِهِ، فَلَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا عِنْدَهُ۔

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কারো কাছে একহাজার দিরহাম আমানত রাখে এবং ঐ দিরহামগুলো তার পাওনাদারের জন্য আমানতগ্রহীতাকে হাওয়ালা করে তাহলে এ হাওয়ালা জায়েজ হবে। কেননা, [এ সুরতে] আমানত গ্রহীতা [মুহতাল আলাইহি] [মুহতাল লাহুর ঋণ] পরিশোধে বেশি সামর্থ্য রাখে। যদি দিরহামগুলো [আমানতগ্রহীতার কাছ থেকে] ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুহতাল আলাইহি [আমানতগ্রহীতা] দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা হাওয়ালা আমানতের মালের সাথে শর্তযুক্ত ছিল। মুহতাল আলাইহি [আমানতগ্রহীতা] আমানতকৃত দিরহামগুলো দ্বারাই [মুহতাল লাহুর ঋণ] পরিশোধের দায় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হাওয়ালা গসবকৃত মালের সাথে শর্তযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন হবে। কেননা স্থলবর্তী রেখে নষ্ট হওয়াটা নষ্ট না হওয়ার মতো। হাওয়ালা কখনো কখনো ঋণের সাথেও শর্তযুক্ত হয়। আর এ সকল সুরতে শর্তযুক্ত হাওয়ালা -এর হুকুম হলো, মুহীল মুহতাল আলাইহি থেকে তাগাদার মালিক হয় না। কেননা হাওয়ালাকৃত মালের সাথে মুহতাল লাহুর হক জড়িত হয়ে গেছে। যেমন– বন্ধকি দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যদিও মুহীলের মৃত্যুর পর মুহতাল লাহু অন্যান্য পাওনাদারদের সমতুল্য গণ্য হবে। তাগাদার মালিক হতে না পারার কারণ এই যে, যদি মুহীলের জন্য হাওয়ালাকৃত মালের তাগাদা করার অধিকার বহাল থাকে আর সে মুহতাল আলাইহি থেকে তা নিয়ে নেয় তাহলে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে। অথচ তা মুহতাল লাহুর হক; কিন্তু নিঃশর্ত হাওয়ালার ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা [সেক্ষেত্রে] মুহতাল লাহুর হক হাওয়ালাকৃত মালের সাথে জড়িত হয় না; বরং মুহতাল আলাইহি -এর জিম্মার সাথে জড়িত হয়। তাই মুহতাল আলাইহি -এর কাছে যা পাওনা আছে বা গচ্ছিত আছে, তা নিয়ে নেওয়ার দ্বারা হাওয়ালা বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا الخ : গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারতে হাওয়ালাহ মুকায়্যাদাহ (اَلْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ)-এর আলোচনা করেছেন। হাওয়ালাহ মুকায়্যাদার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বে গেছে। এখানে মাসআলা হলো, কেউ যদি কারো কাছে একহাজার দিরহাম আমানত রাখে এবং ঐ দিরহামগুলো তার পাওনাদারের জন্য আমানতগ্রহীতা হাওয়ালা করে তাহলে এ হাওয়ালা জায়েজ হবে। উদাহরণত শাহিদের কাছে শামীল একহাজার টাকা পাবে। শাহিদ শরীফের কাছে একহাজার টাকা আমানত রাখল।

এরপর বলল, এ টাকা দিয়ে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর, তাহলে এই হাওয়ালা জায়েজ। দলিল হলো, এ সুরতে আমানতগ্রহীতা অর্থাৎ মুহতাল আলাইহি মুহতাল লাহুর ঋণ পরিশোধে বেশি সামর্থ্য রাখে।

যদি দিরহামগুলো আমানতগ্রহীতার কাছ থেকে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুহতাল আলাইহি অর্থাৎ আমানতগ্রহীতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, হাওয়ালা আমানতের মালের সাথে শর্তযুক্ত(مُقَيَّدٌ) ছিল। মুহতাল আলাইহি অর্থাৎ আমানতগ্রহীতা আমানতকৃত দিরহামগুলো দ্বারাই মুহতাল লাহুর ঋণ পরিশোধের দায় গ্রহণ করেছিল। যেহেতু আমানতের মাল বিনষ্ট হলে তার জরিমানা ওয়াজিব নয় তাই দিরহামগুলো স্থলবর্তী না রেখেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মুহতাল লাহুর ঋণ পরিশোধ করা মুহতাল আলাইহির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হাওয়ালা রহিত হয়ে যাবে। এর নজির হলো যাকাত। জাকাত নির্দিষ্ট নিসাবের সাথে শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) বিধায় কোনো কারণে যদি ঐ নিসাব (نِصَابٌ) ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে জাকাত রহিত হয়ে যায়। তদ্রূপ হাওয়ালাও যেহেতু আমানতের মালের সাথে শর্তযুক্ত, তাই আমানতের মাল ধ্বংস হয়ে গেলে হাওয়ালাও রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْمَغْصُوْبِ الخ : অবশ্য হাওয়ালা গসবকৃত মালের সাথে শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) হওয়ার ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন হবে। কারণ গসবকৃত মাল (اَلْمَالُ الْمَغْصُوْبُ بِهِ) গসবকারী (غَاصِبٌ) -এর কাছ থেকে ধ্বংস হলে তার উপর জরিমানারূপে ঐ জিনিসের মূল্য (قِيْمَةٌ) ওয়াজিব হয়। অতএব গসবকৃত মাল ধ্বংস হলে তা স্থলবর্তী (خَلِيْفَةٌ) রেখে ধ্বংস হয়। আর স্থলবর্তী রেখে গসবকৃত মাল ধ্বংস হওয়ার সুরতে গসবকৃত জিনিস দ্বারা যদিও মুহতাল লাহুর ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়; কিন্তু তার স্থলবর্তী জিনিস দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তাই হাওয়ালা গসবকৃত মালের সাথে শর্তযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গসবকৃত মাল ধ্বংস হলেও হাওয়ালা রহিত হয় না।

وَقَدْ تَكُوْنُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ أَيْضًا : গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাওয়ালা কখনো কখনো ঋণের সাথেও শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) হয়। এর সুরত হলো, মুহীল মুহতাল আলাইহি থেকে একহাজার টাকা পাবে। মুহীল এই এক হাজার টাকাকে হাওয়ালা করল; মুহতাল আলাইহিকে বলল, আমি তোমার কাছে যে একহাজার টাকা পাব তুমি তা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ কর। এ সুরতে মুহীল হাওয়ালাকে মুহতাল আলাইহির কাছে তার প্রাপ্য ঋণের সাথে শর্তযুক্ত করেছে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাওয়ালাটি বস্তু (عَيْنٌ) -এর সাথে শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) হোক বা ঋণ -এর সাথে শর্তযুক্ত হোক, বস্তু আমানতের মাল হোক বা গসবকৃত মাল হোক, কোনো অবস্থাতেই মুহীল মুহতাল আলাইহির কাছে ঐ বস্তু বা ঋণের তাগাদা করতে পারবে না। কেননা হাওয়ালাকৃত মালের সাথে মুহতাল লাহুর হক জড়িত হয়ে গেছে। যদি মুহীলের জন্য হাওয়ালাকৃত মালের তাগাদা করার অধিকার বহাল থাকে আর সে মুহতাল আলাইহি থেকে তা নিয়ে নেয় তাহলে হাওয়ালা বাতিল হয়ে যাবে, অথচ হাওয়ালা মুহতাল লাহুর হক। আর মুহতাল লাহুর হক নষ্ট করার অধিকার মুহীলের নেই। তাই হাওয়ালা মুকায়্যাদায় মুহীল মুহতাল আলাইহি থেকে হাওয়ালাকৃত বস্তু বা ঋণের তাগাদা করতে পারবে না।

এর নজির হলো বন্ধক (رَهْنٌ)। বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকী দ্রব্যের সাথে বন্ধকগ্রহণকারী (مُرْتَهِنٌ) -এর হক জড়িয়ে যায় এবং ঋণ পরিশোধের পূর্বে বন্ধকদাতা (رَاهِنٌ) -এর বন্ধকী দ্রব্য ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে না। অবশ্য হাওয়ালা মুকায়্যাদার হুকুম বন্ধকের চেয়ে একটু ভিন্ন অর্থাৎ হাওয়ালা মুকায়্যাদার ক্ষেত্রে যদিও মুহীল মুহতাল আলাইহি থেকে তাগাদার অধিকার রাখে না, কিন্তু মুহীলের মৃত্যুর পর মুহতাল লাহু অন্যান্য পাওনাদারদের সমতুল্য গণ্য হয়। পক্ষান্তরে বন্ধকদাতার মৃত্যুর পর অন্যান্য পাওনাদাররা বন্ধকগ্রহণকারীর সমতুল্য গণ্য হবে না, বরং বন্ধকগ্রহণকারীর হক অগ্রগণ্য হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُطْلَقَةِ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِحَقِّهِ بِهِ الخ : কিন্তু হাওয়ালা মুতলাক (اَلْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ) অর্থাৎ যে হাওয়ালা আমানতের মাল, গসবকৃত মাল বা ঋণের সাথে শর্তযুক্ত (مُقَيَّدٌ) নয়, তার ব্যাপার ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে মুহতাল লাহুর হক হাওয়ালাকৃত মালের সাথে জড়িত হয় না; বরং মুহতাল আলাইহি -এর জিম্মার সাথে জড়িত হয়। তাই মুহতাল আলাইহি -এর কাছে মুহীলের যে ঋণ আছে বা আমানতের মাল আছে কিংবা গসবকৃত মাল আছে, তা নিয়ে নেওয়ার দ্বারা হাওয়ালা মুতলাক বাতিল হবে না।

قَالَ : وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ، وَهِيَ قَرْضٌ اِسْتَفَادَ بِهِ الْمُقْرِضُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيْقِ، وَهٰذَا نَوْعُ نَفْعٍ اُسْتُفِيْدَ بِهِ، وَقَدْ نَهَى الرَّسُوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাফাতেজ [হুন্ডি] মাকরূহ। সাফাতেজ হলো এমন ঋণ যা দ্বারা ঋণদাতা পথের ঝুঁকি রহিত হওয়ার সুবিধা লাভ করে। এটাও এক ধরনের সুবিধা যা ঋণ প্রদান করে লাভ করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ঋণ [প্রদান] সম্পর্কে নিষেধ করেছেন, যা [ঋণদাতার জন্য] অতিরিক্ত সুবিধা বয়ে আনে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ الخ : মাসআলা : সাফাতেজ (اَلسَّفَاتِجُ) মাকরূহ। কুদূরী গ্রন্থে সাফাতেজকে মাকরূহ শব্দে ব্যক্ত করা হলেও মূলত সাফাতেজ হারাম। ইমাম কুদূরী (র.) সাফাতেজ -এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, সাফাতেজ হলো এমন ঋণ যা দ্বারা ঋণদাতা পথের ঝুঁকি রহিত হওয়ার সুবিধা লাভ করে। এটাকে অর্থনীতির পরিভাষায় হুন্ডি বলে। এর সূরত হলো, কেউ দূরবর্তী কোনো দেশে বা শহরে অবস্থানরত তার বন্ধুকে একহাজার টাকা পৌঁছাতে চায়। কিন্তু পথের ঝুঁকি থাকায় সে তা কারো মাধ্যমে পৌঁছাতে চাচ্ছে না। কারণ কোনোক্রমে তা ধ্বংস হয়ে গেলে আমানতের মাল হওয়ায় বাহকের কাছ থেকে সে তা ফেরত পাবে না। তাই ঐ নগর বা দেশে গমনেচ্ছু কোনো ব্যবসায়ীকে সে একহাজার টাকা ঋণ প্রদান করে, যাতে সে উক্ত শহরে বা দেশে পৌঁছে এ দিরহামগুলো তার বন্ধুর কাছে সোপর্দ করে।

গ্রন্থকার (র.) হুন্ডি মাকরূহ হওয়ার দলিল হিসেবে বলেন, এটা একপ্রকার ঋণ যা প্রদান করে পথের ঝুঁকি রহিত করার সুবিধা আদায় করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ঋণ প্রদান সম্পর্কে নিষেধ করেছেন, যা ঋণদাতার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা বয়ে আনে। হযরত আলী (রা.) সূত্রে হযরত হারিছ ইবন আবী উসামা (র.) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ঋণ [ঋণদাতার জন্য অতিরিক্ত] সুবিধা বয়ে আনে তা সুদ। আর সুদ হারাম। তাই সাফাতেজ তথা হুন্ডিও হারাম।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে হযরত ইবন আদী (র.)-এর কামিল গ্রন্থে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّفْتَجَاتُ حَرَامٌ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাফাতেজ [হুন্ডি] হারাম।

كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ

অধ্যায় : বিচারকের নীতিমালা

ভূমিকা-পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : ইতঃপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদে নানা প্রকারের ক্রয়বিক্রয় এবং ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষে মানুষে যে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় এর সিংহভাগই বেচাকেনা, লেনদেন এবং ঋণের আদান-প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে, আর সেই ঝগড়া-বিবাদের অবসান হয় বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে, তাই বেচাকেনা সংক্রান্ত আলোচনার পর বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট অধ্যায় আনা হয়েছে। আর বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তাই এ অধ্যায়ের পর সাক্ষ্য-প্রমাণ সংক্রান্ত অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

اَدَبُ الْقَاضِىْ-এর বিশ্লেষণ : اَدَبٌ শব্দের অর্থ– اَلْخِصَالُ الْحَمِيْدَةُ / مَا يُمْدَحُ قَوْلًا وَفِعْلًا অর্থাৎ উত্তম গুণাবলি বা যেসব কথা ও কাজ মানুষের কাছে প্রশংসিত হয় তাই আদব (اَدَبٌ), উল্লিখিত অর্থের সাথে আদবের শাব্দিক অর্থের সম্পর্ক হলো اَدَبٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– আহ্বান, দাওয়াত ও একত্র করা। উত্তম গুণাবলি ও প্রশংসিত কাজ যেহেতু মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে এবং একত্রিত করে এজন্য একে اَدَبٌ বলা হয়। খাবারের প্রতি আহ্বান করাকেও اَدَبٌ বলা হয়। সেই থেকে দাওয়াতি মেহমানদের জন্য তৈরি খাবারকে مَأْدُبَةٌ বলা হয়। اَدَبٌ শব্দের উক্ত অর্থ বিখ্যাত কবি তারাফার কবিতায় পাওয়া যায়। কবি বলেন– نَحْنُ فِى الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلٰى * لَا تَرَى الْاٰدَبَ فِيْنَا يَنْتَقِرُ

উক্ত অর্থে اَدَبٌ শব্দের ব্যবহার হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তিতে বিদ্যমান। বিখ্যাত ভাষাবিদ আবূ উবাইদ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সেই উক্তিটি উল্লেখ করেন– اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فَمَنْ دَخَلَ فِيْهِ فَهُوَ اٰمِنٌ অন্যত্র বলেন– مَأْدُبَةُ اللّٰهِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدُبَتِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার ভোজসভা। যে এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। আরো বলেন, [কুরআন] আল্লাহর মেহমানদারি, এ থেকে তোমরা জ্ঞানার্জন কর।

قَضَاءٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইবনে কুতাইবা বলেন, قَضَاءٌ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবগুলোর সারকথা হচ্ছে– সমাপ্ত করা এবং কোনো কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ করা। শরিয়তের পরিভাষায় قَضَاءٌ অর্থ হচ্ছে, কারো উপর কোনো বিষয় আরোপ করা। قَضَاءٌ-কে حُكْم বলা হয়, কেননা বিচারের মাধ্যমে অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে প্রতিরোধ করা হয় এবং উভয়ের মাঝে ন্যায়বিচার আরোপ করা হয়। حُكْم শব্দটি নির্গত হয়েছে حَكَمَةٌ থেকে। حَكَمَةٌ বলা হয় লাগামের সে অংশকে যা ঘোড়ার মুখে পরানো হয়। حُكْم-এর মূলার্থ এবং বিচারকার্য এর অর্থ- উভয়ের সাদৃশ্য হচ্ছে উভয়ের মধ্যে বাধা প্রদান ও প্রতিরোধের অর্থ বিদ্যমান, যা বর্ণিত বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে। قَضَاءٌ শব্দটি মূলে قَضَايٌ ছিল। اَلِفٌ-এরপর يَاءٌ আসার কারণে يَاءٌ-কে هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন– رِدَاءٌ-এর মূল رِدَايٌ ছিল।

اَدَبُ الْقَاضِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচারকের নীতিমালা, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় এবং করণীয় কর্তব্য। এর মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ইনসাফকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, অত্যাচার-নির্যাতনের মূলোৎপাটন করা, শরিয়তের সীমারেখা ও সুন্নতের উপর অবিচল থাকা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের দৃষ্টিতে قَضَاءٌ [বিচারকার্য] فَرْضِ كِفَايَةٌ, যদি শাসক নিজে বিচারকার্য সম্পাদন করে আর জনগণ এতে এগিয়ে না আসে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে, তবে যদি শাসক বিচারকার্য -এর দায়িত্ব হাতে নেয় তাহলে আম জনতা গুনাহগার হবে না। –[বাযযাযিয়া, ফাতহুল কাদীর]

যদি শাসক বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বিচারকার্যের দায়িত্ব দেন আর সে না নেয় তাহলে তিনি তাকে বাধ্য করতে পারবেন। কারণ হকদারের কাছে তার হক পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যান্য দাবিদারকে বাধা দেওয়া জরুরি, আর এ কাজ বিচারব্যবস্থা ছাড়া সম্পাদান করা সম্ভব নয়।

বিচারকার্য কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস– চার দলিলের মাধ্যমেই প্রমাণিত।

১. **কুরআনের দলিল :** আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন–وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ (اَلْمَائِدَةُ . ٤٩) অর্থাৎ [আর আমি আদেশ দিচ্ছি যে,] আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়গুলো আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানানুসারে ফয়সালা করুন। –[সূরা মায়েদা : আয়াত– ৪৯]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ.)-কে এ সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো–

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى (ص . ٢٦)

অর্থাৎ আপনি লোকদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। –[সূরা সাদ : আয়াত– ২৬]

আয়াত দুটিতে সুস্পষ্টভাবে বিচারকার্যের বৈধতা ও এর গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

২. **হাদীসের দলিল :** রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারকরূপে নিয়োগ দান করেছিলেন এবং তথায় বিচারকরূপে পাঠিয়েছিলেন হযরত মু'আয (রা.)-কে। বিদায় মুহূর্তে রাসূল ﷺ-এর সাথে তার যে কথোপকথন হয়েছিল তা এখানে দেওয়া হলো। রাসূল তাঁকে বলেন, بِمَ تَقْضِىْ 'কিসের সাহায্যে রায় দেবে?' হযরত মু'আয (রা.) বলেন–

بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ

অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে [ফয়সালা করব]। রাসূল ﷺ বলেন, যদি তুমি সমাধান কুরআনে না পাও [তাহলে কি করবে]। তিনি বললেন, হাদীসে রাসূলের সাহায্যে। তিনি বলেন, তাতে যদি না পাও। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করে সমাধান বের করব।

হযরত আলী ও মু'আয (রা.)-কে বিচারকরূপে নিয়োগ দান এবং হযরত মু'আয (রা.)-এর সাথের কথোপকথন সুস্পষ্টভাবে ও উত্তমরূপে বিচারকার্যের বৈধতাকে সমর্থন করছে। অন্যত্র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاِنْ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ অর্থাৎ যখন কোনো বিচারক সুচিন্তিতভাবে [ইজতিহাদ করে] বিচারের রায় প্রদান করে, কিন্তু [তা সত্ত্বেও] ভুল করে, তাহলে একটি পুণ্য লাভ করবে। আর যদি সে সঠিক রায় দেয় তাহলে সে দুটি পুণ্য লাভ করবে।

৩. **ইজমা :** রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত সর্বযুগে বিচারকার্যের বৈধতার পক্ষে উম্মতের ইজমা রয়েছে। উম্মতের একজন ব্যক্তিও এর বৈধতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলেননি।

৪. **কিয়াস :** কিয়াস ও যুক্তি এর বৈধতা প্রমাণ করে এভাবে যে, ন্যায়বিচার সমাজে ইনসাফ কায়েম করে, অত্যাচার-শোষণের পথ রুদ্ধ করে এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রত্যেক হকদার তার হক লাভে সমর্থ হয়। তাছাড়া এর দ্বারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা' সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার হুকুম-এর বাস্তবায়ন হয়। উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপস্থিতি সৎজ্ঞানবান লোকের চাহিদা। সুখ-শান্তির পরিবেশ মানুষের একান্ত কামনা।

قَالَ : وَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ الْقَاضِيْ حَتّٰى يَجْتَمِعَ فِى الْمَوْلٰى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ وَيَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ حُكْمَ الْقَضَاءِ يَسْتَقِيْ مِنْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ يَكُوْنُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ، وَمَا يُشْتَرَطُ لِأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ يُشْتَرَطُ لِأَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَالْفَاسِقُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ حَتّٰى لَوْ قُلِّدَ يَصِحُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُقَلَّدَ كَمَا فِيْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِيْ شَهَادَتَهُ، وَلَوْ قَبِلَ جَازَ عِنْدَنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহ পাওয়া যায় এবং উক্ত ব্যক্তি ইজাতিহাদী যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। প্রথম বিষয় [সাক্ষ্যদানের শর্ত এজন্য আবশ্যক যে,] বিচারকার্যের বিধান সিঞ্চিত হয় সাক্ষ্যদানের বিধান থেকে, কেননা এদের প্রত্যেকটি [কর্তৃত্ব] -এর অর্ন্তগত। ফলে যে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হয় সে বিচারকার্য পরিচালনার যোগ্য বিবেচিত হয়। তাছাড়া সাক্ষ্যদানের যোগ্যতার জন্য যা শর্ত, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাই শর্ত। ফাসিক বিচারক হওয়ার উপযুক্ত। [এজন্য] যদি তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। তবে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা অনুচিত, যেমন সাক্ষ্য প্রদানের বিধানে। কেননা এ জাতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিচারকের জন্য সমীচীন নয়, যদি বিচারক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে তাহলে আমাদের মতে তা বৈধ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ الْقَاضِيْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিচারক বা কাজি হওয়ার যোগ্যতা কি এবং কারা বিচারক হতে পারেন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তে 'বিচারক' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ, এর নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিযুক্তিদান সে পর্যন্ত বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না নিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে সাক্ষ্যদান (شَهَادَتْ) -এর যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায় এবং বিচারক হওয়ার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক।

শব্দ বিশ্লেষণ : وِلَايَةٌ শব্দের অর্থ– কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা। পরিভাষায় وِلَايَةٌ বলা হয়– وَهِيَ تَنْفِيْذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبٰى অর্থাৎ অন্যের উপর কর্তৃত্ব করা, চাই সে ব্যক্তি তা কামনা করুক কিংবা না করুক।

شَهَادَةٌ শব্দের অর্থ সাক্ষ্য দান বা প্রত্যক্ষ দর্শনের পর কোনো বিষয়ের সত্যতার সংবাদ দেওয়া, এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা كِتَابُ الشَّهَادَةِ -এর মধ্যে আসবে ইনশাল্লাহ। شَهَادَةٌ -এর যোগ্যতা। বিচারক হওয়ার প্রথম ও প্রধানতম শর্ত।

شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ - সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহ এই যে, ১. মুসলমান হওয়া ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে বালেগ হওয়া ৩. জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া [পাগল না হওয়া] ৪. স্বাধীন হওয়া ৫. অন্ধ না হওয়া ৬. অপবাদ দেওয়ার অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত না হওয়া। উত্তম হওয়ার শর্তাবলি এই যে, ১. বিচারক ন্যায়পরায়ণ-নীতিবান হওয়া ২. পরহেজগার হওয়া ৩. সুন্নতে পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন এবং পূর্ববর্তী ন্যায়বিচারকের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হওয়া।

ইবারতে উল্লিখিত اَلْمَوْلٰى শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْل রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা লেখক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করছেন যে, বিচারকের দায়িত্ব নিজে যেচে নেওয়া সমীচীন নয়; বরং অন্যদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আসলে তা গ্রহণ করা যায়।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ : দ্বিতীয় বিষয় যা বিচারকের গুণাবলিরূপে থাকা উচিত তা হচ্ছে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। এ শর্তটি বিচারকের উপযুক্ততার জন্য শর্ত, নাকি উত্তম হওয়ার শর্ত– এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবে মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইনায়া গ্রন্থের ভাষ্য হচ্ছে– বিশুদ্ধ মতে ইজতিহাদী যোগ্যতা বৈধতার শর্ত নয়; বরং উত্তম গুণাবলি হিসেবে শর্ত। যারা বলেন, ইজতিহাদী যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া শর্ত– তারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি উক্তিকে পেশ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেন– "اِنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ قَاضِيًا" অর্থাৎ 'মুকাল্লিদের জন্য বিচারক হওয়া বৈধ নয়।' পক্ষান্তরে ইমাম আবূ বকর আল খাসসাফ (র.)-এর বর্ণনা মতে ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়া বিচারক হওয়া বৈধ।

বিচারক যদি মুজতাহিদ হয় তাহলে নিজ মতামতের ভিত্তিতে রায় দেবে, যদি সে মুজতাহিদ না হয় তাহলে মুজতাহিদের সাহায্য গ্রহণ করবে। ইজতিহাদী যোগ্যতা শর্ত না হওয়ার দলিল হলো হযরত আলী (রা.)-কে বিচারকরূপে প্রেরণ সংক্রান্ত রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُرْسِلُنِىْ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِىْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِىْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ حَتّٰى تَسْمَعَ عَنِ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ تُبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءَ. قَالَ فَمَازِلْتُ قَاضِيًا وَمَا شَكَكْتُ فِىْ قَضَاءٍ بَعْدُ.

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ আমাকে বিচারকরূপে অল্প বয়সকালে ইয়েমেনে পাঠান। আমি বললাম, আমি অল্পবয়স্ক, তাছাড়া আমার এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানও নেই। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, বাদী ও বিবাদী উভয়ের কথা শুনে রায় দেবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি ধীরে ধীরে বিচারক রূপে পরিণত হলাম।' [সংক্ষেপিত] এ হাদীস ইজতিহাদী যোগ্যতা শর্ত না হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল। কারণ রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণকালে তিনি মুজতাহিদ ছিলেন না, যা তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়।

اَهْلِ اِجْتِهَادْ বা মুজতাহিদ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য : ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়াতে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ– সদরুল ইসলাম আল বাযদাভী (র.) তাঁর اُصُوْل বিষয়ক গ্রন্থে বলেন, মুজতাহিদ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কুরআনের نَاسِخْ وَمَنْسُوْخْ [বিধান রহিতকারী আয়াতসমূহ ও রহিতবিধান] সম্পর্কে জানেন, হাদীসের নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে জানেন এবং যুক্তির মানদণ্ড কুরআন ও হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল হুদূদে যা বলেছেন তাতে উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যদিকে কতিপয় আলেম মনে করেন, উপরিউক্ত গুণাবলির সাথে সাথে বিচারককে সংশ্লিষ্ট শহরের রীতিনীতি, তাদের কথাবার্তা ও তাদের ভাষার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অর্থাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও জরুরি। তিনি বলেন, ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের মুজতাহিদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ফিকহ এর দলিল-প্রমাণাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আর ফিক্‌হ সংক্রান্ত দলিল হচ্ছে– ১. কুরআন ২. হাদীসে রাসূল ৩. উম্মতের ইজমা ও ৪. কিয়াস বা যুক্তি।

মুফতি হওয়ার ব্যাপারে সদরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) বলেন, ফকীহগণ ও ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মুফতি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক। এতে কারো দ্বিমত নেই। কেননা সে যদি মুজতাহিদ না হয় তাহলে উদ্ভূত মাসায়েলের ফতোয়া প্রদান করতে সক্ষম হবে না। তাই সে ইজতিহাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। যদি সে মুজতাহিদ না হয় তাহলে মুখস্থ উদ্ধৃতির সাহায্যে বিচারের রায় প্রদান করবে। তখন পূর্ববর্তী মুফতিগণের রেফারেন্স ছাড়া ফতোয়া দেওয়া তার জন্য অবৈধ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّ حُكْمَ الْقَضَاءِ يَسْتَقِىْ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিচারকের মধ্যে সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহ এবং ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এখানে লেখক সাক্ষ্যদানের শর্তসমূহকে আবশ্যক করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, বিচারকার্যের হুকুম সাক্ষ্যদানের হুকুম থেকে অর্জিত হয়। কারণ বিচার পরিচালনার অধিকার ও সাক্ষ্যদানের অধিকার শরিয়ত স্বীকৃত وِلَايَةْ [কর্তৃত্ব] -এর মাধ্যমে হাসিল হয়।

وِلَايَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ– অন্যের উপর নিজের কথাকে প্রয়োগ করা। আমরা দেখতে পাই যে, সাক্ষ্যদাতা তার কথাকে অন্যের উপর যেরূপ প্রয়োগ করে তদ্রূপ বিচারক তার সিদ্ধান্তকে অন্যদের উপর প্রয়োগ কার্যকর করে। যেহেতু বিচারকার্যের কর্তৃত্ব সাক্ষ্যদানের কর্তৃত্ব থেকে ব্যাপকতর ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাই সাক্ষ্যদানের অধিকার লাভের যে শর্তাবলি তা বিচারকার্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে লাগবে, উপরন্তু তাতে অতিরিক্ত কিছু শর্ত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের অধিকারপ্রাপ্ত হবে, সে বিচারক হওয়ার যোগ্য হবে এবং সাক্ষ্যদানের অধিকার প্রাপ্তির জন্য যেসব শর্ত প্রযোজ্য, বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে সেসব শর্ত প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ وَالْفَاسِقُ اَهْلٌ لِلْقَضَاءِ حَتّٰى لَوْ قُلِّدَ الخ : প্রাসঙ্গিকক্রমে লেখক বলেন, যেহেতু ফাসিক সাক্ষ্যদানের যোগ্য তাই সে বিচারক হওয়ার যোগ্য হওয়া উচিত। কারণ সাক্ষ্যদানের যোগ্যতার উপর বিচারকার্যের ভিত্তি, যা এইমাত্র বলা হলো। সেমতে যদি কর্তৃপক্ষ ফাসিককে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করে তাহলে তা বৈধ হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। তবে লেখক বলেন, যদিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবানুযায়ী এটা বৈধ, তবে এরূপ করা সমীচীন নয়, যেমন বিচারকের জন্য ফাসিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা সমীচীন নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি কোনো ফাসিক সাক্ষ্য প্রদান করে, আর বিচারক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেন তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। কারণ সাধুতা (عَدَالَتْ) সাক্ষ্যদানের শর্তভুক্ত নয়; বরং সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সাধুতা একটি উত্তম গুণরূপে বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত হলো, ফাসিকের বিচারক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং ফাসিককে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা বৈধ নয়। আমাদের মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের পক্ষে নাওয়াদির রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা অবৈধ। তদ্রূপ কতিপয় ফকীহের মতেও ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা বৈধ নয়।

আসলে মাসআলাটি খুবই স্পর্শকাতর। আমাদের মাযহাবেও এ ব্যাপারে বৈধতার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। খুলাসাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, "বিচারকার্যের জন্য ফাসিককে মনোনীত করার ব্যাপারে রেওয়ায়েত বিভিন্ন ধরনের। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো, ফাসিকের মনোনয়ন বৈধ এবং ফিসক প্রকাশ পাওয়ার কারণে বিচারক পদচ্যুত হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, মুহীত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, অধিকাংশ মাশায়েখের মতে ফাসিক বিচারক পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত বটে। তবে যদি সে অত্যাচারী হয় তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হবে। সরকার / রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপারে বিধান হলো তারা ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও ইমাম / সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি মত এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি বিচারক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তারপর তওবা করে ফেলে তাহলে সে বিচারকরূপে বহাল থাকতে পারবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র আলী আর-রাযী থেকে বর্ণিত যে, বিচারক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া মাত্রই পদচ্যুত হবে। এ ছিল ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া -এর বর্ণনা।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলেন, "ফাসিকের বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে ফাসিকের বিচার করার অধিকার নেই, যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ অন্যরা বলেছেন। আমাদের প্রধান তিন ইমাম থেকে নাওয়াদির রিওয়ায়াত এরূপই বর্ণিত আছে। তবে ইমাম গাযালী (র.) বলেন, আমাদের যুগে عَدَالَتْ [সাধুতা], ইজতিহাদ ও অন্যান্য শর্তাদি বিচারকের মধ্যে পাওয়া যাওয়া দুষ্কর। কারণ এ যুগে মুজতাহিদ ও প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নেই। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে বিধান হলো, প্রতাপশালী বাদশাহ যে ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করেছেন তার বিচারই কার্যকর হবে। যদিও সে ফাসিক এবং কমশিক্ষিত হয় না কেন।"

আমাদের মাযহাবের সাধারণ বক্তব্যও তাই, যদি ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা হয় তবে তা বৈধ হবে। উক্ত বিচারক অন্যের সাহায্যে/ অন্যদের ফতোয়া নিয়ে বিচারের ফায়সালা করবেন, তবে এ ধরনের ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ দেওয়া মোটেও সমীচীন নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হলো, যদি জনগণের মাঝে বিজ্ঞ ও দূরদর্শী আলেম / জ্ঞানী লোক থাকেন যিনি ন্যায়পরায়ণ ও মুজতাহিদ হন তাহলে ফাসিককে বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা অবৈধ। অন্যথায় তা বৈধ। ইমাম গাযালী (র.)-এর যুগের যে বর্ণনা তিনি দিলেন, বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে যে অনেক খারাপ তা সাধারণ বিবেকবান মানুষেরও বুঝতে সমস্যা হয় না। তাই বর্তমান যুগে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের উপর আমল করা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই।

وَلَوْ كَانَ الْقَاضِىْ عَدْلًا فَفَسَقَ بِاَخْذِ الرِّشْوَةِ اَوْ غَيْرِهٖ لَا يَنْعَزِلُ، وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ، وَهٰذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ، وَقَالَ الشَّافِعِىُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَلْفَاسِقُ لَا يَجُوْزُ قَضَاؤُهٗ كَمَا لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهٗ عِنْدَهٗ، وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّوَادِرِ اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ قَضَاؤُهٗ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ (رحـ) اِذَا قُلِّدَ الْفَاسِقُ اِبْتِدَاءً يَصِحُّ، وَلَوْ قُلِّدَ وَهُوَ عَدْلٌ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ، لِاَنَّ الْمُقَلِّدَ اِعْتَمَدَ عَدَالَتَهٗ، فَلَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِتَقْلِيْدِهٖ دُوْنَهَا، وَهَلْ يَصْلُحُ الْفَاسِقُ مُفْتِيًا قِيْلَ : لَا، لِاَنَّهٗ مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ، وَخَبَرُهٗ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ فِى الدِّيَانَاتِ، وَقِيْلَ : يَصْلُحُ، لِاَنَّهٗ يَجْتَهِدُ الْفَاسِقُ حَذَرًا عَنِ النِّسْبَةِ اِلَى الْخَطَاِ -

অনুবাদ : যদি বিচারক ন্যায়পরায়ণ হন, অতঃপর উৎকোচ গ্রহণ করেন কিংবা অন্য কোনো দোষের কারণে ফাসিক হয়ে যান তাহলে তিনি পদচ্যুত হবেন না, তবে পদচ্যুতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। এটাই জাহের মাযহাবের বিধান। আমাদের ফকীহগণ এ মতই পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফাসিকের সাক্ষ্য যেমন বৈধ নয় তেমনি তার বিচার পরিচালনা বৈধ নয়। আমাদের তিন ইমাম থেকে নাওয়াদির রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ফাসিকের জন্য বিচারকের দায়িত্ব পালন বৈধ নয়। কতিপয় মাশায়েখ বলেন, সূচনাতেই যদি ফাসিককে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে [তার বিচারকার্য পরিচালনা] বৈধ, আর যদি ন্যায়পরায়ণ অবস্থায় দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে ফাসিক হয়ে গেলে পদচ্যুত হবে। কারণ দায়িত্ব প্রদানকারী তার ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করেছিল, ফলে সে ন্যায়পরায়ণতাবিহীন অবস্থায় বিচারকরূপে নিয়োগ দানে সম্মত ছিল না। ফাসিক মুফতি হতে পারে কি? [এ প্রশ্নের উত্তরে] কেউ কেউ বলেন, না। কেননা ফতোয়া দান একটি দীনি বিষয়, দীনি বিষয়ে ফাসিকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন, ফাসিক মুফতি হতে পারে। কেননা সে ভ্রান্ত সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে [ভুল থেকে বাঁচতে] নিরন্তর চেষ্টা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِىْ عَدْلًا الخ : رِشْوَةٌ [رَاء -এর নিচে যের এবং উপরে পেশ উভয়ভাবে পড়া যায়] -এর মূলার্থ– কূপ থেকে পানি উঠানোর রশি, ঘুষ যেহেতু হারাম উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হয় তাই একে رِشْوَةٌ বলা হয়। رِشْوَةٌ হুকুমের বিবেচনায় মোট চার প্রকার হতে পারে–

১. যা প্রদানকারী ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। যেমন– বিচারকের পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়া। ইজমা অনুসারে ঘুষ দিয়ে বিচারকের পদ গ্রহণ করা যায় না। চাই সে বিচারক ন্যায়ানুগ বিচার করুক কিংবা ভ্রান্ত বিচার করুক।
২. যে ঘুষ বিচারক বিচারকার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে। এটাও দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। উক্ত বিচারকের বিচার গ্রহণযোগ্য হবে না, চাই সে হক বিচার করুক বা অন্যায় বিচার করুক।
৩. যে ঘুষদাতা তার জান / মালের ভয়ে তা প্রদান করে থাকে তা ঘুষদাতার জন্য হারাম নয়, তবে গ্রহীতার জন্য হারাম।
৪. যে ঘুষ দিলে সরকারের কাছে তার অবস্থান ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে, তাহলে তার জন্য উক্ত ঘুষ দেওয়া বৈধ। তবে গ্রহীতার জন্য উক্ত ঘুষ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

লেখক যে মাসআলাটি উপরের ইবারতে বর্ণনা করেন তা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি বিচারকরূপে নিয়োগের পূর্বে ন্যায়পরায়ণ থাকে, অতঃপর বিচারকরূপে নিয়োগ লাভ করার পর ঘুষ গ্রহণ করার মাধ্যমে অথবা মদ্যপান / ব্যাভিচার ইত্যাদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে ফাসিক হয়ে যায় তাহলে সে [ফিসকের কারণে] পদচ্যুত হবে না। তবে সে উপরিউক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু উপরিউক্ত কারণে সে সাথে সাথে পদচ্যুত হবে না তাই এরপর সে যতগুলো বিচারের রায় প্রদান করবে তা কার্যকর হবে এবং তাকে রায় প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনো বাধাও দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ তবে যদি বিচারক নিয়োগের সময় নিয়োগকারী এই শর্তে নিয়োগ করে যে, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পদচ্যুত হবে তাহলে সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া মাত্রই পদচ্যুত হবে এবং এরপর তার কোনো রায় কার্যকর হবে না। লেখক বলেন, এটাই জাহের মাযহাব এবং এ মতের উপরই আমাদের বুখারা ও সমরকন্দের ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ الخ : পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত হবে এ কথার অর্থ হচ্ছে, নিয়োগদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত বিচারককে পদচ্যুত করা আবশ্যক হবে। কেউ কেউ বলেন, যদি ন্যায়পরায়ণরূপে নিয়োগ পায়, তারপর বিচারক ফাসিক হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই পদচ্যুত হবে। কারণ তার عَدَالَتْ তার নিযুক্তির সাথে শর্তের মতো যুক্ত আছে। কেননা যখন তাকে ন্যায়পরায়ণ বিচারকরূপে নিয়োগ দান করা হলো তখন যেন নিয়োগদানকারী তার عَدَالَتْ-এর উপর নির্ভর করেই নিয়োগ দিয়েছিল। সুতরাং তার বিচারক থাকা عَدَالَتْ-এর সাথে শর্তযুক্ত। অতঃপর যখন عَدَالَتْ খতম হয়ে গেল তখন তার বিচারকরূপে নিয়োগ বাতিল হয়ে গেল। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কথা, বিচারকরূপে নিয়োগ দানের সময় যদি এরূপ কোনো শর্ত করা হয় যে, হারাম কাজে লিপ্ত হলে নিয়োগ বাতিল। যেমন– বলা হলো যে, যদি আপনি উৎকোচ গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ হয় তাহলে আপনি পদচ্যুত হবেন, তাহলে তার উৎকোচ গ্রহণের সাথে সাথেই পদচ্যুতি ঘটবে। এর দলিল হিসেবে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, বিচারকার্য ও নেতৃত্ব এমন বিষয় যা শর্ত ও কয়েদ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায়, তাই যদি কারো ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে তার নিয়োগ শর্তের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং শর্ত না পাওয়া গেলে তার পদচ্যুতি ঘটবে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْفَاسِقُ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, ফাসিকের বিচার পরিচালনা করা বৈধ নয়। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও তাই। আমাদের প্রধান তিন ইমাম থেকে নাওয়াদির রেওয়ায়েতে এরূপ মতামত বর্ণিত আছে। কতিপয় মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে ফাসিক জেনেই বিচারক বানানো হয় তাহলে তার বিচার পরিচালনা করা বৈধ, তবে যদি ন্যায়পরায়ণ জেনে বিচারক বানানো হয় তারপর ফিসক প্রকাশ পায় তাহলে ফিসক প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তার পদচ্যুতি ঘটবে। কারণ বিচারক নিয়োগদানকারী নিয়োগ দানের সময় উক্ত ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করেছিল। তাই যখন তার ন্যায়পরায়ণতা ভূলুণ্ঠিত হলো তখন উক্ত নিয়োগকারী তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বিচারকের ন্যায়পরায়ণতা নিয়োগকারীর কাছে শর্তের মতো। অর্থাৎ নিয়োগকারী যেন ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্তে তাকে বিচারক করেছিল। এরপর যখন বিচারক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার শর্ত বাতিল করল তখন তার পদচ্যুতিও ঘটল।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোনো বিষয়ের সূচনা যতটা কঠিন তার অব্যাহত থাকাটা ততটা কঠিন নয়। যেমন আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে দেখি যে, বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু উক্ত বিবাহ বহাল থাকার জন্য কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, কোনো বিষয়ের শুরুটা যতটা শর্ত সাপেক্ষে হয় তার বহাল থাকার বিষয়টি শর্ত সাপেক্ষ নয়। অতএব বিচারক হওয়ার জন্য যদিও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত ছিল, কিন্তু বিচারকরূপে বহাল থাকার জন্য ন্যায়পরায়ণ থাকা শর্ত হবে না। সুতরাং বিচারক যদি নিয়োগের পর ফাসিক হয়ে যায় তাহলে এর দ্বারা সে পদচ্যুত হবে না। এটাই যুক্তির দাবি।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, আলোচ্য মাসআলায় বিচারক হওয়া عَدَالَتْ-এর সাথে শর্তযুক্ত ছিল। অর্থাৎ যদি ন্যায়পরায়ণ থাকে তাহলেই বিচারক থাকতে পারবে। যখন عَدَالَتْ খতম হয়ে যাবে সাথে সাথে বিচারকের আসন থেকে

নেমে যাবে। সেমতে এখানে বিচারকের পদচ্যুতি ঘটেছে ন্যায়পরায়ণতা বাতিল হওয়ার দ্বারা। সুতরাং এ মাসআলাটিকে যে মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছিল সেটি এর বিপরীত। এখন এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, বিচারকের বিচারকার্যকে শর্তযুক্ত করা কতটা শরিয়তসম্মত?

এর উত্তর হলো, বিচারকার্য ও নেতৃত্বকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা শরিয়ত অনুমোদিত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ بَعَثَ الْبَعْثَ إِلَى مُؤْتَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ : إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ أَمِيْرُكُمْ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ (صَحِيْحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থাৎ মহানবী ﷺ যখন মূতার উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেন তখন বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায় তাহলে জা'ফর ইবনে আবূ তালিব তোমাদের আমির হবে, যদি জা'ফর শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ তোমাদের আমির হবে।

হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত, বুখারী (র.) এটা রেওয়ায়েত করেছেন। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর জীবনীকার ও যুদ্ধ বিষয়ক রাবীগণ ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। এ হাদীসে রাসূল ﷺ হযরত জা'ফর (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ (রা.)-এর নেতৃত্বকে শর্তযুক্ত করেছেন। সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বিচারকার্য ও নেতৃত্ব শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা বৈধ।

এরপর লেখক ফতোয়া দানের অধিকারী তথা মুফতি সম্পর্কে বলেন, মুফতির ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। ফাসিক ব্যক্তি মুফতির পদ অলঙ্কৃত করতে পারবে না। কারণ ফতোয়া হচ্ছে দীনি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা। যেহেতু দীনি বিষয়ে ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য নয় তাই ফাসিক মুফতি হতে পারবে না। দীনের যাবতীয় বিষয়াদির ভিত্তি আমানতদারির উপর এবং খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকার উপর নির্ভরশীল। আর এ ব্যাপারে ফাসিকের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। অর্থাৎ দীনি ব্যাপারে খিয়ানত করার কারণেই তো সে ফাসিক হলো। এটা হচ্ছে কতিপয় ফকীহের অভিমত। অনেকে অবশ্য বলেন যে, ফাসিক মুফতি হতে পারে। কারণ উক্ত ফাসিক মুফতি লোকদের মাঝে সমালোচিত হওয়ার ভয়ে খুবই সর্তকতার সাথে ফতোয়া দিয়ে থাকবে। এর ফলে সে ভুল ফতোয়া থেকে বাঁচতে পারবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, বিচারকার্য ও নেতৃত্ব কোনো কোনো বিষয়ে এক হলেও এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ইমাম / আমির যদি নিয়োগের পরে ফাসিক হয়ে যায় তাহলে সে তার দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। কারণ নেতৃত্ব বা ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব ফলানোর উপর। এজন্যই দেখা যায় যে, অনেক আমির-শাসক অত্যাচার-নির্যাতনের পথে চলেছেন, এতদ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাদের কর্মকাণ্ড মেনে নিয়েছেন এবং তাদের পিছনে নামাজ পড়েছেন। পক্ষান্তরে বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আমানতদারি ও ন্যায়পরায়ণতার উপর। এজন্য যখন আমানতদারি ও নীতির বিসর্জন দেয় তখন তার বিচার পরিচালনা বাতিল হওয়ার যোগ্য হয়।

وَاَمَّا الثَّانِيْ فَالصَّحِيْحُ اَنَّ اَهْلِيَّةَ الْاِجْتِهَادِ شَرْطُ الْاَوْلَوِيَّةِ، فَاَمَّا تَقْلِيْدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيْحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ : اِنَّ الْاَمْرَ بِالْقَضَاءِ يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ، وَلَا قُدْرَةَ دُوْنَ الْعِلْمِ، وَلَنَا اَنَّهُ يُمْكِنُهُ اَنْ يَقْضِيَ بِفَتْوٰى غَيْرِهِ، وَمَقْصُوْدُ الْقَضَاءِ يَحْصُلُ بِهٖ، وَهُوَ اِيْصَالُ الْحَقِّ اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ، وَيَنْبَغِيْ لِلْمُقَلِّدِ اَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ الْاَقْدَرُ وَالْاَوْلٰى، لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَنْ قَلَّدَ اِنْسَانًا عَمَلًا وَفِيْ رَعِيَّتِهٖ مَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِيْ حَدِّ الْاِجْتِهَادِ كَلَامٌ عُرِفَ فِيْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ، حَاصِلُهٗ اَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ لَهٗ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ لِيَعْرِفَ مَعَانِي الْاٰثَارِ، اَوْ صَاحِبَ فِقْهٍ لَهٗ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِالْقِيَاسِ فِي الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ، وَقِيْلَ : اَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ قَرِيْحَةٍ مَعَ ذٰلِكَ يَعْرِفُ بِهَا عَادَاتِ النَّاسِ، لِاَنَّ مِنَ الْاَحْكَامِ مَا يَبْتَنِيْ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : আর দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো, ইজতিহাদী যোগ্যতা উৎকৃষ্টতার শর্ত। সুতরাং [ইজতিহাদী যোগ্যতা নেই এমন] জাহিলকে বিচারক নিয়োগ করা আমাদের মতে বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, বিচারের দায়িত্ব প্রদানের অর্থ হলো, বিচারক এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ ও যোগ্য হবেন। অথচ পূর্ণজ্ঞান ছাড়া তার সক্ষমতা প্রমাণ হয় না। আমাদের দলিল হলো, অমুজাহিদের পক্ষে অন্যের ফতোয়ার সাহায্যে বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। আর বিচারের উদ্দেশ্য এর দ্বারা হাসিল হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হলো হককে তার হকদারের কাছে পৌছে দেওয়া। তবে [বিচারক] নিয়োগদানকারীর উপর যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করে অথচ তার অধীনস্থ লোকদের মাঝে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান তাহলে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম জামাতের সাথে খিয়ানত করল।" ইজতিহাদের সংজ্ঞার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, যা ফিকহ -এর মূলনীতি শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা হলো, মুজতাহিদ হয় তো এমন মুহাদ্দিস হবেন যার ফিকহ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে, যাতে হাদীসের অর্থ তার পরিজ্ঞাত হয়, অথবা তিনি এমন ফকীহ হবেন যার হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞান রয়েছে, ফলে তিনি যেসব বিষয়ে নস [কুরআন ও হাদীসের বিধান] রয়েছে তাতে কিয়াস করবেন না। কেউ বলেন, এ দুটির যে কোনো একটির সাথে মুজতাহিদ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া দরকার যার সাহায্যে তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানবেন। কেননা অনেক বিধিবিধান এমন রয়েছে যা [মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি]-এর উপর নির্ভর করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الثَّانِيْ فَالصَّحِيْحُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিচারকের যোগ্যতার প্রশ্নে যে দ্বিতীয় শর্ত রয়েছে অর্থাৎ ইজতিহাদের যোগ্যতা, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হিদায়ার লেখক প্রথমত এ বিষয়ের মীমাংসা করেছেন যে, 'ইজতিহাদের যোগ্যতা' থাকাটা বিচারকের জন্য কি ধরনের শর্ত। বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কারণ ইমাম কুদূরী

(র.)-এর ইবারত لَا تَصِحُّ দ্বারা অনুমিত হয় যে, ইজতিহাদের যোগ্যতা আবশ্যকীয় শর্ত। অর্থাৎ যার ইজতিহাদী যোগ্যতা নেই সে বিচারক হতে পারবে না, এজন্য লেখক বলেন– فَالصَّحِيْحُ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْاِجْتِهَادِ الخ অর্থাৎ 'সঠিক কথা হলো ইজতিহাদী যোগ্যতা আবশ্যকীয় শর্ত নয়; বরং উৎকৃষ্টতার শর্ত।' এর মানে যদি বিচারক মুজতাহিদ হন তাহলে ভালো। আর যদি মুজতাহিদ না হন তাহলেও তার দ্বারা বিচার চলবে।

قَوْلُهُ فَاَمَّا تَقْلِيْدُ الْجَاهِلِ فَصَحِيْحٌ الخ : এ বাক্যটি লেখকের পূর্ববর্তী কথার সারাংশ। অর্থাৎ যেহেতু মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক শর্ত নয়, সেহেতু জাহিল আমাদের মতে বিচারক হতে পারবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে جَاهِلٌ শব্দের কি অর্থ এখানে উদ্দেশ্য? এর উত্তর পূর্বের বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, জাহিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুজতাহিদ নন, এমন ব্যক্তি। আর পরবর্তী বাক্য– خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ الْاَمْرَ بِالْقَضَاءِ يَسْتَدْعِى الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا قُدْرَةَ دُوْنَ الْعِلْمِ দ্বারা বুঝা যায় জাহিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিকহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি। এ দু অর্থের মধ্যে কোনটা প্রাধান্য পাবে? আমাদের মতে প্রথম অর্থ [অ-মুজতাহিদ]-ই এখানে উদ্দেশ্য। কারণ ফিক্‌হ সম্পর্কে যার জ্ঞান শূন্য বা স্বল্প থাকে, সেতো বিচারক হতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, জাহিলকে বিচারক বানানো বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) ও আহমদ (র.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুরূপ। হানাফী মাযহাবের কতিপয় আলেমও তাই মনে করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : কেউ বিচারক হওয়ার মানে হলো তিনি রায় প্রদান করতে ভালোভাবে সক্ষম। তাই এ সক্ষমতা প্রমাণের জন্য ইলম বা জ্ঞান থাকা জরুরি। কারণ জ্ঞান ছাড়া তার সক্ষমতা প্রমাণ হবে না। তাছাড়া জাহিল হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না; বরং ভালো করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলে।

আমাদের দলিল : জাহেল অন্যের ফতোয়ার সাহায্যে রায় প্রদান করতে পারে, ফলে এর দ্বারা বিচারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। বিচারের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক হকদারকে তার হক পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যায়-অবিচার নির্মূল করা। মোটকথা, যেহেতু অ-মুজতাহিদ ব্যক্তির পক্ষেও সঠিক রায় প্রদান করা সম্ভব, সুতরাং তার রায় প্রদান করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর তাই বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত করা অনাবশ্যক প্রমাণিত হলো। এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, হযরত মু'আয (রা.)-কে যখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যদি তোমার সমাধান খুঁজে না পাও তবে তুমি কি করবে? এর উত্তরে তিনি বললেন, اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ অর্থ 'আমি ইজতিহাদ করব।' এ হাদীস দ্বারা তো ইজতিহাদের প্রয়োজনীতা প্রমাণ হয়। তাহলে আপনারা মুজতাহিদ হওয়ার কথাটি কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? এর উত্তরে আমরা বলব, ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, তবে সে প্রয়োজন যেহেতু অন্যভাবেও মিটে যেতে পারে, তাই স্বয়ং বিচারকের মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক নয়। আবশ্যক তখনই হতো যদি হাদীস দ্বারা প্রত্যেক বিচারকের মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত প্রমাণিত হতো।

একটি প্রশ্ন : হযরত মু'আয (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে ইজমা'র কথা কেন উল্লেখ করা হয়নি?

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইজমা শরিয়তের দলিল নয়, কারণ রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতি ইজমার প্রয়োজনকে রহিত করে। যেহেতু হযরত মু'আযের ঘটনা রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসে ইজমার বর্ণনা নেই।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, একটি হাদীসে বলা হয়েছে– রাসূল ﷺ বলেছেন– وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর এবং অজ্ঞাত অবস্থাতে বিচারের রায় প্রদান করে, সে জাহান্নামি। [হাদীসটি আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণিত] এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অ-মুজতাহিদ বিচারক জাহান্নামি হবে। সুতরাং বিচারক হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক। এর উত্তর হলো– এ হাদীস ঐ জাহেল বিচারক সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে, যে অজ্ঞাত অবস্থাতে বিচারের রায় প্রদান করে এবং সঠিক রায় অন্য থেকে জানারও চেষ্টা করে না।

قَوْلُهُ يَنْبَغِىْ لِلْمُقَلِّدِ اَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ الخ : বিচারক নিয়োগদানকারী ব্যক্তিকে ইবারতে মুকাল্লিদ বলা হয়েছে। মুকাল্লিদের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, সে অন্যের কথাকে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়। কিন্তু এ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে মুকাল্লিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, هُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْلِيْدِ অর্থ– যার অন্যকে দায়িত্ব দানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।

অর্থাৎ যার বিচারক নিয়োগ দানের ক্ষমতা রয়েছে। এমন ব্যক্তি সরাসরি খলীফাতুল মুসলিমীন [ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান] তথা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর কিংবা একটি এলাকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর হয়ে থাকেন। হিদায়ার লেখক বলেন, মুকাল্লিদের জন্য উচিত যোগ্যতম ও সর্বোত্তম ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিয়োগ করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ قَلَّدَ اِنْسَانًا عَمَلًا وَفِىْ رَعِيَّتِهٖ مَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কাউকে কোনো দায়িত্ব দিল অথচ তার অধীনস্থ প্রজাদের মাঝে এর চেয়ে যোগ্য ও উত্তম ব্যক্তি রয়ে গেছে, তাহলে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে খিয়ানত করল।' এ হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিচারক নিয়োগদানকারীর উচিত সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া এবং যে তা করবে না সে মহাগুনাহে লিপ্ত হলো।

বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা : হাদীসটি হিদায়ার লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন ঠিক সেরূপ হাদীসের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى করেছেন। তবে একই অর্থে মুসতাদরাকে হাকেমের ৪র্থ খণ্ডের ৯২ - ৯৩ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এভাবে রয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعْمَلَ عَلٰى عِصَابَةٍ وَفِىْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ اَرْضٰى لِلّٰهِ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

হাদীসটি তাবারানী (র.)-ও ভিন্নসূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَلّٰى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَوْلٰى بِذٰلِكَ وَاَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

প্রায় একই অর্থে হাদীসটি আবূ ইয়া'লা আল মু'সীলী হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই–

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَجُلٌ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلٰى عَشَرَةِ اَنْفُسٍ وَعَلِمَ اَنَّ فِى الْعَشَرَةِ مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْهُ فَقَدْ غَشَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উপরিউক্ত তিনটি হাদীসের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। হাদীসগুলোর সারাংশ হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অথবা বিশেষ একটি দল বা গোষ্ঠীর [মুসলমানদের] ক্ষমতা দিয়েছেন, অতঃপর সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাদের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বিচারক নিয়োগ করে তাহলে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে খিয়ানত করল।

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কথা হলো, সমার্থক এ হাদীসগুলো বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও সনদের জটিলতার কারণে حَسَنْ -এর পর্যায়ে পৌঁছেনি, তবে এর স্তর حَسَنْ -এর কাছাকাছি। –[ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদীরে প্রাসঙ্গিকভাবে বিচারকের ভাতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, নিয়োগকারীর উপর যেমনভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন করা কর্তব্য, তদ্রূপ বিচারকের ভাতা নির্ধারণ করাও তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বিচারকের জন্য উক্ত ভাতা গ্রহণ করাতে কোনো ক্ষতি নেই, যদিও বিচারক সম্পদশালী হয়। তবে সম্পদশালী বিচারক যদি ছওয়াব লাভের আশায় ভাতা গ্রহণ না করে তাহলে সেটা হবে উত্তম। ভাতা দেওয়ার মূল দলিল হলো এতিমের মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী অছি সম্পর্কিত আয়াত– وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ 'যে সম্পদশালী সে যেন নিজেকে বিরত রাখে, যে দরিদ্র সে যেন উত্তম পন্থায় খায়।' এ আয়াতে অছি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ধনী হলে যেন বিনিময় গ্রহণ না করে, আর দরিদ্র হলে প্রয়োজন মাফিক বিনিময় গ্রহণ করতে পারে।

হযরত ওমর (রা.) যখন খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলেন তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিচারক সুলায়মান ইবনে রাবিয়া আল বাহেলীকে বিচারকের ভাতারূপে প্রতিমাসে পাঁচশত দিরহাম প্রদান করতেন। কেননা উক্ত বিচারক মুসলমানদের উপকারে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। আর সে ভাতায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হতো। বর্ণনাকারীগণ বলেন, হযরত ওমর (রা.) বিচারপতি শুরাইহ (র.)-কে একশত দিরহাম মাসহারা দিতেন, আর হযরত আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে দিতেন পাঁচশত দিরহাম। হযরত ওমর (রা.) কম দিতেন কারণ তৎকালে বিচারপতি শুরাইহ (র.)-এর পরিবার ছোট ছিল এবং মুদ্রার মূল্যমান বেশি ছিল। আর হযরত আলী (রা.)-এর যুগে তাঁর পরিবার অনেক বড় হয়ে যায় সেই সাথে মুদ্রার মূল্যমান কমে যায়, তাই হযরত আলী (রা.) তাঁর ভাতা পাঁচশত দিরহামে উন্নীত করেন।

শর্তব্য যে, বিচারকের ভাতা কোনো কিছুর বিনিময়ে নির্ধারিত হবে না। কারণ এ ভাতা তাঁর পারিশ্রমিক নয়। এটা তাঁর সম্মানী ভাতা। কেননা বিচার পরিচালনা করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অবৈধ। আল্লামা ইবনুল হুমাম এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বিচারকের মতো মুফতির জন্য মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক কিনা এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মুজতাহিদ ছাড়া কেউ ফতোয়া দিতে পারবে না। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারকগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুফতি অবশ্যই মুজতাহিদ হবেন। যারা মুজতাহিদ নন; বরং মুজতাহিদগণের কথা ও বিভিন্ন রেওয়ায়েত মুখস্থ ও আয়ত্ত করেন তারা মুফতি নন, এজন্য তাদের কাছে যখন কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হবে তখন তাদের উদ্ধৃতি আকারে বলা জরুরি। যেমন বলবে, ইমাম আবূ হানীফা এরূপ বলেছেন। উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগে যে ফতোয়া প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলো ফতোয়া নয়; বরং এগুলো হচ্ছে অন্যের উক্তি / কথা উদ্ধৃতি আকারে বর্ণনা করা। মুজতাহিদগণ থেকে কথা নকল করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে– ১.ধারাবাহিক সনদের মাধ্যমে মুজতাহিদের উক্তি বর্ণনা করা। কিংবা ২. তাদের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি নকল করা।

قَوْلُهُ وَفِىْ حَدِّ الْاِجْتِهَادِ كَلَامٌ الخ : লেখক বলেন, ইজতিহাদের সংজ্ঞা, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ তো উসূলুল ফিকহের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখানে উক্ত আলোচনার সারাংশ বর্ণনা করা হচ্ছে। মুজতাহিদ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুটি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে–

১. মুজতাহিদ এমন মুহাদ্দিস হবেন, যার ফিকহশাস্ত্রে যথেষ্ট দখল রয়েছে, যাতে উক্ত মুহাদ্দিস সেসব হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে, যার উপর আহকামের ভিত্তি রয়েছে।

২. মুজতাহিদ এমন ফকীহ হবেন, যার হাদীসশাস্ত্রে ভালোজ্ঞান রয়েছে, ফলে তিনি যেসব বিধিবিধানে নস [আয়াত ও হাদীস] বিদ্যমান রয়েছে তাতে কিয়াস করবেন না।

সারকথা, যিনি মুজতাহিদ হবেন তাঁর কুরআন-হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মুহাদ্দিস হওয়ার কারণে তিনি যেসব বিষয়ে নস রয়েছে তা জানবেন এবং নস আছে এমন বিষয়ে কিয়াস করবেন না। পক্ষান্তরে ফকীহ হওয়ার সুবাদে তিনি সেসব আয়াত ও হাদীসের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা জানবেন যার উপর বিধিবিধানের ভিত্তি। এ দু সংজ্ঞা খুবই কাছাকাছি। এ দুয়ের মাঝে এতটুকু পার্থক্য যে, প্রথম সংজ্ঞানুসারে মুজতাহিদের ইলমে হাদীসে পারদর্শিতা বেশি, আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় মুজতাহিদের ইলমুল ফিকহে দক্ষতা বেশি। উক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের পর্যালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, সংজ্ঞা দুটি সারকথা হিসেবে কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে যথেষ্ট। তা এই যে, একজন হাদীসে পণ্ডিত, অন্যজন ফিকহশাস্ত্রে। অথচ মুজতাহিদের জন্য দুটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় বিষয়ের প্রতি মুজতাহিদ মুখাপেক্ষী, কারণ মুজতাহিদ যদি কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে না জানেন তাহলে কিয়াস করতে পারবেন না, আবার কুরআন-হাদীস না জানলে কুরআন ও হাদীসের দলিল আছে এমন বিষয়ে কিয়াস করে বসবেন। তাই আমার মতে উত্তম হলো এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যে, মুজতাহিদ কুরআন হাদীস ও ফিকহ উভয় বিষয়ে জ্ঞানী হবেন, যাতে তিনি আয়াত ও হাদীসের অর্থ-ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হন এবং দলিলের বিপরীতে কিয়াস করা থেকেও বেঁচে থাকেন।

সারকথা, মুজতাহিদ কুরআন-হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথা ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস ও ইকতিযাউন নস এবং নাসিখ-মানসূখ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান, কিয়াসের শর্তাদি, ইজমা হয়েছে এমন মাসায়েল ও সাহাবীগণের বিভিন্ন উক্তি ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত হবেন।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ قَرِيْحَةٍ الخ : লেখক বলেন, কারো কারো মতো উপরিউক্ত দুটি সংজ্ঞার সাথে মুজতাহিদের জন্য আরেকটি বিষয় জরুরি, আর তা হলো মুজতাহিদকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হতে হবে। কারণ মুজতাহিদ যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হন তাহলে তাঁকে এমন সব মাসআলায় হোঁচট খেতে হবে, যার ভিত্তি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও সামাজিকতার উপর। আর মুজতাহিদ যদি তা না জানেন তাহলে সমস্যায় পড়বেন। কারণ অনেক সময় প্রচলিত প্রথা কিয়াসের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالدُّخُوْلِ فِي الْقَضَاءِ لِمَنْ يَثِقُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّيْ فَرْضَهُ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَقَلَّدُوْهُ وَكَفٰى بِهِمْ قُدْوَةً وَلِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِكَوْنِهِ أَمْرًا بِالْمَعْرُوْفِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী যে, বিচার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব সে আদায় করতে পারবে তার জন্য বিচারকের পদ গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সাহাবায়ে কেরাম বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আমাদের অনুসরণীয়। তাছাড়া এটা ফরযে কিফায়া, কারণ এটা 'সৎকাজের আদেশ' -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِالدُّخُوْلِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সুবিচার করা ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তার জন্য উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। এ দায়িত্ব গ্রহণ করা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। এর দলিল হলো সমস্ত নবীকে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الخ অর্থাৎ হে দাউদ! আপনাকে আমি এ পৃথিবীর প্রতিনিধি মনোনীত করেছি। সুতরাং আপনি জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার করুন।

–[সূরা সাদ : আয়াত– ২৬]

আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ

অর্থ [হে নবী !] আমি আপনার কাছে সত্যসহ কিতাব প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো পথে লোকদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। –[সূরা নিসা : আয়াত– ১০৫]

এসব আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ন্যায়বিচার একটি প্রশংসনীয় কাজ।

দ্বিতীয় দলিল : সাহাবায়ে কেরামের আমল। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী যুগে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন হযরত মু'আয ও হযরত আলী (রা.) দুজনেই রাসূলের জীবদ্দশায় বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস, তিনি বলেন– بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا ও হযরত মু'আয (রা.)-এর বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস– بِمَا تَقْضِيْ يَا مُعَاذُ الخ এছাড়া হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে সুলায়মান ইবনে রাবীয়া ও কাজি শুরাইহ্‌কে বিচারক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। [যার বর্ণনা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।] তদ্রূপ হযরত আলী (রা.) কাজি শুরাইহ (র.)-কে পুনর্বার বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। বায়হাকীর বর্ণনানুসারে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর খেলাফতকালে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে বিচারক ও আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত করেন।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে বিচারক পদে নিয়োগ দান করেন। উপরিউক্ত সাহাবীগণের ঘটনাবলির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিচারকের পদ গ্রহণ করা

কিংবা এ পদে অন্যকে নিয়োগ দান করা এমন একটি কাজ, যাতে সাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আর্দশ তাই আমাদের জন্যও বিচারকের পদ গ্রহণ করা বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় দলিল : এটা ফরযে কিফায়া, যা বাস্তবায়ন করা সকলেরই কর্তব্য। তাই যোগ্য ব্যক্তির এ পদ গ্রহণ করা উত্তম হবে। কিন্তু ইমাম কুদূরী (র.) বিষয়টি অন্যভাবে উপস্থাপন করছেন। ইমাম কুদূরী (র.) "لَا بَأْسَ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার বহুল ব্যবহার হচ্ছে মুবাহ এবং যা না করা উত্তম -এর অর্থে। এতে ফরযে কিফায়া প্রমাণিত হয় না। এর উত্তর হলো, আলোচ্য মাসআলাটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যার সারকথা হচ্ছে, যদি বিচারক নিজের উপর জুলুম ও অন্যায় বিচার করার ব্যাপারে অনিশ্চিত হয় অর্থাৎ তার দ্বারা জুলুম প্রকাশিত হওয়ার ও অন্যায় বিচার করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার জন্য বিচারক হওয়া মাকরূহে তাহরীমী।

আর যদি বিচারক নিজে উপরিউক্ত ব্যাপারগুলোর জন্য আত্মবিশ্বাসী হয় তাহলে তার জন্য তা করার অনুমতি রয়েছে তবে না করাই উত্তম।

তবে স্মর্তব্য যে, উপরিউক্ত বিশ্লেষণ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিচারক হওয়ার যোগ্যতা এক ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ না হয়, আর যদি একজন মাত্র লোক যোগ্য থাকেন তাহলে তো তার উক্ত পদ গ্রহণ করা ফরজ হয়ে যাবে। ফরযে কিফায়া হওয়ার দলিল হলো, বিচারক হওয়ার দ্বারা أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ [সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে বাধান প্রদান] -এর সুযোগ আসে। কেননা বিচারক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সৎকাজের প্রতিষ্ঠা ও জুলুম বন্ধ করার মাধ্যমে অসৎকাজের মূলোৎপাটন করে থাকেন। আর উক্ত কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সব মুসলমানদের উপর নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الخ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন থাকা উচিত যারা কল্যাণের পথে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, আর অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে। -[সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১০৪]

قَالَ : وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِمَنْ يَخَافُ الْعَجْزَ عَنْهُ، وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفَ فِيهِ، كَيْلَا يَصِيرَ شَرْطًا لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَبِيحَ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الدُّخُولَ فِيهِ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ رُخْصَةٌ طَمَعًا فِي إِقَامَةِ الْعَدْلِ، وَالتَّرْكَ عَزِيمَةٌ فَلَعَلَّهُ يُخْطِئُ ظَنَّهُ، وَلَا يُوَفَّقُ لَهُ أَوْ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَابُدَّ مِنَ الْإِعَانَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ الْأَهْلَ لِلْقَضَاءِ دُونَ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ التَّقَلُّدُ صِيَانَةً لِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَإِخْلَاءً لِلْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অপারগতার ভয় করবে এবং বিচারকার্যে জুলুম করার ব্যাপারে তার আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকবে তার জন্য [বিচারকের] দায়িত্ব গ্রহণ করা মাকরূহ। যাতে তা নিকৃষ্ট কাজের শর্ত বা মাধ্যম না হয়ে যায়। কতিপয় আলেম বিচারকের দায়িত্বগ্রহণকে মাকরূহ মনে করেন রাসূল ﷺ -এর এ বাণীকে গ্রহণ করার কারণে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "যাকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হলো তাকে ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।" বিশুদ্ধ কথা হলো, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে, তবে তা পরিত্যাগ করা সতর্কতার পরিচায়ক। কেননা এটাতো সম্ভব যে, বিচারক [ধারণাগত] সিদ্ধান্তে ভুল করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তের তৌফিকপ্রাপ্ত হবে না। অথবা বিচারকের রায় বাস্তবায়নে অন্যরা সহযোগিতা করবে না। অথচ অন্যদের সহযোগিতা আবশ্যক। তবে যদি সে ছাড়া অন্য কেউ বিচারকের যোগ্য না হয় তখন তার উপর দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজ হয়ে যাবে, যাতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং জগতকে অরাজকতা মুক্ত করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে কাদের জন্য বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা মাকরূহ তা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে নিজ অপারগতার ভয় করে এবং নিজেকে জুলুম থেকে রক্ষার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী না হয় তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা মাকরূহ তাহরীমী।" কেননা তার বিচারকের দায়িত্বটি অত্যাচারের ও নির্যাতনের বাহন হবে। আবার কতিপয় ওলামা/ কতিপয় পূর্বসূরিদের মতে সাধারণভাবে বিচারকের দায়িত্বগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী। চাই বিচারক নিজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিশ্চিত হোক অথবা জুলুমের ব্যাপারে আশঙ্কা করুক। হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ বিনায়া, ফাতহুল কাদীর ও ইনায়াতে বলা হয়েছে যে, মাকরূহ দ্বারা এখানে মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য। ইনায়াতে বলা হয়েছে যে, মাকরূহ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো নাজায়েজ। এর দলিলরূপে তিনি সদরুশ শহীদের উক্তি উদ্ধৃত করেন– وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ إِلَّا مُكْرَهًا অর্থাৎ 'কতিপয় আলেম বলেন, বাধ্য না হলে বিচারকের পদ গ্রহণ করা নাজায়েজ।' তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে রাসূল ﷺ -এর হাদীস পেশ করেন, যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ . (حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, যাকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হলো তাকে তো ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।

হাদীসটির সমার্থক আরেকটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

اَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِى الْكَامِلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَقْضٰى فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিচারক হতে চায়, তাকে যেন ছুরি ছাড়া হত্যা করা হলো।

বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারাই বিচারকের পদ গ্রহণ করার প্রতি অনুৎসাহিত করা হয়েছে এবং গ্রহণ করার উপর সমূহ ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। ফলে বিচারকের পদ গ্রহণ করা যে মাকরূহ, তাই প্রমাণিত হলো।

উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীস দুটিতে বিচারকের পদ গ্রহণ করার বিষয়টিকে ছুরিবিহীন জবাইয়ের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য কি? এর উত্তরে সদরুশ শহীদ (র.) তাঁর আদাবুল কাযী গ্রন্থে লিখেন, ছুরি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে কাজ করে। যেমন– ছুরি দিয়ে কাটলে রক্ত বের হয়। আবার এতে ভিতরের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অকেজো হয়ে যায়; কিন্তু ছুরি ছাড়া হত্যা করা মানে গলা টিপে হত্যা করা, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করা ইত্যাদি। এসবের দ্বারা বাহ্যত কিছু না হলেও ভিতরে এর প্রভাব শতভাগ দেখা যায়। তদ্রূপ বিচার পরিচালনার মাধ্যমে [অন্যায় করলে] বাহ্যিক কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না; বরং বাহ্যিকভাবে তো বিচারকের সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। উপরিউক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অনেক বড় বড় ইমাম উক্ত পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ত্রিশের/ চল্লিশের অধিক দিন উক্ত পদ গ্রহণ না করার কারণে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন, তারপর বাধ্য হয়ে বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে আব্বাসী দ্বিতীয় খলীফা আবূ জা'ফর আল মানসূর বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্য তিনবার আহ্বান করেন, তিনবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে প্রত্যেকবার তাঁকে ত্রিশটি করে বেত্রাঘাত করা হয় এবং বন্দী করে রাখা হয়, এ বন্দী অবস্থাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় দফা বিচারকের পদ গ্রহণ করার আহ্বান জানালে তিনি তাঁর ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমেই তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার সারকথা এখানে তুলে ধরা হলো–

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আপনি যদি এ পদ গ্রহণ করেন তাহলে জনগণ উপকৃত হবে। উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, 'এত বড় সাগর আমি সাঁতরিয়ে কিভাবে পার হব।' তদুত্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বললেন, 'সাগর গভীর বটে; তবে নৌকা তো মজবুত এবং মাঝি পণ্ডিত।' প্রখ্যাত আলেম আবূ কিলাবা -এর উক্তিও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতো। তিনি বলেন, বিচারকদের অবস্থা হলো মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটা ব্যক্তির ন্যায়, যাদের অধিকাংশই ডুবে মারা যায়। তাকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার কথা বলা হলে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে যান, সেখানে একই পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ইয়ামামায় চলে আসেন। এ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণিত হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهٗ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ لَا تَأْمُرَنَّ عَلٰى اِثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ .
(مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْحِ، ص ٣٢٠)

অর্থাৎ হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী ﷺ তাকে বলেন, হে আবূ যর! আমি নিজের জন্য যা ভালো মনে করি তোমার জন্য তাই ভালো মনে করি, [অতএব, শোন] দুজনের উপর [হলেও] আমির এবং কোনো এতিমের সম্পদের অভিভাবক হয়ো না।

এতদসংক্রান্ত আরেকটি হাদীস ইবনে আবূ বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِى النَّارِ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ وَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বলেছেন বিচারক তিন ধরনের। দুধরনের বিচারক জাহান্নাম যাবে, আর এক ধরনের বিচারক যাবে জান্নাতে। ১. যে বিচারক সঠিক রায়ে অবগত এবং সে অনুযায়ী সে রায় প্রদান করল সে জান্নাতে যাবে। ২. যে বিচারক সঠিক রায় জানে কিন্তু তদনুযায়ী ফয়সালা দিল না; বরং রায়ের ব্যাপারে অত্যাচার-অবিচার করল, সে দোজখে যাবে। ৩. যে বিচারক

সঠিক রায়ে অবগত নয়; বরং মূর্খতাবশত রায় প্রদান করল সেও দোজখে যাবে।" এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস উল্লেখযোগ্য, যা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُدْعٰى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقٰى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنّٰى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِيْ عُمْرِهٖ (اَخْرَجَ ابْنُ صَبَّانَ)

অর্থাৎ "আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারককে ডাকা হবে, অতঃপর তার এমন কঠিন হিসাব নেওয়া হবে যে, তার তখন মনে হবে যদি সে দুনিয়াতে তার গোটা জীবনে দুজন ব্যক্তির বিচারও না করত তাহলে ভালো হতো।

অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ ব্যক্তির মাঝে বিচার পরিচালনার দায়িত্ব পেল তারপর সে তাদের প্রিয়ভাজন হয়ে / অপ্রিয়ভাজন হয়ে বিচার পরিচালনা করল কিয়ামত দিবসে উক্ত বিচারককে কাঁধে হাত বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। যদি উক্ত বিচারক আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী, উৎকোচ গ্রহণ না করে ফয়সালা দিয়ে থাকে এবং কোনো অত্যাচার না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বাঁধন মুক্ত করে দেবেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিধানের খেলাফ ফয়সালা দেয়, রায় প্রদানে উৎকোচ নেয় এবং অত্যাচার করে তাহলে তার বাম হাত ডান হাতের সাথে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যারা বিচারকের পদ গ্রহণ করা মাকরূহ মনে করেন উপরিউক্ত হাদীসগুলো এবং সালাফের আমল দ্বারা তারা দলিল দেন।

তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হলে এ কথাই প্রমাণ হবে যে, বিচারকের পদ একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্বের জবাবদিহিতা সবচেয়ে বেশি। এ দায়িত্ব পালনে সামান্যতম পদস্খলন ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে বিরাট বিপর্যয়। এ হাদীসগুলোতে বিচারকের পদ গ্রহণে সাবধান হতে বলা হয়েছে- নিষেধ করা হয়নি। আর এজন্যই লেখক বলেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উক্ত পদ গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর উৎসাহ বাণীও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। রাসূল ﷺ বলেন– عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ অর্থাৎ "এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার বছর ব্যাপী নেক আমলের চেয়ে উত্তম।" ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ فِي الدُّنْيَا عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلٰى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, পৃথিবীর ন্যায়-বিচারকগণ [কিয়ামত দিবসে] পরম করুণাময় আল্লাহর ডানদিকে জ্যোতির মিম্বরে অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহর উভয় হাত ডান তথা সম্মানিত, ন্যায়-বিচারক হলেন তারা যারা তার বিচার পরিচালনায় অধীনস্থ লোকজন, নিকটাত্মীয় ও বন্ধু মহলে ন্যায়নিষ্ঠা অবলম্বন করেন।

قَوْلُهُ وَالتَّرْكُ عَزِيْمَةٌ الخ : লেখক বলেন, এমতাবস্থায়ও উক্ত পদ পরিত্যাগ করা সাহসিকতার কাজ বিবেচিত হবে। কারণ যদি বিচারক মুজতাহিদ হয় এবং বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে তাহলে সে ভুল করতে পারে। আর যদি বিচারক মুজতাহিদ না হয় তাহলে সে অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হবে। অন্য কেউ তাকে সহযোগিতা করবে একদিকে এর যেমন নিশ্চয়তা নেই, অন্যদিকে এমন কোনো ব্যক্তি নাও থাকতে পারে যে তাকে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া লোভ ও মোহ যা অন্তরে সুপ্ত ছিল তা জেগে উঠতে পারে। অথবা বিচারক নিরপেক্ষতা হারাতে পারে, স্বজনপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নিতে পারে। এসব বিবেচনা করত বিচারকের পদ গ্রহণ না করা আযীমত বা উত্তম ও সতর্কতামূলক কাজ।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا كَانَ هُوَ الْاَهْلُ الخ : লেখক বলেন, যদি একজন মাত্র যোগ্য লোক থাকে এবং তার বিকল্প কেউ না থাকে তাহলে তার জন্য বিচারকের পদ গ্রহণ করা ফরজ যাতে মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষা করা যায় এবং জগতকে অরাজকতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। কারণ যোগ্য লোক যদি শক্ত হাতে বিচার ব্যবস্থার হাল না ধরেন তাহলে দেশ, জাতি ও সমাজ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অন্ধকারে ডুবে যাবে।

قَالَ : وَيَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَطْلُبَ الْوِلَايَةَ وَلَا يَسْأَلُهَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهٗ، وَلِاَنَّ مَنْ طَلَبَهٗ يَعْتَمِدُ عَلٰى نَفْسِهٖ فَيُحْرَمُ وَمَنْ اُجْبِرَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلٰى رَبِّهٖ فَيُلْهَمُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কারো জন্য [বিচারকের] দায়িত্বের অনুসন্ধানে থাকা এবং তা চেয়ে নেওয়া সমীচীন নয়। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় সেটা তার নিজের উপর অর্পণ করা হয়। আর যাকে [দায়িত্ব গ্রহণে] বাধ্য করা হয় তার উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাছাড়া যে এ দায়িত্ব চায় সে নিজের উপর [নিশ্চিত] নির্ভর করে। ফলে সে বঞ্চিত হয়। আর যাকে বাধ্য করে দায়িত্ব দেওয়া হয় সে তার প্রভুর উপর ভরসা করে, ফলে তার প্রতি ইলহাম করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَيَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَطْلُبَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারকের দায়িত্ব ও অন্যান্য কর্তৃত্ব চেয়ে নেওয়া ও এর জন্য দরখাস্ত করা অনুচিত। কারণ এগুলো গুরুদায়িত্ব, এর মাঝে যে ভুল করা হয় তার পরিণতি ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত এসব আঞ্জাম দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হিদায়ার লেখক রাসূল ﷺ-এর বাণী পেশ করেন, যা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত ও ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক উল্লিখিত–

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهٗ .

হিদায়ার লেখক مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ-এর স্থলে طَلَبَ الْقَضَاءَ শব্দটি ব্যবহার করেন যা আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়– ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে নিম্নলিখিত শব্দেও রেওয়ায়েত করেন– مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهٗ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ

প্রথম হাদীসের অর্থ– যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চেয়ে নেয় তার নিজের উপর তার ভার দেওয়া হয়। আর যাকে বাধ্য করে দেওয়া হয় তার উপর একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় যে তাকে সঠিক পথ দেখায়। শেষোক্ত রেওয়ায়েতে এতটুকু শব্দ বেশি রয়েছে যে, কতিপয় সুপারিশকারী [বিচারক পদপ্রার্থীর জন্য] সুপারিশ করে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র.)-এর রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধতম বলে উল্লেখ করেন। যা নিম্নরূপ–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বলেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না, কেননা যদি তুমি তা চেয়ে পাও তাহলে তার ভার তোমার উপর। আর যদি না চেয়ে পাও তাহলে তোমাকে [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে] সাহায্য করা হবে।" উপরিউক্ত হাদীসগুলোর আলোকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, চেয়ে নেওয়া অনুচিত। যদি তা কেউ করে তাহলে তাতে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ব্যাপারে যৌক্তিক দলিল– হিদায়ার লেখক যা প্রকাশ করেছেন তা এই যে, যে ব্যক্তি বিচারকের দায়িত্ব চেয়ে নিল সে তো তার নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর ভরসা করল, সরাসরি আল্লাহর উপর ভরসা করল না, এসবের উপর ভরসা করার কারণে তার অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের উপর ভরসা করল সে আল্লাহ তা'আলার তৌফিক থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ "নিশ্চয় কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ করে।" পক্ষান্তরে যাকে জোর করে উক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয় সে আল্লাহর উপর ভরসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তাকে আল্লাহ তৌফিক দান করেন এবং নেককাজের ইলহাম করেন। অতএব, বিচারকের পদ নিজে প্রার্থী হয়ে নেবে না; বরং বড়দের পক্ষ থেকে উক্ত পদ প্রদান করা হলে এবং বাধ্য হলেই কেবল তা নেবে।

ثُمَّ يَجُوزُ التَّقَلُّدُ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ كَمَا يَجُوزُ مِنَ الْعَادِلِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ (رضـ) تَقَلَّدُوا مِنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ نَوْبَتِهِ وَالتَّابِعِيْنَ تَقَلَّدُوا مِنَ الْحَجَّاجِ وَهُوَ كَانَ جَائِرًا إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِحَقٍّ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ لَا يَحْصُلُ بِالتَّقَلُّدِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُمَكِّنُهُ ـ

অনুবাদ : আর অত্যাচারী শাসক থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ যেমন বৈধ ন্যায়পরায়ণ শাসকের থেকে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অথচ হযরত আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে ন্যায়ের উপর ছিলেন এবং তাবেয়ীগণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর সে ছিল অত্যাচারী শাসক। তবে যদি শাসক বিচারককে ন্যায়বিচার করার সুযোগ না দেয় [তাহলে দায়িত্ব নেওয়া বৈধ নয়]। কেননা তখন দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। যদি তাকে ন্যায়বিচারের সুযোগ দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَجُوزُ التَّقَلُّدُ مِنَ السُّلْطَانِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে অত্যাচারী-স্বেচ্ছাচারী শাসক ক্ষমতায় থাকাকালে তার থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শাসক ন্যায়পরায়ণ হলে তার পক্ষে বিচারক হওয়া যে বৈধ তা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ যেরূপ বৈধ তদ্রূপ অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসকের পক্ষে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বিদ্রোহ করে শাসন ক্ষমতা কব্জা করে ফেলে তারপর পূর্ব নিয়োগকৃত বিচারকদের বিচারক থাকতে বাধ্য করে কিংবা নতুন করে লোকদের বিচারক হতে বাধ্য করে তাহলে যাদের বাধ্য করা হয় তাদের জন্য বিচারক হওয়া বৈধ। হিদায়ার লেখক মাসআলার দলিল হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে স্বেচ্ছাচারী-অত্যাচারী শাসকরূপে উপস্থাপন করেছেন, যার পক্ষে সাহাবীদের একটা অংশ বিচারকের পদ গ্রহণ করেন।

[হযরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রসঙ্গে আলোচনায় পরে আসব] লেখক বলেন, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পরে হযরত আলী (রা.) চতুর্থ খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন বৈধ খলিফা এবং তাঁর খিলাফত সম্পর্কে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাআত সর্বসম্মতভাবে একমত। তবে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাহাবী ও তাবেয়ীদের জামাত দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাহাবীদের মাঝে পরপর দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ [জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীন] সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) দামেস্ককে রাজধানী করে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তাঁর এ খিলাফতের ঘোষণা ছিল একজন হক ও ন্যায়বান খলিফা [হযরত আলী (রা.)]-এর বর্তমানে। তাই তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। হযরত আলী (রা.) শহীদ হওয়ার পর তদীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.) খলিফা হলেন। এক সময় তিনি খিলাফতের দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর সরে যাওয়ার পর খলিফা [আমির] হলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)। উম্মতের সকলেই তাঁর এই [পরবর্তী] খিলাফতকে মেনে নিয়েছিলেন। মোটকথা আলী ও হাসানের খিলাফতকালে তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী খলিফা। হিদায়ার লেখক সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) তাঁর বিদ্রোহী হওয়ার পক্ষে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর সংক্রান্ত বিখ্যাত একটি হাদীস দ্বারাও দলিল পেশ করেন। আম্মার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছিলেন- "تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" অর্থাৎ "বিদ্রোহী সম্প্রদায় তোমাকে হত্যা করবে।" সিফফীন যুদ্ধে হযরত আম্মার (রা.) হযরত আলী (রা.) -এর পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং প্রতিপক্ষ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলের হাতে নিহত হন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর অনুসারীগণ বিদ্রোহী ছিলেন। এ ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি উক্তির মাধ্যমেও আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বিদ্রোহী ও স্বেচ্ছাচারীরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

আল্লামা ইবনু আবদিল বার (র.) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেন–

قَالَتْ عَائِشَةُ (رض) لِابْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَنْهَانِىْ عَنْ مَسِيْرِىْ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا غَلَبَ عَلَيْكِ يَعْنِى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ نَهَيْتَنِىْ مَا خَرَجْتُ ـ

অর্থাৎ "হযরত আয়েশা (রা.) পরবর্তীকালে ইবনে ওমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান ! কেন তুমি আমাকে [উষ্ট্রীর যুদ্ধে যেতে বারণ] করলে না। তিনি বললেন, আমি দেখলাম আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে [তাই আমি বাধা দিলে লাভ হবে না জেনে বাধা দেইনি]। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যদি তুমি আমাকে বারণ করতে তাহলে আমি যেতাম না।" হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ উক্তি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বিপক্ষে ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করার কারণে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই অনুতাপ হযরত আলী (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণ খলিফা হওয়া ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিদ্রোহী হওয়াকে প্রমাণ করে। মোট কথা, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) ন্যায়সঙ্গতভাবে খলিফা হয়েছিলেন, আর তিনিই ছিলেন খিলাফতের বৈধ হকদার। কিন্তু তারপরও যেহেতু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর হাতে বায়'আত নেননি, উপরন্তু দামেস্ককে রাজধানী করে নিজেকে খলিফারূপে ঘোষণা করেছিলেন, তাই তার এই খলিফা হওয়ার চেষ্টা সুস্পষ্টভাবে তার বিদ্রোহী হওয়াকে প্রমাণ করে। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামকে বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সাহাবীগণ উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন– বিখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা (রা.)-কে সিরিয়ার বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই পরামর্শক্রমে কামালাহ ইবনে উবাইদ আল আনসারীকে তাঁর স্থলে সিরিয়ার বিচারক নিযুক্ত করেন। এ সাহাবীদ্বয় কর্তৃক বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা এটাই প্রমাণ করে যে, স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ/ আমিরের পক্ষে বিচারক হওয়া বৈধ।

হিদায়ার লেখক অত্যাচারী শাসকের দ্বিতীয় উদাহরণ পেশ করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফী দ্বারা। হাজ্জাজ প্রকৃতই অত্যাচারী ও নিপীড়ক শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পক্ষে ইরাক ও খোরাসান অঞ্চলের প্রশাসক ও গভর্নর। তার মৃত্যুর খবর শুনে হযরত হাসান বসরী (র.) শুকরিয়া স্বরূপ সিজদায় অবনত হন। হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, "যদি কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মত তাদের যুগের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে আমি [আমার যুগের জন্য] হাজ্জাজকে নিয়ে হাজির হব এবং আমি সবাইকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান লাভ করব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাবেয়ীদের কেউ কেউ তার পক্ষে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন– আবূ বুরদাহ ইবনে আবূ মূসাকে হাজ্জাজ বিচারক নিযুক্ত করেন। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ মারয়াম হাজ্জাজের পক্ষে ইস্পাহানের বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারী শাসকের পক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করা বৈধ।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الخ : লেখক বলেন, অত্যাচারী শাসকের পক্ষে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ, তবে যদি বিচারক এ আশঙ্কা করে / নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হবে না তখন তার জন্য বিচারকের পদ গ্রহণ করা অবৈধ। কারণ বিচারের উদ্দেশ্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। আর তা তখন প্রবলভাবে ব্যাহত হবে। তবে যদি বিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করে এবং এর অনুকূল পরিবেশ পায় তাহলে তার জন্য বিচারকের পদ গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন : হিদায়ার লেখক স্বেচ্ছাচারী শাসকের উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যে নামোচ্চারণ করেছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) -এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর শাম দেশে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উক্ত যুদ্ধে মুসায়লামা হত্যার নায়ক হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। ১৯ হিজরিতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে তাঁর ভাই যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ানের স্থলে সিরিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে চার বছরের প্রশাসক জীবনে রোম সীমান্তে অব্যাহত জিহাদের মাধ্যমে বহু শহর ও জনপদ জয় করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল [বারো বছর] পুরো সময় জুড়ে তিনি স্বপদে বহাল থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন। ২৫ হিজরিতে তিনি রোমের মূল ভূখণ্ডে জিহাদ পরিচালনা করে আমুদরিয়া অতিক্রম করেন এবং পথিমধ্যে মজবুত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো কুস্তুনতুনিয়ার অভিযান। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম উম্মাহের সর্বপ্রথম নৌবহর নিয়ে

কুস্তুনতুনিয়ার অভিযানে গমন করেন। এ অভিযানে তাঁর সাথে অনেক সাহাবীও শরিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেন– "হযরত মুয়াবিয়া হলেন প্রথম খলিফা. যিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্যে নৌবহর তৈরি করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে নৌযুদ্ধের সূচনা করেন।" এ অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের সাথে সাথে অন্যদিক থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জন্য কুস্তুনতুনিয়ার অভিযান ছিল এক মহাসৌভাগ্যের স্বর্ণ-সোপান। কেননা রাসূল ﷺ প্রথম নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বাণী হলো– أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوْا অর্থাৎ "আমার উম্মতের যে প্রথম সৈন্যদলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।" ২৮ হিজরিতে তিনি সাইপ্রাস জয় করেন। ৩৩ হিজরিতে রোমকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করেন। ৩৫ হিজরিতে সংঘটিত সুপ্রসিদ্ধ "যিশখিব" যুদ্ধে তিনি ফিল্ড মার্শালের দায়িত্ব পালন করেন। ৩৭ হিজরিতে সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। ৪১ হিজরিতে হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে খিলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্ধি হয়। সন্ধির মাধ্যমে হযরত হাসান (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুকূলে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান। তখন থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম সাম্রাজ্যের একক খলিফারূপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। ৪২ হিজরিতে সিজিস্তান ও সিন্ধুর অংশবিশেষ দখল করেন। ৪৩ হিজরিতে সুদান জয় করেন। ৪৪ হিজরিতে কাবুল বিজয় এবং ভারতবর্ষে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ৪৫ হিজরিতে আফ্রিকা অভিযান পরিচালনা করেন এবং আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলামি মানচিত্রে যোগ করেন। ৪৬ হিজরিতে সিসিলীতে সেনাবাহিনী পাঠান এবং ৫০/৫১ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। ৫৪ হিজরিতে আমু দরিয়া অতিক্রম করে মুসলিম ফৌজ বুখারায় প্রবেশ করে। ষাট হিজরিতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন এবং দামেস্কে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর কর্মমুখর বিশ বছরের খিলাফতকালে নীতি-নৈতিকতা, সহনশীলতা, কোমল ব্যবহার, ন্যায়-ইনসাফ, সুশাসন, শরিয়তের বিধিবিধানের প্রয়োগ, সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে এক আদর্শ ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিহাসে তার নজির খুবই কম। এ সংক্ষিপ্ত লেখায় তার বিবরণ পেশ করা দুরূহ ব্যাপার। নিম্নে তাঁর শাসনামল সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য তুলে ধরা হলো–

হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় বলেছেন– "হযরত উসমান (রা.)-এর পর এই ঘরের বাসিন্দার [হযরত মুয়াবিয়া (রা.)] চেয়ে অধিক ইনসাফকারী কাউকে আমি দেখিনি।"

হযরত আবূ ইসহাক সাবাই (র.) বলেন, "হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল যদি দেখতে তাহলে ন্যায় ও ইনসাফের কারণে নিঃসন্দেহে তাঁকে তোমরা মাহদী নামে আখ্যায়িত করতে।"

ইমাম আমাশের মজলিসে একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের আলোচনা শুরু হলে তিনি বলেন, "তোমরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের প্রশংসা করছ। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন যুগ দেখলে তবে কি করতে, লোকেরা বলল, আপনি কি তাঁর সহনশীলতার কথা বলছেন? তিনি বললেন, না, তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের কথা বলছি।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) লিখেন "জনসাধারণের সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আচরণ ছিল আদর্শ শাসকের আচরণ। তাই জনসাধারণও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল।"

তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেন, "তাঁর শাসনামলে জিহাদের ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লাহর দীন অপ্রতিহত গতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গনিমাতের মালের ঢল নেমে এসেছিল। মোটকথা, তাঁর শাসনছায়ায় মুসলমানগণ সুখ-শান্তি এবং ইনসাফ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনযাপন করছিল। –['ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.)' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত]

এবার আসা যাক মূল প্রশ্নে অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া কতটা স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন? এর উত্তরে প্রথমেই আমরা বলব, হিদায়ার লেখকের জন্য হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে স্বেচ্ছাচারী শাসকরূপে উপস্থাপন করা মোটেও ঠিক হয়নি। কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেননি এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেকে খলিফারূপে ঘোষণা করেন তা ছিল হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে উদ্ভূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির ফলাফল। এ ঘটনার জন্য তিনি নিজে কোনোভাবে আগ্রহী ছিলেন না। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সিফফীন ও জামাল যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলো। এক্ষেত্রে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলামি উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত নির্মমভাবে মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। সুতরাং

তাঁর ঘাতক হত্যাকারীদের কিসাস ও প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে কোনো রকম শৈথিল্য কিংবা নমনীয়তা প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই, অথচ বাস্তবে তাই হচ্ছে। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা দারুল খিলাফত মদিনাতে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জেঁকে বসেছে। এমনকি তারা খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করেছে। এসব অপতৎপরতা বন্ধ করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার একটি বর্ণনা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নীতি ও অবস্থানের উপর এভাবে আলোকপাত করেছে–

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, "[হযরত আলী (রা.)-এর সাথে মতবিরোধ চলাকালে] হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী (রা.) একটি জামাত নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, কোন যুক্তিতে তুমি হযরত আলী (রা.)-এর মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছ? নিজেকে কি তাঁর সমতুল্য মনে কর? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি ভালো করেই জানি যে, খিলাফতের জন্য তিনিই অধিকতর যোগ্য; কিন্তু হযরত উসমান (রা.) মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছেন এটা কি সত্য নয়? তাঁর চাচাতো ভাই হিসেবে আমি তাঁর কিসাস দাবি করার অধিকারী নই এবং এক্ষেত্রে আমার অধিকারই সর্বাধিক নয়?

হযরত আলী (রা.)-কে তোমরা আমার এ প্রস্তাব পৌঁছে দিও যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার করুন; খিলাফত আমি আপনার হাতে অর্পণ করব; কিন্তু হযরত আলী (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রতিকূলে হওয়ার কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিক বিচার অনুষ্ঠানে সম্মত হলেন না। ফলে সিরিয়ার অধিবাসীরা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।"

উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ কিংবা ক্ষমতার মোহ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে দ্বন্দ্বের কারণ নয়; বরং নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও খিলাফতের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। তাই আমরা মনে করি হযরত মুয়াবিয়ার প্রতি হিদায়ার লেখকের উল্লিখিত এ বিশেষণ তাঁর প্রতি একটি অযথা উক্তি।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মোটেও উক্ত বিশেষণের যোগ্য ছিলেন না। উক্ত বিষয়টিকে এভাবেও বিশ্লেষণ করা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর চতুর্থ খলিফা হওয়া শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো অনিবার্য বিষয় ছিল না। এটা ছিল ইজতিহাদী বিষয়। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরোধিতা [যদি খিলাফত সংক্রান্ত বিরোধিতাও হয়] বেশি থেকে বেশি একে ইজতিহাদী ভুল বলা হবে। ইজতিহাদী ভুল শরিয়তের দৃষ্টিতে কেবল ক্ষমার যোগ্যই নয়; বরং ভুল করা অবস্থায়ও মুজতাহিদ একটি পুণ্য লাভ করে। সুতরাং শরিয়ত যে ভুলকে ক্ষমা করেছে এবং যে ভুলের উপর একটি পুণ্য দিয়েছে সেই কারণে একজনকে স্বেচ্ছাচারী-অত্যাচারী বলা নেহায়েত অনুচিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যদিও মক্কা বিজয়ের পরের মুসলমান; কিন্তু ইসলামপূর্ব অবস্থায় তাঁর থেকে তাঁর পিতামাতার মতো ইসলাম-বিদ্বেষ কখনো দেখা যায়নি। তাই অনেকে মনে করেন তিনি মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসায় যে বর্ণনাটি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ আমির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন তার অর্থ মোটামুটি এরূপ– রাসূল ﷺ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে সরল পথের দিশারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত করুন এবং তার মাধ্যমে অন্যদের পথ প্রদর্শন করুন।' আবূ ইদরীস খাওলানী বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন হিমস থেকে আমীরা ইবনে সা'দকে বরখাস্ত করে সে স্থানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর নিয়োগে অনেকে সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনার জবাবে হযরত আমীরা (রা.) বলেন, তোমরা মুয়াবিয়ার ভালো দিক নিয়ে আলোচনা কর। কারণ রাসূল ﷺ তাঁকে পথপ্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত বলেছেন। কেউ একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সামনে তার সমালোচনা করলে এর জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ "তাঁর সমালোচনা করো না। কারণ তিনি রাসূল ﷺ -এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁর সাহাবী।" ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূল ﷺ যে জামাআ'তকে বেহেশতী বলে সাব্যস্ত করেছেন, মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন সেই জামাতের একজন উদ্যোক্তা এবং সেই সাথে একজন অংশগ্রহণকারী। তিনি ছিলেন, রাসূল ﷺ -এর অতি বিশ্বস্ত ওহী লেখক। এত কিছুর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সমালোচনার বানে বিদ্ধ করা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তার সমসাময়িক যুগের সাহাবা ও তাবেয়ীন যখন তাঁর সমালোচনার ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ককারী তাহলে হিদায়ার লেখকের জন্য কি করে তাঁর সমালোচনাতে নিজেকে যুক্ত করা সঠিক হতে পারে! কি করে তাঁর জন্য শোভন হবে যে, তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে স্বেচ্ছাচারী শাসক বলবেন। সম্ভবত এটা তাঁর অসাবধানতার কারণেই ঘটেছে। আল্লাহ তাঁকে এবং আমাদের ক্ষমা করুন!

قَالَ : وَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْوَانِ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَهُوَ الْخَرَائِطُ الَّتِيْ فِيْهَا السِّجِلَّاتُ وَغَيْرُهَا لِأَنَّهَا وُضِعَتْ فِيْهَا لِتَكُوْنَ حُجَّةً عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَتُجْعَلُ فِيْ يَدِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْبَيَاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْخُصُوْمِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُمْ وَضَعُوْهَا فِيْ يَدِهِ لِعَمَلِهِ، وَقَدِ انْتَقَلَ إِلَى الْمُوَلّٰى، وَكَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْقَاضِيْ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ اِتَّخَذَهُ تَدَيُّنًا لَا تَمَوُّلًا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তিকে বিচার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তিনি [দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমে] তার পূর্ববর্তী বিচারকের নথিপত্র বুঝে নেবেন। দিওয়ান বলা হয় চামড়া ইত্যাদির থলে, যার ভিতর রেকর্ড বই, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি থাকে। এসব ফাইল ও নথিপত্র [তৎকালে] চামড়ার থলের ভিতর রাখা হতো, যাতে প্রয়োজনের সময় দলিলের কাজে আসে। সুতরাং সেগুলো তার হাতেই অর্পণ করা হবে যার কাছে রয়েছে বিচারের দায়িত্ব। আর [অলিখিত] সাদা কাগজ যদি বায়তুল মালের [রাষ্ট্রীয় কোষাগারের] হয় তাহলে তা [নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে অর্পিত হওয়া] তো স্পষ্টই। তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যদি তা বাদী ও বিবাদীর হয়। কেননা তারা কাগজগুলো তার হাতে তার দায়িত্বের জন্যই প্রদান করেছিল, আর কাগজ ও দায়িত্ব নতুন বিচারকের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। একই হুকুম হবে যদি কাগজগুলো পূর্ববর্তী বিচারকের নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত হয়ে থাকে, এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা পদচ্যুত বিচারক কাগজগুলো [কাজ করার উদ্দেশ্যে] আমানতরূপে রেখেছিলেন; সেগুলোকে সম্পদরূপে তিনি রাখেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ يَسْأَلُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে নতুন করে বিচারক নিয়োগ করা এবং পূর্ববর্তী [বরখাস্তকৃত/ অবসরপ্রাপ্ত] বিচারক থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়া সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিচারক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার দায়িত্ব শাসকের হাতে ন্যস্ত। শাসক কোনো সন্দেহ অথবা অভিযোগের কারণে নিযুক্ত বিচারককে যেমন পদচ্যুত করতে পারেন তদ্রূপ কোনো অভিযোগ ছাড়াই তা করতে পারেন। শাসক পদচ্যুত করার পর যখন বিচারকের কাছে উক্ত সংবাদ পৌঁছবে তখন থেকে তার পদচ্যুত হওয়ার নির্দেশ কার্যকর হবে। পদচ্যুত হওয়ার পর সংবাদ পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী বিচারক তার কাজ করে যাবেন। কারণ বিচারকের দায়িত্বের সাথে জনগণের হক জড়িত রয়েছে। বিচারকের সাথে তার সহকারী / সচিবও পদচ্যুত হবে। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, শুধুমাত্র বিচারক পদচ্যুত হবে, তার সহকারী পদচ্যুত হবে না।

বিচারক যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে তাহলে শাসক তা জানার আগ পর্যন্ত তার পদত্যাগ কার্যকর হবে না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে তা কার্যকর হবে না। কারণ তার দায়িত্বের সাথে জনগণের স্বার্থ জড়িত, তাই সে ইচ্ছা করলেই পদত্যাগ করতে পারবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন বিচারককে অনূর্ধ্ব এক বছর পর্যন্ত দায়িত্বে রাখবে, তারপর তাকে বরখাস্ত করে বলবে, আমরা আপনাকে একবছর ব্যস্ত রেখেছি আপনি জ্ঞানচর্চার সুযোগ পাননি। সুতরাং আপনি জ্ঞানচর্চা করুন, পরবর্তী সময় আপনার সেবা আমরা পুনরায় গ্রহণ করব। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী বিচারক বরখাস্ত করার পর যাকে নতুন বিচারক নিয়োগ করা হলো তার সর্বপ্রথম কাজ হবে সে তার পূর্বসূরি [বরখাস্তকৃত বিচারক] -এর কাছে যেসব বাক্স ও থলে রয়েছে তা বুঝে নেবে, যাতে সরকারি ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট রেকর্ড বই ও ফাইল জমা আছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَرَائِطُ الَّتِيْ فِيْهَا الخ : ইবারতে বর্ণিত دِيْوَانٌ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেন, ديوان হলো চামড়ার থলে, যার মধ্যে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো জিনিস রেখে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। লেখকের ব্যাখ্যাটি এ স্থলে যদিও খাস [অর্থাৎ চামড়ার থলে]; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, অর্থাৎ এমন সব জিনিস, যার মধ্যে নথিপত্র, দরকারি কাগজপত্র, রেকর্ড বই ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়। সেমতে বর্তমান যুগের কম্পিউটার ইত্যাদিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। মোটকথা, পূর্বতন বিচারকের কাছে যেসব রেজিস্ট্রার, দরকারি নথিপত্র এবং ফাইল রয়েছে চাই সেটা মামলা-মকদ্দমা সংক্রান্ত হোক কিংবা উত্তরাধিকারী সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা সংক্রান্ত হোক অথবা ওয়াকফ সংক্রান্ত হোক সবই নব নিযুক্ত বিচারক বুঝে নেবেন। কেননা উক্ত ফাইল ও নথিপত্র নব নিযুক্ত বিচারকের ভবিষ্যতে দরকার পড়বে। তাছাড়া বরখাস্তকৃত বিচারক যেহেতু এখন সাধারণ জনগণের পর্যায়ে চলে এসেছে তাই তার কাছে বিচার বিভাগীয় এসব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র না থাকাই সমীচীন। পক্ষান্তরে নতুন বিচারকের সাথে জনগণের বিচার সংক্রান্ত হক জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে নথিপত্রগুলো তার কাছে থাকাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْبَيَاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যেসব কাগজ ও নথিপত্র পূর্ববর্তী বিচারকের কাছে ছিল সেগুলোতো তার মালিকানাধীন জিনিস। সুতরাং নব নিযুক্ত বিচারকের কাছে কেন অর্পণ করা হবে?

উত্তর : প্রশ্নের উত্তরে হিদায়ার লেখক বলেন, পূর্ববর্তী বিচারকের কাছে যেসব নথিপত্র আছে তা তিনভাবে আসতে পারে– ১. নথিপত্রগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত। ২. নথিপত্রগুলো বাদী-বিবাদীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। ৩. বিচারক নিজের গাঁটের পয়সায় সেগুলো খরিদ করেছে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ নথিপত্র যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত হয় তাহলে সেগুলো প্রদান করতে বাধ্য করার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ সরকারিভাবে যে বিচারক নিযুক্ত হবে তার কাছেই নথিপত্র থাকবে। যেহেতু পূর্ববর্তী বিচারক বরখাস্ত হয়েছেন তাই তিনি এসব কাগজপত্র রাখার অধিকার হারিয়েছেন। এখন যিনি তার স্থলে এসেছেন তিনিই উক্ত কাগজপত্র রাখার অধিকার লাভ করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থাতে [নথিপত্র যদি বাদী-বিবাদীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়] পূর্ববর্তী বিচারককে তার কাছে রক্ষিত কাগজপত্র প্রদানে বাধ্য করা হবে। কারণ বাদী-বিবাদী পূর্ববর্তী বিচারককে সরকারিভাবে নিযুক্ত বিচারক হওয়ার কারণেই ঐসব কাগজপত্র দিয়েছিল। অর্থাৎ কাগজপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার/ খলিফা কর্তৃক নিযুক্তিই কাজ করেছে, অন্য কিছু নয়। বর্তমানে যেহেতু সরকারের নিয়োগ পাল্টে গেছে এবং সরকার কর্তৃক নতুন বিচারক নিযুক্ত হয়েছে তাই কাগজপত্রও স্থানান্তরিত হয়ে নতুন বিচারকের দায়িত্বে চলে আসবে এবং পূর্ববর্তী বিচারকের কাছে কোনো কাগজপত্র থাকবে না। আর তৃতীয় অবস্থাতে তথা যদি উক্ত কাগজপত্র বরখাস্তকৃত বিচারপতি নিজের টাকায় খরিদ করে থাকে তাহলেও উক্ত কাগজ ও নথিপত্র নবনিযুক্ত বিচারকের কাছে সোপর্দ করা হবে। হিদায়ার লেখক বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে নব নিযুক্ত বিচারকের কাছে বরখাস্তকৃত বিচারকের নিজ কেনা নথিপত্র প্রদান করতে বাধ্য করা হবে। কারণ পূর্ববর্তী বিচারক তার কাছে উক্ত কাগজপত্র আমানতরূপে এজন্যই রেখেছিল যে, এতে সাধারণ জনগণের জরুরি ও মামলা-মকদ্দমার বিষয়গুলো লিখে রাখা হবে। নথিপত্রগুলো সঞ্চয় করা কিংবা সম্পদরূপে সেগুলো সংরক্ষণ তার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং যেহেতু নথিপত্র ও কাগজগুলো তার কাছে আমানতরূপে ছিল, মালিকানাধীন সম্পদরূপে ছিল না তাই পূর্ববর্তী বিচারক তা নিজের কাছে রাখবেন না; বরং তা যে-ই বিচারকরূপে তার পদ গ্রহণ করবেন তার হাতে উক্ত কাগজপত্র অর্পণ করবেন। লেখক বলেন, এটাই বিশুদ্ধ মত– একথার দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, কতিপয় আলেমের এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্য হচ্ছে, সব কাগজপত্র যদি বাদী-বিবাদীর মাধ্যমে অর্জিত হয়/ বিচারক নিজে তা খরিদ করে থাকে তাহলে তা সমর্পণে পূর্ববর্তী বিচারককে বাধ্য করা হবে না। কেননা যদি কাগজপত্রগুলো বাদী-বিবাদীরা কিনে তাকে দিয়ে থাকে তাহলে তা হেবা দানের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিচারক কাগজগুলোর মালিক হয়ে গেল। তদ্রূপ যদি বিচারক নিজে ক্রয় করে থাকে তাহলে তো সেই এগুলোর স্বত্বাধিকারী। মোটকথা, উভয় অবস্থায় বিচারক নথিপত্রগুলোর স্বত্বাধিকারী। আর নিয়ম হলো কোনো ব্যক্তিকে তার আপন সম্পদ হস্তান্তরে বাধ্য করা যায় না। আর এজন্যই উপরিউক্ত দু অবস্থায় পদচ্যুত বিচারককে তার কাছে রক্ষিত কাগজপত্র স্থানান্তরে বাধ্য করা হবে না। সুতরাং এ দু অবস্থায় নবনিযুক্ত বিচারক পূর্ববর্তী বিচারকের নথিপত্র পাওয়া নিশ্চিত নয়। তবে কতিপয় আলেমের উক্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়; বরং প্রথমে উল্লিখিত মাসআলাই হলো গ্রহণযোগ্য মত।

وَيَبْعَثُ أَمِينَيْنِ لِيَقْبِضَاهَا بِحَضْرَةِ الْمَعْزُولِ وَأَمِينِهِ، وَيَسْأَلَانِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَجْعَلَانِ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا فِي خَرِيطَةٍ كَيْلَا يَشْتَبِهَ عَلَى الْمُوَلّٰى، وَهٰذَا السُّؤَالُ لِكَشْفِ الْحَالِ لَا لِلْإِلْزَامِ. قَالَ: وَيَنْظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ، لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا فَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُلْزِمٌ وَمَنْ أَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمَعْزُولِ عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهُ بِالْعَزْلِ الْتَحَقَ بِالرَّعَايَا، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَخْلِيَتِهِ، حَتّٰى يُنَادِيَ عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِهِ، لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ حَقٌّ ظَاهِرًا فَلَا يُعَجِّلُ كَيْلَا يُؤَدِّيَ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ.

অনুবাদ : সে [দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন বিচারক] দুজন বিশ্বস্ত লোককে কাগজগুলো পদচ্যুত বিচারকের অথবা তার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে বুঝে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে। এরা দুজন এক এক করে সব জিজ্ঞাসা করে নেবে এবং প্রত্যেক প্রকারের নথিপত্র সংশ্লিষ্ট ফাইলের মধ্যে রাখবে যাতে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকের কাছে সেগুলো এলোমেলো না হয়ে যায়। আর এ জিজ্ঞাসাবাদ সামগ্রিক অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার জন্য; অভিযুক্ত করার জন্য নয়। ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, আর নবনিযুক্ত বিচারক কারাবন্দীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কারণ তাকে তাদের পরিদর্শকরূপেও নিয়োগ করা হয়েছে। যদি কোনো কয়েদি কারো হকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তাকে সেই হকের ব্যাপারে দায়ী করবে। কেননা স্বীকারোক্তি স্বীকারকারী ব্যক্তির উপর আবশ্যক হয়ে যায়। আর যে অস্বীকার করবে তার বিরুদ্ধে পদচ্যুত বিচারকের উক্তি দলিল ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা পদচ্যুত হওয়ার দ্বারা তিনি সাধারণ জনগণের কাতারে চলে এসেছেন। আর এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দলিল নয়। বিশেষভাবে যখন সেটা নিজের কাজের ব্যাপারে হয়। যদি তার বিপক্ষে দলিল [সাক্ষী] দাঁড় করানো না যায় তাহলে নবনিযুক্ত বিচারক তাকে খালাস করে দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন না যে পর্যন্ত না তার ব্যাপারে সাধারণ ঘোষণা দেবেন এবং তাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কেননা [পূর্ববর্তী] পদচ্যুত বিচারকের কাজ [ফয়সালা] বাহ্যত সঠিক; সুতরাং অপরাধী খালাস করার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, যাতে এ দ্রুততা অন্যের হক বাতিল করার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَبْعَثُ أَمِينَيْنِ الخ : লেখক বলেন, নবনিযুক্ত বিচারকের নথিপত্র বুঝে নেওয়ার পদ্ধতি এই যে, নবনিযুক্ত বিচারক তার দুজন বিশ্বস্ত লোককে পদচ্যুত বিচারকের কাছে পাঠাবে। তারা দুজন পদচ্যুত বিচারক বা তার বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে সব নথিপত্র ও ফাইল এক এক করে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেবে, তারা প্রত্যেক প্রকারের কাগজ ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে পৃথকভাবে সাজিয়ে রাখবে। যেমন– ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র একটি ফাইলে, দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র আরেক ফাইলে, উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টন সংশ্লিষ্ট কাগজ ভিন্ন ফাইলে, ওয়াকফ সংক্রান্ত নথি ভিন্ন ফাইলে রাখবে। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে বিন্যস্ত করে রাখবে, যাতে নবনিযুক্ত বিচারক পূর্ববর্তী কাগজপত্র এলোমেলো অবস্থায় না পায়। এলোমেলো অবস্থাতে থাকলে নবনিযুক্ত বিচারকের কাজ করতে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকের লোকজন যখন বরখাস্তকৃত বিচারক থেকে কাগজপত্র বুঝে নেবে তখন প্রত্যেক ফাইলে সিলমোহর লাগিয়ে দেবে।

লেখক বলেন, নবনিযুক্ত বিচারকের বিশ্বস্ত লোকদ্বয় নথিপত্র বুঝে নেওয়ার সময় যেসব জিজ্ঞাসাবাদ করবে সেগুলো নিছক বুঝে নেওয়ার সুবিধার্থে। তাদের এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ পূর্ববর্তী বিচারকের উপর অভিযোগ দায়েরের উদ্দেশ্যে মোটেও নয়। উল্লেখ্য যে, নবনিযুক্ত বিচারক দুজন বিশ্বস্ত লোক না পাঠিয়ে যদি একজনকে পাঠায় তাহলেও কাজ চলবে। তবে দুজন পাঠানো অধিকতর সর্তকতার উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَنْظُرُ فِىْ حَالِ الْمَحْبُوْسِيْنَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে নবনিযুক্ত বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, নবনিযুক্ত বিচারক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম জেল ও হাজতখানার খোঁজখবর নেবেন। তিনি প্রথমেই নিজে অথবা লোক মারফত কয়েদিদের সংখ্যা, তাদের অবস্থা এবং কি অপরাধে তারা জেলখানায় এসেছে তা জেনে নেবেন। এর দলিল হলো, বিচারকের নিযুক্তি মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা দেখাশুনা করার জন্য। এ কয়েদিরা মুসলমান। অতএব তাদের জেলখানায় আসার কারণ বিচারকের কাছে অবহিত হতে হবে। প্রথম বিচারকের জানা থাকা যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বিচারক যে দলিলের ভিত্তিতে কয়েদিকে জেলখানায় ঢুকিয়েছিল এবং সাজা দিয়েছেন নবনিযুক্ত বিচারক সেই দলিলের ভরসা করে বসে থাকবে না, কারণ পূর্ববর্তী বিচারকের সিদ্ধান্ত এখন আর ধর্তব্য নয়। কেননা তিনি এখন সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়েছেন।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক আসামিদের অবস্থা এভাবে যাচাই করবেন যে, আসামি ও তার বাদী উভয়কে মুখোমুখি করবেন। তারপর কোনো আসামি যদি তার তাদের অপরাধ সম্পর্কে স্বীকার করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার উপর বাদীর হক আরোপ করা হবে। এরপর বাদী যদি চায় আসামিকে আটকে রাখতে তাহলে বাদীর দাবি অনুযায়ী নবনিযুক্ত বিচারক আসামিকে পুনরায় জেলখানায় প্রেরণ করবেন। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে স্বীকারোক্তি এমন দলিল, যার মাধ্যমে স্বীকার করা বিষয়টি স্বীকারকারী ব্যক্তির উপর আবশ্যক হয়ে যায়। স্বীকার করার পর বাদী যেহেতু তার হকের দাবিতে আসামিকে আটকে রাখতে চাচ্ছে তাই আসামিকে আটক রাখা হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ الخ : পক্ষান্তরে আসামি যদি নতুন বিচারক ও বাদীর সামনে বাদীর সেই দাবিকে অস্বীকার করে যার কারণে সে জেলে বন্দী রয়েছে, তবে এমতাবস্থায় যদি পূর্ববর্তী বিচারক কয়েদির জেলে থাকার কারণ বর্ণনা করেন তাহলে পূর্ববর্তী বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ বরখাস্তকৃত বিচারক বর্তমানে সাধারণ জনগণের মতো একজন মানুষ মাত্র। সুতরাং বিচারের ক্ষেত্রে তার কথা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করবে না। কারণ একজনের সাক্ষ্য কোনো বিষয় প্রমাণ বা রহিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিচারকের সাক্ষ্য তারই কাজের স্বপক্ষে হচ্ছে, তাই তার কথা ও সাক্ষ্য তো গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং পদচ্যুত বিচারকের এ উক্তি যে, "আমি এ কয়েদিকে বন্দী করেছি এবং আমার বন্দী করা যথার্থ" দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। একই মত পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, পদচ্যুত বিচারকের মতামত পদচ্যুত হওয়ার আগের মতোই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ পদচ্যুত বিচারক শরিয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত। যদি এ রকম হয় যে, পূর্ববর্তী বিচারক দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত করেছিল এবং নতুন বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয় তাহলে অভিযোগের দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে নতুন বিচারক অভিযুক্ত কয়েদিকে পুনরায় জেলে প্রেরণ করবেন। যদি নতুন বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে অবগত না হয় তাহলে তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করে সে রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। অনুসন্ধানের পর যদি সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হয় তাহলেও দলিল তথা সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে আসামিকে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দেবেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَمْ تَقُمْ لَمْ يُعَجِّلْ الخ : পক্ষান্তরে যদি কয়েদি আসামির বিপক্ষে অভিযোগ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ না করা যায় অথবা বাদী যদি বিচারকের সামনে উপস্থিত না হয় কিংবা আসামি যদি বলে, আমার বিপক্ষে মূলত কোনো বাদী নেই; বরং আমাকে অন্যায় ও ষড়যন্ত্র করে আটক করা হয়েছে তাহলে নবনিযুক্ত বিচারক তার এতটুকু কথা শুনেই তাকে খালাস করে দেবেন না; বরং তার ব্যাপারে মূলত অভিযোগ আছে কিনা? তা যাচাই করতে সময় ও উদ্যোগ নেবেন, যেমন জনগণের মাঝে উক্ত কয়েদির ব্যাপারে ঘোষণা করাবেন যে, অমুকের ছেলে অমুক জেলে বন্দী আছে, যদি কেউ তার কাছে কোনো হক পেয়ে থাকেন / যদি কারো তার ব্যাপারে অভিযোগ থাকে তিনি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করুন! এ ঘোষণার পর যদি কোনো বাদী উপস্থিত হয়ে তার হক প্রাপ্তির কথা বলে তাহলে সে হিসেবে বিচারক ব্যবস্থা নেবেন। অন্যথায় বিচারক এভাবে কয়েকদিন ঘোষণা করাতে থাকবেন। ইতোমধ্যে যদি কেউ উপস্থিত না হয় তাহলে বিচারক উক্ত বন্দীকে জামিন দান করে বেকসুর খালাস করে দেবেন। এর কারণ সম্পর্কে যা বলা হয় তা হচ্ছে– একজন লোককে তো এমনিতে বন্দী করা হয় না। অবশ্যই কোনো না কোনো হেতু এর রয়েছে, যা হয়তো বা এখন স্পষ্ট নয়, তাই এভাবে ইশতিহার করার দ্বারা প্রকৃত হেতু বের হয়ে আসবে। এর কারণ সম্পর্কে লেখকের উক্তি হলো পদচ্যুত বিচারকের কাজ তথা উক্ত বন্দীকে গ্রেফতার করে রাখা বাহ্যত সঠিক মনে হয়। তাই বন্দী খালাস করার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা যদি খালাস করার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে তা হবে বাদীর হক বাতিল করার একটি চেষ্টা। আর কারো হক বাতিল করার চেষ্টা শরিয়ত সমর্থন করে না।

وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوْفِ فَيَعْمَلُ فِيْهِ عَلَى مَا تَقُوْمُ بِهِ الْبَيِّنَةُ اَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ مَنْ هُوَ فِيْ يَدِهٖ، لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ حُجَّةٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَعْزُوْلِ لِمَا بَيَّنَّاهُ، اِلَّا اَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِيْ هِيَ فِيْ يَدِهٖ اَنَّ الْمَعْزُوْلَ سَلَّمَهَا اِلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيْهَا، لِاَنَّهُ ثَبَتَ بِاِقْرَارِهٖ اَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْقَاضِيْ، فَيَصِحُّ اِقْرَارُ الْقَاضِيْ، كَاَنَّهُ فِيْ يَدِهٖ فِي الْحَالِ، اِلَّا اِذَا ابْدَأَ بِالْاِقْرَارِ لِغَيْرِهٖ، ثُمَّ اَقَرَّ بِتَسْلِيْمِ الْقَاضِيْ فَيُسَلِّمُ مَا فِيْ يَدِهٖ اِلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْاَوَّلِ لِسَبْقِ حَقِّهٖ، وَيَضْمَنُ قِيْمَتَهُ لِلْقَاضِيْ بِاِقْرَارِهِ الثَّانِيْ، وَيُسَلَّمُ اِلَى الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِيْ -

অনুবাদ : আর নবনিযুক্ত বিচারক আমানতসমূহ ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয়-ব্যয় এর প্রতি লক্ষ্য করবেন, এক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী কিংবা দখলদারের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কেননা এর [সাক্ষী ও স্বীকারোক্তি] প্রত্যেকটিই [শরিয়ত স্বীকৃত] দলিল। তবে বরখাস্তকৃত বিচারকের কথা আমাদের বর্ণিত কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না; কিন্তু যদি যার হাতে আমানত রয়েছে সে স্বীকারোক্তি করে যে, পদচ্যুত বিচারক তার কাছে এগুলো অর্পণ করেছে তাহলে তার [বিচারকের] কথা গ্রহণ করে নেওয়া হবে। কেননা দখলদারের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমানতের মূল দখল বিচারকের ছিল। ফলে [এক্ষেত্রে] বিচারকের স্বীকারোক্তি সঠিক বিবেচিত হবে। [ব্যাপারটি এমন হবে যে,] যেন বর্তমানেও আমানতের মাল তার দখলে রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দখলদার প্রথমে [বিচারক ব্যতীত] অন্যের পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তারপর বিচারকের অর্পণের স্বীকারোক্তি দেয়। [এমতাবস্থায় বিচারকের অনুকূলে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং] স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর হাতে যা আছে তা প্রথম যার জন্য স্বীকারোক্তি করেছে তাকে প্রদান করা হবে। কেননা তার হক [প্রথম উল্লেখের কারণে] অগ্রবর্তী। অতঃপর তার দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির কারণে উক্ত বস্তুর বাজারমূল্য [বা সদৃশ বস্তু] বিচারককে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করবে আর বিচারকের পক্ষ থেকে যার জন্য স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তাকে সেই মাল হস্তান্তর করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে নবনিযুক্ত বিচারকের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, নবনিযুক্ত বিচারক প্রথমে কারাগারের খোঁজখবর নিয়ে কয়েদি-আসামিদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবেন। তারপর [এ ইবারতে] বলা হয়েছে নবনিযুক্ত বিচারক আমানতের মালামালের খোঁজখবর নেবেন অর্থাৎ পূর্ববর্তী [পদচ্যুত] বিচারক আমানতের মাল কাদের কাছে রেখেছেন এবং সেগুলো যথাযথভাবে আছে কিনা? তদ্রূপ ওয়াকফ সম্পত্তি কোথায় ও কিভাবে আছে এবং সেগুলোর আয়-ব্যয় কিভাবে হচ্ছে, সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে কিনা? তাও দেখবেন। তৎকালে বিচারকগণ বিভিন্ন আমানতের মাল তার দৃষ্টিতে যারা বিশ্বস্ত তাদের কাছে রেখে দিতেন। তদ্রূপ ওয়াকফ সম্পত্তিও বিভিন্ন বিশ্বস্ত লোকের হাতে ছেড়ে দিতেন।

قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقُوْمُ بِهِ الْبَيِّنَةُ الخ : আলোচ্য মাসআলায় বিচারক পরিবর্তনের পর নতুন বিচারক তার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খোঁজ নিয়ে জানবেন কাদের কাছে তার পূর্বসূরি আমানত ও ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলো রেখেছেন, কাদের কাছে সেগুলো তা প্রমাণ করার সুরত দুটো–

১. সাক্ষীদাতাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে জেনে নেবেন।

২. যাদের কাছে সেসব রয়েছে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেবেন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নতুন বিচারকের সামনে দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, আব্দুর রহীমের কাছে যে আমানতের মালামাল রয়েছে তা খালিদের। বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা

প্রমাণিত হওয়ার পর নবনিযুক্ত বিচারক আমানতের পাওনাদার খালিদকে তার আমানতের মাল ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু পাওনাদারের সম্মতিক্রমে মাল আমানতদারের কাছে রেখে দিতে পারেন, অথবা আমানতদার আব্দুর রহীমের স্বীকারোক্তি দ্বারাও তা হতে পারে। যেমন– আব্দুর রহীম বলল, খালিদের দশ হাজার টাকা আমার কাছে আমানতরূপে রয়েছে। উক্ত স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নবনিযুক্ত বিচারক তার করণীয় সাব্যস্ত করবেন। এখন প্রশ্ন হলো, নবনিযুক্ত বিচারক স্বীকারোক্তি / সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেবেন এর ভিত্তি কতটুকু? এর উত্তর খুবই সহজ। আর তা হলো দখলদারের স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য এর প্রত্যেকটি শরিয়তের দলিল এবং এগুলো শরিয়তের দালিল হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম দ্বিধার অবকাশ নেই। আর তাই নবনিযুক্ত বিচারক এ দুটি দলিলের মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَعْزُوْلِ لِمَا بَيَّنَّاهُ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিচারকের কোনো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, অর্থাৎ যদি পূর্ববর্তী বিচারকের সাথে দখলদারের স্বীকারোক্তি সাংঘর্ষিক হয়ে যায় যেমন– পূর্ববর্তী বিচারক বলল, আব্দুর রহীমের কাছে যে মাল রয়েছে সেগুলো খালিদের, আর রহীম বলল না, এমতাবস্থায় পদচ্যুত বিচারকের কথা আব্দুর রহীমের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। লেখক বলেন, পদচ্যুত বিচারকের কথা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না তা আমরা পিছনে বলে এসেছি। আর তা হলো- পদচ্যুত হওয়ার কারণে বিচারক এখন সাধারণ নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। তার একজনের কথার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। যেমন সাধারণ একজন নাগরিকের কথায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না, তবে পূর্ব বিচারক যদি তার কথার স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত বিচারক, তার একজনের কথায় যে কারো উপর কোনো বিষয় আরোপ করা যাবে। এমনকি যদি স্বয়ং শাসক যিনি বিচারক নিয়োগ করেছেন, তার মতের বিপরীতে বিচারক বলেন, অমুক ব্যাপারে সাক্ষীরা এরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন এর বিপরীতে বাদশাহ [শাসক]-এর কথার সিদ্ধান্ত দিবেন না। যদি না শাসকের সাথে অপর ব্যক্তি সাক্ষ্য না দেয়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِىْ هِىَ فِىْ يَدِهِ الخ : লেখক বলেন, তবে যদি আমানতদার স্বীকারোক্তি দেয় যে, আমানতের মাল বিচারক তার কাছে অর্পণ করেছিল; কিন্তু সে জানে না কার মাল বিচারক তাকে দিয়েছিল। অথবা দখলদার [আমানতদার] এরূপ বলে যে, বিচারক আমার কাছে এ মাল অর্পণ করেছেন এবং এটা অমুকের মাল। বিচারকের মতামতও একই ব্যক্তির অনুকূলে। উপরিউক্ত দু অবস্থায় পদচ্যুত বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ দু অবস্থাতেই আমানতদারের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, মালের মূল দখল পদচ্যুত বিচারকের হাতে ছিল, পরে সেটা হাতবদল হয়েছে। যেহেতু মূল দখলদার পূর্ববর্তী বিচারক ছিলেন তাই যেন উক্ত আমানত বর্তমানেও পূর্ববর্তী বিচারকের হাতেই রয়েছে। আমানতের ব্যাপারে আমানতদারের কথাই গ্রহণযোগ্য ও সর্বশেষ কথা। তাই উল্লিখিত দুই অবস্থাতে পদচ্যুত বিচারকের কথা [আমানতদার] হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন সরাসরি তার হাতে আমানত থাকলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হতো।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا اَبْدَأَ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ الخ : লেখকের এ বাক্যটি فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيْهَا থেকে إِسْتِثْنَاء হয়েছে, অর্থাৎ পদচ্যুত বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না যদি বর্তমান দখলদার প্রথমেই ভিন্ন ব্যক্তির জন্য স্বীকারোক্তি করে। যেমন সে বলল, আমার কাছে এ রক্ষিত মাল আমরের আমানত। কিন্তু পরক্ষণে বলে যে, এ মাল পদচ্যুত বিচারক আমাকে দিয়েছিল। অপর পক্ষে পদচ্যুত বিচারক সেই মাল আমর ব্যতীত অন্য কারো অনুকূলে স্বীকারোক্তি করে। এ অবস্থায় মাসআলার বিধান এই হবে যে, আমানতের দখলদারকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন সে আমানতটি আমরকে প্রদান করে, যার জন্য সে প্রথমে স্বীকারোক্তি করেছিল। কেননা তার জন্য প্রথমে স্বীকারোক্তি করার দ্বারা তার হক অগ্রগণ্য ও অবধারিত হয়ে গেছে। তবে পরে [দ্বিতীয় পর্যায়ে] সে যে পদচ্যুত বিচারকের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করেছিল– সেই স্বীকারোক্তি বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে বলা হবে, তোমার কাছে যে আমানতের মাল ছিল সেটা সদৃশ-নির্ভর বস্তু হলে তোমার কাছে রক্ষিত মালের সদৃশ মাল পদচ্যুত বিচারককে প্রদান কর, আর যদি সে মাল সদৃশ-নির্ভর না হয় তাহলে পূর্ব রক্ষিত মালের বাজার মূল্য বিচারককে প্রদান কর। পদচ্যুত বিচারক দখলদার থেকে মাল পাওয়ার পর সেটা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করবে যার জন্য স্বীকারোক্তি করেছিল। কারণ আমানতদারের দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, মালের দখলদার প্রথমে বিচারক ছিলেন, অতএব মালের মালিকানার প্রশ্নে বিচারকের উক্তি ধর্তব্য হবে।

قَالَ : وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوْسًا ظَاهِرًا فِى الْمَسْجِدِ، كَيْلَا يَشْتَبِهَ مَكَانُهُ عَلَى الْغُرَبَاءِ وَبَعْضِ الْمُقِيْمِيْنَ، وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ اَوْلٰى، لِاَنَّهُ اَشْهَرُ، وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) يَكْرَهُ الْجُلُوْسَ فِى الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ، لِاَنَّهُ يَحْضُرُهُ الْمُشْرِكُ وَهُوَ نَجَسٌ بِالنَّصِّ، وَالْحَائِضُ وَهِىَ مَمْنُوْعَةٌ عَنْ دُخُوْلِهِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْحُكْمِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُوْمَةَ فِىْ مُعْتَكَفِهٖ، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ لِفَصْلِ الْخُصُوْمَاتِ، وَلِاَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ فَيَجُوْزُ اِقَامَتُهَا فِى الْمَسْجِدِ كَالصَّلٰوةِ، وَنَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ فِىْ اِعْتِقَادِهٖ لَا فِىْ ظَاهِرِهٖ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُوْلِهٖ، وَالْحَائِضُ تُخْبِرُ بِحَالِهَا فَيَخْرُجُ الْقَاضِىْ اِلَيْهَا اَوْ اِلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ اَوْ يَبْعَثُ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَصْمِهَا، كَمَا اِذَا كَانَتِ الْخُصُوْمَةُ فِى الدَّابَّةِ، وَلَوْ جَلَسَ فِىْ دَارِهٖ لَا بَأْسَ بِهٖ، وَيَأْذَنُ لِلنَّاسِ بِالدُّخُوْلِ فِيْهَا، وَيَجْلِسُ مَعَهُ مَنْ كَانَ يَجْلِسُ قَبْلَ ذٰلِكَ لِاَنَّ فِىْ جُلُوْسِهٖ وَحْدَهُ تُهْمَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক বিচার পরিচালনার জন্য প্রকাশ্যে মসজিদে বসবেন। যাতে তার অবস্থান বহিরাগতদের কাছে এবং কোনো কোনো স্থানীয় লোকের কাছে অজ্ঞাত না থাকে। জামে মসজিদই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ তা হলো সর্বাধিক পরিচিত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিচারের উদ্দেশ্যে মসজিদে এজলাস বসানো মাকরূহ। কেননা বিচারের মধ্যে মুশরিক উপস্থিত হয়। আর মুশরিক নস দ্বারা প্রমাণিত নাপাক ব্যক্তি এবং ঋতুমতী নারীও উপস্থিত হয় অথচ তাদের মসজিদে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন, মসজিদ আল্লাহ তা'আলার জিকির ও বিচারকার্যের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, আর মহানবী ﷺ তাঁর ই'তিকাফ করার স্থানে বিচারের রায় প্রদান করতেন। তদ্রূপ খোলাফায়ে রাশেদীন বিচারের রায় প্রদানের উদ্দেশ্যে মসজিদে এজলাস করতেন। তাছাড়া বিচারকার্য একটি ইবাদত, সুতরাং তা নামাজের মতো মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়া বৈধ হবে বৈ কি! মুশরিকের [নাপাক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো] নাপাকী তো তার বিশ্বাসগত; তার বাহ্যিক অঙ্গে নয়। অতএব তার প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে না। ঋতুমতী নারী তার অবস্থা জানাবে, সেমতে বিচারক তার কাছে যাবেন অথবা মসজিদের দরজায় যাবেন কিংবা এমন লোক প্রেরণ করবেন, যে তার ও তার প্রতিপক্ষের মাঝে রায় প্রদান করবে। যেমন– কোনো প্রাণী সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে করা হয়। যদি বিচারক নিজ বাড়িতে [মসজিদ ছাড়া ভিন্নস্থানে] এজলাস বসান তাতেও অসুবিধা নেই। [এ ক্ষেত্রে] লোকদেরকে তার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবে। আর যারা বিচারক হওয়ার পূর্বে তার সাথে বসত তারা [বিচারের এজলাসে] তার সাথে বসবে। কেননা একাকী বসাতে অপবাদের সুযোগ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ يَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوْسًا الخ : এখনে লেখক বিচারকের এজলাস সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করেছেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বিচারক / বিচারকগণ যেখানে বসেন অর্থাৎ বিচারালয়কে প্রচলিত ভাষায় আদালত (عَدَالَتْ) বলা হয়। عَدَالَتْ শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণতা। শব্দটির সাথে বিচারালয়ের যোগসূত্র এভাবে যে, বিচারালয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয় বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারালয় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। যেহেতু লোকেরা বিচারালয়ে ন্যায়বিচার পেত তাই তারা এক সময় স্বয়ং বিচারালয়কেই আদালত বলে ডাকা শুরু করে, এরপর থেকে লোকেরা বিচারালয়কে আদালত বলতে থাকে। বর্তমান যুগে সর্বত্রই এমনকি পৃথিবীর সবদেশেই বিচারালয় ভিন্নস্থানে হয়ে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা অবশ্য মসজিদেই ছিল। মসজিদেই বিচার অনুষ্ঠিত হতো। কালক্রমে সেটা মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য যে, এককালে মসজিদই ছিল রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বর্তমানে মসজিদ নামাজ পড়ার স্থান মাত্র। মানুষ যখন থেকে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে তখন থেকে মসজিদ কেন্দ্রচ্যুত হতে থাকে। এটা মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক বিচার পরিচালনার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রকাশ্যভাবে বসবেন, এ ব্যাপারে হিদায়ার লেখক বলেন, মসজিদেই বিচারকের এজলাস বসা উচিত, যাতে তা সবার কাছেই পরিচিত স্থানরূপে গণ্য হয়। বিশেষভাবে মুসাফির ও ভিনদেশী লোকদের কাছে এবং স্থানীয় সর্বস্তরের জনগণের কাছে স্থানটি পরিচিত হয়। কেননা, মসজিদে স্থানীয়-অস্থানীয় সব ধরনের লোক যাতায়াত করে থাকে। লেখক বলেন, পরিচিত স্থান হওয়ার বিবেচনায় জামে মসজিদ [জুমার নামাজ যেখানে আদায় করা হয়] সবচেয়ে উত্তম। কারণ জামে মসজিদ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান, একে সবধরনের লোকেরা চেনে এবং সহজেই জামে মসজিদে সকলে যাতায়াত করতে পারে। স্মর্তব্য যে, জামে মসজিদ সর্বোত্তম স্থান বিবেচিত হবে যদি জামে মসজিদ শহর বা জনপদের মধ্যভাগে হয়। যদি শহরের একপ্রান্তে হয় তাহলে বিচারক এমন মসজিদ নির্বাচন করবেন, যা শহরের মাঝে অবস্থিত। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং পৃথিবীর কোনো কোনো মুসলিম দেশে অদ্যাবধি জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে পুরো শহর জুড়ে একটি বা দুটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং পুরো শহরের লোকেরা সেখানেই জুমার নামাজ আদায় করে। ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ার জন্য পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় নামাজ ঘর ও মসজিদ থাকে। ফিকহশাস্ত্রের সর্বোচ্চ কিতাবগুলোতেও এরূপ দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেমন পাড়ায়-পাড়ায় জামে মসজিদ তা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না এবং এরূপ হওয়া শরিয়তের দিকনির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জামে মসজিদে বিচার অনুষ্ঠান করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিচার অনুষ্ঠান মসজিদে করা মাকরূহ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি হলো, বিচারের উদ্দেশ্যে অনেক মুশরিক-কাফেরদের বিচারালয়ে যেতে হয়, মুশরিকরা নাপাক ও অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের মসজিদের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ অর্থ "নিশ্চয় মুশরিক সম্প্রদায় অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে গমন না করে।" তাছাড়া বাদী / বিবাদী হিসেবে ঋতুমতী নারীরা মসজিদে আসবে, অথচ তাদের মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন– إِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ অর্থাৎ "ঋতুমতী নারী ও জুনুবী ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ আমি বৈধ করিনি।"

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো– মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগি সম্পাদন করা। বিচার ব্যবস্থায় অনেক সময়ই বাদী/বিবাদী মিথ্যা শপথ করে থাকে। তদ্রূপ তাদের দাবি ও অভিযোগের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব মসজিদের মতো এমন মহান ও পবিত্র স্থানকে পাপের ক্ষেত্র না বানানোর উদ্দেশ্যে বিচারকের জন্য মসজিদ ব্যতীত অন্যস্থানে বিচারের এজলাস বসানো উচিত। মোটকথা, উপরিউক্ত দু-দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, মসজিদে বিচার অনুষ্ঠান করা মাকরূহ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্যদের দলিল হলো– إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِلذِّكْرِ وَالْحُكْمِ অর্থ "রাসূল ﷺ বলেছেন- মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও বিচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।" লেখকের দ্বিতীয় দলিল হলো–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْصِلُ الْخُصُوْمَاتِ فِيْ مُعْتَكَفِهِ -

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ মসজিদে অবস্থানকালে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।"

হাদীসদ্বয়ের উপর পর্যালোচনা : প্রথম হাদীসটির ব্যাপারে আল্লামা যায়লায়ী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে– قُلْتُ غَرِيْبٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَاَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ فِيْهِ الْحُكْمُ এ শব্দ সহকারে হাদীসটি গরীব। ইমাম মুসলিম (র.) হাদীসটি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসে اَلْحُكْمُ শব্দটি নেই। হাদীসটির ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে– لَمْ اَجِدْهُ هٰكَذَا এভাবে হাদীসটি আমি পাইনি। হাদীসটির উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুঈন সম্পর্কিত হাদীসে এরূপ অর্থ পাওয়া যায়, যা হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ، حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، وَاِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ، قَالَ : وَاَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

এ হাদীসের শেষাংশে রাসূল ﷺ বলেন, এ মসজিদে পেশাব ও নাপাক জাতীয় কিছু ফেলা সমীচীন নয়। মসজিদ তো আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। এ অর্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এরূপ হাদীস ইবনে মাজাহ শরীফেও বর্ণিত আছে। সেই হাদীসের শব্দগুলো হলো– فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيْهِ وَاِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِلصَّلٰوةِ

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী (র.) বলেন, এ বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যেমন–

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّهُ تَقَاضٰى اِبْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ، فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادٰى : يَا كَعْبُ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ.

হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে রাসূল ﷺ কা'ব ইবনে মালিক ও ইবনে আবী হাদরাদের মাঝে সৃষ্ট ঋণসংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা মসজিদে সম্পন্ন করেছিলেন।

এ বিষয়ের আরেকটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) فِيْ قِصَّةِ اللِّعَانِ اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلًا ... اِلٰى اَنْ قَالَ : فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ.

لِعَانٌ সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লি'য়ানের মাধ্যমে মসজিদে বিচারকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। এরূপ আরেকটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ

এক ব্যক্তিকে অপবাদের সাজারূপে মসজিদে আশিটি দোররা মারার ব্যবস্থা করেছিলেন। সারকথা হলো, রাসূল ﷺ মসজিদে অনেকগুলো বিচার সম্পন্ন করেছিলেন। আর হিদায়ার লেখকের كَانَ يَفْصِلُ الْخُصُوْمَاتِ فِيْ مُعْتَكَفِهِ ইবারত দ্বারা সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অতএব উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মসজিদে বিচার অনুষ্ঠান করা বৈধ।

রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে তাঁরা মসজিদে বিচার সম্পাদন করেছেন বলে হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, রাসূল ﷺ -এর পরে সাধারণভাবে যিনি খলিফা হতেন তিনি নিজে বিচার না করে বিচার বিভাগের দায়িত্ব অন্যের হাতে ছেড়ে দিতেন। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত ওমর (রা.), হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সুলায়মান ইবনে রাবীয়া ও শুরাইহ (র.) প্রমুখ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, তাছাড়া পরবর্তী খলিফাগণের আমলে শুরাইহ, শা'বী, ইয়াহইয়া ইবনে মা'মার ও মারওয়ান প্রমুখ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

আসলে রাসূলের ইন্তেকালের পর বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছিল, তাই লেখকের সরাসরি كَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ لِفَصْلِ الْخُصُوْمَاتِ অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন বিচার করার উদ্দেশ্যে মসজিদে বসতেন বলাটা যথাযথ হয়নি, তবে ইতঃপূর্বে আমরা যেমনটা বলেছি যে, খোলাফায়ে রাশেদীন [মাঝে মাঝে] বিচার অনুষ্ঠান মসজিদে করতেন তা প্রমাণিত। তবে তা সব সময়ের জন্য নয় এবং তারাই তা করতেন এমনও নয়; বরং তাদের নিযুক্ত বিচারকগণ বিচারকার্য সম্পাদন করতেন সব সময়। মোটকথা সাহাবী এবং তাবেয়ীন মসজিদে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। এতে কেউ বাধা দিয়েছেন তা জানা নেই।

আমাদের যৌক্তিক দলিল হলো– ন্যায়বিচার করা একটি ইবাদত। আর ইবাদত মসজিদে করা জায়েজ। যেমন– নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করা জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে লেখক বলেন, কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের অপবিত্রতা তাদের বিশ্বাসগত ব্যাপারে বলা হয়েছে। বাহ্যিক বা দেহগত অপবিত্রতার কথা আয়াতে বলা হয়নি। বিশ্বাসগত নাপাকী মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। আর এজন্যই রাসূল ﷺ -এর কাছে [ইসলাম গ্রহণের পূর্বে] মুশরিকদের প্রতিনিধি দল আগমন করত এবং রাসূল ﷺ তাদের সাথে মসজিদের অভ্যন্তরে আলোচনায় মিলিত হতেন।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, হযরত ছুমাম ইবনে আসালকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। অথচ তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। অতএব মুশরিকদের মসজিদে আগমন অবৈধ নয়।

ঋতুমতী নারীর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি ঋতুমতী নারী আসামি কিংবা বাদী হয় তাহলে তার সমস্যার কথা বিচারককে জানাবে। সেমতে বিচারক তার বক্তব্য শোনার উদ্দেশ্যে বাইরে যাবেন/ সে মসজিদের গেইটে আসবে/ বিচারক তার সহকারীকে ঋতুমতী নারীর কাছে পাঠাবেন, যিনি উক্ত নারীর ও তার প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারের রায় প্রদান করবেন।

তাছাড়া মহিলাদের ঋতুমতী হওয়াতো একটা সাময়িক সমস্যা গুরুতর সমস্যা না হলে বিচার প্রক্রিয়া সামান্য বিলম্ব করার মাধ্যমে এর থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। লেখক বলেন, ঋতুমতী নারীর অবস্থাটি পশু নিয়ে বিবাদের মতো, অর্থাৎ যদি কোনো পশু নিয়ে বিবাদ হয় তাহলে পশুটিকে মসজিদের বাইরে রাখা হবে। আর অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য বিচারক মসজিদের বাইরে যাবেন। তদ্রূপ ঋতুমতী নারীর জন্য বিচারক বাইরে যাবেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ جَلَسَ فِىْ دَارِهِ الخ : লেখক বলেন, বিচারক যদি নিজ বাসস্থানে বিচারের এজলাস বসায় তবু তা বৈধ হবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো বিচারক তার এজলাসে জনসাধারণকে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে হবে– কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা সকলেরই বিচারকের কার্যালয়ে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রেও উত্তম হচ্ছে বিচারকের বাড়ি শহরের মধ্যবর্তী স্থানে হওয়া, যাতে সকলের জন্য সে স্থানে গমন করা সহজ হয়।

বিচারকের শিষ্টাচার সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিচারক হাঁটা-চলা করার সময় অথবা সওয়ারির/ পরিবহনের উপর চলাকালে বিচারের রায় প্রদান করবেন না। কারণ এগুলো কোনো স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অথচ বিচারকের রায় প্রদানের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা আবশ্যক। তাছাড়া এরূপ অবস্থায় রায় প্রদানের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার এবং বিচারকের মহান পদের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। এরূপ অবস্থায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, এ জাতীয় অবস্থায় বিচারকদের একাগ্রতা থাকে না এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মনোসংযোগ নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে মাবসূতে আরো বলা হয়েছে যে, হেলান দিয়ে বসা বিচারকার্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু নয়। কেননা এটা বসার একটি ধরন, মানুষ বিভিন্ন ধরনের আসনে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, রাগান্বিত, উৎফুল্ল, ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, চিন্তিত, ঝিমানো অবস্থায় বিচারের রায় প্রদান সমীচীন নয়। এমনিভাবে প্রচণ্ড শীত ও গরমে, পেশাব-পায়খানার বেগ থাকাকালে ও কামভাব থাকাবস্থায় বিচার করা সমীচীন নয়। মোটকথা, শারীরিকভাবে বা মনোগতভাবে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় বিচার পরিচালনা করবে না। কারণ একাগ্রতা বিচার পরিচালনা করার জন্য আবশ্যক। এসবের ভিত্তি হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। তিনি ইরশাদ করেন- لَا يَقْضِى الْقَاضِىْ وَهُوَ غَضْبَانُ অর্থাৎ "বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান করবেন না।" বিচারকের শিষ্টাচারের মধ্যে আরো যা রয়েছে, সেগুলো হলো- যেদিন বিচারের রায় প্রদান করবেন সেদিন নফল রোজা রাখবেন না। এক ব্যক্তি থেকে একাধিক প্রমাণ শুনবেন না, তবে লোকজন কম থাকলে তা করতে পারবেন। সিরিয়ালের পরের ব্যক্তিকে আগে সুযোগ দেবেন না এবং মসজিদের মধ্যে হদ কিংবা তা'যীর প্রয়োগ করবেন না।

قَوْلُهٗ وَيَجْلِسُ مَعَهٗ مَنْ كَانَ يَجْلِسُ قَبْلَ ذٰلِكَ الخ : লেখক বলেন, বিচারক যখন তার নিজ বাড়িতে বিচার করবে তখন তার সাথে সেই সব লোক থাকা উচিত যারা ইতঃপূর্বে তার সাথে উঠাবসা করত। কারণ নির্জনে একাকী বিচার করা অবস্থায় ঘুষ আদান-প্রদানের এবং অবিচার করার সুযোগ থাকে। হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কমপক্ষে চারজন সাহাবী উপস্থিত না থাকলে বিচারপর্ব শুরু করতেন না। মুস্তাহাব হচ্ছে বিচারকের মজলিসে এক জামাত ফকীহ -এর সমাবেশ থাকা; যাতে বিচারক বিচারের ব্যাপারে তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মজলিসে হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) উপস্থিত থাকতেন। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, বিচারকের মজলিসে সব মাযহাবের ফকীহদের উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে বিচারক জটিল মাসআলায় তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। মাবসূত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিচারকের ঘরে যদি তার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনেরা প্রবেশ করে তাহলে স্থানের সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে অথবা বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মাধ্যমে মুসলমানদের জরুরি বিষয়ে বিচারকের মনোসংযোগ ব্যাহত করবে। তাই বিচারকের একাকী বসাই উচিত। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। সুতরাং তার পাশে এমন লোকদের রাখবেন যাদের দ্বারা তার কোনো ক্ষতি না হয়; বরং উপকার হয় এবং তারা তাকে সহযোগিতা করে।

قَالَ : وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً اِلَّا مِنْ ذِىْ رِحْمٍ مَحْرَمٍ اَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ لِاَنَّ الْاَوَّلَ صِلَةُ الرَّحِمِ، وَالثَّانِىْ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ بَلْ جَرٰى عَلَى الْعَادَةِ، وَفِيْمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ يَصِيْرُ اٰكِلًا بِقَضَائِهِ حَتّٰى لَوْ كَانَتْ لِلْقَرِيْبِ خُصُوْمَةٌ لَا يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ، وَكَذَا اِذَا زَادَ الْمُهْدِىْ عَلَى الْمُعْتَادِ اَوْ كَانَتْ لَهُ خُصُوْمَةٌ، لِاَنَّهُ لِاَجْلِ الْقَضَاءِ فَيَتَحَامَاهُ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ عَامَّةً، لِاَنَّ الْخَاصَّةَ لِاَجْلِ الْقَضَاءِ فَيُتَّهَمُ بِالْاِجَابَةِ، بِخِلَافِ الْعَامَّةِ، وَيَدْخُلُ فِىْ هٰذَا الْجَوَابِ قَرِيْبُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهُ يُجِيْبُهُ، وَاِنْ كَانَتْ خَاصَّةً كَالْهَدِيَّةِ، وَالْخَاصَّةُ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُضِيْفُ اَنَّ الْقَاضِىَ لَا يَحْضُرُهَا لَا يَتَّخِذُهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক [সাধারণ জনগণ থেকে] হাদিয়া গ্রহণ করবেন না, তবে যদি তার নিকটাত্মীয় কিংবা যাদের সাথে বিচারক হওয়ার পূর্ব থেকে হাদিয়া লেনদেনের অভ্যাস ছিল [তাদের হাদিয়া গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই ।] কেননা নিকটাত্মীয়ের হাদিয়া তো আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়াস, আর দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের হাদিয়া তো অভ্যাসবশত হাদিয়ার অংশ–বিচারকার্যের জন্য নয় । এছাড়া অন্যান্য হাদিয়া বিচারক হওয়ার ভিত্তিতে খাওয়া হচ্ছে । এজন্য যদি কোনো আত্মীয়ের মামলা হয় সেখানে হাদিয়া গ্রহণ করবেন না । অদ্রূপ যদি হাদিয়া স্বাভাবিক অভ্যাসের চেয়ে বেশি হয় কিংবা যার সাথে হাদিয়া আদান-প্রদানের সম্পর্ক রয়েছে, তার কোনো মামলা থাকে । কেননা এটা বিচারক হওয়ার কারণে প্রদান করা হচ্ছে । সুতরাং বিচারক তা থেকে বেঁচে থাকবেন । বিচারক কোনো দাওয়াতে যাবেন না তবে সাধারণ নিমন্ত্রণে যেতে পারবেন । কেননা বিশেষ নিমন্ত্রণ বিচারক হওয়ার কারণে হয়ে থাকে । ফলে সে দাওয়াত কবুল করার কারণে সমালোচিত হতে পারেন । সাধারণ দাওয়াতে সেটা নেই । ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দাওয়াতের ব্যাপারে বিচারকের নিকটাত্মীয়গণও শামিল । ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচারকের নিকটাত্মীয়রা বিশেষ দাওয়াত দিলেও গ্রহণ করবেন, যেমন তাদের হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেন । বিশেষ দাওয়াত হচ্ছে যাতে বিচারক অংশগ্রহণ না করলে মেজবান খাবারের আয়োজন করবে না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً اِلَّا مِنْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক বিচারকের হাদিয়া গ্রহণ করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন ।

হাদিয়া বলা হয় বৈধ উদ্দেশ্যে প্রাপকের সন্তুষ্টির জন্য যা দেওয়া হয় । হাদিয়া দেওয়া সুন্নত । রাসূল ﷺ হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন । রাসূল ﷺ বলেন– نِعْمَ الشَّئُ الْهَدِيَّةُ الخ 'হাদিয়া খুবই উত্তম বস্তু ।' অন্যত্র তিনি বলেন– اَلْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ অর্থাৎ 'হাদিয়া অন্তরের দ্বেষকে প্রশমিত করে ।' তিনি আরো বলেন– تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ 'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া প্রদান কর, তাহলে ভালোবাসায় আবদ্ধ হবে ।'

তবে মনে রাখা দরকার, হাদিয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষের সাথে খাস নয় । হাদিয়া সংক্রান্ত উপরিউক্ত উৎসাহমূলক হাদীসগুলো মুসলমানদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যারা দায়িত্ব লাভ করেন যেমন– বিচারক, প্রশাসক এবং

সরকারি অন্যান্য কর্মকর্তা তাদের জন্য সাধারণের হাদিয়া গ্রহণ করা সমীচীন নয়। বিশেষভাবে এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করবেন না, যারা ইতঃপূর্বে কখনো হাদিয়া দেয়নি। কারণ এ জাতীয় হাদিয়া উৎকোচের অন্তর্ভুক্ত। মাসরূক (র.) বলেন, বিচারক যখন হাদিয়া গ্রহণ করল সে উৎকোচ নিল. আর যদি সরাসরি উৎকোচ নেয় তাহলে সে কুফরি কাজের মধ্যে শরিক হলো। ইমাম বুখারী (র.) আবূ হুমাইদ আস সায়েদী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইবনে আসাদ নামক অয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সদকাহ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন। সে সদকা উসুল করে মদিনায় আসল। এরপর রাসূল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে বলল, এ মালগুলো আপনাদের সদকার মাল, আর এগুলো আমি হাদিয়া রূপে পেয়েছি। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার মা/ বাবার বাড়িতে বসে দেখ কেউ তোমাকে হাদিয়া দেয় কিনা?

হযরত ওমর (রা.) একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দিয়ে এক স্থানে পাঠালেন। কিছুকাল পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কিছু সম্পদ সাথে করে মদিনায় ফিরে আসলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব তুমি কোথায় পেলে? তিনি বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা প্রসব এবং হাদিয়ার মাধ্যমে অর্জন করেছি। হযরত ওমর (রা.) [ধমকের স্বরে] বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি ঘরে বসে দেখ তো তোমাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা? অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাঁর থেকে যাবতীয় মাল নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দেন। উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাদিয়া গ্রহণ উৎকোচের মধ্যে গণ্য হয়। এজন্য বিচারক হাদিয়া গ্রহণ করবেন না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক দুধরনের ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। যথা– ১. মাহরাম আত্মীয় বা অতি নিকটাত্মীয় ২. যার / যাদের সাথে বিচারক হওয়ার পূর্বে হাদিয়া আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। ইমাম কুদূরী (র.)-এর এ ইবারতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, যে বিচারককে হাদিয়া প্রদান করবে প্রথমে দেখতে হবে বিচারকের কাছে তার কোনো মামলা-মকদ্দমা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে তার হাদিয়া কবুল করা হবে না। যদিও হাদিয়াদাতা বিচারকের নিকটাত্মীয় হয়ে থাকুক অথবা এমন ব্যক্তি থেকে হোক, যার সাথে পূর্ব থেকে হাদিয়া আদান-প্রদানের অভ্যাস রয়েছে। আর যদি হাদিয়া প্রদানকারী ব্যক্তির কোনো মামলা-মকদ্দমা না থাকে তাহলে দু অবস্থা–

১. হাদিয়াদাতার সাথে আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের কারণে বিচারক হওয়ার পূর্বে হাদিয়া আদান-প্রদানের কোনো অভ্যাস ছিল না। এ অবস্থাতে হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়।

২. আর যদি আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের কারণে পূর্বে তাদের মাঝে হাদিয়া আদান-প্রদান হয়ে থাকে তাহলে শর্তসাপেক্ষে হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। শর্তটি হচ্ছে, পূর্ব অভ্যস্ত পরিমাণের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশি না হতে হবে, যদি অভ্যস্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু গ্রহণ করবেন না।

শায়েখ ফখরুল ইসলাম (র.) বলেন, যদি হাদিয়াদাতার মাল বৃদ্ধি পায় তাহলে সে পরিমাণে বেশি নেওয়া বৈধ হবে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অভ্যাস না থাকলে আত্মীয় থেকেও হাদিয়া নেওয়া যাবে না। যদি কোনো আত্মীয়ের বিচারক হওয়ার পূর্বে হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস না থাকে, আর বিচারক হওয়ার পর সে হাদিয়া নিয়ে আসে তাহলে তার হাদিয়া গ্রহণ করবেন না।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এরপর বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এবং তার ব্যাখ্যায় হিদায়ার ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, অভ্যাস নেই এমন আত্মীয়ের [যদি মামলা না থাকে] হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে; কিন্তু ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, তার বর্ণিত ব্যাখ্যাই উত্তম। কারণ এতে অধিকতর সর্তকতা বিদ্যমান।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ صِلَةُ الرَّحِمِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণিত মাসআলা অনুযায়ী দু ধরনের ব্যক্তি থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা যে বৈধ তার দলিল হিসেবে হিদায়ার লেখক বলেন– لِأَنَّ الْأَوَّلَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَالثَّانِيْ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ بَلْ جَرْى عَلَى الْعَادَةِ অর্থাৎ বিচারকের জন্য মাহরাম আত্মীয়ের হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। কারণ সে তো আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হাদিয়া দিয়েছে। বিচারক হওয়ার কারণে হাদিয়া দেয়নি। আর যার / যাদের সাথে বিচারক হওয়ার পূর্ব থেকে হাদিয়া আদান-প্রদানের

সম্পর্ক ছিল তার হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। কারণ সেতো পূর্বের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করেছে। সেও বিচারক হওয়ার কারণে হাদিয়া দেয়নি। আর যে হাদিয়া বিচারকরূপে দেওয়া হয় না তা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। লেখক বলেন, এছাড়া অন্য কারো হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি নিকটাত্মীয়ের যদি মামলা বিচারাধীন থাকে তাহলে তার হাদিয়াও গ্রহণ করা বৈধ নয়। তদ্রূপ যার সাথে পূর্ব থেকে হাদিয়ার লেনদেন ছিল বর্তমানে তার মামলা বিচারাধীন রয়েছে তার হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এমনিভাবে উক্ত ব্যক্তি যদি অস্বাভাবিক বেশি হাদিয়া দেয় তাও গ্রহণ করা যাবে না, কারণ এসব ক্ষেত্রে হাদিয়া প্রদান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচারককে প্রভাবান্বিত করা ও তার আনুকূল্য লাভ করা। আর এসব উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হাদিয়া উৎকোচরূপে গণ্য হয়। তাছাড়া বিচারকের এসব হাদিয়া বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের কারণেই হচ্ছে। আর ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে, দায়িত্ব গ্রহণের কারণে যে হাদিয়া পাওয়া যায় তা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অবৈধ। যেমন ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত হাদীস ও হযরত ওমর (রা.)-এর আমল থেকে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, যেসব অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা নিষিদ্ধ সেসব অবস্থায় যদি বিচারক অবৈধভাবে হাদিয়া গ্রহণ করে ফেলেন তাহলে সেসব হাদিয়া বায়তুল মালে জমা করে দেবেন। যেমন– হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিয়ার মাল নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দিয়েছিলেন, এটা কতিপয় মাশায়েখের মত। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা হয়েছে তাকে যদি পরে সনাক্ত করা যায় তাহলে তার কাছে ফেরত দেবে। আর যদি তাকে সনাক্ত করা না যায় কিংবা বিচারক তাদের চিনেন বটে; কিন্তু দূরত্বের কারণে তাদের কাছে মাল পৌছানো অসম্ভব হয়ে যায় তখন বায়তুল মালে জমা করবেন। উক্ত মাল কুড়ানো মালের [لُقْطَةٌ -এর] হুকুমে হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الخ : লেখক বলেন , বিচারক বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করবেন না। তবে সাধারণ দাওয়াত গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ খাস দাওয়াত বিচারক হওয়ার কারণে দেওয়া হয় এবং এতে অংশগ্রহণ করার কারণে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আম দাওয়াত যা সকলের জন্য দেওয়া হয় তাতে অংশগ্রহণ করাতে যেহেতু অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই এতে অংশহগ্রহণ করা বৈধ। লেখক বলেন, বিশেষ দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা বিচারকের জন্য নিষেধ, যদি তা বিচারকের নিকটাত্মীয়দের পক্ষ থেকেও হয়। কারণ অনেক সময় মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। সারকথা হলো শায়খাইনের মতে, বিচারক কোনো বিশেষ দাওয়াত কবুল করবেন না, এমনকি যদি তার নিকটাত্মীয়রা সেই দাওয়াত দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিচারক তার নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত গ্রহণ করবেন যদি তা খাস দাওয়াতও হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে, নিকটাত্মীয়দের হাদিয়া কবুল করা বৈধ, অর্থাৎ হাদিয়া গ্রহণ যেহেতু বৈধ, সেহেতু দাওয়াত কবুল করাও বৈধ হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ বকর আল খাসসাফ বলেন, এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই যে, বিচারক তার নিকটাত্মীয়ের বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এটা করা জরুরি। তিনি বলেন, হাদিয়ার ক্ষেত্রে তো এমন করা হয়নি, তাহলে হাদিয়া এবং দাওয়াতের মধ্যে কি পার্থক্য? তা আপনারা দেখান। উল্লেখ্য যে, ইমাম তাহাবী (র.) শায়খাইন (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে উক্ত ইখতিলাফ বর্ণনা করেছেন। হিদায়ার লেখক বলেন, খাস দাওয়াতের সংজ্ঞা এই যে, যদি দাওয়াতকারী জানতে পারে যে, বিচারক তার নিমন্ত্রণে আসবেন না তাহলে সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে না।

আর আম দাওয়াত হচ্ছে বিচারক না গেলেও দাওয়াতদাতা তার অনুষ্ঠান-আয়োজন বাদ দেবে না।

কতিপয় মাশায়েখের মতে, যে দাওয়াতে দশজনের কম লোককে দাওয়াত দেওয়া হয় তা হলো খাস দাওয়াত। আর যে দাওয়াতে দশের অধিক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হয় তা সাধারণ দাওয়াত।

অনেকের মতে বিবাহ, খতনা, আকিকা ইত্যাদি [যার অনুষ্ঠান প্রথাগতভাবে করে থাকে] হলো আম দাওয়াত। এছাড়া অন্যান্যগুলো খাস দাওয়াত।

قَالَ : وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ، لِأَنَّ ذٰلِكَ مِنْ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوْقٍ، وَعَدَّ مِنْهَا هٰذَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক জানাজার নামাজে উপস্থিত হবেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন, কেননা এগুলো মুসলমানদের হকসমূহের অন্তর্গত। রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মুসলমানের আরেক মুসলমানের কাছে ছয়টি হক রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রাসূল ﷺ এ দুটিকে গুনেছেন অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক বিচারকের কতিপয় শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক জানাজায় শরিক হবেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবেন। এর দলিল হিসেবে লেখক বলেন, এ দুটি কাজ মুসলমানের হক। অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের কাছে যেসব হক পায় সেগুলোর মধ্যে এ দুটিও রয়েছে। তিনি এখানে রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীসের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করেছেন। হাদীসটি হলো–

رَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هُنَّ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর ছয়টি হক রয়েছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন– ১. যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সালাম দেবে ২. যখন সে তোমাকে দাওয়াত দেবে তুমি তাতে সাড়া দেবে ৩. সে যখন তোমার কাছে উপদেশ চায় তুমি তাকে উপদেশ দেবে ৪. যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তুমি জবাব দেবে [অর্থাৎ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে] ৫. আর যখন সে অসুস্থ হবে তুমি তাকে দেখতে যাবে ৬. এবং যখন সে মারা যাবে তুমি তার জানাজায় অংশগ্রহণ করবে।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস হযরত আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلٰى اَخِيْهِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ اِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ لِاَخِيْهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَحْضُرُ اِذَا مَاتَ وَيَنْصَحُهُ اِذَا اسْتَنْصَحَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ كِتَابِهِ الْاَدَبِ الْمُفْرَدِ ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের উপর ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় অধিকার রয়েছে। যদি সে সেগুলোর একটি ছেড়ে দেয় তাহলে সে তার ভাইয়ের আবশ্যকীয় অধিকার ছেড়ে দিল। ১. যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে সালাম দিবে ২. যখন সে দাওয়াত দিবে তাতে অংশগ্রহণ করবে। ৩. যখন সে হাঁচি দিবে তখন তার জবাব দিবে ৪. সে যখন অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাবে ৫. সে যখন ইন্তেকাল করবে তার জানাজায় শরিক হবে। ৬. যখন সে উপদেশ চাইবে তাকে উপদেশ দেবে। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে হিদায়ার লেখক বিচারকের জন্যে জানাজায় অংশগ্রহণ করা এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া উচিত মনে করেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির কোনো মামলা যদি বিচারাধীন না থাকে তাহলেই তাকে দেখতে যাবে। অন্যথায় সে অসুস্থ হলেও যাবে না।

وَلَا يُضِيْفُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُوْنَ خَصْمِهٖ، لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَلِاَنَّ فِيْهِ تُهْمَةٌ. قَالَ : وَاِذَا حَضَرَ سَوّٰى بَيْنَهُمَا فِى الْجُلُوْسِ وَالْاِقْبَالِ، لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِذَا ابْتُلِىَ اَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِى الْمَجْلِسِ وَالْاِشَارَةِ وَالنَّظْرِ، وَلَا يُسَارُّ اَحَدَهُمَا وَلَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ وَلَا يُلَقِّنُهٗ حُجَّةً لِلتُّهْمَةِ، وَلِاَنَّ فِيْهِ مُكَسَّرَةٌ لِقَلْبِ الْاٰخَرِ فَيَتْرُكُ حَقَّهٗ وَلَا يَضْحَكُ فِىْ وَجْهِ اَحَدِهِمَا، لِاَنَّهٗ يَجْتَرِئُ عَلٰى خَصْمِهٖ، وَلَا يُمَازِحُهُمْ وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمْ لِاَنَّهٗ يَذْهَبُ بِمَهَابَةِ الْقَضَاءِ.

অনুবাদ : বিচারক বাদী ও বিবাদীর মধ্য থেকে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যের মেহমানদারি-আপ্যায়ন করবে না। কেননা রাসূল ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এতে অপবাদ দানের সুযোগ রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন বাদী ও বিবাদী উভয়ে উপস্থিত হবে বিচারক তাদের আসন দান ও তার মনোযোগ প্রদানে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবেন। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ বিচারকের দায়িত্ব লাভ করে সে যেন বাদী-বিবাদীর মাঝে আসন, ইশারা-ইঙ্গিত ও দৃষ্টি নিক্ষেপের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখে। [পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার] অভিযোগ থাকার কারণে তিনি একজনের সাথে কান কথা বলবেন না, একজনের প্রতি ইশারা করবেন না এবং দলিল-প্রমাণ পড়িয়ে দেবেন না। তাছাড়া এসবের মধ্যে অন্যের হৃদয়ভঙ্গ হওয়ার কারণ রয়েছে। ফলে সে তার দাবি প্রত্যাহার করবে। আর তিনি একজনের প্রতি তাকিয়ে হাসবেন না, ফলে সে তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে সাহসী হয়ে উঠবে। তাদের সবার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন না এবং তাদের একজনের সাথেও করবেন না। কারণ এর দ্বারা বিচারকার্যের গুরুগম্ভীরতা বিনষ্ট হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يُضِيْفُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُوْنَ خَصْمِهٖ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক যদি কোনো ভোজের ব্যবস্থা করে তাহলে তাতে বাদী-বিবাদীর একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে দাওয়াত দেবেন না। কেননা একটি হাদীসে এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিষেধ বাণী পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো–

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَنَزَلَ عَلٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَضَافَهٗ فَلَمَّا قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُخَاصِمَ قَالَ لَهٗ عَلِيٌّ تَحَوَّلْ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نُضِيْفَ الْخَصْمَ اِلَّا وَمَعَهٗ خَصْمُهٗ.

অর্থ– হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে মেহমানরূপে গ্রহণ করেন। যখন সে আলী (রা.)-এর কাছে বিচার প্রার্থীরূপে এসেছে একথা জানাল, তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, তুমি অন্য কোথাও চলে যাও। কেননা মহানবী ﷺ আমাদের বাদী-বিবাদীর একত্রে দুজন ব্যতীত শুধু একজনের মেহমানদারি করতে নিষেধ করেছেন।" সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, উভয়কে একত্রে দাওয়াত দেওয়া বৈধ। একজনকে খাসভাবে দাওয়াত দেওয়া নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধতার যৌক্তিক দলিল হলো, শুধু একজনকে দাওয়াত দেওয়ার কারণে সমালোচিত ও অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে লোকেরা ধারণা করবে যে, তার প্রতি বিচারকের দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং বিচার নিরপেক্ষ হবে না। এরূপ ধারণা/ আশঙ্কা বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা বিনষ্ট করে দেয়।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا حَضَرَ سَوَّى بَيْنَهُمَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে এজলাসের কতিপয় শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে– প্রথমত বিচারক তার এজলাসে বসা অবস্থায় যখন বাদী ও বিবাদী উভয়ে আসবে বিচারক তাদের সমমর্যাদার আসনে বসতে দেবেন এবং বিচারক তাদের প্রতি সমান মনোযোগ দেবেন। অর্থাৎ তাদের কাউকে উচ্চ আসনে, অন্যকে নিম্ন আসনে বসাবেন না। একজনকে চেয়ারে আর অন্যজনকে বেঞ্চে বসাবেন না। একজনকে তুলনামূলক উত্তম তথা ডানপাশে, অন্যজনকে বাম পাশে বসাবেন না। বিচারক তাদের দুজনকে তার এক পার্শ্বে [ডান / বাম] বসাবেন না। তাহলে একজন বিচারকের সামান্য কাছে, অন্যজন সামান্য দূরে থাকবে; বরং দুজনকে দুপাশে বসাবেন। এ ব্যাপারে উত্তম সুরত হচ্ছে বিচারকের সামনে বাদী ও বিবাদী উভয়কে মাটিতে বিচারক থেকে সমান দূরত্বে ডান ও বামে বসাবেন, যাতে বিচারকের কারো প্রতি লক্ষ্য করতে কোনো সমস্যা না হয় এবং দুজনের প্রতি একভাবে লক্ষ্য করতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস। হাদীসটি হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ তাঁর কিতাবে হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلٰى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ.

অর্থ- "হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যাকে মুসলমানদের বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সে যেন তাদের মাঝে আসন, ইশারা-ইঙ্গিত ও দৃষ্টি নিক্ষেপের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখে এবং বাদী-বিবাদীর মধ্য হতে একজনের সাথে অপরের তুলনায় রূঢ় ভাষায় কথা বলবে না।" এ হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ীর মন্তব্য হলো, হাদীসটি দুর্বল।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে শব্দের ভিন্নতা সহ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, আর তা হলো–

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِيْ لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ (أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচারক নিযুক্ত হলো সে যেন তাদের মাঝে কথাবার্তা, ইশারা-ইঙ্গিত ও আসনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখে।

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবূ মূসা, আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আনসারীকে পত্র লিখেন–

أَنْ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتّٰى لَا يَطْمَعَ شَرِيْفٌ فِيْ حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيْفٌ مِنْ عَدْلِكَ.

অর্থাৎ "[হে আবূ মূসা] তুমি [বিচারপ্রার্থী] লোকদের মাঝে তোমার মনোনিবেশ, ন্যায়পরায়ণতা ও তোমার আসন গ্রহণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা কর। যাতে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক তোমার থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য আশান্বিত না হয় এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি যেন তোমার ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে নিরাশ না হয়।" এটি মাওকূফ হাদীস, তবে সবগুলো সূত্রের বিবেচনায় হাদীসটির সনদ উত্তম।

قَوْلُهُ وَلَا يُسَارُّ أَحَدَهُمَا وَلَا يُشِيْرُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক বাদী-বিবাদীর যে কোনো একজনের সাথে একান্তে আলোচনা করবেন না এবং হাত, মাথা কিংবা কোনো অঙ্গের সাহায্যে ইশারা করবেন না। তদ্রূপ কোনো একজনকে তার প্রমাণ পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে দেবেন না। কারণ এরকম করলে বিচারক পক্ষপাতিত্ব কিংবা উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। সুতরাং অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে বিচারক উপরিউক্ত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকবে। তাছাড়া বিচারক এরূপ করলে প্রতিপক্ষের হৃদয় ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাবে। প্রতিপক্ষ মনে করবে আমার বাদী/ বিবাদীর সাথে বিচারকের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং আমি ন্যায়বিচার পাব না। এসব চিন্তা করে তার হক ছেড়ে চলে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক কোনো একজনের দিকে তাকিয়ে হাসবেন না। কারণ যার দিকে তাকিয়ে বিচারক হাসবেন সে তার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে সাহসী হয়ে উঠবে। ফলে অন্যজন ন্যায়বিচারের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে।

বিচারক বিচারকালীন সময়ে কোনো একজনের সাথে অথবা সকলের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করবেন না। কারণ, বিচারকের এরূপ ঠাট্টা করার দ্বারা বিচারের গুরুগম্ভীরতা নষ্ট হবে এবং মানুষের মন থেকে বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে করণীয় হলো এই যে, বিচারক তার সামনে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে সেখানকার পরিবেশ ঠিক রাখবে, কোলাহলমুক্ত, গম্ভীর ও স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করবে। বিচারক অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলবেন না। বাদী ও বিবাদী একজন কথা বললে অন্যজন সম্পূর্ণ চুপ থাকবে। প্রথমে বাদী তার অভিযোগ / দাবি উত্থাপন করবে।

قَالَ : وَيَكْرَهُ تَلْقِيْنَ الشَّاهِدِ، وَمَعْنَاهُ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ : اَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا، وَهٰذَا لِاَنَّهُ اِعَانَةٌ لِاَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، فَيَكْرَهُ كَتَلْقِيْنِ الْخَصْمِ، وَاسْتَحْسَنَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ، لِاَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَحْصَرُ لِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ، فَكَانَ تَلْقِيْنُهُ اِحْيَاءً لِلْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْاِشْخَاصِ وَالتَّكْفِيْلِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাক্ষীকে কথা শিখিয়ে দেওয়া মাকরূহ, অর্থাৎ এ ধরনের কথা বলা যে, তুমি কি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও? কেননা এ হচ্ছে দুপ্রতিপক্ষের একজনকে সহযোগিতা করা। সুতরাং সরাসরি প্রতিপক্ষকে যুক্তি শিখিয়ে দেওয়ার মতো এটাও মাকরূহ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এটাকে উত্তম মনে করেন। কেননা সাক্ষী কখনো বিচারালয়ের গুরুগম্ভীর পরিবেশের ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাকে বাতলে দেওয়া হক প্রতিষ্ঠা করা এবং তা দুজনের একজনের কাছে লোক প্রেরণ করা ও তাদের একজনের জন্য জামিন নেওয়ার পর্যায়ে পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَكْرَهُ تَلْقِيْنُ الشَّاهِدِ الخ : উক্ত ইবারতে বিচারকের পক্ষ থেকে সাক্ষীকে যুক্তি শিখিয়ে দেওয়া/ সাক্ষীর বক্তব্য গুছিয়ে বাতলে দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

تَلْقِيْن শব্দের অর্থ– শিখিয়ে দেওয়া, বাতলে দেওয়া, নিজের সাথে অন্যকে পড়ানো ইত্যাদি। এখানে তালকীন দ্বারা উদ্দেশ্য বিচারকের এমন কথা বলা, যার দ্বারা সাক্ষী তার সাক্ষ্যদান বিষয়ে উপকৃত হয়। যেমন– বিচারক সাক্ষীকে বলল, তুমিতো এই এই বিষয়ের সাক্ষী। হিদায়ার লেখক মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাক্ষীকে যুক্তি/ কথা বাতলে দেওয়া / শিখিয়ে দেওয়া মাকরূহ, এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর। একটা সময় পর্যন্ত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)ও এরূপ মত পোষণ করতেন, পরে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন যা একটু পরেই আমরা বর্ণনা করব। লেখক তালকীন মাকরূহ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা দুই প্রতিপক্ষের একজনের সহায়তা করা হয়। লেখক বলেন, দুই প্রতিপক্ষের একজনকে সরাসরি তালকীন করা যেমন মাকরূহ ঠিক তেমনি দুজনের একজনের সাক্ষীকে তালকীন করা মাকরূহ হবে।

قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অপবাদের ভয় আছে এমন ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তালকীন করা উত্তম। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কোনো সাক্ষী যদি টেনশনের কারণে / বিচারালয়ের পরিবেশের কারণে ভয়ে হতভম্ব হয়ে সাক্ষ্যের কোনো শর্তাদি ভুলে যায়, বিস্মৃত হয়ে যায় তাহলে তাকে তালকীন করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, আদালতের পরিবেশের কারণে অনেকে মূল কথা/সাক্ষ্য দানের শর্তাদি ব্যক্ত করতে অক্ষম হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তালকীন করার দ্বারা তার বিস্মৃত কথা মনে হয়। আর এভাবে এক মুসলমানের প্রাপ্য অধিকার লাভ হয়। এজন্য এটা বৈধ হবে।

এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এমন দুটি মাসআলা পেশ করেন যার দ্বারা তাঁর বক্তব্য শক্তিশালী হয়। তিনি বলেন– ১. বিচারক বাদী বা বিবাদীর মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আনার জন্য যেমন লোক প্রেরণ করতে পারেন, অদ্রূপ তার জন্য তালকীন

করাও বৈধ হবে। ২. বিচারক দুই প্রতিপক্ষের একজনের জন্য কাউকে যেমন জামিন নিতে পারেন, তদ্রূপ সাক্ষীকে তালকীন করতে পারবেন। সারকথা হচ্ছে, লোক প্রেরণ ও জামিন নেওয়া একপক্ষের উপকার হওয়া সত্ত্বেও যেমন এগুলো জায়েজ তদ্রূপ এক পক্ষের সাক্ষীকে তালকীন করা বৈধ হবে। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হওয়ার ভয় আছে সেসব ক্ষেত্রে তালকীন করা নাজায়েজ। যেমন– কেউ বিবাদীর উপর পনের শত টাকার দাবি করল। জবাবে বিবাদী একহাজার টাকা স্বীকার করল, কিন্তু পাঁচশত টাকা অস্বীকার করল। অতঃপর সাক্ষী একহাজারের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। এমতাবস্থায় বিচারক বললেন, সম্ভবত বাদী মাফ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সাক্ষী সতর্ক হয়ে গেল এবং তার সাক্ষ্য শুধরে নিল। এটা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ।

মাবসূত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) যা বলেছেন তা হচ্ছে বিচারকের জন্য আযীমত, তথা স্বীয় দৃঢ়তা ও আপসহীন অবস্থান। কেননা বিচারকের এমন কাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ যা তার অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যাতে তার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভবনা জাগায়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফের মতটি হচ্ছে রুখসাতের উপর আমল করা বা দুর্বল অবস্থাকে গ্রহণ করা। কারণ বিচারক অনেক সময় দেখতে পায় সাক্ষীরা আদালতে সাক্ষী দিতে ভয় পায়, বিচারকের সাক্ষীদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা তাদের ভয় কাটাতে সাহায্য করে। বিচারকের এতটুকু সহযোগিতা হক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়, তাছাড়া সাক্ষীদের সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারকের এ তালকীন তাদের একপ্রকার সম্মান করারই নামান্তর। ফাতহুল কাদীরে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, লেখক ইমাম আবূ ইউসুফের মতটিকে اِسْتِحْسَانٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার দ্বারা এবং তাঁর মতটিকে পরে উল্লেখ করার দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, লেখকের কাছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি গ্রহণযোগ্য।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ফাতওয়ায়ে কাযীখানে বলা হয়েছে যে, বিচারকের নিজে বেচাকেনা করা উচিত নয়; বরং তিনি লোক দিয়ে হাট-বাজার করাবেন। তিন ইমামের মতও এটাই। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচারক বেচাকেনার জন্য তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন, যে জনগণের মাঝে অজ্ঞাত থাকবেন। কথিত আছে যে, জগদ্বিখ্যাত বিচারক শুরাইহ (র.) তাঁর নিয়োগের সময় হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে শর্তারোপ করেছিলেন যে, আমি ক্রয়বিক্রয় ও উপঢৌকন গ্রহণ করব না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, বাদী-বিবাদীরা যখন বিচারালয়ে পৌঁছবে তখন বিচারক সালাম করবেন না, যদি তারা সালাম করে তাহলে وَعَلَيْكُمْ বলে সংক্ষিপ্ত জবাব দেবেন। বিচারক উত্তম পোশাকে বিচারালয়ে আসবেন।

فَصْلٌ فِى الْحَبْسِ

قَالَ : وَاِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِىْ وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيْمِهٖ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهٖ وَأَمَرَهٗ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، لِاَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ، فَلَابُدَّ مِنْ ظُهُوْرِهَا، وَهٰذَا اِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِاِقْرَارِهٖ، لِاَنَّهٗ لَمْ يُعْرَفْ كَوْنُهٗ مُمَاطِلًا فِىْ اَوَّلِ الْوَهْلَةِ. فَلَعَلَّهٗ طَمَعَ فِى الْاِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبِ الْمَالَ. فَاِذَا امْتَنَعَ بَعْدَ ذٰلِكَ حَبَسَهٗ لِظُهُوْرِ مَطْلِهٖ، اَمَّا اِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حَبَسَهٗ، كَمَا ثَبَتَ لِظُهُوْرِ الْمَطْلِ بِاِنْكَارِهٖ ـ

অনুচ্ছেদ : আসামিদের আটক করা প্রসঙ্গ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন বিচারকের কাছে [হকদারের] হক প্রমাণিত হয়ে গেল এবং হকদার তার ঋণগ্রহীতাকে কারাবন্দী করার দাবি করল তখন ঋণগ্রহীতাকে দ্রুত বন্দী করার পদক্ষেপ নেবেন না, বিচারক ঋণগ্রহীতাকে তার উপর অবধারিত ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেবেন, কারণ বন্দী করা গড়িমসি ও টালবাহানা করার শাস্তি। সুতরাং টালবাহানার [শাস্তি প্রদানের] জন্য এর প্রকাশ জরুরি। এ বিধান তখনই কার্যকর হবে যখন হক বিবাদীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় তার টালবাহানাকারী হওয়ার বিষয়টি বুঝা যায় না। কেননা হতে পারে ঋণগ্রহীতা সুযোগ পাওয়ার আশা করছিল, এ কারণে সে মাল সাথে নিয়ে আসেনি। কিন্তু যদি এর পরে ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার টালবাহানা প্রকাশ পাওয়ার কারণে বিচারক তাকে গ্রেফতার করবেন, তবে যদি হক প্রাপ্যতার বিষয়টি সাক্ষীদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারক তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করবেন। কারণ হক প্রদানে অস্বীকৃতির মাধ্যমে টালবাহানা করা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : حَبْس শব্দের অর্থ– আটক করা, রোধ করা, গ্রেফতারি, কারাগারে নিক্ষেপ ইত্যাদি। জেল ও কারাগারের অর্থেও শব্দটি ব্যবহার হয়। গ্রেফতার ও কারাগারে বন্দী করা যেহেতু বিচারের বিধানভুক্ত এবং এর সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান জড়িত তাই লেখক ভিন্ন অনুচ্ছেদে এর আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

গ্রেফতার ও জেলখানায় বন্দী করার বিষয় কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কুরআনের দলিল হলো সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াত। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ 'অথবা তাদের নির্বাসনে দেওয়া হবে।' نَفْىٌ الْاَرْضِ শব্দটি যেমন নির্বাসনের অর্থে ব্যবহার হয় তদ্রূপ এটি গ্রেফতার ও বন্দী করে রাখার অর্থ প্রদান করে।

হাদীসের দলিল : رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَبَسَ رَجُلًا فِىْ تُهْمَةٍ অর্থাৎ 'বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ অপবাদ দানের কারণে এক ব্যক্তিকে বন্দী করে রেখেছিলেন।' হাদীসটি كِتَابُ الْكَفَالَةِ -এ উল্লেখ করা হয়েছিল এবং কিতাবুল হুদূদের প্রথম দিকেও হাদীসটি রয়েছে।

হযরত আবূ বকর আল খাসসাফ বর্ণনা করেন–

اِنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْحِجَازِ اِقْتَتَلُوْا فَقَتَلُوْا بَيْنَهُمْ قَتِيْلًا فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَحَبَسَهُمْ ـ

অর্থাৎ "হিজাজের কতিপয় লোক নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, এক পর্যায়ে তারা একজন লোককে হত্যা করে ফেলে। রাসূল ﷺ তাদের গ্রেফতার করতে লোক প্রেরণ করেন। তিনি তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।"

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে নিয়মতান্ত্রিক কোনো জেলখানা ও বন্দী রাখার স্থান ছিল না। তাছাড়া তখন বন্দী করার খুব প্রয়োজনও ছিল না। তখন কাউকে বন্দী করার প্রয়োজন হলে মসজিদে অথবা মসজিদের আঙ্গিনায় বেঁধে রাখা হতো। সর্বপ্রথম ফারূকে আযম হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে স্থায়ী জেলখানা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এতদ্দোশ্যে মক্কা মুকাররামায় চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে এটি জায়গা খরিদ করে তাতে জেলখানা নির্মাণ করেন।

কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) -এর যুগেও কোনো স্থায়ী জেলখানা তৈরি করা হয়নি; বরং হযরত আলী (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় সর্বপ্রথম জেলখানা নির্মাণ করেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম ফায়েক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতহুল কাদীরে লিখেন, হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম বাঁশের তৈরি জেলখানা নির্মাণ করেন। অতঃপর সেটার নামকরণ করেন নাফে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে এতে আটক কতিপয় চোর সিঁধ কেটে পালিয়ে যায়, তারপর তিনি শক্ত মাটিতে ঢালাই দিয়ে মজবুত করে আরেকটি জেলখানা নির্মাণ করেন এবং সেটাকে মুখাইয়্যাস নামে নামকরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ এর নির্মাণ সংক্রান্ত হযরত আলী (রা.)-এর একটি কবিতাও লিপিবদ্ধ করেন, যা নিম্নরূপ–

أَلَا تَرَانِيْ كَيِّسًا مُكَيِّسًا
بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيَّسًا
بَابًا حَصِيْنًا وَأَمِيْنًا كَيِّسًا

অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শীরূপে মনে কর না। আমি প্রথমে নাফে' [নামক জেলখানা] এরপর মুখায়্যাস [নামক জেলখানা] নির্মাণ করেছি। এতে একটি মজবুত দরজা স্থাপন করেছি এবং এতে বিশ্বস্ত ও সতর্ক পাহারাদার নিযুক্ত করেছি। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) কয়েদিদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তি রমজানের রোজা, ঈদ, জুমার নামাজ ও জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে জেল থেকে বের হতে পারবে না। এমনকি সে হজপালন এবং আত্মীয়দের জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যাতে এ দুঃসহ অবস্থা তাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করে। এজন্য ফকীহগণ বলেন, বন্দীর আবাসস্থল থাকার অনুপযুক্ত হওয়া এবং তার জন্য বিছানার ব্যবস্থা না করা উচিত। তার কাছে এমন কেউ যেতেও পারবে না যার সংস্পর্শে সে আরাম বোধ করে, তবে বন্দী কাউকে জামিন রেখে পিতামাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জানাজায় শরিক হতে পারবে। এর উপরই ফতোয়া। এতদ্সংক্রান্ত মাসআলা সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীসের মতো যুক্তি দ্বারাও বন্দী করার বৈধতা প্রমাণ হয়। কারণ বিচারকের মূল দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃত হকদারের কাছে তার হক পৌঁছে দেওয়া; কিন্তু বিবাদী যদি বাদীর হক আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায় / অপারগতার কথা জানায়/ গড়িমসি করে এমতাবস্থায় বিচারক তাকে হক আদায়ের ব্যাপারে বাধ্য করবে। যেহেতু ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আসামিকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য মারামারি করা যাবে না তাই বিচারক আসামিকে গ্রেফতার ও বন্দী করার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করবেন। আর যেহেতু আসামিদের বন্দী করা প্রয়োজন তাই এতদ্দোশ্যে কারাগার নির্মাণ করাও বৈধ।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক বিবাদীকে কখন গ্রেফতার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন বিচারকের সামনে বাদীর হক যথার্থভাবে প্রমাণিত হলো তখন বিচারক বিবাদীকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।

মাসআলাটির স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে অন্য ব্যক্তির ব্যাপারে এই অভিযোগ দিল যে, আমি তার কাছে টাকা পাই, সে আমার টাকা পরিশোধ করছে না। আপনি টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেফতার করুন! উক্ত অভিযোগের পর বাদীর হক প্রমাণিত হওয়ার দুটি সুরত হতে পারে–

১. বিবাদী বাদীর হকের দাবি শুনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেবে।

২. অথবা অস্বীকার করবে, তারপর বাদী সাক্ষীর মাধ্যমে তার অভিযোগ ও দাবি প্রমাণ করবে।

যদি বিবাদী স্বীকার করে তাহলে বিচারক বিবাদীকে আটক করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেবেন। উল্লেখ্য যে, ঋণ এক দিরহাম বা তার চেয়ে কমবেশি হওয়াতে মাসআলার কোনো পার্থক্য হবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ الخ : স্বীকারোক্তির সাথে সাথে আটক না করার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, আটককরণ টালবাহানা করার শাস্তি। সুতরাং উক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য টালবাহানা পাওয়া যাওয়া শর্ত। স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাদী স্বীকার করার দ্বারা বাদীর হক প্রমাণিত হয়েছে। অতএব স্বীকার করা মাত্রই তার থেকে টালবাহানা প্রকাশ পেয়েছে একথা নিশ্চিত করা বলা যাচ্ছে না। কারণ সে একথা বলতে পারে যে, আমি ভেবেছি ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বাদী থেকে আরো কিছুদিন সময় অবশ্যই পাব। আর এ কারণে আমি সাথে করে টাকা নিয়ে আসিনি। এখন আপনি যদি আমাকে আরো কিছুদিন সময় দিতে প্রস্তুত না হন তাহলে আমি বাদীর টাকা আজই বাড়িতে গিয়ে পরিশোধ করব। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, স্বীকারকারী ব্যক্তি থেকে টালবাহানা পাওয়া যায়নি তাই তাকে টালবাহানার শাস্তিস্বরূপ বন্দী করা যাবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণগ্রহীতা স্বীকারোক্তি করার পর টালবাহানা করে তাহলে তখন তাকে শাস্তিরূপে আটক করা যাবে।

হক প্রমাণ হওয়ার দ্বিতীয় অবস্থা হলো দলিল-প্রমাণ তথা সাক্ষীর মাধ্যমে হক প্রমাণিত হওয়া। অর্থাৎ বাদী যখন তা পাওনার দাবি নিয়ে বিচারকের কাছে গেল এবং বিচারক বিবাদীকে ডেকে এনে তার হকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল, তখন বিবাদী হকের কথা অস্বীকার করল, এরপর বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের মাধ্যমে / লিখিত দলিলপত্রের মাধ্যমে হক প্রমাণিত হলো, এমতাবস্থায় বিচারক তৎক্ষণাৎ বিবাদীকে আটক করতে পারবেন। কারণ ইতঃপূর্বে আমরা যা বললাম, অস্বীকার করার কারণেই সাক্ষীদের মাধ্যমে হক প্রমাণ করা হয়। আর একথা বলাবাহুল্য যে, বিবাদীর অস্বীকার করাই তার পক্ষ থেকে টালবাহানা করা। আর টালবাহানা করার শাস্তি হলো বন্দী করা। এজন্য সাক্ষী দ্বারা হক প্রমাণ হওয়ার পরপরই বিচারক বিবাদীকে বন্দী করতে পারবেন।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাওয়ায়েদে জাহিরিয়্যাহ গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, শামসুল আইম্মাহ সারাখসী থেকে উপরে বর্ণিত মাসআলার বিপরীত বক্তব্য বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যখন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হক প্রমাণ হবে তখন বিচারক বিবাদীকে সাথে সাথে গ্রেফতার করবেন না। কেননা বিবাদী তখন এই বলে ওজর পেশ করবে যে, আমার উপর এই পাওনা রয়েছে তাতো জানতাম না। স্বীকারোক্তির ব্যাপার এমন নয়, কারণ স্বীকারোক্তিকারী তো পূর্ব থেকে পাওনার কথা জানত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরিশোধ করেনি; বরং পাওনাদারকে বিচারকের কাছে পাঠাতে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে আল জামিউস সাগীর গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে কাযীখান (র.) বলেন, আবূ বকর আল খাসসাফের মতানুযায়ী দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হক প্রমাণ হওয়ার ক্ষেত্রেও সাথে সাথে বিবাদীকে আটক করবেন না। আজনাস গ্রন্থে كَفَالَةُ الْاَجَلِ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সব ধরনের ঋণের ব্যাপারে দেনাদারকে গ্রেফতার করা হবে। সেই ঋণ কর্জ, আত্মসাৎকৃত মাল, পণ্যের বাকি মূল্য ও মহর ইত্যাদি যাই হোক না কেন; কিন্তু দেনাদারকে কোনো অবস্থাতেই প্রথমেই গ্রেফতার করবেন না; বরং প্রথমে দেনাদারকে বলা হবে, তুমি উঠ এবং পাওনাদারকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা কর, এরপর যদি পাওনাদার বিচারকের দরবারে বিচার নিয়ে ফিরে আসে তাহলে বিবাদীকে গ্রেফতার করবে। ইমাম আবূ বকর আল খাস্‌সাফ (র.) বলেন, আমার মতে সঠিক কাজ এই যে, বিচারক প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার কাছে পাওনা শোধ করার মতো মাল বা অর্থকড়ি আছে কিনা? যদি সে স্বীকার করে তার কাছে অর্থকড়ি আছে তাহলে বিচারক তাকে আটক করবেন। যদি বলে, আমার কাছে পাওনা শোধ করার মতো মাল নেই তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন, তার কাছে যে মাল আছে তা প্রমাণ কর তাহলে আমি তাকে গ্রেফতার করব। কতিপয় বিচারকের মাযহাবও তাই।

উল্লেখ্য যে, যে দেনাদারের অর্থাভাবের বিষয়টি সুপ্রমাণিত তাকে কোনোভাবেই গ্রেফতার করা যাবে না, এ ব্যাপারে কোনো ইমামের দ্বিমত নেই। সবার ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সচ্ছল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে সময় দিতে হবে। কারণ রাব্বুল আলামীন বলেন– وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যদি ঋণী অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত, আর যদি তাকে ঋণ থেকে রেহাই দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮০]

قَالَ : فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوِ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاؤُهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْتِزَامِهِ بِاخْتِيَارِهِ دَلِيلُ يَسَارِهِ، إِذْ هُوَ لَا يَلْتَزِمُ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ مُعَجَّلُهُ دُونَ مُؤَجَّلِهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সে [বিবাদী] ঋণ শোধ করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রত্যেক এমন ঋণের পরিবর্তে তাকে আটক করবে যে ঋণ তার হস্তগত মালের বিনিময়ে আবশ্যক হয়েছে যেমন– পণ্যের মূল্য, অথবা এমন ঋণ যা সে চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যক করেছে। যেমন– মহর এবং জামানতের মাল। কেননা যখন তার হাতে মাল আসল তখন মালের মাধ্যমে তার সচ্ছল হওয়া প্রমাণিত হলো। আর স্বেচ্ছায় মাল আবশ্যক করার ব্যাপারে তার উদ্যোগ তার সামর্থ্যবান হওয়ারই দলিল। কেননা সে তো যে মাল আদায় করতে সক্ষম তাই নিজের উপর আবশ্যক করবে। মহর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য নগদ মহর, মেয়াদি প্রদেয় মহর নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ الخ : আলোচ্য ইবারতে কোন ধরনের ঋণের পরিবর্তে দেনাদারকে আটক করা হবে? তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত পৃষ্ঠায় আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি উক্তি আলোচনা করেছিলাম, যাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের ঋণের উল্লেখ করেছেন, যার বিপরীতে বিচারক দেনাদারকে গ্রেফতার করতে পারেন। উক্ত ইবারতে সেই ঋণগুলোকে মূলনীতি আকারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক বলেন, যেসব ঋণের বিপরীতে বন্দী করা যাবে সেগুলো দুই প্রকার– ১. এমন সব ঋণ যার বিনিময়ে তার হাতে/ দখলে কোনো মাল এসেছে, যেমন– বিক্রয় পণ্যের মূল্য, ২. এমন ঋণ যা কোনো চুক্তির মাধ্যমে সে নিজের জিম্মায়/ দায়িত্বে নিয়েছে। যেমন– বিবাহের মাধ্যমে মহর, কাফালাহ চুক্তির মাধ্যমে জামানতের মাল। উপরিউক্ত দু প্রকার ঋণ যদি গ্রহীতা দিতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক দেনাদারকে আটক করতে পারেন। তবে বিচারক তাদের তখনই আটক করবেন যখন পাওনাদাররা বিচারকের কাছে গ্রেফতারের আবেদন করবে। এ ব্যাপারে কাযীখান (র.) আল জামিউস সাগীর গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, স্বীকারোক্তি এবং দলিল-প্রমাণ যেভাবেই হক প্রমাণিত হোক না কেন বাদীর আবেদন ছাড়া আটক করা হবে না। প্রখ্যাত বিচারক শুরাইহ (র.) বলেন, বাদীর আবেদন ছাড়াই বিচারক আটক করবেন। যখীরাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি ঋণগ্রহীতা বলে, আমি অসচ্ছল, আর বাদী বলে, সে সচ্ছল; কিন্তু বাদীর কোনো প্রমাণ নেই, এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে শপথ সহকারে। এটা হানাফী ফকীহগণের মত, খাস্সাফ এ মতকে উত্তম মনে করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও একই মত পোষণ করেন। কারণ মানুষের ধনী-দরিদ্র হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো দরিদ্র হওয়া। –[ইনায়া]

আলোচ্য মাসআলার প্রথম অবস্থার দলিল হিসেবে হিদায়ার লেখক বলেন, যখন ঋণগ্রহীতার দখলে মাল আসল তখন সে উক্ত মালের মাধ্যমে ধনী হয়ে গেল। এখানে ধনী হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঋণশোধে সক্ষম হয়ে গেল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা ঋণশোধ করতে সক্ষম তারপরে সে ঋণশোধ করছে না তাই তাকে আটক করা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মালের বিনিময়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, তার হাতে উক্ত মাল বিদ্যমান আছে। যেমন– কেউ পণ্য কিনে পণ্যের মূল্যের দেনাদার হলো। [পণ্য তার কাছে থাকাটাই

নিশ্চিত] এমতাবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে বলা হবে তুমি পণ্য বিক্রি করে আমার মূল্য শোধ কর। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, কোনো ব্যক্তির আসল অবস্থা হলো দরিদ্র হওয়া। কারণ মালের বিনিময়ে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার আসল অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তার পণ্যের মালিক থাকা বা সচ্ছল হওয়াই আসল।

মাসআলার দ্বিতীয় অবস্থা [তথা কোনো চুক্তির মাধ্যমে যে ঋণ নিজের জিম্মায় আসে] এর দলিল সম্পর্কে লেখক বলেন, দেনাদারের চুক্তি করাটাই সচ্ছল হওয়ার তথা চুক্তিকৃত ঋণ শোধে সক্ষম হওয়ার দলিল। কারণ মানুষ তার নিজের জিম্মায় মাল তখনই নেয় যখন সে উক্ত মাল শোধ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কোনো লোক যে মাল / ঋণ পরিশোধ করতে পারে সেই ঋণের বোঝা তার মাথায় নেয়। আলোচ্য উদাহরণ দুটিতে মহর ও জামানতের মালের দায়িত্ব সেই নেবে যে উক্ত মহর ও জামানতের মাল শোধ করতে পারবে। চুক্তিকারী ব্যক্তি যদি বলে সে দরিদ্র তাহলেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং এ কথা বলার পরেও তাকে গ্রেফতার করা হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে ইনায়ার লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এবং হিদায়ার উক্ত ব্যাখ্যা [অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার একই হুকুম এবং এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই] ইবনে সামা'আহ (اِبْنُ سَمَاعَةَ) -এর বর্ণনা মতে করা হয়েছে। অর্থাৎ চুক্তিকারী ব্যক্তির দরিদ্র হওয়ার উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন, ইমাম খাসসাফ (র.) ফকীহগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, মাল গ্রহণ করার বিনিময়ে যে ঋণ হয়ে থাকে শুধু তার মধ্যে বিচারক ঋণগ্রহীতাকে আটক করবেন। এছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে সাথে সাথে দেনাদারকে গ্রেফতার করবে না; বরং তাদের দরিদ্র হওয়ার দাবিকে আমলে নেবে। কারণ আটককরণ হচ্ছে সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করার বা টালবাহানা করার শাস্তি। সুতরাং জাহেরী অবস্থা বিবেচনা করে তাকে শাস্তিদান করা উচিত হবে না। ইনায়া গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, আমাদের মাযহাবের সারকথা হচ্ছে বিচারক বাদীকে বিবাদীর মাল আছে কিনা? এ মর্মে কোনো প্রশ্ন করবেন না। তবে যদি বিবাদী দাবি করে যে, সে দরিদ্র, তাহলে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি বাদী বলে যে, সে দরিদ্র তাহলে তাকে ছেড়ে দেবেন। আর যদি বাদী বলে– সে সচ্ছল; কিন্তু বিবাদী বলে– আমি অসচ্ছল। এ অবস্থায় ফকীহদের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। খাসসাফ (র.) বলেন, এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতার মত গ্রহণযোগ্য। কারণ সে আসল অবস্থার স্বীকারোক্তি করছে। তবে বর্ণিত আছে যে, যদি মাল গ্রহণের বিনিময়ে ঋণ হয়ে থাকে, যেমন পণ্যের মূল্য অথবা কর্জ ইত্যাদি তাহলে বাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মাল গ্রহণের বিনিময়ে ঋণ না হয় যেমন– মহর ইত্যাদি তাহলে বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। খাসসাফ (র.) 'আদাবুল কাযী' গ্রন্থে এ মতটিকে শায়খাইনের মত বলে ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ مُعَجَّلُهُ دُوْنَ مُؤَجَّلِهِ : লেখক এখানে তাঁর বর্ণিত উদাহরণে মহরের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, মহর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مَهْر مُعَجَّلْ বা মহরের নগদাংশ।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত প্রথানুসারে মহর দুপর্যায়ে আদায় করা হয়। বিবাহের সময় নগদ মহরের যে অংশ আদায় করা হয় তাকে مَهْر مُعَجَّلْ বলা হয়। আর যে অংশ পরে শোধ করা হয় তাকে مَهْر مُؤَجَّلْ বলা হয়। যেহেতু বিবাহের সময় مَهْر مُعَجَّلْ শোধ করা হয় তাই বিবাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে নগদ মহর দানে সে সক্ষম। সুতরাং সে দরিদ্র একথা গ্রহণ করা হবে না; বরং مَهْر مُعَجَّلْ না দেওয়ার কারণে তাকে আটক করা হবে; কিন্তু مَهْر مُؤَجَّلْ বিবাহের সময় দেওয়ার শর্ত না থাকার কারণে مَهْر مُؤَجَّلْ -এর কারণে স্বামীকে আটক করা হবে না।

قَالَ : وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ إِذَا قَالَ : إِنِّىْ فَقِيْرٌ، إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ غَرِيْمُهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَيَحْبِسُهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ دَلَالَةُ الْيَسَارِ فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَ عَلَى الْمُدَّعِىْ إِثْبَاتُ غِنَاهُ، وَيُرْوٰى أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِىْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعُسْرَةُ، وَيُرْوٰى أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ إِلَّا فِيْمَا بَدَلُهُ مَالٌ، وَفِى النَّفَقَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَفِىْ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ الْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উল্লিখিত ঋণ ব্যতীত বিচারক বিবাদীকে আটক করবেন না। যখন সে বলবে, আমি দরিদ্র। তবে যদি তার পাওনাদার প্রমাণ করতে পারে যে, তার সম্পদ আছে, তখন তাকে আটক করবে। কেননা [অন্য ঋণের ক্ষেত্রে] সামর্থ্যবান হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যার দায়িত্বে ঋণ রয়েছে। আর বাদীর কর্তব্য হচ্ছে বিবাদীর সচ্ছলতা প্রমাণ করা। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় ঋণগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ [মানুষের] অসচ্ছলতাই হলো মূল অবস্থা। এও বর্ণিত আছে যে, মালের বিনিময়ে গৃহীত ঋণ ছাড়া অন্য সব ঋণের ক্ষেত্রে দেনাদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। স্ত্রীর খোরপোশের ব্যাপারে স্বামীর অসচ্ছল হওয়ার দাবিই গ্রহণযোগ্য। অংশীদারিত্বের গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে আজাদকারীর কথা ধর্তব্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوٰى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আটক করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের ইবারতে মূলনীতি আকারে বলা হয়েছিল কি কি কারণে বা কোন কোন ঋণের ক্ষেত্রে গ্রেফতার করা যাবে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, মাল গ্রহণের বিনিময়ে যে ঋণ করা হয় এবং চুক্তির মাধ্যমে যে ঋণ নিজের জিম্মায় নেওয়া হয় তার কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত দু-অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবেন না। শর্ত হচ্ছে, যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি দরিদ্র, তবে যদি তার পাওনাদার প্রমাণ করতে পারে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সচ্ছল এবং তার কাছে ঋণ শোধ করার মতো মাল আছে তাহলে বিচারক ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে তাকে আটক করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে– এক ব্যক্তি কারো সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলল কিংবা কারো মাল আত্মসাৎ / ছিনতাই করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলল। আর এ কারণে উক্ত মালের জরিমানা প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হলো। এরপর পাওনাদার যখন তার পাওনা-জরিমানা চাইল তখন সে বলল, আমি তো অসচ্ছল। তাহলে বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উক্ত কথাকে গ্রহণ করবেন এবং তাকে গ্রেফতার করবেন না। কিন্তু যদি পাওনাদার দাবি করে যে, দেনাদার সচ্ছল এবং ঋণশোধ করার মতো সম্পদ তার কাছে আছে। এরপর সে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তার দাবিকে প্রমাণিত করে তাহলে বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আটক করবেন। মাসআলাটির দলিল হলো, যে পর্যন্ত পাওনাদারের পক্ষ থেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সচ্ছল হওয়া সংক্রান্ত কোনো দলিল না পাওয়া যাবে সে পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। তাছাড়া মানুষের মূল অবস্থা হলো দরিদ্র হওয়া, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সেই মূল অবস্থাকে ব্যক্ত করছে। সুতরাং তার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। হ্যাঁ, তবে যদি পাওনাদার সাক্ষী বা অন্যকোনো দলিলের

মাধ্যমে বিচারকের সামনে একথা প্রমাণ করতে পারে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আসলে সচ্ছল এবং তার পাওনা আদায়ে সক্ষম তাহলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সামর্থ্যবান হওয়া প্রমাণ হয়ে গেল। সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণশোধ করছে না তখন তার থেকে টালবাহানা পাওয়া গেল। টালবাহানার শাস্তি হচ্ছে বন্দী করা। অতএব বিচারক তাকে বন্দী করবেন।

যাখীরাহ (اَلذَّخِيْرَة) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরেকটি মাসআলা আলোচনা করেছে যে, যদি পাওনাদার এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি উভয়ে তাদের দাবির স্বপক্ষে দলিল-সাক্ষী পেশ করে তাহলে পাওনাদারের সাক্ষী ও দলিল অগ্রাধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَيُرْوٰى اَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِىْ جَمِيْعِ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, এ ব্যাপারে একটি ভিন্নমত বর্ণিত আছে- সর্বাবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ ঋণ মাল গ্রহণের বিনিময়ে হোক অথবা চুক্তির মাধ্যমে নিজের জিম্মায় নিয়েছে এমন হোক কিংবা অন্য কোনো উপায়ে হোক সব অবস্থাতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য। এর দলিল হিসেবে একথা বলা হয় যে, মানুষের দরিদ্র হওয়া মূল অবস্থা। এর কারণ মানুষ কপর্দকশূন্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বলে আমি দরিদ্র অসচ্ছল'– তাহলে তো সে মূল অবস্থার বর্ণনা করছে। আর পাওনাদারের কথা তার [দেনাদারের] কাছে মাল আছে বা সে সচ্ছল হচ্ছে মূল অবস্থার বিপরীত। আর নিয়মানুযায়ী যার কথা মূল অবস্থার সাথে মিলে যায় তাকে বিবাদী (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) বলা হয়। আর যার কথা মূল অবস্থার বিপরীত হয় তাকে বাদী (مُدَّعِىْ) বলা হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় পাওনাদার হচ্ছে বাদী, আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হচ্ছে বিবাদী। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, বাদীর কাছে প্রমাণ না থাকলে বিবাদীর কথা শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তথা বিবাদীর বক্তব্য "আমি অসচ্ছল" শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি বাদী [পাওনাদার] দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সচ্ছল প্রমাণিত করতে পারে তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَيُرْوٰى اَنَّ الْقَوْلَ لَهُ اِلَّا فِيْمَا بَدَلُهُ مَالٌ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যার সারকথা হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ঋণ যদি কোনো মাল গ্রহণের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে এতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা দরিদ্র হওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া অন্য যে কোনো ঋণের ক্ষেত্রে তার দরিদ্র হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমনটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এ বর্ণনাটি ইমাম খাস্‌সাফ (র) থেকে বর্ণিত। আর তিনি এটিকে শায়খাইনের মত বলে ব্যক্ত করেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এর পূর্বের বর্ণনাটিকে ইমাম খাসসাফ (র.)-এর মত বলে উল্লেখ করেন।

স্ত্রীর খোরপোশ বা ভরণপোষণ প্রদানের ব্যাপারে যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেমন– স্ত্রী দাবি করে যে, তার স্বামী সচ্ছল। সুতরাং স্বামী তাকে সচ্ছল ব্যক্তির খোরপোশ দিতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর বক্তব্য হচ্ছে সে দরিদ্র ও অসচ্ছল। অতএব তার উপর দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তির ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে? লেখক বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণীয় হবে। কারণ স্বামী মূল অবস্থার দাবি করছে। আর স্ত্রী মূল অবস্থার বিপরীত দাবি করছে। যেহেতু স্ত্রীর কাছে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই তাই স্বামীর কথাই শপথ সহকারে গ্রহণীয় হবে। হ্যাঁ, যদি স্বামীর সচ্ছল হওয়ার বিষয়টি স্ত্রী দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্বামীকে সচ্ছল ব্যক্তির মতো খোরপোশ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ اِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ الخ : এরপর হিদায়ার লেখক وَفِىْ اِعْتَاقِ الْعَبْدِ বলে আরেকটি মাসআলার আলোচনা শুরু করেন। كِتَابُ الْعِتَاقِ -এর মধ্যে মাসআলাটি এভাবে রয়েছে যে, একটি ক্রীতদাসে দুজনের মালিকানা রয়েছে। দুজনের একজন তার অংশটুকু আজাদ করে নিজের অসচ্ছলতার দাবি করে [যাতে তাকে তার অংশীদারের অংশের ক্ষতিপূরণ না দিতে হয়]; কিন্তু তার অংশীদারের দাবি হচ্ছে তার অংশীদার [আজাদকারী] সচ্ছল। সুতরাং সে আমাকে আমার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে। এমতাবস্থায় আজাদকারী ব্যক্তির দাবি– "সে অসচ্ছল" গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তার দাবিটি মূল অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে যদি তার অংশীদার দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, আজাদকারী সচ্ছল এবং তার ক্ষতিপূরণ দিতে সে সক্ষম তাহলে অংশীদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং আজাদকারীর উপর তার অংশীদারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে।

وَالْمَسْأَلَتَانِ تُؤَيِّدَانِ الْقَوْلَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ، وَالتَّخْرِيجُ عَلٰى مَا قَالَ فِى الْكِتَابِ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مُطْلَقٍ، بَلْ هُوَ صِلَةٌ حَتّٰى تَسْقُطَ النَّفَقَةُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْاِتِّفَاقِ، وَكَذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ضَمَانُ الْاِعْتَاقِ، ثُمَّ فِيْمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعِىْ : اِنَّ لَهُ مَالًا اَوْ ثَبَتَ ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فِيْمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ يَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ فَالْحَبْسُ لِظُهُوْرِ ظُلْمِهِ فِى الْحَالِ، وَاِنَّمَا يَحْبِسُهُ مُدَّةً لِيُظْهِرَ مَالَهُ لَوْ كَانَ يُخْفِيْهِ، فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ تُمْتَدَّ الْمُدَّةُ لِيُفِيْدَ هٰذِهِ الْفَائِدَةَ، فَقُدِّرَ بِمَا ذُكِرَهُ، وَيُرْوٰى غَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ التَّقْدِيْرِ بِشَهْرٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ اِلٰى سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ التَّقْدِيْرَ مُفَوَّضٌ اِلٰى رَأْيِ الْقَاضِىْ لِاِخْتِلَافِ اَحْوَالِ الْاَشْخَاصِ فِيْهِ ـ

অনুবাদ : এ দুটি মাসআলা শেষোক্ত মতামতদ্বয়কে সমর্থন করে। আর কিতাবে বর্ণিত বক্তব্যের আলোকে মাসআলাদ্বয়ের ব্যাখ্যা এই যে, এটা পরিপূর্ণ ঋণ নয়; বরং এটা সৌজন্য দান, আর এজন্যই তো মৃত্যু দ্বারা সবার ঐকমত্যে খোরপোশ বাতিল হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এরূপভাবে আজাদ করার ক্ষতিপূরণও পরিপূর্ণ ঋণ নয়। অতঃপর যেসব ক্ষেত্রে বাদীর দাবি গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে যে, বিবাদীর সামর্থ্য আছে অথবা যেসব ক্ষেত্রে বিবাদীর কথাই চূড়ান্ত- তাতে যদি [বাদীর] দলিল-প্রমাণ দ্বারা বিবাদীর সচ্ছলতা থাকা প্রমাণ হয় তাহলে বিচারক ঋণগ্রহীতাকে দু-তিন মাস বন্দী করে রাখবেন। তারপর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। তার আটককরণের কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিককালে তার জুলুম প্রকাশ পাওয়া। এক মেয়াদ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করে রাখবে যাতে সে যদি মাল লুকিয়ে রাখে তা প্রকাশ করবে। সুতরাং একটা মেয়াদ নির্ধারণ করা উচিত যাতে উক্ত সুফল পাওয়া যায়। আর তাই উল্লিখিত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও এক মাস ও চার-ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করার বিষয়টি বর্ণিত আছে। বিশুদ্ধ মত এই যে, মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর অর্পিত হবে। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَتَانِ تُؤَيِّدَانِ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, এ দুটি মাসআলা অর্থাৎ খোরপোশের মাসআলা ও অংশীদারি ক্রীতদাস আজাদ করার মাসআলা কিতাবে বর্ণিত শেষ দু'টি মতকে সমর্থন করছে এবং শক্তি যোগাচ্ছে। শেষোক্ত দুটি মতের প্রথমটি হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মালের বিনিময়ে যে ঋণগ্রহণ করেছে সেটি ছাড়া অন্য সব ঋণের ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য।

মাসআলা দুটি কিতাবে উল্লিখিত প্রথম মতটির বিপরীত। কারণ জিম্মায় নেওয়া ঋণ ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কথা দরিদ্র হওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রে পাওনাদারের কথা [তথা ঋণগ্রস্তরা সচ্ছল] গ্রহণযোগ্য। মাসআলা দুটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, মাসআলা দুটি কিতাবে বর্ণিত প্রথম মতটির বিপরীত। কেননা প্রথম মাসআলায় স্বামী বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে নিজ জিম্মায় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, আর দ্বিতীয় মাসআলায় এক অংশীদার আজাদ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথম মাসআলায় বিবাহ চুক্তি করা আর দ্বিতীয় মাসআলায় আজাদ করা উভয়ই তাদের সচ্ছলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এতদসত্ত্বেও দরিদ্র ও অসচ্ছল হওয়ার ব্যাপারে স্বামী ও আজাদকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য। অথচ এ দুটি মাসআলা যদি প্রথমোক্ত মত [ইমাম কুদূরীর ইবারতে যা রয়েছে] অনুযায়ী হতো তাহলে সচ্ছল হওয়ার দাবির ক্ষেত্রে স্ত্রী ও আজাদকারীর অংশীদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হতো। অতএব বুঝা গেল মাসআলা দুটি প্রথম মতের বিপরীত এবং শেষোক্ত মতদ্বয়ের অনুযায়ী হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالتَّخْرِيْجُ عَلٰى مَا قَالَ فِى الْكِتَابِ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা দুটির ব্যাখ্যা এমন পদ্ধতিতে পেশ করেছেন যার দ্বারা মাসআলার ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে প্রথম মতের প্রতি কোনো কটাক্ষ বা আপত্তি তোলা হচ্ছে না।

লেখকের ব্যাখ্যানুযায়ী মাসআলা দুটি প্রথম মতের বিপরীতও থাকছে না। তিনি বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর ইবারতে যে ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে دَيْنٌ مُطْلَقٌ বা পূর্ণাঙ্গ ঋণ।

دَيْنٌ مُطْلَقٌ -কে دَيْنٌ صَحِيْحٌ বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ ঋণ বা دَيْنٌ صَحِيْحٌ বলা হয় এমন ঋণকে যা থেকে মুক্ত হওয়া যায় দুভাবে– ১. যদি ঋণ শোধ করা হয় ২. পাওনাদার যদি ঋণ মওকুফ করে দেয়। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারতে বর্ণিত ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ঋণ, আর পরবর্তীতে উল্লিখিত দু'টি ঋণ যথা প্রথম মাসআলার খোরপোশ পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়; বরং স্বামীর পক্ষ থেকে সৌজন্য দান। এজন্যই স্বামীর মৃত্যুর দ্বারা সকলের ঐকমত্যে খোরপোশ রহিত হয়ে যায়। তদ্রূপ দ্বিতীয় মাসআলায় শরিকানা গোলামের মুক্ত করার জরিমানা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়। সুতরাং যেহেতু ইমাম কুদূরী (র.), বর্ণিত প্রথম মতটিতে ঋণ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ঋণ বুঝানো হয়েছে। আর পরবর্তীতে উল্লিখিত মাসআলা দুটির ঋণ পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়, তাই এ দুটি মাসআলা প্রথম মতের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। সুতরাং এ দুটি মাসআলা দ্বারা প্রথম মতের উপর আপত্তি তোলা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, পূর্ণাঙ্গ ঋণ বলা হয় এমন ঋণকে যা পরিশোধ অথবা পাওনাদারের ঋণ মওকুফ করার দ্বারা রহিত হয়, সেহেতু খোরপোশ মৃত্যুর দ্বারা রহিত হয় এবং আজাদ করার ক্ষতিপূরণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক অংশীদারের মুমূর্ষ অবস্থায় আজাদ করার দ্বারা রহিত হয় তাই এগুলো পূর্ণাঙ্গ ঋণ নয়। যদি পূর্ণাঙ্গ ঋণ হতো তাহলে তা কোনোভাবেই রহিত হতো না। এরপর লেখক বলেন, যে অবস্থায় বিবাদীর ব্যাপারে বাদীর কথা যে, "সে সচ্ছল" গ্রহণযোগ্য হয় অথবা যে অবস্থায় বিবাদীর কথা "আমি দরিদ্র" বাদীর দলিল-প্রমাণ দ্বারা তার মালদার হওয়া প্রমাণিত হয়- উভয় অবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দু-তিন মাস সময়কাল আটক করে রাখবে, তারপর প্রতিবেশী এবং তার নিকটজনকে জিজ্ঞাসা করবে এবং জানতে চাইবে যে, ঋণগ্রস্ত কয়েদি সচ্ছল নাকি অসচ্ছল? উল্লেখ্য যে, দু'তিন মাস মেয়াদের আটককরণের অভিমতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এটি রেওয়ায়াত করেন, যা কিতাবুল হাওয়ালা ও কাফালাহ -এ বর্ণিত আছে।

উক্ত বন্দীকরণের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, টালবাহানা করার কারণে সাম্প্রতিককালে তার থেকে জুলুম প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু জুলুমের সাজা আটককরণ তাই বিচারক তাকে আটক করবেন। দু-তিন মাসের মেয়াদ নির্ধারণ করার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, যাতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোথাও মালামাল লুকিয়ে রাখলে তা প্রকাশ করে দেয়। দু-তিন মাসের আটকাদেশ যদিও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়; কিন্তু তা দেওয়ার কারণ হচ্ছে মাল গোপন করে রাখলে তা যেন প্রকাশ করে দেয়।

আটকাদেশের মেয়াদ সম্পর্কে আরো দুটি মত রয়েছে। যথা–

১. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আটকাদেশের মেয়াদ চার থেকে ছয় মাস হতে পারে। চার মাসের মেয়াদটি ঈলা -এর মেয়াদের উপর কিয়াস করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, আটকাদেশের মেয়াদ একমাস। লেখক বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে আটকাদেশের মেয়াদ বিচারকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। এটি শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.)-এর অভিমত। তিনি আদাবুল কাযী অধ্যায়ে বলেন– لَيْسَ فِيْهِ مُضِيٌّ وَقْتٍ مُقَدَّرٍ بَلِ الْاَمْرُ مُفَوَّضٌ اِلٰى رَأْيِ الْقَاضِىْ

অর্থাৎ "এর কোনো নির্ধারিত সময় নেই; বরং বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর নির্ভর করবে।" যেমন– চারমাস অতিক্রম করার পরও ঋণশোধ না করার কারণে আটকে রাখতে পারবে, আবার দু'মাস / একমাস বা তারচেয়ে কম সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি দেখা যায় আসলে মাল প্রদানে অক্ষম তাহলে তাকে জেলখানা থেকে খালাস করে দেবে।

লেখক বলেন, বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়ার কারণ হলো– মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের। কেউ অল্পদিন বন্দিত্ব বরণ করার দ্বারা বাধ্যগত হয়ে যায়, আবার কেউ বহুদিন কারাবাসের পরও সঠিক পথে আসে না। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এরূপ মত পোষণ করেন।

فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ، يَعْنِي بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، لِأَنَّهُ اِسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَيَكُونُ حَبْسُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظُلْمًا، وَلَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِفْلَاسِهِ قَبْلَ الْمُدَّةِ تُقْبَلُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُقْبَلُ وَعَلَى الثَّانِيَةِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ (رح) قَالَ فِي الْكِتَابِ : خَلَّى سَبِيلَهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ وَهٰذَا كَلَامٌ فِي الْمُلَازَمَةِ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، رَجُلٌ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِدَيْنٍ، فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَبَّدَ حَبْسَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خَلَّى سَبِيلَهُ، وَمُرَادُهُ إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَوْ عِنْدَهُ مَرَّةً فَظَهَرَتْ مُمَاطَلَتُهُ، وَالْحَبْسُ أَوَّلًا وَمُدَّتُهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ فَلَا نُعِيدُهُ .

অনুবাদ : আর যদি তার কোনো সম্পদের সন্ধান না মিলে তাহলে তাকে রেহাই দেবেন। অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। কেননা সে সচ্ছলতা লাভের সুযোগের হকদার। সুতরাং এরপর তাকে কারা বন্দী করে রাখা জুলুম। আর যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তার অসচ্ছলতার দলিল প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে এক বর্ণনানুসারে তার দলিল গ্রহণ করা হবে, অন্য বর্ণনা মতে গ্রহণ করা হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মাশায়েখ দ্বিতীয় বর্ণনাটির পক্ষে রয়েছেন। লেখক বলেন, মূল কিতাবে যা বলা হয়েছে তাকে রেহাই দেবেন এবং তার ও তার পাওনাদারদের মাঝে বিচারক বাধা হবেন না। এটা মুলাযামাত সংক্রান্ত আলোচনা। 'হাজার অধ্যায়ে' এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আল জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বিচারকের সামনে ঋণের স্বীকারোক্তি করল তাহলে বিচারক তাকে গ্রেফতার করবেন, তারপর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি সে সচ্ছল হয় তাহলে তাকে স্থায়ীভাবে বন্দী করবেন। আর যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে তাকে মুক্ত করে দেবেন। এ মাসআলার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকটি বিচারক ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বীকারোক্তি করেছে অথবা বিচারকের কাছে একবার স্বীকারোক্তি করেছে, তারপর তার টালবাহানা প্রকাশ পেয়েছে। বন্দী করার প্রাথমিক অবস্থা এবং আটকাদেশের মেয়াদের কথা আমরা আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে আসামিদের বন্দী থাকাকালীন সময়ে কোন সুরতে তাদের রেহাই দেওয়া যাবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, বন্দীকালীন সময় যদি উত্তীর্ণ হয় আর বিবাদীর সচ্ছল না হওয়া এবং মাল না থাকা প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারক তাকে ছেড়ে দেবেন আটকে রাখবেন না। কারণ মাল না থাকার দ্বারা তার দরিদ্র হওয়া প্রমাণিত হয়েছে, তাই তাকে সচ্ছল ও ধনী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ লাভ তার অধিকার, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ অর্থাৎ "যদি [ঋণগ্রহীতা] দরিদ্র হয় তাহলে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।" –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮০] যেহেতু উক্ত ব্যক্তি সুযোগ পাওয়ার উপযুক্ত, সুতরাং তাকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জেলে বন্দী করে রাখা মূলত তার প্রতি অবিচার করা। অতএব যাতে তার প্রতি জুলুম না করা হয় এজন্য বিচারক তাকে মুক্ত করে দেবেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِفْلَاسِهِ الخ : যদি এমন হয় যে, বন্দীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তার অসচ্ছলতা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। এর প্রমাণ এভাবে হতে পারে যেমন– একজন অথবা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এসে বিচারকের কাছে সাক্ষ্য দিল যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে যাচাই করে দেখেছি যে, উক্ত কয়েদি প্রকৃতই দরিদ্র, এমনকি তার পরনের কাপড়টি ছাড়া তার অন্য কোনো মালামাল নেই। তাদের বর্ণিত সাক্ষ্য বা প্রমাণ গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রথম মতটি হচ্ছে, বিচারক তাদের সাক্ষ্য বা তার পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করে নেবেন এবং সে মোতাবেক বন্দীকে মুক্ত করে দিবেন। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত। আরেকটি মত হচ্ছে, তাদের

সাক্ষ্য বিচারক গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ বন্দীকে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ছাড়বেন না। ইমাম মালেক (র.) দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করেছেন। লেখক বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মাশায়েখ দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। সদরুশ শহীদ (র.) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, এ মতটিই [দ্বিতীয় মতটি] বিশুদ্ধ মত। যাখীরাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করার পূর্বেই তার অসচ্ছল হওয়ার ব্যাপারে একজন অথবা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সংবাদ দেয় কিংবা দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী তাকে বন্দী করবেন না। ফাযালী (র.) এ মতের উপর ফতোয়া দেন। পক্ষান্তরে বুখারা ও সামারকান্দের অধিকাংশ ফকীহ বলেন, তাদের কথা বা প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য, যে মাসআলার উপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে যে, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বন্দীর দরিদ্রতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না সেটি হচ্ছে তাদের [দরিদ্রতার পক্ষের] সাক্ষ্যটি মূলত না থাকার দলিল। কারণ তাদের সাক্ষ্য একথাই প্রমাণ করছে যে, বন্দীর মালামাল নেই। আর নিয়ম হচ্ছে কোনো বিষয়ের নেতিবাচকতা প্রমাণের দলিল গ্রহণ করা হয় না। আর এজন্য দরিদ্রতার ব্যাপারে যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি উক্ত নেতিবাচকতার বিষয়টি কোনো কিছুর দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সমর্থনপুষ্ট হওয়ার কারণে দরিদ্রতার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হয়। সেখানে বাহ্যিক অবস্থা নেতিবাচকতাকেই সমর্থন করে। কারণ বাহ্যিক অবস্থার দাবিতো এই যে, যদি তার সম্পদ থাকত তাহলে সে জেলের কষ্ট ও অপমান ভোগ করত না।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে লেখক উপরিউক্ত আলোচনার সাথে আরেকটি আলোচনার অবতারণা করেছেন, সেটি হচ্ছে কয়েদির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিচারক তাকে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কিনা? এর উত্তর হচ্ছে, বিচারক সর্তকতার উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন "তোমার প্রকৃতই মাল আছে কিনা?" যদি জিজ্ঞাসা না করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, যদি তার সম্পদ থাকত তাহলে তো সে অবশ্যই দিত তাহলেও তাকে জিজ্ঞাসা না করে মুক্ত করে দেওয়া ওয়াজিব, যদি বাদী পুনরায় সচ্ছলতার দলিল পেশ না করে। এ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে লেখকের ইবারত فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ -এর মধ্যে।

قَوْلُهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ خَلَّى سَبِيْلَهُ الخ : লেখক বলেন, خَلَّى سَبِيْلَهُ কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে সম্পদ না থাকে তাহলে বিচারক তাকে বন্দীমুক্ত করে দেবেন এবং বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও ঋণদাতার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকরূপে থাকবেন না। লেখক বলেন, বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করার পর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে লোক লাগিয়ে রাখার নিষেধাজ্ঞা / বৈধতা সংক্রান্ত মাসআলা মুলাযামা (اَلْمُلَازَمَةُ) সংক্রান্ত বিষয়, যা আমরা হাজার অধ্যায় (كِتَابُ الْحَجْرِ) -এ আলোচনা করব। সেখানে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে যে, পাওনাদার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে লেগে থাকবে কিনা?

আল জামিউস সাগীর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি বিচারকের কাছে ঋণের স্বীকারোক্তি করে তাহলে বিচারক তাকে [প্রথমেই] গ্রেফতার করবেন, তারপর তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। অর্থাৎ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করবেন, প্রয়োজনে তার সমপেশাজীবীদের জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে সচ্ছল ও অর্থশালী কিনা ? যদি জিজ্ঞাসাবাদে প্রমাণ হয় যে, সে সচ্ছল ও ঋণ পরিশোধে সক্ষম তাহলে বিচারক তার আটকাদেশ বহাল রাখবেন। পক্ষান্তরে যদি খোঁজখবর নেওয়ার পর জানা যায় যে, উক্ত ব্যক্তি অসচ্ছল তাহলে তাকে খালাস করে দেবেন।

উল্লেখ্য যে, বাহ্যত আল জামিউস সাগীরের ইবারত ইমাম কুদূরীর ইবারতের সাথে সংঘাতপূর্ণ। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত ছিল এরূপ যে, إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالْإِقْرَارِ لَا يَحْبِسُهُ فِيْ أَوَّلِ الْوَهْلَةِ, অর্থাৎ যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঋণ প্রমাণ হয় তাহলে বিচারক তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করবেন না, অথচ আল-জামিউস সাগীরের ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, সাথে সাথেই গ্রেফতার করবে। উক্ত দুই ইবারতের আপাত বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে লেখক আল-জামিউস সাগীরের ইবারতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদানকারী প্রথমে বিচারক ছাড়া অন্য ব্যক্তির কাছে স্বীকারোক্তি করেছে; কিন্তু তারপরে ঋণ শোধ করেনি। পরে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। অথবা প্রথমে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে; কিন্তু ঋণ শোধ করেনি। পরে যখন বাদী বিষয়টি বিচারকের এজলাসে নিয়ে গেছে এবং বিচারক যখন তাকে উপস্থিত করেছে তখন পুনরায় স্বীকারোক্তি করেছে। লেখকের উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, স্বীকারোক্তি প্রদানকারী থেকে টালবাহানা প্রকাশ পেয়েছে। এরপর বিচারক তাকে [দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির পর] গ্রেফতার করেছেন। লেখকের উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.) ও জামিউস সাগীরের ইবারতে যে বিরোধ ছিল তারও নিরসন হয়ে গেছে।

এরপর লেখক বলেন, জামিউস সাগীরের বর্ণনানুযায়ী প্রথমেই বন্দী করবে অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বে বন্দী করবে, তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবে "বন্দী করার পর জিজ্ঞাসাবাদ" এ সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উল্লেখ করেছি, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত ছিল এরূপ- يَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ এ ইবারতে বন্দী করার মেয়াদ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আর এজন্যই আমরা এখানে এ বিষয়টির বর্ণনা পুনরাবৃত্তি করিনি।

قَالَ : وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِىْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهٖ، لِاَنَّهٗ ظَالِمٌ بِالْاِمْتِنَاعِ، وَلَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِىْ دَيْنِ وَلَدِهٖ، لِاَنَّهٗ نَوْعُ عُقُوْبَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ، اِلَّا اِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْاِنْفَاقِ عَلَيْهِ، لِاَنَّ فِيْهِ اِحْيَاءً لِوَلَدِهٖ، وَلِاَنَّهٗ لَا يَتَدَارَكُ لِسُقُوْطِهَا بِمُضِىِّ الزَّمَانِ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্ত্রীর খোরপোশের ব্যাপারে স্বামীকে আটক করা হবে। কেননা সে খোরপোশ বন্ধ করার মাধ্যমে অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়েছে। সন্তানের ঋণের কারণে পিতাকে গ্রেফতার করা হবে না। কেননা এটা একপ্রকারের শাস্তি। আর ছেলের পক্ষে পিতার জন্য এমন শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার নেই। যেমন– হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে। তবে যদি পিতা সন্তানের খরচ দানে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা খরচ করার উপর ছেলের জীবন নির্ভরশীল। তাছাড়া এর ক্ষতিপূরণ করাও সম্ভব নয়। কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ভরণপোষণ রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِىْ نَفَقَةِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণ বন্ধ করা এবং এর সাজাস্বরূপ স্বামীকে আটক করা সংক্রান্ত মাসাআলার আলোচনা করেছেন। মাসআলার স্বরূপ হলো, যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো ভরণপোষণের ব্যাপারে একমত হয় বা বিচারক কর্তৃক স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তারপর স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ বন্ধ করে দেয় বা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আর সে পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী আদালতে বিচারকের কাছে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে যে, আমার স্বামী আমাকে ভরণপোষণ দিচ্ছে না বা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তাহলে বিচারক উক্ত স্বামীকে আটক করবেন। কারণ স্ত্রীর ভরণপোষণ না দেওয়ার কারণে স্বামীর অত্যাচার-অবিচার করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর অত্যাচার ও অবিচারের সাজা হচ্ছে বন্দী করা। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর অভিযোগ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তার ভরণপোষণ নির্ধারণ হওয়ার পর একাধিক সময় সে তার ভরণপোষণ না পায়। ভরণপোষণ নির্ধারণ হওয়া মাত্রই যদি অভিযোগ করা হয় তাহলে সেই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। উক্ত অভিযোগ সামান্য পরিমাণ ভরণপোষণের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهٗ وَلَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ فِىْ دَيْنِ الخ : এরপর লেখক বলেন, ছেলের ঋণের কারণে তার পিতাকে আটক করা হবে না। অর্থাৎ যদি সন্তান তার পিতার কাছে টাকা পায়, আর পিতা সেই টাকা পরিশোধে গড়িমসি করে তাহলে বিচারক পিতাকে গ্রেফতার করবেন না। কারণ বন্দী করা এক ধরনের শাস্তি, আর সন্তানের জন্য পিতাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। যেমন– হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নেই। অর্থাৎ যদি কোনো পিতা সন্তানকে হত্যা করে কিংবা সন্তানের বাঁদির সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে সন্তান হত্যার কিসাসরূপে পিতাকে হত্যা করা হবে না এবং ব্যাভিচারের শাস্তিরূপে তার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে না। হুদূদ ও কিসাসের উপর কিয়াস করে পিতা ঋণশোধ না করলে পিতাকে গ্রেফতার করা হবে না। কারণ সন্তানের উপর পিতার অনেক হক রয়েছে যার বর্ণনা কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ অর্থাৎ "তাদের [পিতামাতা] -কে উফ বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; বরং তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত কথা বল, আর তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।" হাদীসে রাসূলে বর্ণিত আছে– পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ।

قَوْلُهٗ اِلَّا اِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْاِنْفَاقِ الخ : এরপর লেখক বলেন, যদি পিতা সন্তানের খরচ দানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে পিতাকে বিচারক গ্রেফতার করবেন। কারণ, পিতার প্রদত্ত খরচ লাভের উপর সন্তানের বেঁচে থাকা নির্ভরশীল। খরচ বন্ধ করার দ্বারা সন্তানকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। সুতরাং সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পিতাকে গ্রেফতার করা হবে। পিতার গ্রেফতারের পক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা অতীত দিনগুলোর ভরণপোষণ রহিত হয়ে যায়। এজন্য অতীতের ভরণপোষণের ক্ষতিপূরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ঋণ দিন অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা রহিত হয় না তাই সেগুলোর ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব। এ কারণে সন্তানের ভরণপোষণকে অন্যান্য ঋণের উপর কিয়াস করা যায় না। এজন্য অন্যান্য ঋণের কারণে বন্দী করা ও ভরণপোষণ না দেওয়ার কারণে বন্দী করা এক নয়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) যাখীরাহ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মুনিবের পাওনার কারণে গোলামকে বন্দী করা হবে না। তদ্রূপ গোলামের পাওনার কারণে মনিবকে গ্রেফতার করা হবে না। তবে মুকাতাবের মনিবকে তার পাওনার কারণে গ্রেফতার করা হবে, যদি কিতাবাতের ঋণ ও পাওনা একই শ্রেণিভুক্ত না হয়।

بَابُ كِتَابِ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ

পরিচ্ছেদ : বিচারকের কাছে বিচারকের পত্র প্রেরণ

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : বিচারকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে লেখক আলোচনা করেছেন। লেখক গ্রেফতার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের পর বিচারকের কাছে বিচারকের পত্র প্রেরণ -এর পরিচ্ছেদ আলোচনা করেছেন। এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক এরূপ যে, গ্রেফতার একজন বিচারকের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে; কিন্তু পত্র প্রেরণে দুজন বিচারকের প্রয়োজন। ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী একককে মুফরাদ আর একের অধিককে মুরাক্কাব বলা হয়। একক থেকে অধিকের জন্য হয় বলে একক আগে আসে আর অধিক বা মুরাক্কাব পরে আসে। সেমতে সেখানে এক বিচারকের প্রয়োজন অর্থাৎ গ্রেফতার প্রসঙ্গ সেটা মুফরাদ বলে আগে আনা হয়েছে। আর কমপক্ষে দুজন বিচারকের প্রয়োজন এমন পরিচ্ছেদ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ -কে পরে আনা হয়েছে কারণ এটা মুরাক্কাব।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে "কাযীর পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে" বলেন, এক বিচারকের চিঠির ভিত্তিতে অন্য বিচারকের রায় প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ পত্র প্রেরণ কিছুতেই অন্য বিচারকের মৌখিক/ সরাসরি জবানবন্দির/ সংবাদের চেয়ে বেশি কার্যকর নয়। অথচ আমরা দেখি এক শহরের বিচারক যদি অন্য শহরের বিচারকের কাছে একথা জানায় যে, আপনার শহরের অমুক [বর্তমান] অধিবাসীর জিম্মায়/ তার জন্য এত পরিমাণ হক এমন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যারা সরাসরি আমার সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং তাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণও করেছি। এত কিছু বলার পরও অন্য শহরের বিচারকের জন্য সংবাদদাতা বিচারকের কথামতো রায় প্রদান করা বৈধ নয়। এর কারণ হচ্ছে একজন বিচারকের ক্ষমতা তার এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় কার্যকর নয়। সেমতে তার বক্তব্য অন্য শহরের বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যেহেতু বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে চিঠিতো অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। কিন্তু এক বিচারকের পত্র মোতাবেক অন্যবিচারকের ফয়সালার বৈধতার ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমার কারণে তা যুক্তি বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আমলযোগ্য। তাছাড়া এরূপ পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। কারণ কখনো বাদীর পক্ষে বিবাদী ও সাক্ষীদের একত্রে জড়ো করা সম্ভব হয় না। যেমন– এক শহরে বিবাদী রয়েছে; কিন্তু সাক্ষীরা রয়েছে অন্য শহরে। এমতাবস্থায় বাদী যদি এরূপ করে যে, সাক্ষীদেরকে জড়ো করে বিচারকের নিকট সাক্ষী দেওয়ায় আর বলে যে, অমুক শহরে আমার বিবাদী রয়েছে আপনি আমাকে / আপনার প্রতিনিধিকে চিঠি দিয়ে অমুক শহরের বিচারকের কাছে প্রেরণ করুন। এরূপ পত্র গ্রহণের দ্বারা হকদারের হক লাভ করা / প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় বলে এর গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে।

এখানে কেউ কেউ এ আপত্তি করতে পারেন যে, একজনের লেখা ও সিল অন্যজনের লেখা ও সিলের সাথে মিলে যেতে পারে অথবা কোনো দুষ্কৃতকারী বিচারকের লেখা ও সিল নকল করতে পারে। ফলে গোটা বিষয়টা প্রতারণা বলে সাব্যস্ত হতে পারে। এর উত্তর হচ্ছে, এরূপ সম্ভাবনা থাকাটা স্বাভাবিক, তবে এরূপ সম্ভাবনা দূর করা যেতে পারে। প্রেরক বিচারক দুজন সাক্ষী তার পত্রের সাথে প্রেরণ করবে, যারা প্রাপক বিচারকের সামনে গিয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, এ পত্র অমুক বিচারক লিখেছেন এবং পত্রের মাঝে ও উপরে তারই সিল রয়েছে। সাক্ষীদের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব।

এক বিচারকের কাছে অন্য বিচারকের পত্র প্রেরণ এবং সে মোতাবেক ব্যয় প্রদানের বৈধতার ব্যাপারে দলিল হচ্ছে যাহহাক ইবনে সুফিয়ানের বর্ণনা– اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَتَبَ اِلَىَّ اَنْ اُوَرِّثَ اِمْرَأَةَ اَشْيَمَ الضَّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا হাদীসটির প্রেক্ষাপট এই যে, হযরত ওমর (রা.) একবার ফরমান জারি করেন যে, স্ত্রী তার স্বামীর দিয়তের থেকে উত্তরাধিকার লাভ করবে না। একথা যাহহাক ইবনে সুফিয়ানের কানে গেলে তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে উক্ত হাদীস জানান যে, [হাদীসটির অর্থ] "রাসূল ﷺ আমার কাছে এই মর্মে পত্র লিখেছেন, যেন আমি আশয়াম যিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়তের উত্তরাধিকারী করি।" উল্লেখ্য যে, আশয়াম যিবাবী (রা.) রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ভুলক্রমে হত্যার শিকার হন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিচারকের চিঠি কার্যকর। যদি তা না হতো তাহলে রাসূল ﷺ আশয়াম-এর স্ত্রীর ব্যাপারে যাহহাক ইবনে সুফিয়ানের কাছে পত্র প্রেরণ করতেন না। এ ব্যাপারে ইনায়া গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর মত উল্লেখ করা হয় যে, হযরত আলী (রা.) মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে পত্র প্রেরণকে বৈধতা দান করেন। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমাও বিদ্যমান। তবে হুদূদ ও কিসাসের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পত্র গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা এমন সব হকের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য, যেগুলোতে সামান্য সন্দেহ থাকলেও কার্যকর হয়ে যায়।

قَالَ : وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِيْ إِلَى الْقَاضِيْ فِي الْحُقُوْقِ إِذَا شُهِدَ بِهِ عِنْدَهُ لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، فَإِنْ شَهِدُوْا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ لِوُجُوْدِ الْحُجَّةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ، وَهُوَ الْمَدْعُوُّ سِجِلًّا، وَإِنْ شَهِدُوْا بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْخَصْمِ لَمْ يَحْكُمْ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوْزُ، وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ بِهَا وَهٰذَا هُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَهُوَ نَقْلُ الشَّهَادَةِ فِي الْحَقِيْقَةِ، وَيَخْتَصُّ بِشَرَائِطَ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الْحَاجَةِ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُوْدِهِ وَخَصْمِهِ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হকসমূহের ক্ষেত্রে বিচারকের কাছে অন্য বিচারকের প্রেরিত পত্র গ্রহণ করা হবে, যখন লিখিত পত্রের ব্যাপারে প্রাপক বিচারকের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া হবে। পত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে, যা আমরা পরে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। যদি সাক্ষীগণ প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে [পত্র প্রেরক] বিচারক সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে। আর উক্ত রায় সেই পত্রে লিপিবদ্ধ করবেন, এই পত্রকে সিজিল বলা হয়। আর যদি সাক্ষীগণ বিবাদীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বিচারক [বিচারের] রায় প্রদান করবেন না। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান অবৈধ। তবে বিচারক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করবেন যাতে প্রাপক বিচারক সেমতে রায় প্রদান করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে কিতাবুল হুকমী [সাক্ষীপত্র]। এটা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য স্থানান্তর করা। এটা শর্তাদির সাথে খাস, যা আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এর বৈধতা প্রয়োজনের কারণে। কেননা বাদীর পক্ষে কখনো কখনো সাক্ষী ও বিবাদীকে একত্রে জড়ো করা অসম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং এটা সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্যদানের মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِيْ الخ : উক্ত ইবারতে এক বিচারকের কাছে অন্য বিচারকের প্রেরিত পত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা এবং সেই পত্রের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হকসমূহের ক্ষেত্রে এক বিচারকের নামে লেখা অন্য বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য। এখানে হকসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন হক যা সামান্য সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রমাণিত হয়। সুতরাং হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে উক্ত পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবে এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে কমপক্ষে দুজন সাক্ষী প্রাপক বিচারকের সামনে প্রেরক বিচারক সম্পর্কে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, এ পত্রটি অমুক বিচারকের লেখা এবং চিঠির উপর মহরাঙ্কিত সিল [স্বাক্ষর ও সিল]-ও উক্ত বিচারকেরই।

এরপর হিদায়ার লেখক বিচারকের চিঠির প্রকারভেদ উল্লেখ করেন। চিঠি দু প্রকার– ১. سِجِلٌّ [হুকুমনামা] ২. اَلْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ [সাক্ষীনামা]। প্রথম প্রকারের চিঠির ব্যাখ্যা হলো, সাক্ষীরা যদি বিচারক ও বিবাদীর সামনে বিবাদীর [প্রতিপক্ষের] বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন এবং উক্ত রায় সাক্ষীদের বিবরণসহ লিখে রাখবেন। কেননা শরিয়তসম্মত প্রমাণ পাওয়ার কারণে বিচারকের উপর রায় প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায়। বিচারকের উক্ত লিখিত পত্রকে سِجِلٌّ [হুকুমনামা] বলা হয়। বিচারক এ ধরনের লিখিত সিজিল প্রেরণ করতে পারেন। এখানে অবশ্য একটি

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, যখন সাক্ষীরা বিবাদীর সামনে সাক্ষ্য দিল এবং যে মোতাবেক বিচারক রায়ও প্রদান করলেন তাহলে উক্ত লিখিত রায় অন্য বিচারকের কাছে প্রেরণের অর্থ কি ? এর উত্তর হচ্ছে কোনো কোনো পরিস্থিতি এরূপ লিখিত হুকুমনামা প্রেরণের দাবি করে। যেমন– বিচারক বিবাদীর বিপক্ষে রায় প্রদান করেছে কিন্তু কার্যকর করেনি বা কোনো আইনী জটিলতায় তা কার্যকর করতে পারেনি। ইতোমধ্যে বিবাদী [আসামি] অন্য শহরে চলে গেল; যা রায় প্রদানকারী বিচারকের আওতাধীন নয়। তখন রায় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অন্য বিচারকের কাছে 'সিজিল' প্রেরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই এ প্রকারের পত্রও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় প্রকারের পত্রের বর্ণনা হলো, সাক্ষীগণ বিবাদীর [প্রতিপক্ষের] অনুপস্থিতিতে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিল। তাহলে বিচারক রায় প্রদান করবেন না। কেননা প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করা আমাদের [হানাফী মাযহাব] মতে অবৈধ। বিচারক উক্ত সাক্ষ্য তার নথিপত্রে লিখে রাখবেন। তার উক্ত লিখিত [সাক্ষীগণের সাক্ষ্য] পত্রকে كِتَابِ حُكْمِيٌّ বা সাক্ষীনামা বলা হয়। সে উক্ত কিতাবে হুকমী অন্য বিচারকের কাছে প্রেরণ করবে যাতে সে রায় প্রদান করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, خَصْم [প্রতিপক্ষ] শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বিবাদী অথবা তার উকিল অথবা বিচারক নিযুক্ত বিবাদীর পক্ষে যুক্তিতর্ককারী [উকিল] সবই উদ্দেশ্য। সুতরাং قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদানের অর্থ হচ্ছে বিবাদী, তার উকিল ও বিচারক নিযুক্ত বিবাদীর পক্ষের যুক্তিতর্ক প্রদানকারী সকলের অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করা। এ তিনজনের যে কোনো একজন থাকলে সেটাকে قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ বলা হবে না। অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের বিপক্ষে রায় প্রদান আমাদের মাযহাবে নাজায়েজ। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বৈধ। দ্বিতীয় প্রকারের লিখিত পত্র [কিতাবে হুকমী] মূলত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য স্থানান্তর করা এটা কোনো হুকুমনামা বা অনিবার্য বিষয় নয়। এজন্য প্রথম বিচারকের পক্ষে সেটাকে প্রেরণের পূর্বে বাতিল করা বৈধ, তদ্রূপ দ্বিতীয় বিচারকের জন্য এই পত্র অনুযায়ী রায় প্রদানের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তার রায়ের অনুযায়ী হলে তা কার্যকর করতে হবে।

কিতাবে হুকমী [সাক্ষীনামা] ও সিজিল [হুকুমনামা] -এর মাঝে পার্থক্য হলো, সিজিল যখন প্রাপক বিচারকের কাছে পৌছবে তখন সে উক্ত সিজিলের রায়কে কার্যকর করবে, চাই সে রায় তার রায়ের সাথে মিলে যাক অথবা তার রায়ের বা মতের বিপরীত হোক। উল্লেখ্য যে, সিজিলের মধ্যে বিচারের রায় থাকা আবশ্যক বা রায় থাকলেই সেটাকে সিজিল বলা হয়। অতএব, তা যখন দ্বিতীয় বিচারকের কাছে পৌছবে রায়সহ পৌছবে। সুতরাং সে রায়কে প্রাপক বিচারকের কার্যকর করতে হবে। পক্ষান্তরে কিতাবে হুকমী [সাক্ষীনামা] -এর মাঝে যে রায়ের প্রতি ইঙ্গিত থাকে দ্বিতীয় বিচারকের রায় যদি উক্ত ইঙ্গিতের সাথে মিলে যায় তাহলে বিচারক সেটাকে কার্যকর করবেন না। প্রথম বিচারকের জন্য যেমন সাক্ষীদের সাক্ষ্য রায় প্রদান করার বা না করার অধিকার রয়েছে তদ্রূপ দ্বিতীয় [প্রাপক] বিচারকের জন্যও চিঠিতে উল্লিখিত সাক্ষ্য মোতাবেক রায় প্রদান করার / না করার অধিকার রয়েছে। এরপর লেখক বলেন, এক বিচারক অন্য বিচারকের কাছে পত্র প্রেরণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত রয়েছে- যা আমরা সামনে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। সেই শর্তগুলো কি কি ? এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। মূলত পাঁচটি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া জরুরি। বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার লেখক আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, যাখীরাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে– ১. পত্র প্রেরণকারী বিচারক পরিচিত হওয়া ২. প্রাপক বিচারক পরিচিত হওয়া। ৩. বাদী পরিচিত হওয়া ৪. বিবাদী পরিচিত হওয়া ও ৫. দাবিকৃত বিষয়টি জ্ঞাত হওয়া। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

قَوْلُهُ وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الْحَاجَةِ الخ : লেখক বলেন, এক বিচারকের কাছে অন্য বিচারকের পত্র প্রেরণের বৈধতার দলিল হচ্ছে মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন। অর্থাৎ মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ বৈধ করা হয়েছে। কেননা কখনো কখনো বাদীর জন্য বিবাদী ও সাক্ষীদের একই স্থানে একই সময়ে উপস্থিত করা ও একত্র করা অসম্ভব হয়ে যায়। যেমন– বিবাদী এক শহরে রয়েছে; কিন্তু সাক্ষীগণ ভিন্ন শহরে অবস্থান করছে। সাক্ষীগণ বিবাদীর শহরে যেতে প্রস্তুত নয় আবার বিবাদী সাক্ষীদের শহরে আসতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায় বাদীর হক উদ্ধার করার জন্য এক বিচারকের অন্য বিচারকের কাছে পত্র প্রেরণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। অথচ একজন বিচার প্রার্থীর হক উদ্ধার করা শরিয়তের নির্দেশ। যেহেতু হক উদ্ধার করার বিকল্প কোনো পথ এখানে নেই তাই এক বিচারকের অন্য বিচারকের কাছে পত্র প্রেরণ করা এবং সেই পত্র গ্রহণ করা বৈধ করা হয়েছে।

এরপর লেখক فَاَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ বলে দ্বিতীয় দলিল পেশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন এটা সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সামাঞ্জস্য রাখার কারণে বৈধ। কারণ উভয়ের ইল্লত একই। সেটা হচ্ছে প্রতিপক্ষ এবং সাক্ষীদের একত্র করা অসম্ভব হওয়া। অর্থাৎ সাক্ষী ও প্রতিপক্ষকে একত্র করা অসম্ভব হওয়াতে شَهَادَةٌ عَلٰى شَهَادَةٍ-কে হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেমন বৈধ করা হয়েছে, তদ্রূপ একই কারণে বিচারকের কাছে বিচারকের পত্র প্রেরণ ও তা গ্রহণ বৈধ করা হয়েছে।

নিম্নে বিচারকের পত্রের একটি নমুনা দেওয়া হলো, নমুনাটি ফাতহুল কাদীর থেকে সংগৃহীত।

প্রেরক

বিচারক : আব্দুল করীম ইবনে আব্দুর রহীম

বিচারক / জর্জ / ম্যাজিস্ট্রেট, দায়েরা আদালত ঢাকা

প্রাপক

বিচারক : রাশেদ ইমাম ইব্‌নে খালেদ ইমাম

বিচারক / জর্জ / ম্যাজিস্ট্রেট দায়েরা আদালত গাজীপুর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

জনাব,

হামদ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, আমার কাছে জনৈক খালেদ, পিতা : আব্দুল গফুর, সাং ইসলাম পুর, পোঃ ও থানা কেরানীগঞ্জ আগমন করে বলল, "আমি মামুন, পিতা : আব্দুল আহাদ, সাং রাসূল বাগ, থানা গাজীপুর, জিলা গাজীপুর -এর কাছে একহাজার টাকা কর্জরূপে পাব। সে আমার উক্ত টাকা প্রদান করছে না।" উক্ত পাওনাদার আমার কাছে এই আর্জি জানাচ্ছে যে, আমি যেন তার সাক্ষ্য শুনে যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য তা আপনার কাছে লিখিতভাবে প্রেরণ করি। অতঃপর তার কাছে সাক্ষী তলব করলাম। সে অমুক অমুক সাক্ষীদের আনল [সাক্ষীদের নাম, পরিচয়, ঠিকানা-আবাসস্থল সবই উল্লেখ থাকবে]। যাই হোক সাক্ষীরা আমার সামনে এই সাক্ষ্য দিল যে, খালেদ ইবনে আব্দুল গফুর কেরানীগঞ্জী বাদীর এক হাজার টাকা মামুন পিতা আব্দুল আহাদ সাং রাসূল বাগের কাছে এক হাজার টাকা নগদ পাওনা রয়েছে। দেনাদার উক্ত টাকা প্রদানে গড়িমসি করছে। আমার কাছে এটা স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়েছে যে, বাদী-বিবাদীর কাছে এক হাজার টাকা পায়। বাদীর আবেদন মুতাবিক আমি উক্ত চিঠি আপনার কাছে প্রেরণ করছি। আমি পত্রের সাথে দু'জন সাক্ষী পাঠাচ্ছি যারা এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, পত্রের হাতের লেখা আমার এবং পত্রের মাঝে ও উপরের সিলটি আমার। আমি এই চিঠি সাক্ষীদের সামনে পড়ে শুনিয়েছি।

এরপর উক্ত চিঠি ভাঁজ করে, তাতে সিল মেরে বাদীর হাতে অর্পণ করবেন। বাদী যখন উক্ত চিঠি প্রাপক বিচারকের কাছে পৌছে দেবে, সে বিচারক চিঠির সাক্ষীদের ডাকাবে। অতঃপর যে পর্যন্ত বিবাদী আদালতে উপস্থিত না হবে বিচারক সাক্ষীদের বক্তব্য শুনবেন না। এরপর যখন বিবাদী উপস্থিত হবে তখন সে প্রথমে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করবে যে, আমিই মামুন ইবনে আব্দুল আহাদ....

এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষীদের বক্তব্য শুনবেন। পক্ষান্তরে যদি বিবাদী নিজেকে গোপন করে বলে আমি সেই লোক নই, তাহলে বিচারক বাদীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করবেন। সাক্ষীরা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, সেই মামুন ইবনে আব্দুল আহাদ। বিবাদী প্রমাণিত হওয়ার পর বিচারক বাদীর সাক্ষীদের কথা শুনবেন যে, এই চিঠি অমুক বিচারকের। এরপর প্রাপক বিচারক সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করবেন যে, এ চিঠিতে কি লেখা আছে। প্রেরক বিচারক কি তোমাদের এটা পড়ে শুনিয়েছেন। যদি তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় যে, এই লেখা সেই বিচারকের এবং এর উপরের সিলও সেই বিচারকের তাহলে প্রাপক বিচারক তার আদালতের ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তার আদালতের স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারক বিবাদীর উপস্থিতিতে সিলগুলো খুলে পত্র পড়ে শোনাবেন।

وَقَوْلُهُ فِى الْحُقُوْقِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْمَغْصُوْبُ وَالْاَمَانَةُ الْمَجْحُوْدَةُ وَالْمُضَارَبَةُ الْمَجْحُوْدَةُ، لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْاِشَارَةِ، وَيُقْبَلُ فِى الْعَقَارِ اَيْضًا، لِاَنَّ التَّعْرِيْفَ فِيْهِ بِالتَّحْدِيْدِ وَ لَا يُقْبَلُ فِى الْاَعْيَانِ الْمَنْقُوْلَةِ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْاِشَارَةِ، وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يُقْبَلُ فِى الْعَبْدِ دُوْنَ الْاَمَةِ لِغَلَبَةِ الْاِبَاقِ فِيْهِ دُوْنَهَا، وَعَنْهُ اَنَّهُ يُقْبَلُ فِيْهِمَا بِشَرَائِطَ تُعْرَفُ فِىْ مَوْضِعِهٖ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يُقْبَلُ فِىْ جَمِيْعِ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، وَعَلَيْهِ الْمُتَاَخِّرُوْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের শব্দ "হকসমূহের ক্ষেত্রে" (فِى الْحُقُوْقِ) -এর অধীনে রয়েছে ঋণ, বিবাহ, বংশ পরিচয়, ছিনতাই ও আত্মসাৎকৃত পণ্য, অস্বীকারকৃত আমানতের মাল ও অস্বীকারকৃত মুযারাবার মাল। কেননা এগুলোর সবই ঋণের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। আর এগুলো গুণাগুণ বর্ণনার দ্বারা জানা যায়, ইশারা করে বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে হুকমী পত্র গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ, সীমানা বর্ণনার দ্বারা এর পরিচয় দেওয়া হয়। তবে স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা এতে পরিচয়ের জন্য ইশারা করার প্রয়োজন হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে নয়। কারণ দাসের বেলায় পলায়নের ঘটনা বেশি ঘটে দাসীর ক্ষেত্রে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে ক্রীতদাস ও দাসী উভয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তের সাথে পত্র গ্রহণযোগ্য। শর্তগুলো যথাস্থানে জানা যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রকার স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য। আধুনিক ও পরবর্তীকালের ফকীহগণের মতও তাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِى الْحُقُوْقِ يَنْدَرِجُ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে লেখক পূর্বে উল্লিখিত ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত- وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ فِى الْحُقُوْقِ -এর অংশবিশেষ فِى الْحُقُوْقِ -এর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক বলেন, হকসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ঋণ, বিবাহ, বংশ পরিচয়, ছিনতাই ও আত্মসাৎকৃত দ্রব্যাদি এবং অস্বীকারকৃত আমানতের মাল ও অস্বীকারকৃত মুযারাবার মাল। কেননা এসবগুলো দুটি কারণে ঋণের পর্যায়ভুক্ত। ১. ঋণ ব্যক্তির জিম্মায় আবশ্যক হয় ২. ঋণের পরিচয় গুণাগুণ বর্ণনা ও বিবরণ দেওয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, এর প্রতি ইশারা করার প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ উক্ত বিষয়গুলো জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং এসবের পরিচয় ইশারা করা ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা ও বিবরণ দেওয়ার দ্বারাই হয়ে যায়।

ঋণের ক্ষেত্রে যেহেতু বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য, সুতরাং যে দ্রব্যাদি ঋণের পর্যায়ভুক্ত ও ঋণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলোর ক্ষেত্রেও বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। বিবাহের হকের ব্যাখ্যা এই যে, এক ব্যক্তি

এক মহিলার উপর এই দাবি করল যে, সে আমার স্ত্রী অথবা কোনো মহিলা এক পুরুষের উপর দাবি করল যে, সে আমার স্বামী অর্থাৎ আমরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

বিবাহের সাথে তালাকও সেই সব হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। যেমন– কোনো মহিলা দাবি করল যে, আমার পূর্বস্বামী আমাকে তালাক দিয়েছেন।

বংশ পরিচয়ের হকের স্বরূপ যে, কোনো ব্যক্তি এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলল যে, আমি উক্ত মৃত ব্যক্তির ছেলে অথবা বলল, আমি উক্ত মৃত ব্যক্তির পিতা।

গসব বা ছিনতাইকৃত মালের হক এই যে, যেমন– কেউ বলল, অমুক আমার এই মাল ছিনতাই/ আত্মসাৎ করেছে।

অস্বীকারকৃত আমানতের উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তির কাছে আমানত রাখা হয়েছিল। কিছুকাল পরে আমানত প্রদানকারী যখন তার আমানতের মাল ফেরত চাইল, তখন আমানতদার বলে উঠল যে, তুমি আমার কাছে কোনো আমানত রাখনি বা তোমার আমানত আমি তোমার কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

অস্বীকারকৃত মুযারাবার মাল (اَلْمُضَارَبَةُ الْمَجْحُوْدَةُ) -এর হকের উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি দাবি করল যে, আমি অমুককে মুযারাবারূপে দশ হাজার টাকা প্রদান করেছি; কিন্তু মুযারিব অস্বীকার করল যে, আমাকে এমন কোনো টাকা দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন : ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এখানে একটি আপত্তি করা হয়েছে যে, বিবাহের দাবির ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ইশারা করার মাধ্যমে দাবি জানাতে হয়। তদ্রূপ আমানতের মাল ও গসবের মালের প্রতি ইশারা করা আবশ্যক। আর ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, যে বস্তু ইশারার মুখাপেক্ষী তাতে এক বিচারকের চিঠি অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। সে মতে বিবাহ, আমানতের মাল ও গসব ইত্যাদির ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণযোগ্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অথচ লেখক বলছেন এসবে পত্র গ্রহণযোগ্য হবে।

উত্তর : ফাতহুল কাদীরেই উক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে যে, এখানে বাদীর দাবি হচ্ছে বিবাহ, ছিনতাই ইত্যাদি কাজের উপর। আর এসব কাজ যেহেতু অদৃশ্যমান বিষয় তাই এগুলোর প্রতি ইশারা করা সম্ভব নয় যেমন ঋণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঋণের মধ্যে যদিও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি ইশারা করা শর্ত; কিন্তু ঋণ যা জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছে তার প্রতি ইশারা করা শর্ত নয়। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি ইশারা করা শর্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের মধ্যে যেহেতু বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ বিবাহ ইত্যাদির মধ্যেও বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য। ফাতহুল কাদীরে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যে কোনো হকের মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি ইশারা করা জরুরি চাই সেটা ইচ্ছাকৃত হোক অথবা প্রচ্ছন্নভাবে হোক। অথচ পত্র লেখক বিচারকের সাক্ষীদের পক্ষে তার প্রতি ইশারা করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। এর প্রকৃত সমাধান হচ্ছে, অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের প্রতি ইশারা করা আবশ্যক নয়; বরং অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের বা বিবাদীর খাস নাম, বংশ পরিচয় ও লোকদের মাঝে যে নামে পরিচিত তা উল্লেখ করে তার ব্যাপারে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেবে এরপর যখন পত্র অন্য বিচারকের কাছে পৌঁছবে তখন পত্রে লিখিত বর্ণনানুযায়ী বিবাদীকে চিহ্নিত করা হবে। এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে, সেখানে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করব।

قَوْلُهٗ وَيُقْبَلُ فِى الْعَقَارِ اَيْضًا الخ : লেখক বলেন, স্থাবর-অস্থানান্তরযোগ্য ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত হকের ব্যাপারে বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ ভূমির পরিচয় সীমানা ও চৌহদ্দি বর্ণনা দ্বারা ফুটে উঠে। এতে ইশারা করার প্রয়োজন হয় না। আর যেহেতু এতে ইশারা করার প্রয়োজন নেই তাই এর মধ্যে বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য হবে। এই মূলনীতি পিছনে বর্ণনা করে এসেছি। অতএব, ভূমি ও স্থাবর সম্পত্তিতে বিচারকের পত্র গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে স্থানান্তরযোগ্য বস্তুসমূহে বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য নয় যেমন– পশুপাখি, গোলাম, বাঁদি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেহেতু

ইশারা করার প্রয়োজন হয় তাই এগুলোর মধ্যে বিচারকের পত্র অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আর প্রথমটি হচ্ছে ক্রীতদাসের ব্যাপারে বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য হবে তবে দাসীর ক্ষেত্রে পত্র গ্রহণ করা হবে না। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, দাসের মধ্যে পলায়নের প্রবণতা বেশি থাকে তাই তার অনুপস্থিতিতে বিচারকের পত্র প্রেরণের প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে দাসীর মাঝে পলায়নের প্রবণতা কম থাকাতে এর মাঝে বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, দাস সাধারণত বাড়ির বাহিরে কাজ করে এবং কাজের জন্য তার বাহিরে যাওয়া পড়ে তাই তার জন্য পলায়নের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দাসীরা কাজ করে বাড়ির অভ্যন্তরে তাই তারা পলায়নের সুযোগ পায় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর আরেকটি মত হচ্ছে, দাস ও দাসী উভয়ের ক্ষেত্রে বিচারকের পত্র গ্রহণীয়, তবে তা কতিপয় শর্তের সাথে। শর্তগুলো মাবসূত ও আদাবুল কাযী-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

গোলামের ব্যাপারে পত্র লেখার একটি উদাহরণ এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, বুখারার অধিবাসী এক লোকের গোলাম পালিয়ে সমরকন্দ চলে গেল এরপর সমরকন্দবাসী এক লোক সেই গোলামটিকে আটক করল। এ খবর শুনে গোলামের মালিক এ ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করল; কিন্তু বিপত্তি সাধল এই যে, তার বুখারার সাক্ষীগণ সমরকন্দ যেতে রাজি নয়। এমতাবস্থায় সে বুখারার বিচারকের শরণাপন্ন হলো এবং বলল, আমার সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে আপনি এই মর্মে সমরকন্দের বিচারকের কাছে পত্র লিখুন যে, অমুক অমুক সাক্ষী আমার সামনে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে এই বর্ণের, এই এই গুণাবলির অধিকারী অমুক বুখারীর একটি দাস বর্তমানে সমরকন্দের অমুক এলাকায় অমুক ব্যক্তির হাতে রয়েছে। এরপর অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করবে যা আমরা ইতঃপূর্বে নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করেছি।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে কোনো ধরনের অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য মালের ক্ষেত্রে বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য। লেখক বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্ত মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন পরবর্তীকাল তথা আধুনিক কালের ফকীহগণ। তাদের ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর। এছাড়া তিন প্রধান ইমাম তথা ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতও তাই।

قَالَ : وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، لِأَنَّ الْكِتَابَ يُشْبِهُ الْكِتَابَ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ وَهٰذَا لِأَنَّهُ مُلْزِمٌ فَلَابُدَّ مِنَ الْحُجَّةِ، بِخِلَافِ كِتَابِ الْاِسْتِيْمَانِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ، وَبِخِلَافِ رَسُوْلِ الْقَاضِىْ إِلَى الْمُزَكِّىْ وَرَسُوْلِهِ إِلَى الْقَاضِىْ لِأَنَّ الْإِلْزَامَ بِالشَّهَادَةِ لَا بِالتَّزْكِيَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য ব্যতীত বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এক ধরনের লিখন অন্য লিখনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং পূর্ণ দলিল ছাড়া তা প্রমাণিত হবে না। এই শর্তারোপ এজন্যে যে, পত্রটি হক [অধিকার] আবশ্যককারী। সুতরাং এতে [শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ] দলিল জরুরি। পক্ষান্তরে অমুসলিম-শত্রু কবলিত রাষ্ট্রের [শাসকের] নিরাপত্তা প্রার্থনার পত্র এর থেকে ভিন্ন। কেননা তার হকটি আবশ্যককারী কিছু নয়। [মুসলিম শাসক ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন] সত্যায়নকারীর কাছে বিচারকের দূত প্রেরণ এবং সত্যায়নকারীর দূত বিচারকের কাছে প্রেরণ এর থেকে ভিন্ন। কেননা হক সাব্যস্ত হয় সাক্ষ্য দ্বারা সত্যায়নের দ্বারা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إِلَّا بِشَهَادَةِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে প্রেরক বিচারকের চিঠি প্রাপক বিচারকের কাছে পৌছানোর সময় সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এখানে ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.)-এর একটি ইবারত এনেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [ন্যায়পরায়ণ] পুরুষের সাক্ষ্য অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য ব্যতীত বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ এক কথায় শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ দলিল ব্যতীত এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণীয় নয়। এ ব্যাপারে ইমাম শা'বী (র.) বলেন, পূর্ণাঙ্গ দলিল ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। তিনি বিচারকের পত্রকে দারুল হারবের শাসকের নিরাপত্তা প্রার্থনার দলিলের উপর কিয়াস করেন। তার উক্ত কিয়াসের জবাব লেখকের ইবারতে রয়েছে, যা সামনে আসছে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ করেন যে, সাক্ষীরা এ সাক্ষ্য দেবে যে, পত্রটি অমুক বিচারকের, পত্রের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরও সেই বিচারকের, পত্রের উপরের সিলও সেই বিচারকের এবং পত্রের মধ্যে এই এই বিষয় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাক্ষী দুজনের মুসলিম হওয়া আবশ্যক। সুতরাং মুসলিম বিচারকের পত্রের উপর দুই জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি যদি জিম্মির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় অন্য জিম্মির বিরুদ্ধে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে একজন মুসলিম [বিচারক]-এর কাজের ব্যাপারে। তবে জিম্মিদের কাজের ব্যাপারে জিম্মিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ তাদের পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ খুব কমই উপস্থিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَ يُشْبِهُ الْكِتَابَ الخ : লেখক সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার দলিল সম্পর্কে বলেন, একজনের হস্তাক্ষর অন্যজনের হস্তাক্ষরের সাথে অনেক সময় মিলে যায়, তাছাড়া অনেক দুষ্কৃতকারী বিচারক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলদের হস্তাক্ষর নকলের চেষ্টা করে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি সাক্ষীর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এতে প্রতারণার সুযোগ থেকে যায়। প্রতারণার সেই ছিদ্রপথকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে আবশ্যক করা হয়েছে।

সাক্ষীর শর্তারোপের দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ হচ্ছে, বিচারকের চিঠির মাধ্যমে বিবাদীর উপর এমন হক আবশ্যকভাবে সাব্যস্ত করা যা চিঠির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, কারো উপর কোনো জিনিস পূর্ণাঙ্গ দলিল ব্যতীত আবশ্যক করা

যায় না। এজন্য বিচারকের পত্র গ্রহণ করার জন্য পূর্ণাঙ্গ দলিল তথা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও দুজন ন্যায়পরায়ণা নারীর সাক্ষ্য আবশ্যক।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দুজন নারী ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য তো দুজন পুরুষের সাক্ষ্যের মতো সন্দেহাতীত নয়; তাহলে দুজন নারী ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য কি করে গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিচারকের পত্র এমন সব হুকুমের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যেগুলো সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও রহিত হয় না; বরং বাস্তবায়িত হয়ে যায়। আর নিয়ম হচ্ছে, যেসব হক সন্দেহের সাথে বাস্তবায়িত হয় এর মধ্যে দুজন নারী ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং বিচারকের চিঠি সত্যায়নে দুজন নারী ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইমাম শা'বী (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, বিচারকের পত্রের সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। তাঁর সাথে আরও রয়েছেন ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি বর্ণনাও এরূপ রয়েছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা কিয়াস করেছেন দারুল হারবের নিরাপত্তা প্রার্থনার পত্র ও বিচারকের দূত সত্যায়নকারীর কাছে পাঠানোর উপর। অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রার্থনার পত্র যেমন সাক্ষী ছাড়া গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ বিচারকের পত্র সাক্ষী ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে বিচারক যখন সাক্ষীদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সত্যায়নকারী ব্যক্তির কাছে তার দূত প্রেরণ করেন তখন তার দূতকে সাক্ষী ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ। তদ্রূপ সত্যায়নকারী যখন তার দূতকে বিচারকের কাছে প্রেরণ করে তখন সে যে সত্যায়নকারীর দূত– বিচারক একথা কোনো সাক্ষী সাক্ষ্য ছাড়াই গ্রহণ করে।

ইমাম শা'বী (র.)-সহ অন্যদের দাবি হচ্ছে, যদি বিচারকের দূত সত্যায়নকারীর কাছে এবং সত্যায়নকারীর দূত বিচারকের কাছে সাক্ষী ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বিচারকের পত্রের বেলায় সাক্ষী লাগবে কেন?

قَوْلُهُ بِخِلَافِ كِتَابِ الْاِسْتِيْمَانِ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ : লেখক بِخِلَافِ كِتَابِ الْاِسْتِيْمَانِ الخ দ্বারা তাদের প্রথম কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। লেখক বলেন, শত্রু রাষ্ট্রের শাসকের নিরাপত্তা পত্র মুসলিম শাসকের উপর কোনো কিছু আবশ্যক করে না। মুসলিম শাসকের তার পত্রের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন, ইচ্ছা করলে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সুতরাং বুঝা গেল নিরাপত্তা প্রার্থনার পত্র কোনো কিছু আবশ্যক [লাযেম] –কারী নয়। আর নিয়ম হচ্ছে, যে বিষয় কোনো হক/ কিছুকে লাযেম করে না তা প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ দলিলের প্রয়োজন নেই। এজন্য নিরাপত্তা প্রার্থনার পত্র সাক্ষী ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে যখন বিচারক তার প্রতিনিধিকে সত্যায়নকারীর কাছে প্রেরণ করে কিংবা সত্যায়নকারী তার বার্তাবাহককে বিচারকের কাছে প্রেরণ করে তার তাযকিয়া-সত্যায়ন কোনো কিছুকে আবশ্যক অথবা সাব্যস্ত করে না; বরং হক সাব্যস্তকারী হচ্ছে সাক্ষীদের সাক্ষ্য। হক সাব্যস্তকারী না হওয়াতে এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দলিলের প্রয়োজন নেই। আর এজন্য বিচারকের দূত কিংবা সত্যায়নকারীর দূতের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। সারকথা হচ্ছে, সত্যায়ন কোনো হককে সাব্যস্ত বা আবশ্যক করে না। অর্থাৎ সত্যায়নের দ্বারা বিবাদীর উপর হক সাব্যস্ত হবে না; বরং সেই সাক্ষী দ্বারা হক সাব্যস্ত হবে যে সাক্ষীদের সত্যায়নকারীরা ন্যায়পরায়ণ বলেছে। যেহেতু দূতের মাধ্যমে হক সাব্যস্ত হচ্ছে না, সুতরাং সত্যায়নকারীর দূতের/ সত্যায়নকারীর কাছে প্রেরিত দূতের সংবাদ কবুল করার জন্য সাক্ষীর/ পূর্ণাঙ্গ দলিলের প্রয়োজন নেই।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো বিচারক চিঠি প্রেরণের পরিবর্তে লোক মারফত অন্য বিচারকের কাছে চিঠির বক্তব্য জানায় তাহলে সেই দূতের সংবাদ শুনে দ্বিতীয় বিচারক বিবাদীর উপর কোনো রায় প্রদান করতে পারবেন না। এমনকি যদি দূত যে বিচারকের দূত এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা হলেও না। সুতরাং সার কথা এ দাঁড়াল যে, বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে সাক্ষীর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এক বিচারকের বার্তাবাহক বা দূত অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য না যদিও সাক্ষীদের মাধ্যমে দূত হওয়াকে প্রমাণ করা হয়। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে যুক্তি বহির্ভূতভাবে হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেয়ীদের ইজমা -এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিচারকের দূতের ব্যাপারে কোনো হাদীস ও ইজমা সংঘটিত হয়নি। যার ফলে বিচারকের দূত অন্য বিচারকের কাছে অগ্রহণীয়।

قَالَ : وَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَعْرِفُوْا مَا فِيهِ أَوْ يُعْلِمَهُمْ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ، ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ، كَيْلَا يُتَوَهَّمَ التَّغْيِيْرُ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) ، لِأَنَّ عِلْمَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالْخَتْمَ بِحَضْرَتِهِمْ شَرْطٌ، وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا ، وَلِهٰذَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ كِتَابًا اٰخَرَ غَيْرَ مَخْتُوْمٍ لِيَكُوْنَ مَعَهُمْ مُعَاوَنَةً عَلٰى حِفْظِهِمْ، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) أَخِرًا : شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالشَّرْطُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ أَنَّ هٰذَا كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّ الْخَتْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا ، فَسَهَّلَ فِيْ ذٰلِكَ لَمَّا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ قَوْلَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পত্র লেখক বিচারকের জন্য সাক্ষীদের সামনে পত্রটি পাঠ করা [এবং তা শুনানো] ওয়াজিব যাতে তারা বুঝতে পারে এতে কি লিখিত আছে অথবা বিচারক তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত করাবেন। কেননা কোনো বিষয় না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। অতঃপর পত্রটির উপর তাদের উপস্থিতিতে সিলমোহর লাগাবেন এবং তাদের হাতে তা অর্পণ করবেন, যাতে তাদের এতে পরিবর্তনের সন্দেহ না হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। কেননা পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তাদের উপস্থিতিতে সিলমোহর লাগানো [তাঁদের কাছে] শর্ত। তদ্রূপ পত্রের বিষয়বস্তু মুখস্থ করাও তাঁদের মতে শর্ত। এজন্য তাদের কাছে সিলমোহর ছাড়া একটি অনুলিপি প্রদান করা হবে যাতে সেটা [সার্বক্ষণিকভাবে] মুখস্থ করার সহায়ক হিসেবে তাদের সাথে থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে এর কোনো কিছুই শর্ত নয়; বরং শর্ত হচ্ছে, তাদের এই মর্মে সাক্ষী রাখবে যে, এটা তার পত্র ও মোহর। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সিলমোহরও শর্ত নয়। যখন তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন বিষয়টিকে সহজ করে দেন। আর সংবাদ কিছুতেই দর্শনের মতো হয় না। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি গ্রহণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ الخ : চলমান ইবারতে লেখক বিচারকের পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষ্যদানের শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাক্ষ্যদানের প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের অর্থ হচ্ছে- পত্র লেখক বিচারকের দায়িত্ব হচ্ছে তিনি [যাদের সাক্ষীরূপে অন্য বিচারকের নিকট পাঠাবেন] তাদের সামনে তার পত্রটি পড়ে শোনাবেন যাতে তারা পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে অথবা তিনি পত্রের বিষয়বস্তু তাদের জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেবেন। ইমাম কুদূরী (র.) এ ইবারতে একটি শর্তের আলোচনা করেছেন- যে শর্তগুলো সম্পর্কে আলোচনার প্রতিশ্রুতি ইতঃপূর্বে লেখক দিয়েছিলেন। তাঁর ইবারত ছিল يَخْتَصُّ بِشَرَائِطَ نَذْكُرُهَا - সারকথা হচ্ছে, পত্র লেখক বিচারকের কর্তব্য হলো পত্রের বিষয়বস্তু পড়ে শুনিয়ে দেওয়া কিংবা তা জানিয়ে দেওয়া। কেননা যদি সাক্ষীরা পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত না হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য অবগতিবিহীন সাক্ষ্য হবে। আর অবগতিবিহীন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে– إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ 'যে জেনেশুনে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য প্রদান করে।' আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, তোমাদের কেউ যদি সঠিকভাবে অবগত হয়ে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। এ আয়াত এ কথার ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাহোক পত্র লেখক বিচারক যখন পত্র পড়ে সাক্ষীদের শুনিয়ে দিলেন এবং তাদের অবগত করিয়ে দিলেন এরপর তার দায়িত্ব হচ্ছে মোহরাঙ্কিত করে পত্রটি তাদের হাতে অর্পণ করা। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। মোহরাঙ্কিত বা সিল-গালা লাগবে যাতে পত্রস্থিত বিষয়বস্তু সংরক্ষিত থাকে। তারফাইন (র.)-এর মতে সাক্ষীদ্বয়ের জন্য পত্রের বিষয়বস্তু মুখস্থ করাও জরুরি। তাদের মুখস্থ করা এবং মুখস্থ রাখার সুবিধার জন্য তাদের হাতে মূলপত্রের একটি অনুলিপি প্রদান করা উচিত। যে অনুলিপিটি তাদের হাতে খোলা অবস্থায় থাকবে। যাতে তারা এটা দেখে মুখস্থ করে নিতে পারে এবং প্রয়োজনে স্মরণ করতে পারে। কেননা পত্রটির বিষয়বস্তু শোনার পর থেকে সাক্ষ্যদানের পূর্ব পর্যন্ত বিষয়বস্তু স্মরণ রাখা জরুরি। যখন তারা একটি অনুলিপি হাতে রাখবে তখন তাদের মনে রাখার কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

লেখক বলেন, উপরের যাবতীয় শর্তাদি যথা– সাক্ষীদানের সামনে পত্র পাঠ করে শোনানো, পত্রের বিষয়বস্তু মুখস্থ করিয়ে দেওয়া, তাতে সিলমোহর লাগানো, সাক্ষীদের হাতে পত্র হস্তান্তর করা, পত্রের বিষয়বস্তু মনে রাখার জন্য তাদের হাতে অনুলিপি প্রদান করা, সাক্ষীদের প্রাপক বিচারকের সামনে হুবহু পত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা ইত্যাদি সবকিছু তারফাইনের মতে শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-ও তারফাইনের সাথে একমত পোষণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম মালেক (র.) -এর একটি মত এরূপ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) أَخِرًا الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)ও প্রাথমিক যুগে এরূপ মত পোষণ করতেন। শেষকালে তাঁর মত এ ব্যাপারে স্থির হয় যে, এসব কিছুই করার দরকার নেই। অর্থাৎ সাক্ষীদের সামনে পত্র পাঠ, তাদের পত্রের বিষয়বস্তু মুখস্থ করানো এবং মুখস্থ থাকার জন্য হাতে অনুলিপি তুলে দেওয়া এসবের কোনো কিছুরই দরকার নেই; বরং তাঁর মতে শর্ত হচ্ছে শুধুমাত্র সাক্ষীদের এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, পত্রটি অমুক বিচারকের এবং পত্রের উপর অঙ্কিত মোহরটাও বিচারকের। ব্যাস, এতটুকু সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ইমাম মালেক (র.)-এরও একটি মত এরূপ রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিচারক তার পত্র বাদীর হাতেই তুলে দেবেন– সাক্ষীদের হাতে নয়। তাঁর থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত এমন রয়েছে যে, সিলমোহর লাগানোও শর্ত নয়। তাঁর মতটি সম্পর্কে লেখক বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যখন বিচারকের পদ গ্রহণ করেন তখন এসব সহজ বিধান জারি করেন। লেখক ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতকে বিশুদ্ধ মনে করেন। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নিজে বিচারক হওয়ায় এসবের ভুক্তভোগী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বিধানগুলো জারি করেছিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন– لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতা আর গ্রন্থবদ্ধ কথা এক নয়; বরং বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অধিক কার্যকর। যুগ চাহিদা ও লোকসমাজের সুবিধার খাতিরে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটিকে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। কেননা সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি যখন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তারাই পত্রটি বহন করে অন্য বিচারকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাতে সিলমোহর না থাকলেও চলবে, যেহেতু তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা অমুক বিচারকের পত্র। তবে যদি পত্র বাদীর কাছে অর্পণ করা হয় তখন অবশ্যই সিলমোহর লাগাতে হবে। কেননা তাতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি সাক্ষীরা পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মুখস্থ সাক্ষী দেয় তাহলে মোহর না লাগালেও চলবে। সারকথা হচ্ছে, যদি সাক্ষীদের সাথে পত্র থাকে তাহলে তাতে সিলমোহর লাগানো শর্ত এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষীদের অবগতিও আবশ্যক নয়; বরং তাদের বিচারকের পত্র হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দানই যথেষ্ট। আর যদি পত্র বাদীর হাতে অর্পণ করা হয় তাহলে এর বিষয়বস্তু সাক্ষীদের মুখস্থ থাকা জরুরি। পত্রের মধ্যে তারিখ উল্লেখ থাকা শর্ত। যদি তারিখ উল্লিখিত না থাকে তাহলে পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তারিখ উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা যাবে যে, পত্র প্রেরণকালে বিচারক তখন দায়িত্বে ছিলেন কিনা? এমনিভাবে যদি সাক্ষীরা মূল ঘটনার সাক্ষ্য দেয় অথচ সে ঘটনা পত্রে উল্লেখ নেই তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

قَالَ : فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِيْ لَمْ يَقْبَلْهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، فَلَابُدَّ مِنْ حُضُوْرِهٖ، بِخِلَافِ سِمَاعِ الْقَاضِى الْكَاتِبِ، لِأَنَّهُ لِلنَّقْلِ لَا لِلْحُكْمِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন পত্র বিচারকের কাছে পৌছবে তখন তিনি প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ব্যতীত পত্র গ্রহণ করবেন না। কেননা এ পত্র সাক্ষ্য প্রদানের পর্যায়ে। আর তাই এতে বিবাদীর উপস্থিতি জরুরি। তবে পত্র লেখক বিচারকের [সাক্ষীদের] সাক্ষ্য শোনা এর বিপরীত। কারণ সেই শ্রবণ পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্যে হয়, রায় প্রদানের জন্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِىْ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে পৌছলে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত আনা হয়েছে। তিনি বলেন, যখন পত্র লেখক বিচারকের পত্র প্রাপক বিচারকের কাছে পৌছল, তখন প্রাপক বিচারক উক্ত পত্র বিবাদী বা প্রতিপক্ষের সামনে গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ পত্রটি বিবাদী বা তার উকিলের উপস্থিতিতে বাদী অথবা সাক্ষীগণের হাত থেকে গ্রহণ করবে। অন্য অনুলিপিতে لَمْ يَقْبَلْهُ-এর স্থলে لَمْ يَفُكَّهُ [ছিঁড়বে না] শব্দ রয়েছে। ইনায়ার ভাষ্যমতে প্রথম শব্দটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ জামিউস সাগীর, জামিউল কাবীর ও ফাতওয়ায়ে কাযীখানে এরূপ রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনুল হুমামের ভাষ্য হচ্ছে, এখানে শব্দ যাই হোক উদ্দেশ্য হচ্ছে পত্রটি পাঠ করবে না। কারণ পত্র গ্রহণের সাথে হুকুমের কোনোই সম্পর্ক নেই। তিনি পত্র পৌছানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, যখন বাদী বিচারকের কাছে পৌছবে বিচারক বাদী ও বিবাদী উভয়কে একত্র করবেন। যদি বিবাদী তার হক স্বীকার করে নেয় তাহলে পত্র বের করবেন না। যদি বিবাদী অস্বীকার করে তাহলে বাদীকে বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন- আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে ? যদি বাদী বলে, আমার কাছে অমুক বিচারকের একটি পত্র আছে। তখন বিচারক উক্ত পত্র যে সেই বিচারকের সে ব্যাপারে প্রমাণ চাইবেন, যখন সাক্ষীরা উপস্থিত হবে বিচারক প্রতিপক্ষকে উপস্থিত করবেন– যদি সে উপস্থিত না থাকে, তারপর প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এটা অমুক বিচারকের পত্র, তিনি তার এজলাসে আমাদের কাছে এ পত্র হস্তান্তর করেছেন এবং আমাদেরকে পত্র পাঠ করে শুনিয়েছেন। তখন প্রাপক বিচারক পত্র খুলে প্রতিপক্ষের সামনে তা পাঠ করবেন।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক (র.) প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া পত্র গ্রহণ না করার তথা পত্র পাঠ না করার দলিল বর্ণনা করেছেন। পত্র লেখক বিচারকের এ পত্রটি شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ-এর নামান্তর বা পর্যায়ভুক্ত, কারণ পত্র লেখক বিচারক তার পত্রের মাধ্যমে সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের শব্দাবলিকে হুবহু নকল করে প্রাপক বিচারকের, কাছে প্রেরণ করেন। যেমনিভাবে সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেমনিভাবে আসল সাক্ষীর শব্দগুলো পরবর্তী সাক্ষ্য প্রদানকারীরা নকল করেন তদ্রূপ বিচারকের পত্র সাক্ষীদের শব্দ নকল করে। অতএব যেহেতু মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য নকল করার সময় বিবাদীর উপস্থিতি জরুরি, সেহেতু বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের সামনে পাঠ করার সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের সামনে পাঠ করা সাক্ষ্য প্রদান করার পর্যায়ে। সাক্ষ্য প্রদান করার সময় বিবাদীর উপস্থিতি আবশ্যক তদ্রূপ পত্র পাঠের সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে। সার কথা হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রদান ও সাক্ষ্যের থেকে সাক্ষ্য উভয়ের উপর কিয়াস করার দ্বারা বিচারকের পত্র পাঠের সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা জরুরি প্রমাণ হয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ سِمَاعِ الْقَاضِى الْكَاتِبِ الخ : লেখক বলেন, পত্র লেখক বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার বিষয়টি উপরিউক্ত মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ পত্র লেখক বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়। অতএব, যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্য যদি বিবাদীর অনুপস্থিতিতে পত্র লেখক বিচারকের সামনে প্রদান করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কেননা পত্র লেখক বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনছেন তা স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে রায় প্রদান যা বিচার করার উদ্দেশ্যে নয়। আর নিয়ম হচ্ছে বিচারের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য শোনা হলে তখন তাতে বিবাদী উপস্থিত থাকতে হয়।

সুতরাং পত্র লেখক বিচারকের সাক্ষ্য শোনা অনুগামী সাক্ষীর মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য শোনা ও তা দায়িত্বে নেওয়ার মতো হলো অর্থাৎ অনুগামী সাক্ষী সাক্ষ্য নকল করার জন্যে সাক্ষ্য দায়িত্বে নেওয়ার সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। তাই বিচারকের পত্র লেখার সময় যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তাতে বিবাদীর উপস্থিতি জরুরি নয়।

উল্লেখ্য যে, এসব আলোচনা তারফাইনের মতানুসারে করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সাক্ষীদের এ সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট যে, পত্রটি অমুক বিচারকের এবং সিলমোহরও তারই।

মুখতাসারুল কুদূরী কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ أَقْطَعُ-এ বর্ণিত আছে যে, পত্র গ্রহণের সময় বা পাঠ করার সময় বিবাদীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়। তবে রায় প্রদানের সময় বিবাদীর উপস্থিতি আবশ্যক। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত।

قَالَ : فَإِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُوْدُ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَى خَتْمِهِ، فَإِذَا شَهِدُوْا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ الْقَاضِيْ سَلَّمَهُ إِلَيْنَا فِيْ مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاضِيْ وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَأَلْزَمَهُ مَا فِيْهِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ)، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) إِذَا شَهِدُوْا أَنَّهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ قَبِلَهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْكِتَابِ ظُهُوْرُ الْعَدَالَةِ لِلْفَتْحِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَفُضُّ الْكِتَابَ بَعْدَ ثُبُوْتِ الْعَدَالَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ (رحـ)، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ الشُّهُوْدِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُمْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بَعْدَ قِيَامِ الْخَتْمِ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ عَلَى الْقَضَاءِ حَتّٰى لَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ أَوْ لَمْ يَبْقَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ قَبْلَ وُصُوْلِ الْكِتَابِ لَا يَقْبَلُهُ، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِنَ الرِّعَايَا، وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ إِخْبَارُهُ قَاضِيًا آخَرَ فِيْ غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ فِيْ غَيْرِ عَمَلِهِمَا.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর যখন [বিবাদীর উপস্থিতিতে] সাক্ষীগণ পত্র [প্রাপক] বিচারকের কাছে হস্তান্তর করবে– বিচারক তখন সিলমোহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। এরপর যখন সাক্ষীরা এই মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, এটা অমুক বিচারকের পত্র, তিনি তার এজলাসে এটি আমাদের কাছে অর্পণ করেছেন এবং আমাদের পড়ে শুনিয়ে এতে মোহর মেরে দিয়েছেন। এরপর বিচারক পত্রটি খুলে প্রতিপক্ষের সামনে পাঠ করে শোনাবেন এবং পত্রের বিষয়বস্তু তার [বিবাদীর] উপর আবশ্যিকভাবে কার্যকর করবেন। এ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, এটা পত্র প্রেরক বিচারকের পত্র ও তার মোহরাঙ্কিত– বিচারক পত্র গ্রহণ করে নেবেন, যেমন বর্ণিত হয়েছে। পত্র খোলার জন্য সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত হওয়ার শর্ত কুদূরী কিতাবে করা হয়নি। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত হওয়ার পর বিচারক পত্রটি খুলবেন। ইমাম খাসসাফ (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। কেননা অনেক সময় অধিক সংখ্যক সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। আর অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান সিলমোহর লাগানোর পর সম্ভব হয়। পত্র প্রেরক বিচারক [বিচারকের] দায়িত্বে থাকলেই পত্র প্রাপক বিচারক পত্রটি গ্রহণ করবেন। যদি পত্র পৌঁছার পূর্বে প্রেরক বিচারক মৃত্যুবরণ করে অথবা পদচ্যুত হয় কিংবা বিচারকের যোগ্য না থাকে তাহলে পত্র গ্রহণ করবেন না। কেননা সে উল্লিখিত কারণে সাধারণ জনগণে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণেই তিনি যদি তার দায়িত্বাধীন এলাকার বাইরে অন্য বিচারককে কিংবা উভয়ের দায়িত্বাধীন এলাকার বাইরে কোনো সংবাদ দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُوْدُ إِلَيْهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে পত্র পৌঁছার পর প্রাপক বিচারকের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন পত্রের সাক্ষীরা পত্রটিকে প্রাপক বিচারকের হাতে অর্পণ করবেন বিচারক [পত্রটি সংরক্ষিত কিনা তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য প্রথমে] এর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী যদি বাদী পত্রটি বিচারকের হাতে অর্পণ করে তাহলেও চলবে। মোহর দেখার পর বিচারক পত্রটি প্রেরক বিচারকের হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য তলব করবেন। যখন সাক্ষীরা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, পত্রটি অমুক বিচারকের, তিনি আমাদের হাতে পত্রটি তার বিচারের এজলাসে প্রদান করেছেন, আমাদেরকে পত্রটি পড়ে শুনিয়েছেন এবং পত্রটিতে তার সিলমোহর মেরে দিয়েছেন। এ সাক্ষ্য শোনার পর বিচারক পত্রটি খুলবেন এবং বিবাদীর সামনে সেটাকে পাঠ করে শোনাবেন। এরপর পত্রস্থিত বিষয়বস্তুগুলো বিবাদীর উপর অবশ্যিকভাবে কার্যকর করবেন। যেমন পত্রে সাক্ষীগণের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে যে, বাদী বিবাদীর কাছে দশ হাজার টাকা পায়, এমতাবস্থায় বিচারক বিবাদীকে বাদীর উক্ত দশ হাজার টাকা প্রদান করতে বলবেন, বিবাদী নগদ / সময় নিয়ে উক্ত টাকা শোধ করবে। যদি বিবাদীর টালবাহানা প্রমাণিত হয় তাহলে বিচারক তাকে আটক করবেন।

উল্লেখ্য যে, বিচারকের পত্র অনুযায়ী রায় কার্যকর করবেন যদি পত্রটিতে সাক্ষীদের শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য এবং পত্র লেখক বিচারকের রায় উল্লেখ থাকে এবং বিবাদীর কাছে উক্ত পত্রের বিপক্ষে কোনো দলিল না থাকে। লেখক বলেন, বিচারের উল্লিখিত প্রক্রিয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) اِذَا شَهِدُوْا الـخ : পক্ষান্তরে ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব পূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী সাক্ষীগণের এতটুকু সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট যে, পত্র ও সীলমোহরটি অমুক বিচারকের। তাঁর মতে এতটুকু সাক্ষ্য দ্বারাই পত্র গ্রহণ করা যায়। উপরিউক্ত অন্যান্য শর্তগুলো বাস্তবায়ন না করলেও এর কোনো ক্ষতি নেই। এরপর হেদায়ার লেখক ইমাম কুদুরী (র.)-এর ইবারত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) পত্র খোলার পূর্বে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَتْ) প্রকাশ হওয়া / ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার শর্ত করেননি। কেননা তাঁর ইবারত হচ্ছে–

فَاِذَا شَهِدُوْا اَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ الْقَاضِىْ سَلَّمَهُ اِلَيْنَا فِىْ مَجْلِسِ حُكْمِهٖ وَقَضَائِهٖ وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَيَفْتَحُهُ .

তিনি এভাবে বলেননি যে, فَاِذَا شَهِدُوْا عَدِلُوْا। সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে এই যে, প্রাপক বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যদি নিশ্চিত হন যে, সাক্ষীরা প্রকৃতই ন্যায়পরায়ণ তাহলে বিচারক পত্র খুলবেন। এর পূর্বে পত্র খুলবেন না। মোটকথা ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত দ্বারা সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ হওয়ার শর্ত করা হয়নি; বরং তাঁর ইবারত দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পত্র খোলা বৈধ; কিন্তু হিদায়ার লেখকের মত এ ব্যাপারে ভিন্ন। তিনি মনে করেন সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই পত্র খুলবেন। এজন্য তিনি বলেন– اَلصَّحِيْحُ اَنَّهُ يَفُضُّ الْكِتَابَ بَعْدَ ثُبُوْتِ الْعَدَالَةِ অর্থাৎ বিশুদ্ধমত এই যে, প্রাপক বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর পত্র খুলবেন। ইমাম খাসসাফ (র.) তাঁর কিতাবে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। লেখক খাসসাফের মতটি বিশুদ্ধ বলার যুক্তি পেশ করেছেন এভাবে যে, যদি সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পত্র খোলা হয় তাহলে বাদীর অতিরিক্ত সাক্ষী উপস্থিত করার প্রয়োজন হতে পারে। অতিরিক্ত সাক্ষীর প্রয়োজন এভাবে দেখা দিতে পারে যে, বিবাদী উপস্থিত কারো ব্যাপারে আপত্তি জানাল যে, সে ন্যায়পরায়ণ নয়, অথবা তার মাঝে এই সমস্যা আছে ইত্যাদি। যখন কারো ব্যাপারে আপত্তি উঠবে তখন উক্ত সাক্ষীর পরিবর্তে অন্য সাক্ষী পেশ করতে হবে। অথচ অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ পত্রটির গায়ে সিলমোহর থাকবে। কারণ তাদের সাক্ষ্য তো সিলমোহর সম্পর্কেই। তারা বলবে যে, পত্রটি অমুক বিচারকের আর পত্রের উপরের সিলমোহরটিও সেই বিচারকের। সুতরাং যদি সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বেই পত্র খোলা হয়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়। আর তখন বিচারকার্যে এক ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। সে ধরনের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তাই বিচারকের উচিত পত্র খোলার পূর্বে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

মুগনী কিতাবে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইমাম খাসসাফ (র.) বলেছেন– "ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাওয়ার আগে পত্র খুলবেন না।" অবশ্য এরপর পরেই বলা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে সাক্ষ্য দেওয়ার পরে পত্র খোলা যে জায়েজ বলেছেন সেটাই বেশি শুদ্ধ।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি এমন হয় যে, বিবাদী তার বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে পত্র আসার খবর শুনে সে শহর থেকে পলায়ন করে অন্য শহরে চলে যায় তাহলে প্রাপক বিচারকের জন্য সেই শহরের বিচারকের কাছে এ পত্র লেখা বৈধ যে, উক্ত আসামির ব্যাপারে আমার কাছে একটা পত্র এসেছে। প্রথম বিচারকের জন্য যেমন পত্র লেখা আমরা বৈধ করেছি, তদ্রূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় এভাবে একের পর একের জন্য পত্র লেখা বৈধ মনে করি। কেননা, প্রথমজনের মতো অন্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ الخ : এরপর লেখক বলেন, বিচারকের পত্র গ্রহণের জন্য শর্ত হচ্ছে বিচারক বর্তমানে বিচারকের দায়িত্বে থাকতে হবে, সুতরাং পত্র লেখক বিচারক যদি মারা/ পদচ্যুত হয় / উম্মাদ হয়ে যায়/ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে/ মুরতাদ হয়ে যায় / দারুল হারবে [শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে] আশ্রয় গ্রহণ করে/ কারো কারো মতে ফাসিক হওয়ার কারণে বিচারকের যোগ্যতা রহিত হয়ে যায় অথবা পত্র প্রাপক বিচারকের কাছে পৌঁছেনি অথবা পত্র পৌঁছেছে; কিন্তু বিচারক এখনো পত্রটি বিবাদীর সামনে পাঠ করেননি তাহলে [উল্লিখিত সব সুরতে] পত্র বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং প্রাপক বিচারক উক্ত পত্র গ্রহণ করবেন না। আর যদি পত্র গ্রহণ করে থাকেন তাহলে পত্র অনুযায়ী রায় কার্যকর করবেন না। এ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হচ্ছে, উল্লিখিত অবস্থাগুলোতেও পত্র গ্রহণ করবেন এবং পত্র মোতাবেক বিচারের রায় প্রদান করবেন। তাঁদের মতে, বিচারকের পত্র সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য দান করার মতো। কেননা পত্রের মাধ্যমে বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে স্থানান্তর করেন; যেমন– মূল সাক্ষীদের থেকে পরবর্তী সাক্ষীরা সাক্ষ্য স্থানান্তর করেন। মূল সাক্ষীদের থেকে সাক্ষ্য শুনে পরবর্তী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে যদি মূল সাক্ষীগণ মারা যায় অথবা পরবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষের ভিত্তিতে রায় প্রদানের পূর্বে যদি মূল সাক্ষীগণ মারা যায় তাহলে পরবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাতিল হয় না কিংবা সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করাতে কোনো সমস্যা হয় না। অতএব, আমাদের চলমান মাসআলাতে বিচারকের পত্র গ্রহণের পূর্বে অথবা রায় প্রদানের পূর্বে যদি বিচারক মারা যায় কিংবা পদচ্যুত ইত্যাদি হয় তাহলে সেই পত্র অনুযায়ী রায় প্রদানে কোনো সমস্যা হবে না। তাঁদের এই যুক্তির জবাবে তারফাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয় [যখীরাহ কিতাবের উদ্ধৃতিতে] শুধুমাত্র পত্রের দ্বারা সাক্ষ্যের স্থানান্তর পূর্ণতা লাভ করে না। সাক্ষ্যের স্থানান্তর তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন পত্রটি প্রাপকের কাছে পৌঁছে, অতঃপর প্রাপক সেটিকে বিবাদীর সামনে পাঠ করে। কেননা এই সাক্ষ্যের স্থানান্তরটি প্রকৃতপক্ষে রায় প্রদান করা। আর এজন্যই তো এটা বিচারক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে প্রেরণ করা বৈধ নয়। সুতরাং এ লিখিত সাক্ষ্য পরিপূর্ণ হবে না সরাসরি রায় প্রদান ব্যতীত। আর রায় প্রদান কার্যকর হবে পত্রটি বিবাদীর সামনে পাঠ করার দ্বারা।

সুতরাং বিচারকের পত্র পৌঁছার পূর্বে কিংবা পৌঁছার পর পত্র বিবাদীর সামনে পাঠ করার পূর্বে বিচারক মারা যাওয়া / পদচ্যুত হওয়া যেন পরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে মারা যাওয়া। আর পরবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে মারা গেলে বিচারক রায় প্রদান করতে পারবে না তদ্রূপ বিচারকের পত্র পাঠের পূর্বে পত্র প্রেরক বিচারক মারা গেলে বিচারক রায় প্রদান করতে পারবে না। কারণ বিচারকের মৃত্যু ইত্যাদির মাধ্যমে যোগ্যতা তিরোহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اِلْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعَايَا الخ : এটি হচ্ছে বিচারকের পত্র উল্লিখিত অবস্থাসমূহে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে তারফাইন (র.)-এর দলিল। তাঁরা বলেন, বিচারক বিবাদীর সামনে পত্র পাঠ করার পূর্বে যদি পত্র লেখক বিচারক মারা যায় অথবা পদচ্যুত ইত্যাদি হয় তাহলে তার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। আর দায়িত্ব রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই বিচারক একজন সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। যেহেতু বিচারক সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়েছেন, তাই তার পত্র দ্বারা বিচার ও রায় প্রদান করা বৈধ হবে না এবং তার রায় কার্যকরও হবে না। কারণ সাধারণ ব্যক্তির রায় কখনো কার্যকর হয় না।

এজন্যই যদি এক বিচারক তাঁর কর্ম ও দায়িত্বাধীন এলাকার বাইরে অন্য বিচারকের কাছে কোনো সংবাদ দেয় তা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন– এক বিচারকের এলাকা হচ্ছে গাজীপুর, তিনি ময়নমসিংহের বিচারকের কাছে গিয়ে বললেন, অমুক অমুকের কাছে এত টাকা পায়। গাজীপুরের বিচারকের এই খবর শুনে ময়মনসিংহের বিচারক রায় প্রদান করতে পারবেন না। কারণ গাজীপুরের বিচারকের বক্তব্য তার এলাকার [গাজীপুরের] বাইরে [ময়মনসিংহে] গ্রহণযোগ্য নয়। তার এলাকার বাইরে তিনি একজন সাধারণ লোক বলে গণ্য হবে না। আর সাধারণ লোকের সংবাদে বিচারক তার বিচার প্রদান করবেন না। লেখক বলেন, এমনিভাবে যদি দুজন বিচারক তাদের দায়িত্বাধীন এলাকার বাইরে অন্যকোনো এলাকায় একত্র হন এবং সেখানে তাদের একজন অন্যজনের কাছে কারো বিপক্ষে কোনো সংবাদ বা তথ্য জানান সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, তাহলে যার কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে তিনি রায় বা বিচার করতে পারবেন না। কেননা এ দুজন বিচারকই তাদের কর্মের এলাকার বাইরে হওয়ার কারণে সেখানে তারা সাধারণ নাগরিকতুল্য। আর আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, সাধারণ নাগরিকের রায় প্রদানের কোনো যোগ্যতা নেই। যদি তারা রায় প্রদান করেন তাহলে সেই রায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন : এখানে একটি আপত্তি এমন হতে পারে যে, আপনি ইতঃপূর্বে বলেছেন যে, পত্র লেখক বিচারকের মারা যাওয়া অথবা পদচ্যুত হওয়া, উন্মাদ হওয়া ইত্যাদির কারণে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ধর্তব্যে থাকে না এবং সে একজন সাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যখন বিচারক পদচ্যুত হন তখন তার সাধারণ মানুষে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি তো বোধগম্য। কিন্তু মারা যাওয়ার দ্বারা কিংবা উন্মাদ হওয়ার দ্বারা বিচারক সাধারণ মানুষের কাতারে কিভাবে আসে?

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে, লেখক মৃত্যু, উন্মাদ হওয়া ও পদচ্যুত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন বিচারকের দায়িত্বমুক্ত অবস্থাকে অর্থাৎ বিচারকের পত্র পড়ে রায় কার্যকর করা পর্যন্ত পত্র লেখক বিচারকের দায়িত্বে থাকা শর্ত; কিন্তু যদি বিচারকের পত্র কার্যকর করার আগেই পত্র লেখক দায়িত্বচ্যুত হন তাহলে পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বিচারকের দায়িত্বচ্যুতি বরখাস্তের মাধ্যমে যেমন হয় তেমনি উন্মাদ হওয়া ও মৃত্যুবরণ করার দ্বারাও হয়। কেননা যে ব্যক্তি মারা গেল অথবা উন্মাদ হয়ে গেল সে তো আর বিচারকের যোগ্য নয়। আর যে ব্যক্তি বিচারকের যোগ্য নয় তার দায়িত্ব নেই; বরং বলা যায় পদচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা পুরোপুরি অনুপস্থিত হয় এমন নয়; কিন্তু উম্মাদ হলে কিংবা মারা গেলে তার যোগ্যতা সামান্য পরিমাণও থাকে না। কারণ ব্যক্তিই যদি না থাকে বা উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে তার যোগ্যতা থাকবে কি করে। সুতরাং বিচারক মারা গেলে কিংবা উন্মাদ হলে তার পত্রের বিষয়বস্তু কার্যকর না করা অধিক যুক্তিযুক্ত। উপরিউক্ত বিশ্লেষণের পর আশা করি কারো এ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকার কথা নয়।

তবে যদি বিচারকের পত্র বিবাদীর সামনে পাঠ করার পর পত্র লেখক বিচারক মারা যায় তাহলে প্রাপক বিচারক পত্রের ভাষ্য অনুযায়ী রায় কার্যকর করবেন, জাহেরী রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত আছে।

وَكَذٰلِكَ لَوْ مَاتَ الْمَكْتُوْبُ اِلَيْهِ اِلَّا اِذَا كَتَبَ اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِىْ بَلَدِ كَذَا وَاِلٰى كُلِّ مَنْ يَصِلُ اِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ، لِاَنَّ غَيْرَهٗ صَارَ تَبَعًا لَهٗ، وَهُوَ مُعَرَّفٌ، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَتَبَ اِبْتِدَاءً اِلٰى كُلِّ مَنْ يَصِلُ اِلَيْهِ عَلٰى مَا عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا (رح)، لِاَنَّهٗ غَيْرُ مُعَرَّفٍ، وَلَوْ كَانَ مَاتَ الْخَصْمُ يُنْفِذُ الْكِتَابَ عَلٰى وَارِثِهٖ لِقِيَامِهٖ مَقَامَهٗ .

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি প্রাপক বিচারক মারা যান। পক্ষান্তরে যদি [প্রাপকের নাম এভাবে] লিখেন যে, অমুক শহরের বিচারক অমুক ইবনে অমুক -এর নামে এবং [এভাবে লিখেন যে,] মুসলমানদের যে বিচারক দায়িত্বে থাকবে তাঁর নামে [তাহলে পত্র বাতিল হবে না।] কেননা অন্য বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছেন। আর সেই কারণে তিনি পরিচিত বলে বিবেচিত হবেন। তবে যদি সূচনাতে [এভাবে] লিখেন, 'মুসলমানদের যে বিচারকের হাতে পৌঁছে তার প্রতি' তাহলে আমাদের মাশায়েখে কেরামের মতে মাসআলাটি ভিন্ন হবে। কেননা প্রাপক বিচারক [এভাবে পত্র লেখার ক্ষেত্রে] অপরিচিত। যদি বিবাদী মারা যায় তাহলে বিচারক তার উত্তরাধিকারীদের উপর পত্রের বিষয়বস্তু কার্যকর করবেন। কেননা তারা মৃতের স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ لَوْ مَاتَ الْمَكْتُوْبُ اِلَيْهِ اِلَّا اِذَا الخ : লেখক বলেন, এমনিভাবে যদি প্রাপক বিচারক পত্র পাঠ করার পূর্বে মারা যান, অথবা পদচ্যুত হন অথবা উন্মাদ হয়ে যান তাহলে পত্র বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি সেই বিচারকের স্থলে অন্য বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হন তাহলে তিনি পত্রটি গ্রহণ করবেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রাপক বিচারকের মৃত্যুর পর যে বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি পত্র গ্রহণ করে তদনুযায়ী রায় কার্যকর করবেন। ইমাম আহমদ (র.) ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি পত্র লেখক বিচারক প্রাপক বিচারকের উদ্দেশ্যে এভাবে লিখেন যে, অমুক শহরের বিচারক অমুকের ছেলে অমুকের নামে অথবা লিখে মুসলমানদের যে বিচারক পত্র পাবে তার নামে এরপর দেখা গেল প্রাপক বিচারক উক্ত পত্র পাওয়ার পূর্বে মারা গেল, তারপর অন্য বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হলো এমতাবস্থায় স্থলাভিষিক্ত বিচারক সকলের ঐকমত্যে পত্র গ্রহণ করবেন এবং পত্রানুযায়ী রায় কার্যকর করবেন। সুতরাং যদি কেউ প্রাপকের নাম এভাবে না লিখেন এবং ইতিমধ্যে প্রাপক বিচারক মারা যাওয়ার কারণে কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হন তাহলে তিনিও পত্র গ্রহণ করবেন এবং পত্রের বিষয়বস্তু অনুযায়ী রায় কার্যকর করবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের দলিল হলো, পত্র লেখক বিচারক প্রাপক বিচারকের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আমানতদারির উপর বিশ্বাস করে তার নামে পত্র লিখেছিলেন কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর পত্র লেখক অন্য কোনো বিচারকের উপর তার আস্থা পোষণ করেননি। আর আমানতদারির ক্ষেত্রে বিচারকদের মাঝে স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে। অতএব, যে বিচারকের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল তিনিই পত্র গ্রহণ করবেন। অন্য কেউ তার পত্র গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচারক এভাবে পত্র প্রেরণ করেন যে, অমুক শহরের বিচারক অমুক ইবনে অমুক এর নামে এবং [এভাবে লিখে যে] মুসলমানদের যে বিচারক দায়িত্বে থাকবে তার নামে তাহলে দায়িত্বে নিযুক্ত বিচারক মারা গেলেও পত্র বাতিল হবে না; বরং বর্তমানে দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনি পত্র গ্রহণ করবেন এবং বিবাদী যদি তার আয়ত্তাধীন এলাকায় থাকে তাহলে বিবাদীকে উপস্থিত করে তার বিপক্ষে পত্রের বিষয়বস্তু

কার্যকর করবেন কারণ। এ অবস্থায় প্রাপক বিচারক হচ্ছেন তিনিই, যিনি দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সুতরাং মৃত প্রাপক বিচারকের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পত্র গ্রহণ করবেন। যেহেতু বর্তমান বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত এবং পত্র লেখক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নামেই পত্র লিখেছেন তাই পত্র নির্দিষ্ট পরিচিত বিচারক থেকে অন্য পরিচিত বিচারকের নামেই গেল। উল্লেখ্য যে, পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য مِنْ مَعْلُوْمٍ اِلٰى مَعْلُوْمٍ হওয়া শর্ত, তাছাড়া পত্র লেখক বিচারক এক্ষেত্রে বিশেষ বিচারকের উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন তারপর দায়িত্ব বা পদের প্রতি তার আস্থা প্রকাশ করেছেন, মোটকথা পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যে শর্ত রয়েছে, তা পাওয়া যাওয়াতে পত্র গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَتَبَ اِبْتِدَاءً اِلٰى كُلِّ الخ : লেখক বলেন, যদি পত্র লেখক বিচারক সূচনাতে এভাবে পত্র লিখেন যে- مَنْ يَصِلُ اِلَيْهِ অর্থাৎ যার কাছে পত্র পৌঁছবে তার নামে, তাহলে এ চিঠি অনর্থক সাব্যস্ত হবে এবং কোনো বিচারক পত্রটি গ্রহণ করবেন না। এটি আমাদের মাশায়েখে কেরামের মত। কারণ এ অবস্থায় পত্র প্রাপক বিচারক নির্দিষ্ট নন; বরং অজ্ঞাত বিচারকের নামে; তিনি পত্র প্রেরণ করলেন। অথচ পত্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে পত্রটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে অন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে প্রেরিত হতে হবে। এই সুরতের সাথে পূর্বোক্ত বৈধ সুরতের পার্থক্য হলো, পূর্বোক্ত সুরতে প্রথমে একজন নির্দিষ্ট বিচারকের নামোল্লেখ করার পর পত্রপ্রেরক তার স্থলাভিষিক্ত মুসলিম বিচারকের উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ مِنْ مَعْلُوْمٍ اِلٰى مَعْلُوْمٍ-এর শর্ত মোতাবেক পত্র প্রেরণ করেছেন। তারপর অন্যকে স্থলাভিষিক্তরূপে উল্লেখ করেছেন। আর শেষোক্ত অবস্থায় বিচারক পত্র প্রেরণ করেছেন এভাবে যে- مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَاضِىْ بَلَدِ كَذَا اِلٰى كُلِّ مَنْ يَصِلُ اِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ অমুক শহরের অমুকের পুত্র অমুক বিচারকের পক্ষ থেকে অমুক শহরের মুসলমান বিচারকের নামে। বাহ্যতই দেখা যাচ্ছে পত্রটি শর্তানুযায়ী প্রেরিত হয়নি। শর্ত হচ্ছে- مِنْ مَعْلُوْمٍ اِلٰى مَعْلُوْمٍ অথচ এখানে পত্রটি প্রেরিত হয়েছে مِنْ مَعْلُوْمٍ اِلٰى مَجْهُوْلٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিচারক থেকে অনির্দিষ্ট বিচারকের নামে। উল্লিখিত অবস্থায় পত্র অগ্রহণযোগ্য হওয়ার মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর। কারো কারো মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে আছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ অবস্থায়ও পত্র গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ مَاتَ الْخَصْمُ الخ : হিদায়ার লেখক (র.) বলেন, যদি বিচারকের পত্র পৌঁছার পূর্বে বিবাদী মারা যায়, এরপর পত্র বিচারকের কাছে পৌঁছে। তাহলে প্রাপক বিচারক পত্রের বিষয়বস্তু বিবাদীর উত্তরাধিকারের উপর কার্যকর করবেন। কেননা উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পত্রের তারিখ বিবাদীর মৃত্যুর পরে হলেও কোনো সমস্যা নেই। যেমন- পত্রের তারিখ মৃত বিবাদীর মৃত্যুর আগে হলে সমস্যা নেই।

وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِيْ إِلَى الْقَاضِيْ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ فِيْهِ شُبْهَةُ الْبَدْلِيَّةِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلِأَنَّ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْإِسْقَاطِ، وَفِيْ قَبُوْلِهِ سَعْيٌ فِيْ إِثْبَاتِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এতে বদলের সন্দেহ বিদ্যমান; ফলে এটা সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্যদান করার মতো হলো। তাছাড়া হুদূদ ও কিসাসের ভিত্তি হচ্ছে [সন্দেহের কারণে] রহিতকরণের উপর। আর বিচারকের পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে হুদূদ ও কিসাসকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। [সুতরাং এ দুটি বিষয়ে পত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِيْ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আমাদের আলোচনায় এ বিষয়টি এসেছে যে, হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এখানে লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এনে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি মত হচ্ছে হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রেও এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও তাই। তাঁদের দলিল হলো, হুদূদ ও কিসাসের ভিত্তি হচ্ছে সাক্ষীদের উপর। আর বিচারকের পত্রের ক্ষেত্রে যেহেতু সাক্ষীরা বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছে তাই সেই পত্রের ভিত্তিতে রায় প্রদান করাতে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের [আহনাফের] দলিল হলো, বিচারকের পত্রের মাঝে বদলের সন্দেহ বিদ্যমান। বদলের অর্থ হচ্ছে– মৌলিকতা না থাকা বা মূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এখানে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আসল সাক্ষীরা বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছে, বিচারক তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তার লিখিত পত্র অন্য বিচারকের কাছে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং পত্র প্রাপক বিচারক পত্র লেখক বিচারকের বদল হলেন। যখন বদলের সন্দেহ এতে বিদ্যমান তখন এটা اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ -এর মতো হয়ে গেল। সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে বিচারকের পত্রের সামঞ্জস্য ইতঃপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি। যেহেতু হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ গ্রহণযোগ্য নয় তাই এ দুটিতে كِتَابُ الْقَاضِيْ إِلَى الْقَاضِيْ [এক বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে] গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর লেখক আরেকটি দলিল পেশ করেন। আর তা হচ্ছে হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যতদূর সম্ভব সেগুলোকে প্রতিহত করা এবং কার্যকর না করার চেষ্টা করা। কিন্তু যদি বিচারকের পত্র এতে গ্রহণ করা হয় তাহলে তো এর মাধ্যমে হুদূদ ও কিসাস বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

فَصْلٌ اُخَرُ

وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِلاَّ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ اِعْتِبَارًا بِشَهَادَتِهَا فِيْهِمَا ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ .

আরেকটি অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : আর মহিলাদের রায় প্রদান হুদুদ ও কিসাস ছাড়া সব ক্ষেত্রে বৈধ। এ দুটি ক্ষেত্রে [তাদের রায়কে] তাদের সাক্ষ্যের উপর কিয়াস করা হয়েছে। [অর্থাৎ এ দুটি ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, অতএব রায়ও গ্রহণযোগ্য হবে না] এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : এ অনুচ্ছেদটি 'পূর্ববর্তী বিচারকের পত্র বিচারকের নামে' পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট। فَصْلٌ اُخَرُ শব্দটির اُخَرُ অর্থ হচ্ছে– আরেকটি। তার অর্থ হচ্ছে– পূর্বে উপরিউক্ত পরিচ্ছেদের ন্যূনতম একটি অনুচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে, এটা হচ্ছে আরেকটি বা দ্বিতীয়টি; কিন্তু ইতঃপূর্বে পূর্বের এ পরিচ্ছেদের কোনো অনুচ্ছেদ যায়নি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে اُخَرُ শব্দটি এখানে বেমানান। এ সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে ভাষ্যকার ইনায়ার লেখক বলেন, এটাকে আদাবুল কাযী অধ্যায়ের فَصْلٌ اُخَرُ [আরেক অনুচ্ছেদ] বলা যুক্তিসঙ্গত হত। কারণ আদাবুল কাযী অধ্যায়ে এর পূর্বে একটি অনুচ্ছেদ (فَصْلٌ فِى الْحَبْسِ) অতিক্রান্ত হয়েছে।

নেহায়া গ্রন্থে এ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিচারকের পত্র যদি সিজিলি [হুকুমনামা] জাতীয় হয়; যাতে বিচারের রায় লিখা থাকে, তা যখন প্রাপক বিচারকের কাছে পৌঁছে তখন সে বিচারকের উপর কর্তব্য হচ্ছে সেই রায়কে কার্যকর করা– সেই রায়টি মতবিরোধপূর্ণ হলেও; কিন্তু কিতাবে হুকমী [সাক্ষীনামা] তার বিপরীত, কারণ এতে কোনো রায় থাকে না। প্রাপক বিচারক সেই পত্রের সুপারিশকে ইচ্ছা করলে বাস্তবায়ন করতে পারেন অন্যথায় সেই সুপারিশকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। যেহেতু মতবিরোধপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে তাই মতবিরোধপূর্ণ স্থানগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করা উচিত। এ অনুচ্ছেদে লেখক সেই সব মতবিরোধ বের করে একটি মূলনীতি আলোচনা করেছেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে নারীদের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে মহিলাদের বিচারের রায় প্রদান করা বৈধ। অর্থাৎ মহিলাগণ হুদূদ ও কিসাসের বিচারক হতে পারবেন না। এ ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে মহিলাদের বিচারক হওয়াতে কোনো বাধা নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) তথা হানাফী মাযহাবের অভিমত।

পক্ষান্তরে অন্য প্রধান তিন ইমাম তথা– ইমাম আহমদ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে মহিলাদের কোনো ধরনের বিচারের রায় প্রদান তথা বিচারক হওয়া বৈধ নয়।

তিন ইমামের দলিল হলো মহিলারা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারিণী নয়। তাদেরকে রাসূল ﷺ তাদের স্বল্প জ্ঞানের অধিকারিণী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিচারের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্বল্প জ্ঞানের অধিকারিণীকে দেওয়া হলে তা যথাযথভাবে

আদায় হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, বিচারকের মজলিস প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের মাঝে হয়ে থাকে। মহিলাদের আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম দিয়েছেন। এমতাবস্থায় পুরুষদের সাথে বন্দী ও আসামিদের মজলিসে কি করে যাবেন ? তাছাড়া মহিলাদের দায়িত্ব প্রদান করার ব্যাপারে শরিয়তে সর্তকবাণী এসেছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً অর্থাৎ সেই সম্প্রদায় কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না, যারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব মহিলাদের হাতে অর্পণ করেছে।

এ হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের দায়িত্বশীল করা মানুষের অকল্যাণ ও অমঙ্গলের পথে চলা। যেহেতু রাসূল ﷺ মহিলাদের দায়িত্বশীল করার দ্বারা নিশ্চিত অকল্যাণ ও ব্যর্থতার ঘোষণা দিয়েছেন তাই মহিলাদের বিচারক বানানো কিছুতেই বৈধ হবে না।

আমাদের দলিল হলো, মহিলাদের বিচারকের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি মহিলাদের সাক্ষ্যদানের উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু মহিলাদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা বিদ্যমান ও শরিয়ত স্বীকৃত তাই মহিলাদের বিচারক হওয়াও বৈধ হবে। কেননা সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা যেমন ওলায়াতের মাধ্যমে লাভ হয় তেমনি বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ওলায়াত থেকে প্রাপ্ত। যেহেতু মহিলাদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা আছে সেহেতু তাদের ওলায়াত আছে। আর যার ওলায়াত আছে তার বিচারক হতে কোনো বাধা নেই। মহিলাদের সাক্ষ্য হুদূদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যসব ক্ষেত্রে বৈধ। অতএব, মহিলাদের বিচার পরিচালনা হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে বৈধ হবে। তাছাড়া মহিলাদের মাঝে شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ [স্থলবর্তীতার সন্দেহ] রয়েছে। আর এ কারণে হুদূদ ও কিসাসের মাঝে মহিলার বিচারের রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

তিন ইমাম বর্ণিত দলিলের জবাব : প্রথম উত্তর হচ্ছে, হাদীসের দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, মহিলারা বিচারক হতে পারবে না; বরং হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলারা বিচারক বা অন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে, তবে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলে অকল্যাণ হবে। দ্বিতীয়ত হাদীসের দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, মহিলাদের দায়িত্ব দান করা নাজায়েজ; কিন্তু দায়িত্ব দেওয়া হলে এবং তারা শরিয়ত মোতাবেক রায় প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে শামীর ইবারত হলো– وَالْمَرْأَةُ تَقْضِىْ فِىْ غَيْرِ حَدٍّ وَقِصَاصٍ وَاِنْ اَثِمَ الْمُوَلِّىْ لَهَا لِخَبَرِ الْبُخَارِىْ لَنْ يُفْلِحَ অর্থাৎ "মহিলারা হদ ও কিসাস ছাড়া অন্যসব বিষয়ে বিচারের রায় প্রদান করবে। যদিও বুখারীর হাদীসের কারণে মহিলাকে দায়িত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে।" যেহেতু আমাদের আলোচনা বিচার নিয়োগ করা সম্পর্কে নয়; বরং বিচারক হলে তার রায় কার্যকর হবে কিনা সে সম্পর্কে। তাই আমরা বলব, হদ ও কিসাস ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে মহিলাদের বিচারের রায় প্রদান বৈধ। এ হাদীসসহ শরিয়তে অন্য কোথাও তাদের রায় প্রদানের যোগ্যতা রহিত করা হয়নি; বরং সাক্ষ্যদানের যোগ্যতার স্বীকৃতির মাধ্যমে রায় প্রদানের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে। হ্যাঁ এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদের জ্ঞান স্বল্প। কিন্তু জ্ঞান স্বল্প হওয়া কি পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতাকে না-বাচক করে দেয়? এর উত্তর হচ্ছে, না। এজন্যই আপনি দেখে থাকবেন মহিলারা ওয়াকফ ও অসিয়তের সাক্ষী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে পারে; বরং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা তো পুরুষের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে। তাছাড়া এটা বলা হয়েছে জাতিগতভাবে বা সামগ্রিকভাবে। এজন্য কোনো একজন সদস্যের মধ্যে এর ব্যতিক্রম হওয়াও সম্ভব। যেমন সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে– اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ 'পুরুষ মহিলাদের থেকে উত্তম।' এরপরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একথা বলা সম্ভব– بَعْضُ اَفْرَادِ النِّسَاءِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ اَفْرَادِ الرِّجَالِ অর্থাৎ "কোনো কোনো মহিলা কতক পুরুষ থেকে উত্তম।" সারকথা হচ্ছে হাদীসদৃষ্টে একথাই প্রমাণ হয় যে, মহিলাদের জ্ঞান স্বল্প এবং নিশ্চিত অকল্যাণের কারণে তাদের দায়িত্ব প্রদান করা গুনাহের কাজ; কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, মহিলারা বিচারের রায় প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

وَلَيْسَ لِلْقَاضِىْ اَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ اِلَّا اَنْ يُفَوَّضَ اِلَيْهِ ذٰلِكَ، لِاَنَّهٗ قُلِّدَ الْقَضَاءَ دُوْنَ التَّقْلِيْدِ بِهٖ، فَصَارَ كَتَوْكِيْلِ الْوَكِيْلِ، بِخِلَافِ الْمَامُوْرِ بِاِقَامَةِ الْجُمُعَةِ، حَيْثُ يَسْتَخْلِفُ، لِاَنَّهٗ عَلٰى شَرَفِ الْفَوَاتِ لِتَوَقُّتِهٖ، فَكَانَ الْاَمْرُ بِهٖ اِذْنًا فِى الْاِسْتِخْلَافِ دَلَالَةً، وَلَا كَذٰلِكَ الْقَضَاءُ، وَلَوْ قَضَى الثَّانِىْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْاَوَّلِ اَوْ قَضَى الثَّانِىْ فَاَجَازَ الْاَوَّلُ جَازَ كَمَا فِى الْوَكَالَةِ، وَهٰذَا لِاَنَّهٗ حَضَرَهٗ رَأْىُ الْاَوَّلِ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَاِذَا فَوَّضَ اِلَيْهِ يَمْلِكُهٗ فَيَصِيْرُ الثَّانِىْ نَائِبًا عَنِ الْاَصْلِ، حَتّٰى لَا يَمْلِكُ الْاَوَّلُ عَزْلَهٗ اِلَّا اِذَا فَوَّضَ اِلَيْهِ الْعَزْلُ، هُوَ الصَّحِيْحُ -

---

অনুবাদ : বিচারকের [তার স্থলে] অন্য কাউকে বিচারকার্যে স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার নেই। তবে যদি তাকে সে অধিকার প্রদান করা হয়। কেননা তাকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে; তাকে বিচারক নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়নি। এটা [বিচারকের বিচারক নিযুক্তি] তো উকিল কর্তৃক আরেক উকিল নিযুক্ত করার মতো. অবশ্য জুমা পড়ানোর নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। কেননা সে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারে। কেননা জুমার সময় নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে রয়েছে। সুতরাং আদায় করার নির্দেশের মধ্যে স্থলবর্তী করার পরোক্ষ অনুমতি রয়েছে। বিচারকার্যের বিষয় ঠিক এমন নয়। আর যদি দ্বিতীয় [পরবর্তীতে নিযুক্ত] বিচারক প্রথম বিচারকের সামনে রায় প্রদান করে অথবা দ্বিতীয়জন রায় প্রদান করার পর প্রথমজন অনুমোদন করে তাহলে তা বৈধ হবে যেমন ওকালতের মধ্যে হয়ে থাকে। এই বৈধতা এ কারণে যে, এ [দ্বিতীয়জনের] রায়ে প্রথমজনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। আর এটাই ছিল শর্ত। আর যখন তাকে [বিচারক নিযুক্তির] অধিকার দেওয়া হয় তখন সে তার অধিকারী হয়। ফলে দ্বিতীয়জন মূল ক্ষমতার অধিকারীর প্রতিনিধি হবেন। এজন্য প্রথম বিচারক তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। তবে যদি তাকে বরখাস্তের ক্ষমতা দেওয়া হয় [তাহলে তা পারবে।] এটাই বিশুদ্ধ মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ لِلْقَاضِىْ اَنْ يَسْتَخْلِفَ الخ : আলোচ্য ইবারতে সরকার প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে বিশেষভাবে তার স্থলবর্তী নিযুক্ত করা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিচারক নিয়োগের ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র সরকার প্রধান হয়ে থাকেন। অন্য কারো বিচারক নিয়োগের এখতিয়ার নেই, তবে সরকার প্রধান অন্য কাউকে তার এ ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের অর্থ হচ্ছে, বিচারকের বিচারকার্যে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার নেই, তবে তাকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হলে সে তার অধিকারী হবে। সার কথা হচ্ছে, কোনো বিচারকের পক্ষে সরকারপ্রধানের অনুমোদন ছাড়া তার ওজরবশত বা ওজর ব্যতীত অন্য কাউকে তার

স্থলাভিষিক্ত করার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে আহনাফের সাথে ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) রয়েছেন। তবে সরকারপ্রধান তাকে ক্ষমতা প্রদান করলে তিনি সবার ঐকমত্যে তা করতে পারবেন। আর সরকারপ্রধান যদি তাকে নিষেধ করেন তাহলেও সবার ঐক্যমত্যে তা করতে পারবেন না; কিন্তু সরকারপ্রধান যদি অন্যকে স্থলবর্তী করার অনুমতি কিংবা নিষেধ কোনোটাই না করেন এবং বিচারক বিচারকার্য পরিচালনায় অক্ষম হন তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক বিখ্যাত ছাত্র আসতাখারী (الاَسْطَخْرِىْ)-এর মতে বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করতে পারবেন। তার এ ভিন্নমত ছাড়া সকলের মতে স্থলবর্তী নিযুক্ত করা অবৈধ।

দলিল এই যে, বিচারককে বিচারকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাকে বিচারক নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে বিচারক উকিলের মতো হলো। উকিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে অন্যকে উকিল নিয়োগ করতে পারে না তদ্রূপ বিচারক অন্যকে তার ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করতে পারবে না। এরপর লেখক বলেন, জুমার নামাজ পড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারকের মতো নয়। কেননা সে অন্যকে তার স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে পারবে; যদিও তার নিয়োগকারী তাকে সেই অধিকার প্রদান করেনি। কারণ জুমার নামাজের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। সে সময়ের পর জুমা আদায় করা চলবে না। আর সে সময়টুকু সংক্ষিপ্ত [সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে আসরের ওয়াক্ত আসার আগ পর্যন্ত]। সুতরাং যাকে জুমার নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যদি অসুস্থতা, নামাজ পড়ানো অবস্থায় অজু চলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে নামাজ পড়াতে অক্ষম হয় তাহলে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করবে। এতে সে অন্যের অনুমতির অপেক্ষা করবে না। কেননা সে তার নিয়োগকারীর অনুমোদনের অপেক্ষা করলে জুমার সময় চলে যাবে। তাই সে তার দায়িত্ব অন্যের কাঁধে দিয়ে দেবে। সুতরাং জুমা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করার সাথে সাথে পরোক্ষভাবে তার স্থলবর্তী করার অনুমতি প্রদান করা হয়ে যাচ্ছে।

মাসআলা : যদি ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার সময় সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে এমন একজনকে তার খলিফা নিয়োগ করবেন যে তার খুতবা শুনেছে। কেননা জুমা শুরুর জন্য খুতবায় অংশগ্রহণ জরুরি। যদি প্রথমজন নামাজ শুরু করার পর অজু চলে যায় তাহলে সে কাউকে তার স্থলবর্তী করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَا كَذٰلِكَ الْقَضَاءُ : লেখক বলেন, বিচারকার্য জুমার মতো নয়। কেননা বিচারকার্য কোনো সময়ের সাথে আবদ্ধ নয় যে, ঐ সময়ের পর বিচার চলবে না; বরং ওজরের কারণে বিচারকার্য বিলম্বিত করাতে কোনো সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَضَى الثَّانِىْ الخ : এরপর লেখক বলেন, যদি বিচারক অন্যকে তার স্থলবর্তী করেন তার নিয়োগদাতার অনুমতি ব্যতীত এবং দ্বিতীয়জন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তারপর দ্বিতীয় [স্থলবর্তী] বিচারক প্রথম বিচারকের সামনে বিচার পরিচালনা করেন। অথবা দ্বিতীয় বিচারক প্রথম বিচারকের অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করেন এবং পরে প্রথমজন তার অনুমোদন দেন তাহলে [উভয় অবস্থায়] দ্বিতীয় বিচারক যোগ্য হলে তার রায় কার্যকর হবে। যেমনটা অন্যকে উকিল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি উকিলকে তার মক্কেল তার স্থলাভিষিক্ত বানানোর অনুমতি না দেয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও উকিল যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করে, আর তার নিয়োগকৃত উকিল তার সামনেই কাজকারবার করে / তার অনুপস্থিতিতে কাজ করার পর সে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তা বৈধ বিবেচিত হবে।

সারকথা, উকিলের ক্ষেত্রে যেমন দ্বিতীয়জনের কাজকারবার প্রথমজনের [প্রথম উকিলের] উপস্থিতি/ অনুমোদনক্রমে শুদ্ধ তদ্রূপ বিচারকের ক্ষেত্রেও শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّهُ حَضَرَهُ رَأْىُ الْاَوَّلِ الخ : এ ইবারতে লেখক পূর্বোক্ত উকিলের উপস্থিতি/ সম্মতিতে দ্বিতীয় উকিলের কাজের বৈধতা এবং বিচারকের উপস্থিতি/ সম্মতিতে দ্বিতীয় বিচারকের রায়ের বৈধতার দলিল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দলিল হলো, যেহেতু দ্বিতীয় উকিল/ বিচারক প্রথম উকিল/ বিচারকের উপস্থিতিতে কাজ করেছে/ রায় প্রদান করেছে কিংবা তাদের

অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান/ কাজ করলে তারা তাতে সম্মতি দিয়েছে সেহেতু উভয় অবস্থায় মূল উকিল ও মূল বিচারকের রায় বা মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। আর মূল বিচারক/ উকিলের মতামত থাকাই হচ্ছে বৈধতার শর্ত। যেহেতু শর্ত বা মূল বিচারক ও উকিলের মতামত পাওয়া গিয়েছে তখন মাসআলার বৈধতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয় বিচারকের রায় কার্যকর হবে এবং দ্বিতীয় উকিলের কাজ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا فَوَّضَ إِلَيْهِ يَمْلِكُهُ الخ : লেখক বলেন, যদি বিচারককে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে বিচারক উক্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। যেমন সরকারপ্রধান বিচারককে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার পছন্দমতো কাউকে বিচারক [আপনার স্থলবর্তী] নিযুক্ত করতে পারেন। এরপর যদি বিচারক কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন তাহলে তিনি স্থলবর্তী হয়ে যাবেন। তবে উক্ত বিচারক প্রথম বিচারকের প্রতিনিধি হবেন না; বরং সরকারপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবেন। এজন্য প্রথম বিচারক কোনো কারণে দ্বিতীয় বিচারককে পদচ্যুত করতে পারবেন না। কেননা সে সরকারপ্রধানের প্রতিনিধি এবং প্রকারান্তরে সরকার প্রধানের মাধ্যমে তার নিয়োগ হয়েছে। অতএব, সরকার প্রধান ব্যতীত অন্য কেউ তাকে পদচ্যুত করতে পারবে না। তবে যদি সরকারপ্রধান প্রথম বিচারককে বিচারক নিয়োগ ও বরখাস্ত করা উভয় প্রকারের ক্ষমতা দান করেন তাহলে তিনি তাঁর ক্ষমতা বলে তার মনোনীত ও নিয়োগকৃত বিচারককে পদচ্যুত করতে পারবেন।

এমনিভাবে যদি সরকারপ্রধান কাউকে প্রধান বিচারপতিরূপে নিয়োগ করেন তাহলে প্রধান বিচারপতি বিচারক নিয়োগ ও বরখাস্ত উভয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। কারণ প্রধান বিচারপতি এমন এক ব্যক্তি যার হাতে অন্য বিচারকদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করার অধিকার থাকে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

যাখীরাহ কিতাবে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অছি বা যাকে অসিয়ত করে যাওয়া হয় এবং বিচারকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয়কে অন্যের পক্ষ থেকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞানী তার সমস্যার কারণে অন্যকে তার উকিল বানাতে পারে এবং অসিয়ত করতে পারে; কিন্তু বিচারক তো তা পারে না। এর উত্তর হচ্ছে, অছির কর্ম সম্পাদনের সময় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর। তখন কোনো কারণে যদি সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তখন তার অসিয়তকারীর সাথে যোগাযোগের কোনো পথ থাকে না। ফলে অসিয়তকারীর যে কোনো সহযোগিতা গ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি আছে সেটাই ধরে নেওয়া হয়। বিচারকের বিষয়টি এমন নয়। বিচারক তার নিয়োগকারীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারে। কেউ কেউ বলেন, অছির মতো বিচারকও অন্যকে উকিল নিয়োগ ও অসিয়ত করতে পারে। সুতরাং অছি এবং বিচারকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

قَالَ : وَاِذَا رُفِعَ اِلَى الْقَاضِىْ حُكْمُ حَاكِمٍ اَمْضَاهُ، اِلَّا اَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ اَوِ السُّنَّةَ اَوِ الْاِجْمَاعَ بِاَنْ يَكُوْنَ قَوْلًا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ الْفُقَهَاءُ فَقَضٰى بِهِ الْقَاضِىْ ثُمَّ جَاءَ قَاضٍ اٰخَرُ يَرٰى غَيْرَ ذٰلِكَ اَمْضَاهُ، وَالْاَصْلُ اَنَّ الْقَضَاءَ مَتٰى لَاقٰى فَصْلًا مُجْتَهَدًا فِيْهِ يَنْفُذُ وَلَا يَرُدُّهُ غَيْرُهُ، لِاَنَّ اجْتِهَادَ الثَّانِىْ كَاجْتِهَادِ الْاَوَّلِ، وَقَدْ تَرَجَّحَ الْاَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهٖ، فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُوْنَهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন বিচারপতির কাছে [আপিলরূপে অন্য] বিচারকের রায় উত্থাপন করা হয় এবং রায়টি যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমা -এর বিপরীত না হয় যেমন তার রায়টি দলিলবিহীন হলো তাহলে বিচারপতি রায়টি কার্যকর করবেন। জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ফকীহগণের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে যদি কোনো বিচারক রায় প্রদান করেন, তারপর [রায় কার্যকর করার পূর্বে] অন্য বিচারক সমাসীন হন যিনি পূর্ববর্তী রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন তবু তিনি প্রথম রায়টি কার্যকর করবেন। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো যখন কোনো মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে বিচারকের রায় যুক্ত হয় তখন তা কার্যকর হয়ে যায় এবং অন্য রায় তা বাতিল করতে পারে না। কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তির ইজতিহাদ প্রথমজনের ইজতিহাদের সমপর্যায়ের। আর প্রথম ইজতিহাদটি বিচারের রায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তা তার চেয়ে নিম্নতর ইজতিহাদ দ্বারা বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا رُفِعَ اِلَى الْقَاضِىْ الخ : উক্ত ইবারতে এক আদালতের রায়ের ব্যাপারে অন্য আদালতে আপিল সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাটির স্বরূপ অনুধাবনের জন্য আমাদের দেশের [বাংলাদেশের] বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। আমাদের দেশের আদালতগুলো দুভাগে বিভক্ত। নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালত। নিম্ন আদালত বলতে থানা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং জেলা বা বিভাগীয় জজকোর্টকে বুঝানো হয়। উচ্চ আদালত দ্বারা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে বুঝানো হয়ে থাকে। আমাদের বিচারব্যবস্থার নিয়মানুযায়ী যদি কোনো বাদী কিংবা বিবাদী নিম্ন আদালতে সুবিচার পায়নি বলে মনে করে তখন সে উচ্চ আদালতে সুবিচার পাওয়ার আশায় আবেদন [আপিল] করতে পারে। উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিচারকের রায় বিচার-বিশ্লেষণ করে রায়কে কখনো বহাল রাখেন আবার কখনো পরিবর্তনও করে থাকেন। কিতাবে বর্ণিত رُفِعَ শব্দ দ্বারা আমাদের পরিভাষায় আপিলকে বুঝানো হয়েছে। حَاكِمٌ শব্দ দ্বারা নিম্ন আদালতের বিচারক তথা ম্যাজিস্ট্রেট বা জজকে বুঝানো হয়েছে। আর قَاضِىْ শব্দ দ্বারা উচ্চ আদালতের বিচারপতিকে বুঝানো হয়েছে। কিতাবের মাসআলাটি হচ্ছে, ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো বিচারপতির আদালতে [উচ্চ আদালতে] কোনো [নিম্ন আদালতের] বিচারকের রায়ের ব্যাপারে আপিল করা হয় তাহলে বিচারপতি পূর্ববর্তী রায়টিকে বহাল রাখবেন যদি সে রায়টি কুরআন, হাদীস ও ইজমা বিরোধী না হয়। তবে যদি প্রথম বিচারকের রায়টি উল্লিখিত তিন বিষয়ের কোনো একটির বিপরীত হয় তাহলে উচ্চ আদালতের বিচারপতি পূর্ববর্তী রায় বহাল রাখবেন না এবং রায়টি কার্যকর করবেন না।

এখানে কুরআন, হাদীস ও ইজমা বিরোধী রায়ের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো−

১. প্রথম বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম বর্জন করে জবাইকৃত পশুর বৈধতার ব্যাপারে রায় দিলেন। এরপর উক্ত রায়ের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের আপিল করা হলে বিচারপতি প্রথম রায়টি খারিজ করে দেবেন। কেননা রায়টি কুরআনের আয়াত وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الخ [অর্থাৎ তোমরা যে পশুতে আল্লাহর নাম [ইচ্ছাকৃত] নেওয়া হয়নি তা খেয়ো না।] এর বিপরীত।

২. প্রথম বিচারক একটি মকদ্দমায় একজন সাক্ষী ও বাদীর কসম শুনে রায় প্রদান করলেন, অথচ তার এ রায় প্রদানের প্রক্রিয়াটি কুরআনের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে−

فَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ .

অর্থাৎ "তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজন পুরুষ সাক্ষী কর। যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী না পাও তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা [সাক্ষী কর]।" এ আয়াতের সুস্পষ্ট বিধান প্রথম বিচারকের রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাই প্রথম বিচারকের এ রায়টি উচ্চ আদালতের বিচারপতি বাতিল করবেন।

বলা বাহুল্য যে, উদাহরণ দুটিতে কুরআনের বিপক্ষে প্রথম বিচারকের রায় প্রদানের বিষয়টি বুঝানো হয়েছে। এরপর নিম্নোক্ত তিন নং উদাহরণটি হচ্ছে হাদীসের বিপক্ষে প্রথম বিচারকের রায়।

৩. প্রথম [নিম্ন আদালতের] বিচারক রায় প্রদান করলেন যে, কোনো স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করলে [এবং তালাক দিলে]-ই প্রথম স্বামীর জন্য মহিলাটি হালাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় স্বামীর তার সাথে সঙ্গম করার প্রয়োজন নেই। তাহলে এ রায় উচ্চ আদালত বহাল রাখবে না। কারণ রায়টি হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ। কেননা রিফায়াহ (رِفَاعَةُ) -কে রাসূল ﷺ বলেন− لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ مِنْ عُسَيْلَتِهٖ وَيَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ

ভাবার্থ : রিফায়াহ ! তুমি পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে যে পর্যন্ত না তোমার বর্তমান স্বামীর সাথে পূর্ণাঙ্গ সহবাস না হয়।

অথবা ইজমার বিপরীত রায় প্রদান করা হলে যেমন−

৪. প্রথম বিচারক মুতা বিবাহ বৈধ হওয়ার পক্ষে তার রায় প্রদান করলেন। তারপর উচ্চ আদালতে রায়টি নিয়ে যাওয়া হলে বিচারপতি রায়টি বাতিল করবেন। কারণ রায়টি সাহাবায়ে কেরামের ইজমার পরিপন্থি। উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামের সকলের ঐকমত্যে মুতা বিবাহ হারাম।

সারকথা হচ্ছে, প্রথম বিচারকের রায় যদি কুরআন/ হাদীস/ ইজমার বিপরীতে প্রদান করা হয় [যেমন আমরা উপরের উদাহরণগুলোতে দেখতে পেলাম] তাহলে উচ্চ আদালতের বিচারপতি আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের রায় বাতিল ও খারিজ করে দেবেন।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَكُوْنَ قَوْلًا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ : কুদূরী লেখকের এ ইবারতের ব্যাপারে প্রথমত একথা জানা দরকার যে, কোনো কোনো অনুলিপিতে ইবারতটি হুবহু এমনি রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো অনুলিপিতে اَوْ يَكُوْنَ قَوْلًا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ রয়েছে। প্রথম ইবারত যা আমাদের কিতাবে উল্লিখিত সে মতে এ ইবারতটি اِلَّا اَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ اَوِ السُّنَّةَ اَوِ الْاِجْمَاعَ -এর দলিল হিসেবে গণ্য হবে। ইবারতের তরজমা হবে- কুরআন বা হাদীস বা ইজমার বিপরীত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এগুলোর বিপরীত কথাটি এমন যে, তার কোনো দলিল নেই। আর যদি بِاَنْ -এর স্থলে اَوْ হয় তাহলে ইবারতের অর্থ হবে− বিচারপতি নিম্ন আদালতের বিচারকের রায় কার্যকর করবেন যদি তার রায় কুরআন/ হাদীস/ ইজমার বিপরীত না হয় কিংবা দলিলবিহীন কথা না হয়। কেননা যে কথাতে শরিয়তের কোনো দলিল থাকে না অথবা শরিয়তের বিরুদ্ধ দলিল থাকে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

قَوْلُهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, জামিউস সাগীরে মাসআলাটি এভাবে আলোচিত হয়েছে- যদি কোনো বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতবিরোধ হয় অতঃপর এক বিচারক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাটির একটি মতের উপর ফতোয়া দিলেন, তারপর রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বেই তার স্থানে অন্য বিচারক স্থলাভিষিক্ত হলো, যার রায় মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী বিচারকের রায়ের থেকে ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও তাকে পূর্ববর্তী বিচারকের রায়টিকে কার্যকর করতে হবে, যদি প্রথম বিচারকের রায়টি কুরআন, হাদীস ও ইজমা'র পরিপন্থী না হয়।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, যেহেতু জামিউস সাগীরের মাসআলাটি কুদূরী (র.)-এর ইবারতের মাসআলার অনুরূপ, সেহেতু পরবর্তীতে আল জামিউস সাগীরের মাসআলাটি উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

উত্তর : এর উত্তরে ফাতহুল কাদীরে বলা হয়েছে যে, আল জামিউস সাগীরের ইবারতকে দুটি ফায়দার প্রতি লক্ষ্য করে আনা হয়েছে। [যে দু'টি ফায়েদার উল্লেখ কুদূরী কিতাবে নেই] প্রথমত আল জামিউস সাগীরের ইবারতে فُقَهَاءُ [ফকীহগণের মতামত] কথাটি অতিরিক্তরূপে রয়েছে। এ শব্দটি আনার দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি প্রথম বিচারক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে রায় প্রদান করেন; কিন্তু কাকতালীয়ভাবে তার রায়টি ইজতিহাদী মাসআলার সাথে মিলে যায়, অর্থাৎ ফকীহগণের মধ্য হতে কোনো ফকীহের সাথে মিলে যায় এমতাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে যদি রায়টি সম্পর্কে উচ্চ আদালতে বিচারপতির কাছে আপিল করা হয় তাহলে উক্ত রায়ের কার্যাদেশ বহাল রাখা বিচারপতির জন্য আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে প্রথম বিচারক যদি মাসআলাটি মতবিরোধের ব্যাপারে অবগত হন এবং জেনেশুনে মাসআলাটির একটি মতের উপর রায় প্রদান করেন তাহলে উচ্চ আদালতের বিচারপতির উপর তার [প্রথম বিচারকের] রায় বহাল রাখা ওয়াজিব-যদিও রায়টি উচ্চ আদালতের বিচারপতির মতের বিরুদ্ধে হয়।

জামিউস সাগীরের ইবারতের আরেকটি উপকারিতা হলো, তার ইবারতের মধ্যে يَرَى غَيْرَ ذٰلِكَ শব্দটির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম বিচারকের রায়টি যদি কুরআন-হাদীস অথবা ইজমা বিরোধী না হয়; কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারপতির মতের বিরুদ্ধে হয়, এমতাবস্থায় বিচারপতির উপর প্রথম বিচারকের রায়কে বহাল রাখা আবশ্যক। বিচারপতির মতের বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় নয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম বিচারকের রায়টিই লক্ষণীয়। তাছাড়া এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, বিচারপতির মতের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও যখন প্রথম বিচারকের রায় বহাল রাখা জরুরি তখন বিচারপতির মতের সাথে প্রথম বিচারকের রায় মিলে গেলে প্রথম রায় বহাল থাকার ব্যাপারে কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

যেহেতু ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের মধ্যে এ দুটির ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই, তাই জামিউস সাগীরের ইবারতটিকে আনা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এ ব্যাপারে স্পষ্ট নয় যে, যদি প্রথম বিচারকের রায়ের সাথে দ্বিতীয় বিচারকের মতের মিল না হয় তখন কি করবে? তার উদ্দেশ্য তো এমনও হতে পারে যে, যদি প্রথম বিচারকের রায়ের সাথে দ্বিতীয় বিচারকের মতের মিল হয় তাহলে প্রথম বিচারকের রায় বহাল থাকবে; অন্যথায় প্রথম বিচারকের রায় দ্বিতীয় বা উচ্চ আদালতের বিচারকের বিচারপতি বহাল রাখবেন না। আল জামিউস সাগীরের ইবারত এমন একটি সম্ভবনাকে রহিত করে দিয়েছে এবং একথা প্রমাণ করেছে যে, প্রথম বিচারকের রায় যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমা -এর পরিপন্থি না হয় এবং বিষয়টিতে ফকীহগণের মতবিরোধ থাকে তাহলে প্রথম বিচারক যে রায় প্রদান করবেন দ্বিতীয় বিচারক সে রায় [তার মতের অনুকূলে হোক কিংবা প্রতিকূলে হোক] বহাল রাখবেন। এরপর ইমাম কুদূরী (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেন। তার মূলনীতির ক্ষেত্র হচ্ছে আপিলকৃত প্রথম বিচারকের রায়, যদি তা কুরআন, হাদীস ও ইজমা -এর বিরোধী না হয়। মূলনীতিটি হচ্ছে, যদি কোনো বিচারক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় একটি দিককে প্রাধান্য দিয়ে রায় প্রদান করেন। অতঃপর রায়টির ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আপিল করা হয় তাহলে উচ্চ আদালতের বিচারপতি প্রথম বিচারকের রায় বাতিল করবেন না এবং তার পক্ষে উক্ত রায় বাতিল করার ক্ষমতাও নেই; বরং প্রথম বিচারকের রায় কার্যকর করা হবে। এর কারণ হলো, দ্বিতীয় বিচারকের ইজতিহাদ এবং প্রথম বিচারকের ইজতিহাদ একই মানের। প্রথম বিচারকের রায়ে যেমন ভুলের সম্ভবনা রয়েছে তদ্রূপ দ্বিতীয়

বিচারকের ইজতিহাদেও ভুলের সম্ভবনা বিদ্যমান। কারণ কোনো একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদকে সুনিশ্চিতভাবে সঠিক আর অন্যের ইজতিহাদকে ভুল বলা সম্ভব নয়; বরং হাদীসের ভাষ্যমতে (اَلْمُجْتَهِدُ يُصِيْبُ وَيُخْطِئُ) মুজতাহিদ সঠিক এবং ভুল উভয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে। অতএব, উভয় মুজতাহিদের ইজতিহাদ একই পর্যায়ের সাব্যস্ত হলো। কিন্তু প্রথম বিচারকের ইজতিহাদের সাথে বিচারের রায় যুক্ত হওয়ার কারণে তার ইজতিহাদ উচ্চ আদালতের বিচারকের ইজতিহাদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা উচ্চ আদালতের বিচারপতির রায়ের সাথে বিচারের রায় যুক্ত হয়নি। মোটকথা, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উভয়ের ইজতিহাদ সমপর্যায়ের হলেও বিচারের রায় প্রথম বিচারকের ইজতিহাদের সাথে যুক্ত হওয়াতে সেটা শক্তিশালী হয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় বিচারকের ইজতিহাদের সাথে রায় যুক্ত না হওয়াতে সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়ে গেছে এবং প্রথম বিচারকের ইজতিহাদের তুলনায় দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। শক্তিশালী রায় পাওয়া যাওয়ার পর বাতিল হবে না; বরং শক্তিশালী রায় দুর্বল রায় দ্বারা বাতিল হবে না; বরং শক্তিশালী রায়কে কার্যকর করা হবে অর্থাৎ প্রথম বিচারকের রায়কে কার্যকর করা হবে এবং দ্বিতীয় বিচারকের মতকে গ্রহণ করা হবে না।

এ প্রসঙ্গে ইনায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) যখন খিলাফতের কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তখন হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে তাঁর স্থলে বিচারক নিযুক্ত করেন। একদা হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর কাছে দু ব্যক্তি বাদী-বিবাদী হয়ে আসল, তিনি তাদের একজনের পক্ষে রায় দিলেন। এরপর ঘটনাক্রমে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে যার বিপক্ষে রায় গেছে তার সাক্ষাৎ হলো। হযরত ওমর (রা.) তাকে তার মামলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে ঘটনা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-কে অবহিত করল যে, আমার বিপক্ষে রায় হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন, আমি তার স্থানে হলে তোমার পক্ষে রায় দিতাম। তখন সেই ব্যক্তি তাঁকে বলল, [তার রায় বাতিল করে] এখন আপনার রায় প্রদান করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের বিষয়টিতে কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই; বরং এটা একটা ইজতিহাদী বিষয়। [সুতরাং তিনি তার মতে রায় দিয়েছেন।]

এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্টত এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, ইজতিহাদী বিষয়ে রায় ঘোষণা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) [-এর মতো প্রবীণ বিচারপতি] -এর মতের বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথম রায়টি বাতিল করেননি। অর্থাৎ ইজতিহাদী বিষয়ে রায় ঘোষিত হওয়ার পর আরেকটি ইজতিহাদ দ্বারা সেই রায় বাতিল করা যায় না।

হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে তার সহযোগিতার জন্য বিচারক নিয়োগ করেন। তার সাথেও হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর অনুরূপ বিচারের ঘটনা ঘটে। পরে হযরত ওমর (রা.) হযরত যায়েদ (রা.)-এর রায়কে বাতিল করেননি।

তদ্রূপ আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত ওমর (রা.) একদা একটি বিষয়ে রায় প্রদান করেন। এর কিছুকাল পরে হুবহু এমনি একটি ঘটনায় পূর্বের রায়ের বিপরীত রায় প্রদান করেন। তখন হযরত ওমর (রা.)-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি এমনি একটি ঘটনায় এর বিপরীত রায় দিয়েছিলেন। এখন এমন কেন করলেন? উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী উভয় রায়ই সঠিক। অর্থাৎ বিষয়টি যেহেতু ইজতিহাদী বিষয় তাই প্রথমবার এক ইজতিহাদ [যুক্তি] অনুযায়ী রায় প্রদান করেছিলাম আর এখন ভিন্ন ইজতিহাদ অনুযায়ী রায় দিয়েছি। যদি এতে কুরআন বা হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকত তাহলে এ ব্যাপারে একাধিক রায় প্রদান করতাম না। এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, ইজতিহাদী বা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় দ্বারা কাদের মতবিরোধ উদ্দেশ্য? এর উত্তর সামনের ইবারতে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

তবে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে, যদি মাসআলাটি পূর্বযুগে অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে যায় অথবা এককালে এক ধরনের পরিস্থিতির কারণে ওলামায়ে কেরাম এক ধরনের ফতোয়া দিয়েছিলেন বর্তমান প্রেক্ষাপট তা থেকে ভিন্ন। এমতাবস্থায় মুফতি এবং বিচারকগণের উচিত মানুষের জন্য সহজতর বিষয়ে যেন তারা ফতোয়া প্রদান করেন।

وَلَوْ قَضٰى فِى الْمُجْتَهَدِ فِيْهِ مُخَالِفًا لِرَأْيِهٖ نَاسِيًا لِمَذْهَبِهٖ نَفَذَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاِنْ كَانَ عَامِدًا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَوَجْهُ النَّفَاذِ اَنَّهٗ لَيْسَ بِخَطَأٍ بِيَقِيْنٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِى الْوَجْهَيْنِ، لِاَنَّهٗ قَضٰى بِمَا هُوَ خَطَأٌ عِنْدَهٗ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ثُمَّ الْمُجْتَهَدُ فِيْهِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ مِنْهَا، وَفِيْمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ لَا يُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ الْبَعْضِ، وَذٰلِكَ خِلَافٌ وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ، وَالْمُعْتَبَرُ الْاِخْتِلَافُ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো বিচারক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় তার মতের বিরুদ্ধে তার মাযহাবের অবস্থান ভুলে রায় প্রদান করে তাহলে তার রায়টি ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে কার্যকর হবে। আর যদি বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ রায় প্রদান করে সেই [রায় কার্যকর হওয়ার] ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। কার্যকর হওয়ার কারণ হলো, সে রায়টি নিশ্চিতভাবে ভুল নয়। আর সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থাতে রায় কার্যকর হবে না। কেননা সে তো তার মাযহাবে ভুল, এমন বিষয়ে রায় প্রদান করেছে। আর এ মতের উপরই ফতোয়া। আর ইজতিহাদী বিষয়ের অর্থ হচ্ছে উল্লিখিত বিষয়গুলো [তথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা] -এর বিরোধী না হওয়া। হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহ এবং যে ব্যাপারে সিংহভাগ লোক ঐকমত্য পোষণ করে, কতিপয় লোকের বিরোধিতা এতে বিবেচ্য নয়। এটা [তাদের] বিরুদ্ধাচরণ, ভিন্নমত নয়। আর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে প্রথম [সাহাবী ও তাবেয়ীন] যুগের মতবিরোধ। [পরবর্তী কালের মতবিরোধ নয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَضٰى فِى الْمُجْتَهَدِ فِيْهِ الخ : ইতঃপূর্বে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে বিচারকগণের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনার একটি অংশ এবং বিশেষভাবে কোন ধরনের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গে উক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক মূলপাঠ হিসেবে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এনেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ইজতিহাদী মাসআলায় বিচারক নিজ মাযহাব ভুলে নিজ মতের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন, তাহলে ইমাম হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত বিচারকের রায় কার্যকর করা হবে। আর যদি মতের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে রায় প্রদান করে তাহলে তার কার্যকর করার ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। এক বর্ণনা মতে তার রায় কার্যকর হবে। অন্য মতে কার্যকর হবে না। প্রথম মতটি সদরুশ শহীদ শায়েখ জহীরুদ্দীন ও হিদায়ার লেখক গ্রহণ করেন এবং সে মোতাবেক তাঁরা ফতোয়া দেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতানুযায়ী শামসুল আইম্মাহ আল আওজানযাদী ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। হিদায়ার লেখক যেহেতু প্রথম মত তথা রায় কার্যকর হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন তাই তিনি এর দলিল উল্লেখ করেন এই বলে যে, তার রায় কার্যকর হবে। কেননা তার রায় বা ইজতিহাদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না যে, তার ইজতিহাদই সঠিক তার প্রতিপক্ষের ইজতিহাদ সঠিক নয়; বরং ইজতিহাদের সঠিক হওয়া অনিশ্চিত এবং সম্ভাবনাময়, এমতাবস্থায় সেই ইজতিহাদ সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে তিনি যার সাথে বিচারের রায় যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় বিচারকের রায় কার্যকর হবে না, অর্থাৎ যদি কোনো বিচারক ভুলক্রমে তার মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়, এমন বিষয়ে রায় প্রদান করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তার মাযহাবের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন, উভয় অবস্থায় তার রায় গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। তাঁদের দলিল হলো, উক্ত বিচারক তার

ধারণায় যে বিষয়টি ভুল ও অগ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে রায় প্রদান করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার ধারণা ও মতামত হচ্ছে ইজতিহাদী বিষয়ে মাপকাঠি। যেহেতু তার ধারণা ও বিশ্বাসমতে রায় প্রদানকৃত বিষয়টি ভুল তখন তার রায়টি কিভাবে কার্যকর করা হবে? লেখক বলেন, সাহেবাইনের মতের উপর ফতোয়া। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-ও বলেন, সাহেবাইন (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া। কারণ বর্তমান যুগে মানুষ নিজ মাযহাব ত্যাগ করে থাকে সাধারণত নিজ কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে, ভালো কোনো উদ্দেশ্যে নয়। ভুলকারীর রায়ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তার নিয়োগদাতা তার মাযহাবানুযায়ী রায় দিতে তাকে নিয়োগ করেছে। সর্বোপরি তিনি তার বিশ্বাস ও ধারণার বিপরীতে রায় প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُجْتَهَدُ فِيْهِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِفًا الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা হচ্ছে যা কুরআন, মাশহুর হাদীস ও ইজমা বিরোধী নয় এবং মাসআলাটির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো কুরআন-হাদীসের কোনো দলিল না থাকা। এখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে "কুরআনের এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা যার ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেন। অথবা যা সরাসরি আয়াতের অর্থ এবং তার রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো রেওয়ায়েত নেই ও তার ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা সালাফ থেকে বর্ণিত নেই। প্রথম ব্যাখ্যা মতে উদাহরণ হচ্ছে- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের উপর তোমাদের মা [বিবাহের জন্য] হারাম।" সুতরাং কোনো বিচারক যদি রায় প্রদান করে যে, মা বিবাহের জন্য হালাল, তাহলে তা ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ আয়াতের অর্থ দ্ব্যর্থহীন এবং এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

পক্ষান্তরে যার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে- وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - "যে পশু জবাইয়ে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তোমরা তা খেয়ো না।" -[সূরা আন'আম : আয়াত- ১২১]

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে যা করা হয় তা হচ্ছে, যে পশু জবাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খাওয়া যাবে না; কিন্তু এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহিলি যুগে যেসব পশু প্রতিমার নামে জবাই করা হতো তা খাওয়া নিষেধ। সুতরাং আয়াতের দ্ব্যর্থহীন অর্থ সাব্যস্ত হলো না। এ আয়াতের ব্যাপারে আমাদের মাযহাবে মতবিরোধ রয়েছে বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে পশুতে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা হালাল কিনা? এ ব্যাপারে তারফাইন (র.)-এর মত হচ্ছে তা খাওয়া যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হচ্ছে খাওয়া যাবে না। যেমন- "খুলাসাহ" গ্রন্থে আদাবুল কাযী প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো বিচারক ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়া পশু হালাল হওয়ার ব্যাপারে রায় প্রদান করেন তাহলে তার রায় তারফাইন (র.)-এর মতে কার্যকর হবে, অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার রায় বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

সুন্নত ও হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন হাদীস যা সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল এবং আমাদের পর্যন্ত সহীহ সনদের ধারাবাহিকতায় এসে পৌঁছেছে। যেমন- [হাদীস] اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ অর্থাৎ "বাদীর কর্তব্য হচ্ছে সাক্ষী উপস্থাপন করা আর অস্বীকারকারী [বিবাদী] -এর উপর কসম।" সুতরাং কোনো বিচারক যদি একজন সাক্ষী ও একটি শপথের মাধ্যমে বিচারের রায় প্রদান করেন তাহলে তার রায় কার্যকর হবে না। উচ্চ আদালতের বিচারপতি উক্ত রায় বাতিল ঘোষণা করবেন।

ইজমা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জমহুর ওলামায়ে কেরামের ইজমা। জমহুর শব্দের অর্থ হচ্ছে- বেশিরভাগ বা সিংহভাগ। সুতরাং কোনো মাসআলার ব্যাপারে যদি সালাফের অধিকাংশ আলেম এবং বেশির ভাগ বড় বড় আলেম ফতোয়া দেন এবং ঐকমত্য পোষণ করেন আর বিচারক তাদের মতের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন তাহলে তার রায় কার্যকর হবে না। উচ্চ আদালতে এ ব্যাপারে আপিল করা হলে বিচারপতি সে রায়টি নাকচ করে দেবেন, কারণ বিচারকের রায়টি ইজমার পরিপন্থি। যদি কোনো মাসআলায় অধিকাংশ আলেম ঐকমত্য পোষণ করেন; কিন্তু কতিপয় লোক তাদের বিরোধিতা করেন তাহলে তাদের বিরোধিতার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কেননা তাদের এ বিরোধিতা শরিয়তের দৃষ্টিতে বিরুদ্ধাচরণ; এটা ভিন্নমত পোষণ বা মতপার্থক্য নয়। শরিয়তে কারো বিরুদ্ধাচরণ (خِلَافٌ) গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে ভিন্নমত (اِخْتِلَافٌ)। اِخْتِلَافٌ ও خِلَافٌ -এর মাঝে পার্থক্য হলো, خِلَافٌ -এর মধ্যে পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য উভয়ই ভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে اِخْتِلَافٌ -এর

মধ্যে পদ্ধতি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, ইখতিলাফের ভিত্তি হচ্ছে দলিল আর খিলাফের ভিত্তি হচ্ছে গোঁড়ামি এবং একঘেয়েমি। কোন ধরনের ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে একটু পরে আসছি। অধিকাংশের মতের বিপক্ষের উদাহরণ হচ্ছে– এক দিরহামের বিনিময়ে দু-দিরহামের বিক্রির বৈধতার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইজতিহাদ। তাঁর মতে এক দিরহামকে দু-দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে। পক্ষান্তরে জমহুর সাহাবায়ে কেরামের মতে তা জায়েজ নয়। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাসের মতানুযায়ী কোনো বিচারক যদি রায় প্রদান করেন তাহলে সে রায় কার্যকর হবে না। কারণ সব সাহাবায়ে কেরামের বিপক্ষে তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয়। লেখকের وَلَا يُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ الْبَعْضِ দ্বারা এ মতবিরোধিতাই উদ্দেশ্য। লেখকের উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয়ের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজতিহাদের বৈধতার ক্ষেত্রে কতিপয়ের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, بَعْضٌ দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক/ দুজন; অর্ধেকের কম বা শতভাগ না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। সারকথা হচ্ছে, যদি কোনো মাসআলায় সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন; কিন্তু এক/ দুজন তার বিরোধিতা করেন তাহলে বিষয়টি ইজতিহাদী বিষয় বা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং সকল আলেমের বিপরীতে একজনের মতের ভিত্তিতে যদি কেউ রায় প্রদান করে তাহলে তার রায় কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ الْاِخْتِلَافُ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ : লেখক বলেন, মতবিরোধপূর্ণ বা ইজতিহাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সেই মতবিরোধ প্রথম যুগের হতে হবে। প্রথম যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবী ও তাবেয়ীনদের স্বর্ণযুগ। সুতরাং তাঁদের পরবর্তী যুগের মতপার্থক্য ধর্তব্য নয়। সেমতে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে যদি কোনো মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয় এবং সে মতবিরোধ যদি পূর্ব যুগে না হয় তাহলে এমন ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ মতবিরোধটি প্রাথমিক যুগের নয়; বরং মতবিরোধটি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত।

এ প্রসঙ্গে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, প্রাথমিক যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য অবশ্যই সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগ। তবে পরবর্তীকালের বিভিন্ন ইমামগণের মতপার্থক্য এ ইজতিহাদের মধ্যে গণ্য নয়। এ কারণে অনেকে বলেন, যদি মালেকী মাযহাবানুসারী বিচারক কোনো রায় প্রদান করেন তাহলে অন্য বিচারক সে রায়কে তার রায় দ্বারা বাতিল করতে পারবেন। তদ্রূপ শাফেয়ী মাযহাবানুসারী বিচারকের রায় অন্য বিচারক বাতিল করতে পারবেন। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) অথবা ইমাম মালেক (র.)-এর মত তখনই গ্রাহ্য হবে যখন তাঁদের মত সাহাবী/ তাবেয়ীনদের মধ্য থেকে কারো সাথে মিলে যায়। তাঁদের এ জাতীয় মত দ্বারা রায় প্রদান করা হলে বিচারক সে রায়কে বাতিল করতে পারবেন না। এই হিসেবে যে, বিষয়টি সাহাবী/ তাবেয়ীন যুগে মতবিরোধপূর্ণ ছিল। এ হিসেবে নয় যে, মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) অথবা ইমাম মালেক (র.) -এর মত। সুতরাং যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীযুগে মতবিরোধ না থাকে; বরং পরবর্তী ইমামগণের যুগে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে রূপান্তরিত হয় তাহলে এমন মতপার্থক্যের বিষয়ে কোনো বিচারক রায় দিলে উচ্চ আদালত সে রায়কে তার রায়ের মাধ্যমে নাকচ করতে পারে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উপরিউক্ত বিশ্লেষণের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলেন, এ বিশ্লেষণ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যদি ইমাম মালেক (র.), ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বীকৃত মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের ইজতিহাদের বিষয়টি অবশ্যই ইজতিহাদী হবে, অন্যথায় হবে না। যেহেতু তাঁদের মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই তাই তাঁদের মতপার্থক্যের বিষয়গুলোও ইজতিহাদী বিষয়সমূহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মাশায়েখে কেরামের মতপার্থক্য কিছুতেই ইজতিহাদী বিষয় বলে গণ্য হবে না। তাই তাঁদের একজনের মতানুযায়ী কোনো বিচারক রায় প্রদান করলে অন্য বিচারক সে রায় খারিজ করে দিতে পারবেন। কিতাবে বর্ণিত ইবারতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ [প্রথমে আলোচিত] সাধারণ ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেছেন; তারা আল্লামা ইবনুল হুমামের মতটি গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ ইমামগণের মতপার্থক্য ইজতিহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না; বরং ইজতিহাদী বিষয় সেগুলোই যাতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ মতবিরোধ করেছেন। আর যদি ইমামগণের মতপার্থক্য তাঁদের মতবিরোধের ভিত্তিতে হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। তবে ইবনে হুমামের মতে তিন ইমামের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টিও বর্তমান ওলামায়ে কেরাম বিবেচনা করতে পারেন।

قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِيْ فِي الظَّاهِرِ بِتَحْرِيْمِهِ فَهُوَ فِي الْبَاطِنِ كَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَكَذَا اِذَا قَضَى بِاِحْلَالٍ، وَهٰذَا اِذَا كَانَتِ الدَّعْوٰى بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ قَضَاءِ الْقَاضِيْ فِي الْعُقُوْدِ وَالْفُسُوْخِ بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي النِّكَاحِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যেসব বিষয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যত বিচারক রায় প্রদান করেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অভ্যন্তরীণভাবে সেগুলো এরূপই। তদ্রূপ যদি বিচারক হালাল হওয়ার ব্যাপারে রায় প্রদান করেন। এ বিধান তখনই প্রযোজ্য যখন দাবি সুনির্দিষ্ট কারণে উত্থাপিত হয়। এটি মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত মাসআলা। এ আলোচনা 'বিবাহ' অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ قَضَى بِهِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক একটি নতুন প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, যার আলোচনা বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এখানের আলোচনাটি হচ্ছে, মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে যদি কোনো বিচারক [মিথ্যা সাক্ষীদের সম্পর্কে অবগত না হয়ে] রায় প্রদান করেন তাহলে তার সে রায়ের কার্যকারিতা কতটুকু? মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে একটি ভূমিকা প্রাসঙ্গিকভাবে পেশ করছি। মানুষের মালিকানার দাবি দুভাবে হতে পারে–

১. সুনির্দিষ্ট কারণ/ মাধ্যমের সাহায্যে মালিকানার দাবি করা। যেমন– কোনো ব্যক্তি দাবি করল, আমি ক্রয়সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয়েছি। অথবা বলল, দানের মাধ্যমে / উত্তরাধিকারের মাধ্যমে উক্ত সম্পদের মালিক হয়েছি। এ ধরনের মালিকানার দাবিকে اَمْلَاكٌ مُقَيَّدَةٌ বলা হয়।

২. কোনো কারণ/ মাধ্যমের উল্লেখ ব্যতীত মালিকানার দাবি করা। যেমন– এক ব্যক্তি একটি গোলামের মালিকানার দাবি করল; কিন্তু সে উল্লেখ করল না যে, সে কিভাবে উক্ত বস্তুর মালিক হয়েছে। যেমন– সে ক্রয়/ দান/ উত্তরাধিকার এগুলোর কোনোটার কথাই উল্লেখ করল না। একে اَمْلَاكٌ مُرْسَلَةٌ বলা হয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে, বিচারকের রায় দুভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। যথা–

১. বাহ্যিকভাবে বা যাহেরীভাবে অর্থাৎ মানব সমাজের দৃষ্টিতে।

২. বাতেনীভাবে তথা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে বা আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে। যেমন– সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক এই রায় প্রদান করলো যে, ফাতিমা রাশেদের স্ত্রী। বাহ্যিক বা জাহেরীভাবে এ রায়ের অর্থ হচ্ছে রায় প্রদানের পর থেকে ফাতিমা রাশেদের কাছে নিজেকে অর্পণ করবে আর রাশেদ ফাতিমার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বাতেনীভাবে রায় কার্যকর হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে হাজির-নাজির জেনে তার জন্য উক্ত ফাতিমার সাথে সহবাস বৈধ সাব্যস্ত হবে এবং ফাতিমা নিজেকে অর্পণ করার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা থাকবে না।

اَمْلَاكٌ مُرْسَلَةٌ-এর ক্ষেত্রে যদি বিচারক মিথ্যা সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে রায় প্রদান করেন তাহলে তার রায় সকলের ঐকমত্যে বাতেনীভাবে কার্যকর হবে না, তবে বাহ্যিকভাবে তার রায় কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– এক ব্যক্তি বিচারকের এজলাসে উঠে দাবি করল অমুক দাসীটি আমার, আমি দাসীটির মালিক; কিন্তু উক্ত দাবিদার তার মালিকানার সূত্রের উল্লেখ করল না যে, সে কিভাবে দাসীটির মালিক হয়েছে– ক্রয়ের মাধ্যমে বা দানের মাধ্যমে নাকি উত্তরাধিকারের মাধ্যমে। এরপর বিচারক তার কাছে প্রমাণ চাইলে সে দুজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করল যারা দাসীটি তার মালিকানাধীন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করল। বিচারক যেহেতু মিথ্যাসাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না তাই তিনি দাসীটিকে উক্ত দাবিদারের বলে রায় ঘোষণা করলেন। ফলে বাহ্যত দাসীটি দাবিদারের হয়ে গেল। এখন ক্রেতা দাসীটির মালিক, সে তার ভরণপোষণের খরচ বহন করবে। আর দাসী খেদমতের জন্য নিজেকে দাবিদারের হাতে সঁপে দেবে; কিন্তু বিচারকের উক্ত রায় বাতেনীভাবে কার্যকর

হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার মাঝে যে সম্পর্ক সেটাকে সামনে রেখে সে দাসীর সাথে সঙ্গম করবে না এবং তার জন্য কিছুতেই সঙ্গম করা বৈধ হবে না। অন্যদিকে দাসীর জন্য নিজেকে সহবাসের জন্য সঁপে দেওয়া হালাল হবে না।

যদি মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে أَمْلَاكٌ مُقَيَّدَةٌ -এর মাঝে রায় প্রদান করা হয় তাহলে কি হবে? মূলত এ মাসআলাটি ইবারতের মধ্যে এসেছে এবং এ মাসআলার মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ অবস্থাতে বাতেনীভাবে বিচারকের রায় কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন ও অন্য প্রধান তিন ইমামের মতে বাতেনীভাবে রায় কার্যকর হবে না। এ মাসআলাটি "কিতাবুন নিকাহ" [বিবাহ অধ্যায়]–এ নিম্নোক্ত শিরোনামে এসেছে–

إِنَّ الْقَضَا وَالْفَسْخَ بِشَهَادَةٍ بِغَيْرِ عِلْمِ الْقَاضِيْ نَافِذٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لِصَاحِبَيْهِ .

অর্থাৎ চুক্তি প্রমাণে বা চুক্তি প্রত্যাহারে বিচারকের অজান্তে মিথ্যা সাক্ষীদের মাধ্যমে রায় প্রদান করা হলে সে রায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কার্যকর হবে। সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামদের মতে কার্যকর হবে না। যেমন– এক ব্যক্তি এক মহিলার উপর তার স্ত্রীত্বের দাবি করল; কিন্তু মহিলা অস্বীকার করল। অতঃপর দাবিদার মিথ্যা সাক্ষীদের সাহায্যে বিষয়টি প্রমাণে সচেষ্ট হলো। বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী দাবিদারের পক্ষে রায় দিলেন। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাবিদারের জন্য সেই মহিলার সাথে সহবাস করা বৈধ এবং মহিলার জন্য উচিত দাবিদারের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। কিন্তু অন্য কোনো ইমামের নিকট সেটা করা বৈধ নয়। তদ্রূপ যদি কোনো মহিলা দাবি করে তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী অস্বীকার করল। অতঃপর তালাক প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী নিয়ে আসল। মহিলার প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল। তারপর মহিলা ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় বিবাহ করল; কিন্তু পরবর্তীকালে বিচারক মিথ্যাসাক্ষ্যের ব্যাপারে অবগত হলো। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিচারকের রায় বাহ্যিক ও বাতেনী উভয়ভাবে কার্যকর হবে। অর্থাৎ প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর জন্য উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে ও দ্বিতীয় স্বামীর উপর মহিলার খোরপোশ প্রদান করা জরুরি হবে। এমনকি দ্বিতীয় স্বামী যদি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় যে, প্রথম স্বামীর সাথে মিথ্যাসাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তবুও উক্ত স্ত্রী তার জন্য জাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবে বৈধ হবে। আর যদি দ্বিতীয় স্বামী প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয় তাহলে তো তা আরো স্বাভাবিকভাবে বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় (أَمْلَاكٌ مُقَيَّدَةٌ) বিচারকের রায় শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে কার্যকর করা হবে, বাতেনীভাবে কার্যকর হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। যদি দ্বিতীয় স্বামী তার এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলার ব্যাপারে এই দাবি করে যে, মহিলাটি তার স্ত্রী, আর তখন মহিলা সেই পুরুষটিকে অস্বীকার করলে পুরুষ মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে বিচারকের রায় পায় তাহলে মহিলা দাবিদারের স্ত্রী সাব্যস্ত হবে এবং যাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবে রায়টি কার্যকর হবে। অর্থাৎ স্বামীর জন্য সেই মহিলার সাথে সহবাস করা বৈধ এবং মহিলা তার স্বামীর কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন ও অন্য প্রধান তিন ইমামের মতে বিচারকের উক্ত রায় বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে; কিন্তু বাতেনীভাবে কার্যকর হবে না। উপরের উদাহরণগুলোতে মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে হালাল করার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে।

হারাম হওয়ার উদাহরণ হলো– দারুল হারব থেকে বন্দী অবস্থায় আনীত দুটি শিশু মুসলমান দেশে বড় হলো, এক পর্যায়ে দুজনই তাদের মালিক কর্তৃক আজাদ হলো, তারপর একজন অন্যজনকে বিবাহ করল। এরপর সেই দারুল হারব থেকে এক ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় আগমন করল এবং সে প্রমাণ পেশ করল যে, বন্দী দুটি শিশু তার সন্তান ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদের রায় দিলেন, বিচ্ছেদের রায় কার্যকরও হলো; কিন্তু তারপরে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসল, অথবা সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হলো; এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্বামীর জন্য তার সেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। কেননা স্ত্রী হারাম হওয়ার রায়টি বাহ্যিক ও বাতেনী উভয়ভাবে কার্যকর হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হচ্ছে, সাক্ষীদের প্রকৃত মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি এখানে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

قَالَ : وَلَا يَقْضِى الْقَاضِى عَلَى غَائِبٍ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) : يَجُوْزُ لِوُجُوْدِ الْحُجَّةِ، وَهِىَ الْبَيِّنَةُ، فَظَهَرَ الْحَقُّ، وَلَنَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالشَّهَادَةِ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ، وَلَا مُنَازَعَةَ بِدُوْنِ الْاِنْكَارِ وَلَمْ يُوْجَدْ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْاِقْرَارَ وَ الْاِنْكَارَ مِنَ الْخَصْمِ، فَيَشْتَبِهُ وَجْهُ الْقَضَاءِ لِأَنَّ اَحْكَامَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান করবেন না, তবে যদি তার প্রতিনিধি উপস্থিতি থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রমাণ বিদ্যমান থাকাতে তা করা বৈধ, আর তা হচ্ছে সাক্ষীদের সাক্ষ্য। কেননা হক প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দলিল হলো, সাক্ষ্যের মাধ্যমে ফয়সালা করা হয় বিবাদ নিরসনের উদ্দেশ্যে। প্রতিপক্ষের অস্বীকার ছাড়া বিবাদ প্রমাণ হয় না। অথচ এখানে অস্বীকার পাওয়া যায়নি। কেননা প্রতিপক্ষের থেকে স্বীকারোক্তি ও অস্বীকার উভয়ের সম্ভবনা রয়েছে। ফলে বিচার ও রায়ের প্রকৃতি অস্পষ্ট হয়ে যাবে, কেননা এ দুটি [স্বীকারোক্তি ও অস্বীকার] এর বিধান ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَقْضِى الْقَاضِى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক বিচারকের শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, মূলত এ ইবারতে বাদী ও বিবাদীর অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করা যাবে কিনা- সেই মাসআলার অবতারণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান করবেন না। অনুপস্থিত দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাদী। কেননা বাদী সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে এবং উপস্থিত হয়েই বাদী হয়। অনুপস্থিত থাকার দুই অর্থ– ১. শহরেই নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে, ২. শহরে আত্মগোপন করে আছে, বিচারকের মজলিসে অনুপস্থিত। সুতরাং যদি বিবাদী বিচারকের মজলিসে অনুপস্থিত থাকে এবং উক্ত মজলিসে তার কোনো প্রতিনিধি [উকিল বা অছি] না থাকে তাহলে বিচারক তার পক্ষে/ বিপক্ষে কোনো ধরনের রায় প্রদান করবেন না। অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে/ বিপক্ষে রায় দেওয়া বিচারকের জন্য বৈধ নয়, যদি বিচারক রায় প্রদান করে উক্ত রায় কার্যকর হবে না।

এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি বিবাদী শহরে না থাকে অথবা থেকেও আত্মগোপন করে থাকে তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান করা বৈধ। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) একই মত পোষণ করেন; কিন্তু যদি বিবাদী শহরে প্রকাশ্যে থাকে, তাহলে তার বিধান কি হবে– এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী উক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে বিচারক রায় প্রদান করবেন না। এটা ইমাম মালেক (র.)-এর মত। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, আত্মগোপনকারীর অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান না করা হলে বাদীর হক নষ্ট করা হয়; কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তির বিষয়টি এমন নয়। কেননা যেহেতু সে শহরেই রয়েছে এবং তার ঠিকানা জানা আছে সেহেতু বাদীর হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এখানে কম।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামগণের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থ হলো, [বিচারক তার রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে] বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করবে। [যদি বাদী তা উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়] তাহলে অস্বীকারকারী থেকে শপথ গ্রহণ করে তার পক্ষে রায় প্রদান করবেন। হাদীসের মধ্যে বিবাদীর উপস্থিত হওয়ার কোনো শর্ত নেই, এমতাবস্থায় বিবাদীর উপস্থিতির শর্ত করা হাদীসের উপর অতিরিক্ত শর্তারোপ করা। অথচ অতিরিক্ত শর্তের কোনো দলিল নেই, আর হাদীসের উপর দলিল ছাড়া অতিরিক্ত শর্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বিচারের রায় প্রদান করা বৈধ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো, মামলার ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে

দলিল-প্রমাণ। এই দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার রায় হয়ে থাকে। প্রমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সাক্ষীর উপস্থিতি, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে দলিল। যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য পাওয়া গেল তখন হক প্রকাশিত হলো। যেহেতু হক পাওয়া গেছে সুতরাং বিচারক হক মোতাবেক রায় প্রদান করবেন- এতে বিবাদী উপস্থিত থাকুক বা নাই থাকুক।

কেউ কেউ অবশ্য হযরত আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এর হাদীসের সাহায্যে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেন। হিন্দা রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে বলেন–

إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَ وَلَدِيْ فَقَالَ خُذِيْ مِنْ مَالِ اَبِيْ سُفْيَانَ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহর রাসূল! [আমার স্বামী] আবূ সুফিয়ান খুবই কৃপণ। আমার এবং আমার সন্তানের অতিপ্রয়োজনীয় ভরণপোষণ সে আমাদের দেয় না। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি আবূ সুফিয়ানের মাল থেকে তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করতে পার।" তারা এভাবে দলিল দেন যে, রাসূল ﷺ উপরিউক্ত ঘটনায় আবূ সুফিয়ানের অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করেছেন। অতএব বিবাদীর অনুপস্থিতে রায় প্রদান বৈধ হবে।

এর উত্তর হচ্ছে– দলিলটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটা কোনো বিচারের ঘটনাই ছিল না। এজন্য রাসূল ﷺ হিন্দা -এর কাছে কোনো সাক্ষী-প্রমাণ তলব করেননি; বরং রাসূল ﷺ আবূ সুফিয়ানের ভরণপোষণ প্রদানে কৃপণতার কথা জানতেন। সে মোতাবেক রাসূল ﷺ সমাধান দিয়েছিলেন। এজন্যই শুধুমাত্র হিন্দার অভিযোগে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় প্রদান নাজায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে

আহনাফের প্রথম দলিল :

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيٍّ حِيْنَ بَعَثَهٗ اِلَى الْيَمَنِ : لَا تَقْضِ لِاَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِشَيْءٍ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ فَاِنَّكَ اِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الْاٰخَرِ عَلِمْتَ كَيْفَ تَقْضِيْ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ যখন হযরত আলী (রা.)-কে বিচারকরূপে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেন, কোনো একপক্ষের অনুকূলে কোনো বিষয়ে রায় প্রদান করবে না যে পর্যন্ত তুমি প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনবে না। কেননা যখন তুমি প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনবে তোমার রায় দানের পদ্ধতি জানা হয়ে যাবে।" এ হাদীসের দ্বারা স্পষ্টত বুঝা গেল যে, রায় প্রদানের জন্য বাদী ও বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শোনা আবশ্যক। একজনের বক্তব্য শুনে রায় প্রদান অনুচিত। দুজনের বক্তব্য তখনই শোনা সম্ভব হবে যখন বিচারকের এজলাসে উভয়েই উপস্থিত হবে। তবে যদি কোনো পক্ষের মূল ব্যক্তি উপস্থিত না হয়ে তার স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি [উকিল] উপস্থিত হয় তাতেও চলবে; কিন্তু যদি বিচারকের এজলাসে বিবাদী কিংবা তার স্থলবর্তী কেউই উপস্থিত না হয় তাহলে বিচারকের পক্ষে রায় প্রদান করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : [যা ফাতহুল কাদীরে উল্লিখিত] এই সাক্ষীর দ্বারা আমল তখনই ওয়াজিব হয় যখন অস্বীকারকারী সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে প্রতিহত করতে কিংবা সাক্ষীদের সমালোচিত করতে ব্যর্থ হয়। বিবাদীর উক্ত অক্ষমতা প্রকাশিত হওয়ার জন্য তার কিংবা প্রতিনিধির উপস্থিতি জরুরি। যখন বিবাদী/ তার প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকবে তাদের অক্ষমতা জানা যাবে না। আব অক্ষমতা জানা সম্ভব না হলে সাক্ষ্যকে অত্যাবশ্যকীয় শরিয়তের দলিলরূপে উপস্থাপন করা যাবে না; যার সাহায্যে বিচারক রায় প্রদান করবেন। এমতাবস্থায় উক্ত সাক্ষ্য দ্বারা বিচারকের রায় প্রদান বৈধ হবে না। এ দলিলের দ্বারাও প্রমাণ হলো যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

তৃতীয় দলিল : সাক্ষ্য প্রদান কিংবা সাক্ষ্য শ্রবণের প্রয়োজন তখনই হয়ে থাকে যখন বিবাদী অস্বীকার করে, এজন্যই তো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিদাতার বিপক্ষে সাক্ষ্য তলব করা হয় না এবং স্বীকারোক্তি করা হলে সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় প্রদান করা হয় না। বিবাদী অনুপস্থিত থাকলে অস্বীকার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ সাক্ষ্য তলব করার জন্য অস্বীকার সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি বা সাক্ষ্য তলব করার জন্য অস্বীকার সম্পর্কে অবগত হওয়া শর্ত। অতএব, শর্ত সম্পর্কে না জেনে শর্তযুক্ত (مَشْرُوْط) বিষয়ের বাস্তবায়ন করার হুকুম দেওয়া উচিত নয়।

হিদায়ার লেখক **তৃতীয় দলিলটিকে** এভাবে বলেছেন– সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা বিবাদ নিরসনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। বিবাদ বা ঝগড়া তখনই দেখা দেবে যখন বিবাদী বাদীর দাবিকে অস্বীকার করবে। আর অস্বীকার করার জন্য অবশ্যই বিবাদীর উপস্থিতি জরুরি। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে অস্বীকার পাওয়া যায়নি। অস্বীকার বিদ্যমান না হওয়াতে ঝগড়া ও

বিবাদ সৃষ্টি হয়নি। অতএব, সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে আমল করা বৈধ হবে না। সুতরাং বিবাদীর অনুপস্থিতিতে যদি বিচারক রায় প্রদান করেন তাহলে উক্ত রায় কার্যকর হবে না। অতএব, এ দলিলের মাধ্যমেও একথাই প্রমাণ হলো যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

তৃতীয় দলিলের উপর দু'টি আপত্তি করা হয়–

প্রথম আপত্তি : উপরিউক্ত দলিলের দ্বারা বুঝা যায় যে, অস্বীকার পাওয়া গেলেই সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় প্রদান করা বৈধ হবে। সুতরাং কোনো বিবাদী যদি উপস্থিত হয়ে অস্বীকার করে তারপর অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার বিপক্ষে সাক্ষ্যের মাধ্যমে তার অনুপস্থিতিতে রায় প্রদান করা বৈধ হবে। অথচ এটাও তো قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ -ই হলো।

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে অস্বীকার পাওয়া গেলেই তার বিপক্ষে সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় প্রদান করা বৈধ হবে না; বরং তার অস্বীকার স্থায়ী হতে হবে, আর এ স্থায়িত্ব বুঝা যাবে রায় প্রদানের মজলিসে বিবাদীর উপস্থিত থাকার মাধ্যমে। কেননা বিবাদী উপস্থিত না হলে এ সম্ভবনা থাকতে পারে যে, সে অস্বীকার থেকে কি তার অবস্থার পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয় আপত্তি : দ্বিতীয় আপত্তিটি হচ্ছে, বিবাদী যদি উপস্থিত হয় এবং বাদীর দাবি শুনে চুপ থাকে, স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করে এমতাবস্থায় বিচারক যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন তাহলে উক্ত রায় কার্যকর হবে এবং রায় বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হবে। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে অস্বীকার ও ঝগড়া ছাড়াই বিচারক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় কার্যকর করেছেন। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিবাদ / অস্বীকার ব্যতীত সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় কার্যকর করা বৈধ নয়।

উত্তর : এর জবাব হচ্ছে, বিবাদীর চুপ থাকাকে শরিয়ত অস্বীকারকারীর পর্যায়ে রেখেছে। কেননা মুসলমানের বাহ্যিক অবস্থার দাবি এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে কোনো হক চায় তাহলে সে চুপ থাকবে না। হয়তো স্বীকার করবে নতুবা সরাসরি অস্বীকার করবে। যেহেতু সে স্বীকার করছে না; বরং চুপ থাকছে তাই তার চুপ থাকাকে অস্বীকার ধরা হবে। সুতরাং বুঝা গেল বিবাদীর এক্ষেত্রে চুপ থাকা অস্বীকার করার পর্যায়ে। সুতরাং আর কোনো আপত্তি রইল না।

চতুর্থ দলিল : অনুপস্থিত বিবাদীর ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা বিদ্যমান– হয়তো সে স্বীকার করবে নতুবা অস্বীকার করবে। স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বিচারের রায় এক ধরনের হয় আর অস্বীকারের ক্ষেত্রে রায় হয় ভিন্ন। ফলে বিবাদীর অনুপস্থিতির অবস্থায় বিচারকের রায়ের প্রকৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ বিবাদীর অনুপস্থিতিতের ক্ষেত্রে এটাও বলা যেতে পারে যে, বিবাদী অস্বীকার করছে। এজন্যই বিচারক সাক্ষীদের মাধ্যমে বিচারের রায় প্রদান করেছেন। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, বিবাদী উপস্থিত হলে বাদীর দাবি স্বীকার করত, আর যে কারণে বিচারক তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করতেন। আর এ দু রায়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে যে রায় প্রদান করা হয় তা বিবাদী ও সকলের ব্যাপারে কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তির কারণে যে রায় প্রদান করা হয় তা শুধুমাত্র বিবাদীর উপর কার্যকর হয়, তা বিবাদী ব্যতীত অন্য কারো উপর কার্যকর হয় না। আরেকটি পার্থক্য হলো, যদি বিচারক বিবাদীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে রায় প্রদান করে, তাহলে পরবর্তী কালে বিবাদী তার সততা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য পেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে রায় প্রদান করেন তাহলে বিবাদী তার সততা প্রমাণে সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারবে। এ দু রায়ের পার্থক্য একটি উদাহরণের মধ্যে প্রতিভাত হয় এভাবে যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল, অতঃপর দাসীটি তার নিকট বাচ্চা জন্ম দিল। এরপর একব্যক্তি দলিল ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে দাসীটির হকদার সাব্যস্ত হলো। অতএব, হকদার দাসী ও তার শিশু বাচ্চা উভয়কে নিয়ে নেবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে দাসীর হকদার সাব্যস্ত হয় তাহলে হকদার শুধুমাত্র দাসীটি নিতে পারবে তার জন্ম দেওয়া শিশু নিতে পারবে না। তদ্রূপ স্বীকারকারী দাসীটির মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে দাসীর হকদার প্রমাণিত হয় তাহলে ক্রেতা দাসীর মূল্য ফেরত নিতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, অস্বীকার বিচারকের রায়ের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার যে শর্তারোপ করা হয়েছে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। **ইমাম আবূ ইউসুফ** (র.)-এর মতে অস্বীকার পাওয়া গেলেই অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান করা যাবে। অস্বীকার প্রলম্বিত হওয়া আবশ্যক নয়।

তাছাড়া **ইমাম আবূ ইউসুফ** (র.) বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের পরে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে/ বিপক্ষে রায় প্রদানকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন এবং মানুষের সম্পদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এটাকে উত্তম মনে করেন।

وَلَوْ اَنْكَرَ ثُمَّ غَابَ فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ لِاَنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الْاِنْكَارِ وَقْتَ الْقَضَاءِ، وَفِيْهِ خِلَافُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُوْنُ نَائِبًا بِاِنَابَتِهٖ كَالْوَكِيْلِ اَوْ بِاِنَابَةِ الشَّرْعِ كَالْوَصِىِّ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِىْ، وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا بِاَنْ كَانَ مَا يَدَّعِىْ عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِيْهِ عَلَى الْحَاضِرِ، وَهٰذَا فِىْ غَيْرِ صُوْرَةٍ فِى الْكُتُبِ اَمَّا اِذَا كَانَ شَرْطًا لِحَقِّهٖ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهٖ فِىْ جَعْلِهٖ خَصْمًا عَنِ الْغَائِبِ، وَقَدْ عُرِفَ تَمَامُهُ فِى الْجَامِعِ .

অনুবাদ : যদি বিবাদী [আদালতে উপস্থিত হয়ে] হক অস্বীকার করে, তারপর দৃশ্যের আড়ালে চলে যায় তাহলে একই বিধান। কেননা শর্ত হচ্ছে বিচারের সময় অস্বীকার বহাল থাকা। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি স্থলবর্তী হবে সে হয়তো বা বিবাদীর স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন– উকিল। অথবা শরিয়তের স্থলবর্তী করার দ্বারা, যেমন– বিচারকের পক্ষ থেকে অসিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কিংবা বিবাদীর স্থলবর্তী হবে আইনগতভাবে। যেমন– অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে তা উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে দাবি করার কারণ হবে। এর অনেক উদাহরণ ফিকহশাস্ত্রের কিতাবগুলোতে রয়েছে। সুতরাং যদি বাদীর হক প্রমাণ করার শর্ত হয় তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপস্থিত ব্যক্তিকে স্থলবর্তী করার সময় উক্ত শর্ত ধর্তব্য হবে না। বিস্তারিত আলোচনা আল জামিউস সাগীর গ্রন্থে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنْكَرَ ثُمَّ غَابَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে পূর্ববর্তী ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বের বিশ্লেষণে আলোচনা করেছিলাম যে, যদি বিবাদী বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হয়ে অস্বীকার করে, তারপর মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকে তাহলেও বিচারকের জন্য অনুপস্থিত বিবাদীর ব্যাপারে রায় প্রদান করা বৈধ হবে না। কেননা বিচারের রায় প্রদানের সময় অস্বীকার বহাল থাকা জরুরি। আর বিবাদী যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার অস্বীকার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হবে না।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে বিবাদী একবার অস্বীকার করে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিপক্ষে রায় প্রদান করা যাবে। তার মতে বিবাদী অস্বীকার করার পর যেহেতু বিচারের রায় পর্যন্ত অনুপস্থিত সেহেতু তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, বিচারক পূর্ববর্তী অবস্থার উপর কিয়াস করে রায় প্রদান করবেন, আর পূর্ববর্তী অবস্থা হচ্ছে অস্বীকার। সুতরাং তাঁর মতে যেহেতু এভাবে বিচারের রায় প্রদান করার পূর্ব পর্যন্ত অস্বীকার স্থায়ী হয় তাই বিচারকের রায় প্রদান করা বৈধ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) তাঁর বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'বিনায়া'য় লিখেন; কোনো কিছু প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে 'ইসতিসহাবে হাল' [পূর্ববর্তী অবস্থার ভিত্তিতে রায়] দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। 'ইসতিসহাবে হাল' দ্বারা কোনো কিছু প্রত্যাহার/ প্রত্যাখান করা যায় বটে; কিন্তু কোনো বিষয় প্রমাণ করা যায় না। এখানে যেহেতু ইসতিসহাবে হাল দ্বারা বিচারের রায় প্রমাণ করা দরকার তাই এখানে বিচারের রায় প্রদান পর্যন্ত অস্বীকারের উপর অব্যাহত

অবস্থা (اِسْتِمْرَارْ) প্রমাণিত হবে না। যেহেতু বিচারের রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অস্বীকারের অবস্থা অব্যাহতভাবে পাওয়া যায়নি সুতরাং বিচারকের রায় প্রদানের শর্ত পাওয়া যায়নি। আর রায় প্রদানের শর্ত পাওয়া যেহেতু যায়নি তাই এ অবস্থায় বিচারকের রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُوْنُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় প্রদান করা যদিও বৈধ নয়; কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি যদি বিচারকের মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় প্রদান করা বৈধ হবে। এরপর লেখক স্থলবর্তী ব্যক্তির ব্যাখ্যা করছেন এভাবে যে, স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি তিন ধরনের হতে পারে– ১. প্রকৃত স্থলবর্তী ২. শরয়ী স্থলবর্তী ও ৩. হুকমী স্থলবর্তী।

১. প্রকৃত স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি হচ্ছে– বিবাদী নিযুক্ত উকিল, যে বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করে থাকে। যেহেতু উকিল সরাসরি বিবাদী কর্তৃক নিযুক্ত তাই উকিল বিচারকের মজলিসে উপস্থিত থাকা মানে বিবাদী উপস্থিত থাকা।

২. শরিয়তের দৃষ্টিতে স্থলবর্তী হচ্ছে– বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত অছি। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, অছির কথা নির্দিষ্টভাবে লেখক বলেছেন, এর দ্বারা লেখক উদ্দেশ্য مُسَخَّرْ -কে বাদ দেওয়া। অর্থাৎ مُسَخَّرْ যদি বিচারকের মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে অনুপস্থিত বিবাদীর ব্যাপারে রায় প্রদান বৈধ হবে না। مُسَخَّرْ -এর ব্যাখ্যায় ফাতহুল কাদীরে লিখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে বিচারক বাদীর দাবি শুনার জন্য মজলিসে দাঁড় করিয়েছেন তাকে مُسَخَّرْ বলা হয়। অদ্রূপ যদি বাদী কোনো ব্যক্তিকে মামলার শুনানি শুনার জন্য উপস্থিত করে এবং বিচারক নিশ্চিতভাবে জানে যে, লোকটি প্রতিপক্ষ নয় তাহলে তার সামনে অভিযোগ শুনাবেন না।

৩. হুকমী স্থলবর্তীর অর্থ হচ্ছে, বাদী যে বিষয়ে বিবাদীর উপর হক দাবি করছে সে ঐ বিষয়ের সবব হয়েছে আবশ্যিকভাবে ও সব সময়ের জন্য। এমন নয় যে, কোনো সময়ের জন্য সবব ছিল; কিন্তু এখন সবব নয়। হিদায়ার লেখক বলেন, হুকমী স্থলবর্তী হওয়ার উদাহরণ ফিকহশাস্ত্রের কিতাবগুলো অনেক রয়েছে। যেমন– রাশেদ খালেদের উপর এই দাবি করল যে, খালেদ যে বাড়িতে বর্তমানে বসবাস করছে বাড়িটি আমার। আমি বাড়িটি আব্দুল করীম থেকে খরিদ করেছি, যখন আব্দুল করীম বাড়িটির মালিক ছিল। এ মুহূর্তে আব্দুল করীম অনুপস্থিত। রাশেদ আরো বলল, খালেদ বাড়িটি আমার থেকে জবরদস্তি দখল করে নিয়েছে। অথচ খালেদ জবরদখল করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় রাশেদ তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করল, তাহলে রাশেদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে রাশেদ বিচারের যে রায় পাবে তা খালেদের উপর যেভাবে কার্যকর সেভাবে অনুপস্থিত আব্দুল করীমের বিপক্ষেও কার্যকর হবে। কেননা [রাশেদের] খালেদের উপর হক দাবি করার সবব সেই [আব্দুল করীম], কেননা তার থেকেই তো রাশেদ বাড়িটি ক্রয় করেছিল। সুতরাং আব্দুল করীমের পক্ষ থেকে খালেদ হুকমী স্থলবর্তী হয়ে গেল। সুতরাং বিবাদী [আব্দুল করীম] যদিও অনুপস্থিত; কিন্তু তার হুকমী স্থলবর্তী বিচারের মজলিসে যেহেতু উপস্থিত তাই আব্দুল করীমের [অনুপস্থিত ব্যক্তির] ব্যাপারে রায় প্রদান করা বৈধ হবে।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো, মঈন যায়েদের কাছে একটি বাড়ির শুফআহ দাবি করল। [অর্থাৎ সে বলল, যে বাড়িটি তুমি খরিদ করেছ, এটা আমার পার্শ্ববর্তী জমিন, তাই আমি জায়গাটির শুফআহ দাবি করছি।] কিন্তু যায়েদ বলল, আপনি ভুল বলছেন, আমি বাড়িটি কারো কাছ থেকে খরিদ করেনি। আমি উত্তরাধিকারীসূত্রে বাড়িটির মালিক হয়েছি। এরপর মঈন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল যে, যায়েদ বাড়িটি হামিদ [যে বর্তমানে অনুপস্থিত] থেকে খরিদ করেছে। হামিদ বিক্রির সময় বাড়িটির মালিক ছিল। মঈন বলল, আমি উক্ত জমিনের পার্শ্ববর্তী জমিনদার হওয়ার কারণে জমিনটি শুফআর ভিত্তিতে দাবি করছি। ফলে যায়েদের ব্যাপারে জমিন ক্রয়ের আর হামিদের ব্যাপারে বিক্রির রায় প্রদান করা হবে। যায়েদ হামিদের পক্ষে হুকমী স্থলবর্তী মনোনীত হবে। কেননা যায়েদের উপর শুফআহ দাবি করার সবব [কারণ] হচ্ছে, যায়েদ এ বাড়িটি হামিদের থেকে ক্রয় করেছিল। সুতরাং এ মাসআলায় বিবাদী তথা বিক্রেতা [হামিদ] যদিও অনুপস্থিত; কিন্তু তার হুকমী স্থলবর্তী যায়েদ উপস্থিত আছে। এমন আরো উদাহরণ ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান।

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সবব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সব সময়ের জন্য সবব হতে হবে। সাময়িক সবব -এর ভিত্তিতে হুকমী স্থলবর্তী করা যাবে না। যেমন– এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল। ক্রয়ের পর ক্রেতা দাবি করল যে, দাসীটির পূর্ব মালিক দাসীটিকে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছিল। দাবিদার উক্ত দাবির সত্যতা প্রমাণে সাক্ষী হাজির করল এবং বিবাহের দোষে দুষ্ট হওয়াতে দাসীটিকে ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু দাবিদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত [পূর্ব মালিক] এবং অনুপস্থিত [দাসীর স্বামী] কারো বিপক্ষে কার্যকর হবে না। কেননা ক্রেতা এখানে দুটি বিষয়ের দাবি করেছে–

১. উপস্থিত মনিবের কাছে দাবি করেছে দোষের কারণে দাসীটিকে ফেরত দিতে, আর

২. অনুপস্থিত স্বামীর উপর বিবাহের দাবি করেছে। অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে দাবি তথা বিবাহ সে সময় পর্যন্ত দাসী ফেরত দেওয়ার কারণরূপে গণ্য হবে যতক্ষণ বিবাহ বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী ক্রেতার ক্রয়ের পূর্বেই দাসীটিকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ সংক্রান্ত দোষ তো রইল না, সুতরাং তা দাসী ফেরত দেওয়ার সবব হবে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, বিবাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দাসী ফেরত দেওয়ার সবব হবে। আর সেই নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে বিবাহ বহাল থাকা পর্যন্ত। কিন্তু যদি দাসীটি ক্রয় করার পূর্বে দাসীটিকে তার স্বামী তালাক দিয়ে থাকে তাহলে বিবাহ দাসী ফেরত দেওয়ার সবব হবে না। কেননা তালাকপ্রাপ্তা দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহজনিত দোষ দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং দাসীর ক্ষেত্রে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে না। তাই এ উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বিবাহ এক সময়ে ক্রীতদাসী ফেরত দেওয়ার সবব; কিন্তু অন্য সময় বিবাহ দাসী ফেরত দেওয়ার সবব নয়। অতএব, এ মাসআলায় কাউকে হুকমী স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা যাবে না।

قَوْلُهُ اَمَّا اِذَا كَانَ شَرْطًا لِحَقِّهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الخ : লেখক বলেন, যদি এমন হয় যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির যেসব হকের দাবি রয়েছে তা উপস্থিত ব্যক্তির উপর হক প্রমাণ করার শর্ত হয়- সবব না হয়, তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিকে স্থলবর্তী নির্ধারণ করা বৈধ নয়। কেননা স্থলবর্তী নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়; বরং সবব গ্রহণযোগ্য। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি রাশেদ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তুমি তালাক। এরপর এ লোকের স্ত্রী বলল, রাশেদ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তারপর মহিলা রাশেদের স্ত্রী তালাক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সেই সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তালাকের রায় প্রদান করা হবে না। কেননা অনুপস্থিত [রাশেদ] -এর উপর তালাকের যে দাবী করা হয়েছে যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে তা উপস্থিত ব্যক্তি [স্ত্রীর প্রতি তালাক শর্তারোপকারী] -এর উপর হক তথা তালাক প্রমাণ করার শর্ত। যেহেতু ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হুকমী স্থলবর্তী নির্ধারণ করার জন্য সবব গ্রহণযোগ্য; পক্ষান্তরে শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় এজন্য এক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে স্থলবর্তী হবে না। কারণ এখানে শর্ত পাওয়া গেছে, সবব পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন : ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি আপত্তি করা হয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক হবে যদি অমুক ব্যক্তি তোমার ঘরে প্রবেশ করে। এরপর এ লোকের স্ত্রী সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, অমুক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেছে। তাহলে উক্ত বিষয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারক তালাক সংঘটিত হওয়ার রায় প্রদান করবেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, এ মাসআলা পূর্বের মাসআলার অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে তালাক সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর যে দাবি তা উপস্থিত ব্যক্তির উপর হক প্রমাণিত হওয়ার শর্ত- সে হিসেবে এখানে তালাক সংঘটিত না হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু পূর্বের মাসআলার বিপরীতে এখানে শর্তকে গ্রহণ করা হচ্ছে তথা তালাক সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর : এর উত্তরে লেখক বলেন, বাড়িতে প্রবেশ করার শর্তারোপ করা হলে যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তির হক নষ্ট করা হয় না তাই এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান বলে গণ্য হয় না। যেহেতু এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় প্রদান বলে গণ্য নয় সেহেতু এটা ঐ মাসআলার মতো নয়। অতএব, এতে শর্ত গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। অথচ প্রথম মাসআলাতে অনুপস্থিত ব্যক্তি তথা রাশেদের হক বাতিল করা হচ্ছে তাই তাতে শর্তকে গ্রহণ করা হয়নি। বিস্তারিত আলোচনা ইমাম মুহাম্মদের জামিউস সাগীরে রয়েছে।

قَالَ : وَيَقْرِضُ الْقَاضِى أَمْوَالَ الْيَتَامٰى، وَيَكْتُبُ ذِكْرَ الْحَقِّ، لِاَنَّ فِى الْاِقْرَاضِ مَصْلَحَتَهُمْ لِبَقَاءِ الْاَمْوَالِ مَحْفُوْظَةً مَضْمُوْنَةً، وَالْقَاضِى يَقْدِرُ عَلَى الْاِسْتِخْرَاجِ، وَالْكِتَابَةِ لِيَتَحَفَّظَهُ، وَاِنْ اَقْرَضَ الْوَصِىُّ ضَمِنَ، لِاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِسْتِخْرَاجِ، وَالْاَبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِىِّ فِىْ اَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ لِعَجْزِهٖ عَنِ الْاِسْتِخْرَاجِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিচারক [তার কাছে রক্ষিত] এতিমের মাল কর্জরূপে অন্যকে দিতে পারে। তবে তার হকের কথা লিখে রাখবেন। কেননা কর্জ প্রদানের মধ্যে তাদের কল্যাণ বিদ্যমান। কারণ এতে তাদের মাল সংরক্ষিত এবং ঋণগ্রহীতাদের জিম্মায় বহাল থাকবে। তাছাড়া বিচারক সেগুলো আদায় করতে সক্ষম। লিপিবদ্ধকরণ স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে। যদি অছি এতিমের মাল কর্জরূপে প্রদান করে তাহলে সে এর জামিন হবে। কেননা সে তা উসুল করতে [বিচারকের মতো] সক্ষম নয়। বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েতে অনুযায়ী পিতা অছির পর্যায়ে, কেননা তিনিও আদায় করতে সক্ষম নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقْرِضُ الْقَاضِى أَمْوَالَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিচারকের এখতিয়ারভুক্ত একটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, এতিমের মাল অন্যকে কর্জরূপে প্রদান করা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিচারকের জন্য তার কাছে রক্ষিত এতিমের মাল অন্য [বিশ্বস্ত ও লেনদেনে উত্তম] ব্যক্তিদের প্রদান করার এখতিয়ার রয়েছে। তাজুশ শরীয়াহ (র.) বলেন, বিচারক বিশ্বস্ত ও লেনদেনে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের তা প্রদান করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, বিচারকের উক্ত এখতিয়ার তখনই কার্যকর হবে যখন এতিমের মালে এতিমের কর্তৃত্ব না থাকে। যদি এতিমের কর্তৃত্ব থাকে তাহলে বিচারক তার মালে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত রয়েছে। যাহোক এতিমের বিচারক কর্জরূপে প্রদান করলে তা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। বিচারক ঋণ সংক্রান্ত নথিতে এভাবে লিখবেন যে, "অমুক এতিমের মাল এই পরিমাণ মাল, অমুক তারিখে, অমুক ব্যক্তিকে ঋণরূপে প্রদান করা হলো।"

এরপর লেখক কর্জ প্রদানের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, বিচারকের কাছে এতিমের মালামাল রাখা হয়। অথচ বিচারক অতিব্যস্ত মানুষ ব্যস্ততার কারণে এতিমের মালামাল হেফাজত করা বিচারকের পক্ষে কঠিন। সুতরাং কর্জ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত মালের সংরক্ষণ সম্ভব। কারণ কর্জের মাল যদি কর্জ গ্রহীতার কাছে নষ্টও হয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে বিচারকের কাছে নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। এভাবে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, কর্জ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এতিমের মালের অধিকতর সংরক্ষণ হয়। এখানে একটি আপত্তি অবশ্য হতে পারে যে, কর্জ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা এমন হতে পারে যে, কর্জগ্রহীতা ঋণ গ্রহণের কথা অস্বীকার করে বসল, তখন তো ঋণের মাল হালাক হয়ে গেল। এর উত্তরে লেখক বলেন, যেহেতু বিচারকের কর্জ প্রদানের বিষয় জানা আছে এবং তার কাছে বিষয়টি লিখিত এবং তা উসুল করার ক্ষমতাও তার কাছে রয়েছে, তাই তা উসুল করতে বিচারকের কোনো সমস্যা হবে না। অতএব, এতিমের মাল নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভবনা রইল না। সারকথা হচ্ছে এতিমের মাল কর্জ প্রদানের ক্ষেত্রে মাল হিফাজতের মত গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা থাকায় কর্জ প্রদানে কোনো সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য যে, বিচারক এতিমের রক্ষিত মালামাল অন্য কাউকে আমানতরূপে প্রদান করবে না, কেননা তাতে যদিও মালের সংরক্ষণ হবে; কিন্তু মালের জামানত থাকবে না। কেননা আমানতের মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে এর ক্ষতিপূরণ আদায়ের বাধ্যবাধকতা নেই।

লেখক বলেন, কর্জ প্রদানের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার যৌক্তিকতা হলো, লিপিবদ্ধ করার কারণে বিচারকের স্মরণ থাকবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَقْرَضَ الْوَصِيُّ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অছির জন্য এতিমের মাল ঋণরূপে প্রদান করা বৈধ নয়। যদি কোনো অছি এতীমের মাল কর্জ হিসেবে প্রদান করে তাহলে সে উক্ত মালের জামিন হবে। অর্থাৎ কর্জগ্রহীতা যদি মাল ফেরত দেয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কর্জগ্রহীতা যদি মাল ফেরত না দেয় কিংবা আংশিক ফেরত দেয় তাহলে সে মাল পুরো আদায়ের দায় অবশ্য অছিকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা যদিও কর্জ প্রদানের মাধ্যমে মালের সংরক্ষণ হয় এবং ঋণ গ্রহণকারীদের উপর তা আদায়ের বাধ্যবাধকতা থাকে কিন্তু যদি ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রহণের ঘটনা অস্বীকার করে বসে তাহলে ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণ আদায়ের ক্ষমতা অছির নেই। কেননা হয়তো অছি কোনো উপযুক্ত সাক্ষী পাবে না অথবা সাক্ষীই পাবে না। যদি সাক্ষী পায়ও তাহলে সব সাক্ষীই ন্যায়সঙ্গত হয় না। আবার সবকিছু ঠিক থাকলেও দেখা যায় বিচারক ন্যায়পরায়ণ হয় না। তাছাড়া মামলা মকদ্দমার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়রানি তো আছেই। এসবের ফলে এতিমের ক্ষতিই বাড়বে বৈ কিছু নয়। আর এজন্যই এতিমের মাল অছির জন্য কর্জরূপে প্রদান করা বৈধ নয়। যদি সে ঋণরূপে প্রদান করে তাহলে মালের জামিন হবে।

قَوْلُهُ وَالْأَبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এতিমের মালের ক্ষেত্রে অছির যে হুকুম তদ্রূপ ছোট সন্তানের মালের ব্যাপারে পিতার হুকুম। অর্থাৎ আপন নাবালেগ সন্তানের মাল কর্জরূপে অন্য কাউকে দেওয়ার অধিকার পিতার নেই। তবে যদি পিতা ছোট সন্তানের মাল কাউকে কর্জরূপে প্রদান করে তাহলে উক্ত মালের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ পিতার। যদি কোনো পিতা তার সন্তানের মাল কাউকে ঋণরূপে প্রদান করে আর উক্ত ঋণ যথাসময়ে আদায় হয়ে যায় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় না করে তাহলে পিতাকে উক্ত ঋণের জরিমানা আদায় করতে হবে। পিতার হুকুম অছির মতো হওয়ার কারণ হচ্ছে পিতাও [একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে] অছির মতো ঋণ আদায়ে পূর্ণ সক্ষম নন।

কোনো কোনো বর্ণনামতে পিতার ক্ষমতা যেহেতু অছির চেয়ে অনেক বেশি তাই পিতা অছির মতো নয়। সেই বর্ণনার দলিল হলো, পিতার ক্ষমতা ব্যাপক। পিতা সন্তানের জান ও মালের রক্ষক যেমন বিচারক। অথচ অছি কেবল মালের তদারককারী। তাছাড়া পিতার সন্তানের প্রতি সবিশেষ স্নেহ-মমতা রয়েছে, যা আর কারো নেই। ফাতহুল কাদীরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে– কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, পিতার জন্য যাদের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাদের ঋণ দেওয়া বৈধ। যেমন– পিতার নিজের ঋণ নেওয়া বৈধ।

তবে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরূপ ঋণ দেওয়া বা নেওয়া বৈধ নয়। যারা বৈধ বলেন তাদের জবাবে বলা হয় যে, ঋণ বৈধ বা অবৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ঋণ উসুল করার ক্ষমতা। যদি কারো ঋণ উসুল করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে [যেমন বিচারকের রয়েছে] তাহলে তার জন্য ঋণ প্রদান বৈধ। এখানে আত্মীয়তার নৈকট্য বা দূরত্ব বিবেচনার বিষয় নয়। যেহেতু পিতার পক্ষে ঋণ উসুল করার পূর্ণ ক্ষমতা নেই তাই পিতার জন্য ঋণ প্রদান করা বৈধ নয়, বিচারকের ব্যাপারে এমন নয়। বিচারক যদি মৃত্যুর কারণে সাক্ষীদের না পান অথবা সাক্ষীরা অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার জানার ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারবেন এবং ঋণ উসুল করে নিতে সক্ষম হবেন। বলা বাহুল্য যে, বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগ তখনই সম্ভব হবে যদি ঋণগ্রহীতা সচ্ছল থাকে। আর যদি ঋণগ্রহীতা সচ্ছল না হয় তাহলে অক্ষমতার দিক থেকে বিচারক অন্যদের কাতারে চলে যাবেন। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে এজন্য বিচারকের উচিত যাদেরকে ঋণ দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। যদি কারো ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে তার থেকে ঋণ আগেভাগেই আদায় করে নেবেন। কেননা ঋণগ্রহীতা দরিদ্র হয়ে গেলে তার থেকে ঋণ আদায় সম্ভব হবে না। আর যদি ঋণগ্রহীতা প্রথম থেকেই দরিদ্র হয় তাহলে বিচারকের জন্য ঋণ দান করা উচিত হবে না।

بَابُ التَّحْكِيْمِ

وَإِذَا حَكَمَ رَجُلَانِ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكْمِهِ جَازَ، لِأَنَّ لَهُمَا وِلَايَةً عَلٰى أَنْفُسِهِمَا فَصَحَّ تَحْكِيْمُهُمَا، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهٰذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِيْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، فَيُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَلَا يَجُوْزُ تَحْكِيْمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمَحْدُوْدِ فِي الْقَذْفِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ، لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ اِعْتِبَارًا بِأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْفَاسِقُ إِذَا حَكَمَ يَجِبُ أَنْ يَجُوْزَ عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ فِي الْمَوْلٰى .

পরিচ্ছেদ : সালিস নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন দু-ব্যক্তি কোনো [তৃতীয়] ব্যক্তিকে সালিস [বিচারক] সাব্যস্ত করে, আর সে তাদের মাঝে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে এবং তারা তার ফয়সালা মেনে নেয় তাহলে এটা বৈধ। কেননা তাদের দুজনের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাই তাদের সালিস নিযুক্ত করা বৈধ হয়েছে এবং তার রায় তাদের উপর কার্যকর হবে। এ বিধান তখনই যথার্থ হবে যখন সালিস বিচারকের গুণাবলির অধিকারী হয়। কেননা সে তাদের মাঝে বিচারকের মতো। অতএব, বিচারকের যোগ্যতাকে শর্ত করা হবে। সুতরাং কাফের, গোলাম, জিম্মি অপবাদের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ফাসিক এবং শিশুকে সালিস নিয়োগ করা বৈধ হবে না। কেননা, [তাদের মাঝে] সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা না থাকার উপর কিয়াস করে বিচারক হওয়ার যোগ্যতাও নেই। ফাসিককে সালিস নিয়োগ করা হলে তা আমাদের মাযহাবে বৈধ সাব্যস্ত হবে; যেমনটি বিচারকের মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : সালিস নিয়োগ বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। তবে সালিস (مُحَكَّمْ) বিচারকের চেয়ে কম মর্যাদার। ফলে সালিসের রায় বিচারকের রায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিচার ও বিচারক (قَاضِيْ) -এর আলোচনার পর সালিসের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বিচারক ও সালিসের রায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিচারকের রায় সবার ক্ষেত্রে কার্যকর ও প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সালিসের রায় কেবল তার উপর কার্যকর করা যাবে যে সালিসে রায়ে সন্তুষ্ট। বিচারকের রায় সবধরনের ব্যক্তিদের উপর চলে বা তার ব্যাপক ক্ষমতা (وِلَايَةٌ عَامَّةٌ) রয়েছে; কিন্তু সালিসের কর্মক্ষেত্র সীমিত। হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সালিসের রায় চলে না; কিন্তু বিচারকের রায় চলে। এসব বিবেচনা করে বিচারকের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে তারপর সালিসের আলোচনা আনা হয়েছে।

ভূমিকা : تَحْكِيْمٌ শব্দটি بَابُ تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ ফয়সালা প্রদানকারী নিয়োগ করা বা সালিস (ثَالِثٌ) নিয়োগ করা। حَكَّمَهُ (فِعْل) শব্দটি ব্যবহার করা হয় যখন বাদী-বিবাদী তাদের বিবাদ নিরসনের উদ্দেশ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। অনেক সময় মানুষ বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হওয়াতে ঝামেলা/ অপমানজনক/ অতিরিক্ত ঝামেলা মনে করে তাই নিজেদের মধ্যে আপস মীমাংসার উদ্দেশ্যে তৃতীয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।

সালিস নিয়োগ কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম দলিল– কুরআন :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– (النِّسَاءُ : ৩৫) فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا অর্থাৎ "তোমরা স্বামীর পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের একজন সালিস নিয়োগ কর।" আয়াত দ্বারা প্রাথমিকভাবে একথাই বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর জন্য তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করা বৈধ। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মতো অন্যদেরও সালিস নিয়োগ করা বৈধ হবে।

দ্বিতীয় দলিল– হাদীস :

عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ شُرَيْحٍ قَالَ اَبُوْ شُرَيْحٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ قَوْمِىْ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَىْءٍ فَاَتَوْنِىْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ عَنِّى الْفَرِيْقَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَحْسَنَ هٰذَا ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىْ ـ

অর্থ- আবূ শুরাইহ (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয় আমার কাছে তারা আসে, আমি তাদের সমস্যা মীমাংসা করি, ফলে তাদের উভয় দল আমার [ফয়সালার] উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূল ﷺ বলেন, এটা খুবই উত্তম।

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে আবূ শুরাইহ -এর গোত্রের লোকেরা তাকে সালিস সাব্যস্ত করত, আর তিনি তাদের সমস্যার সমাধান দিতেন, রাসূলের কাছে ঘটনা শুনানো হলে রাসূল ﷺ এ প্রক্রিয়াকে উত্তম বলে মন্তব্য করেন।

ইহুদি সম্প্রদায় বনূ কুরায়যার উপর থেকে রাসূল ﷺ অবরোধ তুলে তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-কে সালিস সাব্যস্ত করেছিলেন। ইহুদিরা হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-কে সালিস হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনার হাদীসটি দীর্ঘ, এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হলো–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ بَنِىْ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى سَعْدٍ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى خِيَارِكُمْ اَوْ اِلٰى سَيِّدِكُمْ قَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَدْ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ وَتُسْبٰى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَقَالَ مَرَّةً بِحُكْمِ الْمَلِكِ ـ

মোটকথা, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে সালিশ সাব্যস্ত করার দ্বারা সালিস সাব্যস্ত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় দলিল– ইজমায়ে সাহাবা : সালিস নিয়োগের বৈধতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মত ছিলেন। কোনো সাহাবী থেকে এ ব্যাপারে দ্বিমত পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের ইজমা প্রমাণে ফাতহুল কাদীরে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনার বিবরণ হলো, হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উবাই ইবনে সা'দ (রা.)-এর মাঝে একটি বাগান সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদ সৃষ্টি হলো, তাঁরা উভয়ে তাঁদের সালিস নিযুক্ত করলেন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে। অতঃপর তাঁরা উভয়ে হযরত যায়েদ (রা.)-এর কাছে [তাঁর বাড়িতে] আসলেন। হযরত যায়েদ তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে খলিফা হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি লোক পাঠালে তো আমিই আপনার কাছে চলে আসতাম। উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ফয়সালার জন্য হাকিমের কাছে আসা উচিত। অতঃপর তাঁরা উভয়ে হযরত যায়েদের ঘরে ঢুকলেন, তো হযরত যায়েদ (রা.) খলিফার জন্য বালিশ দিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এটা তো তোমার প্রথম অবিচার। হযরত ওমর (রা.) বিবাদী হওয়াতে শপথ তার উপর নির্ধারিত হলো। তখন যায়েদ উবাইকে বললেন, যদি তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে শপথ থেকে বাঁচিয়ে দিতে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার শপথ নেওয়া আবশ্যক। হযরত উবাই (রা.) বললেন, আমরা আমীরুল মু'মিনীনকে শপথ নেওয়া থেকে মুক্তি দিলাম এবং তাঁকে বিশ্বাস করলাম।

এ ঘটনার দ্বারা সাহাবীদের মাঝে সালিস সাব্যস্ত করার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত বর্ণিত হয়নি। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ঘটনা প্রথম কাতারের শীর্ষ সাহাবীদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল যা সালিসের বৈধতাকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে গেছে। ইজমায়ে সাহাবার আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে– সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবূ মুসা আশয়ারী (রা.)-কে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে সালিস নিযুক্ত করা হয়। ঘটনাটি হাজার হাজার সাহাবীর সামনে ঘটেছিল এবং কোনো সাহাবী এর বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেননি।

قَوْلُهُ وَاِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে সালিস (ثَالِثْ) নিয়োগ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সালিস নিয়োগ করা বৈধ কিনা এবং সালিসের জন্য কি কি যোগ্যতা প্রয়োজন? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু-ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে সালিস বিচারক নিয়োগ করে এবং তার রায়ের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা বৈধ। বৈধতার দলিল সম্পর্কে হিদায়ার লেখক বলেন, বিচারক নিয়োগকারী দু-ব্যক্তির নিজেদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য অন্য কাউকে বিচারক বানানো বৈধ হবে। কেননা বিচারক বানাচ্ছে তাদের নিজেদের মতবিরোধ/ দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য। বিচারকের রায় তাদের পক্ষে/ বিপক্ষে যাবে। সুতরাং তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে বিচারক নির্ধারণ করাও বৈধ হবে। এজন্য তাদের বিচারকের [সালিসের] রায় তাদের উপর কার্যকর হবে। তারা ছাড়া অন্য কারো উপর তা কার্যকর হবে না।

এর একটি উদাহরণ হলো, ক্রেতা বিক্রীত মালে দোষ খুঁজে পেল। তারপর উক্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন সালিস [বিচারক] নিয়োগ করল। অতঃপর বিচারকের রায় অনুযায়ী দ্বিতীয় বিক্রেতার কাছে মাল ফেরত দিল। তাহলে দ্বিতীয় বিক্রেতার জন্য প্রথম বিক্রেতার কাছে উক্ত মাল ফেরত দেওয়া বৈধ হবে না। কেননা প্রথম বিক্রেতা উক্ত বিচারক নিয়োগে শরিক ছিল না। তাই তার উপর বিচারকের রায় প্রয়োগ করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا اِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الخ : এরপর লেখক সালিস বা বিচারক হওয়ার শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেখক বলেন, সালিস ঐ ব্যক্তিই হতে পারবেন যার মধ্যে বিচারক হওয়ার গুণাবলি বিদ্যমান। অর্থাৎ বিচারকের জন্য যেমন সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকতে হবে তদ্রূপ সালিস -এর জন্য সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকতে হবে। কেননা দু-ব্যক্তির নির্বাচিত উক্ত ব্যক্তি দু-ব্যক্তির মাঝে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আর ইতঃপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি যে, বিচারকের জন্য সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া এবং বিচার পরিচালনার যোগ্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সালিস যেহেতু বিচারকের সমমর্যাদার, তাই তার জন্যও সাক্ষ্যদান যোগ্যতা এবং বিচারকার্য পরিচালনার যোগ্য হওয়া জরুরি। অতএব যদি দু-ব্যক্তি কোনো মহিলাকে কোনো বিষয়ে সালিস নিযুক্ত করে তাহলে শুবহাত [সন্দেহ] -এর সাথে মহিলা সালিস হয়ে যাবে। কেননা মহিলা এ জাতীয় বিষয়ে সন্দেহের সাথে সালিস হতে পারে।

স্মর্তব্য যে, যেমনিভাবে বিচারকের জন্য বিচারকের যোগ্যতা পদগ্রহণের পর থেকে রায় প্রদান পর্যন্ত অব্যাহত থাকা জরুরি তদ্রূপ সালিসের জন্যও মনোনীত হওয়ার পর থেকে রায় ও ফয়সালা দেওয়া পর্যন্ত যোগ্যতা থাকা জরুরি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদি কোনো দু-ব্যক্তি ক্রীতদাসকে সালিস নিযুক্ত করে তারপর সে রায় প্রদানের পূর্বেই মুক্ত হয়ে যায়/ কোনো নাবালেগকে বিচারক বা সালিস নিযুক্ত করে তারপর সে রায় প্রদানের পূর্বেই বালেগ হয়ে যায়/ কোনো জিম্মিকে সালিস নিযুক্ত করে তারপর উক্ত জিম্মি ফয়সালা প্রদানের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ফয়সালা কার্যকর হবে না। কেননা এসব সুরতে যদিও ফয়সালা প্রদানের সময় সালিসগণ বিচারকের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু মনোনীত হওয়ার সময় তারা রায় ও ফয়সালা প্রদানের যোগ্য ছিলেন না।

উপরিউক্ত ব্যক্তিরা যেহেতু ফয়সালা প্রদানের যোগ্য নয়, তাই প্রথম থেকেই তাদের সালিস নিযুক্ত করা উচিত নয়। তারা ফয়সালা প্রদানের অযোগ্য কারণ তাদের মধ্যে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা নেই [অর্থাৎ তারা اَهْلُ شَهَادَةٍ নয়]। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মতো অপবাদ দানের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ফাসিকও সালিস ও বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, যদি দুজন জিম্মি অপর এক জিম্মিকে সালিস নিযুক্ত করে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা জিম্মি তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচারক হওয়ার যোগ্য; মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়।

مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ -এর ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, তারা যদি তওবাও করে তবু তাদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ফিরে আসে না; বরং সাজা পাওয়ার পর থেকে তাদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সব সময়ের জন্য রহিত হয়ে যায়।

ফাসিকের ব্যাপারে কথা হলো ফাসিক বিচারক ও সালিস হওয়ার যোগ্য নয় বটে, তবে যদি ফাসিককে সালিস নিযুক্ত করা হয় আর সে কোনো বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করে তাহলে তার ফয়সালা কার্যকর হয়ে যায়। যেমনটা বিচারকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, ফাসিককে যদি বিচারক নিযুক্ত করা হয়, আর সে রায় প্রদান করে তাহলে তার রায় কার্যকর হয়ে যাবে, তদ্রূপ ফাসিককে সালিস নিযুক্ত করা হলে তার ফয়সালা সালিস নিযুক্তকারী দুজনের উপর কার্যকর হবে যদি তারা ফয়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَكِّمِيْنَ اَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمَا ، لِاَنَّهُ مُقَلَّدٌ مِنْ جِهَتِهِمَا ، فَلَا يَحْكُمْ اِلَّا بِرِضَاهُمَا جَمِيْعًا ، وَاِذَا حَكَمَ لَزِمَهُمَا لِصُدُوْرِ حُكْمِهِ عَنْ وَلَايَةٍ عَلَيْهِمَا ، وَاِذَا رَفَعَ حُكْمَهُ اِلَى الْقَاضِيْ فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ اَمْضَاهُ ، لِاَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيْ نَقْضِهِ ثُمَّ فِيْ اِبْرَامِهِ عَلٰى ذٰلِكَ الْوَجْهِ ، وَاِنْ خَالَفَهُ اَبْطَلَهُ ، لِاَنَّ حُكْمَهُ لَا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ التَّحْكِيْمِ مِنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সালিস নিযুক্তকারী দুজনের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য সালিস নিযুক্তি থেকে সরে আসার অধিকার রয়েছে সালিসের ফয়সালা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত। কেননা তিনি তো উভয়ের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত। সুতরাং তিনি তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি ব্যতীত ফয়সালা প্রদান করবেন না। তবে যদি সালিস [বিচারক] ফয়সালা দিয়ে দেন তাহলে তা উভয়ের উপর কার্যকর হবে। কেননা তাদের উপর কর্তৃত্ব নিয়েই তিনি রায় প্রদান করেছেন। আর যদি তার ফয়সালা বিচারকের সমীপে উত্থাপন করা হয় এবং তা বিচারকের মতের সাথে মিলে যায় তাহলে তা কার্যকর করবেন। কেননা তার ফয়সালা বাতিল করত তারপর ঐ একইভাবে তা কার্যকর করাতে কোনো উপকারিতা নেই। তবে যদি তা বিচারকের মতের বিরুদ্ধে হয় তাহলে তা বাতিল করবেন। কেননা সালিসের ফয়সালা বিচারকের জন্য আবশ্যক নয়। কারণ সালিস নিযুক্তি বিচারকের পক্ষ থেকে হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَكِّمِيْنَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে সালিসের ফয়সালার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সালিস নিযুক্তকারী দুব্যক্তির জন্য সালিসের ফয়সালা প্রদানের পূর্বে নিয়োগ বাতিল করার অধিকার রয়েছে। যেমন দুজনের কোনো একজন বলল, আপনি আমার সালিস নন বা আপনাকে আমি সালিস হিসেবে মানি না। তাহলে ঐ ব্যক্তি তাদের দুজনের সালিস থাকবেন না। এর দলিল হলো, নিযুক্তকারী দুজন তাদের সম্মতিতে তৃতীয় ব্যক্তিকে সালিস নিয়োগ করেছে। সুতরাং তারা যতক্ষণ তার ব্যাপারে আস্থা রাখবে ততক্ষণ তার ফয়সালা চলবে। যখন তাদের দুজনের কিংবা একজনের আস্থা ও সম্মতি উঠে যাবে তখন তার ফয়সালা করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। কেননা দুজনের নিযুক্তি দ্বারা সে বিচারক বা সালিসের নিয়োগ লাভ করেছে। সুতরাং রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের উভয়ের নিযুক্তি বহাল থাকতে হবে। উপরিউক্ত মতের সাথে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত, ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা ও ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি মত মিলে যায়।

قَوْلُهُ وَاِذَا حَكَمَ لَزِمَهُمَا الخ : আর যদি সালিস তাদের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দেয় তাহলে সালিস নিযুক্তকারী দুজনের উপর রায়টি আবশ্যক হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের দুজনকেই উক্ত রায় মেনে নিতে হবে। তাদের কারো জন্য উক্ত ফয়সালা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। যেমন কোনো কাজি [বিচারক] যদি কোনো বিষয়ে রায় প্রদান করে, তারপর তার নিয়োগদানকারী [সরকারপ্রধান] যদি তাকে পদচ্যুত করে তাহলেও তার প্রদানকৃত রায় কার্যকর থাকে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও মত এবং ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অনুরূপ একটি মত রয়েছে।

এর দলিল হলো, যখন বিচারক [সালিস] তাদের মাঝে রায় প্রদান করেছিলেন তখন তার তাদের উভয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। কারণ ফয়সালা প্রদানের পূর্বে তারা তার ব্যাপারে অনাস্থা জানায়নি, যেহেতু সালিস ফয়সালা প্রদানের সময় পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী (صَاحِبُ وِلَايَتْ) সুতরাং তার ফয়সালা কার্যকর হবে। কেননা সাহিবে ওলায়াতের রায় কার্যকর হয়।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَفَعَ حُكْمَهُ إِلَى الْقَاضِي الخ : এরপর লেখক আরেকটি প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, সালিসের ফয়সালা বিচারকের সামনে পেশ করা। লেখক বলেন, সালিসের ফয়সালা বিচারকের সামনে উত্থাপন করা হলে বিচারকের মাযহাবের সাথে ফয়সালা সঙ্গতিপূর্ণ হলে বিচারক ফয়সালাটি বহাল রাখবেন। কারণ সালিসের ফয়সালাটি বাতিল করে পুনরায় এরূপ ফয়সালা প্রদানের মাঝে কোনো উপকার বা লাভ নেই। পক্ষান্তরে যদি বিচারকের মতের সাথে ফয়সালাটির সঙ্গতি না থাকে তাহলে বিচারক সালিসের ফয়সালাটি বাতিল করবেন। কারণ বিচারকের জন্য সালিসের ফয়সালা কার্যকর করা আবশ্যক নয়, সালিসের রায় তার নিয়োগকারীদের উপর আবশ্যক। যেহেতু বিচারক সালিস নিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন, তাই তার উপর সালিসের রায় মেনে নেওয়া আবশ্যক নয়। বলা বাহুল্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সালিসের ফয়সালা নিয়োগকারী ছাড়া অন্যদের উপর আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সালিসের ফয়সালাকে বিচারকের কাছে উত্থাপন কেন করবে?

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে, রায় প্রদানের পর তা মেনে নেওয়া নিয়োগদাতাদের উপর আবশ্যক হয়ে যায়; কিন্তু এমনও হতে পারে যে, সালিসের ফয়সালা তাদের মনঃপূত হলো না। তখন তাদের কাছে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে বিচারকের আদালতের সালিসের ফয়সালার ব্যাপারে আপিল করা। আপিল করার পর বিচারক সালিসের রায়টি পর্যবেক্ষণ করবেন যদি মনে করেন তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং রায়টির সাথে তার মাযহাবের মিল রয়েছে তাহলে রায়টি বাতিল না করে বহাল রাখবেন। বিচারকের কাছে উত্থাপনের উপকারিতা এটাও যে, যদি বিচারক রায়টি বহাল রাখেন তারপর যদি অন্য এমন বিচারকের সামনে রায়টি উত্থাপন করা হয় যার মাযহাব রায়টিকে সমর্থন যোগায় না, এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় বিচারক রায়টি বাতিল করতে পারবেন না। কেননা ইতঃপূর্বে এ মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে যে, যদি কোনো মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে কোনো বিচারক রায় প্রদান করেন, তারপর মাসআলাটি অন্য বিচারকে কাছে উত্থাপন করা হলে দ্বিতীয় বিচারকের মতের খেলাফ হলেও বিচারক রায়টি বাতিল করতে পারবেন না।

وَلَا يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى دَمِهِمَا، وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكَانِ الْإِبَاحَةَ، فَلَا يُسْتَبَاحُ بِرِضَاهُمَا، قَالُوْا : وَتَخْصِيْصُ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ يَدُلُّ عَلٰى جَوَازِ التَّحْكِيْمِ فِيْ سَائِرِ الْمُجْتَهِدَاتِ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ صَحِيْحٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْتٰى بِهِ، وَيُقَالُ يَحْتَاجُ إِلٰى حُكْمِ الْمَوْلٰى دَفْعًا لِتَجَاسُرِ الْعَوَامِّ فِيْهِ، وَإِنْ حَكَّمَاهُ فِيْ دَمِ خَطَأٍ فَقَضٰى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ، إِذْ لَا تَحْكِيْمَ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَلَوْ حَكَمَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ فِيْ مَالِهِ رَدَّهُ الْقَاضِيْ، وَيَقْضِيْ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرَأْيِهِ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِّ أَيْضًا، إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হুদূদ ও কিসাসের জন্য সালিস নিযুক্ত করা বৈধ নয়। কেননা নিয়োগদানকারী ব্যক্তিদ্বয়ের নিজেদের রক্তের [প্রাণের] উপর কর্তৃত্ব নেই। এ কারণে তারা তাদের রক্ত বৈধ করতে পারে না। অতএব, তাদের সম্মতিতে তাদের রক্ত বৈধ হবে না। মাশায়েখে কেরাম বলেন, হুদূদ ও কিসাসকে নির্দিষ্টকরণ এ ইঙ্গিত বহন করে যে, অন্য সব মাসআলা যেমন– তালাক, বিবাহ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে সালিস বানানো বৈধ। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে সালিশের রায়ের উপর ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কেউ কেউ বলেন, এতে বিচারকের রায় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সাধারণ লোকজনের দুঃসাহস অপসৃত হয়। যদি দুব্যক্তি কাউকে ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে সালিস মানে এবং সে আকেলার উপর দিয়াত আরোপের ফয়সালা দেয় তাহলে তার ফয়সালা কার্যকর হবে না। কেননা সে তাদের পক্ষ থেকে সালিস নিযুক্ত না হওয়াতে তাদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর যদি হত্যাকারীর নিজস্ব মালের উপর দিয়াত আরোপের রায় প্রদান করে তাহলে বিচারক রায়টি প্রত্যাহার করবেন এবং [তদস্থলে] আকেলাদের উপর দিয়াতের রায় দেবেন। কেননা সালিশের রায় তার রায়ের বিপরীত। তাছাড়া রায়টি নসের পরিপন্থি। তবে যদি হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা হত্যা প্রমাণিত হয়। কেননা এ [স্বীকারোক্তিকারীর] দিয়াতের বোঝা আকেলাগণ নেবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ فِي الْحُدُوْدِ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে সালিস নিয়োগের ক্ষেত্র নয় এমন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হুদূদ ও কিসাসের ফয়সালার জন্য সালিসের মনোনয়ন যথার্থ নয়। কারণ সালিস নিযুক্তির ক্ষেত্রে নিযুক্তকারীদের ওলায়াত [কর্তৃত্ব] হস্তান্তর করা হয়। আর নিযুক্তকারীরা সেই কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে পারে যে কর্তৃত্ব তাদের হাতে রয়েছে। যেহেতু নিযুক্তকারী দুজনের নিজেদের প্রাণের উপর কর্তৃত্ব নেই, তাই তারা তাদের রক্ত বা প্রাণ হালাল করতে পারে না। অতএব, তাদের সম্মতিক্রমে তাদের রক্ত বা খুন হালাল হবে না। উল্লেখ্য যে, হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সালিস নিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে সালিসের নিজেদের খুনকে হালাল করে দেওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত মাসআলাটি ইমাম আবূ বকর আল খাসসাফের মাযহাব অনুযায়ী রচিত। ইমাম আবূ বকর আল খাসসাফ হানাফী মাযহাবের মধ্যযুগের একজন বড় ইমাম। ইমাম আবুল হাসান আল কুদূরী [মুখতাসারুল কুদূরীর লেখক] এবং হিদায়ার লেখক তাঁর মাযহাবকে গ্রহণ করেছেন।

এখানে হুদূদ দ্বারা সেসব হদ উদ্দেশ্য যেগুলো খালিস আল্লাহর হক। যেমন– ব্যভিচার ও মদ পানের হদ। এগুলোর মধ্যে সালিস নিযুক্ত করা বৈধ নয়। কেননা বাদশাহ এগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট। তাছাড়া এগুলো বাস্তবায়ন তার পক্ষেই সম্ভব যে সব মানুষের উপর কর্তৃত্ব রাখে। ইমাম শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) অপবাদ দানের হদ ও কিসাসের মধ্যে সালিস নিযুক্ত করা বৈধ মনে করেন। মূলত শামসুল আইম্মাহ ইমাম খাসসাফ (র.)-এর মতকে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল হুমামের মত ভিন্ন। তিনি বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) মনে করেন, ইমাম খাসসাফের মাযহাব এ ব্যাপারে মুতলাক অর্থাৎ তিনি কোনো হদকে খাস করেন না। এজন্যই ইমাম কুদূরী لَا يَجُوزُ শব্দ [মুতলাকভাবে] ব্যবহার করেছেন। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, এ মতটি বিশুদ্ধ। কেননা এ ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে সন্ধি করা। আর হদ ও কিসাস সন্ধির মাধ্যমে আদায় বৈধ নয়। তাছাড়া হদ ও কিসাস সন্দেহের কারণে বাতিল হয়ে যায়। সালিসের ফয়সালা সন্দেহযুক্ত। কারণ তার ফয়সালা শুধুমাত্র নিয়োগদাতাদ্বয়ের উপর প্রয়োগ হয়; অন্যদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। আর এটা একটা বড় ধরনের সন্দেহ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অর্থসম্পদ ও অর্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালিস বানানো যাবে; কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সালিস বানানো বৈধ হবে না। ইমাম মালেক (র.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন, সেমতে হদ, লি'আন, কিসাস, অপবাদ, দাসমুক্তি, বংশ প্রমাণ, ওলা ইত্যাদি বিষয় যেহেতু সরাসরি অর্থ বা অর্থ সংশ্লিষ্ট নয়, তাই এগুলোর মধ্যে তাঁদের মতে সালিস মানা বৈধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এসব বিষয়াদির মধ্যে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাই এসবের ফয়সালা বিচারকই করবেন, এ সবের ফয়সালার জন্য সালিস যথেষ্ট নয়। যেহেতু এসবের মধ্যে বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত সালিসের ফয়সালা যথেষ্ট নয় তাই এসবের সালিস বানানো বৈধ নয়। ইমাম শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.)-এর দলিল হলো, অপবাদের শাস্তি ও কিসাস আদায়ের অধিকার যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার এবং নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের। এক কথায় অপবাদের শাস্তি ও কিসাস বান্দার বা মানুষের হক। তাই এতে অপবাদদাতা ও যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তাদের দুজনের জন্য নিজেদের হকের ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করা বৈধ। তদ্রূপ হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিদের জন্য হক আদায়ের উদ্দেশ্যে সালিস নিযুক্ত করা বৈধ। ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার লেখক হিদায়ার লেখকের উপর একটি আপত্তি করেছেন। আপত্তিটি হলো– লেখকের বর্ণিত হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সালিস নিযুক্ত নাজায়েজ হওয়ার দলিল কিসাসের দলিল মাত্র। এটি হুদূদের দলিল নয়, তিনি হুদূদের দলিল উল্লেখ করেননি।

قَوْلُهُ تَخْصِيصُ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ يَدُلُّ الخ : লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে সালিসের ফয়সালা থেকে হুদূদ ও কিসাসকে খাস করা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, হুদূদ ও কিসাস ছাড়া আর সব বিষয়ে সালিস নিযুক্ত করা যাবে, এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে সালিসের রায় দ্বারা ফতোয়া প্রদান করা যাবে না; বরং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে সকলের আমলের জন্য সালিসের ফায়সালার সাথে বিচারকের সমর্থন আবশ্যক।

যেমন খুলাসাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সালিসের ফয়সালা তালাক, দাসমুক্তি, বিবাহ-শাদি, কাফালাহ, ঋণসংক্রান্ত বিষয়, বেচাকেনা, কাফফারাসমূহ, কিসাস, জরিমানা, ইচ্ছাকৃত কারো হাত কেটে ফেলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে- যদি এতে বিচারকের রায় বা সমর্থন থাকে। কারণ যদি বিচারকের সমর্থন ছাড়া সালিসের ফয়সালার মাধ্যমে ফতোয়া দেওয়া বৈধ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ জনগণের স্পর্ধা বেড়ে যাবে। তখন সুবিধাবাদী লোকেরা তাদের স্বার্থ

উদ্ধারের জন্য সালিস নিয়োগ করে তাদের সুবিধামতো ফয়সালা আদায় করে নেবে। এর উদাহরণ হলো, এক স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে এক বৈঠকে দিল। তাহলে হানাফী মাযহাব অনুসারী তার স্ত্রী তার কাছে ফেরত আসতে পারে না, যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর তালাকপ্রাপ্তা না হয়; কিন্তু যদি তাদের সালিস নিযুক্ত করার ফতোয়া জানা থাকে তাহলে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে এক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী আলেমকে/ গাইরে মুকাল্লিদ আলেমকে তাদের তালাকের ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করবে। আর সেই আলেম তাকে এক তালাকের আদেশ দিয়ে দেবে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো মাসআলায় সমস্যা মনে হয় তাহলে সে তার সমাধান করার জন্য বা বৈধতার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে, যার মাযহাবে উক্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে বা বৈধতা রয়েছে। আর এভাবে নফস পূজার সয়লাব ছড়িয়ে পড়বে। এসব বিবেচনা করে মাশায়েখে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, সালিস নিয়োগ করা যদিও বৈধ; কিন্তু এর উপর ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ حَكَّمَاهُ فِىْ دَمِ خَطَإٍ فَقَضَى الخ : লেখক বলেন, যদি দুজন লোক কোনো ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা (قَتْلُ خَطَاءٍ) -এর সালিশ নিয়োগ করে আর সালিস সমপেশাজীবী/ সম্প্রদায়ের লোকদের উপর দিয়াত নির্ধারণ করে তাহলে সালিসের এ রায় কার্যকর হবে না। কেননা [মাসআলা বা ফয়সালা যদিও সঠিক কিন্তু] তারা তো তাকে সালিস নিয়োগ করেনি, তাই তাদের উপর সালিসের ফয়সালা অবধারিত হবে না। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, সালিসের ফয়সালা শুধুমাত্র নিযুক্তকারীদের উপর আবশ্যক; অন্যদের উপর নয়। পক্ষান্তরে যদি নিযুক্ত বিচারক হত্যাকারীর নিজস্ব মালের উপর দিয়াতকে ওয়াজিব করে তাহলে সরকারি বিচারক উক্ত রায় বাতিল করবেন এবং আকেলা তথা সমপেশাজীবী/ সম্প্রদায়ের লোকদের উপর দিয়াত ওয়াজিব করবেন। কারণ নিযুক্ত বিচারক [সালিস] -এর রায়টি সরকারি বিচারকের মাযহাবের বিপরীত। আবার তা হাদীসের পরিপন্থি। এ ব্যাপারে হাদীস এই- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ اَوْ عُمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَاَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ غُرَّةَ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ وَجَعَلَهُ عَلٰى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.

অর্থাৎ "হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুজন মহিলা পরস্পর সতীন ছিল, তাদের একজন অপরজনকে [ঝগড়ার সময়] পাথর/ তাঁবুর খুঁটি ছুঁড়ে মারল। ফলে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে গেল। অতঃপর রাসূল ﷺ গর্ভস্থিত বাচ্চার [রক্তপণ হিসেবে] একটি গোলাম/ দাসীর ফয়সালা করলেন এবং তা হত্যাকারী মহিলার আসাবা তথা আকেলার উপর আরোপ করলেন।" উল্লেখ্য যে, এ দুই সতীন হামল ইবনে মালেকের ছিল। রাসূল ﷺ উক্ত ঘটনায় হত্যাকারী স্ত্রীর আত্মীয়দের লক্ষ্য করে বলেন- قُوْمُوْا اَفْدُوْهُ 'তোমরা উঠ এবং তার রক্তপণ-দিয়াত আদায় কর।' উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দিয়াত হত্যাকারীর নিজস্ব মালে ওয়াজিব হয় না; বরং হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়/ সম্প্রদায়ের উপর ওয়াজিব হয়।

লেখক বলেন, তবে যদি হত্যাকাণ্ড হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা ওয়াজিব হয় তাহলে হত্যাকারীর নিজস্ব মালের উপর দিয়াত আবশ্যক হবে; আকেলাদের উপর ওয়াজিব হয় না। কেননা তার স্বীকারোক্তি তাদের উপর কার্যকর হয় না। কারণ তাদের উপর তো তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। অতএব তার স্বীকারোক্তি তার মধ্যে সীমিত থাকবে।

وَيَجُوْزُ اَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَقْضِىْ بِالنُّكُوْلِ، وَكَذَا بِالْاِقْرَارِ، لِاَنَّهٗ حُكْمٌ مُوَافِقٌ لِلشَّرْعِ، وَلَوْ اَخْبَرَ بِاِقْرَارِ اَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اَوْ بِعَدَالَةِ الشُّهُوْدِ، وَهُمَا عَلٰى تَحْكِيْمِهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهٗ، لِاَنَّ الْوِلَايَةَ قَائِمَةٌ وَلَوْ اَخْبَرَ بِالْحُكْمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهٗ لِاِنْقِضَاءِ الْوِلَايَةِ، كَقَوْلِ الْمَوْلٰى بَعْدَ الْعَزْلِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সালিসের জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনা এবং শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর অবস্থায় ফয়সালা করা বৈধ। এমনিভাবে স্বীকারোক্তি দ্বারা রায় দেওয়া বৈধ। কেননা এটাও শরিয়ত অনুমোদিত ফয়সালা। যদি সালিস বিচারপ্রার্থী দুজনের একজনের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে অথবা সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানায়। এমতাবস্থায় যদি তারা তার সালিসিতে থাকে তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তাদের উপর তার কর্তৃত্ব বহাল আছে। তবে যদি কোনো ফয়সালা সম্পর্কে অবহিত করে তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। যেমন– পদচ্যুত হওয়ার পর বিচারকের বক্তব্য [গ্রহণযোগ্য নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ اَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে সালিসের বিচার ও ফয়সালা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [যদি দু-ব্যক্তি কাউকে সালিস নিযুক্ত করে তখন তারা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর এজন্যে] তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনা জায়েজ আছে এবং তার জন্য শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো অবস্থায় ও স্বীকারোক্তি প্রদানের সময় ফয়সালা দেওয়া বৈধ। অর্থাৎ নিযুক্তকারী দুজনের একজন অবশ্যই বাদী আর অপরজন বিবাদী। বাদী যখন তার দাবি উত্থাপন করবে তখন তিনটি অবস্থা হতে পারে– ১. বিবাদী বাদীর হক স্বীকার করবে, যে ভিত্তিতে সালিস রায় প্রদান করবেন। ২. বিবাদী অস্বীকার করবে, তখন বাদী সাক্ষী পেশ করবে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে সালিস তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। ৩. বিবাদী বাদীর হকের দাবী অস্বীকার করবে; কিন্তু বাদী তার দাবির পক্ষে সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হবে। অতঃপর সালিস বিবাদীকে শপথ করতে বলবেন। যদি শপথ করে তাহলে তার পক্ষে ফয়সালা দেবে, আর যদি শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে বাদীর পক্ষে ফয়সালা দেবে।

দলিল হিসেবে লেখক বলেন, সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনা, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করা ও শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর অবস্থায় ফায়সালা প্রদান করা শরিয়তের বিচার কাঠামোর অংশ। যেহেতু সালিস নিয়োগ শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা তাই তার জন্য শরিয়তের প্রক্রিয়ায় ফয়সালা দেওয়া বৈধ হবে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَخْبَرَ بِاِقْرَارِ اَحَدِ الْخَصْمَيْنِ الخ : লেখক বলেন, যদি সালিস বাদী/ বিবাদীর কোনো একজনের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে জানায়। যেমন– সে বিবাদীকে বলল, তুমি আমার কাছে তোমার প্রতিপক্ষের হকের কথা স্বীকার করেছ অথবা তাকে বলল, তোমার বিপক্ষে আমার কাছে সাক্ষীদের উপস্থিত করা হয়েছে- যারা প্রত্যেকে ন্যায়পরায়ণ। যাহোক স্বীকারোক্তি/ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি ফয়সালা দিয়েছি [তোমার বিপক্ষে] তাহলে উক্ত সালিসের ফয়সালা কার্যকর হবে যদি নিয়ুক্তকারী দুজন তাদের নিযুক্তির ব্যাপারে অবিচল থাকে। কেননা সালিস নিযুক্ত হওয়ার কারণে তার কর্তৃত্ব তাদের উপর বহাল রয়েছে। সুতরাং যদি এমন হয় যে, যার বিপক্ষে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে– সে সালিসের কাছে স্বীকারোক্তি প্রদানের কথা যদি অস্বীকার করে কিংবা তার বিপক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা না মানে তাহলে তার বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না; বরং বিচারক সালিসের কথাকে গ্রহণ করবেন এবং তার ফয়সালাকে কার্যকর করবেন। কেননা সালিস তার নিয়োগকালীন সময়ে যে ফয়সালা দেবেন, তা কার্যকর হবে। যেমন বিচারক যতক্ষণ তার পদে বহাল থাকেন তার রায় কার্যকর হয়।

পক্ষান্তরে সালিস যদি বিবাদীকে বলে, তোমার বিপক্ষে তো আমি ফয়সালা দিয়ে দিয়েছি। তাহলে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ফয়সালা প্রদানের সাথে সাথে সালিসের কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেছে, তার নিয়োগ বাতিল হয়ে গেছে। এখন তার কথা আর দশজন মানুষের কথার মতোই। সাধারণ কেউ যদি বলে, আমি এই ফায়সালা করেছি তা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না তদ্রূপ এ সালিসের কথাও গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন পদচ্যুত বিচারকের বক্তব্য পদচ্যুতির পর গ্রহণযোগ্য হয় না। সারকথা, সালিস রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিচারকের মতো, আর ফায়সালা দানের পর পদচ্যুত বিচারকের মতো। বিচারকের ফায়সালা প্রদানের কথা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় তার কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। পদচ্যুত বিচারকের কথা যেমন অগ্রহণযোগ্য তার কথাও অগ্রহণযোগ্য হবে।

وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِاَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ بَاطِلٌ، وَالْمَوْلٰى وَالْمُحَكَّمُ فِيْهِ سَوَاءٌ، وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِهٰؤُلَاءِ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ، فَكَذٰلِكَ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا اِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ، لِاَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، فَكَذَا الْقَضَاءُ، وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَابُدَّ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا، لِاَنَّهُ اَمْرٌ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الرَّأْيِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : বিচারকের ফয়সালা তার পিতামাতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানের অনুকূলে অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে বিচারক ও সালিস একই পর্যায়ের। এ বিধানের কারণ হলো, এদের অনুকূলে বিচারকের সাক্ষ্য পক্ষপাতের সম্ভাবনা হেতু গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাই বিচারের ফয়সালা তাদের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে তাদের বিপক্ষে বিচারকের রায় গ্রহণযোগ্য। কেননা পক্ষপাতের সম্ভাবনা না থাকাতে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তদ্রূপ বিপক্ষে রায়ও। যদি দু-ব্যক্তি দুজনকে সালিস নির্ধারণ করে তাহলে তাদের উভয়ের একত্র হওয়া আবশ্যক। কেননা ফায়সালার মধ্যে মতামত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান, প্রকৃত বিষয়ে আল্লাহ ভালো জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِاَبَوَيْهِ الخ **:** উক্ত ইবারতে নিকটাত্মীয়ের অনুকূলে ও বিপক্ষে রায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামি শরিয়ত পক্ষপাত ও স্বজনপ্রিয়তার মতো ন্যায় শাসনের পরিপন্থি বিষয়গুলোকে কঠোর হস্তে দমন করেছে। বলা বাহুল্য যে, স্বজনপ্রিয়তা এমন এক ব্যাধি যা পুরো শাসনব্যবস্থার ভিত নড়িয়ে দিতে পারে এবং এর ফলে সমাজের সর্বস্তরে সৃষ্টি হতে পারে বিশৃঙ্খলাও অরাজকতা। এ স্বজনপ্রিয়তা রোধে ইসলাম এক যুগান্তকারী বিধান জারি করেছে। আর তা হচ্ছে, বিচারক যদি তার পিতামাতা, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানের অনুকূলে রায় দেয় তাহলে তা ন্যায়সঙ্গত হলেও গ্রহণযোগ্য হবে না। বিচারক দ্বারা এখানে সব ধরনের বিচারক উদ্দেশ্য। সরকার নিযুক্ত বিচারক এবং সালিস উভয়ই সমান অর্থাৎ কারো রায় এসব ব্যক্তিদের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিচারের রায় গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল হচ্ছে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া। অর্থাৎ পিতামাতা, সন্তান ও স্ত্রীর অনুকূলে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার উপর ভিত্তি করে বিচারের রায়কে অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য কেন গ্রহণযোগ্য নয়? এর উত্তর হচ্ছে, পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এমন অপবাদের সম্ভাবনা বা আশঙ্কা এতে রয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তার পিতামাতার অনুকূলে একটি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাকে কেউ একথা বলতে পারে যে, তোমার পিতামাতা বলেই এমন সাক্ষ্য দিয়েছ অন্যথায় তুমি এমন সাক্ষ্য দিতে না। সারকথা, অপবাদের সম্ভাবনার কারণে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে যেহেতু সাক্ষ্যদান করা অবৈধ তাই তাদের অনুকূলে বিচারের রায় প্রদান অবৈধ হবে। তবে যদি বিচারক উপরিউক্ত লোকজন তথা বিচারকের পিতামাতা, ভাই-বোন ও তার স্ত্রীর বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন তাহলে তার রায় গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো– তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হলে তাতে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ আসার অবকাশ নেই। প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেওয়া হলে বরং পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি এমন প্রমাণ স্পষ্টভাবে আছে বলে প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَابُدَّ مِنْ الخ **:** লেখক বলেন, যদি দু-ব্যক্তি তাদের আপসের মাঝে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করার দুজন ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করে। তাদের ফয়সালার জন্য দুজনের ঐকমত্য আবশ্যক। তাদের ঐকমত্য হওয়ার জন্য দুজনের একত্র হওয়া প্রয়োজন। কেননা কোনো কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়। বাদী ও বিবাদী পৃথকভাবে দুজন সালিস নিযুক্ত করার অর্থই হচ্ছে তারা উভয়ে দুজন সালিসের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে ফয়সালা নেবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুজনের উপস্থিতি একত্রে জরুরি, যাতে তারা পরস্পর মতবিনিময় করে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। কিন্তু দুজন সালিস নিযুক্ত করার পর একজন যদি উপস্থিত না হয় তাহলে [উপস্থিত] অপরজনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না। উল্লেখ্য যে, দুজন সালিস যদি বিচারের মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে ফয়সালা সংক্রান্ত তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তারা মজলিস ভেঙ্গে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে, আর সাধারণ মানুষের নিজেদের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, তাদের নিজেদের কাজের [সালিসির] ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

مَسَائِلُ شَتّٰى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ

قَالَ : وَاِذَا كَانَ عِلْوٌ لِرَجُلٍ وَسِفْلٌ لِاٰخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّفْلِ اَنْ يَتِدَ فِيْهِ وَتَدًا وَلَا يَنْقُبَ فِيْهِ كُوَّةً عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَعْنَاهُ بِغَيْرِ رِضَاءِ صَاحِبِ الْعِلْوِ، وَقَالَا : يُصْنَعُ مَا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْوِ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافُ اِذَا اَرَادَ صَاحِبُ الْعِلْوِ، اَنْ يَبْنِىَ عَلٰى عِلْوِهٖ، قِيْلَ : مَا حُكِىَ عَنْهُمَا تَفْسِيْرٌ لِقَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فَلَا خِلَافَ، وَقِيْلَ : اَلْاَصْلُ عِنْدَهُمَا الْاِبَاحَةُ، لِاَنَّهٗ تَصَرُّفٌ فِىْ مِلْكِهٖ، وَالْمِلْكُ يَقْتَضِى الْاِطْلَاقَ، وَالْحُرْمَةُ بِعَارِضِ الضَّرَرِ، فَاِذَا اَشْكَلَ لَمْ يَجُزِ الْمَنْعُ، وَالْاَصْلُ عِنْدَهٗ الْخَطَرُ، لِاَنَّهٗ تَصَرُّفٌ فِىْ مَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهٖ حَقٌّ مُحْتَرَمٌ لِلْغَيْرِ كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَاْجِرِ، وَالْاِطْلَاقُ بِعَارِضٍ، فَاِذَا اَشْكَلَ لَا يَزُوْلُ الْمَنْعُ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَعْرِىْ عَنْ نَوْعِ ضَرَرٍ بِالْعِلْوِ مِنْ تَوْهِيْنِ بِنَاءٍ اَوْ نَقْضِهٖ فَيُمْنَعُ عَنْهُ ـ

বিচার অধ্যায়ের বিবিধ মাসআলা

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ভবনের উপরের তলা এক ব্যক্তির হয় আর নিচতলা হয় অন্য ব্যক্তির, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নিচতলার মালিকের জন্য দেয়ালে পেরেক গাঁথা এবং ক্ষুদ্র আলোপথ তৈরি করার অধিকার নেই। অর্থাৎ উপর তলার মালিকের অনুমতি ব্যতীত। সাহেবাইন (র.) বলেন, উপর তলার মালিকের ক্ষতি হয় না, এমন সবকিছুই সে করতে পারবে। একই মতবিরোধ তখনও হবে যখন উপর তলার মালিক তার উপরে কিছু নির্মাণ করতে চাইবে। কেউ কেউ বলেন, সাহেবাইনের বর্ণিত বক্তব্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা মাত্র। সুতরাং তাঁদের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। কেউ কেউ বলেন, সাহেবাইন (র.)-এর মতে মূল বিষয় হচ্ছে বৈধতা। কেননা এগুলো নিজ মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ। মালিকানা নিঃশর্ত হওয়া দাবি করে। হারাম হওয়ার বিধান উদ্ভূত ক্ষতির কারণে। সুতরাং যখন ক্ষতি সুস্পষ্ট নয় তখন বাধা প্রদান করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মূল বিষয় হচ্ছে অবৈধতা। কেননা এগুলো এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ যাতে অন্যের সম্মানযোগ্য অধিকার বিদ্যমান। যেমন বন্ধকগ্রহীতার ও ভাড়াটিয়ার অধিকার। বৈধতা উদ্ভূত অবস্থায় [পরিলক্ষিত হয়]। আর যখন ক্ষতির বিষয় অস্পষ্ট হয় তখন নিষিদ্ধতা অপসৃত হয় না। তবে যে কোনো হস্তক্ষেপই উপর তলার ক্ষতিমুক্ত নয়। যেমন ভবনটি দুর্বল হওয়া কিংবা ভেঙ্গে যাওয়া। সুতরাং এসব হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : شَتّٰى শব্দের অর্থ– বিবিধ ও বিভিন্ন। লেখকদের সাধারণ রীতি হলো, তারা কোনো একটি অধ্যায় রচনা করার পর যদি সে অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলা বাদ পড়ে যায় সেগুলোকে সেই অধ্যায় শেষ করার পর مَسَائِلُ شَتّٰى/مَسَائِلُ مَنْثُوْرَةٌ/ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা করেন। সে হিসেবে এসব বিবিধ আলোচনা/ মাসআলা মূল

অধ্যায়ের পরই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু এটা বিচারকের নীতিমালা শীর্ষক অধ্যায়ের বিবিধ আলোচনা, তাই এ অধ্যায়ের পর এ আলোচনা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু হিদায়ার লেখক তা করেননি; বরং এ অনুচ্ছেদের পরও বিচার সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসছে। অতএব, مَسَائِلُ شَتّٰى তো সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সর্বশেষ বিষয় হিসেবে উল্লিখিত হলো না। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, এরপর وَالْقَضَاءُ بِالْمَوَارِيْثِ وَالرَّحْمِ -এর আলোচনা আসবে। সেগুলো যেহেতু নিশ্চিতভাবে শেষে আনতে হয় তাই লেখক বিবিধ মাসায়েলের আলোচনা এর আগে নিয়ে এসেছেন। বিনায়ার লেখক বলেন, হিদায়ার লেখক এস্থানে যে বিবিধ মাসআলার উল্লেখ করেছেন তা যথার্থ। কেননা বিচারকের নীতিমালা অধ্যায়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের মাসায়েলকে 'বিবিধ মাসায়েল' -এর শিরোনাম দেওয়া চলে।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ عِلْوٌ لِرَجُلٍ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর-এর একটি মাসআলা সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। মাসআলাটি একটি দ্বিতল / বহুতলবিশিষ্ট ভবনের একাধিক মালিকের অধিকার সংক্রান্ত। উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে একটি ভবনের একাধিক মালিকের ঘটনা সচরাচর দেখা যায়। একটি বহুতল ভবনের এককেটি আবাসকে ফ্লাট বলা হয়। এক তলায় একাধিক ফ্লাটও থাকে। এককেটি ফ্লাটের এককেজন মালিক, কেউ উপর তলার মালিক আবার কেউ নিচতলার মালিক। মালিকদের পরস্পর অধিকার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে বর্ণনা করেন যে, যদি কোনো ভবনের নিচতলা এক মালিকের হয় আর উপরতলা অন্য মালিকের হয় তাহলে উপর তলার মালিকের অনুমতি ছাড়া নিচতলার মালিকের দেয়ালে পেরেক/ গজাল ঠোকার কিংবা আলো-বাতাস ঢুকার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র পথ তৈরি করার অধিকার নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, উপর তলার মালিকের ক্ষতি না হয় এমন সব কাজ নিচতলার মালিক করতে পারে। অদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নিচতলার মালিকের অনুমতি ব্যতীত উপর তলার মালিকের ঘর তোলার অধিকার নেই; কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে উপর তলার মালিকের সেই অধিকার আছে যদি নিচতলার মালিকের কোনো ক্ষতি না হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে পেরেক বা গজাল ঠোকা ও ছিদ্রপথ তৈরি করার দ্বারা উদ্দেশ্য এমন কাজ যা ভবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ভিত দুর্বল করে দেয়। হেদায়ার লেখক বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইবারতের অর্থ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিষেধাজ্ঞা উপর তলার মালিকের অসন্তুষ্টির অবস্থায়। অর্থাৎ যখন উপর তলার মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর সমর্থনে হিদায়ার লেখক কতিপয় মাশায়েখের মতামত বর্ণনা করেন। যারা বলেন, সাহাবাইন (র.)-এর মত [উপর তলার মালিকের ক্ষতি না হলে নিচতলার মালিকের যে কোনো হস্তক্ষেপ করা বৈধ] মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিচ ও উপর তলার মালিকের হস্তক্ষেপকে অবৈধ বলেন যখন প্রতিপক্ষের ক্ষতি হয়। যদি ক্ষতি না হয় তাহলে হস্তক্ষেপ করাতে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে ব্যাখ্যা করা হলে সাহেবাইন (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের কোনো অমিল নেই।

وَقَوْلُهُ وَقِيْلَ الْاَصْلُ عِنْدَهُمَا الْاِبَاحَةُ الخ : তবে অন্য কতিপয় মাশায়েখ (র.) এর বিপরীত মনে করেন। তাদের মতে সাহেবাইন (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। কেননা উভয় দলের মূলনীতি ভিন্ন ভিন্ন। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে বৈধতা। কেননা উপরতলা ও নিচতলার মালিকের হস্তক্ষেপ তার মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ। অর্থাৎ উপর তলার মালিক তার মালিকানাধীন উপর তলাতে কাজ করছে আর নিচতলার মালিক তার মালিকানাধীন নিচতলায় কাজ করছে। তাদের মালিকানা তাদের স্বাধীন হস্তক্ষেপকে অনুমোদন করে। কারণ যে কোনো মালিকানা নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত হওয়াকে দাবি করে। তবে এসব হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা তখনই দেখা দেয় যখন এতে প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধিত হয়। প্রতিপক্ষের ক্ষতি না হলে সাধারণ বৈধতা হিসেবে যে কোনো হস্তক্ষেপ বৈধ আর ক্ষতি অস্পষ্ট হলে নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত বাধা প্রদান করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ ব্যাপারে মূল বিষয় হচ্ছে অবৈধতা অর্থাৎ

তাঁর মতে উপর তলার মালিকের উপর তলায় আর নিচতলার মালিকের নিচতলায় যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা নিষেধ। তাঁর দলিল হচ্ছে- এটা এমন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ যাতে অন্যের সম্মানযোগ্য অধিকার যুক্ত রয়েছে। যেহেতু তার হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে অন্যের হক যে কোনো এক পর্যায়ে জড়িত তাই অন্যের অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

যেমন– বন্ধকগ্রহীতা ও ভাড়াটিয়ার হক, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কারো কাছে কোনো দ্রব্য বন্ধক রাখে তাহলে বন্ধকগ্রহীতার (مُرْتَهِن) অনুমতি ব্যতীত বন্ধকদাতা (رَاهِن) -এর জন্য বন্ধকী দ্রব্যে হস্তক্ষেপ অবৈধ। কারণ বন্ধকী জিনিসের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতার হক যুক্ত হয়েছে। যদিও সে হক সাধারণ এবং বন্ধকদাতার মালিকানা পূর্ণ রয়েছে। তদ্রূপ সে ব্যক্তি কোনো কিছু ভাড়া নিলে সেই বস্তুতে মালিকের হস্তক্ষেপ ভাড়াটিয়ার অনুমতি ব্যতীত সঠিক নয়। কারণ বস্তুটির মধ্যে ভাড়াটিয়ার হক যুক্ত হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল অন্যের হক যুক্ত হওয়ার কারণে মালিকের মালিকানা সত্ত্বেও বস্তুর মধ্যে স্বাধীন হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় উপর তলা ও নিচতলার মালিকের জন্য তাদের আপন মালিকানাধীন তলায় স্বাধীন হস্তক্ষেপও প্রতিপক্ষের অনুমতি ছাড়া অবৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, স্বাধীন হস্তক্ষেপ তখনই করা যাবে যখন অন্যের ক্ষতি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে। ক্ষতি না হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হবে যখন প্রতিপক্ষের অনুমতি মিলবে। সারকথা আসল অবস্থা হলো অবৈধতা, তবে অন্যের ক্ষতি না হলে বৈধতা আসবে। সুতরাং যদি অন্যের ক্ষতি অনিশ্চিত হয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অনুমতি কিংবা অসম্মতি কোনো কিছুই যদি জানা না থাকে তাহলে আসল অবস্থা তথা অবৈধতা বহাল থাকবে। কেননা মূলনীতি হচ্ছে اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ অর্থাৎ "সুনিশ্চিত বিষয় সন্দেহপূর্ণ বিষয় দ্বারা খণ্ডিত হয় না।" অতএব, নিষেধাজ্ঞা সন্দেহ দ্বারা বাতিল হবে না। লেখক বলেন, নিচতলার মালিকের নিচের দেয়াল ইত্যাদির মধ্যে যে কোনো হস্তক্ষেপ ক্ষতিকারক বটে। কেননা এসবে ছিদ্র তৈরি করা বা অন্যান্য কাজের দ্বারা দেয়াল, পিলার ইত্যাদি দুর্বল হয়ে যায়। এভাবে এক সময় তা ভবন ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। শরিয়তের নির্দেশ হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করে নিজের কোনো ফায়দা উঠানো যাবে না। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ ; অতএব নিচতলার মালিকের জন্য তার উপরতলায় মালিকের অনুমতি ছাড়া উপর তলার ক্ষতি করে কোনো হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না; বরং সেগুলো অবৈধ ও নাজায়েজ হবে। তদ্রূপ উপর তলার মালিকের জন্য নিচতলার মালিকের অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করা অবৈধ।

قَالَ : وَإِذَا كَانَتْ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ تَنْشَعِبُ مِنْهَا زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ، وَهِيَ غَيْرُ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الزَّائِغَةِ الْأُولَى أَنْ يَفْتَحُوا بَابًا فِي الزَّائِغَةِ الْقُصْوَى، لِأَنَّ فَتْحَهُ لِلْمُرُورِ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْمُرُورِ، إِذْ هُوَ لِأَهْلِهَا خُصُوصًا، حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَهْلِ الْأُولَى فِيمَا بِيعَ فِيهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ، بِخِلَافِ النَّافِذَةِ، لِأَنَّ الْمُرُورَ فِيهَا حَقُّ الْعَامَّةِ، قِيلَ : اَلْمَنْعُ مِنَ الْمُرُورِ لَا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ، لِأَنَّهُ رَفْعُ جِدَارِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْفَتْحِ لِأَنَّ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا يُمْكِنُهُ الْمَنْعُ مِنَ الْمُرُورِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَلِأَنَّهُ عَسَاهُ يَدَّعِي الْحَقَّ فِي الْقُصْوَى بِتَرْكِيبِ الْبَابِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি একটি সোজা সড়ক থেকে একটি সোজা গলি বের হয়, যার শেষ প্রান্ত বন্ধ, তাহলে প্রথম সড়কের অধিবাসীদের গলির [শাখা সড়কের] দিকে গেইট রাখার অধিকার নেই। কেননা গেইট রাখা হয় পথ চলার জন্য, অথচ তাদের শাখা গলিতে পথ চলার অধিকার নেই। কেননা ঐ গলিটি বিশেষভাবে ঐ গলির অধিবাসীদের জন্য। এজন্যই তো গলির ভিতরে বিক্রীত জমির মধ্যে প্রথম সড়কের [মেইন রোডের] অধিবাসীদের শুফআহ -এর অধিকার স্বীকৃত নয়, তবে মুক্ত গলির হুকুম ভিন্ন। কেননা তাতে পথ চলার অধিকার সকলের। কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞা কেবল পথ চলার ক্ষেত্রে দরজা খোলার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, দরজা খোলার অর্থ হচ্ছে নিজ দেয়াল ভাঙ্গা। বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা দরজা খোলা সংক্রান্ত ব্যাপারে, কেননা দরজা [গেইট] খোলার পর প্রতি মুহূর্তে পথ চলাতে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া দরজা খোলার সুবাদে এক সময় গলিতে চলাচলের অধিকার দাবি করে বসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَتْ زَائِغَةٌ الخ : উক্ত ইবারতে সড়ক/ রাস্তার অধিকার সংক্রান্ত মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে।

زَائِغَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– বক্রতা, কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি। শব্দটি গলি ও শাখা সড়কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ছাক্কাফী (র.) ও তাজুশ শারীয়াহ -এর মতে زَائِغَةٌ শব্দের অর্থ– মাথা বন্ধ গলি। সারকথা হচ্ছে এখানে এর অর্থ মূল সড়ক থেকে বের হওয়া শাখা সড়ক বা গলি। গলি দু ধরনের হয়ে থাকে– ১. শেষ প্রান্ত বন্ধ ২. শেষ প্রান্ত খোলা। এখানে দুটি চিত্রই দেওয়া হলো–

زَائِغَةٌ نَافِذَةٌ : উন্মুক্ত গলি

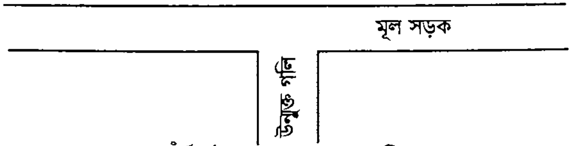

زَائِغَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ : বন্ধ গলি

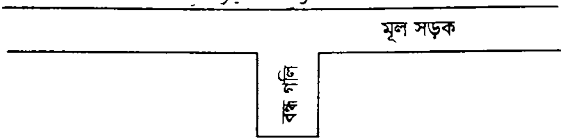

ইবারতের মাসআলার স্বরূপ হলো, যদি একটি সোজা সড়ক থেকে সোজা গলি বের হয় এবং গলিটির শেষ প্রান্ত বন্ধ থাকে তাহলে প্রথম সড়কের অধিবাসীদের জন্য শাখা সড়ক বা গলির দিকে তাদের বাড়ির দরজা রাখা বৈধ নয়, বা তাদের গলির দিকে দরজা রাখার অধিকার নেই। নিচে চিত্রের সাহায্যে মাসআলাটি বুঝানো হলো।

মূল ইবারতে বর্ণিত মাসআলার চিত্র :

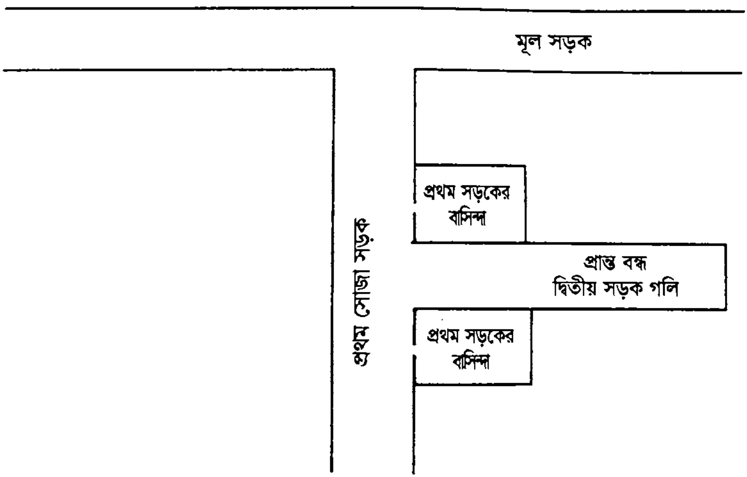

এরপর লেখক গলিতে দরজা বা গেইট না খোলার দলিল দেন এভাবে যে, দরজা বা গেইট খোলা হয় এর সাহায্যে চলাচল করার জন্য। যেহেতু প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের গলিতে চলাচলের অধিকার নেই তাই প্রথম সড়কের বাসিন্দাগণ গলির দিকে দরজা খুলতে পারবেন না। কেননা গলি/ দ্বিতীয় সড়কটি কেবলমাত্র গলিতে বসবাসকারী লোকদের চলাচলের জন্য। এ গলিতে মূল সড়কের বাসিন্দাদের চলাচলের অধিকার নেই। অধিকার না থাকার বিষয়টি বুঝানোর জন্য লেখক শুফআহ-এর মাসআলা পেশ করেছেন। লেখক বলেন, গলিতে যে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের অধিকার নেই তার প্রমাণ এই যে, যদি গলির কোনো বাড়ি বিক্রি হয় তাতে প্রথম সড়কের লোকদের শুফআহ-এর অধিকার থাকবে না। প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের শুফআহ এর অধিকার না থাকা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের গলির মাঝে কোনো অধিকার নেই। যেহেতু প্রথম সড়কের লোকদের গলিতে কোনো অধিকার নেই তাই তারা গলির দিকে তাদের বাড়ীর দরজা বা গেইট খুলতে পারবে না। তবে যদি গলির শেষ মাথা বন্ধ না হয় তথা উন্মুক্ত গলি হয় তখন এতে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের দরজা বা গেইট খোলাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং সেই গলির দিকে দরজা খোলা এবং গলিপথে চলাচল করার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। কেননা তখন দ্বিতীয় সড়ক বা গলিটি জনসাধারণের চলাচলের গলি বিবেচিত হবে, ঐ গলির বাসিন্দাদের বিশেষ গলি সাব্যস্ত হবে না। যেহেতু সেই গলিতে সকলেরই চলাচলের অধিকার রয়েছে তাই এতে প্রথম সড়কের বাসিন্দাগণ চলাচল করতে পারবে, যেহেতু তাদের চলাচলের অধিকার স্বীকৃত তাই তাদের বাড়ির দরজা বা গেইট খোলাতেও কোনো সমস্যা নেই. নিচের চিত্রে উন্মুক্ত গলির ছবি দেওয়া হলো−

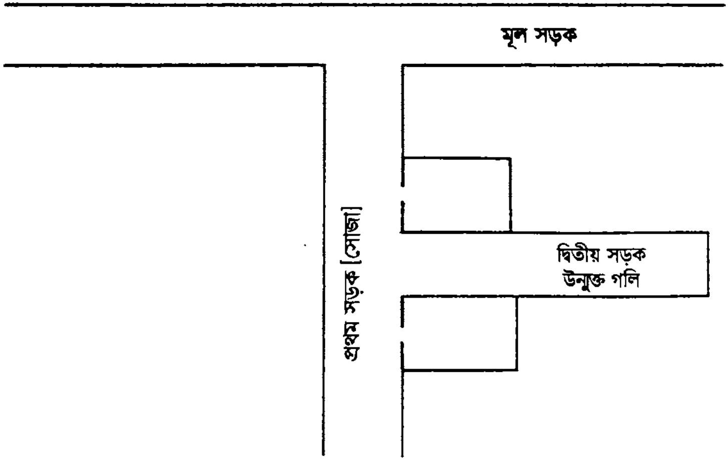

قَوْلُهُ قِيلَ الْمَنْعُ مِنَ الْمُرُوْرِ الخ : লেখক বলেন, প্রথম সোজা সড়ক থেকে যে সোজা গলি বের হয়েছে, তার প্রান্ত যদি বন্ধ থাকে তাহলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের দরজা/ গেইট খোলার অনুমতি নেই। এ সম্পর্কে কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা মূলত চলাচলের ব্যাপারে, দরজা খোলার ব্যাপারে নয়। সুতরাং তাদের মতে প্রথম সড়কের অধিবাসীদের জন্য দরজা/ গেইট খোলার অধিকার আছে বটে; তবে চলাচলের অধিকার নেই। তাদের দলিল হলো, দরজা খোলার অর্থ হচ্ছে দেয়ালের একাংশ ভেঙ্গে দেওয়া/ দেয়াল না তোলা। যেহেতু বাড়ির মালিকের পুরো দেয়াল না তোলার কিংবা পুরো দেয়াল ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার আছে তাহলে একাংশ না তোলার/ ভেঙ্গে ফেলার অধিকার তো অবশ্যই থাকবে; কিন্তু লেখক বলেন, বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে প্রথম সড়কের অধিবাসীদের গলির দিকে দরজা খুলতেই নিষেধ করা হয়েছে, শুধুমাত্র চলাচল নিষেধ করা হয়েছে এমন নয়। কারণ দরজা/ গেইট খোলার পর সার্বক্ষণিকভাবে চলাচলে বাঁধা প্রদান করা এক অসম্ভব কাজ। তাই চলাচলে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দরজা খোলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা দরজা না থাকলে চলাচল করা সম্ভব হবে না।

লেখক বিশুদ্ধতর মতের দ্বিতীয় দলিল দেন এভাবে যে, যদি প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের দরজা খোলার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে এটা খুব সম্ভব যে, কিছুকাল পরে উক্ত বাসিন্দা দ্বিতীয় সড়কে-গলিতে দরজা খোলার সুবাদে চলাচলের অধিকার দাবি করে বসবে, অথবা শুফআহ ও অন্যান্য অধিকার চেয়ে বসবে। ফলে একটা বিবাদ সৃষ্টি হবে। আবার তাকে সেই অধিকার প্রদান করা হলে গলির বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব বিবেচনা করত প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের দ্বিতীয় সড়কে দরজা খোলার অনুমতি দেওয়াই হবে না।

وَاِنْ كَانَتْ مُسْتَدِيْرَةً قَدْ لَزِقَ طَرْفَاهَا فَلَهُمْ اَنْ يَفْتَحُوْا بَابًا، لِاَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّ الْمُرُوْرِ فِىْ كُلِّهَا، اِذْ هِىَ سَاحَةٌ مُشْتَرِكَةٌ، وَلِهٰذَا يَشْتَرِكُوْنَ فِى الشُّفْعَةِ، اِذَا بِيْعَتْ دَارٌ مِنْهَا .

অনুবাদ : আর যদি গলিপথটি অর্ধবৃত্তাকারে হয় যার দুপ্রান্ত [প্রথম সড়কের সাথে] মিলে গেছে তাহলে প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের [দ্বিতীয় সড়কে] দরজা খোলার অধিকার থাকবে। কেননা প্রত্যেকের পুরো সড়কে চলাচলের অধিকার রয়েছে। কারণ এটা [দ্বিতীয় সড়ক] তো সকলের খোলা স্থান। আর এজন্যই যদি সেখানের কোনো বাড়ি বিক্রি হয়, তাহলে সকলে শুফআহর অংশীদারি লাভ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ مُسْتَدِيْرَةً قَدْ لَزِقَ الخ : ইতঃপূর্বে প্রথম সড়ক থেকে নির্গত দ্বিতীয় সোজা সড়ক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর চলমান ইবারতে প্রথম সড়ক থেকে বের হওয়া এমন অর্ধবৃত্তাকারে সড়কের কথা আলোচনা করা হচ্ছে যার উভয় প্রান্ত মূল সড়কের সাথে মিলিত আর মূল / প্রথম সড়কটিও উন্মুক্ত নয়। নিম্নে এর চিত্র দেওয়া হলো–

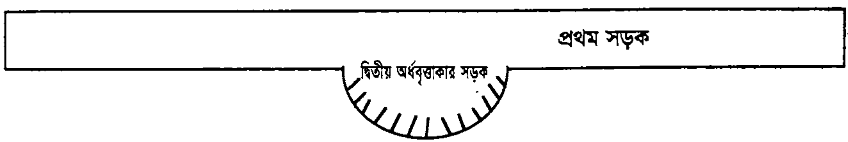

চিত্রে প্রথম সড়কের দুজন বাসিন্দার বাড়ি দেখা যাচ্ছে যারা প্রথম সড়কে তাদের বাড়িতে গেইট রেখেছে, আবার প্রথম সড়ক থেকে বের হওয়া অর্ধবৃত্তাকারে শাখা সড়কটিতেও তাদের বাড়ির দরজা রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম সড়কের বাসিন্দাদের দ্বিতীয় অর্ধবৃত্তাকারে সড়কের দিকে দরজা খোলার অধিকার রয়েছে। এর দলিল সম্পর্কে হেদায়ার লেখক বলেন, দ্বিতীয় সড়ক বা মাঝের আঙ্গিনা সকলের সম্মিলিত, উক্ত আঙ্গিনার মালিক প্রথম ও দ্বিতীয় সড়কের সবাই। এজন্য সবারই এতে চলাচলের অধিকার রয়েছে। যেহেতু সবার চলাচলের অধিকার স্বীকৃত তাই অর্ধবৃত্তাকার সড়ক অভিমুখে দরজা খোলার অধিকারও অবশ্যই থাকবে। আর এ কারণেই উক্ত অর্ধবৃত্তাকার গলিতে যদি কোনো বাড়ি বিক্রি হয় তাহলে উক্ত ঘরের শুফআহ দাবি করার অধিকার সকলের রয়েছে।

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى فِىْ دَارٍ دَعْوٰى وَاَنْكَرَهَا الَّذِىْ هِىَ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ صَالَحَهٗ مِنْهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَهِىَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْاِنْكَارِ، وَسَنَذْكُرُهَا فِى الصُّلْحِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَالْمُدَّعٰى وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلاً فَالصُّلْحُ عَلٰى مَعْلُوْمٍ عَنْ مَجْهُوْلٍ جَائِزٌ عِنْدَنَا، لِاَنَّهٗ جَهَالَةٌ فِى السَّاقِطِ، فَلَا تُفْضِىْ اِلَى الْمُنَازَعَةِ عَلٰى مَا عُرِفَ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ কোনো বাড়ির অংশ দাবি করে; কিন্তু বাড়ির [বর্তমান] দখলদার তা অস্বীকার করে। তারপর সে [দখলদার] দাবিদারের সাথে দাবিকৃত অংশের ব্যাপারে আপস রফা করে তাহলে তা বৈধ হবে। এটা হচ্ছে অস্বীকারের পর সমঝোতা সংক্রান্ত মাসআলা, সন্ধি ও সমঝোতা চুক্তির অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। [আলোচ্য মাসআলায়] দাবিকৃত অংশ যদিও অজ্ঞাত; কিন্তু অজ্ঞাত অংশের তরফে জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট অংশের উপর আপস করা আমাদের মতে বৈধ। কেননা এই অজ্ঞতা এমন বিষয়ে যা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা বিবাদের পথে ধাবিত করবে না। এ বিষয়ে সন্ধি ও সমঝোতা অধ্যায়ে জানা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى فِىْ دَارٍ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত আল জামিউস সাগীরের একটি মাসআলা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে صُلْح শব্দের বিশ্লেষণ করা যাক। صُلْح শব্দের অর্থ– সন্ধি, সমঝোতা ও আপস-মীমাংসা। صُلْح মোট তিন প্রকার–

১. صُلْحٌ مَعَ اِقْرَارٍ অর্থাৎ বাদীর দাবি মেনে নিয়ে তার সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়া।
২. صُلْحٌ مَعَ سُكُوْتٍ অর্থাৎ বাদীর দাবি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি বা অস্বীকার কোনো কিছু না করা এবং এ অবস্থায় বাদীর সাথে অনৈক্য দূর করা।
৩. صُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ অর্থাৎ বাদীর দাবি অস্বীকার করার পর তার সাথে সমঝোতা করা। صُلْح সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী হচ্ছে– فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের ভাইদের মাঝে তোমরা আপস করে দাও।"

অন্যত্র বলা হয়েছে– والصلح خير অর্থাৎ "সমঝোতাই মঙ্গল।" উপরিউক্ত তিন প্রকার সন্ধি হানাফী মাযহাবে বৈধ। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শেষোক্ত দু প্রকার বৈধ নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে রাসূলের হাদীস–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيْمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের সব সমঝোতাই বৈধ, তবে যে সমঝোতা-সন্ধি কোনো হারামকে হালাল করে, অথবা হালালকে হারাম করে [তা অবৈধ]।"

সারকথা, وَهِىَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْاِنْكَارِ الخ ইবারত দ্বারা লেখক উপরিউক্ত আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত মাসআলার স্বরূপ হলো, একটি বাড়ি/ খালি জায়গা এক লোকের দখলে আছে। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি উক্ত বাড়ির/ স্থানের একটি অংশ দাবি করল, যেমন বলল, আমি এ বাড়ির/ স্থানের একাংশের মালিক; কিন্তু সে কতটুকু

অংশ পায় তা উল্লেখ করল না। দখলদার দাবিদারের হক পাওয়ার কথা অস্বীকার করল যে, আপনি কোনো অংশ পাবেন না; কিন্তু অস্বীকার করার কারণে যেহেতু অস্বীকারকারীকে শপথ করে বলতে হবে যে, আল্লাহর শপথ আমার কাছে কোনো হক সে পায় না। সে শপথ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে দাবিদারের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব করল। যেমন বলল, আপনার হকের পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা নিয়ে নিন; দাবিদার উক্ত প্রস্তাব লুফে নিল, তাহলে তাদের মাঝে উক্ত সমঝোতা শুদ্ধ বলে সাব্যস্ত হবে। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হক অস্বীকার করার পর বাদীর সাথে যে সমঝোতা করা হয় তাকে صُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ বলা হয়, যা আমাদের কাছে বৈধ। এ সম্পর্কিত আলোচনা সমঝোতা (صُلْح) অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু উপরিউক্ত মাসআলার উপর একটি বড় ধরনের আপত্তি রয়েছে। আপত্তিটি হলো, দাবিদারের / বাদীর দাবি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে হকের দাবি নির্দিষ্টজ্ঞাপক হতে হবে, দাবিকৃত অংশ অনির্দিষ্ট হলে দাবি শুদ্ধ হয় না। আর দাবি শুদ্ধ না হলে সমঝোতা সঠিক হয় না। কেননা এক্ষেত্রে সন্ধি শুদ্ধ হওয়ার প্রধান যুক্তি হচ্ছে শপথ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে সমঝোতা করা, আর শপথ আবশ্যক হয় দাবি শুদ্ধ হলে। সুতরাং যেহেতু দাবি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে হয়নি তাই এর উপর সমঝোতা করা ঠিক নয়।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে হতে পারে–

১. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে নিহায়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় মাশায়েখ বলেন, লেখক এখানে دَعْوٰى-এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দাবি। যেমন– তিনের একাংশ $\frac{1}{3}$ কিংবা অর্ধেক $\frac{1}{2}$ । লেখকের ইবারতের এমন উদ্দেশ্য বলার কারণ হলো, দাবিকৃত অংশ অনির্দিষ্ট হলে দাবিই শুদ্ধ হয় না। আর দাবি শুদ্ধ না হলে এর উপর সন্ধি হতে পারে না।

২. লেখক নিজে যে জবাবটি কিতাবে লিখেছেন তা হচ্ছে, দাবিকৃত অংশ যদিও এখানে অজ্ঞাত তাতেও কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের মাযহাবে অজ্ঞাত অংশের ব্যাপারে জ্ঞাত বিষয়ে সন্ধি করা হলে সে সন্ধি কার্যকর হয়ে যায়। এর কারণ হলো, দাবিকৃত অজ্ঞাত অংশ যা মূলত দখলদারের জিম্মায় রয়েছে, তা সন্ধি ও সমঝোতা করার দ্বারা দখলদারের জিম্মা থেকে রহিত হয়ে যায়। আর যে অজ্ঞতা রহিত হয়ে যায় তা বিবাদের উদ্রেক করে না। প্রকৃতপক্ষে লেনদেনের ক্ষেত্রে বিবাদ উদ্রেককারী অজ্ঞতা নিষিদ্ধ, যে অজ্ঞতা ঝগড়া বাধায় না তা নিষিদ্ধ নয়। যেহেতু আলোচ্য অজ্ঞতা-অনির্দিষ্টতা নিষিদ্ধ নয় তাই তার উপস্থিতিতে সন্ধি ও সমঝোতা শুদ্ধ হয়ে যাবে। লেখক বলেন, বিস্তারিত সমঝোতা অধ্যায় (كِتَابُ الصُّلْحِ) -এর মধ্যে আসবে।

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى دَارًا فِىْ يَدِ رَجُلٍ اَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ فِىْ وَقْتٍ فَسُئِلَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ جَحَدَ فِى الْهِبَةِ فَاشْتَرَيْتُهَا ، وَاَقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَدَّعِىْ فِيْهِ الْهِبَةَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِظُهُوْرِ التَّنَاقُضِ ، اِذْ هُوَ يَدَّعِى الشِّرَاءَ بَعْدَ الْهِبَةِ ، وَهُمْ يَشْهَدُوْنَ بِهِ قَبْلَهَا ، وَلَوْ شَهِدُوْا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلُ لِوُضُوْحِ التَّوْفِيْقِ ، وَلَوْ كَانَ ادَّعَى الْهِبَةَ ثُمَّ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبْلَهَا وَلَمْ يَقُلْ جَحَدَنِى الْهِبَةَ فَاشْتَرَيْتُهَا لَمْ تُقْبَلْ اَيْضًا ، ذَكَرَهُ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ ، لِاَنَّ دَعْوَى الْهِبَةِ اِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ وَدَعْوَى الشِّرَاءِ رُجُوْعٌ مِنْهُ فَعُدَّ مُنَاقِضًا ، بِخِلَافِ مَا اِذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ الْهِبَةِ لِاَنَّهُ تَقْرِيْرُ مِلْكِهِ عِنْدَهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অন্যের দখলে থাকা একটি বাড়ি এই বলে দাবি করল যে, লোকটি তাকে বাড়িটি অমুক সময়ে দান করেছে। তারপর তার কাছে প্রমাণ চাওয়া হলে সে বলল, সে [দখলদার] আমাকে দান করার কথা অস্বীকার করেছে। অতঃপর বাড়িটি তার থেকে আমি কিনে নিয়েছি। তারপর সে ঐ সময়ের পূর্বে ক্রয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে সময়ে দান করেছে বলে দাবি করেছিল; তাহলে তার প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। কেননা স্ববিরোধিতা পাওয়া গিয়েছে। এভাবে যে, বাদী হেবা-দানের পর ক্রয়ের দাবি করছে, আর সাক্ষীরা এর পূর্বে ক্রয় হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর যদি তারা হেবার পর ক্রয় সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে পরস্পর সঙ্গতি থাকাতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দাবিদার দানের দাবি করে, তারপর দানের পূর্বে ক্রয়ের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে; কিন্তু একথা বলেনি যে, দানের কথা অস্বীকার করার পর আমি খরিদ করেছি তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। [জামিউস সাগীরের] কোনো কোনো অনুলিপিতে মাসআলাটি রয়েছে। কেননা হেবার দাবির অর্থ হচ্ছে দাতার মালিকানার স্বীকারোক্তি করা, আর ক্রয়ের দাবির অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসা। সুতরাং এটাকে স্ববিরোধী বিবেচনা করা হবে। তবে যদি হেবার পর ক্রয়ের দাবি করা হয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা এটা হেবার সময় দাতার মালিকানা প্রমাণ করে। [আর তাই এটা পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তির সমর্থক]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى دَارًا فِىْ يَدِ الخ : ইবারতে দানের স্বীকারোক্তি ও তারপর ক্রয়ের দাবি সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। এ ইবারতটিও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। মাসআলার স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি [খালেদ] অন্যের [রাশেদের] দখলে থাকা একটি জমির ব্যাপারে এই দাবি করল যে, রাশেদ আমাকে তার দখলে থাকা জমিটি ২০০৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি দান করত আমার হাতে বুঝিয়ে দিয়েছে; কিন্তু রাশেদ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলল, আমি এরূপ কোনো দান করিনি। বিচারক স্বভাবতই বাদী খালেদের কাছে তার দাবির সপক্ষে সাক্ষী তলব করলেন; কিন্তু তখন

খালেদ বলে ভিন্ন কথা। সে বলল, আমার কাছে তো দানের কোনো সাক্ষী নেই, তবে এর পরবর্তীতে সংঘটিত বিক্রয়ের সাক্ষী রয়েছে। বিষয়টি হলো, দাতা রাশেদ দানও বুঝিয়ে দেওয়ার পর জমিটি আমার হাত থেকে নিয়ে নেয়, তারপর সে দান-হেবারূপে জমিটি আমার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। আর তখন আমি তার [রাশেদের] থেকে জমিটি [আমার খুব পছন্দ হওয়ায়] কিনে নেই। মাননীয় বিচারক আমার এ ক্রয়ের সাক্ষী-প্রমাণও রয়েছে। এরপর খালেদ তার সাক্ষীদের বিচারকের সামনে উপস্থাপন করল; কিন্তু সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিল যে, খালেদ রাশেদ থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৩ইং তে জমিটি খরিদ করেছে। বলা বাহুল্য যে, তাদের এ তারিখ তার দান সংক্রান্ত তারিখের পনের দিন পূর্বের ঘটনা। অর্থাৎ খালেদের দাবি ছিল দানের ঘটনা ঘটেছে পনেরই ফেব্রুয়ারি, তারপর ক্রয়ের ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু সাক্ষীরা বলছে ভিন্ন কথা। তারা বলছে ক্রয়ের ঘটনা ঘটেছে পহেলা ফেব্রুয়ারি, স্পষ্টতই বাদীর দাবি ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে বিরোধ রয়েছে, দাবিকে সত্য ধরা হলে সাক্ষীরা মিথ্যাবাদী, আর সাক্ষীরা সত্যবাদী হলে দাবি মিথ্যা। দাবি ও সাক্ষ্যের এ পরস্পর বিরোধিতা দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। ব্যাখ্যাকারগণ স্ববিরোধিতাকে অন্যভাবে প্রমাণ করেছেন। তা এভাবে যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ক্রয়ের ঘটনা ঘটেছে দানের পূর্বে, অথচ বাদী বলছে আমাকে আগে দান করেছে, সুতরাং তার কথার অর্থ হচ্ছে আমাকে দান করার পূর্বেই আমি জমিটির ক্রয়সূত্রে মালিক ছিলাম। এখন দানের দ্বারা তার মালিকানা কিভাবে প্রমাণ হবে? মালিকানা থাকা অবস্থায় তো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। মালিকানা থাকা অবস্থায় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবিতে স্পষ্ট বিরোধ। মোট কথা বাদীর দাবি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাঝে স্পষ্ট বিরোধ প্রমাণিত হয়। আর নিয়ম হচ্ছে, দাবি ও প্রমাণের মধ্যে বিরোধ থাকা অবস্থাতে প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهَا الخ : লেখক বলেন, যদি দাবিদারের সাক্ষীরা এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রয়ের ঘটনা দানের ঘটনার পর ঘটেছে। যেমন সাক্ষীরা বলল, খালেদ জমিটি ২৫শে ফেব্রুয়ারি ক্রয় করেছে। এ অবস্থায় খালেদের দাবি [দানের ঘটনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি, তারপর ক্রয়ের ঘটনা ঘটেছে] এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য [ক্রয়ের ঘটনা ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঘটেছে] এর মাঝে দৃশ্যত কোনো বিরোধ নেই। যেহেতু দাবি ও সাক্ষ্যের মাঝে কোনো বিরোধ নেই তাই সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হবে। ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া লিখেছে– হিদায়ার কোনো কোনো অনুলিপিতে ইবারত এরূপ যে, وَهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ قَبْلَهُ আর আমাদের কাছে বিদ্যমান অনুলিপিতে রয়েছে قَبْلَهَا ; আমাদের অনুলিপি অনুযায়ী هَا -এর مَرْجِعْ হচ্ছে اَلْهِبَةَ আর قَبْلَهُ হলে "ه" -এর مَرْجِعْ হবে عَقْدَ الْهِبَةِ অথবা وَقْتَ الْهِبَةِ ; অর্থাৎ قَبْلَ عَقْدِ الْهِبَةِ /وَقْتَ الْهِبَةِ ; অনুরূপভাবে لَوْ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهُ -এর ক্ষেত্রে "ه" -এর مَرْجِعْ হবে عَقْدَ الْهِبَةِ /وَقْتَ الْهِبَةِ।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ادَّعَى الْهِبَةَ ثُمَّ اَقَامَ الخ : লেখক বলেন, যদি বাদী [খালেদ] দানের দাবি করে। তারপর সে হেবা-দান সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ক্রয়ের প্রমাণ দাখিল করে এবং 'আমাকে দান করতে অস্বীকার করার পর আমি ক্রয় করেছি' একথা না বলে তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন খালেদ বলল, আমাকে রাশেদ জমিনটি ১৫ই মার্চ ২০০৩ ইং দান করেছে। তারপর খালেদ এমন সাক্ষীদের উপস্থাপন করল, যারা সাক্ষ্য দিল যে, খালেদ উক্ত জমিনটি ৫ই মার্চ ২০০৩ ইং রাশেদ থেকে খরিদ করেছে। এ অবস্থাতেও খালেদের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না, সেই একই [দাবি ও দলিলের স্ববিরোধিতার] কারণে।

লেখক বলেন, জামিউস সাগীরের কোনো কোনো অনুলিপিতে মাসআলাটি এভাবে উল্লিখিত রয়েছে। তারপর এর দলিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বাদীর [খালেদ]-এর হেবা-দানের স্বীকারোক্তি প্রদান এই অর্থ বহন করে যে, হেবার সময় দাতা [রাশেদ] এই স্থানের মালিক ছিল। তারপর তার দান চুক্তির পূর্বে [তথা ৫ই মার্চ ২০০৩ ইং] ক্রয়ের দাবি করা তারই পূর্ব [হেবা সংক্রান্ত] স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসার অর্থ বহন করে। অর্থাৎ খালেদের এই বক্তব্য যে, খালেদ ৫ই মার্চ রাশেদ থেকে জমি ক্রয় করেছে, তা এই অর্থ দেয় যে, রাশেদ ১৫ই মার্চ জমিটির মালিক ছিল না। অথচ খালেদ ইতঃপূর্বে এই দাবি করেছিল যে, রাশেদ তাকে ১৫ই মার্চ হেবা করেছে অর্থাৎ রাশেদ জমির মালিক। সুতরাং বাদীর কথাগুলোর মাঝে পরিষ্কার স্ববিরোধিতা

বিদ্যমান। এজন্য তার ক্রয়ের দাবি কিংবা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি বাদী তথা খালেদ হেবার ঘটনার পরবর্তী সময়ে ক্রয়ের দাবি করে তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন– খালেদ দান বা হেবার ঘটনার দাবি করল ১৫ই মার্চ, অতঃপর ২৫শে মার্চের ব্যাপারে দাবি করল যে, আমি জমিটি ২৫শে মার্চ খরিদ করেছি তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তার ২৫শে মার্চ খরিদ করার দাবি ১৫ই মার্চ রাশেদের জমির মালিকানাকে সমর্থন করে। সুতরাং খালেদ যখন এ দাবি করল যে, সে রাশেদ থেকে ২৫শে মার্চ জমি ক্রয় করেছে, তা রাশেদের জমির মালিক হওয়াকে সমর্থন করছে। সুতরাং যেহেতু উভয় দাবি রাশেদের জমির মালিক হওয়াকে সমর্থন করছে তাই দাবিদ্বয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। এই বৈপরীত্যের অনুপস্থিতির কারণে দাবি ও সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে শেযোক্ত সুরতেও দাবিদারের দলিল গ্রহণযোগ্য না হওয়াই উচিত। কেননা দাবিদার এ অবস্থায় একটি বাতিল দাবি করছে। সে দাবি করছে যে, সে জমি ক্রয় করেছে, অথচ ইতঃপূর্বে সে দাবি করেছিল যে, সে জমিটি দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং তার দু-দাবি মিলালে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথমে সে হেবার মাধ্যমে জমিটির মালিক হয়েছে এবং পরবর্তীতে ক্রয়ের মাধ্যমে সেই জমিরই মালিক হয়েছে। অথচ এটা তো হতে পারে না। কারণ দাবিদারের দুটো দাবির মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। অতীতের আলোচনা অনুযায়ী স্ববিরোধ সংবলিত দাবি ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, আলোচ্য ক্রয়ের দাবিটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে, যখন হেবাকারী [দাতা] হেবা করার কথা অস্বীকার করল তখন অস্বীকারের মাধ্যমে হেবাকে রহিত করল। কেননা বিবাহ ছাড়া অন্য যে কোনো লেনদেন অস্বীকার করার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। বিবাহ রহিত বা অস্বীকার করার দ্বারা রহিত হয় না। সুতরাং বিবাদীর ক্ষেত্রে হেবা রহিত হয়ে গেল বাকি রইল বাদীর ক্ষেত্রের কথা। বাদীর ক্ষেত্রে রহিত হওয়ার জন্য তার সম্মতির প্রয়োজন। যখন বাদী [আলোচ্য মাসআলায়] ক্রয়ের জন্য চেষ্টা করল, তখন এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, সে হেবা রহিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। যদি সে রহিত করার ব্যাপারে সম্মত না হতো তাহলে ক্রয়ের চেষ্টা করত না। সুতরাং হেবা দাবিদার ও বিবাদী উভয়ের সম্মতিতে রহিত হলো। এরপর যখন দাবিদার পূর্ব হেবাকৃত জমিটি ক্রয় করছে তখন তা এমন জমি যার মালিক সে নয়। সুতরাং ক্রয় যথার্থ হয়েছে এবং মালিকানাধীন জমি পুনরায় কেনা হলো না।

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اِشْتَرَيْتَ مِنِّىْ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ فَاَنْكَرَ الْآخَرُ اَنْ اَجْمَعَ الْبَائِعُ عَلٰى تَرْكِ الْخُصُوْمَةِ وَسِعَهُ اَنْ يَطَأَهَا ، لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ لَمَّا جَحَدَ كَانَ فَسْخًا مِنْ جِهَتِهِ اِذِ الْفَسْخُ يَثْبُتُ بِهِ كَمَا اِذَا تَجَاحَدَا فَاِذَا عَزَمَ الْبَائِعُ عَلٰى تَرْكِ الْخُصُوْمَةِ تَمَّ الْفَسْخُ وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ وَاِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ فَقَدِ اقْتَرَنَ بِالْفِعْلِ ، وَهُوَ اِمْسَاكُ الْجَارِيَةِ وَنَقْلُهَا وَمَا يُضَاهِيْهِ ، وَلِاَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اِسْتِيْفَاءُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِىْ فَاتَ رِضَاءُ الْبَائِعِ ، فَيَسْتَبِدُّ بِفَسْخِهِ .

অনুবাদ : যদি কেউ অন্য ব্যক্তিকে বলে, [আমার] এ দাসীটি তুমি আমার কাছ থেকে ক্রয় করেছ; কিন্তু সেই ব্যক্তি অস্বীকার করল। [এমতাবস্থায়] যদি বিক্রেতা বিবাদ [মামলা-মকদ্দমা] পরিহার করার দৃঢ় ইচ্ছা করে তাহলে সেই দাসীর সাথে তার সহবাস করা বৈধ হবে। কেননা ক্রেতা যখন ক্রয়ের বিষয়টি অস্বীকার করল তখন তার পক্ষ থেকে চুক্তিটি রহিত হয়ে গেল। কারণ অস্বীকারের দ্বারা রহিতকরণ প্রমাণিত হয়। যেমন দুজন অস্বীকার করলে রহিত হয়। আর যখন বিক্রেতা বিচার-সালিস পরিহার করার সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে রহিতকরণ পূর্ণতা লাভ করে। শুধুমাত্র দৃঢ় ইচ্ছা দ্বারা যদিও রহিতকরণ প্রমাণিত হয় না; কিন্তু [এখানে] একটি কাজ তার সাথে যুক্ত হওয়াতে তা প্রমাণিত হবে। আর তা হচ্ছে দাসীটি নিজের কাছে রেখে দেওয়া, দাসীকে সরিয়ে নেওয়া এবং এ জাতীয় কোনো কিছু। কেননা যখন ক্রেতা থেকে মূল্য উসুল করা অসম্ভব হয়ে গেল তখন বিক্রেতার সম্মতিও ফউত হয়ে গেল। ফলে বিক্রেতা বিক্রয় রহিত করার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اِشْتَرَيْتَ الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে বিবাদ ও দাবিদাওয়া সংক্রান্ত আরেকটি মাসআলার অবতারণা করেছেন। মাসআলাটির স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি তার একটি দাসী দেখিয়ে অন্য এক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার এ দাসীটি খরিদ করেছ; কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি অস্বীকার করে বলল, দাসীটি আমি ক্রয় করিনি। বিক্রেতা এরপর এ নিয়ে কোনো বিবাদ বা বিচার সালিসিতে যাওয়ার মনোভাব দৃঢ়ভাবে পরিহার করল। এমতাবস্থায় বিক্রেতার জন্য দাসীটির সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। তবে কতিপয় ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, বিক্রেতার অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছার সাথে সাথে মৌখিকভাবে একথা বলতে হবে যে, আমি এ বিষয়ে বিবাদ করতে ইচ্ছুক নই। অর্থাৎ একথা মৌখিকভাবে বললে তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। এর দলিল হলো, যখন ক্রেতা ক্রয়ের কথা অস্বীকার করল তখন বিক্রয় চুক্তিটি তার পক্ষ থেকে রহিত হয়ে গেল। কেননা অস্বীকারের দ্বারা চুক্তি রহিত হয়ে যায়। অস্বীকারের দ্বারা রহিতকরণের দলিল হলো, অস্বীকারের অর্থ হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনের/ সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করা। আর فَسْخ [রহিতকরণ] -এর অর্থ হচ্ছে চুক্তি করার পর তা প্রত্যাহার করা। দুশব্দের অর্থের মাঝে এক ধরনের সাদৃশ্য বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে বর্তমানের চুক্তির অনুপস্থিতি। অর্থাৎ মূল চুক্তিকে অস্বীকার করা আর চুক্তি প্রত্যাহার করা উভয়ের দাবি হচ্ছে বর্তমান চুক্তি বহাল না থাকা। যেহেতু শব্দ দুটির মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান তাই

একটি শব্দ অন্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। অর্থাৎ এখানে جُحُوْدٌ [অস্বীকার] শব্দটি فَسْخٌ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। এরপর লেখক كَمَا إِذَا تَجَاحَدَا বলে স্থলাভিষিক্তকরণের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার কথা অস্বীকার করে তাহলে সেই বিক্রয়টি নিশ্চিতভাবে রহিত সাব্যস্ত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অস্বীকার রহিতকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার অস্বীকারের দ্বারা বিক্রয় চুক্তিটি রহিত বলে সাব্যস্ত হবে। এরপর বিক্রেতা যখন বিবাদ বা বিচার-সালিসি পরিহার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল তখন তার পক্ষ থেকেও রহিত করার প্রতি পরোক্ষ সম্মতি পাওয়া গেল। অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে রহিত হয়ে গেল বা রহিতকরণ পূর্ণতা লাভ করল। বিক্রয় প্রত্যাহার চূড়ান্ত হওয়ার কারণে বিক্রেতার জন্য দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : এখানে একটি আপত্তি প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে পারে আর তা হচ্ছে, শুধুমাত্র ইচ্ছা ও সংকল্প দ্বারা কোনো হুকুম প্রমাণিত হয় না। এমন হুকুম প্রমাণিত না হওয়ার বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন– যে ব্যক্তির খিয়ারে শর্ত রয়েছে। সে যদি বিক্রয় রহিত করার ইচ্ছা করে তাহলে শুধুমাত্র ইচ্ছা করার দ্বারাই বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে না; বরং সেই ব্যক্তিকে মুখে উচ্চারণ করে শোনাতে হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাহারের ইচ্ছা করার দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার/ রহিতকরণ প্রমাণিত হয় না। আর বিক্রয় রহিতকরণ প্রমাণিত না হলে বিক্রেতার জন্য উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না।

উত্তর : এর উত্তরে লেখক বলেন, وَمُجَرَّدُ الْعَزْمِ اِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ الخ অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র বিবাদ পরিহার করার ইচ্ছা দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার প্রমাণিত হয়নি। এখানে বিক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাহার করার ইচ্ছার সাথে বিক্রেতার এমন কাজও যুক্ত হয়েছে যা বিক্রেতার সেই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। যেমন– বিক্রেতার নিজের কাছে দাসী রাখার ব্যবস্থা করা/ বিবাদের স্থান থেকে দাসীকে নিজ ঘরে নিয়ে আসা ও দাসীর থেকে খেদমত গ্রহণ করা ইত্যাদি। এ কাজগুলো এমন যা বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় রহিত করা ছাড়া পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য বিক্রেতার এই কাজগুলো পরোক্ষভাবে বিক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাহার করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। সার কথা হচ্ছে, যেহেতু বিক্রেতা থেকে পরোক্ষভাবে বিক্রয় প্রত্যাহার প্রমাণিত হয়েছে তাই এটা বিক্রয় প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রেতার জন্য দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় প্রত্যাহারের দ্বিতীয় দলিল হলো, যেহেতু ক্রেতা বিক্রয় চুক্তিকে অস্বীকার করেছে তাই ক্রেতা থেকে দাসীর মূল্য আদায় করা সম্ভবপর হবে না। বিক্রয়ের মূল্য উসুল করার অক্ষমতার কারণে বিক্রেতার বিক্রয়ের সম্মতি ফউত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রয় মূল্য উসুল করতে না পারলে বিক্রয় করতে রাজি হবে না। বিক্রেতার সম্মতি না থাকার অর্থ হচ্ছে বিক্রয়ের রুকন না থাকা। আর বিক্রেতার সম্মতি না থাকা তথা বিক্রয়ের রুকন না থাকা বিক্রয় রহিত করে দেয়। এভাবে বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে, বিক্রেতার মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক হবে না। এ দলিলের সারকথা হচ্ছে, বিক্রেতা উক্ত রহিতকরণের ব্যাপারে একাই পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তাই তার অন্যকে বলার/ জানানোর প্রয়োজন নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় দলিলের মাঝে পার্থক্য হলো, প্রথম দলিল অনুযায়ী বিক্রয় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মতামত ও উদ্যোগের প্রয়োজন; কিন্তু দ্বিতীয় দলিল অনুযায়ী বিক্রয় প্রত্যাহার সম্পূর্ণরূপে বিক্রেতার উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন : এখানে কেউ কেউ আরেকটি আপত্তি করে থাকেন যার উল্লেখ কিতাবের মাঝে করা হয়নি। তা হলো, যদি অস্বীকার এবং বিবাদ পরিহার করার ইচ্ছা বিক্রয় প্রত্যাহারের স্থলবর্তী হয় তাহলে তো কোনো মহিলার স্বামী যদি বিবাহকে অস্বীকার করে, আর স্ত্রী স্বামীর সাথে বিবাদে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাহলে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হওয়া উচিত হবে; কিন্তু শরিয়ত তো এমন কোনো কিছুকে সমর্থন করে না।

উত্তর : কোনো কিছু অন্যের স্থলবর্তী হয় এমন স্থানে যে স্থান অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে। বিবাহে রহিতকরণের অর্থের সম্ভবনা নেই, তাই বিবাহ রহিতকরণের স্থলাভিষিক্ত হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রয়ে যেহেতু রহিতকরণের সম্ভাবনা আছে তাই রহিতকরণের স্থলবর্তী হয়।

قَالَ : وَمَنْ اَقَرَّ اَنَّهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ ادَّعَى اَنَّهُ زُيُوفٌ صُدِّقَ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اِقْتَضَى، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَبْضِ اَيْضًا ، وَوَجْهُهُ اَنَّ الزُّيُوفَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ اِلَّا اَنَّهَا مَعِيبَةٌ، وَلِهٰذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جَازَ، وَالْقَبْضُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِيَادِ فَيُصَدَّقُ، لِاَنَّهُ اَنْكَرَ قَبْضَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا اَقَرَّ اَنَّهُ قَبَضَ الْجِيَادَ اَوْ حَقَّهُ اَوِ الثَّمَنَ اَوِ اسْتَوْفَى لِاِقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْجِيَادِ صَرِيحًا اَوْ دَلَالَةً فَلَا يُصَدَّقُ، وَالنَّبَهْرَجَةُ كَالزُّيُوفِ، وَفِي السَّتُّوقَةِ لَا يُصَدَّقُ، لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ، حَتَّى لَوْ تَجَوَّزَ بِهَا فِيمَا ذَكَرْنَا لَا يَجُوزُ، وَالزَّيْفُ مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ، وَالنَّبَهْرَجَةُ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ، وَالسَّتُّوقَةُ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهَا الْغِشُّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ স্বীকার করে যে, সে অমুক ব্যক্তি থেকে দশ দিরহাম [কোনো উপলক্ষে] গ্রহণ করেছে, তারপর সে দাবি করে যে, সেই দিরহামগুলো অচল; তাহলে তার কথা মেনে নেওয়া হবে। জামিউস সাগীরের কোনো কোনো অনুলিপিতে قَبَضَ শব্দের স্থলে اِقْتَضَى শব্দটি রয়েছে। অবশ্য এ শব্দটিও গ্রহণ করার অর্থ বহন করে। এর দলিল হলো, অচল মুদ্রাও দিরহামের শ্রেণিভুক্ত, তবে পার্থক্য এতটুকু যে, এগুলো ত্রুটিযুক্ত। এজন্য সালাম ও সারাফ বিক্রয় চুক্তিতে যদি জাল মুদ্রা গ্রহণ করার ব্যাপারটি সহ্য করে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। তাছাড়া কব্জা করার বিষয়টি শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মুদ্রার সাথে খাস নয়, সুতরাং তাকে সত্যবাদী মনে করা হবে। কেননা সে তার হক গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করেছে। তবে যদি সে স্বীকার করে যে, সে উৎকৃষ্ট মুদ্রা/ তার হক/ মূল্য গ্রহণ করেছে অথবা সে স্বীকার করে যে, সে পূর্ণ পাওনা আদায় করেছে– তাহলে এর ব্যাপার ভিন্ন। কেননা সে সুস্পষ্টভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সুতরাং তার পরবর্তী কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে না। নাবহারজা দিরহাম জাল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত, আর সেতুকাহ দিরহাম গ্রহণ করার দাবি সত্য বলে ধর্তব্য হবে না। কেননা এগুলো দিরহামের শ্রেণিভুক্ত নয়। এজন্য আমাদের বর্ণিত সালাম ও সারাফ বিক্রয় চুক্তিতে সেতুকাহ গ্রহণ করতে সম্মত হলেও বৈধ হবে না। জাল বা অচল (زَيْفٌ) হচ্ছে এমন দিরহাম যেগুলোকে বায়তুল মাল [কেন্দ্রীয় ব্যাংক] খাদযুক্ত [অচল] ঘোষণা করেছে। নাবহারজা এমন দিরহাম যেগুলোকে ব্যবসায়ীরাও ফিরিয়ে দেয় [গ্রহণ করে না], সেতুকাহ হচ্ছে এমন দিরহাম যাতে ভেজাল বেশি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ اَنَّهُ قَبَضَ مِنْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে নিম্নমানের মুদ্রা, ভেজাল মুদ্রা ও অচল মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো গ্রহণ করা হলে মুদ্রা গ্রহণ ধর্তব্য হবে কিনা তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইবারতে প্রথম যে মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে তা হলো কোনো ব্যক্তি স্বীকারোক্তি করল যে, সে অমুক ব্যক্তি থেকে তার পাওনা [ঋণরূপে/ বিক্রয় মূল্যরূপে] আদায় করেছে। তারপর সে বলল, আমি যে দিরহামগুলো কব্জা করেছি সেগুলো খাঁটি নয়; বরং অচল বা খাদযুক্ত। তাহলে উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর কথা শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে যদি কব্জাকারী বলে দিরহামগুলো নাবহারজাহ তবুও তার কথা শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। স্বীকারোক্তির পরবর্তী কথা প্রথম কথা [স্বীকারোক্তি]-এর সাথে সাথে হোক অথবা বিলম্বে হোক তাতে কোনো আসে যায় না। অর্থাৎ উভয়ের একই হুকুম রাখে। যেহেতু লেখক صُدِّقَ শব্দ মুতলাক ব্যবহার করেছেন তাই তার বাক্যের সাথে সাথে বলা এবং বিলম্বে বলা উভয়ই শামিল। এ প্রসঙ্গে ফাতহুল কাদীরে বলা হয়েছে যে, ঋণের স্বীকারোক্তির ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। মাবসূত গ্রন্থের ঋণের স্বীকারোক্তি

সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ বলে, অমুক আমার কাছে পণ্যের মূল্যরূপে/ কর্জরূপে/ ভাড়া হিসেবে একহাজার টাকা পায়, তবে সেই টাকাগুলো খাদযুক্ত বা অচল, তাহলে তার স্বীকারোক্তির প্রথমাংশ গ্রহণযোগ্য হলেও দ্বিতীয়াংশ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়াংশ সাথে সাথে বলুক কিংবা বিলম্বে বলুক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, সাথে সাথে বললে বাক্যের দ্বিতীয়াংশ [দিরহামগুলো খাদযুক্ত বা অচল] ধর্তব্য হবে। বিলম্বে বললে বাক্যের দ্বিতীয়াংশ প্রথমাংশের সাথে ধর্তব্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মত হলো, ঋণ উসুল করা কিংবা ঋণের স্বীকারোক্তি করা উভয় অবস্থায় বিলম্বে বাক্যের দ্বিতীয়াংশ বলা হলে তা সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে না। তাঁদের মতে যখন স্বীকারোক্তিকারী عَشَرَةُ دَرَاهِم বলবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট মুদ্রা। এরপর যখন সে هِيَ زُيُوفٌ বলবে এর দ্বারা তার পূর্বে কৃত স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হবে।

এর উত্তরে আহনাফ বলেন, আমাদের মাসআলা হচ্ছে, এক ব্যক্তি স্বীকার করেছে যে, সে দিরহাম কব্জা করেছে, দিরহাম কব্জা করা উত্তম ও উৎকৃষ্ট মুদ্রার সাথেই খাস নয়, কেননা দিরহাম বলা হলে এর দ্বারা শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট বুঝায় এমন নয়; বরং দিরহাম দ্বারা যেমন উৎকৃষ্ট মুদ্রা বুঝানো হয় তদ্রূপ খাদযুক্ত এবং নিম্নমানের অচল দিরহামও বুঝানো হয়। সুতরাং যখন সে বলল, সে যা কব্জা করেছে তা খাদযুক্ত বা অচল দিরহাম– তখন তার কথার দ্বারা সে কোন প্রকারের দিরহাম গ্রহণ করেছে তার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেল। তার এ কথার দ্বারা সে উৎকৃষ্ট দিরহাম কব্জা করার কথা অস্বীকার করল। সুতরাং তার কথা শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার কথা কোনো অবস্থান থেকে সরে আসা বলে বিবেচিত হবে না। কেননা أَعَمّ বা ব্যাপকতর শব্দ খাসের উপর প্রয়োগ হয়।

قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اقْتَضَى الخ : লেখক বলেন, আল জামিউস সাগীরের কোনো কোনো অনুলিপিতে قَبَضَ শব্দের স্থলে اقْتَضَى [গ্রহণ করা] শব্দটি রয়েছে। শব্দের এ তারতম্য অর্থের মাঝে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। কারণ উভয় শব্দের অর্থ এবং হুকুম একই। এরপর লেখক هِيَ زُيُوفٌ কথাটি কেন সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে? এর দলিল বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, زُيُوفٌ বা খাদযুক্ত দিরহাম মূল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত। পার্থক্য এই যে, এতে ত্রুটি রয়েছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, খাদযুক্ত দিরহাম যে, মূল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত এর দলিল কি? এর উত্তরে লেখক বলেন, সারাফ ও সালাম বিক্রয় চুক্তিতে উভয় বিনিময় কব্জা করার পূর্বে কোনোরূপ অদল-বদল করা বৈধ নয়। অর্থাৎ সারাফ [মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়] -এর মধ্যে কোনো বিনিময় কব্জা করার পূর্বে এবং সালাম বিক্রয়ে رَأْسَ الْمَالِ কব্জা করার পূর্বে এগুলোর পরিবর্তে অন্যকোনো দ্রব্য গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য মাসআলায় খাদযুক্ত দিরহাম যদি 'বাইয়ে সারাফের' দিরহামের পরিবর্তে কেউ প্রদান করে আর গ্রহীতা যদি উক্ত খাদযুক্ত দিরহামই নিতে সম্মত হয়ে যায় তাহলে সেই 'বাইয়ে সারাফ' বৈধ হয়ে যাবে। এর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, খাদযুক্ত দিরহামগুলো মূল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত। যদি মূল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত না হতো তাহলে খাদযুক্ত দিরহাম গ্রহণ নাজায়েজ হতো; কিন্তু যেহেতু উৎকৃষ্ট দিরহামের পরিবর্তে খাদযুক্ত দিরহাম গ্রহণ করা বৈধ, সুতরাং বুঝা গেল খাদযুক্ত দিরহামগুলো দিরহামের শ্রেণিভুক্ত, ভিন্ন কিছু নয়। তদ্রূপ সালাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। যেমন– কোনো ব্যক্তি পাঁচশত দিরহামে পঞ্চাশ মণ চাউল ক্রয় করল। তারপর সে বিক্রেতা পাঁচশত ভালো দিরহামের পরিবর্তে খাদযুক্ত দিরহাম প্রদান করল, আর বিক্রেতা সেই খাদযুক্ত দিরহামগুলো নিয়ে নিতে সম্মত হলো তাহলে সেই সালাম চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, খাদযুক্ত দিরহাম আসল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত। যদি তা না হতো তাহলে সালাম বিক্রয়ে কব্জার পূর্বে ভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ করা আবশ্যক হতো, যা অবৈধ। যেহেতু উৎকৃষ্ট মুদ্রার পরিবর্তে খাদযুক্ত মুদ্রা গ্রহণের পরও সালাম চুক্তি অবৈধ হয় না তাই এর দ্বারা খাদযুক্ত দিরহাম মূল দিরহামের শ্রেণিভুক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَالنَّبَهْرَجَةُ كَالزُّيُوفِ : লেখক বলেন, নাবহারজাহ দিরহাম খাদযুক্ত দিরহামের মতো। ইতঃপূর্বে আমরা এর হুকুম বর্ণনা করে এসেছি; نَبَهْرَجَة মূলত অতি নিম্নমানের মুদ্রাকে বলা হয়, যা ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত গ্রহণ করে না। তবে এটাও দিরহামের শ্রেণিভুক্ত ও সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ الخ : লেখক বলেন, যদি কব্জাকারী প্রথমে বলে যে, সে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করেছে [যা মূলত তার হক]/ তাঁর হক [উৎকৃষ্ট দিরহাম] কব্জা করেছে/ বিক্রয়মূল্য কব্জা করেছে/ সে পূর্ণ হক উসুল করেছে তারপর যদি সে

বলে যে, তার কব্জাকৃত দিরহামগুলো খাদযুক্ত কিংবা নাবহারজাহ তাহলে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিশ্বাস করা হবে না। কেননা উপরিউক্ত চারটি সুরতে প্রত্যক্ষভাবে/ পরোক্ষভাবে সে উৎকৃষ্ট দিরহাম কব্জা করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।

১. **প্রথম সুরত :** সে বলেছে- أَنَّهُ قَبَضَ الْجِيَادَ অর্থাৎ 'সে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করেছে।' এতে প্রত্যক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার কথা বলা হয়েছে।

২. **দ্বিতীয় সুরত :** সে বলেছে- أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ অর্থাৎ 'সে তার হক কব্জা করেছে।' তার হক উৎকৃষ্ট মুদ্রা। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার কথা বলা হয়েছে।

৩. **তৃতীয় সুরত :** সে বলেছে- أَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ অর্থাৎ 'সে বিক্রয় মূল্য কব্জা করেছে।' আর মূল্য উৎকৃষ্ট দিরহাম হয়ে থাকে- খাদযুক্ত মুদ্রা মূল্য হয় না। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার কথা বলা হয়েছে।

৪. **চতুর্থ সুরত :** সে বলেছে- أَنَّهُ اسْتَوْفَى অর্থাৎ 'পূর্ণভাবে উসুল করেছে।' বলা বাহুল্য যে, পূর্ণতা উৎকৃষ্ট মুদ্রা দ্বারাই অর্জিত হয়- খাদযুক্ত মুদ্রা দ্বারা পূর্ণতা অর্জিত হয় না। সুতরাং এতে পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উপরিউক্ত চার সুরতের প্রথম সুরতে প্রত্যক্ষভাবে আর বাকি তিন সুরতে পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার কথা বলা হয়েছে। এরপর একই ব্যক্তি যখন বলে যে, সে খাদযুক্ত কিংবা নাবহাবজাহ [অতি নিম্নমানের] মুদ্রা গ্রহণ করেছে, তখন তার কথাটি পূর্বের কথার বিপরীতে কথা/ স্ববিরোধী কথা গণ্য হয়। আর ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে, স্ববিরোধিতার ক্ষেত্রে দাবি গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, আলোচ্য সুরতগুলোতে খাদযুক্ত/ নাবহারজাহ হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ فَلَا يُصَدَّقُ الخ : ফাতহুল কাদীর ও ইনায়া উভয় ভাষ্যগ্রন্থে নিহায়া গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে এ মাসআলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, লেখক উপরিউক্ত চার সুরতকে একটি হুকুমের অধীন করে বর্ণনা করেছেন। চারটি সুরতের পর হুকুম হিসেবে বলেছেন- لَا يُصَدَّقُ

তিনি বলেন, লেখকের এরূপ বলা উচিত হয়নি। কারণ চার সুরতের হুকুম মুতলাকভাবে এক নয়; বরং এগুলোর হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি বলেন, যখন স্বীকারোক্তি প্রদানকারী বলবে যে, সে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করেছে তারপর তার দিরহামগুলো খাদমুক্ত হওয়ার দাবি বিশ্বাসযোগ্য হবে না। চাই তার দাবি প্রথম বাক্যের সাথে সাথে বলা হোক কিংবা বিলম্বে বলা হোক; কিন্তু অবশিষ্ট তিন সুরতে তার দিরহামগুলো খাদযুক্ত হওয়ার দাবি বিলম্বে করা হলে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, তবে অবিলম্বে-সাথে সাথে দাবি করা হলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে। প্রথম সুরতের সাথে বাকি তিন সুরতের উক্ত পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি কেউ বলে তার জিম্মায় আমার যে মাল/ হক রয়েছে তা আমি কব্জা করেছি। এর দ্বারা স্বীকারকারী মূলত একটি শব্দ ব্যবহার করে দুটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করল- ১. দিরহামের বা হকের পরিমাণ ও ২. উৎকৃষ্ট দিরহাম বা হকের। এরপর যখন সে বলল- إِلَّا وَهِيَ زُيُوفٌ [তবে সেগুলো খাদযুক্ত] তখন সে উৎকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে ইসতিছনা [নেতিবাচক] করল। তার এই ইসতিছনা মূলত একটি সামগ্রিক অংশ থেকে কতককে বাদ দেওয়ার মতো হলো। যেমন কেউ বলল- لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِائَةً [অমুক আমার কাছে একহাজার টাকা পায়, তবে একশত কম]।

পক্ষান্তরে যদি সে বলে- قَبَضْتُ عَشَرَةً جِيَادًا [আমি তার থেকে দশ দিরহাম উৎকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করেছি] তবে এতে দুটি শব্দ দ্বারা দুটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি করল, পরিমাণ বুঝানোর জন্য عَشَرٌ শব্দটিকে এবং উৎকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য جِيَادٌ শব্দটি ব্যবহার করল। এরপর যদি সে দাবি করে- أَلَا إِنَّهَا زُيُوفٌ তখন উৎকৃষ্টতার ব্যাপারে তার ইসতিছনাটি হবে اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ [অর্থাৎ সমগ্র থেকে সমগ্রকে ইসতিছনা করা] আর আরবি ভাষাগত রীতিতে اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ অবৈধ। যেমন কেউ বলল- لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَدِيْنَارٌ إِلَّا دِيْنَارًا ; এ বাক্যে এক দিনারকে এক দিনার থেকে ইসতিছনা করা হয়েছে বা সমগ্র থেকে সমগ্র ইসতিছনা করা হয়েছে। এজন্য এ ইসতিছনা শুদ্ধ নয়। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য قَبَضْتُ عَشَرَةً جِيَادًا أَلَا وَهِيَ زُيُوفٌ শুদ্ধ হবে না। মোটকথা হচ্ছে প্রথম সুরতে স্বীকারোক্তিকারীর পরবর্তী দাবি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু অবশিষ্ট তিন সুরতে স্বীকারোক্তিকারীর দাবি সাথে সাথে করা হলে তা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَفِي السَّتُّوقَةِ لَا يُصَدَّقُ الخ : লেখক বলেন, কব্জাকারী যদি পরবর্তীতে বলে, আমার কব্জাকৃত দিরহামগুলো সেতুকাহ তাহলে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা সেতুকাহ দিরহাম মূলত দিরহামের শ্রেণিভুক্ত বা সমগোত্রীয় নয়।

এর দলিল হলো, যদি বিক্রেতা সালাম বিক্রয়ে কব্জার পূর্বে رَأْسُ الْمَالِ-এর পরিবর্তে সেতুকাহ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে তা বৈধ না। তদ্রূপ যদি সারাফ বিক্রয়ে ক্রেতা/ বিক্রেতা দিরহামের পরিবর্তে সেতুকাহ গ্রহণে রাজি হয়ে যায় তাহলে সারাফ বিক্রয় বৈধ হবে না। কারণ সেতুকাহ দিরহাম নয় আর তাই সালাম ও সারাফ বিক্রয়ে কব্জার পূর্বে ভিন্ন জিনিস গ্রহণ করা আবশ্যক হবে– যা নাজায়েজ। কিন্তু লেখকের এ মাসআলাটির ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ আপত্তি করে বলেন, সেতুকাহ -এর ব্যাপারে লেখকের ঢালাও মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন বিনায়া গ্রন্থের লেখক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী কাকী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, সর্বাবস্থায় এ হুকুম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মাবসূত গ্রন্থে স্বীকারোক্তির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, যদি কেউ বলেন যে, পাওনাদার থেকে পাঁচশত দিরহাম কব্জা করেছে, তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে যে, সেগুলো সিসা জাতীয়, তাহলে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা দিরহামের মধ্যে সীসা অর্ন্তভুক্ত নয়। তবে যদি প্রথম স্বীকারোক্তির সাথে সাথে বলে– هِيَ رِصَاصٌ তাহলে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা সিসা দিরহাম সদৃশ যদিও মূল্যমানের বিচারে পার্থক্য অনেক। যেহেতু সিসার চেয়ে সেতুকাহ দিরহামের অনেক কাছাকাছি। কেননা সেতুকাকে দিরহাম বলা হয়, পক্ষান্তরে সিসাকে দিরহাম বলা হয় না। সুতরাং সিসার হুকুম সেতুকার ক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

ইনায়ার লেখক উপরিউক্ত দুটি আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে লেখকের পক্ষে বলেন, যারা লেখকের উপর উপরিউক্ত দুটি আপত্তি করেছেন, তারা তাঁর ইবারতকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ না করার কারণে আপত্তি করেছেন। কেননা ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত বিলম্বে দাবি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এর দলিল হলো, ইমাম কুদুরী (র.) দাবি প্রসঙ্গে বলেছেন– ثُمَّ ادَّعَى إِنَّهَا زُيُوفٌ الخ ; এখানে ثُمَّ শব্দটি বিলম্বের অর্থ প্রদান করে ফলে তাঁর ইবারত থেকে বিলম্ব দাবি প্রমাণিত হচ্ছে। বিলম্বে দাবি করা হলে তাঁর মতেও তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তবে সাথে সাথে খাদযুক্ত বা নাবহারজাহ হওয়ার দাবি করা হলে কি হুকুম হবে সে সম্পর্কে ইবারতে কোনো ইঙ্গিত নেই। এর ইঙ্গিত না থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা উসূলে ফিক্‌হের পরিভাষায় بَيَانَ تَغْيِيْر ; আর بَيَانَ تَغْيِيْر-এর হুকুম হচ্ছে– هُوَ لَا يُقْبَلُ مُنْفَصِلًا وَيُقْبَلُ مَوْصُوْلًا ; এ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এ বিষয়ে জ্ঞাত আছেন– এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। তাছাড়া একাংশকে যখন উল্লেখ করেছেন এর দ্বারা অন্য অংশ এমনিতেই বুঝা যাবে।

তবে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা কব্জা করার দাবি করার পর খাদযুক্ত দিরহাম কব্জা করার দাবী কোনো অবস্থাতে [সাথে সাথে কিংবা বিলম্বে] গ্রহণযোগ্য হবে না। গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তার পরবর্তী দাবি গ্রহণ করার দ্বারা اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ আবশ্যক হয় যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর লেখক سَتُّوْقَة ও نَبَهْرَجَة، زُيُوْف বলে দিরহামের পরিচয় দিচ্ছেন; زُيُوْف বা খাদযুক্ত দিরহাম وَالزَّيْفُ مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ সম্পর্কে লেখক বলেন, যে দিরহামকে বায়তুল মাল [রাষ্ট্রীয় কোষাগার] খাদযুক্ত গণ্য করে এবং অচল ঘোষণা দেয়; কিন্তু ব্যবসায়ীরা সে দিরহাম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মালকে বর্তমান পরিভাষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। যেমন– বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রা চালু করে এবং মুদ্রা প্রত্যাহার করে।

نَبَهْرَجَة হলো এমন দিরহাম, যা زَيْف থেকেও নিম্নমানের এবং যাকে ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করে না। তবে নাবহারজাহকে দিরহাম বলে অবহিত করা হয়।

আর سَتُّوْقَة বলা হয় এমন দিরহামকে যাতে [রূপার তুলনায়] খাদ বেশি। এটা নাবহারজাহ থেকেও নিম্নমানের। এটাকে দিরহামের শ্রেণিভুক্ত মনে করা হয় না।

মুদ্রা সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা : উপরের আলোচনায় এমন কয়েক ধরনের মুদ্রার বিবরণ এসেছে, যার বা যেগুলোর অস্তিত্ব বর্তমান দুনিয়ায় নেই। মুদ্রার এসব প্রকার ধাতব মুদ্রার সাথে, বিশেষভাবে স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রার সাথে জড়িত। পাঠককুলের কাছে তাই এসব আলোচনা অনেকটাই অপরিচিত। সেসব মুদ্রার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রাচীন মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে সংক্ষেপে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগ এবং তার পরবর্তী বিকাশ সম্পর্কে আমরা আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মুদ্রা শব্দটি আরবি ثَمَنٌ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। অভিধানে কারো দায়িত্বে বর্তানো পরিশোধিত বস্তুকে ثَمَنٌ বুঝানো হয়। হিদায়া গ্রন্থের টীকাকার ثَمَنٌ শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ثَمَنٌ বা মুদ্রা দু-ধরনের হয়ে থাকে– ১. اَلثَّمَنُ الْاَصْلِيُّ

[প্রকৃত মুদ্রা] যেমন– স্বর্ণ, রূপা। ২. اَلثَّمَنُ الْاِصْطِلَاحِیُّ [পারিভাষিক মুদ্রা] পারিভাষিক মুদ্রার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন– هُوَ سِلْعَةٌ فِى الْاَصْلِ اِنْ كَانَ رَائِجًا كَانَ ثَمَنًا অর্থাৎ "পারিভাষিক মুদ্রা মূলত ধাতব উপকরণ, যদি তাকে মুদ্রা হিসেবে প্রচলন দেওয়া হয় তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়।" আল্লামা তাক্বী ওসমানী মুদ্রার সংজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, যে বস্তু লেনদেনের প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা একটি নির্ধারিত পরিমাণের প্রতীক হয়ে থাকে এবং যা দ্বারা মূল্যমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় তাকে মুদ্রা বলা হয়। সর্বকালে মুদ্রা ব্যবস্থা এক ছিল না। যুগে যুগে এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংস্কার হয়েছে। তাই প্রাচীন মুদ্রার সংজ্ঞা এবং বর্তমানকালের মুদ্রার সংজ্ঞাও এক নয়। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, মানব সভ্যতার সূচনাকালে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লেনদেনের প্রথাই প্রচলিত ছিল। যাকে ইসলামি পরিভাষায় بَيْعُ مُقَايَضَةٍ বলা হয়; কিন্তু সেই পদ্ধতিতে মানুষের সমস্যার সমাধান না হওয়াতে মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে মুদ্রা প্রথা প্রচলন করে।

بَيْعُ مُقَايَضَةٍ-এর মাঝে প্রধান সমস্যা এই ছিল যে, চাহিদা ও যোগানের সম্মিলন অনেক সময় একস্থানে ঘটত না। যেমন– একজনের কাছে ধান আছে, তার কাপড়ের প্রয়োজন; কিন্তু কাপড় বিক্রেতাদের কারো ধানের প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় ধান দিয়ে কাপড় ক্রয় করা জটিল হয়ে পড়ত। তাছাড়া পণ্য/ দ্রব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঝক্কি-ঝামেলা তো ছিলই। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ছিল, তাই পরবর্তীকালের লোকেরা বিভিন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা সেসব ধাতব পদার্থগুলো সাময়িক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। আরো পরবর্তীকালে সংরক্ষণ ও বহন সুবিধার দিক বিচার করে সোনাকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। যেহেতু সোনার চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং ধাতব পদার্থের মাঝে এটি সংরক্ষণের জন্য অধিক সুবিধাজনকও ছিল। কেননা এটির লয়-ক্ষয় অন্যসব পদার্থের তুলনায় খুবই কম। তাছাড়া এটি অতি মূল্যবান পদার্থ হিসেবে অল্প পরিমাণই অনেক মূল্যমান বহন করত। তাই এটিকেই পৃথিবীবাসী বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নেয়, সে থেকেই সোনা মুদ্রা মূল হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। এর পরবর্তীকালে সোনার সাথে রূপার মুদ্রার তৈরির প্রচলন শুরু হয় এবং এ দুটিই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সমান তালে চলতে থাকে। প্রথম যুগে সাধারণত সোনা-রূপার মাধ্যমে বেচাকেনা হতো। মুদ্রারূপে ঢালাইকৃত কোনো নির্ধারিত পরিমাণের প্রতীকরূপে এর ব্যবহার ছিল না। পরবর্তীতে মুদ্রা হিসেবে ঢালাইকৃতরূপে তার ব্যবহার শুরু হয় এবং তার গায়ে পরিমাণ নির্দেশক প্রতীকী চিত্র অঙ্কিত হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে সোনা ও রূপা এ দুটি পদার্থকে মুদ্রা মূল হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এরও পরবর্তী যুগে মুদ্রা ব্যবসায়ীরা মুদ্রা গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে রশিদ সরবরাহ করা শুরু করে। এ রশিদসমূহের উন্নত সংস্করণ হিসেবেই কাগজি নোটের প্রচলন শুরু হয়। আমাদের চলমান ইবারতে نَبَهْرَجَةٌ، سَتُوقَةٌ ও زَيُوفٌ যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো পূর্ব যুগের ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিভিন্ন অবস্থা। তৎকালে সোনা ও রূপার যে মুদ্রা তৈরি করা হতো তাতে খাদ যুক্ত করা হতো। অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার সাথে পিতল কাসা ইত্যাদি, আর রূপার মুদ্রার মাঝে সিসা ও সিলভার খাদ হিসেবে মিশানো হতো। খাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিমাণ মূল সোনা/ রূপার সাথে যুক্ত করা তৎকালীন মুদ্রা ব্যবস্থায় বৈধ মনে করা হতো। এর চেয়ে বেশি মেশানো হলে পর্যায়ভেদে তা زَيْفٌ، نَبَهْرَجَةٌ ও سَتُوقَةٌ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, একটা সময় পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে মুদ্রা তৈরি করত। অর্থাৎ বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মুদ্রা তৈরি হতো, আর এ কারণেই মুদ্রায় খাদ কম/ বেশি হওয়ার সম্ভবনা তৈরী হতো বা কম/ বেশি বাস্তবিকই হতো। অস্বাভাবিক পর্যায়ে খাদ হলে তাকে سَتُوقَةٌ বলা হয়। খাদ খুব বেশি হওয়াতে একে দিরহামের [রৌপ্য মুদ্রার] অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো না। তবে এর চেয়ে কম খাদযুক্ত নাবহারজাহকে অবশ্য দিরহামের শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করা হতো, যদিও তা খুবই নিম্নমানের ছিল। আর زَيْفٌ হচ্ছে সাধারণ খাদযুক্ত। যেহেতু সেসব মুদ্রার মূল ছিল সোনা-রূপা, তাই খাদ বেশি থাকা অবস্থাতেও এর একটা মূল্যমান অবশ্যই থাকত, তাই অনেক ব্যবসায়ীরা তা গ্রহণ করত। বর্তমানে যে কাগজি নোট বাজারে প্রচলিত আছে, তাতে খাদের কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে বর্তমানে জাল নোটের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। জাল নোট কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে মুদ্রা প্রকাশ ও তা বাজারে ছাড়ার একমাত্র অথরিটি সরকারের বলে বেসরকারি পর্যায়ে এর উৎপাদন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আশা করা যায় মুদ্রা ব্যবস্থার উপর সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা আমাদের অর্জিত হয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া প্রণীত 'ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন' বইটি পড়া যেতে পারে। উপরে বর্ণিত আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি সংক্ষেপাকারে সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : لَكَ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ، فَقَالَ : لَيْسَ لِيْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ فِيْ مَكَانِهِ : بَلْ لِيْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِاَنَّ اِقْرَارَهُ هُوَالْاَوَّلُ، وَقَدْ اِرْتَدَّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالثَّانِيْ دَعْوٰى، فَلَابُدَّ مِنَ الْحُجَّةِ اَوْ تَصْدِيْقِ خَصْمِهِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ : اِشْتَرَيْتَ وَاَنْكَرَ الْاٰخَرُ لَهُ اَنْ يُصَدِّقَهُ، لِاَنَّ اَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا يَتَفَرَّدُ بِالْفَسْخِ، كَمَا لَا يَتَفَرَّدُ بِالْعَقْدِ، وَالْمَعْنٰى فِيْهِ اَنَّهُ حَقُّهُمَا فَبَقِيَ الْعَقْدُ فَيَعْمَلُ التَّصْدِيْقُ، اَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ يَتَفَرَّدُ بِرَدِّ الْاِقْرَارِ، فَافْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অন্যকে বলে, তুমি আমার কাছে একহাজার দিরহাম ঋণ পাবে। কিন্তু সে বলল, তোমার কাছে আমার কোনো পাওনা নেই। তারপর সেই স্থানেই থাকা অবস্থায় প্রথম ব্যক্তি বলল, বরং তোমার কাছে আমার একহাজার দিরহাম পাওনা আছে। তাহলে প্রথম ব্যক্তির উপর কোনো ঋণ আবশ্যক হবে না। কেননা তার প্রথম উক্তিটি ছিল স্বীকারোক্তিমূলক। আর তা যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল তার প্রত্যাখ্যানের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আর স্বীকারোক্তিকারীর দ্বিতীয় উক্তিটি ছিল দাবীমূলক। সুতরাং এর জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা প্রতিপক্ষের সত্যতা জরুরি। এ মাসআলার বিপরীত মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যকে বলে তুমি খরিদ করেছ। কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে তার পরবর্তীতে স্বীকারোক্তিকারীর কথাকে সত্য মনে করার সুযোগ রয়েছে। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কোনো একজনের বিক্রয় প্রত্যাহার বা রহিত করার এখতিয়ার নেই যেমন চুক্তি করার এখতিয়ার নেই। মূলকথা হচ্ছে রহিত করার হক তাদের দুজনের। সুতরাং চুক্তি বহাল রইল এবং তার সত্যায়ন কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার স্বীকারোক্তি রহিত করার অধিকার রয়েছে। অতএব, উভয় মাসআলা ভিন্ন সাব্যস্ত হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ الخ : উক্ত ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আল-জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। মাসআলার স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি [সুলাইমান] অন্য এক ব্যক্তি [হারূন] -কে বলল, তুমি আমার কাছে একহাজার দিরহাম পাবে। আরবি পরিভাষায় যে স্বীকার/ স্বীকারোক্তি করে তাকে مُقِرٌّ বলা হয়, আর যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় তাকে مُقَرٌّ لَهُ বলা হয়। সুতরাং এ মাসআলায় প্রথম ব্যক্তি তথা সুলাইমান হচ্ছে স্বীকারোক্তিকারী আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তথা হারূন হচ্ছে مُقَرٌّ لَهُ; আলোচ্য মাসআলায় স্বীকারোক্তিকারীর স্বীকারের পর مُقَرٌّ لَهُ তথা হারূন বলল, তোমার কাছে আমার কোনো পাওনা নেই। এরপর সে স্থানে অবস্থানকালেই স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সুলাইমান বলল, বরং আমিই তোমার কাছে একহাজার টাকা পাব। এমতাবস্থায় সুলাইমানের উপর কোনো পাওনা সাব্যস্ত হবে না। এর দলিল সম্পর্কে হিদায়ার লেখক বলেন, স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সুলাইমান থেকে এ বৈঠকে দুটি উক্তি পাওয়া গিয়েছে। প্রথম উক্তিটি مُقَرٌّ لَهُ তথা হারূনের জন্য একহাজার টাকার স্বীকারোক্তি, আর দ্বিতীয় উক্তিটি তার একহাজার পাওয়ার দাবি সংবলিত। সুলাইমানের প্রথম উক্তি তথা স্বীকারোক্তিটি হারূন (مُقَرٌّ لَهُ) -এর প্রত্যাখ্যানের দ্বারা নাকচ হয়ে গেছে। কেননা স্বীকারোক্তি مُقَرٌّ لَهُ -এর প্রত্যাখ্যানের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। অতএব, এ মাসআলায় হারূনের [مُقَرٌّ لَهُ -এর] স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করার কারণে সুলাইমান (مُقِرٌّ) -এর উপর কোনো পাওনা প্রমাণিত হলো না। এরপর যদি হারূন সুলাইমানের পূর্ব স্বীকারোক্তিকে সত্যায়ন করে তাহলেও তার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে না। তার পূর্বকৃত প্রত্যাখ্যান শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে। তাই পরবর্তীতে এর বিপরীত

কোনো কথা গ্রাহ্য হবে না। বাকি রইল সুলাইমানের দ্বিতীয় উক্তি যা একহাজার টাকা পাওনার দাবি সংবলিত। এটা পূর্ব স্বীকারোক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এটা প্রমাণ করার দুটি সুরত রয়েছে– ১. প্রতিপক্ষ বা বিবাদী হয়তো বাদীর দাবিকে সত্যায়ন করবে। ২. নতুবা বিবাদী অস্বীকার করার পর বাদী তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপন করবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ الخ : পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি মালের বিনিময়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, যেমন– সুলাইমান খালেদকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার থেকে উক্ত গোলামটি ক্রয় করেছ। খালেদ অস্বীকার করে বলল, আমি আপনার থেকে কোনো গোলাম খরিদ করিনি তাহলে এতটুকুর দ্বারা বিক্রয় চুক্তি রহিত সাব্যস্ত হবে না; বরং খালেদ যদি পরবর্তীতে বলে যে, আসলে আমি গোলাম খরিদ করেছি তাহলে তার এ সত্যায়ন [প্রত্যাখ্যান করার পর পুনরায়] গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের বর্ণিত প্রথম মাসআলার সাথে এই মাসআলার পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী মাসআলায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করার পর পুনরায় সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হয়নি; কিন্তু পরবর্তীতে বর্ণিত মাসআলায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করার পর সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

উভয় মাসআলার পার্থক্য সম্পর্কে লেখক বলেন, দ্বিতীয় মাসআলায় বিক্রয় চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য যেমন দুজনের মতামতের প্রয়োজন তদ্রূপ বিক্রয় চুক্তি রহিত করার জন্যও দুজনের সমর্থন প্রয়োজন। কেননা চুক্তি রহিত করা উভয়ের হক। সুতরাং একজন যদি চুক্তি অস্বীকার করে তথা রহিত করে তাহলে তা যদিও তার পক্ষ থেকে রহিতকরণ হলো, কিন্তু মূল থেকে চুক্তি রহিত হলো না। রহিত হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষের রহিত করা জরুরি। যেহেতু চুক্তি একজনের অস্বীকারের দ্বারা রহিত হয়নি, তাহলে চুক্তি বহাল আছে। অতএব, অস্বীকারকারীর জন্য চুক্তি বহাল থাকার পক্ষে স্বীকারোক্তিকারীর বক্তব্য পুনরায় সত্যায়ন করা জায়েজ হবে। মালের ব্যাপারে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছে তার ব্যাপারটি এরূপ নয়। কেননা যার অনুকূলে মালের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছে সে স্বীকারোক্তি রহিত করার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ একার অস্বীকার করার দ্বারা স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু مُقَرٌّ لَهُ-এর অস্বীকার করার দ্বারা ঋণের স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায় তাই তার অস্বীকারের পর স্বীকারোক্তি বহাল থাকে না। আর যেহেতু স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায়, তাই অস্বীকার করার পর পুনরায় সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে না। যাহোক উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঋণের স্বীকারোক্তি এবং বিক্রয় চুক্তির স্বীকারোক্তির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে লেখকের উপর কেউ কেউ আপত্তি করেন যে, লেখকের বক্তব্য চুক্তিকারী দুজনের মধ্য হতে একজনের পক্ষে চুক্তি রহিত করা সম্ভব নয়– একথাটি ভুল। তা এভাবে যে, যদি ক্রেতা অস্বীকার করে তারপর বিক্রেতা [স্বীকারোক্তিকারী] ক্রেতার সাথে বিবাদে জড়াতে না চায় তাহলেই বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একজনের অস্বীকারের দ্বারাই বিক্রয় চুক্তি রহিত হলো এবং এরপর যদি ক্রেতা [যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে] সত্যায়ন করে তাহলে তার সত্যায়ন কার্যকর হবে না। কেননা বিক্রয় পরিপূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে। আর এজন্যই যদি দাসীর ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করা হয়ে থাকে তাহলে দাসীর সাথে স্বীকারোক্তিকারীর সহবাস বৈধ হয়ে যাবে যেমনটা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

উত্তর : এ আপত্তির উত্তরে আমরা বলব, ইতঃপূর্বে এতদসংক্রান্ত মাসআলায় এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, বিক্রেতার বিবাদে না জড়ানো এবং দাসীকে বিবাদের স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাই বিক্রয় রহিত করার দলিল। শুধুমাত্র একজনের অস্বীকারের দ্বারা বিক্রয় রহিত হয়নি। কাফী কিতাবে এ প্রসঙ্গে যে আপত্তিটি করা হয়েছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কাফী কিতাবে বলা হয়েছে যে, লেখক এখানে বলেছেন, দুই চুক্তিকারীর একজনের পক্ষে চুক্তি রহিত করা অসম্ভব। অথচ লেখক ইতঃপূর্বে বলেছেন যে, যখন ক্রেতা থেকে মূল্য শোধ করা অসম্ভব হবে তখন বিক্রেতার সম্মতি বাকি থাকবে না। তখন বিক্রেতা বিক্রয় রহিত করার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সারকথা হচ্ছে, লেখকের পূর্ব বর্ণনানুসারে বুঝা গেছে যে, একজনের পক্ষে বিক্রয় রহিত করা সম্ভব, অথচ এখানে বলা হচ্ছে তা সম্ভব নয়। এর উত্তর হচ্ছে, লেখকের ইবারতেই এর জবাব রয়েছে। সেই মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, মূল্য উসুল করা অসম্ভব হওয়ার কারণে বিক্রেতা রহিতকরণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে অথচ আলোচ্য মাসআলায় মূল্য উসুল করা অসম্ভব নয়। কারণ মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্রেতা [যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে] ক্রয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। যখন ক্রেতা ক্রয় করার স্বীকারোক্তি প্রদান করল তখন মূল্য উসুল করা অসম্ভব রইল না। অতএব, কতিপয় লোকের আপত্তি যথার্থ নয়।

قَالَ : وَمَنْ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ مَالًا فَقَالَ، مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ، فَاَقَامَ الْمُدَّعِيْ الْبَيِّنَةَ عَلٰى اَلْفٍ، وَاَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَكَذٰلِكَ عَلَى الْاِبْرَاءِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) : لَا تُقْبَلُ لِاَنَّ الْقَضَاءَ يَتْلُوْ الْوُجُوْبَ، وَقَدْ اَنْكَرَهُ فَيَكُوْنُ مُنَاقِضًا، وَلَنَا اَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنٌ لِاَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ قَدْ يُقْضٰى، وَيُبْرَأُ مِنْهُ دَفْعًا لِلْخُصُوْمَةِ، اَلَا تَرٰى اَنَّهُ يُقَالُ قُضِيَ بِبَاطِلٍ، وَقَدْ يُصَالِحُ عَلٰى شَيْءٍ فَيَثْبُتُ، ثُمَّ يُقْضٰى، وَكَذَا اِذَا قَالَ : لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ لِاَنَّ التَّوْفِيْقَ اَظْهَرُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অন্যের কাছে মাল দাবি করে, আর অপর ব্যক্তি বলে, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা কোনো কালেই ছিল না, অতঃপর দাবিদার একহাজার টাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল আর বিবাদী ঋণ শোধ করার ব্যাপারে দলিলাদি [সাক্ষ্য] উপস্থাপন করল তাহলে তার [বিবাদীর] দলিল গ্রহণ করা হবে। তদ্রূপ ঋণমুক্ত করে দেওয়ার উপর [দলিল পেশ করা হলে তা গ্রহণ করা হবে]। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা ঋণ পরিশোধ করা হয় জিম্মায় ঋণ ওয়াজিব হওয়ার পর। আর যেহেতু সে জিম্মায় আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করেছে তাই তার পরবর্তী বক্তব্য স্ববিরোধী হচ্ছে। আমাদের দলিল হলো, উভয় বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব। কেননা অপ্রাপ্য হকও কখনো প্রদান করা হয়ে থাকে এবং বিচার-সালিস থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দায়মুক্তি নেওয়া হয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বলা হয় যে, অমুক অন্যায্য দাবি পূরণ করেছে। কখনো কোনো দ্রব্যের ব্যাপারে সমঝোতা করা হয়, অতঃপর সে দ্রব্যটি প্রমাণিত হয়ে যায় এবং তা তারপর আদায়ও করা হয়। তদ্রূপ যদি কেউ বলে, আপনি কোনো কালেই আমার কাছে কিছু পাবেন না। কেননা এর সমঝোতা সুস্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে চয়ন করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : এক ব্যক্তি [রাশেদ] খালেদের কাছে দাবি করল যে, আমি তোমার পাওনাদার। কিন্তু খালেদ বলল, তুমি আমার কাছে কখনোই কিছু পেতে না, শুধু শুধু দাবি করছ। এরপর রাশেদ দুজন সাক্ষী পেশ করল, যারা সাক্ষ্য দিল যে, খালেদের কাছে রাশেদ একহাজার টাকা পায়; কিন্তু এরপর খালেদও সাক্ষী পেশ করল যে, সে উক্ত টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে / রাশেদ তাকে দায়মুক্তি দিয়েছে। এমতাবস্থায় বিবাদী [খালেদ] -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, এটা আহনাফের ইমাম যুফার ব্যতীত অন্য সব ইমামের অভিমত। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ঋণ পরিশোধের জন্য জিম্মায় ওয়াজিব হতে হয়, সুতরাং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে দলিল ও সাক্ষ্য উপস্থাপন একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, বিবাদী তার উপর ঋণ আবশ্যক হওয়াকে স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পূর্বের কথোপকথনে বিবাদী তার উপর ঋণ থাকার কথা অস্বীকার করেছিল। সে বলেছিল যে, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই। ফলে বিবাদীর কথার মাঝে বৈপরীত্য প্রকাশ পেল বা তার কথার সাথে দলিলের বিরোধ দেখা

দিল। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, দাবিসমূহের মাঝে কিংবা দাবি ও দলিলের মাঝের বিরোধ দাবিকে অকার্যকর ও বাতিল করে দেয়। নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ দাবির সাক্ষ্যকেই কেবল গ্রহণ করা হয়; ফাসিদ ও অশুদ্ধ দাবির সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা হয় না। যেহেতু বিবাদীর দাবি অকার্যকর ও অশুদ্ধ সেহেতু বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং নিয়ম মোতাবেক আলোচ্য মাসআলায় বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنٌ الخ : জমহুর হানাফীগণের দলিল হলো, বিবাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় দাবির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব বলা বাহুল্য যে, মাল জিম্মায় আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে মাল পরিশোধের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার মাঝে সমন্বয় করা হলে বৈপরীত্য আর থাকছে না। সমন্বয় এভাবে সম্ভব যে, কখনো কখনো সৎ ও মর্যাদাবান লোকেরা বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বাঁচার জন্য মন্দ লোকের অন্যায্য দাবি এবং অন্যায় আবদারকে মেনে নিয়ে অপ্রাপ্য মাল আদায় করে দেন। আবার কখনো দায়মুক্তি নিয়ে নেন। কেননা আদালতে ন্যায়-অন্যায় তো পরে বিবেচনা করা হয়– প্রথমেই বাদীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আসামির কাঠগড়ার দাঁড়াতে হয়। এ অপমানকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য অনেকে অন্যান্য দাবিও মেনে নেন। অন্যান্য দাবি যে মেনে নেওয়া হয় এর দলিল হলো, আরবিতে বলা হয় قَضٰى بِبَاطِلٍ অর্থাৎ সে অন্যায় দাবি পূরণ করেছে। যেমন আরবিতে বলা হয়– قَضٰى بِحَقٍّ অর্থাৎ 'সে ন্যায্য দাবি পূরণ করেছে।' এ ধরনের ব্যবহার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় হক যেমন আদায় করা হয়, তদ্রূপ অন্যায় হকও আদায় করা হয়। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের হক [যা তার উপর রয়েছে] অস্বীকার করে; কিন্তু তারপর বাদীর সাথে লেনদেনের ভিত্তিতে সে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে সম্মত হয়। সেই সমঝোতার মাধ্যমে সেই দাবিকৃত বস্তুটির স্বীকৃত প্রমাণ হয়। এরপর সেই বস্তুটি আদায় করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটি অন্যায় দাবি সমঝোতার মাধ্যমে প্রথমে অন্যায়ভাবে স্বীকৃতি পায় তারপর সেই দাবিকৃত বস্তুটি আদায় করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কখনো অন্যান্য দাবি ও পূরণ করা হয় এবং মাল আদায় করার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে মাল ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক নয়। এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, বিবাদী বাদীকে লক্ষ্য করে যে বলেছিল– "তুমি আমার কাছে কখনো কিছু পাবে না"-এর অর্থ হচ্ছে ন্যায়সঙ্গতভাবে কখনো কিছু পাবে না। আর তার মাল আদায় করে দেওয়ার দাবির অর্থ হচ্ছে যদিও তুমি আমার কাছে কোনো কিছুই পাবে না এতদসত্ত্বেও আমি বিবাদের পথ পরিহার করার উদ্দেশ্যে তোমার অন্যায্য দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়েছি। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, বিবাদীর দাবিদ্বয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্যও নেই। সুতরাং বিবাদীর পক্ষে মালামাল পরিশোধ করার কিংবা দায়মুক্তির ঘোষণা শুদ্ধ বিবেচিত হবে। যেহেতু বিবাদীর দাবি শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, সুতরাং এর উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রদান করাও শুদ্ধ প্রমাণিত।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا قَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ الخ : এখান থেকে লেখক অন্য একটি মাসআলা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর বর্ণিত মাসআলাকে সমর্থন করছেন। মাসআলাটি হলো, এক ব্যক্তি অন্যের কাছে মাল দাবি করল, বিবাদী দাবিদারের উক্ত দাবীকে অস্বীকার করল অর্থাৎ বিবাদী বলল, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই। তারপর বাদী তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, আর বিবাদী দাবীদারের পাওনা পরিশোধ করে দেওয়ার ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করল। তাহলে বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে, কারণ এ অবস্থাতে বিবাদীর কথার মাঝে সমন্বয় সাধন করা আরো সহজ।

সহজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হচ্ছে বিবাদীর বাক্যের ব্যাকরণগত দিক, বিবাদী বলেছিল– لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ 'তুমি আমার কাছে বর্তমানে কিছুই পাও না।' আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী لَيْسَ শব্দটি বর্তমানের কোনো কাজকে নেতিবাচক করে। এরপর বিবাদী বর্তমানের পূর্বে অর্থাৎ অতীতে বাদীর পাওনা পরিশোধের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল কিংবা অতীতে বাদীর পক্ষ থেকে দায়মুক্তি লাভ করার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিবাদীর পাওনা পরিশোধের কিংবা দায়মুক্তি লাভের দলিল ও বর্তমানে পাওনা না থাকার দাবির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। কারণ তার বাদীর পাওনা না থাকার দাবি হচ্ছে বর্তমান কালের, আর বাদীর পাওনা পরিশোধের/ দায়মুক্তি লাভের দলিল হচ্ছে অতীতের। সুতরাং বিবাদীর দাবিও দলিলের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। অতএব বিবাদীর মাল পরিশোধ করার দলিল গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর তাই বিবাদীর দলিল গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

وَلَوْ قَالَ : مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا اَعْرِفُكَ، لَمْ يُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَذَا عَلَى الْاِبْرَاءِ لِتَعَذُّرِ التَّوْفِيْقِ، لِاَنَّهُ لَا يَكُوْنُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اَخْذٌ وَاِعْطَاءٌ وَقَضَاءٌ وَاقْتِضَاءٌ وَمُعَامَلَةٌ وَمُصَالَحَةٌ بِدُوْنِ الْمَعْرِفَةِ، وَذَكَرَالْقُدُوْرِيْ (رح) اَنَّهُ تُقْبَلُ اَيْضًا، لِاَنَّ الْمُحْتَجِبَ اَوِ الْمَخْدَرَةَ قَدْ يُؤْذِيْ بِالشَّغَبِ عَلَى بَابِهِ، فَيَأْمُرُ بَعْضَ وُكَلَائِهِ بِاِرْضَائِهِ وَلَا يَعْرِفُهُ، ثُمَّ يَعْرِفُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَاَمْكَنَ التَّوْفِيْقُ ـ

অনুবাদ : আর যদি বিবাদী বলে, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা ছিল না এবং তোমাকে আমি চিনি না তাহলে মাল পরিশোধের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। তদ্রূপ দায়মুক্তির দলিলও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা দাবি ও দলিলের মাঝে সমন্বয় অসম্ভব। এর কারণ হলো, দুব্যক্তির মাঝে লেনদেন, পরিশোধ– উসুল, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সমঝোতা পরিচয় ব্যতীত হতে পারে না। আর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা নিভৃতচারী ব্যক্তি ও পর্দানশিন মহিলা তার দরজায় [দাবি ও দাওয়া নিয়ে] শোরগোল করা অপছন্দ করে। আর তাই উৎপাতকারীকে শান্ত ও সম্মত করতে তার কোনো উকিল বা প্রতিনিধিকে আদেশ করে অথচ সে [দাবি-দাওয়া নিয়ে] উৎপাতকারীকে চিনে না। অবশ্য পরে তার সাথে পরিচিত হয়। আর এভাবে তো [দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণের মাঝে] সমন্বয় সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَىَّ شَىْءٌ الخ : উপরিউক্ত ইবারতটি পূর্বোক্ত ইবারতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বোক্ত ইবারতে বাদীর মাল পাওয়ার জবাবে বিবাদী বলেছিল– لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ আর এ ইবারতে বলা হয়েছে যে, বিবাদী বাদীর জবাবে বলেছে– مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ দু-ইবারতের মাঝে এতটুকুই পার্থক্য। পূর্বোক্ত ইবারতে বলা হয়েছিল যে, মাল পরিশোধের ব্যাপারে বিবাদীর দলিল গ্রহণ করে নেওয়া হবে। আর চলমান ইবারতে বলা হচ্ছে যে, বিবাদীর মাল পরিশোধের দলিল গ্রহণ করা হবে না।

প্রথমে আমরা চলমান ইবারতের মাসআলার সুরত নিয়ে আলোচনা করব তারপর উভয় মাসআলার পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করব ইনশাআল্লাহ।

সুরতে মাসআলা : এক ব্যক্তি [খালেদ] অন্য ব্যক্তি [রাশেদ] এর কাছে মাল [পাওনা] দাবি করল। রাশেদ বলল, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা ছিল না এবং আমি তোমাকে চিনি না। এরপর খালেদ তার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল। অন্যদিকে রাশেদও দাবিকৃত মাল পরিশোধ করে দেওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল/ খালেদ যে দায়মুক্ত করে দিয়েছে সে ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল। এমতাবস্থায় বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ অবস্থায় বিবাদীর প্রথম কথা ও দ্বিতীয় কথার মাঝে এমন বৈপরীত্য বিদ্যমান যে, উভয় কথার মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। সমন্বয় অসম্ভব হওয়ার কারণ হলো– ১. বিবাদী দাবি করছে যে, অতীতে তার কাছে বাদীর কোনো পাওনা ছিল না। তারপর

আবার সে দাবি করছে যে, অতীতে সে বাদীর পাওনা পরিশোধ করেছে, তার দুটি দাবিই অতীতে হয়েছে। আবার দুটি দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। তার একটি দাবি সত্য ধরে নেওয়া হলে অন্য দাবিটি মিথ্যা হয়ে যায় আবার অন্যটি সত্য হলে প্রথম দাবিটি মিথ্যা হয়ে যায়। অর্থাৎ দু-দাবির মাঝে টানাপোড়ন থেকে যায়।

২. দ্বিতীয় দলিল হলো, বিবাদী যখন দাবিকৃত মাল পরিশোধ করবে বাদী তা গ্রহণ করবে এবং তাদের উভয়ের মাঝে দাবিকৃত মাল আদান-প্রদান করা হবে। সারকথা হচ্ছে দুজনের মাঝে একটি লেনদেন ও আপস চুক্তি হবে। দুজনের মাঝে লেনদেন, আদান-প্রদান ও উসুল-পরিশোধের জন্য পরস্পর পরিচয় থাকা আবশ্যক হয়ে থাকে। পরস্পর পরিচয় ছাড়া এরূপ লেনদেন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিবাদীর বাদী সম্পর্কে মন্তব্য "আমি তাকে চিনি না" বলার পর পরবর্তীতে বাদীর কাছে তার দাবিকৃত মাল পরিশোধ করার দাবি নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। যেহেতু বিবাদীর দাবিই অগ্রহণযোগ্য ও ভুল সেহেতু সে দাবির স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলিলও অগ্রহণযোগ্য হবে।

উপরিউক্ত দুদলিলের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোক্ত দুটি মাসআলাতে যেমন বিবাদীর কথাসমূহের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব এখানে তা সম্ভব নয়। অতএব, তার সাক্ষ্য-প্রমাণও গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْقُدُوْرِيْ (رح) اَنَّهُ تُقْبَلُ اَيْضًا الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, উপরিউক্ত সুরতটির ব্যাপারে শায়েখ আবুল হাসান আল কুদূরী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে উপরিউক্ত সুরতেও বিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এ ব্যাপারে তিনি বলেন, যেহেতু এ সুরতেও বিবাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় দাবির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব তাই তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করাতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। সমন্বয় সাধন করা যে সম্ভব এর একটি সুরত তিনি উপস্থাপন করেছেন। আর তা এভাবে যে, বিবাদী হয়তো নিভৃতচারী কিংবা পর্দানশিন মহিলা যাদের কেউ নিজেদের প্রকাশ করতে তৈরি নন। এমতাবস্থায় যখন বাদী তার দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রতিদিন বিবাদী নিভৃতচারী ও পর্দানশিন মহিলার দরজায় হানা দেয় এবং তাদের উৎপাত করে, তাদের ঘরের সামনে চিৎকার ও হই-হুল্লোড় করে। উক্ত দাবিদারের এরূপ উৎপাতের দ্বারা সম্মানিত ঘরের লোকদের বিরক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ জাতীয় উৎপাত বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বিবাদী তার কোনো প্রতিনিধিকে আদেশ করল যে, বাদীকে টাকা-পয়সা/ মালামাল দিয়ে যেন শান্ত করা হয় এবং বিবাদীর দরজায় এসে যেন ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না করে। কথামতো বিবাদীর প্রতিনিধি বাদীকে টাকা-পয়সা/ মালামাল দিয়ে শান্ত করল অথচ বিবাদী বাদীকে চিনে না। পরে বাদী যখন তার কাছে এসে নিজের পরিচয় জাহির করে তখন তার সাথে পরিচয় হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় বিবাদীর পক্ষে প্রথমে একথা বলা সম্ভব যে, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা ছিল না এবং আমি তোমাকে চিনি না। অতঃপর সে বাদীর দাবিকৃত মাল পরিশোধ করার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে।

আমাদের বর্ণিত মাসআলা অনুযায়ী বিবাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় দাবির মাঝে সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব নয়, যেহেতু বিবাদীর দাবিদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সম্ভব এবং উভয় দাবির মাঝে প্রকৃত বৈপরীত্য নেই তাই বিবাদীর মাল বা দাবিকৃত অর্থ পরিশোধের দলিল গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লামা ফখরুদ্দিন কাযীখান জামিউস সাগীরের ভাষ্যে বলেন, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি বিবাদী তার প্রতিনিধির সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেই বাদীর দাবিকৃত মাল পরিশোধ করে তাহলে তার দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তখন বিবাদীর দাবিদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না। কতিপয় মাশায়েখ বলেন, বিবাদী যদি উপরিউক্ত অবস্থায় দায়মুক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে তা সকলের মতে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ দায়মুক্তির জন্য বাদী-বিবাদীর মাঝে পরিচয় থাকা আবশ্যক নয়।

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ اَنَّهٗ بَاعَهٗ جَارِيَةً فَقَالَ لَمْ اَبِعْهَا مِنْكَ قَطُّ، فَاَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا اِصْبَعًا زَائِدَةً، فَاَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ اَنَّهٗ بَرِئَ اِلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ تُقْبَلُ اِعْتِبَارًا بِمَا ذَكَرْنَا، وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ شَرْطَ الْبَرَاءَةِ تَغْيِيْرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ اِقْتِضَاءِ وَصْفِ السَّلَامَةِ اِلٰى غَيْرِهٖ فَيَسْتَدْعِىْ وُجُوْدَ الْبَيْعِ، وَقَدْ اَنْكَرَهٗ فَكَانَ مُنَاقِضًا بِخِلَافِ الدَّيْنِ، لِاَنَّهٗ قَدْ يُقْضٰى وَاِنْ كَانَ بَاطِلًا عَلٰى مَا مَرَّ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের উপর এই দাবি করে যে, সে তার [ক্রেতার] কাছে নিজ দাসী বিক্রয় করেছে; কিন্তু সে [বিক্রেতা] বলল, আমি তোমার কাছে কখনোই তা বিক্রি করিনি। অতঃপর দাবিদার ক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করল। তারপর দাসীর হাতে অতিরিক্ত একটি আঙ্গুল দেখতে পেল। এমতাবস্থায় বিক্রেতা [বিবাদী] সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে তার কাছে সব ক্রটি থেকে দায়মুক্তির কথা বলেছে তাহলে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উপরিউক্ত সমন্বয়ের মাসআলার উপর ভিত্তি করে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে নেওয়া হবে। জাহিরী রেওয়ায়েতের হেতু এই যে, বারাআত বা সকল দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়ার শর্তের অর্থ এই যে, ক্রটিমুক্ত চুক্তির রূপান্তর করা, আর এটা বিক্রয়ের অস্তিত্বকে দাবি করে। অথচ সে বিক্রয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। সুতরাং তার বক্তব্য স্ববিরোধী বিবেচিত হলো। ঋণের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন, কেননা তা অন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করা হয়। এর বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ اَنَّهٗ الخ : উল্লিখিত ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। মাসআলাটির স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি [জামিল] অন্য এক ব্যক্তির [আসিফের] বিরুদ্ধে দাবি করল যে, আসিফ তার কাছে নিজ বাদি বিক্রি করেছে। কিন্তু আসিফ [বিবাদী] বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলল যে, আমি তোমার কাছে এ দাসী কখনো বিক্রি করিনি। অতঃপর জামিল [বাদি] আসিফের কাছ হতে বাদি ক্রয় করার এবং তা কব্জা করার দলিল-প্রমাণ পেশ করল। তাদের ফয়সালা হওয়ার পর দাসীটি কব্জা করে বাদী [জামিল] দাসীটির মাঝে এমন একটি ক্রটি পেল যা দাসী ক্রয় করার পর উদ্ভূত হয়নি; বরং দাসীর মাঝে উক্ত ক্রটি বিক্রেতার কাছে থাকতেই সুনিশ্চিতভাবে ছিল। যেমন– বাদী দেখতে পেল যে, দাসীটির আঙ্গুল পাঁচটির স্থলে ছয়টি। আর আঙ্গুল বেশি হওয়া একটি দোষ। এটা এমন দোষ যা বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই ছিল, এটা নতুনভাবে জন্মায়নি। স্বভাবতই দাসীটি দোষযুক্ত হওয়ার কারণে ক্রেতা সেটিকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে চাইল; কিন্তু তখন বিক্রেতা বলল, আমি [আসিফ] উক্ত দাসী বিক্রয়ের সময় এই শর্তে বিক্রি করেছি যে, দাসীটির মাঝে কোনো ক্রটি নেই। আর ক্রেতা উক্ত শর্তের সাথে দাসীটি ক্রয় করেছিল। বিক্রেতা তার উক্ত দাবির পক্ষে দলিল পেশ করল, তবুও বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উপরিউক্ত অবস্থাতে বিক্রেতার দলিলই গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মাসআলাগুলোর উপর কিয়াস করেছেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী মাসআলাগুলোতে যেমন বিবাদীর দাবিসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তার বক্তব্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল তদ্রূপ চলমান মাসআলাতেও বিবাদীর কথাসমূহের মাঝে সমন্বয় সম্ভব হওয়াতে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে নেওয়া হবে। এ মাসআলায় উভয় বক্তব্যের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হবে যে, যখন বিবাদী এ কথা বলল যে, আমি এ দাসীটি তোমার কাছে বিক্রি করিনি। তখন এ বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমার এবং তোমার মাঝে কোনো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; কিন্তু যখন বাদী বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দাবি করল তখন আমি বললাম, তাহলে আমাকে দাসীর সমস্ত দোষের ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দাও। সুতরাং বাদী আমার সেই আবেদনটি গ্রহণ করে নিল। সুতরাং ব্যাপারটি এমন হলো যে, বিবাদী বাদীর দাবি জানানোর পূর্বে সাধারণ বিক্রয় অস্বীকার করেছিল। এরপর বাদী যখন দাবি করল তখন সে বিক্রয় চুক্তিটি মেনে নিয়ে ক্রটিসমূহ থেকে দায়মুক্তির আবদার করল। অতএব, বিবাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় দাবির মাঝে বিরোধ রইল না। যেহেতু বিবাদীর দাবিদ্বয়ের মাঝে বিরোধ নেই, তাই তার দ্বিতীয় দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করাতেও কোনো সমস্যা নেই।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বিবাদীর দাবিদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় হওয়ার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, এখানে বিবাদী [বিক্রেতা] হচ্ছে একজন উকিল যাকে মূল বিক্রেতা বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করেছে। সে বাদীর জবাবে যখন বলবে, আমি তোমার কাছে বিক্রি করিনি– এর অর্থ হবে আমি নিজ বস্তু তোমার কাছে বিক্রি করিনি অর্থাৎ আমার মুয়াক্কিলের দ্রব্যাদি বিক্রি করেছি। এরপর সে যখন বিক্রয়পণ্যে সব ধরনের ক্রটির ব্যাপারে দায়মুক্তির দাবি করবে, তার এই দাবি পূর্বোক্ত দাবির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি জাহেরী রেওয়ায়েতের মধ্যে নেই। আর এজন্যই ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীরে উল্লিখিত ইবারতে আহনাফের মাঝে কোনো মতবিরোধ আছে বলে উল্লেখ করেননি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্ত রেওয়ায়েত ইমাম খাসসাফ (র.) বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ شَرْطَ الْبَرَاءَةِ الخ : এরপর লেখক জাহেরী রেওয়ায়েতের দলিল উল্লেখ করছেন এই বলে যে, বিবাদী [বিক্রেতা] এর সব ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করার দাবি করা প্রকারান্তরে বিক্রয় চুক্তিকে ক্রটিমুক্ত থেকে রূপান্তর করত ক্রটিযুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যদি বিক্রয়ের মধ্যে সব ক্রটি থেকে মুক্ত এরূপ শর্ত না করা হতো তাহলে বিক্রয় চুক্তির এই দাবি থাকত যে, বিক্রয় পণ্য ক্রটিমুক্ত। যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রটি পাওয়াও যায় তবুও خِيَارُ عَيْبٍ-এর ভিত্তিতে সেই ক্রটি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব; কিন্তু যখন এ শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো এখন বিক্রয় পণ্য সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সুতরাং চুক্তিটি ক্রটিমুক্ত অবস্থা থেকে রূপান্তরিত হয়ে ক্রটিযুক্ত অবস্থায় চলে গেল। সারকথা চুক্তি ক্রটিমুক্ত কিংবা ক্রটিযুক্ত যাই হোক না কেন, এ আলোচনার ফল এই দাঁড়াচ্ছে মূলে চুক্তি অবশ্যই সম্পাদিত হয়েছে। কেননা ক্রটিমুক্ত হওয়া চুক্তির একটি গুণবিশেষ। আর গুণ কখনো মূল ছাড়া অস্তিত্ববান হতে পারে না। ফলে বিবাদীর [বিক্রেতার] সব দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্তারোপ করার চাহিদা এই যে, মূলে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অথচ বিবাদী ইতঃপূর্বে সুস্পষ্টভাবে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল।

অতএব, বিবাদীর দ্বিতীয় দাবি প্রথম দাবির সাথে সাংঘর্ষিক। ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, দাবিসমূহের মাঝে স্ববিরোধিতা থাকলে দাবির দলিল ও সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, চলমান মাসআলায় বিবাদীর দলিল ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الخ : লেখক বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াস যথার্থ নয়, কেননা তিনি ঋণের মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন। ঋণ তো কখনো বাতিল হওয়া সত্ত্বেও আদায় করা হয় এবং অনেক সময় অন্যায্যভাবেও আদায় করা হয়, আর তা করা হয় বলেই বিবাদীর দাবিসমূহের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে চলমান মাসআলার বিবাদীর দাবিসমূহের মাঝে স্ববিরোধিতা বহাল থাকছে। সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই বিরোধিতাকে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু উভয় মাসআলার মাঝে সুস্পষ্ট বিরোধ বিদ্যমান তাই এ মাসআলাকে ঋণের মাসআলার উপর কিয়াস করা সঙ্গত হয়নি।

قَالَ : ذِكْرُ حَقٍّ كُتِبَ فِيْ اَسْفَلِهِ : وَمَنْ قَامَ بِهٰذَا الذِّكْرِ فَهُوَ وَلِيُّ مَا فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، اَوْ كُتِبَ فِى الشِّرَاءِ : فَعَلٰى فُلَانٍ خَلَاصُ ذٰلِكَ وَتَسْلِيْمُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، بَطَلَ الذِّكْرُ كُلُّهُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ عَلَى الْخَلَاصِ، وَعَلٰى مَنْ قَامَ بِذِكْرِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمَا اِسْتِحْسَانٌ ذَكَرَهُ فِى الْاِقْرَارِ، لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ يَنْصَرِفُ اِلٰى مَا يَلِيْهِ، لِاَنَّ الذِّكْرَ لِلْاِسْتِيْثَاقِ، وَكَذَا الْاَصْلُ فِى الْكَلَامِ اَلْاِسْتِبْدَادُ وَلَهُ اَنَّ الْكُلَّ كَشَىْءٍ وَاحِدٍ بِحُكْمِ الْعَطْفِ فَيُصْرَفُ اِلَى الْكُلِّ، كَمَا فِى الْكَلِمَاتِ الْمَعْطُوْفَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ : عَبْدُهُ حُرٌّ وَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَلَيْهِ الْمَشْىُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، وَلَوْ تَرَكَ فُرْجَةً قَالُوْا لَا يَلْتَحِقُ بِهِ، وَيَصِيْرُ كَفَاصِلِ السُّكُوْتِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো পাওনা সংক্রান্ত রশিদ কিংবা দলিলের নিচে লেখা থাকে যে, যে ব্যক্তি এই রশিদটি ধারণ/ পেশ করবে সে উক্ত রশিদে বর্ণিত যাবতীয় মালের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ। অথবা যদি কোনো ক্রয়ের রশিদে লিখা থাকে যে, রশিদ অধিকারীর দায়িত্ব হলো, রশিদের বর্ণিত হক অবমুক্ত করা এবং তা ক্রেতার হাতে সোপর্দ করা ইনশাআল্লাহ। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উপরিউক্ত সবগুলো রশিদ/ দলিলপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইনশাআল্লাহ অংশটি "ধারণকারীর দায়িত্ব হবে অবমুক্ত করা" এবং "যে ব্যক্তি উক্ত রশিদ পেশ করবে"-এর সাথে সম্পৃক্ত হবে। সাহেবাইন (র.)-এর বক্তব্য ইসতিহসান -এর ভিত্তিতে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে স্বীকারোক্তি অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন। কেননা, ইসতিসনা তৎসংলগ্ন বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কেননা, রশিদ বা দলিল লেখা হয় দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার জন্য। তাছাড়া প্রতিটি বাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াই নিয়ম। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আতফের মাধ্যমে সমগ্র রশিদই একটি বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ইনশাআল্লাহ বাক্যাংশটি পুরো বাক্যের সাথেই যুক্ত হবে। যেমন আতফকৃত বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কেউ বলল, আমার ক্রীতদাস আজাদ এবং আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার হজ করা ফরজ ইনশাআল্লাহ। যদি মাঝখানে জায়গা খালি রাখে তাহলে মাশায়েখে কেরাম বলেন, ইনশাআল্লাহ পূর্বের কোনো বাক্যের সাথেই যুক্ত হবে না। আর এটা কথা বলার সময় নীরবতার মাধ্যমে যতি টানার মতো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ ذِكْرُ حَقٍّ كُتِبَ فِىْ اَسْفَلِهِ الخ : উক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইবারতের প্রথম শব্দটি হচ্ছে ذِكْرُ حَقٍّ; এর ব্যাখ্যায় তাজুশ্ শারীয়াহ (র.)

বলেন, এর অর্থ হচ্ছে كِتَابُ اِقْرَارٍ অর্থাৎ ঋণের স্বীকারোক্তিমূলক পত্র। আল্লামা কাকী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ– চেক, রশিদ বা দলিলপত্র। সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি তার নিজের উপর ঋণের স্বীকারোক্তি করে একটি পত্র লিখল [পত্রটিকে চেক, রশিদ বা চিরকুট বলা যেতে পারে]; কিন্তু লেখক পত্রের নিম্নাংশে ইনশাআল্লাহ শব্দটি লিখে দিল। যেমন সে লিখল– مَنْ قَامَ بِهٰذَا الذِّكْرِ فَهُوَ وَلِىُّ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি উক্ত রশিদ পেশ করবে বা ধারণ করবে, সে উক্ত রশিদ বর্ণিত যাবতীয় হকের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ।' অথবা যদি ক্রয়পত্র লিখে তার শেষাংশে লিখা হয় যে, এই পত্রের অধিকারী ক্রেতার যদি কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় [যেমন– কোনো ব্যক্তি ক্রেতার কাছে এসে বলল, আপনার ক্রয়কৃত পণ্যটির প্রকৃত মালিক আমি, সুতরাং পণ্যটি আমার হাতে হস্তান্তর করুন] তাহলে অমুক ব্যক্তি তথা পত্র লিখকের দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে অবমুক্ত করে ক্রেতার হাতে অর্পণ করা ইনশাআল্লাহ। উভয় অবস্থায় অর্থাৎ ক্রয়পত্রের নীচে কিংবা ঋণের স্বীকারোক্তিমূলক পত্রের নীচে ইনশাআল্লাহ লিখা হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পত্র দুটির বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ পত্র দুটির কোনো কার্যকারিতা থাকবে না।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর বক্তব্য হলো উভয় পত্রের ইনশাআল্লাহ -এর সম্পর্ক শুধুমাত্র শেষাংশের সাথে। অর্থাৎ প্রথম পত্রে وَمَنْ قَامَ بِهٰذَا الذِّكْرِ فَهُوَ وَلِىُّ مَا فِيْهِ -এর সাথে আর দ্বিতীয় পত্রে فَعَلٰى فُلَانٍ خَلَاصُ ذٰلِكَ وَتَسْلِيْمُهُ -এর সাথে। তাঁদের মতে শুধুমাত্র উভয় বাক্যের শেষাংশটুকু বাতিল হবে। পক্ষান্তরে স্বীকারকৃত অর্থ/ ঋণ এবং ক্রয়বহাল থাকবে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ইনশাআল্লাহ যে বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তা সে বাক্যের কার্যকারিতাকে বাতিল করে। যেহেতু এখানে ইনশাআল্লাহ -এর সম্পর্ক শেষাংশের সাথে তাই শেষাংশ বাতিল হবে, পুরো রশিদ বা চেক বাতিল হবে না। ইনশাআল্লাহ শব্দের দ্বারা বাক্যের কার্যকারিতা বাতিল হওয়ার কারণ হলো, ইনশাআল্লাহ বলার দ্বারা কোনো বস্তু অত্যাবশ্যকীয় করা যায় না। কেননা ইনশাআল্লাহ বলার দ্বারা বাক্যের ভাবকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিষয়টি কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় বাস্তবায়িত হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - অর্থাৎ 'আল্লাহ চাহে তো তুমি তালাক।' তাহলে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা স্ত্রী তালাক হওয়ার বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আর এখানে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিষয়টি অনবগত, তাই তালাক হবে না।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمَا اِسْتِحْسَانٌ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মূল দলিল হচ্ছে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসটি মাবসূত গ্রন্থের স্বীকারোক্তি প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণভাবে দলিলপত্র, রশিদ ইত্যাদি লিখা হয় কোনো বিষয়কে পাকাপোক্ত করার জন্য। আলোচ্য মাসআলায় যদি ইনশাআল্লাহ শব্দটিকে পুরো দলিল পত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি অভিমুখী করা হয় তাহলে দলিল পত্র অকার্যকর ও অনর্থক সাব্যস্ত হবে। দলিলপত্র লিখে ইনশাআল্লাহ দ্বারা বাতিল করা যুক্তিবিরোধী কাজ, যা সুস্থ বিবেকবান মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অতএব, দলিলপত্রের কার্যকারিতা বহাল রাখার জন্য ইনশাআল্লাহ -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় বাক্যের সাথেই করা হবে।

তৃতীয় দলিল হলো, ব্যাকরণগতভাবে প্রত্যেকটি বাক্য স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব, দলিলপত্রের বা রশিদের প্রতিটি বাক্য স্বতন্ত্র। সুতরাং দলিলপত্রের সর্বশেষ স্বতন্ত্র বাক্যের সাথে ইনশাল্লাহ যুক্ত হবে এবং শেষ বাক্যটির কার্যকারিতা বাতিল করবে। অতএব, বাক্যের প্রথমাংশের কার্যকারিতা অর্থাৎ প্রথম দলিলের স্বীকারকৃত অর্থ/ ঋণ এবং দ্বিতীয় দলিল পত্রের ক্রয় বহাল থাকবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দলিল পত্রের প্রতিটি বাক্য যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র; কিন্তু যেহেতু প্রতিটি আতফ দ্বারা সংযুক্ত সেহেতু আতফ দ্বারা পুরো বক্তব্য অভিন্ন ও অখণ্ডিত সাব্যস্ত হবে। অতএব, যখন আতফ দ্বারা সংযুক্ত বাক্যগুলোর

পর ইনশাআল্লাহকে আনা হলো তখন ইনশাআল্লাহ এর সম্পর্ক হবে পুরো বক্তব্য বা সবগুলো বাক্যের সাথে। যেমন [কোনো ব্যক্তি বলল,] আমার গোলাম আজাদ এবং আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে ইনশাআল্লাহ, তাহলে ইনশাআল্লাহ পূর্বে উল্লিখিত সবগুলো বাক্যের সাথে যুক্ত হবে এবং কোনো বাক্যই কার্যকর হবে না। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই হবে যখন বাক্যগুলোর সাথে সাথেই [দূরত্ব না রেখে] ইনশাআল্লাহ লিখা হয়।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব : সাহেবাইন (র.)-এর প্রথম দলিলের জবাব ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল বর্ণনার মাধ্যমে হয়ে গেছে। তাঁদের দ্বিতীয় দলিলের জবাব হলো, দলিলপত্র তখনই বিষয়বস্তুকে পাকাপোক্ত ও মজবুত করে যখন তা নিঃশর্তভাবে লিখা হয়। কিংবা যখন দলিলপত্রের মধ্যে ইনশাআল্লাহ লিখা না থাকে। যেসব দলিলপত্রে ইনশাআল্লাহ লিখা হয় সেগুলোর উদ্দেশ্য পাকাপোক্তকরণ নয়; বরং এতে দুরভিসন্ধি নিহিত থাকে।

তাঁদের তৃতীয় দলিলের জবাব হলো, বক্তব্যের মূল দাবি স্বতন্ত্র হওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করি না। তবে বক্তব্যের প্রতিটি কথা তখনই স্বতন্ত্র হবে যখন এদের মাঝে আতফ না থাকবে। যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় আতফ বিদ্যমান তাই প্রতিটি কথা স্বতন্ত্র হওয়ার বিধান এখানে চলবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ فُرْجَةً قَالُوْا لَا يَلْتَحِقُ بِهِ الخ : লেখক বলেন, যদি দলিলপত্রের লেখক দলিলপত্রের বক্তব্য লিখার পর খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারপর ইনশাআল্লাহ লিখে তাহলে উক্ত ইনশাআল্লাহ শব্দটি মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত হবে না কিছুতেই। এটা মাশায়েখে কেরামের মত। যেহেতু ইনশাআল্লাহ শব্দটি মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত নয় তাই বক্তব্যের কোনো অংশই অনর্থক হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি কথা বলার সময় কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ইনশাআল্লাহ বললে সেই ইনশাআল্লাহ বলার কারণে বক্তব্যের কোনো কিছুতেই হেরফের হয় না। উদাহরণত এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি তালাক। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করে পরে বলল, ইনশাআল্লাহ। তাহলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তার এ ইনশাআল্লাহ তালাক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোনো পত্র লিখে। আর পত্রের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর কিছু খালি জায়গা রেখে দেওয়ার পর লিখে ইনশাল্লাআহ তাহলে তার এ ইনশাআল্লাহ-এর দ্বারা পত্রের বক্তব্যে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না।

হেদায়ার ভাষ্যকারগণ এখানে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বিষয়টি হলো, মূল লেখকের ইবারতের বাক্য وَمَنْ قَامَ بِهٰذَا الذِّكْرِ فَهُوَ وَلِيٌّ مَا فِيْهِ দ্বারা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উকিল বানানোর প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছে। আর অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উকিল বানানো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বৈধ নয়। তাহলে কি উপায় ? এর উত্তরে ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, দলিলপত্র লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাদীর এই মর্মে সম্মতি প্রদান করা যে, বাদী যাকে উকিল নির্ধারণ করবে বিবাদী তার ব্যাপারে রাজি আছে; তার কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মামলা পরিচালনার জন্য যে উকিল হয়েছে তার মামলা পরিচালনা করাতে কোনো বাধা হবে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মামলা পরিচালনাকারী উকিল নিযুক্তির জন্য প্রতিপক্ষের অনুমতি ও সম্মতি প্রয়োজন হয়। তাছাড়া আরেকটি জবাব হলো, কোনো জিম্মাদারি রহিত করার জন্য অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ।

فَصْلٌ فِى الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيْثِ

قَالَ : وَاِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ فَجَاءَتْ اِمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، وَقَالَتْ : اَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَالَتِ : الْوَرَثَةُ اَسْلَمْتَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) الْقَوْلُ قَوْلُهَا، لِاَنَّ الْاِسْلَامَ حَادِثٌ فَيُضَافُ اِلَى اَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ، وَلَنَا اَنَّ سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِى الْحَالِ، فَيَثْبُتُ فِيْمَا مَضٰى تَحْكِيْمًا لِلْحَالِ كَمَا فِى جَرَيَانِ مَاءِ الطَّاحُوْنَةِ، وَهٰذَا ظَاهِرٌ نَعْتَبِرُهُ لِلدَّفْعِ، وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ لِلْاِسْتِحْقَاقِ -

অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকারীদের মাঝে বিচারকের রায় প্রদান প্রসঙ্গে

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো খ্রিস্টান মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী মুসলমানরূপে আগমন করে এবং বলে যে, আমি তার মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছি, [সুতরাং আমি তার উত্তরাধিকারী সম্পদের হকদার] আর অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ বলে যে, তুমি তার মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হয়েছ তাহলে উত্তরাধিকারীদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে [এবং সে মিরাস পাবে না]। ইমাম যুফার (র.) বলেন, স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে একটি নতুন ঘটনা। অতএব এটাকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। আমাদের দলিল হলো, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার হেতু বর্তমানে বিদ্যমান। সুতরাং সাম্প্রতিক অবস্থাকে বিচারযোগ্য মনে করে অতীতের জন্যেও তা বঞ্চনার কারণ সাব্যস্ত হবে। যেমন পানি উত্তোলনের চরকার পানি প্রবাহের হুকুমের ক্ষেত্রে [বর্তমান অবস্থাকে পূর্বের অবস্থায় বিবেচনা করা হয়]। আর এটা সুস্পষ্ট যে, আমরা যেটাকে দাবি প্রতিহত করার জন্য বিবেচনা করি তিনি সেটাকে দাবি প্রমাণের জন্য বিবেচনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ فَجَاءَتْ الخ : উক্ত ইবারতে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচারকের রায় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে, মানুষের জীবনের সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে তার মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের ইহলোকের জীবনাবসান হয়। তাই মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিচার সম্বন্ধীয় বিধিবিধানকে লেখক সবশেষে এনেছেন। ইবারতের মূল পাঠ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম মাসআলা হলো, এক খ্রিস্টান মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী উত্তরাধিকারীদের কাছে এসে বলল, আমি আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছি। অতএব আমি উত্তরাধিকারের হকদার। কিন্তু মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ বলল, আপনি তার মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমান হয়েছেন। সুতরাং আপনি উত্তরাধিকার পাবেন না। এমতাবস্থায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য, আর অন্যসব ইমামের মতে উত্তরাধিকারীদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল বর্ণনার পূর্বে আমরা একটি ভূমিকার অবতারণা করছি।

লেখক এ অনুচ্ছেদের প্রথমেই এমন দুটি মাসআলা আলোচনা করেছেন, যার সম্পর্ক ইসতিসহাবে হালের (اِسْتِصْحَابُ حَالٍ) -এর সাথে। اِسْتِصْحَابُ حَالٍ উসূলে ফিকহ -এর একটি পরিভাষা। এর সংজ্ঞা হলো– وَهُوَ الْحُكْمُ بِثُبُوْتِ اَمْرٍ فِىْ وَقْتٍ بِنَاءٍ عَلٰى ثُبُوْتِهٖ فِىْ وَقْتٍ اٰخَرَ অর্থাৎ "কোনো বিষয় বা হুকুমকে কোনো এক সময়ে এ ভিত্তিতে প্রমাণ করা যে, এটি অন্য সময়ে একই ক্ষেত্রে প্রমাণিত ছিল।" এটা দুই প্রকার–

১. এটা বলা যে, বিষয়টি অতীতে এমন ছিল, সুতরাং বর্তমানেও এরূপ থাকবে। যেমন– হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে অতীতে জীবিত ছিল সুতরাং এখনো জীবিত আছে।

২. এটা বলা যে, বর্তমানে যেহেতু এমন সুতরাং অতীতেও এমনই ছিল। যেমন– বর্তমানে যেহেতু পানি উত্তোলনের চরকা পানি দিচ্ছে সেহেতু অতীতেও পানি দিয়েছে।

উসূলে ফিকহ-এর নীতি অনুসারে আমাদের কাছে ইসতিসহাবে হাল এমনই এক দলিল যা দাবি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- দাবি প্রমাণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ইসতিসহাবে হাল দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

মূল মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, খ্রিস্টানের বিধবা স্ত্রীর জন্য মুসলমান হওয়া একটি নতুন বিষয়। আর নতুন সংঘটিত কোনো ব্যাপারে নিয়ম হলো, বিষয়টি সবচেয়ে নিকটতম সময়ের প্রতি নিসবত করা হবে। নওমুসলিম সে মহিলাটির ইসলাম গ্রহণের নিকটবর্তী সময় হচ্ছে তার স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়; পূর্ববর্তী সময় নয়। পূর্ববর্তী সময়টি তো তার ইসলাম গ্রহণের জন্য দূরবর্তী সময়। সুতরাং নওমুসলিম স্ত্রীর ইসলামের সম্পর্ক তার স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে। অতএব, তার স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, স্ত্রী তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদের ভাগিদার হবে। আমাদের তথা আহনাফের অন্যান্য ইমামগণের দলিল হলো, মহিলা মুসলমান হওয়ার কারণে বর্তমানে সে তার স্বামীর ভিন্নধর্মে অবস্থান করছে। আর ইসলামি শরিয়তে ধর্মীয় ভিন্নতা (اِخْتِلَافُ دِيْنٍ) উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার হেতু বর্তমানে থাকার কারণে অতীতেও সে বঞ্চিত হবে। কেননা ইসতিসহাবে হালের নীতি অনুযায়ী বর্তমানের যে হুকুম অতীতের একই হুকুম হবে। যেমন– পানি উত্তোলনের চাকতির হুকুম। পানি উত্তোলনের চাকতির ব্যাপার হলো, এক ব্যক্তি চরকার মাধ্যমে ভাড়ায় পানি প্রদান করে। এক পর্যায়ে ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। ভাড়াদাতা বলল, চুক্তির পর থেকে সব সময় চরকার সাহায্যে পানি দিয়ে আসছি; কিন্তু গ্রহীতা অস্বীকার করে বলল, সব সময় পানি দেওয়া হয়নি। তাহলে দেখা হবে বর্তমানে পানির চরকা ঘুরছে কিনা। যদি বর্তমানে পানি দান অব্যাহত থাকে তাহলে অতীতের পুরো সময়ে পানি দান করা হয়েছে সাব্যস্ত হবে। অতএব উক্ত মাসআলায় ভাড়াদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ যদি বর্তমানে পানি দান বন্ধ থাকে তাহলে অতীতের সব সময় পানি দান বন্ধ ছিল গণ্য হবে। সারকথা হলো পানির প্রবাহ অতীতে জারি থাকার বিষয়ে ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার মতপার্থক্যের সমাধান বর্তমানের ভিত্তিতে করা হবে। অর্থাৎ অতীতকে বর্তমানের উপর কিয়াস করা হবে। তদ্রূপ আহনাফের মতে মৃত খ্রিস্টান ব্যক্তির স্ত্রীর মুসলমান হওয়ার বিগত বিষয়টিকে বর্তমানের উপর কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا ظَاهِرٌ نَعْتَبِرُهُ لِلدَّفْعِ الخ : হিদায়ার লেখক বলেন, ইসতিসহাবে হাল বা বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য গণ্য করা একটি প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট অবস্থা। এটিকে আমরা অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.) ব্যতীত অন্যরা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছি উত্তরাধিকারের দাবিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) এটা দলিলরূপে গণ্য করেছেন উত্তরাধিকারের দাবি প্রমাণের জন্য।

উল্লেখ্য যে, ইসতিসহাবে হাল [বা বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য গণ্য করা] আহনাফের মতে একটি প্রতিরোধের দলিল (حُجَّةٌ دَافِعَةٌ); এটা কখনো দাবি প্রতিষ্ঠার দলিল (حُجَّةٌ مُثْبِتَةٌ) নয়। উসূলে ফিকহের নীতি অনুযায়ী আহনাফ এ মাসআলায় তাদের অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নীতি গ্রহণ করেছেন। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ দাবি প্রতিষ্ঠার দলিল হতে পারে।

وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ اِمْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ : اَسْلَمْتِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ اَيْضًا وَلَا يُحَكِّمُ الْحَالُ لِاَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِلْاِسْتِحْقَاقِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ اِلَيْهِ، اَمَّا الْوَرَثَةُ فَهُمُ الدَّافِعُوْنَ، وَيَشْهَدُ لَهُمْ ظَاهِرُ الْحُدُوْثِ اَيْضًا ـ

অনুবাদ : আর যদি এমন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে যার খ্রিস্টান স্ত্রী রয়েছে। অতঃপর সে স্ত্রী তার মৃত্যুর পর মুসলমান রূপে আগমন করে, আর বলে যে, আমি তার মৃত্যুর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি; কিন্তু অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ বলে তুমি তার মৃত্যুর পরে মুসলমান হয়েছ তাহলেও তাদের কথাই ধর্তব্য হবে। সাম্প্রতিক অবস্থাকে এখানে বিচার্য গণ্য করা হবে না। কেননা বর্তমানে জাহেরী অবস্থা হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অথচ এখানে সে [খ্রিস্টান স্ত্রী] এমনই এক দলিলের মুখাপেক্ষী। আর উত্তরাধিকারীগণ [মহিলার দাবি] প্রতিহতকারী। তাছাড়া [এখানে] উদ্ভূত নতুন অবস্থাও তাদের সমর্থন করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ اِمْرَأَةٌ اِلَخ : উক্ত ইবারতে ইসতিসহাবে হালের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় মাসআলাটির আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটির স্বরূপ হলো, এক মুসলমান মৃত্যুবরণ করল। তার একজন খ্রিস্টান স্ত্রী ছিল। সেই মহিলা তার মুসলমান স্বামীর মৃত্যুর পর মুসলমান রূপে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে এসে দাবি করল যে, আমি আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। যেহেতু আমি তার মৃত্যুর সময় মুসলমান ছিলাম তাই আমি তার উত্তরাধিকারের হকদার; কিন্তু উত্তরাধিকারীগণ বলল, তুমি তার মৃত্যুর পর মুসলমান হয়েছ। যেহেতু তুমি তার মৃত্যুর সময় ভিন্নধর্মাবলম্বী ছিলে তাই তোমার উত্তরাধিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেল। দুই পক্ষের মাঝে ইসতিসহাবে হাল ছাড়া তাদের দাবির স্বপক্ষে অন্যকোনো দলিল নেই। অর্থাৎ স্ত্রী তার বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য গণ্য করে অতীতের অবস্থাকে তার উপর কিয়াস করেছে, তার কিয়াস বা বর্তমান অবস্থাকে বিচার্য মনে করাও যথার্থ। যেমনটা প্রথম মাসআলার মধ্যে উত্তরাধিকারীগণ করেছিল; কিন্তু বিপত্তি দেখা দিয়েছে অন্যস্থানে। আর তা হলো মহিলা বর্তমান অবস্থাকে অতীতের অবস্থার জন্য বিচার্য মনে করছে তার উত্তরাধিকার লাভের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য বা তার হক প্রমাণের জন্য। আর ইতঃপূর্বে আমরা আহনাফের নীতি বর্ণনা করেছি যে, ইসতিসহাবে হাল হক প্রমাণের জন্য দলিলরূপে গণ্য হয় না; বরং দাবি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে দলিলরূপে গণ্য হয়। এ মাসআলায় উত্তরাধিকারীদের দলিলও ইসতিসহাবে হাল, তবে তার দ্বিতীয় প্রকার নয়, প্রথম প্রকার। অর্থাৎ অতীতের অবস্থার ভিত্তিতে পরবর্তী কালকে কিয়াস করা। এখানে উত্তরাধিকারের বক্তব্য হলো, যেহেতু মৃতব্যক্তির স্ত্রী তার জীবদ্দশায় সুনিশ্চিতভাবে খ্রিস্টান ছিল সুতরাং তার মৃত্যুর সময়ও খ্রিস্টান ছিল। তারা এখানে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন মহিলার উত্তরাধিকারের হককে প্রতিহত করার জন্য।

সারকথা হলো, মহিলা ইসতিসহাবে হালকে দলিলরূপে গ্রহণ করেছে তার হক প্রমাণের জন্য, আর উত্তরাধিকারীগণ গ্রহণ করেছে মহিলার দাবিকে প্রতিহত করার জন্য। যেহেতু আহনাফ ইসতিসহাবে হালকে দাবি প্রমাণের জন্য দলিলরূপে গ্রহণ করেন না তাই মহিলার দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আহনাফ যেহেতু ইসতিসহাবে হালকে দাবি প্রতিহত করার জন্য গ্রহণ করেন তাই উত্তরাধিকারীদের দলিল এখানে গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَيَشْهَدُ لَهُمْ ظَاهِرُ اِلَخ : এরপর লেখক উত্তরাধিকারীদের পক্ষে আরেকটি দলিল পেশ করেন। আর তা হলো, খ্রিস্টান স্ত্রীর মুসলমান হওয়ার ঘটনা একটি নতুন বিষয়। আর যে কোনো নতুন ঘটনা বা বিষয়কে নিকটবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এখানে ইসলাম গ্রহণের নিকটবর্তী সময় হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী সময়, পূর্ববর্তী সময় নয়। অতএব, নিকটবর্তী সময়ের প্রতি সম্পৃক্ত করে বলা হবে যে, মহিলা তার মুসলমান স্বামীর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেহেতু মহিলার ইসলাম গ্রহণ তার স্বামীর মৃত্যুর পর প্রমাণিত হলো সুতরাং সে স্বামীর মৃত্যুর সময় নিশ্চিতভাবে খ্রিস্টান ছিল। তার স্বামীর মৃত্যুর সময় খ্রিস্টান থাকাতে তার ও তার স্বামীর ধর্ম ভিন্ন হওয়া প্রমাণিত হলো। আর ভিন্নধর্মী কেউ কোনো মুসলমান হতে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। অতএব, এ মহিলাও তার স্বামীর উত্তরাধিকার লাভ করবে না।

قَالَ : وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ فِيْ يَدِ رَجُلٍ اَرْبَعَةُ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً، فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ، هٰذَا اِبْنُ الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، فَاِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ اِلَيْهِ، لِاَنَّهُ اَقَرَّ اَنَّ مَا فِيْ يَدِهِ حَقُّ الْوَارِثِ خِلَافَةً فَصَارَ كَمَا اِذَا اَقَرَّ اَنَّهُ حَقُّ الْمُوَرِّثِ وَهُوَ حَيٌّ اِصَالَةً. بِخِلَافِ مَا اِذَا اَقَرَّ لِرَجُلٍ اَنَّهُ وَكِيْلُ الْمُوْدِعِ بِالْقَبْضِ، اَوْ اَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ اِلَيْهِ، لِاَنَّهُ اَقَرَّ بِقِيَامِ حَقِّ الْمُوْدِعِ، اِذْ هُوَ حَيٌّ فَيَكُوْنُ اِقْرَارًا عَلٰى مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا كَذٰلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، بِخِلَافِ الْمَدْيُوْنِ اِذَا اَقَرَّ بِتَوْكِيْلِ غَيْرِهِ بِالْقَبْضِ، لِاَنَّ الدُّيُوْنَ تُقْضٰى بِاَمْثَالِهَا فَيَكُوْنُ اِقْرَارًا عَلٰى نَفْسِهِ، فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ اِلَيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার চার হাজার দিরহাম অন্য এক ব্যক্তির হাতে আমানতরূপে থাকে। অতঃপর আমানত গ্রহণকারী [এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে] বলে, "এ হলো মৃতের একমাত্র পুত্র, তার অন্য উত্তরাধিকার নেই" তাহলে সে উক্ত মাল সেই পুত্রের হাতেই অর্পণ করবে। কেননা সে এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে যে, তার হাতে যে অর্থ রয়েছে তা মৃতের স্থলাভিষিক্তরূপে উত্তরাধিকারীর হক। সুতরাং বিষয়টি যেন এমন হলো যে, সে মুরিছের জীবদ্দশায় স্বীকার করল যে, এ মাল প্রত্যক্ষভাবে এই লোকের হক। পক্ষান্তরে যদি আমানত গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে আমানতকারীর মাল গ্রহণ করার উকিল অথবা সে তার [আমানত গ্রহণকারীর] কাছে রক্ষিত মাল আমানত প্রদানকারী থেকে ক্রয় করেছে তাহলে হুকুম ভিন্ন হবে অর্থাৎ আমানত গ্রহণকারীকে সেই ব্যক্তির হাতে মাল অর্পণ করার আদেশ দেওয়া হবে না। ফলে এই স্বীকারোক্তি হবে অন্যের মালে স্বীকারোক্তি প্রদান করা। [ঘটনাটি] আমানত প্রদানকারীর মৃত্যুর পর হলে বিষয়টি এমন নয়। এর ব্যতিক্রম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি, যা সে ঋণদাতার পক্ষে ঋণ গ্রহণ করার উকিলরূপে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুকূলে করে থাকে। কেননা ঋণ সমগোত্রীয় দ্রব্যাদি দ্বারা আদায় করা সম্ভব। ফলে এই স্বীকারোক্তির অর্থ হবে নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি করা। অতএব, উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ الخ : ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আল জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। মাসআলাটির স্বরূপ হলো– এক ব্যক্তি [খালেদ] অন্যব্যক্তির [মঈনের] কাছে চার হাজার দিরহাম আমানত রাখল। তারপর খালেদ মারা গেল। তার মৃত্যুর পর আমানতগ্রহণকারী মঈন একটি ছেলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, এ খালেদের একমাত্র পুত্র। এছাড়া খালেদের অন্যকোনো উত্তরাধিকারী নেই। বিষয়টি যদি বিচারক পর্যন্ত গড়ায় তাহলে বিচারক মঈনের উক্ত বক্তব্য শুনে মঈনকে নির্দেশ দেবেন যে, আপনি আপনার হাতে গচ্ছিত আমানতের চার হাজার দিরহাম খালেদের একমাত্র পুত্রের হাতে অর্পণ করুন! এর দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় আমানত গ্রহণকারী মঈন এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে যে, তার হাতে গচ্ছিত চার হাজার দিরহাম মৃত ব্যক্তি [খালেদ] -এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খালেদের উত্তরাধিকারীর হক

বা তার মালিকানাধীন বস্তু। নিয়মানুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার কাছে যদি অন্য কারো মালিকানাধীন বস্তু থাকার স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তখন স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপর মালিক বা হকদারের কাছে তার হক প্রত্যর্পণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন আমানত গ্রহণকারী মঈন যদি খালেদের জীবদ্দশায় খালেদের অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করত যে, আমার কাছে খালেদের দশ হাজার দিরহাম রয়েছে তাহলে মঈনের জন্য খালেদের দিরহাম তার কাছে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হতো।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ الخ : এরপর লেখক উপরের মাসআলার একটি বিপরীত মাসআলা পেশ করেন, যদি কেউ খালেদের জীবদ্দশায় [উদাহরণস্বরূপ] এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলে যে, সে হচ্ছে খালিদের আমানত কব্জা করার উকিল, অর্থাৎ খালেদ তার মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছে যেন আমি তার হাতে খালেদের আমানতের মাল হস্তান্তর করি, অথবা সে [স্বীকারোক্তি প্রদানকারী] বলল, উক্ত আমানতের মাল খালেদ থেকে অমুক ব্যক্তি ক্রয় করেছে তাহলে এ দু-সুরতের হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ বিচারক আমানত গ্রহণকারীকে সে যাদের অনুকূলে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে তাদের হাতে তার গচ্ছিল মাল প্রদান করার নির্দেশ দিবেন না। কেননা আমানত গ্রহণকারী আমানতকারীর হক ও মালিকানাধীন বস্তু তার হাতে থাকার পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। এখানে আমানতকারী জীবিত রয়েছেন। এরপর যখন স্বীকারোক্তিকারী বলল, অমুক হচ্ছে আমানতকারীর পক্ষে মালামাল কব্জা করার উকিল। তখন স্বীকারোক্তিকারী প্রকারান্তরে অন্যের [স্বীকারোক্তিকারী ব্যতীত] মালের স্বীকার করল। إِقْرَارٌ বা স্বীকারোক্তি যেহেতু একটি দুর্বল দলিল তাই অন্যের হকের ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যখন স্বীকারোক্তিকারীর এই স্বীকারোক্তিটি গ্রহণযোগ্য হলো না তখন আমানতগ্রহণকারীকে তার পরবর্তী স্বীকারোক্তি মোতাবিক কব্জার উকিলকে আমানতের মাল প্রদান করার আদেশ করা হবে না। তদ্রূপ যদি আমানত গ্রহণকারী এই স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, আমানতকারী থেকে এই ব্যক্তিটি আমানতের মাল খরিদ করে নিয়েছে তাহলে তার এ স্বীকারোক্তি আমানতকারীর মালিকানা বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। অথচ আমানত গ্রহণকারী আমানত প্রদানকারীর মালিকানা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব, আমানত গ্রহণকারীর পরবর্তী স্বীকারোক্তি দ্বারা আমানত প্রদানকারীর মালিকানা বাতিল বা রহিত হবে না। যদি আমানত প্রদানকারীর মালিকানা বাতিল না হয় তাহলে বিচারক কি করে অন্য ব্যক্তির হাতে মাল সোর্পদ করার নির্দেশ দেবেন? সুতরাং বিচারক আমানত গ্রহণকারীকে তার কাছে গচ্ছিত মালামাল কথিত ক্রেতার হাতে প্রদান করার নির্দেশ দেবেন না।

قَوْلُهُ وَلَا كَذٰلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ : লেখক বলেন, আমানত প্রদানকারীর মৃত্যুর পর মাসআলার হুকুম তার জীবদ্দশার মতো হবে না। অর্থাৎ আমানত প্রদানকারীর মৃত্যুর পর অন্যের মালের স্বীকারোক্তি প্রদান করা আবশ্যক হবে না। কেননা আমানত প্রদানকারীর মৃত্যুর দ্বারা তার মালিকানা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমানতকারীর মৃত্যুর পর আমানতের মাল মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন বলে সাব্যস্ত হবে না; বরং তখন তার মালের মালিক হবে তার ওয়ারিশগণ। ওয়ারিশগণ মালিক হওয়ার পর যদি আমানত গ্রহণকারী ওয়ারিশগণের মালিক বা হকদার হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে তো মালিক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তার স্বীকারোক্তি গেল না। আর যথাযোগ্য মালিকের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য হয়। আর এজন্য আমানত গ্রহণকারী যখন ওয়ারিশগণের পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَدْيُوْنِ إِذَا أَقَرَّ بِتَوْكِيْلٍ الخ : লেখক বলেন, যদি কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, তার পাওনাদার পাওনা বা ঋণ গ্রহণ করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে কব্জার উকিল বানিয়েছে তাহলে তার এই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারক উক্ত ব্যক্তিকেই তার ঋণ শোধ করার আদেশ দেবেন। সুতরাং এ মাসআলাটি পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার বিপরীত হলো। এর দলিল হলো, কর্জ বা ঋণের ক্ষেত্রে সাধারণত হুবহু যা গ্রহণ করা হয়েছে তাই প্রদান করা হয় না; বরং সাধারণত ঋণরূপে যা গ্রহণ করা হয়েছে তার সমগোত্রীয় অর্থ বা দ্রব্যাদি আদায় করা হয়। আর সমগোত্রীয় দ্রব্যাদির অর্থের মালিক হচ্ছে ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা নয়।

সুতরাং ঋণগ্রহীতা যখন ঋণদাতার ঋণ কব্জা করার উকিল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করল তখন সে নিজের উপর ঋণের স্বীকারোক্তি প্রদান করল। নিজের উপর স্বীকারোক্তি প্রদান করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই এ স্বীকারোক্তি সঠিক সাব্যস্ত হবে। অতএব স্বীকারোক্তি প্রদানকারীকে বিচারক মাল অর্পণ করার নির্দেশ দেবেন। কেননা যে ব্যক্তি নিজের দায়িত্বে কোনো মাল থাকার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাকে তার দায়িত্ব থেকে উক্ত মাল বের করার এবং দায়িত্বমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لِآخَرَ : هٰذَا ابْنُهُ اَيْضًا، وَقَالَ الْاَوَّلُ : لَيْسَ لَهُ ابْنٌ غَيْرِىْ، قُضِىَ بِالْمَالِ لِلْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَمَّا صَحَّ اِقْرَارُهُ لِلْاَوَّلِ انْقَطَعَ يَدُهُ عَنِ الْمَالِ، فَيَكُوْنُ هٰذَا اِقْرَارًا عَلَى الْاَوَّلِ، فَلَا يَصِحُّ اِقْرَارُهُ لِلثَّانِىْ، كَمَا لَوْ كَانَ الْاَوَّلُ ابْنًا مَعْرُوْفًا ـ

অনুবাদ : যদি আমানত গ্রহণকারী অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে এও মৃত ব্যক্তির ছেলে। কিন্তু প্রথম [যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল সেই] ছেলে বলল, আমি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির কোনো পুত্র সন্তান নেই। তাহলে প্রথমজনের জন্য [আমানতের] মাল প্রদান করার ফয়সালা করা হবে। কেননা যখন প্রথমজনের ব্যাপারে আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে তখন মালের উপর আমানত গ্রহণকারীর কব্জা [আয়ত্ত] রহিত হয়ে গেছে। ফলে এটি প্রথমজনের উপর স্বীকারোক্তি বিবেচিত হবে। [যেহেতু অন্যের উপর স্বীকারোক্তি কার্যকর নয়] সুতরাং দ্বিতীয়জনের জন্য তার স্বীকারোক্তি সঠিক বিবেচিত হবে না। যেমন- প্রথমজন মৃতের প্রসিদ্ধ ছেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لِآخَرَ الخ : উক্ত ইবারতের মাসআলা পূর্ববর্তী ইবারতের মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির ছেলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে সে মৃতের একমাত্র ছেলে। অতএব, আমার কাছে মৃতের যে আমানত রয়েছে তার হকদার শুধুমাত্র এই ছেলেই। তাহলে ছেলেকে পিতার আমানত প্রদান করার নির্দেশ করবেন বিচারক। আর এই ইবারতে বলা হচ্ছে যে, যদি আমানত গ্রহণকারী প্রথমে এক ছেলের জন্য হকদার হওয়ার কথা স্বীকার করার পর আরেকজনকে দেখিয়ে বলে- এও মৃতের ছেলে অর্থাৎ দ্বিতীয় ছেলে। কিন্তু প্রথম যার জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছিল সে দ্বিতীয়জনকে তার ভাই মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমি ব্যতীত আমার পিতার অন্য কোনো পুত্র সন্তান নেই তাহলে বিচারক আমানতের যাবতীয় মাল প্রথম ছেলেকে প্রদান করার ব্যাপারে রায় প্রদান করবেন এবং দ্বিতীয় ছেলের পক্ষে আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি বাতিল করে দেবেন। এর দলিল হলো, আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি প্রথম ছেলের জন্য যখন করা হয়েছে তখন উক্ত মাল পাওয়ার অন্য কোনো হকদার ছিল না এবং কেউ হক দাবিও করেনি। ফলে আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি প্রথম ছেলের জন্যই সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর আমানত গ্রহণকারীর স্বীকারোক্তি সঠিক বিবেচিত হওয়ার সাথে সাথে আমানতের মালের উপর আমানত গ্রহণকারীর কব্জা বা আয়ত্ত শরিয়তের দৃষ্টিতে রহিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমানতের মালের একমাত্র অধিকারী হচ্ছে প্রথম ছেলে। এরপর যখন আরেক ছেলের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করা হলো তা মূলত অন্যের মালের উপর স্বীকারোক্তি করা। এখানে অন্য ব্যক্তিটি প্রথম ছেলে। অতএব, দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিটি প্রথম ছেলের উপর স্বীকারোক্তি সাব্যস্ত হলো। আর অন্যের উপর স্বীকারোক্তি কখনো কার্যকর হয় না। অতএব, দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিটি কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْاَوَّلُ ابْنًا مَعْرُوْفًا : এটা মৃতের প্রথম ছেলের খুব প্রসিদ্ধ হলে যা হয় সে রকমই হয়ে গেল। অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তির একটি ছেলে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ লোকেরা মৃত ব্যক্তির ছেলে বলতে ঐ একজনকেই চেনে, অন্য কাউকে মৃতের ছেলে বলে জানে না। এমন পরিস্থিতিতে আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অন্য কারো জন্য [মৃতের ছেলে হিসেবে] স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে তা কার্যকর হয় না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় প্রথম ছেলের জন্য স্বীকারোক্তি করার পর দ্বিতীয় ছেলের জন্যে স্বীকারোক্তি করা হলে দ্বিতীয়জনের অনুকূলে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেহেতু আমানত গ্রহণকারীর দ্বিতীয় ছেলের অনুকূলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয় তাই আমানত গ্রহণকারীকে বিচারক তার কাছে গচ্ছিত যাবতীয় মাল প্রথম ছেলের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দেবেন। দ্বিতীয় ছেলেকে কোনো কিছু দেওয়ার আদেশ বিচারক করবেন না।

وَلِأَنَّهُ حِيْنَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فَصَحَّ، وَحِيْنَ أَقَرَّ لِلثَّانِيْ لَهُ مُكَذِّبٌ فَلَمْ يَصِحَّ .

قَالَ : وَإِذَا قَسَّمَ الْمِيْرَاثَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيْلٌ وَلَا مِنْ وَارِثٍ، وَهٰذَا شَيْءٌ إِحْتَاطَ بِهِ بَعْضُ الْقُضَاةِ وَهُوَ ظُلْمٌ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا، يَأْخُذُ الْكَفِيْلَ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيْمَا إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ وَالْإِرْثُ بِالشَّهَادَةِ، وَلَمْ يَقُلِ الشُّهُوْدُ، لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، لَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ لِلْغَيْبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي التَّرِكَةِ وَارِثًا غَائِبًا أَوْ غَرِيْمًا غَائِبًا، لِأَنَّ الْمَوْتَ قَدْ يَقَعُ بَغْتَةً فَيُحْتَاطُ بِالْكَفَالَةِ، كَمَا إِذَا دَفَعَ الْآبِقَ وَاللُّقَطَةَ إِلَى صَاحِبِهِ، أَوْ أَعْطَى امْرَأَةَ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ .

অনুবাদ : তাছাড়া যখন প্রথমজনের জন্যই কেবল স্বীকারোক্তি করল তখন কেউ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেনি। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি সঠিক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর যখন দ্বিতীয়জনের জন্য স্বীকারোক্তি করল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারী [প্রথম ছেলে] রয়েছে। সুতরাং তা সঠিক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন বিচারক মৃত ব্যক্তির মাল পাওনাদারদের ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করবেন তখন তিনি পাওনাদারদের থেকে কোনো জামিন নিতে পারবেন না এবং উত্তরাধিকারীদের থেকেও জামিন নিতে পারবেন না। জামিন নেওয়ার বিষয়টি কতিপয় বিচারক সর্তকতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ এটা এক ধরনের জুলুম। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিচারক জামিন [কাফিল] নিবে। এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ঋণ ও উত্তরাধিকার সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং সাক্ষীরা একথা না বলে যে, তাকে ছাড়া আমরা আর উত্তরাধিকার আছে বলে জানি না। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিচারক অনুপস্থিত লোকদের স্বার্থরক্ষাকারী, আর স্বভাবত মৃতের সম্পদে কোনো উত্তরাধিকার অথবা কোনো পাওনাদার অনুপস্থিত থাকতে পারেন। কেননা, অনেক সময় আচমকা মৃত্যু ঘটে থাকে। অতএব জামিন গ্রহণ করে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যেমন, বিচারক পলাতক গোলাম এবং হারানো বস্তু তার মালিককে প্রদান করেন অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রীর হাতে তার মাল থেকে খরচপাতি প্রদান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ حِيْنَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ لَا مُكَذِّبَ الخ : দ্বিতীয় দলিল হলো, আমানত গ্রহণকারী যখন শুধুমাত্র প্রথম ছেলের জন্য তার স্বীকারোক্তি প্রদান করল তখন কেউই তাকে মিথ্যাবাদী বলেনি। অর্থাৎ একথা বলেনি যে, আপনি ঠিক বলছেন না, মৃত ব্যক্তির তো আরো ছেলে রয়েছে। মোটকথা প্রথম স্বীকারোক্তির পরে সকলেই বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে। ফলে তার স্বীকারোক্তি সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন আমানত গ্রহণকারী দ্বিতীয়জনের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে তখন প্রথম ছেলে আপত্তি জানিয়ে বলেছে, আমি ব্যতীত আমার পিতার অন্য কোনো পুত্র সন্তান নেই। এর ফলে দ্বিতীয় ছেলের জন্য কৃত স্বীকারোক্তি প্রথম ছেলের আপত্তির কারণে সঠিক হয়নি। সুতরাং প্রথম ছেলের জন্য যে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তা সঠিক হওয়ার কারণে বিচারককে মৃত ব্যক্তির আমানতের মাল প্রথম ছেলের হাতে সোপর্দ করতে নির্দেশ দেবেন। আর দ্বিতীয় ছেলের জন্য তার স্বীকারোক্তি সঠিক না হওয়াতে বিচারক দ্বিতীয় ছেলের জন্য কোনো কিছু দেওয়ার নির্দেশ করবেন না।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الخ : উক্ত ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আল জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। মাসআলাটি মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে।

মাসআলাটির স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, মৃতব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় কিছু সম্পদ রেখে গেল। মারা যাওয়ার পর কতিপয় লোক মৃতের কাছে তাদের পাওনা ছিল বলে দাবি করল এবং তা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত করল যে, প্রকৃতই মৃত ব্যক্তির নিকট পাওনাদার। এখন বিচারক যখন মৃত ব্যক্তির মালামাল পাওনাদার ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করবেন তখন পাওনাদার ও উত্তরাধিকারীদের থেকে এই মর্মে কাফীল অর্থাৎ জামিন নিতে পারবেন কিনা যে, যদি তারা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি পাওনা কিংবা উত্তরাধিকার দাবি করে এবং তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে তাহলে উক্ত কাফীল তাদের মাল থেকে আগন্তুকের পাওনা কিংবা উত্তরাধিকার শোধ করবেন। এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, এমন ক্ষেত্রে বিচারক কোনো জামিন নেবেন না; বরং তাঁর মতে জামিন নেওয়া জুলুম। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) মনে করেন, বিচারক তাদের থেকে কাফীল বা জামিন নিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, বিচারকগণের একাংশ এ ধরনের ক্ষেত্রে জামিন নিয়েছেন। এসব বিচারকগণের মধ্যে ইবনে আবূ লায়লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنَ وَالْإِرْثُ بِالشَّهَادَةِ الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা কিতাবে বর্ণিত মাসআলাটির সঠিক ক্ষেত্র নির্ণয় করছেন। লেখক বলেন, উপরিউক্ত কাফীল গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ মতবিরোধ ঐ সুরতে কার্যকর হবে, যখন ঋণ কিংবা উত্তরাধিকার সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে এবং সাক্ষীরা এ কথা না বলবে [উত্তরাধিকারের সুরতে] যে, আমরা তার অন্য উত্তরাধিকার আছে বলে জানি না। কেননা যদি ঋণ এবং উত্তরাধিকার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে সকলের ঐকমত্যে কাফীল বা জামিন গ্রহণ করা বৈধ হবে। তদ্রূপ যদি [উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে] সাক্ষীরা বলে, আমরা তার অন্যকোনো উত্তরাধিকার আছে বলে জানি না তাহলেও সকলের ঐকমত্যে জামিন নেওয়া বৈধ হবে না। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে উত্তরাধিকারী কিংবা পাওনাদার প্রমাণিত হলে এতে জামিন নেওয়া যাবে- এর দলিল হলো, স্বীকারোক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি দুর্বল দলিল। এজন্য যদিও স্বীকারোক্তি দ্বারা উত্তরাধিকারী ও পাওনাদার প্রমাণিত হবে; কিন্তু এর কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারী কিংবা পাওনাদারদের হক বাতিল হবে না, যেহেতু স্বীকারোক্তি দ্বারা অন্যদের হক বাতিল হয় না; বরং অন্যদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থাকে তাই অন্যদের হক রক্ষার উদ্দেশ্যে জামিন [এ অবস্থাতে] নেওয়া যাবে। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নির্ধারণ হয় তার কয়েকটি সুরত হতে পারে, একটি সুরতের কথা আমরা উপরোল্লিখিত ইবারতে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে সামনে সদরুশ শহীদ (র.)-এর আদাবুল কাযী সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের একটি অংশ আলোচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বিচারকের দরবারে উপস্থিত হয়ে দাবি করে যে, অমুক ব্যক্তির দখলে যে বাড়িটি রয়েছে তা আমার পৈর্তৃক সম্পত্তি। আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন; কিন্তু দখলদার বিষয়টি অস্বীকার করে। অতঃপর দাবিদার সাক্ষী পেশ করে। কিন্তু সাক্ষীগণ ওয়ারিশদের সংখ্যা উল্লেখ করল না এবং তারা সাক্ষীদের চেনেও না। সাক্ষীগণ এতটুকু বলল যে, বাড়িটি মৃত ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছেন। এ অবস্থায় বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং উক্ত দাবিদারকে কিছুই দিবে না, যে পর্যন্ত না দাবিদার এমন সাক্ষী পেশ করবে যারা উত্তরাধিকারদের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করবে, যাতে উক্ত দাবিদারের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হয়। কেননা অংশ না জেনে রায় প্রদান করা অসম্ভব। এটি হচ্ছে তিন সুরতের একটি সুরত।

দ্বিতীয় সুরত হলো, সাক্ষীগণ এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এ [দাবিদার] মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং তার উত্তরাধিকারী। এছাড়া মৃতের আর কোনো উত্তরাধিকারী আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ অবস্থায় বিচারক অবিলম্বে মৃতের সমুদয় সম্পত্তি এই দাবিদারকে প্রদান করবেন।

তৃতীয় সুরত হলো, সাক্ষীগণ এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এ দাবিদার উক্ত বাড়ির মালিকের পুত্র। কিন্তু তারা উত্তরাধিকারীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য দিল না এবং একথাও বলল না যে, আমরা সে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষীরূপে জানি না। এ অবস্থায় বিচারক তার বিবেচনা অনুযায়ী কিছুকাল অপেক্ষা করবেন। যদি ইতোমধ্যে অন্য কোনো উত্তরাধিকারী এসে যায় তাহলে তাদের মাঝে উত্তরাধিকার বণ্টন করে দেবেন। আর যদি অন্য কোনো উত্তরাধিকারী না আসে তাহলে বাড়িটি মৃত ব্যক্তির এ পুত্রকে দিয়ে দেবেন।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এ অবস্থায় বিচারক ওয়ারিশ থেকে জামিন নেবেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত ব্যক্তি থেকে জামিন নেবেন না। এরপর তিনি বলেন, বিচারক সব মাল এমন উপস্থিত ওয়ারিশকে দেবেন যার অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, যেমন– পিতা/ ছেলে। আর যদি এমন ওয়ারিশ হয় যাদের অংশ অন্যদের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, যেমন– দাদা, ভাই ও চাচা তাহলে বিচারক তাদের হাতে মৃত ব্যক্তির সম্পদ অর্পণ করবেন না। আর যদি এমন ওয়ারিশ হয় যে কখনো সামান্য বঞ্চিত হয় যেমন– স্বামী, স্ত্রী তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সম্পদের সবচেয়ে কম অংশ তাকে প্রদান করবেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তাদের দুই অংশের বড় অংশ প্রদান করবেন। যেমন– স্বামীকে অর্ধেক $\frac{১}{২}$ আর স্ত্রীকে এক চতুর্থাংশ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। কিতাবে বর্ণিত মাসআলাটি তৃতীয় সুরতের সাথে সম্পর্কিত এবং উত্তরাধিকারের দাবিদার এমন ওয়ারিশ উদ্দেশ্য যে কখনো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র তার পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দাবি করে এবং সাক্ষীগণ "সে ব্যতীত অন্য ওয়ারিশ নাই" একথা বলে তাহলে বিচারক মৃতের সমুদয় মাল উক্ত দাবিদারকে প্রদান করবেন।

এমতাবস্থায় সাহেবাইন (র.)-এর মতে পুত্র থেকে বিচারক এই মর্মে জামিন নিতে পারেন যে, যদি কোনো অনুপস্থিত ওয়ারিশ এসে যায় তাহলে জামিনদার পুত্র থেকে উক্ত ওয়ারিশকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করবে। বিখ্যাত বিচারক ইবনে আবূ লায়লা (র.) সহ অন্যরা জামিন বা কাফিল নিয়েছেন; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ অবস্থাতেও জামিন দেওয়া অবৈধ মনে করেন। তাঁর মতে, পুত্র থেকে জামিন নেওয়া জুলুমের শামিল।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ لِلْغُيَّبِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন, বিচারক অনুপস্থিত লোকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নির্দেশিত। অর্থাৎ শরিয়ত বিচারককে উপস্থিত ব্যক্তিদের মতো অনুপস্থিত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার আদেশ দিয়েছে। আর বাহ্যিক অবস্থার দাবি হলো, বর্তমান উত্তরাধিকারী ছাড়াও অন্য উত্তরাধিকারী থাকতে পারে। তদ্রূপ উপস্থিত পাওনাদার ছাড়া আরো পাওনাদার থাকতে পারে। কেননা অনেক সময় মানুষের হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় ফলে খুব বেশি জানাজানি হওয়ার পূর্বেই মৃতের দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয় এবং এ অল্প সময়ের মধ্যে মৃতের সব আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হতে পারে না। এজন্য সর্তকতার দাবি হলো, বিচারক বর্তমান ওয়ারিশগণ এবং পাওনাদারদের থেকে জামিন বা কাফীল নিয়ে নেবেন, যাতে এ জামিনের/ জামিনদের মাধ্যমে অনুপস্থিত ওয়ারিশ কিংবা অনুপস্থিত পাওনাদারদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

এরপর লেখক একটি অনুরূপ মাসআলা সাহেবাইন (র.)-এর সমর্থনে পেশ করেন। মাসআলাটি হলো, যদি বিচারক পলাতক ক্রীতদাস এমন ব্যক্তিকে প্রদান করে যার মালিক হওয়ার ব্যাপারে বিচারক নিশ্চিত কিংবা কোনো হারানো বস্তুকে বিচারক এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে যার মালিকানার ব্যাপারে বিচারকের কাছে দলিল-প্রমাণ রয়েছে তাহলে বিচারক উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে তা প্রদান করবেন। তবে উভয় থেকে সকল ইমামের ঐকমত্যে জামিন নিয়ে নেবেন। এর আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রী বিচারকের কাছে তার ভরণপোষণ দাবি করল। উক্ত অনুপস্থিত ব্যক্তির অর্থকড়ি অন্য এক ব্যক্তির হাতে আমানতরূপে রয়েছে। আমানত গ্রহণকারী স্বীকার করছে যে, তার হাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির আমানত রয়েছে এবং একথাও স্বীকার করছে যে, এ মহিলা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রী তাহলে বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল থেকে স্ত্রীকে ভরণপোষণ প্রদান করবেন এবং তার থেকে একজন জামিন নিয়ে নেবেন। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ওয়ারিশ এবং পাওনাদার থেকে জামিন নেওয়াতে কোনো সমস্যা হবে না। সামনের ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ حَقَّ الْحَاضِرِ ثَابِتٌ قَطْعًا اَوْ ظَاهِرًا فَلَا يُؤَخَّرُ لِحَقٍّ مَوْهُوْمٍ اِلٰى زَمَانِ التَّكْفِيْلِ، كَمَنْ اَثْبَتَ الشِّرَاءَ مِمَّنْ فِيْ يَدِهٖ اَوْ اَثْبَتَ الدَّيْنَ عَلَى الْعَبْدِ، حَتّٰى بِيْعَ فِيْ دَيْنِهٖ لَا يُكْفَلُ، وَلِاَنَّ الْمَكْفُوْلَ لَهٗ مَجْهُوْلٌ، فَصَارَ كَمَا اِذَا كَفَلَ لِاَحَدِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِاَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ ثَابِتٌ، وَهُوَ مَعْلُوْمٌ، وَاَمَّا الْاٰبِقُ وَاللُّقْطَةُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ عَلَى الْخِلَافِ، وَقِيْلَ : اِنْ دَفَعَ بِعَلَامَةِ اللُّقْطَةِ اَوْ اِقْرَارِ الْعَبْدِ يَكْفُلُ بِالْاِجْمَاعِ، لِاَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَلِهٰذَا كَانَ لَهٗ اَنْ يَمْنَعَ، وَقَوْلُهٗ : وَهُوَ ظُلْمٌ، اَيْ مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَهٰذَا يَكْشِفُ عَنْ مَذْهَبِهٖ رَحِمَهُ اللّٰهُ، اِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ، لَا كَمَا ظَنَّهُ الْبَعْضُ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– উপস্থিত ব্যক্তি [ওয়ারিশ ও পাওনাদার]-এর হক সুনিশ্চিত অথবা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত। সুতরাং সন্দেহযুক্ত হকের কারণে তা জামিনদার প্রদানের সময়কাল পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি দখলদার থেকে ক্রয় করা প্রমাণিত করল কিংবা গোলামের উপর ঋণকে প্রমাণিত করল। ফলে গোলামকে ঋণের পরিবর্তে ঋণ আদায় উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হলো। এমতাবস্থায় ক্রেতা বা পাওনাদার থেকে জামিনদার নেওয়া হয় না। তাছাড়া যার জন্য জামিন নেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিটি এখানে অজ্ঞাত। ফলে এটা এমন হলো যে, পাওনাদারদের কোনো একজনের পক্ষে জামিন নেওয়া হলো। স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বামীর হক প্রমাণিত এবং স্বামীও পরিচিত। পলাতক গোলাম ও হারানো বস্তু সংক্রান্ত মাসআলায় দুধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত হচ্ছে এ ব্যাপারেও [সাহেবাইন ও ইমাম আযমের মাঝে] মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যদি হারানো বস্তু তার মালিকের হাতে চিহ্ন বর্ণনা করার পর প্রদান করে কিংবা গোলামটিকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মালিকের হাতে প্রদান করে তাহলে সব ইমামের মতে, জামিন গ্রহণ করবেন। কেননা হক সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। এজন্য বিচারকের জন্য গোলাম ও হারানো বস্তু আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। জামিনদার গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তি وَهُوَ ظُلْمٌ [এটা জুলুম]-এর অর্থ হচ্ছে– সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি। তার এ উক্তি তাঁর মাযহাবের প্রতি দিকনির্দেশ করছে যে, মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন আবার সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে সক্ষম হন। কতিপয় লোক যা ধারণা করেন [যে, মুজতাহিদ সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত দেন] তা তার মাযহাব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ حَقَّ الْحَاضِرِ الخ : এ ইবারতে সাহেবাইনের বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের দলিল বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, ইমাম আযমের মতে, বিচারক পাওনাদার ও ওয়ারিশগণ থেকে কাফীল বা জামিন নেবেন না। এর দলিল হলো, বর্তমান পাওনাদার ও ওয়ারিশগণের হক বা প্রাপ্য অধিকার

সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মনে করা হবে যদি বিচারক এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, তাদের আর কোনো ওয়ারিশ বা পাওনাদার নেই। অথবা তাদের হক বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এভাবে যে, বিচারকের জানা মতে তাদের সাথে কোনো হকদার নেই, তবে হকদার থাকা বা না থাকা উভয়টির সম্ভবনাই রয়েছে। যেহেতু বিচারক বাহ্যিকভাবে যা প্রমাণিত তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন এবং সব কিছু প্রকাশ করা বা উদ্ঘাটন করা বিচারকের দায়িত্ব নয়, তাই আলোচ্য মাসআলায় বিচারক তার জ্ঞানানুযায়ী বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে রায় প্রদান করবেন। সারকথা হচ্ছে, বিচারকের কাছে যখন সুনিশ্চিতভাবে কিংবা বাহ্যিকভাবে পাওনাদার ও ওয়ারিশগণের হক প্রমাণিত হবে। এর ভিত্তিতে ওয়ারিশ ও পাওনাদারদের অনুকূলে রায় প্রদান করবেন। সন্দেহযুক্ত ও অনিশ্চিত হকের ভিত্তিতে নিশ্চিত হককে বিলম্বিত করা হবে না। কেননা কোনো পাওনাদার অনুপস্থিত থাকা বা ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত। তারা আদৌ আছেন কিনা তাও জানা নেই। সুতরাং বর্তমান পাওনাদার ও ওয়ারিশদেরকে কাফীল বা জামিন দিতে বাধ্য করে তাদের হকসমূহকে বিলম্বিত করা উচিত হবে না। এর একটি উদাহরণ হলো, কোনো এক ব্যক্তি [রাশেদ] এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, সে অমুক [মামুন] দখলদার থেকে অমুক বাড়িটি ক্রয় করেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক মামুনকে নির্দেশ দিল যেন সে বাড়িটি রাশেদের হাতে অর্পণ করে। বিচারক এখানে রাশেদ থেকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো কাফীল নেবেন না যে, রাশেদের পূর্বে হয়তোবা কেউ মামুন থেকে বাড়িটি ক্রয় করেছিল। যদি ক্রয় করে থাকে, তাই সতর্কতামূলকভাবে জামিনদার নেওয়া হোক এমন করা হয় না।

আরেকটি উদারহণ হলো, কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করল যে, অমুক গোলামের কাছে আমার এত দিরহাম ঋণ রয়েছে। বিচারক ঋণ উসুলের উদ্দেশ্যে পাওনাদারকে বলল, তুমি গোলামটিকে বিক্রি করে দাও। এখানেও বিচারক এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে, গোলামের আরো ঋণ আছে কিংবা তার অন্য ক্রেতা আছে– বিক্রেতা বা ক্রেতা থেকে এজন্য কাফিল নেবেন না।

যদি এসব মাসআলার মধ্যে কাফীল [জামিন] নেওয়ার সুযোগ থাকত তাহলে বলা যেত যে, যেহেতু ঐ মাসআলাগুলোতে জামিন নেওয়ার বিধান রয়েছে সেহেতু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার বন্টনের সময় অন্যদের থেকে জামিন নিতে পারবে।

উপরিউক্ত উদাহরণদ্বয়ের মাধ্যমে লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দলিলের প্রতি সমর্থন পেশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো– আলোচ্য মাসআলায় যার জন্য কাফীল নেওয়া হচ্ছে (مَكْفُوْلٌ لَهُ) সে অজ্ঞাত (مَجْهُوْلٌ)। আর مَكْفُوْلٌ لَهُ অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় কাফীল নেওয়া সহীহ নয়। আলোচ্য মাসআলায় অনুপস্থিত পাওনাদার ও অনুপস্থিত ওয়ারিশদের জন্য কাফীল নেওয়া হচ্ছে। তারা অজ্ঞাত, মাসআলাটি এমন হলো যে, কোনো একজন অনির্দিষ্ট পাওনাদারের জন্য যেন জামিনদার হলো। অথচ এ ধরনের জামানত নেওয়া চলে না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় অজ্ঞাত পাওনাদার কিংবা অজ্ঞাত ওয়ারিশের জন্য কাফীল নেওয়া বৈধ নয়। এরপর হিদায়ার লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। লেখক বলেন– بِخِلَافِ النَّفَقَةِ অর্থাৎ স্ত্রীর খোরপোশ অনুপস্থিত স্বামীর আমানতের মাল থেকে দেওয়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা স্বামীর হক সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। আর স্বামী একজন পরিজ্ঞাত ও পরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীর খোরপোশ প্রদানের সময় কাফীল নেওয়া মূলত একটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হক থেকে কাফীল নেওয়া। আর স্বামী পরিচিত হওয়ার কারণে জামানত নেওয়া হচ্ছে পরিচিত ব্যক্তি থেকে। সুতরাং উভয় দিক বিবেচনায় জামানত শুদ্ধ হচ্ছে। অতএব, এর উপর আমাদের আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করা ঠিক হচ্ছে না।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْاٰبِقُ وَاللُّقَطَةُ فَنَقُوْلُ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা লেখক সাহেবাইন (র.)-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। হেদায়ার লেখক বলেন, পলাতক গোলাম ও হারানো বস্তুর মাসআলার উপর কিয়াস করা ঠিক হয়নি। কারণ সহীহ বর্ণনানুযায়ী এ দু মাসআলাতেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে সাহেবাইন (র.)-এর মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম

আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পলাতক গোলামের ক্ষেত্রে ও হারানো বস্তু মালিকের কাছে অর্পণ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফীল নেওয়া হবে না; কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে কাফীল নেওয়া হবে। যেহেতু মাসআলা দুটিতে সকলের ঐকমত্য নেই; বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এতেও দ্বিমত রয়েছে তাই ইবারতের মাসআলাকে এ দুটি মাসআলার উপর কিয়াস করা যথার্থ হয়নি। কারণ মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার কোনো একটি দিককে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কিয়াস করা হয় ঐকমত্যের মাসআলার উপর। কেননা যদি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাকে আরেকটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার উপর কিয়াস করা হয় তাহলে কিয়াস ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়। এর দ্বারা মতবিরোধের কোনো দিক শক্তিশালী হয় না।

قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنْ دَفَعَ بِعَلَامَةٍ الخ : লেখক বলেন, কতিপয় লোক মনে করেন, যদি বিচারক হারানো বস্তুকে তার মালিকের হাতে আলামত বা চিহ্ন বর্ণনা করার পর প্রদান করেন তথা সুনিশ্চিত কোনো দলিলের ভিত্তিতে প্রদান না করেন এবং পলাতক গোলামের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গোলামটিকে মালিকের হাতে অর্পণ করেন তাহলে সকলের ঐকমত্যেই কাফীল নেওয়া হবে। আলামত বা চিহ্ন বর্ণনা করার অর্থ হলো, হারানো বস্তু প্রাপ্তির পর বিচারক যখন ঘোষণা করলেন তখন এক ব্যক্তি এসে দাবি করল যে, বস্তুটি আমার। বিচারক তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইলে সে তা প্রদান করতে ব্যর্থ হলো; কিন্তু মালিক হওয়ার দাবিদার হারানো বস্তুটির চিহ্ন ও নিদর্শন যা বর্ণনা করল তা হুবহু মিলে গেল। বিচারক অন্য কোনো দাবিদার না পাওয়াতে উক্ত দাবিদারের হাতে বস্তুটি প্রদান করলেন; কিন্তু বস্তুটির মালিকানা উক্ত দাবিদারের হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত স্বীকৃত দলিল-প্রমাণ না পাওয়াতে বিচারক মালিক থেকে একজন কাফীল নিবেন এই মর্মে যে, যদি অন্য মালিক বস্তুটি দাবি করে এবং যথাযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হয় তাহলে বস্তুটি সেই মালিককেই প্রদান করা হবে।

আর গোলামের স্বীকারোক্তি করার অর্থ হলো, একটি গোলাম তার মালিকের হাত থেকে পলায়ন করে চলে আসে। ঘটনাচক্রে গোলামটি গ্রেফতার করে বিচারকের দরবারে উঠানো হয় বিচারক তার প্রকৃত মালিক অনুসন্ধান করলে এক ব্যক্তি গোলামটি তার হওয়ার ব্যাপারে দাবি করে। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার মালিকনাধীন হওয়াকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। তবে গোলাম স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, উক্ত দাবিদারই আমার মালিক। এমতাবস্থায় বিচারক মালিক থেকে কাফীল নিয়ে গোলামটি তার হাতে সমর্পণ করবেন।

উল্লেখ্য যে, আলামত বর্ণনা ও এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি কোনোটাই যেহেতু শরিয়ত স্বীকৃত দলিল নয় এজন্য বিচারক ইচ্ছা করলে মালিকানার দাবিদার ব্যক্তিকে হারানো বস্তু ও গোলাম নাও দিতে পারেন। দেওয়া বা না দেওয়া বিচারকের এখতিয়ারাধীন বা ইচ্ছাধীন বিষয়। এমতাবস্থায় কাফীল নিয়ে হারানো বস্তু কিংবা পলাতক গোলাম প্রদানের এখতিয়ার তো অবশ্যই বিচারকের থাকবে।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ ظُلْمٌ الخ : লেখক وَقَوْلُهُ وَهُوَ ظُلْمٌ বলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের অংশ هُوَ ظُلْمٌ-এর ব্যাখ্যা করছেন। লেখক বলেন, এখানে ظُلْمٌ-এর অর্থ– مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ অর্থাৎ 'সঠিক ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া বা সরে যাওয়া।' তিনি মনে করেন উপরিউক্ত সুরতে পাওনাদার ও ওয়ারিশগণ থেকে জামানত দাবি করা একটি ইজতিহাদী ভ্রান্তি। সে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন সাহেবাইন (র.)।

লেখক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে ظُلْمٌ শব্দটির ব্যবহার আরেকটি ইঙ্গিত বহন করছে। সেই ইঙ্গিতটি হচ্ছে, ইমাম আযমের মতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে যেমন পৌঁছতে সক্ষম হন তদ্রূপ তিনি ভুলও করেন। এ ব্যাপারে তাঁর মাযহাব মু'তাযিলা সম্প্রদায় চেয়ে ভিন্ন। মু'তাযিলারা মনে করে মুজতাহিদের ভুল হয় না এবং তিনি কিছুতেই ভুলের স্বীকার হোন না। মু'তাযিলারা তাদের মাযহাবকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তারা এই অপপ্রচার চালায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীরাও তাদের [মু'তাযিলাদের] এ মতটি অনুসরণ করেন। কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এ মতটি প্রচার করা যে অবৈধ তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা এ উক্তির সারকথা হচ্ছে, মুজতাহিদ ভুল করেন আবার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন।

قَالَ : وَاِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِىْ يَدِ رَجُلٍ وَاَقَامَ الْاٰخَرُ الْبَيِّنَةَ : اَنَّ اَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ فُلَانٍ الْغَائِبِ، قُضِىَ لَهُ بِالنِّصْفِ وَتُرِكَ النِّصْفُ الْاٰخَرُ فِىْ يَدِ الَّذِىْ فِىْ يَدَيْهِ، وَلَا يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِكَفِيْلٍ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالَا : اِنْ كَانَ الَّذِىْ فِىْ يَدَيْهِ جَاحِدًا اُخِذَ مِنْهُ، وَجُعِلَ فِىْ يَدِ اَمِيْنٍ، وَاِنْ لَمْ يَجْحَدْ تُرِكَ فِىْ يَدِهٖ، لَهُمَا اَنَّ الْجَاحِدَ خَائِنٌ فَلَا يُتْرَكُ الْمَالُ فِىْ يَدِهٖ، بِخِلَافِ الْمُقِرِّ لِاَنَّهُ اَمِيْنٌ، وَلَهُ اَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ مَقْصُوْدًا، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهٖ مُخْتَارًا لِلْمَيِّتِ ثَابِتٌ فَلَا يَنْقُضُ يَدَهُ، كَمَا اِذَا كَانَ مُقِرًّا، وَجُحُوْدُهُ قَدِ ارْتَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِىْ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْجُحُوْدِ فِى الْمُسْتَقْبَلِ لِصَيْرُوْرَةِ الْحَادِثَةِ مَعْلُوْمَةً لَهُ وَلِلْقَاضِىْ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো এক ব্যক্তির একটি বাড়ি থাকে আর অন্য এক ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, তার পিতা মারা গেছে এবং বাড়িটি তার ও অনুপস্থিত ভাইয়ের মাঝে উত্তরাধিকাররূপে রেখে গেছেন তাহলে বাড়ির অর্ধাংশ তার সাথে ফয়সালা করা হবে। আর বাকি অর্ধাংশ বর্তমান দখলদারের হাতে রেখে দেওয়া হবে। তবে দখলদার থেকে নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে কাফীল নেওয়া হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, দখলদার যদি অস্বীকারকারী হয় তাহলে তার থেকে অবশিষ্ট অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হবে এবং তা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে। আর যদি দখলদার দাবিদারের হক অস্বীকার না করে থাকে তাহলে তা [অবশিষ্ট অর্ধেক] তার হাতেই ফেলে রাখা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, অস্বীকারকারী হচ্ছে খিয়ানতকারী। সুতরাং তার হাতে মাল ফেলে রাখা যায় না। পক্ষান্তরে স্বীকৃতি প্রদানকারী হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিচারকের ফয়সালা উদ্দেশ্যগতভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া দখল মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্বাচিত [ও পছন্দনীয়] হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। সুতরাং তার দখল বাতিল হবে না। সে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী হলে যেমনটা হয়। আর তার অস্বীকার বিচারকের ফয়সালা দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর তার ও বিচারকের ঘটনা জানাজানি হওয়াতে ভবিষ্যতে অস্বীকার করার সম্ভবনা না থাকাই স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا كَانَتِ الدَّارُ الخ : উল্লিখিত ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : [উদাহরণস্বরূপ] মামুন নামের এক ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি রয়েছে। অন্য এক ব্যক্তি [খালেদ] বিচারকের কাছে এসে মামুনের দখলকৃত বাড়িটি এভাবে দাবি করল যে, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় মামুনের দখলকৃত বাড়িটি আমার এবং আমার অনুপস্থিত ভাইয়ের মাঝে ওয়ারিশ সম্পত্তিরূপে রেখে যান। বিচারক বাদির দলিল-প্রমাণ দেখে আশ্বস্ত হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অর্ধেক বাড়ি উপস্থিত ভাইয়ের [দাবিদারের] জন্য ফয়সালার মাধ্যমে প্রদান করবেন। এরপর যখন অনুপস্থিত ভাই চলে আসবে তাকে বর্তমান দখলদার তার প্রাপ্য জমির অর্ধাংশ প্রদান করবে। দখলদার [উক্ত ব্যক্তি] থেকে সকলের ঐকমত্যে কোনো কাফীল নেওয়া হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হলো, যদি দখলদার প্রথমেই ওয়ারিশানের হক অস্বীকার করে থাকে তাহলে বাকি অর্ধাংশ দখলদারের হাতে প্রদান করা হবে না; বরং বিচারক দখলদারের হাত থেকে জমি নিয়ে যে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট জমিটি প্রদান করবেন। আর যদি বর্তমান দখলদার উক্ত দাবিদারের দাবি প্রথমে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে তার হাতে বিচারক জমি রেখে দেবেন। কেননা তার থেকে ইতঃপূর্বে কোনো অবিশ্বস্ততা পাওয়া যায়নি। অতএব, তার প্রতি আস্থা রেখে বিচারক তার হাতে জমি রেখে দেবেন।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ الْجَاحِدَ خَائِنٌ الخ : সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, বর্তমান দখলদার মামুন যদি খালেদের [দাবিদারের] দাবি অস্বীকার করে তাহলে তার অস্বীকারের দ্বারা তার অবিশ্বস্ততা বা খিয়ানত প্রকাশ পাবে, আর যার অবিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়েছে এমন ব্যক্তির হাতে অন্যের মালামাল ও জমি কিছুতেই নিরাপদ নয়। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় খিয়ানতকারী মামুনের হাতে বিচারক খালেদের ভাইয়ের জমি আমানত রূপে রাখবেন না। কেননা খিয়ানতকারী যে কোনো উপায়ে ছলে-বলে-কৌশলে খালেদের অনুপস্থিত ভাইয়ের জমি পুনরায় আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালাবে অথবা সেই জমিতে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে জমি নষ্ট করে ফেলতে পারে। অতএব, বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির মালের হেফাজতের উদ্দেশ্যে বর্তমান খিয়ানতকারী দখলদারের হাতে জমি রেখে দেবেন না; বরং তার হাত থেকে জমি নিয়ে কোনো একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে জমিটি রেখে দেবেন। পক্ষান্তরে যদি বর্তমান দখলদার মামুন জমিটি যে তার কাছে আমানতরূপে রয়েছে তা স্বীকার করে তাহলে স্বীকারোক্তি দ্বারা তার আমানতদারি বা বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে। আর বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে অন্যের মাল নিরাপদ থাকে। যেহেতু এতদিন তার হাতে জমিটি নিরাপদ ছিল তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতেও তার হাতে জমিটি নিরাপদ থাকবে। অতএব বর্তমান দখলদারের হাতে বিচারক অবশিষ্ট অর্ধাংশ জমি রেখে দেবেন। তাছাড়া মৃত ব্যক্তি যেহেতু তাকে বিশ্বস্ত মনে করেছে এবং সে সেই বিশ্বস্ততাকে রক্ষা করেছে তাই তার হাত থেকে জমিটি ফেরত নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না; বরং ফেরত নেওয়াতে তার বিশ্বস্ততার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। সারকথা হলো যে, যদি বর্তমান দখলদার ওয়ারিশানের হক স্বীকার করে তাহলে তার হাত থেকে অবশিষ্ট অর্ধেক জমি ফেরত নেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিচারকের উত্তরাধিকার সম্পর্কে ফয়সালা দেওয়া মূলত মৃত ব্যক্তির অনুকূলে ফয়সালা দেওয়াই। এজন্যই তো মৃত ব্যক্তির বাড়ি বা জমি ফয়সালা দেওয়ার পর মৃতের মাল থেকে তার কর্জ এবং অসিয়ত আদায় করা হয়। বাকি রইল বর্তমান দখলদারের অস্বীকৃতির পর কি করে তারই হাতে জমিটি ফেলে রাখা হবে? এর উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বর্তমান দখলদারের অস্বীকৃতির পরও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি কর্তৃক মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিল। যেহেতু সম্ভবনা রয়েছে তাই মৃত ব্যক্তির অমনোনীত ব্যক্তির দলিল-প্রমাণের কারণে মনোনীত ব্যক্তির মনোনয়ন বা দখল অবমুক্ত হবে না। যেমন দখলদার যদি মৃতের আমানতের স্বীকার করে তাহলে তার দখল বাতিল হয় না।

قَوْلُهُ وَجُحُوْدُهُ قَدْ اِرْتَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِىْ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। তাঁদের দলিলে বলা হয়েছিল যে, দখলদার অস্বীকার করার কারণে তার খিয়ানত প্রকাশ পেয়েছে। এর জবাবে লেখক বলেন, অস্বীকার করার কারণে খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অতীত। অতীতে যদিও বর্তমান দখলদার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল; কিন্তু যখন তার বিপক্ষে দলিল-প্রমাণ উত্থাপিত হলো এবং বিচারক তার কাছে আমানতরূপে জমিটি থাকার ফয়সালা দিলেন তখন তার দাবি অস্বীকারের সুযোগ রইল না। যেহেতু অস্বীকৃতি দূর হয়ে গেল সেহেতু তার অস্বীকারের যে ফলাফল তথা খিয়ানতকারী হওয়াও বিদূরিত হলো। কেননা অস্বীকার ছিল لَازِمٌ আর খিয়ানতকারী হলো তার مَلْزُوْمٌ। যেহেতু لَازِمٌ নেই, অতএব مَلْزُوْمٌ-ও থাকবে না।

মোটকথা, যেহেতু দখলদার বর্তমানে খিয়ানতকারী নয় তাই তার হাতে জমি রাখাতেও কোনো সমস্যা নেই। বাকি রইল বর্তমান দখলদার ভবিষ্যতে পুনরায় অস্বীকার করতে পারে এই সম্ভাবনা। এ ব্যাপারে হিদায়ার লেখক বলেন, ভবিষ্যতে সে পুনরায় অস্বীকার করতে পারে এ সম্ভাবনাও খুবই কম। কেননা পুরো ঘটনাটি বিচারক ও দাবিদার ছেলে এবং আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের জানাজানি হয়ে গেছে। ফলে দখলদার ভবিষ্যতে বিষয়টি অস্বীকার করার সাহস বা সুযোগ পাবে না। তবে এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে, যদি বিচারক মারা যান/ পদচ্যুত হন কিংবা উপরিউক্ত ফয়সালার নথিপত্র নষ্ট হয়ে যায় বা জ্বলে যায় তখন দখলদার তার আলামত অস্বীকার করার সুযোগ পাবে। কারণ এসব বিষয় অতি বিরল বা দুর্ঘটনা। আর এ কথা বলা বাহুল্য যে, দুর্ঘটনা বা বিরল ঘটনা এড়িয়ে কোনো ফয়সালা প্রদান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যে কোনো বিধান প্রণয়ন কিংবা প্রবর্তনের সময় শুধুমাত্র সাধারণ ঘটনা বা পরিস্থিতিকেই সামনে রাখা হয়, বিরল ঘটনা বিবেচনা করা হয় না। সারকথা হলো বিরল বা দুর্ঘটনা এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

উল্লেখ্য যে, সাহেবাইন (র.)-এর দলিলে যে বলা হয়েছে অস্বীকার করা দখলদারের খিয়ানতের পরিচয় বহন করে বা অস্বীকারের দ্বারা খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হয়। এ ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য হলো গড়পড়তা একরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া অনুচিত। কেননা মানুষ সব সময় অন্তরে অসৎ উদ্দেশ্য থাকার কারণেই কেবল অস্বীকার করে না; বরং অনেক সময় ভুলে, অনেক সময় অসাবধানতাবশত, অনেক দাবিদারকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, আবার অনেক সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হওয়ার কারণে অস্বীকার করে। তাই শুধুমাত্র অস্বীকার পাওয়া গেলেই খিয়ানত সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوٰى فِىْ مَنْقُوْلٍ فَقَدْ قِيْلَ يُوْخَذُ مِنْهُ بِالْاِتِّفَاقِ، لِاَنَّهٗ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْحِفْظِ، وَالنَّزْعُ اَبْلَغُ فِيْهِ، بِخِلَافِ الْعِقَارِ لِاَنَّهَا مُحْصِنَةٌ بِنَفْسِهَا، وَلِهٰذَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ بَيْعَ الْمَنْقُوْلِ الْكَبِيْرِ الْغَائِبِ دُوْنَ الْعِقَارِ، وَكَذَا حُكْمُ وَصِيِّ الْاُمِّ وَالْاَخِ وَالْعَمِّ عَلَى الصَّغِيْرِ، وَقِيْلَ : اَلْمَنْقُوْلُ عَلَى الْخِلَافِ اَيْضًا، وَقَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فِيْهِ اَظْهَرُ لِحَاجَتِهٖ اِلَى الْحِفْظِ، وَاِنَّمَا لَا يُؤْخَذُ الْكَفِيْلُ، لِاَنَّهٗ اِنْشَاءُ الْخُصُوْمَةِ، وَالْقَاضِىْ اِنَّمَا نُصِبَ لِقَطْعِهَا لَا لِاِنْشَائِهَا .

অনুবাদ : আর যদি দাবি অস্থাবর সম্পদের ব্যাপারে হয়ে থাকে তাহলে কারো কারো মতে সকলের ঐকমত্যে দখলদার থেকে অবশিষ্ট মাল-সামান নিয়ে নেওয়া হবে। কেননা অস্থাবর সম্পদে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অতি জরুরি। দখলদারের আয়ত্তমুক্ত করাতেই অধিকতর সংরক্ষণ সম্ভব। স্থাবর সম্পত্তি এর থেকে ভিন্ন, কেননা সেটা সত্তাগতভাবে সংরক্ষিত। এজন্যই মৃতের নিযুক্ত অছি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক অনুপস্থিত ওয়ারিশের অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রাখে; কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ক্ষমতা রাখে না। অনুরূপ অধিকার রাখে মা, ভাই ও চাচা অছি অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালগের অস্থাবর সম্পদে। কারো কারো মতে অস্থাবর সম্পত্তিতেও এমন মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কারণে এক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট। কাফীল না নেওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে বিবাদ সৃষ্টি হয়, আর বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে বিবাদ মিটানোর উদ্দেশ্যে, বিবাদ বাঁধানোর উদ্দেশ্যে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوٰى فِىْ مَنْقُوْلٍ الخ : এ ইবারতের মাসআলাটি পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো দখলদারের হাতে মৃতের স্থাবর সম্পত্তি, যথা– বাড়ি-জমি ইত্যাদি থাকে আর মৃতের ওয়ারিশগণ তা দাবি করে তাহলে উপস্থিত ওয়ারিশদের তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর অনুপস্থিত ওয়ারিশের সম্পত্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দখলদারের আয়ত্তেই থাকবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা দখলদার/ বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে থাকবে। এখানে সেই একই মাসআলা তবে এখানে বলা হয়েছে অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে। লেখক বলেন, যদি ওয়ারিশগণের দাবি অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা তা প্রমাণিত হয় তাহলে উপস্থিত ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের মাঝে তাদের অংশ বণ্টন করা হবে আর অবশিষ্টাংশ দখলদার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। এটা কতিপয় মাশায়েখের মত। তাদের মতে উপস্থিত ওয়ারিশকে তার হক বা প্রাপ্য অংশ দিয়ে বাকি অংশ বিচারক দখলদারের হাত থেকে নিয়ে কোনো বিশ্বস্ত-আমানতদার ব্যক্তির হাতে অর্পণ করবেন। তাঁদের যুক্তি হলো, অস্থাবর সম্পদের সংরক্ষণ করা জরুরি। কেননা অস্থাবর সম্পত্তি নিজে নিজে বা সত্তাগতভাবে সংরক্ষিত থাকে না। একে সংরক্ষণ করতে হয়। এর সংরক্ষণের জন্য স্থানান্তর ও জায়গা বদল করা জরুরি। এক স্থানে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, দখলদারের হাত বদল হলে এর উপকার হবে। এজন্য দখলদারের হাত থেকে বিচারক যে কোনো আমানতদারের হাতে অর্পণ করবেন। তাছাড়া যখন সে দাবিদারের দাবি অস্বীকার করল তখন তার হাতে সে অস্থাবর বস্তুটি আর নিরাপদ নয়। সে সেই মাল/মালগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। পক্ষান্তরে যখন বিচারক বর্তমান দখলদারের হাত থেকে তা নিয়ে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে প্রদান করবে, সেই ব্যক্তি তার বিশ্বস্ততার কারণে মালটির যত্ন নেবে এবং তার প্রতি বিচারকের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করবে। সারকথা হচ্ছে অস্থাবর মালের অধিকতর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিচারক উক্ত মালকে দখলদারের হাত থেকে নিয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তির হেফাজতে রাখবেন।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ الْعِقَارِ لِاَنَّهَا مُحْصِنَةٌ الخ : লেখক বলেন, স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য জমির বিধান অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীত। কেননা স্থাবর সম্পত্তি সত্তাগতভাবেই সংরক্ষিত। এ তো আত্মসাৎ, ছিনতাই বা চুরি করা সম্ভব নয়। অতএব, স্থায়ী সম্পদ দখলদারের হাতে ফেলে রাখাতে কোনো ক্ষতি হবে না। অন্যদিকে অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদে অধিকতর সংরক্ষণ করা

জরুরি। এতে চুরি, আত্মসাৎ, ছিনতাই ও অন্য যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য মৃতব্যক্তি যার অনুকূলে অছিয়ত করে যাবে, সে ইচ্ছা করলেমৃতের প্রাপ্ত বয়স্ক অনুপস্থিত ওয়ারিশদের অবর্তমানে তাদের অংশের অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য মাল বিক্রি করে দিতে পারবে, অছি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা বিক্রি করে দিলে প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশের উপর উক্ত বিক্রি কার্যকর হবে। তবে অছির জন্য স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য সম্পদ বিক্রি করা বৈধ হবে না। কেননা স্থাবর সম্পত্তি সত্তাগতভাবে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে তা বিক্রির প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণে সমস্যা দেখা দিলে তা বিক্রি করে এর বিক্রয়মূল্য হেফাজতে রাখা হবে এবং প্রয়োজনে পরে এর সাহায্যে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ বা জিনিসপত্র পুনরায় সংগ্রহ করা যাবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمُ وَصِيِّ الْاُمِّ الخ : এরপর লেখক বলেন, অনুরূপভাবে মা -এর অছি/ভাইয়ের অছি/চাচা-এর অছি নাবালেগ [অপ্রাপ্তবয়স্ক] ওয়ারিশের স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষমতা রাখে, অথচ মা, ভাই ও চাচা-এর অছি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওয়ারিশানের মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তারা শুধুমাত্র মাল হেফাজত করতে পারে। কিন্তু যেহেতু স্থানান্তরযোগ্য মাল বিক্রি করা হেফাজত করার মধ্যে গণ্য বা এ জাতীয় মাল হেফাজত করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে বিক্রি করা, তাই তাদের অছি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নাবালেগের মাল বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْمَنْقُوْلُ عَلَى الْخِلَافِ اَيْضًا : লেখক বলেন, কতিপয় মাশায়েখ মনে করেন, স্থানান্তরযোগ্য মালের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে, যে মতবিরোধ রয়েছে অস্থানান্তরযোগ্য স্থাবর সম্পদের মধ্যে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্থানান্তরযোগ্য মালের অর্ধাংশ উপস্থিত ওয়ারিশানের মাঝে বণ্টন করার পর অবশিষ্ট অংশ বর্তমান দখলদারের হাতে ফেলে রাখা হবে। তাঁর মতে অস্থাবর সম্পত্তিও দখলদার থেকে নিয়ে কোনো বিশ্বস্ত লোকের হাতে প্রদান করা হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে, অস্থাবর সম্পদ অবশ্যই দখলদারের হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তা বিচারকের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে। এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর যুক্তি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের পক্ষে এই দলিল উপস্থাপন করা হয় যে, দখলদারের হাতে অনুপস্থিত ওয়ারিশানের অস্থাবর সম্পদ জামানত রূপে রয়েছে। অর্থাৎ দখলদারের হাতে থাকা অবস্থায় উক্ত সম্পদের কোনোরূপ ক্ষতি হলে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে দখলদার বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি উক্ত মাল দখলদারের হাত থেকে নিয়ে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে প্রদান করেন, তাহলে তা আমানতের মাল গণ্য হবে। আর আমানতের মালের হুকুম হলো, যদি আমানতের মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তার কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে আমানতদার বাধ্য থাকে না। বাকি রইল সাহেবাইন (র.)-এর দলিল যে, দখলদারের হাতে অস্থাবর সম্পদ নিরাপদ নয় এবং তার পক্ষ থেকে খিয়ানতের সম্ভবনা রয়েছে- এর জবাব হলো যখন বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এখন আর দখলদারের পক্ষে এরূপ করার সুযোগ নেই। কারণ বিচারকও আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাঝে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে। তাছাড়া আদালতের নথিতে বিষয়টি লিপিবদ্ধও হয়ে গেছে। অতএব, এখন আর দখলদারের কোনো কিছু করার সুযোগ নেই। আর এসব মজবুত যুক্তি দেখেই হিদায়ার লেখক বলেছেন- قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْهِ اَظْهَرُ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেননা এতে মালের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا لَا يُؤْخَذُ الْكَفِيْلُ لِاَنَّهُ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল পাঠের অংশ وَلَا تَوْثُقَ مِنْهُ بِكَفِيْلٍ -এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। তিনি বলেন, মূল ইবারতে যে বলা হয়েছে নির্ভরতা স্বরূপ কাফীল নেওয়া হবে না- এর দলিল হলো, কাফীল নেওয়ার অর্থ ঝগড়া সৃষ্টি করা। কেননা দখলদার জামিনদার দিতে অস্বীকার করবে, অথচ বিচারক তার কাছ থেকে জামিন চাইবে। আর এভাবে দুপক্ষের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। সারকথা হচ্ছে কাফীলের প্রশ্নে বিচারকের সাথে দখলদারের মতপার্থক্য বা বিবাদ হয়ে যাচ্ছে বা বিচারক প্রতিপক্ষ হয়ে যাচ্ছেন। অথচ শরিয়ত বিচারকের নিয়োগ দিয়েছেন বিবাদ বন্ধ করার জন্য, বিবাদ সৃষ্টির জন্য নয়। অতএব, কাফীল চাওয়াই হবে না তাহলে বিবাদ সৃষ্টির প্রশ্ন আসবে না।

এ বক্তব্যের উপর একটি আপত্তি করা হয়, আর তা হলো- যদি বিচারক কাফীল না চান; বরং কাফীল তলব করে উপস্থিত ওয়ারিশ তাহলে তো তাদের মাঝে বিবাদ হচ্ছে না বা বিচারক প্রতিপক্ষ হচ্ছেন না। তখন কাফীলের জন্য আবেদন করবে উপস্থিত ওয়ারিশ, আর দখলদার তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে এভাবে তাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হবে। অতঃপর বিচারক কাফীল প্রদানের ফয়সালা প্রদানের মাধ্যমে দুপক্ষের ঝগড়ার মীমাংসা করবেন। এভাবে হলে তো দখলদার থেকে কাফীল ও নেওয়া হচ্ছে এবং বিচারক দখলদারের প্রতিপক্ষ হচ্ছেন। ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, বিচারক পদটি ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য হলো না।

وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ وَسُلِّمَ إِلَيْهِ النِّصْفُ بِذٰلِكَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِيْنَ فِيْمَا يَسْتَحِقُّ لَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا، لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ وَعَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمَيِّتُ فِي الْحَقِيْقَةِ، وَوَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ يَصْلُحُ خَلِيْفَةً عَنْهُ فِيْ ذٰلِكَ، بِخِلَافِ الْاِسْتِيْفَاءِ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ عَامِلٌ فِيْهِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَصْلُحُ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهٰذَا لَا يَسْتَوْفِيْ إِلَّا نَصِيْبَهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ اِسْتِحْقَاقُ الْكُلِّ عَلٰى أَحَدِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِيْ يَدِهِ، ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُوْنُ خَصْمًا بِدُوْنِ الْيَدِ، فَيَقْتَصِرُ الْقَضَاءُ عَلٰى مَا فِيْ يَدِهِ۔

অনুবাদ : আর যখন অনুপস্থিত ওয়ারিশ উপস্থিত হবে তার জন্য পুনরায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হবে না। বিচারের সেই রায়ের মাধ্যমেই অবশিষ্ট অর্ধাংশ তাকে প্রদান করা হবে। কেননা ওয়ারিশদের মধ্য থেকে একজন অন্যদের পক্ষে এমন বিষয়ে প্রতিনিধি বা প্রতিপক্ষ হতে পারে যাতে তার জন্য কিংবা তার বিপক্ষে হক প্রমাণিত হবে চাই সে হক বস্তুগত হোক অথবা ঋণ জাতীয় হোক। কেননা যার অনুকূলে বা বিপক্ষে রায় প্রদান করা হবে সে হচ্ছে মৃতব্যক্তি। আর ওয়ারিশগণের যে কোনো একজন এসব ব্যাপারে মৃতের স্থলবর্তী হতে পারে। তবে নিজের জন্য হক লাভ করার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা এতে সে কেবল নিজের জন্যই কাজ করে। অতএব, সে এতে অন্যের প্রতিনিধি হতে পারবে না। আর এজন্যই উপস্থিত বাদী শুধুমাত্র নিজের অংশ কব্জা বা দখল করতে পারে। মাসআলাটি এমন হলো যে, মৃতের ঋণের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো। তবে সম্পূর্ণ মালের হক একজন ওয়ারিশের উপর প্রমাণিত হবে যদি সম্পূর্ণ মাল তার হাতে থাকে। মাসআলাটি তিনি জামিউল কাবীরে উল্লেখ করেছেন। কেননা উপস্থিত ওয়ারিশ দখল ছাড়া প্রতিপক্ষ হতে পারবে না। সুতরাং বিচারকের রায় তার আয়ত্তাধীন মালে সীমাবদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يَحْتَاجُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটি পূর্বে বর্ণিত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার ধারাবাহিকতার অংশ। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মৃতের একজন ওয়ারিশ এসে বিচারকের কাছে দাবি করল যে, অমুক ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়িটি আমার এবং আমার অমুক অনুপস্থিত ভাইয়ের। এরপর সে যথানিয়মে বাড়ির অর্ধাংশ লাভ করল আর বাকি অর্ধাংশ দখলদারের হাতেই রইল, এই অর্ধাংশের মালিক অনুপস্থিত। চলমান ইবারতে সেই অনুপস্থিত ওয়ারিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি সে উপস্থিত হয় আর তার প্রাপ্য অংশ দাবি করে তাহলে তার নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হবে না; বরং সে পূর্ববর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক যে রায় প্রদান করেছিলেন, সেই রায় বলেই তার অংশ সে লাভ করবে। দখলদার উক্ত ব্যক্তি আসা মাত্রই তার জমি/ বাড়ি তাকে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু এ মতটি সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বলা হয়নি। কেননা অন্য এক দল মনে করেন, অনুপস্থিত ওয়ারিশ উপস্থিত হওয়ার পর তাকে

নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। কেননা পূর্ববর্তী দাবিদার যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল তা শুধুমাত্র তার নিজের অংশ লাভের জন্য করেছিল। অতএব, তার প্রমাণাদি অনুপস্থিত ওয়ারিশের জন্য যথেষ্ট হবে না। হিদায়ার লেখক অবশ্য এ মতের প্রবক্তা নন। আর তাই তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সেই ভিত্তিতে প্রদানকৃত রায়ই যথেষ্ট হবে। পরবর্তীতে আগমনকারীর জন্য নতুন করে প্রমাণাদি পেশ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা পূর্বে উপস্থিত ওয়ারিশের [দাবিদারের] সাক্ষ্য-প্রমাণ শুধুমাত্র তার জন্যই ছিল না; বরং তার নিজের জন্য এবং অনুপস্থিত ওয়ারিশ উভয়ের জন্যই ছিল।

প্রশ্ন : তবে এখানে একটি প্রশ্ন কারো মনে আসতে পারে, আর তা হলো, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এখানে তো কোনো দাবি উত্থাপন করা হয়নি এবং তার কোনো প্রতিনিধিও তো নেই, তাহলে উপস্থিত বাদীর [ওয়ারিশের] দাবি ও তার দলিল কিভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, কিছু কিছু ব্যাপারে একজন ওয়ারিশ অন্য ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি সাব্যস্ত হয়ে থাকেন। যেমন– ১. মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো হক প্রমাণ করা। ২. মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে কোনো হক আরোপ করা। সাধারণভাবে মৃত ব্যক্তির অনুকূলে এবং মৃতের বিপক্ষে দুধরনের হক প্রমাণ করা হয়। ক. ঋণ, যা জিম্মায় ওয়াজিব হয় খ. বস্তু বা দৃশ্যমান জিনিসসমূহ। সুতরাং বিচারক যদি মৃত ব্যক্তির অনুকূলে বা প্রতিকূলে একজন ওয়ারিশের উপস্থিতিতেও কোনো হক প্রমাণ করেন তাহলে উক্ত হক অন্য সব ওয়ারিশানের উপর কার্যকর হবে। যেমন– মৃতের যে কোনো একজন ওয়ারিশের উপস্থিতিতে মৃতের জন্য একটি জমির মালিকানা প্রমাণিত হলো তাহলে এ জমি মৃতের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব ওয়ারিশগণ লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যদি মৃতের কাছে কেউ পাওনা দাবি করে আর তা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত ঋণ সব ওয়ারিশদের উপর আপতিত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অনুপস্থিত সব ওয়ারিশকে মৃতের কোনো পাওনার ব্যাপারে বা দেনার ব্যাপারে উপস্থিত ধরে নেওয়া হয়। আর উপস্থিত ওয়ারিশ অন্যসব ওয়ারিশের পক্ষে প্রতিনিধি সাব্যস্ত হন। সুতরাং যে আপত্তি করা হয়েছিল যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো প্রতিনিধি নেই তা বাতিল হয়ে গেল। আলোচ্য মাসআলায় উপস্থিত ভাই তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষে প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে এবং উপস্থিত ভাইয়ের দলিল ও সাক্ষ্য অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, অনুপস্থিত ভাই যখন পরবর্তীতে উপস্থিত হবে তখন তার জন্য নতুন করে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়োজন হবে না। এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার তা হলো একজন ওয়ারিশ অন্যদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি কিভাবে হলেন? এর উত্তরে লেখক বলেন, যার বা যাদের অনুকূলে বিচারক হক প্রমাণ করেছেন কিংবা যার/ যাদের উপর হক আরোপ করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য বা তাদের উপর হক প্রমাণ করেননি; মূলত মৃতের জন্য বা মৃত ব্যক্তির উপর হক আরোপ করেছেন। আর উপস্থিত ওয়ারিশ তো মূলত একজন প্রতিনিধি বা তার স্থলবর্তী। সুতরাং উপস্থিত ওয়ারিশের দাবিও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যে হক প্রমাণিত হলো তা মৃতের হকই প্রমাণিত হলো। সুতরাং যখন বিচারক বাড়িটির ব্যাপারে উপস্থিত ওয়ারিশের পক্ষে ফয়সালা প্রদান করবেন, তখন ফয়সালা দ্বারা বাড়িটি মৃত ব্যক্তির বাড়ি বলে সাব্যস্ত হবে। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, মৃতের যে কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ মৃতের সব ওয়ারিশানের জন্য হয়। চাই সেসব ওয়ারিশ উপস্থিত থাকুক অথবা অনুপস্থিত থাকুক।

মোটকথা যেহেতু বিচারক উপস্থিত একজনের পক্ষে রায় প্রদানের দ্বারা মৃতের মাধ্যমে সকলের জন্য রায় প্রদান সাব্যস্ত হলো সেহেতু পরবর্তীতে উপস্থিত ওয়ারিশের জন্য নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে না। উল্লেখ্য যে, এ মতটি ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী ও ইমাম আবূ বকর আল খাসসাফ (র.) থেকে বর্ণিত। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) তাঁদের মতটি গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْاِسْتِيْفَاءِ لِنَفْسِهِ الخ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে উত্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হচ্ছে একজন ওয়ারিশ যদি মৃতের প্রতিনিধি ও স্থলবর্তী হতে পারে তাহলে তার জন্য পূর্ণ সম্পত্তি আদায় করার সুযোগ লাভ হবে বা হওয়া উচিত, অথচ আমরা দেখতে পাই যে, তাকে তার অংশ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারেই সব ইমামগণের ইজমা বর্ণিত আছে।

উত্তর : এর উত্তর হলো, উপস্থিত ওয়ারিশ তার অংশ গ্রহণকালে শুধুমাত্র নিজের জন্য তা গ্রহণ করে মৃত ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করে না। যেহেতু সে শুধুমাত্র নিজের জন্যই গ্রহণ করে তাই সে অন্য কারো প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হবে না। সে নিজের উদ্দেশ্যে কব্জা করে বলেই নিজ অংশ ছাড়া অন্যের অংশ কব্জা করতে পারবে না। এখানে যদি কেউ এ আপত্তি করে যে, সে নিজের জন্য নিজ অংশের ব্যাপারে কব্জা করছে, অন্যের জন্য নিজে স্থলবর্তী হয়েও তো কব্জা করতে পারে, তাতে সমস্যা কোথায়? এর উত্তর ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছিল যে, তাকে তার অংশ ব্যতীত অন্য অংশ প্রদান না করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। অতএব সে শুধুমাত্র নিজের অংশই কব্জা করতে পারবে।

লেখক বলেন, এ মাসআলা যেন এমন হলো যে, এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পাওনা দাবি করে দলিল-প্রমাণ পেশ করল। বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদীকে আদেশ দিলেন যে, সম্পূর্ণ [দাবিকৃত] ঋণ যেন শোধ করে। কিন্তু অপর দিকে বাদীকে শুধুমাত্র তার অংশ কব্জা করার নির্দেশ দিলেন।

অতএব এ মাসআলাতেও উপস্থিত ওয়ারিশ শুধুমাত্র তার অংশই কব্জা করতে পারবে। যদিও বিচারক দখলদারকে পূর্ণ দাবিকৃত বাড়িটি ফেরত দেওয়ার আদেশ করবেন। উপস্থিত ওয়ারিশ এখানে তার অংশ ছাড়া অন্য অনুপস্থিত ওয়ারিশদের অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ اِنَّمَا يَثْبُتُ اِسْتِحْقَاقُ الْكُلِّ الخ : লেখক উপরিউক্ত মাসআলার لِاَنَّ اَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِيْنَ অংশ থেকে اِلَّا اَنَّهُ اِنَّمَا يَثْبُتُ ইসতিসনা করছেন। অর্থাৎ বিচারক যখন মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো হক প্রমাণ করবেন অথবা মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে কোনো হক আরোপ করবেন তখন একজন ওয়ারিশ অন্যান্য ওয়ারিশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গণ্য হবেন এবং বিচারক যে হক পাওয়ার বা দেনার ঘোষণা দেবেন তা সকলের উপর কার্যকর হবে। তবে যখন মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি উপস্থিত ওয়ারিশের দখলে থাকে তার বিপক্ষে সব মালের প্রাপ্যতা বা ইসতিহকাক প্রমাণিত হবে। এমনকি যদি উপস্থিত ওয়ারিশের হাতে কিছু মাল দখলরূপে থাকে তাহলে সেই পরিমাণ তার বিপক্ষে কার্যকর হবে। কেননা দখল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি প্রতিপক্ষ হতে পারে না।

অতএব তখন বিচারকের রায় সেই পরিমাণ মালের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে, যে পরিমাণ উপস্থিত ওয়ারিশের হাতে রয়েছে। জামিউল কাবীরে এভাবেই মাসআলাটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَنْ قَالَ : مَالِىْ فِى الْمَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلٰى مَا فِيْهِ الزَّكٰوةُ، وَاِنْ اَوْصٰى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ عَلٰى ثُلُثِ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَلْزَمَهُ التَّصَدُّقُ بِالْكُلِّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ (رح) لِعُمُوْمِ اِسْمِ الْمَالِ كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ، وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ اِيْجَابَ الْعَبْدِ يُعْتَبَرُ بِاِيْجَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَنْصَرِفُ اِيْجَابُهُ اِلٰى مَا اَوْجَبَ الشَّارِعُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمَالِ، اَمَّا الْوَصِيَّةُ فَاُخْتُ الْمِيْرَاثِ، لِاَنَّهَا خِلَافَةٌ، كَهِىَ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالٍ، وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ الْتِزَامُ الصَّدَقَةِ مِنْ فَاضِلِ مَالِهِ، وَهُوَ مَالُ الزَّكٰوةِ، اَمَّا الْوَصِيَّةُ فَتَقَعُ فِىْ حَالِ الْاِسْتِغْنَاءِ، فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْكُلِّ، وَتَدْخُلُ فِيْهِ الْاَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح)، لِاَنَّهَا سَبَبُ الصَّدَقَةِ، اِذْ جِهَةُ الصَّدَقَةِ فِى الْعُشْرِيَّةِ رَاجِحَةٌ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا تَدْخُلُ، لِاَنَّهُ سَبَبُ الْمُؤْنَةِ، اِذْ جِهَةُ الْمُؤْنَةِ رَاجِحَةٌ عِنْدَهُ، وَلَا يَدْخُلُ اَرْضُ الْخَرَاجِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهُ يَتَمَحَّضُ مُؤْنَةً ـ

অনুবাদ : যদি কেউ বলে, আমার মাল মিসকিন লোকদের মাঝে সদকা [করা হলো] তাহলে তার সদকা জাকাতের মালের উপর কার্যকর হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি তার মালের এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত করে তার অসিয়ত প্রত্যেক ধরনের মালের এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হবে। যুক্তি অনুযায়ী সদকা সম্পূর্ণ মালের উপর কার্যকর হওয়ার কথা। ইমাম যুফার (র.) এ মতই পোষণ করেন। কেননা মাল শব্দটি সর্বপ্রকার মালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়, যেমন অসিয়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। ইসতিহসান [সূক্ষ্ম কিয়াস] এর দলিল হলো, মানুষের [নিজের উপর] কোনো কিছু ওয়াজিব করা আল্লাহ তা'আলার ওয়াজিব করার ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। সুতরাং মানুষের ওয়াজিব করার হুকুম সেসব মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেসব মালে শরিয়ত সদকা তথা জাকাত ওয়াজিব করেছে। আর অসিয়ত তো মিরাসের সমগোত্রীয়। কেননা, মিরাসের মতো অসিয়ত স্থলবর্তী বিষয়। সুতরাং তা [মিরাসের মতো] বিশেষ কোনো মালের সাথে খাস হবে না। তাছাড়া বাহ্যত তো এটাই মনে হয় যে, সে তার অতিরিক্ত মালে সদকাকে আবশ্যক করেছে। আর অতিরিক্ত মাল হচ্ছে জাকাতের মাল। তবে অসিয়ত কার্যকর হয় মালের থেকে বিমুখ অবস্থায়। সুতরাং তা পুরো মালের সাথে সম্পর্কিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, উশরী জমিও শামিল থাকবে। কেননা উশরী জমি সদকার কারণ হয়ে থাকে। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এতে উশরী জমি অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁর মতে, উশরী জমিতে আর্থিক দায় প্রবল হওয়াতে তা আর্থিক দায়ের কারণ বা সবব। তবে সকলের মতে, খারাজী জমি সদকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা তা সম্পূর্ণই আর্থিক দায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ مَالِىْ فِى الْمَسَاكِيْنِ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক দুটি মাসআলার আলোচনা করেছেন। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে– এক ব্যক্তি বলল, আমার মাল মিসকিনদের মাঝে সদকা করলাম। তাহলে তার সেসব মাল সদকা হবে যেসব মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন– সোনা, রূপা, মাঠে বিচরণশীল পশু, ব্যবসায়িক মালপত্র ইত্যাদি। মোটকথা যেসব মালে জাকাত ওয়াজিব হয় এমন সব মাল সদকা বলে গণ্য হবে, যেহেতু জাকাতের সব মালই সদকা হয়ে যাবে তাই মালগুলো নেসাব পরিমাণ হয়েছে কিনা তা দেখা হবে না। এখানে জাকাতের মাল হওয়া শর্ত, জাকাতের পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। এজন্যই যদি কোনো ব্যক্তি এ মানত করে যে, আমার যাবতীয় মাল আমি সদকা করব। কিন্তু দেখা গেল যে, তার যে পরিমাণ

মাল সেই পরিমাণই ঋণ তাহলেও তার হাতে যে পরিমাণ জাকাতের মাল আছে সবই সদকা হয়ে যাবে। যদিও তার উপর কিছুতেই জাকাত ওয়াজিব নয়- বরং জাকাত গ্রহণ করা বৈধ এমতাবস্থায় সে যদি তার বর্তমান মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে ফেলে তাহলে সে যখন সেই পরিমাণ মাল উপার্জন করবে তখন তার উপর মানত পূরণ করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার যাবতীয় মালের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যায় তাহলে এ অসিয়ত তার কাছে যত ধরনের মাল আছে [চাই সেটা জাকাতের মাল হোক কিংবা জাকাত ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয় মাল হোক] সব ধরনের মালের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন– কারো ফসলি জমি, ঘরের আসবাবপত্র এবং খেদমতের গোলামও অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَهُ الخ : এরপর লেখক প্রথম মাসআলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি বলল, আমার মাল মিসকিনদের মাঝে সদকা। তখন সব ধরনের মালই সদকার অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা যুক্তির দাবি। চাই তা জাকাতের মাল হোক কিংবা অন্য কোনো মাল হোক। কেননা সে তার বিশেষ কোনো মালকে খাস করে কিছু বলেনি। তাই ইমাম যুফার (র.) মনে করেন তার সব মালই সদকা হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ মতই পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) মনে করেন তার পুরো মালের এক তৃতীয়াংশ সদকাহ হবে। তাঁদের দলিল রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস– রাসূল ﷺ -কে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) যখন বলেন, إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ نَخْلَعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً [অর্থাৎ আমি আমার সব মাল সদকা করে তাওবা করছি।] উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন, يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ 'তোমার জন্য এক তৃতীয়াংশ মাল সদকা করাই যথেষ্ট হবে' [এবং এতে তোমার মানত ও তাওবা পূরণ হয়ে যাবে]। এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেউ পুরো মাল সদকা করার মানত করলেও এক তৃতীয়াংশ সদকা করা ওয়াজিব হয় পুরো মাল সদকা করা আবশ্যক হয় না। এর জবাবে বলা হয় যে, এটি আসলে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর কোনো মানতই ছিল না; বরং তিনি এটা তাঁর তওবা কবুল হওয়ার আশায় বলেছিলেন। যেহেতু হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর এ উক্তিটি মানত নয় তাই এটা আলোচ্য মাসআলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল :

১. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মানত করল সে যেন তা পূরণ করে।

২. যৌক্তিক দলিল হলো– مَالٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এতে সব ধরনের মালই অন্তর্ভুক্ত। জাকাতের মালকে যেমন মাল বলা হয় তদ্রূপ অন্য মালকেও মাল বলা হয়। যেহেতু "মাল" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই সব ধরনের মালই সদকা -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন অসিয়তের ক্ষেত্রে সব মাল অন্তর্ভুক্ত হয়, কোনো মালই বাদ পড়ে না।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ الخ : ইমাম যুফার (র.) ব্যতীত আহনাফের অন্য তিন ইমামের দলিল হলো ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস। সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল হলো, বান্দা তার উপর মালের ক্ষেত্রে যা ওয়াজিব করল তাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওয়াজিব করার উপর কিয়াস করা হবে। অর্থাৎ বান্দার নিজের উপর সরাসরি কোনো কিছু ওয়াজিব করতে সক্ষম নয়; বরং বান্দা শরিয়তের উপর কিয়াস করে নিজের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব করতে সমর্থ হয়। সুতরাং যেসব স্থানে শরিয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিব করার বিধান এসেছে সেসব বিষয়গুলো বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করতে পারে, আর যেসব বিষয়ে বা স্থানে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো কিছুকে ওয়াজিব করা হয়নি, বান্দা সেসব বিষয়ে নিজের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব করতে পারবে না। আর শরিয়তে সব মালের উপর সদকা ওয়াজিব করেনি, আল্লাহ তা'আলার বাণী– خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ আপনি তাদের [বিশেষ] মালসমূহ থেকে সদকা [জাকাত] গ্রহণ করুন, আয়াতের মধ্যে সব ধরনের মালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদিও আয়াতের মধ্যে মাল (مَالٌ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল সদকা-এর ক্ষেত্রে মাল শব্দ দ্বারা সব ধরনের মাল উদ্দেশ্য হয় না। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ করেন যে, সর্বোত্তম জবাব হচ্ছে মাল শব্দটি সদকার ক্ষেত্রে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করা শরিয়ত সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا অর্থাৎ তোমরা সবকিছুকে দান করো না। কেননা তাহলে পরবর্তীতে বিষণ্ন-মলিন বদনে বসে থাকতে হবে। সুতরাং মালকে গুটিকতকের সাথে খাস করা আবশ্যক হবে। সারকথা হচ্ছে কেউ যদি সব মাল সদকা করার নিয়ত করে বা মানত করে তাহলে তার উক্ত মানত বা নিয়ত জাকাতের মালের উপর সীমাবদ্ধ হবে, সব মালের উপর নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, তাদের পেশকৃত হাদীস- مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ -এর জবাব হচ্ছে আমাদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি জাকাতের মাল আদায় করে তাহলে তো সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। সুতরাং এ হাদীস আমাদের বিপক্ষে দলিল নয়।

তাদের যৌক্তিক দলিল ছিল যে, অসিয়তের মধ্যে যেমন সব মালের অসিয়ত কার্যকর হয় তদ্রূপ সদকার ক্ষেত্রেও হবে। এর প্রথম উত্তর হলো, অসিয়তের উপর কিয়াস করা ঠিক হয়নি। কারণ যদি কোনো ব্যক্তি তার সব মাল অসিয়ত করে যায় আর তার ওয়ারিশ থাকে তাহলে তো সব মালের উপর অসিয়ত কার্যকর হয় না; বরং তার অসিয়ত এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হয়। অসিয়তের উপর কিয়াস সহীহ না হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, অসিয়ত শরিয়তের দৃষ্টিতে মিরাসের সমগোত্রীয়। কেননা মিরাস যেমন মৃত ব্যক্তির [মৃত্যুর পর] উত্তরাধিকারীদের জন্য প্রমাণিত হয় তদ্রূপ অসিয়তও মৃত্যুর পরই কার্যকর হয়। অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তার মালিকানা প্রমাণিত হয় না। তদ্রূপ উত্তরাধিকার প্রদানকারীর মৃত্যুর আগে উত্তরাধিকারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেহেতু অসিয়ত মিরাসের সদৃশ তাই অসিয়তের হুকুমও মিরাসের মতো হবে। অর্থাৎ মিরাস যেমন সর্বপ্রকার মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তদ্রূপ অসিয়ত সর্বপ্রকার মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মানতকারীর জাহেরী অবস্থা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, মানতকারী তার অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত মাল দান করারই ইচ্ছা করেছে- তার সমুদয় মাল দান করার মনস্থ করেনি। কারণ মানুষ তার জীবন পরিচালনা করতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং হাজারো প্রয়োজন সামনে থাকে। তাই তার দৈনন্দিন জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সামান বা আসবাবপত্র সে দান করতে পারে না। সুতরাং জাহেরী অবস্থার দাবি হলো, সে তার মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অন্য জিনিসগুলোই দান করবে। অতএব, পুরো মাল সদকা করার মানতের সময় তার জাকাতের মালগুলোই সদকা হবে, সব মাল নয়। তাই যেসব মাল জাকাতের মাল বলে গণ্য নয়, যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ব্যবহারিক আসবাবপত্র ইত্যাদি সদকা হবে না।

قَوْلُهُ أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَتَقَعُ فِيْ حَالِ الخ : এরপর লেখক অসিয়তের সাথে বৈসাদৃশ্যের আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেন। লেখক বলেন, অসিয়ত তো এমন সময় কার্যকর হয় যখন মানুষ মালের মুখাপেক্ষী থাকে না। কেননা অসিয়ত কার্যকর হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর। মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তার কোনোরূপ মালের প্রয়োজন থাকে না। এজন্য অসিয়ত সবধরনের মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যেহেতু তখন কোনো মালেরই প্রয়োজন থাকে না তাই অসিয়ত থেকে কোনো মাল বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। পক্ষান্তরে সদকা কার্যকর হওয়ার সময় [বর্তমান মাসআলায়] দাতার জীবদ্দশায়, দাতা তার মালের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, তাই তার সব মাল সদকা হবে না।

قَوْلُهُ وَتَدْخُلُ فِيْهِ الْأَرْضُ الخ : এ পর্যায়ে লেখক উশরী জমিন দানের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। লেখক বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সদকার মালের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বলে "আমার মাল মিসকিনদের মধ্যে সদকা করলাম, আর তার মালের মধ্যে উশরী জমি থাকে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উশরী জমিও সদকা হয়ে যাবে। কেননা উশরী জমি সদকা তথা উশর [ফসলের এক দশমাংশ] ওয়াজিব হওয়ার সবব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মনে করেন, উশরী জমির মাঝে যে উশর ওয়াজিব হয় তাতে সদকা বা জাকাতের দিকটি প্রবল। অর্থাৎ উশর একপ্রকার জাকাত। সুতরাং উশরী জমি জাকাতের মালের মতো হলো। জাকাতের মাল যেরূপ সদকা হয়ে যাবে তদ্রূপ উশরী জমিও সদকা হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরিউক্ত মানতের মাঝে উশরী জমি শামিল হবে না। সুতরাং উশরী জমি তাঁর মতে সদকা হবে না। তাঁর যুক্তি হলো, উশরী জমি সদকা বা জাকাত আদায়ের সবব নয়; বরং উশরী জমি আর্থিক দায় আদায়ের সবব। কেননা তাঁর মতে উশরের মধ্যে আর্থিক দায় -এর দিকটি প্রবল [সদকার দিক প্রবল নয়], ফলে উশরী জমি খেদমত নেওয়ার গোলামের মতো হয়ে গেল, খেদমতের গোলাম যেরূপ উপরিউক্ত মানত দ্বারা সদকা হয়ে যায় না তদ্রূপ উশরী জমিও সদকা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্ত মত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমর্থনপুষ্ট।

তবে খিরাজী জমি সকল ইমামের ঐকমত্যে উপরিউক্ত মানতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বলে, আমার সব মাল সদকা, আর তার মালের মাঝে খিরাজী জমি থাকে তাহলে তা সদকা হবে না। কেননা খিরাজ মানেই আর্থিক দায়। কেননা খিরাজ প্রদান করে অমুসলিম জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ জনগণ এবং খিরাজ ব্যয় করা হয় মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে, অথচ সেনাবাহিনীর মাঝে সম্পদশালী লোকজনও থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, খিরাজ হচ্ছে আর্থিক দায়মাত্র। তাই তা সদকার মাঝে কিছুতেই অন্তর্ভুক্ত হবে না।

খিরাজ আর্থিক দায় হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো যে, খিরাজী জমি যদি কোনো নাবালেগ শিশুর আয়ত্তে বা মালিকানাধীন থাকে তাহলেও তাতে খিরাজ আরোপিত হয়, এমনকি ওয়াকফ করা খিরাজী জমিতেও খিরাজ আরোপিত হয়।

وَلَوْ قَالَ : مَا اَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فِى الْمَسَاكِيْنِ فَقَدْ قِيْلَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَالٍ، لِاَنَّهُ اَعَمُّ مِنْ لَفْظِ الْمَالِ، وَالْمُقَيَّدُ اِيْجَابُ الشَّرْعِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِلَفْظِ الْمَالِ، وَلَا مُخَصِّصَ فِى لَفْظِ الْمِلْكِ، فَبَقِىَ عَلَى الْعُمُوْمِ، وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُمَا سَوَاءٌ، لِاَنَّ الْمُلْتَزَمَ بِاللَّفْظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنِ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، ثُمَّ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَا دَخَلَ تَحْتَ الْاِيْجَابِ يُمْسِكُ مِنْ ذٰلِكَ قُوْتَهُ، ثُمَّ اِذَا اَصَابَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِمَا اَمْسَكَ، لِاَنَّ حَاجَتَهُ هٰذِهِ مُقَدَّمَةٌ، وَلَمْ يَقْدِرْ بِشَيْءٍ لِاِخْتِلَافِ اَحْوَالِ النَّاسِ فِيْهِ، وَقِيْلَ الْمُحْتَرِفُ يُمْسِكُ قُوْتَهُ لِيَوْمٍ، وَصَاحِبُ الْغَلَّةِ لِشَهْرٍ وَصَاحِبُ الضِّيَاعِ لِسَنَةٍ عَلَى حَسْبِ التَّفَاوُتِ فِى مُدَّةِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْمَالِ، وَعَلَى هٰذَا صَاحِبُ التِّجَارَةِ يُمْسِكُ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ مَالُهُ

অনুবাদ : যদি কেউ বলে, আমি যেসব মালের মালিক সব মিসকিনদের মাঝে সদকা। তাহলে কেউ কেউ বলেন, এতে সব মাল অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মাল (مَالٌ) শব্দ থেকে "আমার মালিকানাধীন" কথাটি অধিকতর ব্যাপক। [পূর্ববর্তী মাসআলায়] মালকে সীমাবদ্ধকারী হলো শরিয়তের ওয়াজিবকরণ আর তা [শরিয়তের ওয়াজিবকরণ] মাল শব্দের সাথে খাস। কিন্তু মালিকানা (مِلْكٌ) শব্দটির সীমাবদ্ধকারীতো কিছু নেই। সুতরাং তা তার ব্যাপক অর্থে বহাল থাকবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো এ দুটি শব্দই (مَالٌ وَمِلْكٌ) একই পর্যায়ের। কেননা শব্দ দুটি দ্বারা যা আবশ্যক করা হয়েছে তা হলো বাড়তি মাল যার আলোচনা পিছনে করা হয়েছে। অতঃপর যদি তার কাছে ওয়াজিবকরণের অন্তর্ভুক্ত মাল ছাড়া অন্য মাল না থাকে তাহলে সে ঐ মাল থেকেই তার প্রয়োজনীয় আহার্য রেখে দেবে। তার যখন মাল উপার্জিত হবে, যা রেখে দিয়েছিল সেই পরিমাণ সদকা করে দেবে। কেননা তার [আহার্যের অভাব পূরণের] এ প্রয়োজনটি [সদকার চেয়ে] অগ্রগণ্য। আর মানুষের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। কেউ কেউ বলেন, পেশাজীবী [খেটে খাওয়া মানুষ] একদিনের আহার্য রাখবে। মাসিক রোজগারকারী একমাসের খোরাক রাখবে। আর ক্ষেত-খামারের মালিক একমাসের খোরাক রাখবে। অর্থাৎ তাদের হাতে অর্থকড়ি পৌঁছার ভিত্তিতে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তদ্রূপ ব্যবসায়ী তার পুঁজি ফেরত আসার পরিমাণ সময়ের মাল নিজের কাছে রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مَا اَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ الخ : উক্ত ইবারতে পূর্বে বর্ণিত মাসআলাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাসআলাটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল এভাবে যে, যদি কেউ বলল– مَالِىْ فِى الْمَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ [আমার মাল মিসকিনদের মাঝে সদকা]। বর্তমান ইবারতে সামান্য ভাষাগত পরিবর্তন করে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ বলে– مَا اَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فِى الْمَسَاكِيْنِ [আমি যেসব জিনিসের মালিক সবই সদকা] তাহলে উক্ত মানতকারী ব্যক্তির কি পরিমাণ মাল সদকা হবে? সম্পূর্ণ মাল নাকি জাকাতের মাল এ ব্যাপারে মাশায়েখে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মাশায়েখের অভিমত হলো,

এই মানতকারীর যাবতীয় মাল সদকা হয়ে যাবে। অর্থাৎ مَا اَمْلِكُ বাক্যের মাঝে সব ধরনের মাল অন্তর্ভুক্ত হবে। জাকাতের মাল যেমন অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ জাকাত ওয়াজিব হয় না এমন মালও অর্ন্তভুক্ত। এক কথায় মানতকারীর কোনো মালই এই মানত থেকে বাদ পড়বে না। তাদের দলিল হলো, মাল শব্দ থেকে মিল্ক (مِلْك) শব্দটি ব্যাপকতর। কেননা মাল শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র মাল জাতীয় দ্রব্যকে বুঝানো হয়। পক্ষান্তরে মিল্ক শব্দটি মাল জাতীয় এবং মাল জাতীয় নয়- উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন বলা হয়- مِلْك نِكَاحْ ، مِلْك مُتْعَةْ ও مِلْك قِصَاصْ ইত্যাদি। অথচ نِكَاحْ বা বিবাহ, قِصَاصْ ও মুতা বিবাহ (نِكَاحْ مُتْعَةْ) ইত্যাদির কোনোটাই মাল নয়, সুতরাং বুঝা গেল মিল্ক শব্দটি মাল শব্দ থেকে ব্যাপকতর এবং মিল্ক শব্দের মধ্যে মাল ও মাল নয় এমন সব প্রকারকে শামিল করার যোগ্যতা রয়েছে। শব্দের এ ব্যাপকতা বাস্তবে কার্যকর করার জন্য জাকাতের মাল ছাড়া অন্যান্য মালকেও এর মধ্যে শামিল করা দরকার। যেহেতু মাল শব্দটি ব্যবহার করা হলে জাকাতের মাল শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত হয় সেহেতু مِلْك শব্দটি ব্যবহার করা হলে জাকাতের মাল ও অন্যান্য মাল সবই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং যদি কেউ বলে, আমি যা কিছুর মালিক তার সবই সদকা তাহলে মানতকারীর সব মালই সদকা হয়ে যাবে- শুধুমাত্র জাকাতের মাল সদকা হবে এমন নয়।

قَوْلُهُ وَالْمُقَيَّدُ اِيْجَابُ الشَّرْعِ الخ : এ ইবারতটি মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, মাল শব্দ দ্বারা মানত করা হলে মাল শব্দটি জাকাতের মালের সাথে শরিয়তের ওয়াজিবকরণের ভিত্তিতে খাস ও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মিলক (مِلْك) শব্দ দ্বারা যাবতীয় মাল সদকা করা হলে তা সদকার মালের বা জাকাতের মালের সাথে খাস হবে না কেন ? অর্থাৎ মালের ক্ষেত্রে শরিয়তের ওয়াজিবকরণের বিষয়টি মূল বিবেচনায় রাখা হলো কিন্তু মিল্ক শব্দের ক্ষেত্রে শরিয়তের ওয়াজিবকরণের বিষয়টি কেন বিবেচনায় আনা হলো না।

কতিপয় মাশায়েখের উপর আরোপিত এ প্রশ্নের জবাবে লেখক বলেন, সদকার মাল কথাটিকে জাকাতের মালের সাথে শরিয়ত খাস ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। শরিয়তের এ সীমাবদ্ধকরণ শুধুমাত্র মাল (مَالٌ) শব্দের সাথেই খাস। যেমন- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আয়াতে মাল দ্বারা জাকাতের মাল বুঝানো হয়েছে। তদ্রূপ রাসূল ﷺ-এর হাদীস هَاتُوْا رُبْعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের জাকাতের মালের চল্লিশভাগের একভাগ জাকাত প্রদান কর।' এ হাদীসেও মাল দ্বারা জাকাতের মালকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল মাল শব্দটিকে শরিয়ত জাকাতের মালের সাথে খাস করেছে। পক্ষান্তরে مِلْك বা মালিকানা শব্দটি জাকাতের মালের সাথে খাস- এ ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ থেকে খাস করার বা সীমাবদ্ধ করার কোনো নীতি নেই। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের কোনো বক্তব্য দ্বারা مِلْك বা মালিকানা শব্দটি জাকাতের মালের সাথে খাস এমন কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না। যেহেতু مِلْك শব্দটিকে জাকাতের মালের সাথে খাস করার কোনো দলিল কুরআন-হাদীসে নেই। সুতরাং مِلْك শব্দটি তার আভিধানিক ব্যাপকতা নিয়ে স্বমূর্তিতে বহাল থাকবে। উপরিউক্ত আলোচনার ফলাফল হলো, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে কিংবা মানত করে বলে "আমি যা কিছুর মালিক সবই সদকা" তাহলে তার জাকাতের মাল এবং জাকাতের মাল ছাড়া অন্যসব মাল ও সদকা হয়ে যাবে। সব মাল সদকা না করার আগ পর্যন্ত তার মানত পুরো হবে না।

قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُمَا سَوَاءٌ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক এ ব্যাপারে তাঁর নিজের মন্তব্য উপস্থাপন করছেন। লেখক বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো, مَالٌ ও مِلْك উভয় শব্দ একই পর্যায়ের। মালের দ্বারা যেমন জাকাতের মাল উদ্দেশ্য, তদ্রূপ মালিকানার দ্বারাও জাকাতের মালই উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং مَالِىْ فِى الْمَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ বাক্য দ্বারা জাকাতের মাল যেমন উদ্দেশ্য, তদ্রূপ مَا اَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فِى الْمَسَاكِيْنِ দ্বারাও জাকাতের মালই উদ্দেশ্য। এর দলিল হলো, মানতকারী তার নিজের উপর তার প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি মালগুলোই জাকাত দেওয়ার ইচ্ছা করেছে, তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সদকা করার ইচ্ছা

করেনি। কেননা মানুষ তার সবকিছু সদকা দেয় না এবং এরূপ দান করা শরিয়তে নিষিদ্ধও বটে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا অর্থাৎ "আর তুমি সবকিছু দান করে দিয়ো না, তাহলে তুমি পরবর্তীতে আফসোস করবে এবং বিষণ্ন বদনে বসে থাকবে।" যাহোক লেখকের মতে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে مَالٌ ও مِلْكٌ উভয় শব্দের ভাব এক। যে কোনো শব্দ দ্বারা সদকা করা হলে জাকাতের মালের বেশি সদকা হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ الخ : এরপর লেখক আরেকটি বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন। বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি মানত করল যে, তার পুরো মাল সদকা করবে, তারপর দেখা গেল যে, তার সদকার মাল ছাড়া অন্য কোনো মাল নেই- যার সাহায্যে সে দিনাতিপাত করবে। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যদি সে যাবতীয় মাল সদকা করে দেয় তাহলে তাকে অভুক্ত থাকতে হবে এবং নিজ অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। আর এটা যে কারো জন্যই অমানবিক যে, সে তার যাবতীয় মাল সদকা করে দিয়ে সে নিজেই খাবারের খোঁজে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে। এজন্য এমন ব্যক্তির জন্য করণীয় হলো, সে তার অতি প্রয়োজনীয় মাল নিজের কাছে রেখে বাকি মাল দান করে দেবে। এরপর যখন সে পুনরায় সম্পদশালী হবে তখন তার কাছে যে পরিমাণ মাল রেখে দিয়েছিল তা দান করে তার মানত আদায় করবে। তবে প্রশ্ন হলো মানতকারী তার কাছে কি পরিমাণ মাল রাখবে? এ প্রসঙ্গে হিদায়ার লেখক বলেন, কি পরিমাণ মাল রাখবে এ ব্যাপারে মাবসূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। কেননা একেক মানুষের একেক ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে। কারো সন্তান কম, কারো বেশি, কারো খরচ বেশি, কারো কম, মোটকথা মানুষের অভাব বিভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে মালের নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

তবে কতিপয় মাশায়েখ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, ১. পেশাজীবী মানুষ যারা প্রতিদিনের কাজের জন্য প্রতিদিন মজুরি পায়, দিনমজুর যারা দিন আনে দিন খায় এমন ধরনের লোক তারা তাদের একদিনের খাবার বা একদিনের প্রয়োজনীয় সামান নিজের কাছে রাখবে, আর বাকি সব সামান দান করে দেবে।

২. যাদের আয় মাসিকভাবে হয়, যেমন মাসিক বেতনে চাকরি করে, ঘর/ দোকান ভাড়া দিয়ে রেখেছে মাসান্তে ভাড়া তুলে সংসার চালায়, এমন ব্যক্তি একমাসের পরিমাণ খাবারদাবার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রেখে বাকিটা সদকা করে দেবে।

৩. ভূ-সম্পত্তির মালিক, যেমন ফসলি জমির ও বাগানের মালিক, ফসল ও বাগানের ফলফলাদি তার উপার্জনের মাধ্যম এমন ব্যক্তি এক বছর চলতে পারে এমন সম্পদ রেখে বাকি মাল সদকাহ করে দেবে। কেননা সারা বছরে একবার ফসল উঠার বিষয়টি নিশ্চিত। এজন্য সারা বছরের খোরাকি রেখে বাকি মাল দান করে দেবে।

মোটকথা হলো, অর্থসম্পদ হস্তগত হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের যে পার্থক্য সেই ভিত্তিতে পরিমাণ মতো মাল হাতে রেখে অবশিষ্ট মাল দান করবে। যদি কেউ মনে করে আগামী পাঁচ মাস আমার হাতে অর্থকড়ি আসবে না- তাহলে সে পাঁচ মাসের খোরাকি রেখে বাকি মাল দান করবে। আর যদি মনে করে তিনদিন পরেই হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ চলে আসবে, তাহলে সে তিনদিনের খোরাকি রেখে বাকি মাল সদকা করবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ী ততদিনের খোরাকি রাখবে, যতদিন তার ধারণা অনুযায়ী তার হাতে মাল আসবে না।

قَالَ : وَمَنْ اَوْصٰى اِلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوَصَايَةِ حَتّٰى بَاعَ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ فَهُوَ وَصِيٌّ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيْلِ حَتّٰى يَعْلَمَ، وَعَنْ اَبِيْ يُوسُفَ (رحـ) اَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ اَيْضًا . لِاَنَّ الْوَصَايَةَ اِنَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَتُعْتَبَرُ بِالْاِنَابَةِ قَبْلَهُ، وَهِيَ الْوَكَالَةُ، وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ اَنَّ الْوَصَايَةَ خِلَافَةٌ لِاِضَافَتِهَا اِلٰى زَمَانِ بُطْلَانِ الْاِنَابَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ، كَمَا فِيْ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ، اَمَّا الْوَكَالَةُ فَاِنَابَةٌ لِقِيَامِ وَلَايَةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يَفُوتُ النَّظَرُ لِقُدْرَةِ الْمُوَكِّلِ، وَفِي الْاَوَّلِ يَفُوتُ لِعَجْزِ الْمُوصِيْ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কাউকে অছি নিযুক্ত করা হয়, আর সে তার নিযুক্তি সম্পর্কে অবগত না হয়– এমতাবস্থায় যদি সে উত্তরাধিকার থেকে কোনো কিছু বিক্রি করে দেয় তাহলে অছি সাব্যস্ত হবে। আর তার এ বিক্রয় বৈধ বিবেচিত হবে। কিন্তু উকিল যদি তার দায়িত্বপ্রাপ্তির কথা না জেনে বিক্রি করে দেয় তাহলে তার বিক্রি বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অছির জন্যও তার অসিয়ত সম্পর্কে না জেনে বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা অসিয়ত হচ্ছে মৃত্যুর পর স্থলবর্তী হওয়া। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে স্থলবর্তী হওয়ার উপর কিয়াস করা হবে, আর মৃত্যুর পূর্বে স্থলবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে উকিল হওয়া। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো, অসিয়তের অর্থ হচ্ছে অন্যকে নিজের পূর্ণ স্থলাভিষিক্ত করা বা খলিফা নিযুক্ত করা। কেননা এর সম্পর্ক এমন এক সময়কালের সাথে, যাতে সাময়িক স্থলবর্তীতা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং তা অবগতির উপর নির্ভর করবে না। যেমন উত্তরাধিকারীর হস্তক্ষেপ অবগতির উপর নির্ভরশীল নয়। আর উকিল নিযুক্তির অর্থ হচ্ছে– সাময়িক স্থলবর্তী করা। কেননা এতে যার স্থলবর্তী হয়েছে তার কর্তৃত্ব বহাল থাকে। সুতরাং এটা [উকিলের] অবগতির উপর নির্ভরশীল। এমন হুকুমের কারণ হলো, উকিলের নিযুক্তি যদি তার অবগতির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে উকিল নিয়োগকারীর কর্তৃত্ব থাকাতে তার স্বার্থ-কল্যাণ বিনষ্ট হয় না, পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলায় অছি নিয়োগকারীর অক্ষমতার কারণে কোনো কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে [যদি অছির নিযুক্তি অবগতির উপর নির্ভরশীল হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ اَوْصٰى اِلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

মাসআলার দুটি অংশ। প্রথম অংশটি হচ্ছে অসিয়ত সম্পর্কে অবগত না হয়েও অছি সাব্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে উকালত সম্পর্কে অবগত না হয়ে উকিল সাব্যস্ত হবে না।

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তিকে কেউ অছি বা তার ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করল, কিন্তু যাকে অছি নিয়োগ করা হয়েছে সে তার নিযুক্তির সম্পর্কে অবগত নয়। এরপর যখন নিয়োগকারী মারা গেল তখন সে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্য থেকে কোনো কিছু বিক্রি করে দিল। তাহলে সে অছিরূপে বিক্রয়কারী সাব্যস্ত হবে এবং তার বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ নিযুক্ত ব্যক্তির

অনবগতি সত্ত্বেও তার বিক্রি বৈধ এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অছিরূপেই বৈধ। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো কিছু বিক্রি করার উকিল নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু যাকে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে সে তার নিয়োগ সম্পর্কে না জেনে নিয়োগকারীর কোনো দ্রব্য বিক্রি করে ফেলে তাহলে তার বিক্রি বৈধ হবে না এবং সে অনবগত অবস্থায় উকিলও সাব্যস্ত হবে না।

উপরিউক্ত বর্ণনাটি স্বাভাবিকভাবেই জাহেরী রেওয়ায়েতের অন্তর্গত।

জাহেরী রেওয়ায়েতের বাইরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মত এমন রয়েছে যে, অবগতি ছাড়া অসিয়তও বৈধ নয়। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি তার অছির নিযুক্তি সম্পর্কে অবগত না হয় আর সে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করে দেয় তাহলে তার বিক্রি বৈধ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অনবগত অবস্থায় উকালত এবং অসিয়তের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, আর জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক জাহেরী রেওয়ায়েতের দলিল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, অছি নিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে স্থায়ী স্থলবর্তী বা খলিফা নিযুক্ত করা। [স্থায়ী স্থলবর্তী] বা মৃত্যুর পর স্থলবর্তী হওয়াকে খলিফা বলা হয়। পক্ষান্তরে সাময়িক স্থলবর্তী বা জীবদ্দশায় স্থলবর্তী নিযুক্ত হওয়াকে নায়েব (نَائِبٌ) বলা হয়। অছী স্থায়ী স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হয়, কারণ অছি হওয়া এমন এক সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যে সময় সাময়িক স্থলবর্তী [নায়েব] বানানো যায় না। এর সরল অর্থ হচ্ছে– অসিয়তের দায়িত্ব অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তির নায়েব হওয়া সম্ভব নয়। কেননা নায়েব তার মনিবের [স্থলবর্তীকারী] -এর এখতিয়ার বলে কাজ করে। আর মনিব মারা যাওয়ার কারণে তার কোনো এখতিয়ার নেই। অতএব, বুঝা গেল যে, অসিয়ত হলো খিলাফত, সাময়িক স্থলবর্তী করা নয়। খিলাফত বা স্থায়ী স্থলাভিষিক্তকরণের মাঝে খলিফার হস্তক্ষেপের জন্য অবগতির প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির খলিফা হওয়ার জন্য তার দায়িত্বপ্রাপ্তি বা নিয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং কোনো অছি যদি তার অছিরূপে দায়িত্ব প্রাপ্তির সংবাদে অবগত না হয় এবং অনবগত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পদের মাঝে বেচাকেনার মাধ্যমে কোনো হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে। যেমন– উত্তরাধিকারী ব্যক্তি তার উইলকারী পূর্বপুরুষ (مُوَرِّثٌ) -এর সম্পত্তিতে কোনো হস্তক্ষেপ করল। যেমন, সে তার রেখে যাওয়া কোনো সম্পদ বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় যদি উত্তরাধিকারী তার উইলকারী (مُوَرِّثٌ) -এর মৃত্যুর সংবাদ নাও জানে তবুও তার এ হস্তক্ষেপ বৈধ হবে। উত্তরাধিকারী ও অছি একই পর্যায়ের। উভয়ের জন্য তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয়ে হস্তক্ষেপ করা বৈধ।

قَوْلُهُ أَمَّا الْوَكَالَةُ فَاِنَابَةٌ لِقِيَامِ الخ : লেখক বলেন, উকিল তার নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে সাধারণ ও সাময়িক স্থলবর্তী হয়। এ ধরনের স্থলবর্তী হওয়াকে নায়েব (نَائِبٌ) বলা হয়। নায়েব তার নিয়োগদাতার পক্ষে তার জীবদ্দশায় এবং তারই এখতিয়ার নিয়ে কাজ করে। আর উকিল তার নিয়োগকারীর মৃত্যুর দ্বারা এমনিতেই বরখাস্ত হয়ে যায়।

মোটকথা উকিলের দায়িত্ব তার অবগতির উপর নির্ভরশীল। যদি উকিল তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না হয় তাহলে সে তার নিয়োগকারীর স্থলবর্তী হবে না। আর উকিলের যে কোনো হস্তক্ষেপের জন্যও উকিল সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি। এ অবগতির উপর নির্ভরশীল হওয়ার দলিল হলো, যদি উকিলের দায়িতপ্রাপ্তি তার অবগতির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে কোনো কল্যাণ ও স্বার্থ বিনষ্ট হবে না। কেননা তার নিয়োগদাতা বা মুয়াক্কিল সরাসরি হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে এবং তার কর্তৃত্ব বহাল থাকে। উদাহরণস্বরূপ যদি উকিল তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না হয়, আর এদিকে কোনো একটি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় মুয়াক্কিল নিজেই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে তাহলে তার স্বার্থ নষ্ট হলো না। পক্ষান্তরে অছির দায়িত্ব যদি তার অবগতির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে কল্যাণ ও স্বার্থ বিনষ্ট হতে পারে। কেননা অছি নিযুক্তকারী নিজে এখানে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম। সে এখন মৃত। যেহেতু শুধুমাত্র অছি হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে, এমতাবস্থায় যদি তার হস্তক্ষেপ তার অবগতির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে কল্যাণ বিনষ্ট হতে পারে। অথচ অছির নিযুক্তি কল্যাণ হাসিল করার জন্য। বিষয়টি বিবেচনা করে শরিয়ত উকালতের দায়িত্ব পালনের জন্য উকিলের অবগতিকে শর্ত করেছে। অপর দিকে অছির দায়িত্ব পালনের জন্য অসিয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার শর্ত করেনি।

وَمَنْ اَعْلَمَهُ مِنَ النَّاسِ بِالْوَكَالَةِ يَجُوْزُ تَصَرُّفُهُ، لِاَنَّهُ اِثْبَاتُ حَقٍّ لَا اِلْزَامُ اَمْرٍ قَالَ : وَلَا يَكُوْنُ النَّهْىُ عَنِ الْوَكَالَةِ حَتّٰى يَشْهَدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ اَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالَا : هُوَ وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ لِاَنَّهُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، وَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِيْهَا كِفَايَةٌ، وَلَهُ اَنَّهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ فَيَكُوْنُ شَهَادَةً مِنْ وَجْهٍ، فَيُشْتَرَطُ اَحَدُ شَطْرَيْهَا، وَهُوَ الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ، وَبِخِلَافِ رَسُوْلِ الْمُوَكِّلِ، لِاَنَّ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْاِرْسَالِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا اَخْبَرَ الْمَوْلٰى بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ، وَالشَّفِيْعُ وَالْبِكْرُ وَالْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَمْ يُهَاجِرْ اِلَيْنَا ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি একটি লোকের মুখে তার উকিল নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ পায়, তাহলে তার হস্তক্ষেপ করা বৈধ। কেননা এটা হক সাব্যস্ত করা, কোনো বিষয় আবশ্যক (لَازِمْ) করা নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকালতের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হবে না, যে পর্যন্ত দুজন সাক্ষী কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য না দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, উকিলের নিযুক্তি ও তার বরখাস্ত হওয়া [এর বিধান] একই পর্যায়ের। কেননা উভয়টি মুয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুয়ামালাতের মাঝে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এটা একটা বাধ্যতামূলক সংবাদ। সুতরাং এটা এক ধরনের সাক্ষ্য। সুতরাং এতে দুশর্তের একটি আরোপিত হবে, হয় সংখ্যা-নতুবা ন্যায়পরায়ণতা। প্রথম অবস্থাটি এরূপ নয়। মুয়াক্কিলের দূতের ব্যাপারও এমন নয়। কেননা দূত প্রেরণের প্রয়োজনের নিমিত্তে দূতের বক্তব্য দূতপ্রেরণকারীর বক্তব্যের পর্যায়ে ধরা হয়েছে। একই মতবিরোধ রয়েছে যদি মনিবকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, তার গোলাম অপরাধ করেছে, তদ্রূপ যদি শফী, কুমারী মেয়ে ও এমন মুসলমান যে দারুল হারব থেকে হিজরত করেনি, তাদের সংবাদ দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَعْلَمَهُ مِنَ النَّاسِ الخ : আলোচ্য ইবারতে উকিল নিয়োগ ও বরখাস্ত করার বিষয়ে কতজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য এবং এ বিষয়ে কি শর্ত রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, উকিলের নিয়োগ কার্যকর হওয়ার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির তার নিয়োগ সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি, আর অবগত হওয়ার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সংবাদ বা খবর, এ প্রসঙ্গেই প্রথম মাসআলাটি আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো একজন সাধারণ [প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি] সংবাদ দেয় যে, তাকে অমুক ব্যক্তি উকিল নিযুক্ত করেছে- তাহলেই তার নিযুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। উক্ত সংবাদ জানার পর উকিল যেসব কাজ করবে সবই বৈধ সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যদি এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর উকিল তার মুয়াক্কিলের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে সেই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اِثْبَاتُ حَقٍّ لَا اِلْزَامُ اَمْرٍ الخ : একজনের সংবাদ যথেষ্ট হওয়ার পক্ষে দলিল হলো, উকিল হওয়ার সংবাদ দ্বারা একটি হক সাব্যস্ত করা হচ্ছে, এর দ্বারা কোনো বিষয়কে লাযেম বা আবশ্যক করা হচ্ছে না। অর্থাৎ উক্ত সংবাদ দ্বারা উকিলের উপর কোনো কিছু আরোপিত হয় না; বরং এর দ্বারা মুয়াক্কিলের মালের মাঝে উকিলের হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ হয়। নিয়মানুযায়ী হক সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সংবাদ যথেষ্ট হয়। অতএব, উকিলের হস্তক্ষেপের বৈধতার জন্য এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট।

শামসুল আইম্মাহ (র.)-এর উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুয়ামালাতের মাঝে কোনো কিছু লাযেম করা হয় না। যেমন– উকিল নিয়োগ করা, মুযারাবা ও গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি। এতে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে উকিল নিয়োগ করা ও উকিল বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সংবাদ যথেষ্ট নয়। তাঁরা বলেন, যেহেতু এটা মুয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত তাই এতে শাহাদাত বা সাক্ষ্যদানের শব্দ ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা নেই।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَكُونُ النَّهْيُ عَنِ الْوَكَالَةِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে উকিলের বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে কতজনের সংবাদ জরুরি? লেখক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে উকিলের বরখাস্ত বা পদচ্যুতি কার্যকর হবে না যে পর্যন্ত দুজন ব্যক্তি কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার সামনে সাক্ষ্য প্রদান না করে।

উল্লেখ্য যে, লেখক যদিও এখানে সাক্ষ্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদ ও খবর। কেননা কাযীখান (র.) উল্লেখ করেন যে, এতে সাক্ষ্যদানের শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। সারকথা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উকিলের বরখাস্ত হওয়ার জন্য দুজন সাধারণ মানুষের কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ জরুরি।

قَوْلُهُ وَقَالَا هُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মতে, বরখাস্ত হওয়া ও উকিল নিযুক্ত হওয়া উভয় ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

তাদের দলিল হলো, উকিল বরখাস্ত করা মুয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর মুয়ামালাতের মাঝে একজনের সংবাদ যথেষ্ট। সুতরাং উকিল নিযুক্তির মত এতেও এক ফাসিকের সংবাদ যথেষ্ট হবে। যেমন গোলামের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতির জন্য এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট।

দীনিয়াতের বিষয়টি এমন নয়। কেননা তা দুজন ফাসিকের সংবাদ দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। সুতরাং একজনের সাক্ষ্য দ্বারা তো কিছুতেই তা প্রমাণিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ فَيَكُونُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বরখাস্ত হওয়ার খবর একটি লাযেমকারী খবর। যেহেতু এতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তাই এটা খবর বা সংবাদ। আর খবরটি মুলযিম বা লাযেমকারী হওয়ার দলিল এই যে, এটা হস্তক্ষেপ করার অবৈধতাকে আবশ্যক বা লাযেম করে। খবরটি লাযেমকারী হওয়ার কারণে খবরটি এক হিসেবে শাহাদাত বা সাক্ষ্যদানের মতো হয়ে গেছে, যদিও পূর্ণাঙ্গভাবে এটা সাক্ষ্যদান নয়। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে দুটি শর্তারোপ করা হয়, যথা সংখ্যার দিক থেকে একাধিক হওয়া ও সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া। যেহেতু আলোচ্য সংবাদটি একাংশের সাক্ষ্যদানের মতো। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এতে সাক্ষ্যদানের দুশর্তের একটি শর্তকে আরোপ করেন। তাঁর মতে, উক্ত সংবাদ দুজন ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ হয় দুজন লাগবে অথবা ন্যায়পরায়ণ হওয়া লাগবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَبِخِلَافِ رَسُولِ الْمُوَكِّلِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উকিল নিযুক্তির সংবাদটি এমন নয়। কেননা এতে লাযেম করার মতো কিছুই নেই। যেহেতু এতে লাযেম করার কিছু নেই তাই এটা সাক্ষ্যদানের মত হবে না। সাক্ষ্যদানের মত না হওয়াতে এতে সাক্ষ্যদানের কোনো শর্ত আরোপ করা হবে না। অর্থাৎ এখানে দুজন সাক্ষী হওয়ার কিংবা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত করা হবে না। সুতরাং উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর সংবাদই যথেষ্ট। এমনকি এতে ফাসিকের সাক্ষ্যও চলবে। অনুরূপভাবে উকিল নিয়োগকারী যদি তার একজন বার্তাবাহককে উকিলের কাছে এ সংবাদ দিয়ে পাঠায় যে, উকিলকে বরখাস্ত করা হলো তাহলে উক্ত বার্তাবাহক বা দূতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের কোনো শর্ত আরোপিত হবে না। একজন দূতের সংবাদের মাধ্যমে উকিল বরখাস্ত সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, দূতের-বার্তাবাহকের সংবাদ প্রকারান্তরে মুয়াক্কিলেরই সংবাদ। বার্তাবাহক তো উকিল নিয়োগকারীর বরখাস্ত করার সংবাদটি পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং যেন উকিল নিয়োগকারীই তাকে সংবাদ দিল। নিয়োগকর্তার উপস্থিতি অবস্থায় যেমন কোনো সংখ্যা কিংবা ন্যায়পরায়ণতার শর্ত লাগে না তদ্রূপ নিয়োগকারী দূতের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজন হবে না, তাছাড়া সংবাদ পৌঁছানোর সময় উপযুক্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলে উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। অথচ অনেক সময় দূত বা বার্তাবাহক প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরও চারটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যাতে উপরিউক্ত মাসআলার মতো ইমাম আযম (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

চারটি মাসআলার প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে, যদি কোনো গোলামের মালিককে তার গোলাম সম্পর্কে এ সংবাদ দেওয়া হয় যে, তার গোলাম কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করেছে কিংবা কারো মাল বিনষ্ট করে দিয়েছে তাহলে গোলামের মালিকের উপর সেই গোলাম দিয়ে দেওয়া কিংবা তার ফিদিয়া প্রদান করা আবশ্যক হবে। আলোচ্য মাসআলায় যদি গোলামের মনিবকে দুজন সাক্ষী কিংবা এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তার মনিব গোলামটিকে আজাদ করে দেয় কিংবা বিক্রি করে দেয় তাহলে মনিব তার গোলামের ক্ষেত্রে ফিদিয়ার পথ গ্রহণ করেছে বলে সাব্যস্ত হবে। এটা সব ইমামের মতের বা ঐকমত্যের মাসআলা।

পক্ষান্তরে যদি এক ফাসিক এসে মনিবের কাছে তার গোলামের অপরাধের খবর জানায় আর মনিব খবরটির সত্যতা স্বীকার করে তাহলে একই হুকুম। কিন্তু যদি সংবাদটির সত্যতা স্বীকার না করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মনিবের বিক্রি বা আজাদ করে দেওয়া তার ফিদিয়া গ্রহণ করে নেওয়া সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ফিদিয়া গ্রহণ করে নেওয়া সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এক ফাসিকের সংবাদের দ্বারা গোলামের অপরাধ সাব্যস্ত হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এক ফাসিকের সংবাদ দ্বারাই অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, শুফআর হকের অধিকারী (شَفِيْع) -কে যদি দুজন কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি জমি বিক্রির সংবাদ দেয় আর সে সংবাদ শুনে চুপ থাকে তাহলে তার শুফআর হক বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তাকে এক ব্যক্তি জমি বিক্রির সংবাদ দেয় তারপর সে চুপ থাকে তাহলে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তার শুফআর হক বাতিল হবে না। কারণ এক ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা বিক্রিই প্রমাণিত হয়নি, বিক্রি প্রমাণিত না হওয়ায় চুপ থাকার দ্বারা তার শুফআহ বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, যেহেতু একজনের সংবাদ বিক্রি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, আর সংবাদ শোনার পর শফী চুপ থেকেছে তাই তার শুফআহ বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয় মাসআলা হলো, কুমারী কন্যা যখন সংবাদ পেল যে, তার অভিভাবকগণ/ কোনো অভিভাবক তাকে বিবাহ দিয়েছেন। তারপর সে চুপ রইল। যদি কুমারী মেয়েটি সংবাদ দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাধ্যমে শুনতে পাবে তখন তার চুপ থাকার কারণে সব ইমামের ঐকমত্যে তার সম্মতি সাব্যস্ত হবে। আর যদি উক্ত সংবাদ কোনো এক [ফাসিক] ব্যক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় তাহলে চুপ থাকার দ্বারা সম্মতি হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে পূর্বোক্ত মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এক ব্যক্তির সংবাদ শোনার পর চুপ থাকার দ্বারা সম্মতি সাব্যস্ত হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সম্মতি সাব্যস্ত হবে।

চতুর্থ মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রে (دَارُ الْحَرْبِ) মুসলমান হয়েছে; কিন্তু হিজরত করে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে আসেনি। যদি এমন মুসলমানকে দুজন মুসলমান/ একজন ন্যায়পরায়ণ ইসলামের ফরজ বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত করায় তাহলে সব ইমামের মতে, উক্ত বিধিবিধানগুলো মেনে নেওয়া তার উপর আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো একজন ফাসিক মুসলমান উক্ত সংবাদ তাকে দেয় তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, তা মেনে নেওয়া অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানের জন্য আবশ্যক হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আবশ্যক হবে না।

ইনায়া গ্রন্থের লেখক বলেন, শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.)-এর মতে একজন ফাসিক মুসলমানের সংবাদ দ্বারা এখানে অমুসলিম দেশের মুসলমানের উপর ইসলামের ফরজসমূহ আবশ্যক হয়ে যাবে এবং যদি সে ফরজগুলো আদায় না করে তাহলে তাকে পরবর্তীতে উক্ত ফরজসমূহের কাজা আদায় করার প্রয়োজন হবে। তাঁর দলিল হলো, দীনি বিষয়ের সংবাদদাতা প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ -এর বার্তাবাহক বা দূত। আর দূতের সংবাদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য সংখ্যা কিংবা ন্যায়পরায়ণতার শর্ত নেই।

উল্লেখ্য যে, উপরের মাসআলাগুলোর অনুরূপ আরেকটি মাসআলা লেখক এখানে উল্লেখ করেননি।

পঞ্চম মাসআলাটি হচ্ছে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে বরখাস্ত করার সংবাদ। যদি এরূপ গোলামকে তার মনিব কর্তৃক বরখাস্ত করার সংবাদ একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা দুজন মুসলমান প্রদান করে তাহলে তো সবার মতে উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার রহিত (اَلْحَجْرُ) হয়ে যাবে। আর যদি সংবাদদাতা ফাসিক হয় এবং গোলাম তাকে অবিশ্বাস করে তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, তার ব্যবসা করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অধিকার রহিত হবে না [বহাল থাকবে]।

قَالَ : وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِيْنُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ، لِأَنَّ أَمِيْنَ الْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِي، وَالْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْإِمَامِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْحَقُهُ ضَمَانٌ، كَيْلَا يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ قَبُوْلِ هٰذِهِ الْأَمَانَةِ فَتَضِيْعُ الْحُقُوْقُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِيْ عَلَى الْغُرَمَاءِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوْعِ عَلَى الْعَاقِدِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি বিচারক কিংবা তার নিযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি [আমীন] পাওনাদারদের ঋণশোধ করার উদ্দেশ্যে [ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির] গোলাম বিক্রি করে দেয় এবং তার মূল্য উসুল করে নেয়; কিন্তু সে মূল্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং গোলামের কোনো হকদার আত্মপ্রকাশ করে তাহলে বিচারক বা তার আমীন জামিন হবে না। কেননা বিচারকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীন বিচারকের স্থলবর্তী। আর বিচারক মুসলমানদের ইমাম [প্রধান শাসক] -এর স্থলবর্তী। এদের কারো উপর ক্ষতিপূরণ বা দায় আরোপিত হয় না। যাতে মানুষ এ জাতীয় আমানতের পদ গ্রহণে পিছপা না হয়, অন্যথায় মানুষের হকসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে [এ অবস্থায়] ক্রেতা পাওনাদারদের থেকে মূল্য ফেরত নেবে। কেননা তাদের স্বার্থেই গোলাম বিক্রি করা হয়েছে। সুতরাং ক্রেতা চুক্তিকারী থেকে মূল্য ফেরত নিতে অপারগ অবস্থায় তাদের থেকে ফেরত নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِيْنُهُ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর থেকে আরেকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। মাসআলাটির স্বরূপ হলো, কোনো ব্যক্তি মারা গিয়েছে। তার মালামাল বিচারক অথবা বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি তথা আমীনের কাছে রয়েছে। মৃতে ব্যক্তির মালামালের মধ্যে একটি গোলামও রয়েছে। এদিকে মৃত ব্যক্তির কিছু পাওনাদার তাদের ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিচারক/ তার আমীনের কাছে ভিড় করছে। ঋণগ্রস্তদের দাবি সত্যতা যাচাই করার পর বিচারক/ তার আমীন তাদের ঋণশোধ করার উদ্দেশ্যে গোলামটি বিক্রি করে দিল এবং বিক্রয়লব্ধ মূল্য ক্রেতা থেকে গ্রহণও করল, কিন্তু যে কোনো কারণে উক্ত মূল্য তাদের হাতে নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ বিচারক/ তার আমীন মূল্য পাওনাদারদের শোধ করার আগেই বিনষ্ট হয়ে গেল। এরপর এক ব্যক্তি গোলামটি তার বলে দাবি করে এবং দাবি প্রমাণ করে গোলামটি ক্রেতার হাত থেকে নিয়ে নিল। এখন ক্রেতা গোলামের মূল্য কার কাছে আদায় করবে? মাসআলা হলো বিচারক/ তার আমীন [যার হাতে মূল্য বিনষ্ট হয়েছে] কেউই মূল্য পরিশোধ করার জামিন হবে না। কেননা প্রথমত আমীন বিচারকের স্থলবর্তী হয়, আর বিচারক ইমাম [ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান] -এর স্থলবর্তী হন। ইমাম, বিচারক ও আমীন সকলেই মুসলিম জনসাধারণের খিদমতে নিয়োজিত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ও উম্মতের আমানতদার। এদের কারো উপর ক্ষতিপূরণের দায়ভার আরোপিত হয় না। কেননা যদি তাদের উপর দায়ভার আরোপ করা হয় তাহলে তারা এ জাতীয় আমানতের পদ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসবে না। আর তারা যদি এসব আমানতদারির পদ গ্রহণে পিছপা হয় তাহলে এসব পদ শূন্য হয়ে যাবে। অথচ এসব পদের সাথে বহু মানুষের হক জড়িত রয়েছে। এসব মানুষের হকের হেফাজত করা জরুরি কর্তব্য এবং হকসমূহ নষ্ট করা নিষিদ্ধ। মোটকথা মানুষের হক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের কাউকে জামিন করা হবে না।

এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে ক্রেতা তার মূল্য বিচারক/ তার আমীনের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির পাওনাদারদের থেকে ফেরত নেবে। কেননা উক্ত পাওনাদারদের ঋণশোধ করার উদ্দেশ্যে গোলামটিকে বিক্রি করা হয়েছিল। যেহেতু পাওনাদারদের স্বার্থে গোলাম বিক্রি করা হয়েছিল সেহেতু পাওনাদারদের থেকেই ক্রেতা তার মূল্য বা ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। কেননা এখানে বিক্রয়কারী-বিচারক/ তার আমীন থেকে মূল্য উসুল করা অসম্ভব। মোটকথা হলো, এখানে চুক্তিকারী বা বিক্রেতা থেকে মূল্য উসুল করা সম্ভব না হওয়াতে যাদের স্বার্থে বিক্রি করা হয়েছিল তাদের থেকে ক্রেতা তার মূল্য ফেরত নেবে।

كَمَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَلِهٰذَا يُبَاعُ بِطَلَبِهِمْ وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِيْ الْوَصِيَّ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَضَاعَ الْمَالُ رَجَعَ الْمُشْتَرِيْ عَلَى الْوَصِيِّ، لِأَنَّهُ عَاقِدٌ نِيَابَةً عَنِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ بِإِقَامَةِ الْقَاضِيْ عَنْهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ، قَالَ: وَيَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى الْغُرَمَاءِ، لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُمْ، وَإِنْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ يَرْجِعُ الْغَرِيْمُ فِيْهِ بِدَيْنِهِ، قَالُوْا وَيَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ بِالْمِائَةِ الَّتِيْ غَرِمَهَا أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَحِقَهُ فِيْ أَمْرِ الْمَيِّتِ، وَالْوَارِثُ إِذَا بِيْعَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَرِيْمِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ.

অনুবাদ : যেমন– যদি চুক্তিকারী [বিক্রেতা] অনুমোদিত ব্যক্তি হয়। এজন্যই পাওনাদারদের আবদারের প্রেক্ষিতে গোলাম বিক্রি করা হয়। যদি বিচারক ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির অছিকে তার গোলাম পাওনাদারদের জন্য বিক্রি করার আদেশ করেন তারপর গোলামের হকদার বের হয়, অথবা ক্রেতার কব্জা করার পূর্বে মারা যায় আর গোলামের মূল্য অছির কাছে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা অছি থেকে তার মূল্য ফেরত নেবে। কেননা সে মৃত ব্যক্তির স্থলবর্তীরূপে চুক্তিকারী। যদিও সে বিচারক কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছে। এটা এমন হলো যেন সে [মৃত] নিজেই বিক্রি করেছে। ইমাম মুহাম্মদ/ লেখক (র.) বলেন, অছি প্রদানকৃত অর্থ পাওনাদারদের থেকে ফেরত নেবে। কেননা সে তাদের স্বার্থে কাজ করছে। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো মালের খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে পাওনাদার তার ঋণ উক্ত মাল থেকে ফেরত নেবে। মাশায়েখে কেরাম বলেন, এটা বলাও বৈধ যে, পাওনাদার তার সেই একশত দিরহামও ফেরত নেবে যা সে [ক্রেতা কিংবা অছিকে] ক্ষতিপূরণরূপে প্রদান করেছিল। কেননা এ ক্ষতিপূরণও তো মৃত ব্যক্তির কারণেই তার উপর এসেছে। উত্তরাধিকারীর জন্য যদি উত্তরাধিকারের গোলাম বিক্রি করা হয় তাহলে উত্তরাধিকারী পাওনাদারের পর্যায়ে গণ্য হবে। কেননা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যদি কোনো ঋণ না থাকে তাহলে চুক্তিকারী উত্তরাধিকারীদের স্বার্থেই কাজ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ مَحْجُوْرًا الخ : এর নজিরও রয়েছে শরিয়তে, যেমন কোনো ব্যক্তি তার গোলাম বিক্রির জন্য নাবালেগকে/ বেচাকেনার অনুমতি বঞ্চিত এক গোলামকে উকিল নিয়োগ করল। তারা তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী গোলামটি বিক্রি করল, তারপর বিক্রয়মূল্যও ক্রেতার থেকে আদায় করল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের হাতে বিক্রয়মূল্য বিনষ্ট হয়ে গেল। এদিকে বিক্রীত গোলামের একজন হকদার দাবি করল গোলামটি তার এবং সে তার দাবি প্রমাণ করে গোলামটিকে ক্রেতার হাত থেকে নিয়ে নিল। এখন ক্রেতা তার মূল্য কার কাছ থেকে উসুল করবে? এর উত্তর হলো, ক্রেতা উকিল নিয়োগকারী ব্যক্তি থেকে মূল্য উসুল করে নেবে। কেননা বিক্রয় তার স্বার্থেই সংঘটিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, অনুমতি বঞ্চিত গোলাম থেকে অথবা নাবালেগ বাচ্চা থেকে মূল্য উসুল করা সম্ভব নয়।

মোটকথা হলো, এ মাসআলায় অনুমতি বঞ্চিত গোলাম থেকে মূল্য উসুল করা সম্ভব না হওয়াতে গোলাম যার স্বার্থে বিক্রি করেছিল তার থেকে যেমন মূল্য উসুল করবে তদ্রূপ চলমান মাসআলায় ক্রেতার বিচারক/ তার আমীন থেকে মূল্য উসূল করা অসম্ভব হওয়াতে পাওনাদারদের থেকে মূল্য উসুল করবে।

লেখক বলেন, তাদের স্বার্থে যে গোলাম বিক্রি করা হয়েছে এর দলিল হলো তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতেই তো গোলাম বিক্রি করা হয়েছে। তারা আবেদন না করলে গোলামটি বিক্রি করা হতো না।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ الخ : উক্ত ইবারতে লেখক মৃতব্যক্তির অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, বিচারক/ তার কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির গোলাম তার ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিক্রি করে, তারপর গোলামের অন্য মালিক আবির্ভূত হয় তাহলে এ-এ কাজ করবে। আর আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে যে, যদি বিচারক মৃত ব্যক্তির অছি [যাকে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে গেছেন]-কে মৃতের ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বা পাওনাদারদের দেনা শোধ করার জন্য মৃত ব্যক্তির গোলাম বিক্রি করার আদেশ করেন। তারপর অছি গোলাম বিক্রি করে দিল ও ক্রেতা তা কব্জা করে নিল। এরপর এক ব্যক্তি গোলামটি তার বলে দাবি করল এবং দাবি প্রমাণ করে গোলামটি নিয়ে নিল। [দ্বিতীয় সুরত হলো,] গোলামটি ক্রেতা কব্জা করার পূর্বেই মারা গেল। এদিকে উভয় সুরতে অছি ক্রেতার কাছ থেকে যে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করেছিল তা তার কাছে বিনষ্ট-হাতছাড়া গেল তাহলে ক্রেতা যে মূল্য পরিশোধ করেছিল তা অছির কাছ থেকে ফেরত নেবে। কেননা অছি মৃত ব্যক্তির পক্ষে তার স্থলবর্তীরূপে বিক্রয় চুক্তি করেছে। অছি মৃত ব্যক্তির স্থলবর্তী দুভাবে হতে পারে– ১. মৃত ব্যক্তি তাকে অসিয়ত করে গেছে। ২. বিচারক তাকে মৃত ব্যক্তির স্থলবর্তী নির্ধারণ করেছে। যাহোক না কেন, অছি এখানে মৃত ব্যক্তির স্থলবর্তীরূপে চুক্তি সম্পাদন করেছে। স্থলবর্তী ব্যক্তির চুক্তি মূল ব্যক্তির চুক্তির অনুরূপ। সুতরাং বিক্রয়চুক্তিটি যেন এমন হলো যে, মৃতব্যক্তি স্বয়ং তার জীবদ্দশায় বিক্রয় চুক্তিটি সম্পন্ন করেছে। মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় উক্ত চুক্তি করলে এমতাবস্থায় তার থেকে মূল্য ফেরত নেওয়া হতো। মৃত ব্যক্তির অবর্তমানে তার কাছে অছি তার স্থলবর্তী। সুতরাং তার থেকেই ক্রেতা তার প্রদানকৃত বিক্রয় মূল্য ফেরত নেবে। এরপর অছি উক্ত বিক্রয় মূল্য পরিমাণ টাকা/ দিরহাম পাওনাদারদের থেকে আদায় করবে। কেননা অছি বিক্রয় চুক্তিটি তাদের স্বার্থেই করেছিল। তাদের দেনা পরিশোধের ইচ্ছা না করলে তো'সে গোলামটিকে বিক্রয়ই করত না। এর অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, যদি অছি মৃত ব্যক্তির গোলাম উত্তরাধিকারী খরচ মিটানোর জন্য বিক্রি করে। তারপর উপরের মাসআলায় দুই সুরতের কোনো একটি সুরত দেখা দেয় তাহলে ক্রেতা অছি থেকে তার বিক্রয়মূল্য ফেরত নেবে। অতঃপর অছি উত্তরাধিকারীদের থেকে সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত নিবে। কেননা অছি উত্তরাধিকারীদের স্বার্থে গোলাম বিক্রি করেছে। আর বিক্রয়মূল্য দ্বারা উত্তরাধিকারীরাই উপকৃত হতো। যদি উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ নাবালেগ হয় তাহলে বিচারক এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করবেন যে অছির ঋণ শোধ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ الخ : এরপর লেখক বলেন, ইতোমধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পদের সন্ধানে পাওয়া যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির পাওনদারগণ মৃত ব্যক্তির এই মাল থেকে তাদের পাওনা আদায় করবে। তাদের এ পাওনা উসুল করার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু প্রশ্ন হলো পাওনাদার/ পাওনাদারগণ অছিকে যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল তার কি হবে? এ ব্যাপারে লেখক বলেন, কতিপয় মাশায়েখ বলেছেন, সে যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল যেমন একশত দিরহাম, তাও সে মৃত ব্যক্তির মাল থেকে নিতে পারবে। কেননা এ ক্ষতিপূরণ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারেই সে দিয়েছিল। সুতরাং এ একশত দিরহামও মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে আদায় করবে।

পক্ষান্তরে কতিপয় মাশায়েখ বলেন, ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার টাকা মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে নেওয়ার অধিকার নেই। কেননা তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ সে নিজেই। অর্থাৎ যদি পাওনাদারগণ তাদের স্বার্থে বিক্রি করার আদেশ না করতেন তাহলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। কেননা অছির দখল মৃত ব্যক্তির দখলের মতো। মোটকথা যেহেতু বিক্রয় চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছে পাওনাদারদের স্বার্থে সুতরাং পাওনাদারগণ জরিমানা অন্যদের থেকে আদায় করতে পারে না। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, পাওনাদারগণ তাদের জরিমানা বাবদ প্রদত্ত টাকাও মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে আদায় করবে।

قَوْلُهُ وَالْوَارِثُ إِذَا بِيْعَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الخ : এরপর লেখক বলেন, যদি উত্তরাধিকারীদের জন্য মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি [মিরাস] থেকে কোনো কিছু বিক্রি করা হয় তাহলে এটা পাওনাদারদের জন্য বিক্রি করার মতো হবে। কথাটির ব্যাখ্যা হলো, মৃত ব্যক্তির এক/ একাধিক নাবালেগ শিশু/ কিশোর রয়েছে। তাদের প্রতিপালনের জন্য মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে কিছু মালামাল বিক্রি করা হলো। অছি সেই মাল বিক্রি করে তার আয়ত্তে তা রাখল। অতঃপর দুর্ঘটনাবশত বিক্রীত মালের মূল্য অছির কাছে হালাক হয়ে গেল। তারপর বিক্রীত জিনিসটির অন্য হকদার আত্মপ্রকাশ করল এবং জিনিসটি ক্রেতার হাত থেকে নিয়ে নিল তাহলে ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য অছি থেকে উসুল করবে। আর অছি উসুল করবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ থেকে। কেননা যখন মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মাঝে কোনো ঋণ-পাওনা নেই তখন অছির উক্ত তাসাররুফ-হস্তক্ষেপ ওয়ারিশের স্বার্থে হবে। পূর্বে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী যার/ যাদের স্বার্থে কাজ করা হয় সেই কাজে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ক্ষতি তাকে বহন করতে হয়। সে মতে চলমান মাসআলায় ক্ষতিপূরণ সবশেষে ওয়ারিশকেই বহন করতে হবে।

فَصْلٌ آخَرُ

وَإِذَا قَالَ الْقَاضِيْ، قَدْ قَضَيْتُ عَلٰى هٰذَا بِالرَّجْمِ فَارْجُمْهُ، أَوْ بِالْقَطْعِ فَاقْطَعْهُ، أَوْ بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ، وَسِعَكَ أَنْ تَفْعَلَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هٰذَا، أَوْ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِقَوْلِهِ حَتّٰى تُعَايِنَ الْحُجَّةَ، لِأَنَّ قَوْلَهُ يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَالْخَطَأَ وَالتَّدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَعَلٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ، وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَايِخُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ لِفَسَادِ حَالِ أَكْثَرِ الْقُضَاةِ فِيْ زَمَانِنَا، إِلَّا فِيْ كِتَابِ الْقَاضِيْ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ، فَيُقْبَلُ لِخُلُوِّهِ عَنِ التُّهْمَةِ، وَلِأَنَّ طَاعَةَ أُولِي الْأَمْرِ وَاجِبَةٌ، وَفِيْ تَصْدِيْقِهِ طَاعَةٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ (رحـ) : إِنْ كَانَ عَدْلًا عَالِمًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِانْعِدَامِ تُهْمَةِ الْخَطَأِ وَالْخِيَانَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا جَاهِلًا يُسْتَفْسَرُ، فَإِنْ أَحْسَنَ التَّفْسِيْرَ وَجَبَ تَصْدِيْقُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا أَوْ عَالِمًا فَاسِقًا لَا يُقْبَلُ، إِلَّا أَنْ يُعَايِنَ سَبَبَ الْحُكْمِ لِتُهْمَةِ الْخَطَأِ وَالْخِيَانَةِ.

অনুবাদ : আরেকটি অনুচ্ছেদ : যদি বিচারক [কাজি] বলেন, এর ব্যাপারে আমি [ব্যভিচারের কারণে] পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায় দিয়েছি। সুতরাং তুমি পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দাও। অথবা যদি বলেন, আমি [চুরির অপরাধে] হাত কর্তনের রায় দিয়েছি। তুমি তার হাত কাট। কিংবা যদি বলেন, আমি তাকে প্রহার করার রায় দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাকে প্রহার কর, তাহলে তোমার [সম্বোধিত ব্যক্তির] জন্য তা [-র নির্দেশ রায়] পালন করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ মত থেকে সরে এসেছেন এবং তিনি বলেছেন, তুমি তার [বিচারকের] কথাকে গ্রহণ করবে না যে পর্যন্ত না তুমি সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বচক্ষে দেখবে। কেননা তার কথাতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এক্ষেত্রে ভুলের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। এ রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার চিঠিও গ্রহণযোগ্য নয়। ফকীহগণ এ রেওয়ায়েতটিকে উত্তম মনে করেন। কেননা আমাদের [বর্তমান] যুগের বিচারকদের অবস্থা ভালো নয়। তবে বিচারকের পত্র গ্রহণে বিষয়টির প্রয়োজন বিবেচনা করত বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। জাহেরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, বিচারক এমন বিষয়ে সংবাদ দিয়েছে যা সে নিজে কার্যকর করতে সক্ষম। সুতরাং তুহমতের সম্ভাবনা না থাকাতে তা কবুল করা হবে। তাছাড়া দায়িত্বশীলদের নির্দেশ পালন করা তো ওয়াজিব এবং তা সত্য মনে করাই আনুগত্য বা ইবাদত। ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) বলেন, যদি বিচারক ন্যায়পরায়ণ হন; আলেম হন তাহলে তার নির্দেশ গ্রহণ করা হবে। কেননা এখানে তুহমত ও ভুলের সম্ভাবনা নেই। আর যদি বিচারক ন্যায়পরায়ণ হন; কিন্তু আলেম না হন তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে বিচারক থেকে পূর্ণ তথ্য-অনুসন্ধান চালানো হবে। যদি বিচারক উত্তম ও [সঠিক] ব্যাখ্যা দানে সমর্থ হন তাহলে তাকে সত্য মনে করা ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। আর যদি বিচারক ফাসিক জাহিল হন [আলেম না হন] কিংবা আলেম ফাসিক হন তাহলে তার নির্দেশ গ্রহণ করা হবে না, তবে যদি রায়ের সবব-কারণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করে [তাহলে নির্দেশ গ্রহণ করবে] কেননা [শেষোক্ত সুরতে] ভুল ও খিয়ানতের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ أٰخَرَ : وَاِذَا قَالَ الْقَاضِىْ الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতটি একটি নতুন অনুচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদের সবগুলো মাসআলা লেখক একটি মূলনীতির আলোকে আলোচনা করেছেন।

মূলনীতিটি হলো, বিচারকের শুধুমাত্র কথা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কিংবা বরখাস্ত হওয়ার পর গ্রহণযোগ্য কিনা ? ইবারতের প্রথম মাসআলাটি হলো, কোনো বিচারক এক ব্যক্তিকে বলল, এই ব্যক্তির উপর আমি ব্যভিচারের অপরাধে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছি। সুতরাং তুমি তাকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর। অথবা বলল, তুমি চুরির অপরাধে তার হাত কেটে দাও। অথবা বলল, তুমি তাকে তুহমত দেওয়ার অপরাধে বেত্রাঘাত কর। বিচারকের এতটুকু নির্দেশে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশ পালন করা বৈধ হয়ে যাবে। জাহেরী রেওয়ায়েতের বিপরীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্পর্কে নাওয়াদির রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জাহেরী রেওয়ায়েতের উক্ত মাসআলা থেকে সরে এসেছেন। তিনি বলেন, বিচারক যাকে তার রায় কার্যকর করতে বলেছেন সে সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বচক্ষে না দেখে বিচারকের রায় মোতাবেক নির্দেশ পালন করবে না। কেননা বিচারকের কথাতে ভুল-ত্রুটির সমূহ সম্ভাবনা আছে। আর এরূপ ভুল হয়ে গেলে তা শোধরানোর উপায় বা বিকল্প থাকে না, অর্থাৎ শাস্তি হয়ে যাওয়ার পর বিচারকের রায় পরিবর্তন করলেই কি বা আর না করলেই কি, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ বর্ণনা মতে, বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইমাম মুহাম্মদ যদিও সরাসরি এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। বিচারকের পত্র সংক্রান্ত আলোচনা ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, কতিপয় মাশায়েখ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রেওয়ায়েতটিকে আমাদের বর্তমান যুগের বিচারকদের নৈতিক দুরবস্থার ভিত্তিতে উত্তম মনে করেন। লেখক বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রেওয়ায়েতের দাবি অনুযায়ী বিচারকের পত্র অন্য বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়া উচিত। কেননা এতেও ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ যদি ভুলের সম্ভাবনার কারণে শুধুমাত্র বিচারকের কথা অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তো একই সম্ভাবনার কারণে বিচারকের পত্র অগ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিচারকের পত্র প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে শরিয়ত গ্রহণ করে নিয়েছে। সারকথা এ দাঁড়াল যে, বিচারকের পত্র ব্যতীত অন্য ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা মাশায়েখে কেরামের দৃষ্টিতে অধিক উত্তম।

قَوْلُهُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَنَّهُ اَخْبَرَ الخ : জাহেরি রেওয়ায়েত [যাতে বলা হয়েছে বিচারকের দলিলবিহীন কথা গ্রহণযোগ্য] -এর দলিল হলো, বিচারক এমন বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার ক্ষমতা বিচারকের রয়েছে। কেননা বিচারক নিজে ক্ষমতার অধিকারী বা তাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণেই বিচারক রায় কার্যকর করতে সক্ষম। যেহেতু বিচারক রায় কার্যকর করতে সক্ষম তাই সে রায় সংক্রান্ত সংবাদ প্রদান করাতে সন্দেহযুক্ত হবে না বা তার উপর তুহমত আরোপ করা হবে না। কেননা কোনো ব্যক্তির উপর তুহমত আরোপ বা সন্দেহ করার সুযোগ তো এমন বিষয়ের সংবাদে হয়ে থাকে যে বিষয়টি সে নিজে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। ফলে তার সংবাদ অবাস্তব দোষে দুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যদি সংবাদটি এমন বিষয়ের হয়ে থাকে যে, সংবাদদাতা স্বয়ং বিষয়টি বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম তাহলে তার উপর তুহমত আরোপ করা যায় না; বরং ধরে নেওয়া হবে যে, সংবাদদাতা সবার সামনে বিষয়টি কার্যকর করেছেন।

মোটকথা যেহেতু বিচারকের সংবাদে তুহমত আরোপ করার বা সন্দেহ করার সুযোগ নেই তাই বিচারকের দলিলবিহীন কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। লেখক বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার দ্বিতীয় যে দলিলটি দেন তা হলো বিচারক শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত (اُولُو الْاَمْرِ); আর শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কথা মেনে নেওয়া সাধারণ জনগণের উপর ওয়াজিব এবং বিচারকের কথা মেনে নেওয়া

ইবাদতযোগ্য। যেহেতু বিচারকের কথা সত্যায়ন করা ওয়াজিব ও তা মেনে নেওয়া ইবাদত তাই তার কথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া উচিত।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ (رحـ) الـخ : ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, যদি বিচারক আলেম ও ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আলেম হওয়ার কারণে তিনি ভুল করেছেন এ তুহমত দেওয়া যাবে না এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়ার কারণে তিনি খিয়ানত করেছেন এ তুহমত আরোপ করা বা সন্দেহ করা যাবে না। এজন্যই সবার মতে বিচারকের এমন অবস্থাতে তার প্রদানকৃত রায় সম্পর্কে তার থেকে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ হলো প্রথম সুরত।

দ্বিতীয় সুরত হলো, বিচারক ন্যায়পরায়ণ; কিন্তু আলেম নন। এ অবস্থায় ন্যায়পরায়ণ হওয়ার কারণে যদিও তার সম্পর্কে খিয়ানতের তুহমত দেওয়া যায় না; কিন্তু আলিম না হওয়াতে রায় প্রদানে ভুল করার সম্ভাবনা তার রয়েছে। তাই এ অবস্থায় বিচারকের কাছে রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তার মূলনীতি কি ছিল? সে মূলনীতি যথার্থ ছিল কিনা এবং সে মূলনীতির আলোকে রায় যথার্থ হয়েছে কিনা ইত্যাদি। যদি বিচারক তার রায়ের ব্যাপারে সঙ্গত ও উত্তম জবাব দিতে পারেন তাহলে তার কথা গ্রহণ করা হবে। যদি বিচারক শরিয়তের হুকুম মোতাবেক জবাব দিতে ব্যর্থ হন তাহলে তার রায় মেনে নেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং তার কথা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

তৃতীয় সুরত হলো, বিচারক যদি ফাসিক হন। তারপর তিনি আলেম হন বা জাহিল হন তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বাস্তবায়ন করা হবে না। তবে বিচারক যে ব্যক্তিকে রায় কার্যকর করতে আদেশ দিয়েছেন তিনি যদি রায় প্রদানের সবব স্বচক্ষে দেখে থাকেন তাহলে তিনি বিচারকের কথামতো রায় কার্যকর করবেন। যেমন বিচারক ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত করতে বললেন। যাকে বললেন, সে যদি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হতে কিংবা ব্যভিচারকারীকে স্বীকারোক্তি করতে দেখে তাহলে তার জন্য একশত বেত্রাঘাত লাগানো বৈধ হবে। আর যদি সে ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি না জানে তাহলে তার জন্য বিচারকের কথা মেনে নেওয়া জরুরি নয়; বরং সে বিচারকের কথা প্রত্যাখ্যান করবে, কারণ বিচারক যদি তিনি ফাসিক ও জাহিল হয় তাহলে তো তার ভুল ও খিয়ানত উভয় দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি আলেম হন কিন্তু তিনি ফাসিক, তাহলে তার খিয়ানত করার সম্ভাবনা রয়েছে। খিয়ানত ও ভুল কিংবা শুধুমাত্র খিয়ানতের তুহমত থাকা অবস্থায় বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

قَالَ : وَاِذَا عَزَلَ الْقَاضِىْ فَقَالَ لِرَجُلٍ اَخَذْتُ مِنْكَ اَلْفًا وَدَفَعْتُهَا اِلٰى فُلَانٍ قَدْ قَضَيْتُ بِهَا لَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اَخَذْتَهَا ظُلْمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِىْ، وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ : قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِكَ فِىْ حَقٍّ هٰذَا. اِذَا كَانَ الَّذِىْ قَطَعْتُ يَدَهُ، وَالَّذِىْ اَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ مُقِرَّيْنِ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ وَهُوَ قَاضٍ، وَوَجْهُهُ اَنَّهُمَا لَمَّا تَوَافَقَا اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ فِىْ قَضَائِهِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ، اِذِ الْقَاضِىْ لَا يَقْضِىْ بِالْجَوْرِ ظَاهِرًا، وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهِ، لِاَنَّهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ فِىْ قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ، وَلَا يَمِيْنَ عَلَى الْقَاضِىْ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি বিচারক বরখাস্ত হন তারপর এক ব্যক্তিকে বলেন, তোমার থেকে আমি একহাজার টাকা নিয়ে অমুক ব্যক্তিকে দিয়েছিলাম, যার অনুকূলে এবং তোমার বিপক্ষে ঐ পরিমাণ টাকার ফয়সালা করেছিলাম; কিন্তু লোকটি বলল, আপনি টাকাগুলো অন্যায়ভাবে নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় বিচারকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ যদি বিচারক বলেন, তোমার হাত কাটার ফয়সালা একটি হকের বিপরীতে করেছি। এসব কথা তখনই হবে যখন যার হাত কাটা হয়েছে এবং যার থেকে মাল নেওয়া হয়েছে তারা এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে যে, বিচারক এ ফয়সালা বিচারক থাকা অবস্থায় দিয়েছেন। এর দলিল হলো, যখন তারা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করল যে, বিচারক তার বিচারকের দায়িত্ব পালনকালেই ফয়সালা প্রদান করেছেন তখন জাহেরী অবস্থা তার পক্ষে সাক্ষ্য হয়ে গেল। কেননা বিচারক সাধারণত অন্যায় ফয়সালা প্রদান করেন না। আর বিচারকের থেকে শপথ নেওয়ার বিধানও নেই। কেননা তাদের সমর্থনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিচারকের রায় প্রদান দায়িত্ব থাকাকালেই হয়েছে। আর শপথ তো বিচারকের উপর আরোপিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا عَزَلَ الْقَاضِىْ فَقَالَ الخ : উক্ত ইবারতে বিচারকের পদচ্যুত অবস্থার উক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, যদি বিচারক বরখাস্ত হওয়ার পর একটি লোককে বলেন যে, তোমার বিপক্ষে অমুকের অনুকূলে একহাজার টাকার ফয়সালা করেছিলাম। তারপর তোমার থেকে সেই পরিমাণ টাকা নিয়ে তা অমুককে দিয়েছি। এরপর জবাবে লোকটি বলল, আপনি অন্যায়ভাবে টাকাগুলো আমার থেকে নিয়েছিলেন। লেখক বলেন, এ অবস্থায় বিচারকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এরূপ আরেকটি মাসআলা হলো, বিচারক এক ব্যক্তিকে বলেন, একটি হকের বিপরীতে তোমার হাত কাটার ফয়সালা করেছি। উত্তরে লোকটি বলল যে, আপনি অন্যায়ভাবে আমার হাত কাটার ফয়সালা দিয়েছেন। তাহলেও বিচারকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। লেখক বলেন, এ দু-মাসআলায় বিচারকের কথা ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ যার হাত কাটা হয়েছে সে এবং যার মাল নেওয়া হয়েছে সে সাক্ষ্য দেবে যে, বিচারক হাত কাটার ফয়সালা ও মাল নেওয়ার ফয়সালা তার বিচারক থাকা অবস্থায় ও দায়িত্ব পালনকালেই দিয়েছিলেন। তাদের দুজনের এরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার শর্ত এ কারণে যে, যখন তারা এ ব্যাপারে ঐকমত্য

পোষণ করল যে, বিচারক উক্ত রায় তার দায়িত্ব পালনকালে অর্থাৎ বিচারক থাকা অবস্থায় প্রদান করেছেন, তখন বাহ্যিক অবস্থা বা জাহের বিচারকের পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাবে। কারণ জাহেরের দাবি তো এই যে, বিচারক কোনো অন্যায় ফয়সালা দেবেন না, বরং তিনি তো ন্যায় ও নীতির পক্ষে বিচারক রায় দেবেন। উসূলে ফিকহের নিয়মানুযায়ী জাহের বা বাহ্যিক অবস্থা যার পক্ষে সমর্থন করে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। এজন্য শপথ করা ছাড়াই বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বিচারকের উপরিউক্ত রায় প্রদান যে তার বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত হয়েছে এ ব্যাপারে বিচারক ও যার বিপক্ষে রায় প্রদান করা হয়েছে উভয়ের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু রায় প্রদানের কাল উভয়ের ঐকমত্যে বিচারকের দায়িত্ব পালনের সময় হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে, অতএব যার বিপক্ষে রায় প্রদান করা হয়েছে তার দাবিটিও বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে হয়েছে ধরে নেওয়া হবে। আর বিচারকের দায়িত্ব চলাকালে বিচারকের বিরুদ্ধে বাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, শুধুমাত্র বিচারকের কথাই গ্রহণযোগ্য হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهِ الخ : উল্লেখ্য যে, বিচারকের দায়িত্বে বর্তমান থাকা অবস্থায় বিচারকের উপর শপথ আরোপ করার কোনো বিধান নেই। তাই এখানে বিচারকের উপর শপথ আরোপ করা হবে না। বিচারকদের শপথ-কসম আরোপ রহিত করার দলিল অনুসন্ধান করে যা জানা গেছে তা হলো, শরীফ লোকেরা কসম করাকে তাদের জন্য বেহুরমতী-অসম্মানজনক মনে করেন। যদি বিচারকগণের কসম আরোপ করার বিধান জারি করা হয় তাহলে লোকেরা বিচারকের পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর বিচারকের পদগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বিচারক পদে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষের হকসমূহ নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বিচারক শরিয়তের দৃষ্টিতে আমীন বা আস্থাভাজন হয়ে থাকেন। বাদী-বিবাদীর মতো একজন অপরজনের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হন না।। আর এটা সকলেরই জানা যে, প্রতিপক্ষের উপর শপথ আরোপ করা হয়। আমীন বা বিশ্বাসী লোকের উপর শপথ আরোপ করা হয় না। যেহেতু এখানে বিচারক প্রতিপক্ষ নন; বরং তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা আমীন, তাই তার থেকে শপথ নেওয়া ওয়াজিব নয়। মোটকথা যেহেতু বিচারকের উপর শপথ আরোপের সুযোগ নেই এবং জাহেরী অবস্থা বিচারকের অনুকূলে তাই শপথ ছাড়া জাহেরী অবস্থার ভিত্তিতে বিচারকের কথা গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

وَلَوْ اَقَرَّ الْقَاطِعُ اَوْ الْاٰخِذُ بِمَا اَقَرَّ بِهٖ الْقَاضِىْ لَا يَضْمَنُ اَيْضًا ، لِاَنَّهٗ فِعْلُهٗ فِىْ حَالِ الْقَضَاءِ ، وَدَفْعُ الْقَاضِىْ صَحِيْحٌ ، كَمَا اِذَا كَانَ مُعَايَنًا وَلَوْ زَعَمَ الْمَقْطُوْعُ يَدُهٗ اَوْ الْمَاخُوْذُ مَالُهٗ اَنَّهٗ فَعَلَ ذٰلِكَ قَبْلَ التَّقْلِيْدِ اَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ فَالْقَوْلُ لِلْقَاضِىْ اَيْضًا ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ ، لِاَنَّهٗ اَسْنَدَ فِعْلَهٗ اِلٰى حَالَةٍ مَعْهُوْدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ ، فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ طَلَّقْتُ اَوْ اَعْتَقْتُ وَاَنَا مَجْنُوْنٌ ، وَالْجُنُوْنُ مِنْهُ كَانَ مَعْهُوْدًا .

অনুবাদ : যদি হাত কর্তনকারী অথবা অর্থগ্রহণকারী বিচারকের অনুরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তারাও জামিন হবেন না। কেননা তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে তা করেছেন। আর বিচারকের হকদারের হাতে হকপ্রদান করা বৈধ। যেমন যার থেকে অর্থগ্রহণ করা হয়েছে তার সম্মুখে ফয়সালা করা হয়। আর যদি যার হাত কাটা গিয়েছে কিংবা যার মাল নেওয়া হয়েছে তারা উভয়ে দাবি করে যে, বিচারক রায় প্রদান করেছেন দায়িত্ব লাভের পূর্বে অথবা বরখাস্ত হওয়ার পরে তাহলেও বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটাই বিশুদ্ধমত। কেননা বিচারক তার রায় প্রদানকে এমন একটি পরিচিত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যা দায় আরোপ করার পরিপন্থি। ফলে এটা এমন হলো যেন এক ব্যক্তি বলল যে, আমি উন্মাদ অবস্থায় আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি কিংবা আমার গোলাম আজাদ করেছি। আর তার উন্মাদ হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَقَرَّ الْقَاطِعُ اَوِ الْاٰخِذُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, যদি বিচারক যাকে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাকে অর্থগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তারা উভয়ে বিচারক যা স্বীকার করেছেন তাই স্বীকার করে অর্থাৎ তারা বলে যে, বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী হাত কেটেছে ও মাল নিয়েছে তাহলে হাত কর্তনকারী ও অর্থগ্রহণকারী জামিন হবে না, যেমন বিচারক জামিন হননি। কেননা বিচারক এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন যে, তিনি বিচারক থাকা অবস্থায় ঐ রায় প্রদান করেছেন। আর বিচারকের পদে থাকা অবস্থায় এরূপ রায় প্রদান করা তার জন্য বৈধ। এরপর লেখক বলেন, বিচারকের জন্য অর্থ দেওয়া অর্থাৎ বিচারক যদি দেনাদার থেকে অর্থ নিয়ে অর্থগ্রহণকারীকে সামনাসামনি প্রদান করেন তাহলে যেমন বিষয়টি বৈধ তদ্রূপ বিচারক যদি দেনাদার থেকে নিয়ে পাওনাদারকে কিংবা যার অনুকূলে অর্থ প্রদান করার রায় দেওয়া হয়েছে তাকে সবার অলক্ষ্যে অর্থ প্রদান করেন তাও বৈধ হবে। এ দু-সুরতের যে কোনো সুরতে যেমন অর্থগ্রহণকারীর জন্য অর্থগ্রহণ করা বৈধ এবং সে এর জামিন হয় না তদ্রূপ বিচারকের মাধ্যম ছাড়া যদি কেউ বিচারকের স্বীকারোক্তি মোতাবেক স্বীকারোক্তি দিয়ে অর্থ গ্রহণ করে তাহলেও তা বৈধ হবে এবং অর্থ গ্রহণকারীকে কোনো জামানতের সম্মুখীন হতে হবে না।

হাত কাটার ক্ষেত্রে যদি হস্তকর্তনকারী বিচারকের অনুপস্থিতিতে বিচারকের রায় অনুযায়ী হাত কাটে তাহলে তাকে জামিন হতে হবে না, যেমন বিচারকের উপস্থিতিতে জামিন হতে হয় না।

قَوْلُهُ وَلَوْ زَعَمَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ الخ : ইবারতের দ্বিতীয় মাসআলা হলো–

১. বিচারক কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার বিচারকের পদে থাকাকালীন সময়ে তোমার উপর দশহাজার টাকা প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলাম। অতঃপর উক্ত টাকা তোমার থেকে নিয়ে অমুক ব্যক্তিকে দিয়েছিলাম।

২. বিচারক কোনো ব্যক্তিকে বললেন, আমি বিচারক থাকা অবস্থায় [চুরির অপরাধে] তোমার হাত কাটিয়েছিলাম। প্রতি উত্তরে যার মাল নেওয়া হয়েছিল এবং যার হাত কাটা হয়েছিল তারা উভয়ে বলল, আপনি বিচারকের দায়িত্ব লাভের আগে কিংবা বলল বিচারকের দায়িত্ব লাভের পর এরূপ করেছিলেন। এমতাবস্থায় বিচারকের কথা [যে, আমি বিচারক থাকা অবস্থায় ফয়সালা দিয়েছি] গ্রহণযোগ্য হবে– তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। লেখক এ মতটিকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

ইনায়া গ্রন্থের লেখক বলেন, শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.)-এর মতে, যদি দাবিদার সুনির্দিষ্টভাবে বলে যে, বিচারক পদচ্যুত হওয়ার পর উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছেন তাহলে দাবিদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ কাজটি পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। তাই এটা নিকটবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তিনি বলেন, যদি কেউ পূর্ববর্তী তারিখে সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করে তাহলে তাকে অবশ্যই প্রমাণ দাখিল করতে হবে। কেননা কাজ কখন সংঘটিত হয়েছে এতে যদি মতবিরোধ হয়, তাহলে বর্তমানের ভিত্তিতে ফয়সালা প্রদান করা হয়।

ব্যাখ্যাকার বলেন, তবে প্রথম মতটি বিশুদ্ধ। প্রথম মতটি ফখরুল ইসলাম বাযদুভী ও সদরুশ শহীদ (র.) প্রমুখ মাশায়েখে কেরাম গ্রহণ করেছেন। প্রথম মত [কিতাবে উল্লিখিত মতের] দলিল হলো, বিচারক তার [রায় প্রদানের] কাজটি এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন যে সময়ে তার উপর জামানত আসে না। অর্থাৎ বিচারক রায় প্রদানের সময়কাল উল্লেখ করেছেন তার বিচারক থাকার সময়কালকে। বিচারক থাকা অবস্থায় বিচারকের উপর জামানত বা দায় বর্তায় না। সুতরাং বিচারক যেন এ দাবির মধ্যে যে দায়ভার রয়েছে তা নিতে অস্বীকার করছেন। নিয়মানুযায়ী দাবিদারের কাছে দলিল না থাকলে অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব, এখানে বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়াই বিধিসম্মত। বিচারককে এখানে শপথ করতে হবে না। কারণ বিচারকের উপর শপথ আরোপ করা হয় না।

এ মাসআলার নজির হলো, এক গোলাম অন্য ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার হাত গোলাম থাকা অবস্থায় কেটেছি। পক্ষান্তরে হাতকাটা ব্যক্তি বলল, তুমি স্বাধীন অবস্থায় কেটেছ, তাহলে গোলামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَّقْتُ الخ : কিতাবে মাসআলাটির নজির পেশ করেছে যে, এক ব্যক্তি বলল, আমি আমার স্ত্রীকে উন্মাদ [মস্তিষ্ক বিকৃত] অবস্থায় তালাক দিয়েছি অথবা বলল, আমি আমার গোলাম উন্মাদ অবস্থায় আজাদ করেছি, আর তার উন্মাদ হওয়ার অবস্থাটি সকলেরই জানা আছে তাহলে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। যেহেতু উন্মাদ অবস্থায় তালাক ও আজাদ গ্রহণযোগ্য হয় না, তাই তার স্ত্রী তালাক ও গোলাম আজাদ হবে না। দলিল হলো, এ ব্যক্তি তালাক ও আজাদ করাকে এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যে সময় তালাক ও আজাদ বাস্তবায়নের বিরোধী।

وَلَوْ اَقَرَّ الْقَاطِعُ اَوِ الْاٰخِذُ فِىْ هٰذَا الْفَصْلِ بِمَا اَقَرَّ بِهِ الْقَاضِىْ يَضْمَنَانِ، لِاَنَّهُمَا اَقَرَّا بِسَبَبِ الضَّمَانِ، وَقَوْلُ الْقَاضِىْ مَقْبُوْلٌ فِىْ دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهٖ، لَا فِىْ اِبْطَالِ سَبَبِ الضَّمَانِ عَلٰى غَيْرِهٖ، بِخِلَافِ الْاَوَّلِ، لِاَنَّهٗ ثَبَتَ فِعْلُهٗ فِىْ قَضَائِهٖ بِالتَّصَادُقِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِىْ يَدِ الْاٰخِذِ قَائِمًا، وَقَدْ اَقَرَّ بِمَا اَقَرَّ بِهِ الْقَاضِىْ وَالْمَاخُوْذُ مِنْهُ الْمَالُ صَدَّقَ الْقَاضِىَ فِىْ اَنَّهٗ فَعَلَهٗ فِىْ قَضَائِهٖ، اَوِ ادَّعٰى اَنَّهٗ فَعَلَهٗ فِىْ غَيْرِ قَضَائِهٖ يُؤْخَذُ مِنْهُ، لِاَنَّهٗ اَقَرَّ اَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لَهٗ، فَلَا يُصَدَّقُ فِىْ دَعْوٰى تَمَلُّكِهٖ اِلَّا بِحُجَّةٍ، وَقَوْلُ الْمَعْزُوْلِ فِيْهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ۔

অনুবাদ : যদি হস্তকর্তনকারী অথবা অর্থগ্রহণকারী এ সুরতে বিচারক যা স্বীকার করেছে তা স্বীকার করে তাহলে তারা জামিন হবে। কেননা তারা দায় আরোপের সববকে স্বীকার করে নিয়েছে। বিচারকের কথা তার উপর দায় আরোপ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হবে- অন্যের উপর দায় আরোপের সবব বাতিলকরণের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রথম মাসআলাটি এর থেকে ভিন্ন। কেননা সেখানে বিচারকের রায় প্রদানের কাজটি পরস্পর সমর্থনের মাধ্যমে বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর যদি অর্থগ্রহণকারীর হাতে মাল বিদ্যমান থাকে, আর সে বিচারক যা স্বীকার করেছে তাই স্বীকার করে এবং যার থেকে মাল নেওয়া হয়েছে সেও বিচারককে এই মর্মে সমর্থন করে যে, বিচারক তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এটা করেছেন/ সে দাবি করে যে, বিচারক তার বিচারকালের বাইরে এটা করেছেন তাহলে [উভয় অবস্থায়] অর্থগ্রহণকারী থেকে অর্থ/ মাল ফেরত নেওয়া হবে। কেননা সে একথা স্বীকার করেছে যে, যার থেকে মাল নেওয়া হয়েছে মাল/ অর্থ তার আয়ত্তেই ছিল। সুতরাং শরিয়ত স্বীকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তার মালিকানার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَقَرَّ الْقَاطِعُ اَوِ الْاٰخِذُ الخ : ইবারতের প্রথম মাসআলাটি পূর্বের মাসআলা-এর সাথে সম্পৃক্ত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, হাত কর্তিত ব্যক্তি ও যার মাল নেওয়া হয়েছে তারা যদি এ দাবি করে যে, বিচারক তাদের ব্যাপারে রায় প্রদান করেছেন বিচারক হওয়ার পূর্বে / বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর। এখানে বলা হচ্ছে যে, তাদের এ দাবি জানানো অবস্থায় যদি হস্তকর্তনকারী ও অর্থগ্রহণকারী বিচারকের অনুরূপ স্বীকারোক্তি করে তাহলে তারা দুজন মালের জামিন হবে; কিন্তু বিচারক জামিন হবেন না। কেননা তারা দুজনেই জামিন হওয়ার সবব বা কারণ অর্থাৎ হাত কাটার ও মাল নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। বাকি রইল বিচারকের উপর ক্ষতিপূরণে দায় না আসার কারণ, তাতো আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে বিচারকের স্বীকারোক্তি তার নিজের উপর ক্ষতিপূরণ বা দায় আরোপে বাধা দেবে বটে; কিন্তু অন্যদের [হাত কর্তনকারী ও

অর্থগ্রহণকারী] থেকে দায় আরোপের সবব বা কারণকে বাতিল করতে পারবে না। সুতরাং যখন হাত কর্তিত ব্যক্তি ও যার থেকে অর্থ নেওয়া হয়েছে তারা বিচারকের বিপরীতে জবানবন্দি দেবে অর্থাৎ তারা বলবে– বিচারক তার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কিংবা বরখাস্ত হওয়ার পর বিচারের রায় দিয়েছেন তখন অর্থগ্রহণকারী ও হস্তকর্তনকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ও দায় আরোপ করা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ ثَبَتَ الخ : লেখক বলেন, প্রথম মাসআলাটি এর বিপরীত ছিল। কারণ প্রথম মাসআলায় বিচারকের বিপরীতে অন্য কেউ জবানবন্দি দেয়নি; বরং প্রথম মাসআলাতে সবার ঐকমত্যে বা পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে বিচারকের রায় প্রদান বিচারকালেই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِىْ يَدِ الخ : এরপর লেখক মাসআলার আরেকটি সুরত নিয়ে আলোচনা করেন। তা হলো, যদি অর্থগ্রহণকারীর হাতে মাল বিদ্যমান থাকে আর সে বিচারকের অনুরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে দুঅবস্থা। যার থেকে মাল নেওয়া হয়েছে সে বিচারকের অনুরূপ স্বীকারোক্তি দেবে অর্থাৎ বিচারক তার পদে থাকা অবস্থায় বিচারের রায় প্রদান করেছেন কিংবা সে বিচারকের বিপরীত জবানবন্দি দিবে অর্থাৎ সে বলবে– বিচারক তার কাজটি বিচারকের পদ গ্রহণের পূর্বে করেছেন / বরখাস্ত হওয়ার পরে করেছেন, উভয় অবস্থায় অর্থগ্রহণকারীর হাত থেকে মজুদ থাকা মাল নিয়ে নেওয়া হবে। কেননা সে স্বীকার করেছে যে, মাল ঐ ব্যক্তির হাতেই ছিল যার থেকে মাল নেওয়া হয়েছে। তবে সেই সাথে তার নিজের মালিকানার দাবিও করেছিল। তার মালিকানার পক্ষে যে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন না করাতে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বিচারক ও অর্থগ্রহণকারীর মালিকানার পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। বর্তমানে বিচারক যদিও অর্থগ্রহণকারীর মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে কিন্তু তিনি তো এখন সাবেক বা পদচ্যুত হয়ে গেছেন। তাই পদচ্যুত বিচারকের সাক্ষ্য একজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য। আর একজনের সাক্ষ্য শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সাবেক বিচারকের কথা এখানে দলিল হবে না। তাছাড়া সাবেক বিচারক এখানে তার অনুকূলে ঋণের সাক্ষ্য দিচ্ছেন না; বরং তার নিজ কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যা তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা থেকে হেফাজত করছে।

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় : শাহাদাত

ভূমিকা : ইসলামি বিচারব্যবস্থায় شَهَادَةٌ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা যায় বিচারব্যবস্থার ভিত্তিই শাহাদাতের উপর। তাছাড়া সাধারণভাবে অন্য অনেক বিধিবিধানেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পূর্ববর্তী অধ্যায় (كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ) -এর সাথে সম্পর্ক :

বিচারক যেহেতু বিবাদী অস্বীকার করলে সাক্ষীদের শাহাদাতের মুখাপেক্ষী হন, তাই বিচারকের কর্তব্যের সাথে এর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। সাধারণ রীতি অনুসারে شَهَادَةٌ -কে বিচারকার্যের আগে উল্লেখ সমীচীন। কেননা, বিচারকের রায় সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও বিচারকার্য (قَضَاءٌ) -কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারকার্য মূল বিষয় বা মাকসূদ হওয়ার কারণে। তারপর شَهَادَةٌ -এর আলোচনা আনা হয়েছে।

شَهَادَةٌ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা :

شَهَادَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ : সুনিশ্চিত বিষয়ের সংবাদ দান বা প্রত্যক্ষ দর্শনের পর কোনো বিষয়ের সত্যতার সংবাদ দেওয়া।

* ফকীহদের পরিভাষায় شَهَادَةٌ বলা হয়–

وَفِىْ عُرْفِ اَهْلِ الشَّرْعِ اَخْبَارٌ صِدْقٍ لِاثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

অর্থাৎ কারো অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারকের এজলাসে شَهَادَةٌ শব্দের সাথে সত্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়া।

অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য شَهَادَةٌ নয়। এমনিভাবে ধারণা ও অনুমান-নির্ভর সংবাদও شَهَادَةٌ নয়।

শাহাদাত ধারণ করা (تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ) -এর শর্ত হলো, যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে সেটাকে প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ যে সকল বিষয় চোখে দেখা সম্ভব তা দেখা শর্ত, যে সকল বিষয় কানে শোনা সম্ভব তা শ্রবণ করা শর্ত। শাহাদাত প্রদান করা ওয়াজিব হওয়ার মুখ্য কারণ হলো বাদীর সাক্ষ্য চাওয়া কিংবা বাদীর অধিকার বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। অর্থাৎ যদি অবস্থা এমন হয় যে, বাদী সাক্ষী সম্পর্কে অবগত নয়, আর তার প্রাপ্য হক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার চাওয়া ছাড়াই সাক্ষীর শাহাদাত প্রদান করা আবশ্যক।

শাহাদাতের শর্ত : শাহাদাতের শর্ত হলো সাক্ষী প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, ওলায়াতের অধিকারী, শাহাদাত ধারণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া ও সেই সাথে তার বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

যদি বিবাদী মুসলমান হয়, তাহলে সাক্ষীর মুসলমান হওয়া শর্ত।

শাহাদাতের রুকন হলো اَشْهَدُ শব্দটি।

শাহাদাতের হুকুম : এর হুকুম হলো বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর শাহাদাত মুতাবিক রায় ঘোষণা করা।

শাহাদাত বৈধ হওয়ার দলিল : اِسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজনকে সাক্ষী কর। –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন– لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا অর্থাৎ [বাদীর পক্ষ থেকে] যখন সাক্ষীদের কাছে 'শাহাদাত' চাওয়া হয়, তখন তারা যেন সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি না জানায়। –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮২]

হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ عِنَايَةٌ -এর লেখক মনে করেন [সত্য] সাক্ষ্য একটি উত্তম আমল। কারণ, এটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ [হে ঈমানদারগণ!] তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে। –[সূরা মায়েদা : আয়াত– ৯]

قَالَ : اَلشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُوْدَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِيْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا وَ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِيْ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوْقِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাহাদাত ফরজ। এটা আরোপিত হয় সাক্ষীদের উপর। তাদের জন্য সাক্ষ্য গোপন করা বৈধ নয়, যখন বাদী তাদের কাছে তা চায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا অর্থাৎ যখন সাক্ষীদের কাছে শাহাদাত চাওয়া হয়, তখন তারা যেন তা প্রদানে অস্বীকৃতি না জানায়। তিনি আরো বলেছেন– وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ এবং তোমরা শাহাদাত গোপন করো না, আর যে ব্যক্তি তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ, কলুষিত হবে। –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮৩]

আর বাদীর আবেদনকে শর্ত করা হয়েছে, কেননা, এটা তার প্রাপ্য অধিকার। অতএব, অন্যান্য সকল অধিকারের মতো শাহাদাত তার আবেদনের উপর নির্ভরশীল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ فَرْضٌ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অতঃপর বাদী সাক্ষীর কাছে শাহাদাত তলব করে তখন সাক্ষ্যদান করা সাক্ষীর জন্য ফরজ। সাক্ষীদের এটা দায়িত্ব এবং তাদের জন্য সাক্ষ্য গোপন করা বৈধ নয়। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, সাক্ষী যদি এক বা দু'জন হয় তাহলে সাক্ষ্যদান ফরজে আইন। আর সাক্ষী অনেক থাকা অবস্থায় ফরজে কিফায়া। এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ফরজ হওয়ার দলিল হলো– কুরআনের আয়াত– وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا অর্থাৎ যখন তলব করা হয়, তখন সাক্ষীগণ যেন সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি না জানায়। আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, সাক্ষ্য চাওয়া হলে অস্বীকৃতি জানানো নিষেধ এবং সাক্ষ্যদানের জন্যে উপস্থিত হওয়া জরুরি।

নিষেধের পর এর বিপরীতে أَمْرٌ [আদেশ] প্রমাণিত হয়। আর আদেশ দ্বারা ওয়াজিব ফরজ প্রমাণিত হয়, অতএব, তলব করা হলে দর্শকের জন্য শাহাদাত প্রদান করা ফরজ। এখানে এটাও প্রমাণ হলো যে, ফরজ হওয়ার জন্য তলব শর্ত।

ফরজ হওয়ার আরেকটি দলিল কুরআনের অন্য আয়াত– لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হলো সাক্ষ্য গোপন করা নিষেধ ও হারাম। অতএব সাক্ষ্য প্রকাশ করা জরুরি। কেননা এটা আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। সাক্ষ্য গোপন করা নিষেধ ও হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতের শেষাংশ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এ অংশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বক্তব্যকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। আয়াতের এ অংশের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে সে গুনাহগার ও অপরাধী। এটা নিশ্চিতভাবে وَعِيْد [কঠোর সতর্কবাণী]। আর কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে ফরজ/ ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

এখানে কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা গুনাহের সম্বন্ধ অন্তরের সাথে কেন করলেন? এর দুটি উত্তর হতে পারে–

১. অন্তর হচ্ছে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেতা। এটা অপরাধী হলে সব অঙ্গও অপরাধী হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, যদি অন্তর সঠিক হয়, তাহলে পুরো দেহ সঠিক হবে। আর অন্তর দূষিত হলে পুরো দেহ দূষিত হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এটা অন্তরের গুনাহ হওয়ার কারণে বড় গুনাহ।

২. অন্তরই হচ্ছে সাক্ষ্য গোপন করার স্থান। شَهَادَة -এর ক্ষেত্রে অন্তরই সম্পূর্ণরূপে পাপের স্থান। অন্যান্য গুনাহসমূহ এরূপ নয়; বরং সেগুলোর সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে, সেগুলোর মধ্যে অন্তর যদিও দায়ী হয়, কিন্তু অন্তর সম্পূর্ণরূপে পাপের ক্ষেত্র হয় না, এজন্য এখানে পাপকে অন্তরের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ বলে হিদায়ার লেখক বলেন, শাহাদাত ফরজ হওয়ার জন্যে বাদীর তলব করা শর্ত, কারণ শাহাদাত বাদীর প্রাপ্য অধিকার। অতএব অন্যান্য অধিকারের মতো এটা লাভ করা তলব করার উপর নির্ভর করবে। এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যদি বাদী সাক্ষীকে সুনির্দিষ্টভাবে না চিনে, আবার সাক্ষী মকদ্দমার বিষয়টি অবগত হয় এবং সে এটাও জানতে পারে যে, তার সাক্ষ্য না দিলে বাদী প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় তার সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব হয় অথচ এখানে তো তলব নেই?

এর উত্তর এই যে, এখানে যদিও প্রকাশ্য তলব পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু পরিস্থিতি সাক্ষ্য দাবি করছে। কারণ তলব এর মধ্যে যেমন ওয়াজিবকারী বিষয় হচ্ছে বাদীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অনুরূপ এখানেও বাদীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তথা ওয়াজিবকারী বস্তুটি রয়েছে। অতএব এখানে পরিস্থিতি বাদীর তলব বলে গণ্য হবে। ফলে এর দ্বারাও সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিব হবে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন এই যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য প্রদানের মুখ্য কারণ হলো বাদীর তলব; কিন্তু হিদায়ার লেখক বললেন, এর শর্ত হলো বাদীর তলব। আমরা জানি, শর্ত ও সববের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। সুতরাং বাদীর তলব একই সাথে শর্ত ও সবব কিভাবে হবে?

এর উত্তর হলো, বাদীর তলব হচ্ছে মুখ্য কারণ বা সবব আর সেই তলবের অস্তিত্ব হচ্ছে শর্ত। মোটকথা সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক হওয়ার সবব হলো বাদীর তলব। আর সেই তলব পাওয়া যাওয়া এর শর্ত। অতএব একই বিষয় সবব ও শর্ত হয়নি।

وَالشَّهَادَةُ فِى الْحُدُوْدِ يُخَيَّرُ فِيْهَا الشَّاهِدَيْنِ اَلسَّتْرَ وَالْاِظْهَارَ لِاَنَّهُ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ اِقَامَةَ الْحَدِّ وَالتَّوَقِّىْ عَنِ الْهَتْكِ وَالسَّتْرُ اَفْضَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِىْ شَهِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَفِيْمَا نُقِلَ مِنْ تَلْقِيْنِ الدَّرْءِ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى اَفْضَلِيَّةِ السَّتْرِ ـ

অনুবাদ : হুদূদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সাক্ষীর [সাক্ষ্য] গোপন করা এবং প্রকাশ করা [উভয়ের] এখতিয়ার [স্বাধীনতা] রয়েছে। কেননা সে দুটি পুণ্যের কাজের মাঝে রয়েছে, হদ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের দোষ প্রকাশ করা থেকে আত্মরক্ষা, কিন্তু দোষ গোপন করা উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ তার কাছে সাক্ষ্য প্রদানকারী এক ব্যক্তিকে বলেছেন, যদি তুমি তাকে কাপড় দ্বারা আড়াল করতে তাহলে তা তোমার জন্যে উত্তম হতো এবং তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর হদ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তাতে দোষ ঢেকে রাখা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ فِى الْحُدُوْدِ يُخَيَّرُ فِيْهَا الخ : ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) এ ইবারত উদ্ধৃত করে বলেন, হুদূদের ঘটনায় সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে স্বাধীন। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য প্রয়োগ করে হদ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে পারে, অথবা দোষী ব্যক্তির দোষ গোপন করত তাকে হদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

এখানে স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো, তার সাক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক নয় এবং সাক্ষী এক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিলেও পুণ্য লাভ করবে, আবার সাক্ষ্য গোপন করলেও পুণ্য পাবে। কেননা হদ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা যেমন পুণ্যের কাজ তেমনি মুসলমানের দোষ গোপন করাও পুণ্যের কাজ।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার– ১. হুদূদ ২. কিসাস ও ৩. তা'যীরাত। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

তা'যীরাত : যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে সেসব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় তা'যীরাত বলা হয়।

আর যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে সেগুলো দু রকম–

১. হুদূদ : যেসব অপরাধে আল্লাহ তা'আলার হক প্রবল সেগুলোর শাস্তিকে হদ বলা হয়। হদ-এরই বহুবচন হলো হুদূদ।

২. কিসাস : যেসব অপরাধে [শরিয়তের বিচারে] মানুষের হককে প্রবল ধরা হয়েছে সেগুলোর শাস্তিকে কিসাস বলা হয়।

হুদূদের শাস্তি সাধারণত কঠোর, এগুলোর প্রয়োগ করার আইনও কঠোর। হদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেলে এতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও লঘু করার সুযোগ নেই। এতে সুপারিশ করা ও সুপারিশ শ্রবণ উভয়টি অবৈধ। আর হুদূদের অপরাধ প্রমাণও অনেক দুরূহ কাজ। এতে অপরাধ প্রমাণ করার শর্তাদি সহজ নয়। এর নির্ধারিত শর্তাদির মধ্য হতে কোনো একটি শর্তও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে হদ প্রয়োগ করা যায় না। তাছাড়া অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়।

এসব বিবেচনা করত শরিয়ত হদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে তা থেকে অপরাধীকে বাঁচাতে সাক্ষীদের উৎসাহিত করেছে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হদ প্রতিষ্ঠা করা ও মানুষের দোষ গোপন করা দুটিই পুণ্যের কাজ। হিদায়ার লেখক বলেন, এ দু'টির মধ্যে হদ প্রতিষ্ঠা না করা অধিক উত্তম। তিনি তার এ দাবীর সপক্ষে কয়েকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন−

প্রথম হাদীস : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِيْ شَهِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ .

হাদীসের অর্থ : রাসূল ﷺ সাক্ষীকে বলেছেন, যদি তুমি [অপরাধীর ব্যাপারে সাক্ষ্য না দিয়ে] তার দোষ তোমার কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে অর্থাৎ, গোপন করতে তাহলে তোমার জন্য তা উত্তম হতো।

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যাইলাঈ মন্তব্য করেন যে, রাসূল ﷺ যাকে এ কথাটি বলেছেন সে রাসূলের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেনি; বরং সে মাঈজে আসলামীকে তার অপরাধ রাসূলের সামনে স্বীকার করতে উৎসাহিত করেছিল, তার নাম হচ্ছে হাজাল। হাজালের দাসী ফাতেমা এর সাথে মাঈজ ব্যভিচার করেছিল।

[সূত্র : بَابُ السَّتْرِ عَلٰى اَهْلِ الْحُدُوْدِ আবূ দাউদ শরীফ : খ. ২, পৃ. ২৪৫]

আবূ দাউদের হাদীসটি এরূপ−

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ .

হাদীসটি নাসায়ী, মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদে বাজ্জার, মুসনাদে আহমদ ও মুসতাদরাকে হাকীমেও রয়েছে। এই হাদীস সুস্পষ্টভাবে দোষগোপন করা উত্তম হওয়াকে প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় হাদীস : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করে আল্লাহ তা'আলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ ঢেকে রাখবেন।

এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থে রয়েছে।

তৃতীয় হাদীস : রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণের তালকীন বারবার জিজ্ঞাসাবাদ।

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন হদ থেকে অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য।

রাসূল ﷺ-এর বারবার জিজ্ঞাসা সংক্রান্ত মাঈজ এর হাদীস কিতাবুল হুদুদ -এ আলোচিত হয়েছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

রাসূল ﷺ তাকে [মাঈজকে] বলেছিলেন−

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ .....؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ .

অর্থাৎ [হে মাঈজ !] সম্ভবত তুমি চুমো খেয়েছ অথবা স্পর্শ করেছ অথবা গভীর দৃষ্টিতে দেখেছ এবং সেটাকেই ব্যভিচার মনে করছ? কিন্তু সে বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে কি তুমি সঙ্গম করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, অতঃপর রাসূল তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

অনুরূপ একটি হাদীস আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ এর সংকলকগণ আবূ উমাইয়া মাখযুমী থেকে বর্ণনা করেন−

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اِعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى فَاَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَاَمَرَ بِهٖ فَقُطِعَ .

অর্থাৎ একদা রাসূলের কাছে একটি চোরকে আনা হয়, সে চুরির অপরাধ স্বীকার করছিল; কিন্তু তার কাছে চুরি যাওয়া মাল পাওয়া যায়নি। রাসূল তাকে বললেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বলল হ্যাঁ [চুরি করেছি] বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ একথাটি দু-তিনবার পুনরুক্তি করেন। এরপর রাসূল ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

সাহাবীগণের তালকীন সংক্রান্ত হাদীস : এ প্রসঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রা.)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে–

১. হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীস, যা মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে, একদা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একটি চোর ধরে আনা হলো যে তার অপরাধ স্বীকার করছিল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, লোকটির হাত চোরের হাত বলে মনে হয় না। অতঃপর লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ ! আমি চোর নই। এরপর হযরত ওমর (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন।

২. হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস, যা আহমদ (র.) বর্ণনা করেন–

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ صَبِيٌّ شَرَاحَةُ الْهَمْدَانِيَّةُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ قَالَتْ لَا قَالَ لَعَلَّهُ اِسْتَكْرَهَكِ قَالَتْ لَا يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُوْلُ نَعَمْ.

অর্থাৎ একদা হযরত আলীর কাছে শারাখী হামদানী নামের এক মহিলাকে ব্যভিচারের অপরাধে আনা হলো সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, সম্ভবত তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ তোমার সাথে সঙ্গম করে থাকবে, সে বলল, না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার সাথে জবরদস্তিমূলকভাবে এমন করেছে? সে বলল, না, বর্ণনাকারী বলেন, আলী বারবার তাকে জেরা করছিলেন, যাতে সে হ্যাঁ বলে [এবং শাস্তি থেকে বেঁচে যায়]।

৩. আবূ মাসউদ আনসারীর হাদীস, যা ইবনে আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ আনসারীর কাছে একজন মহিলাকে ধরে আনা হলো, যে উট চুরি করেছিল। তিনি বললেন, তুমি চুরি করেছ? [এরপর বললেন] তুমি বল, না। সে বলল, না, অতঃপর তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

অনুরূপ হাদীস হযরত আবূদ দারদা, আবূ হুরায়রা, আমর ইবনুল আস ও আবূ ওয়াকিদ প্রমুখ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যারা প্রত্যেকেই হদ থেকে অপরাধীদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এ ব্যাপারে যুক্তি হলো সাক্ষ্য গোপন করা হারাম হওয়ার কারণ এই যে, এর দ্বারা বান্দার হক [অধিকার] নষ্ট হয়, অথচ বান্দা অর্থ-সম্পদের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অমুখাপেক্ষী তাই তার হক নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হুদূদের মধ্যে সাক্ষ্য গোপন করার দ্বারা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, পক্ষান্তরে মানুষও সম্ভ্রমহানি থেকে বেঁচে যায় তাই সাক্ষ্যদানের চেয়ে সাক্ষ্য গোপন করা উত্তম।

একটি প্রশ্ন ও তার নিরসন :

প্রশ্ন : সাক্ষ্য প্রদান না করাটাটা আল্লাহ তা'আলার বাণী– "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না" -এর সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া হুদূদের সাক্ষ্যদান না করা উত্তম হওয়ার হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের আয়াত বর্জন করা যায় না। অথচ এখানে তাই করা হয়েছে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াত বান্দার হকের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এর দলিল হলো আয়াতটি মানুষের পরস্পর লেনদেন করা সংক্রান্ত। তাছাড়া আয়াতটি বান্দার হক সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনের আরেকটি আয়াতও দলিল : إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ : যেসব লোকেরা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতা চর্চা করতে পছন্দ করে তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

এ আয়াতে অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা-সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো অশ্লীল বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া প্রকারান্তরে একে প্রকাশ করা ও চর্চা করা। এ কারণে হুদূদের মধ্যে ব্যভিচার ইত্যাদির সাক্ষ্য প্রদান না করাই উত্তম।

اِلَّا اَنَّهُ يَجِبُ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ فِيْ السَّرِقَةِ فَيَقُوْلُ اَخَذَ اِحْيَاءً لِحَقِّ الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ وَلَا يَقُوْلُ سَرَقَ مُحَافَظَةً عَلَى السَّتْرِ وَلِاَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتِ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ لَا يُجَامِعُ الْقَطْعَ فَلَا يَحْصُلُ اِحْيَاءُ حَقِّهِ ـ

অনুবাদ : তবে সাক্ষীর জন্য চুরির ক্ষেত্রে মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজিব। অতএব যার মাল চুরি হয়েছে তার হক প্রতিষ্ঠার জন্য সে বলবে, সে [চোর] মাল নিয়েছে। বলবে না যে, মাল [চোর] চুরি করেছে, তার দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে এবং এ কারণে যে, যদি চুরি প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে হাতকাটা অপরিহার্য হবে, মালের ক্ষতিপূরণ যেহেতু হাতকাটার সাথে একত্র হয় না, তাই তার হক প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও পাওয়া গেল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ يَجِبُ لَهُ الخ : ইতঃপূর্বে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, হুদূদের মধ্যে সাক্ষ্য গোপন করা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাক্ষীর এখতিয়ার থাকবে। উপরে উল্লিখিত ইবারতে একটি ব্যতিক্রম অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। অবস্থাটি হলো, কারো মাল চুরি করতে যদি সাক্ষী দেখে, তাহলে উক্ত মালের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব। তবে সে মালের ব্যাপারে এমনভাবে সাক্ষ্য দেবে যাতে চুরি হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ না পায়। সাক্ষী বলবে সে [চোর] নিয়েছে। সে চুরি করেছে এ কথা বলবে না, তাহলে তো হদ ওয়াজিব হবে।

সে মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে মালের হক রক্ষা করার জন্য এবং চুরির কথা বলবে না মুসলমানকে হদ থেকে রক্ষা করার জন্য।

মোটকথা মাল চুরি হলে মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব, চুরির ব্যাপারে নয়। এর দলিল হলো−

১. মালিকের হক প্রতিষ্ঠা করা।

২. যদি চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে হাত কাটা আবশ্যক হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে না। কেননা হাত কাটা হলে ক্ষতিপূরণ আসে না, আর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হলে হাত কাটা হয় না। অতএব চুরি প্রকাশ করার দ্বারা মালিকের হক বিনষ্ট করা হলো, আবার কোনোরূপ সাক্ষ্য প্রদান না করলেও মালিকের হক বিনষ্ট হয়। আর চুরির সাক্ষ্য না দিলে আল্লাহর হক নষ্ট করা হয়। অতএব বান্দার হককে রক্ষার জন্য শুধুমাত্র মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। কেননা আল্লাহ তার হকের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু বান্দা তার হকের ব্যাপারে মুখাপেক্ষী, তাই এখানে বান্দার হকের উপর আল্লাহর হককে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি যে, বান্দা ও আল্লাহর হক কোথাও একত্র হলে বান্দার হককে আল্লাহর হকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

قَالَ : وَالشَّهَادَةُ عَلٰى مَرَاتِبَ مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِى الزِّنَاءِ يُعْتَبَرُ فِيْهَا اَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاللَّاتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ وَلَا يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِحَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ (رض) مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَلِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيْمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِبَقِيَّةِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাহাদাতের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে, এর মধ্য থেকে একটি হচ্ছে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান। এতে চারজন পুরুষ সাক্ষী বিবেচ্য হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন– এবং তোমাদের রমণীগণের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন পুরুষকে সাক্ষী কর এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতএব যারা [ব্যভিচার প্রমাণের জন্য] চারজন সাক্ষী আনয়ন করতে পারে না' [তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর] এতে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা যুহরী -এর হাদীস [-এ তা নিষেধ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে] রাসূল ﷺ এবং তার পরবর্তী দুই খলিফার সমকাল থেকে এ সুন্নত [রীতি] চলে আসছে যে, হুদূদ ও কিসাসে নারীদের সাক্ষ্য বৈধ নয়। তাছাড়া এতে বদলের সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা নারীর সাক্ষ্য পুরুষের স্থলাভিষিক্তরূপে। সুতরাং এটা এমন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় যা সন্দেহের দ্বারা বাতিল হয়ে যায় এবং এর [আরেকটি শ্রেণি হচ্ছে] অন্যান্য [ব্যভিচার ছাড়া] হুদূদ ও কিসাসের সাক্ষ্য। এতে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমাদের পুরুষদের থেকে দুজন সাক্ষী কর' এবং এগুলোতেও নারীদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না আমাদের [পূর্বে] উল্লিখিত দলিলের কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالشَّهَادَةُ عَلٰى مَرَاتِبَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাহাদাতের কয়েকটি [চারটি] শ্রেণী রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে সাক্ষীগণের সংখ্যা ও সাক্ষ্যদাতা চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. ব্যভিচারের সাক্ষ্য, এতে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি।

২. ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য হুদূদ ও কিসাসের সাক্ষ্য, এতে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য।

৩. হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের সাক্ষ্য, এতে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট।

৪. নারী সম্বন্ধীয় এমন বিষয়াবলির সাক্ষ্য, যা পুরুষদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এতে একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

প্রথম প্রকার তথা ব্যভিচারের সাক্ষ্য-এর মধ্যে কমপক্ষে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য।

হিদায়া লেখক এর দলিল হিসেবে কুরআনের দুটি আয়াত পেশ করেন–

১. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ .

অর্থাৎ, তোমাদের সেসব নারী, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদের ব্যভিচার প্রমাণে তোমাদের চারজন পুরুষ আন, [অন্যথায় ব্যভিচার প্রমাণিত হবে না।]

আয়াতের মধ্যে "أَرْبَعَةً" [চার] শব্দটি সাক্ষীদের সংখ্যা নির্ধারণে সুস্পষ্ট নির্দেশ করছে, আরবি ব্যাকরণ মতে তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা স্ত্রীলিঙ্গবাচক হলে তার مَعْدُوْد [গণ্য ব্যক্তি বা বস্তুটি] পুংলিঙ্গ হয়, এখানে সংখ্যাটি যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ তাই গণ্য ব্যক্তি অবশ্যই পুরুষ হবে। অতএব আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী অপরিহার্য।

২. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً .

অর্থাৎ, যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি [ব্যভিচারের] অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর [তা প্রমাণে] চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে। –[সূরা নূর : আয়াত– ৪]

এ আয়াত দ্বারাও দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক। যারা সরাসরি সঙ্গমরত নারী-পুরুষকে দেখেছে, যেমনটি মানুষ সুরমাদানীর মধ্যে সুরমার কাঠিকে দেখে। কতিপয় লোক মনে করেন, ব্যভিচার যেহেতু দু'জনের সম্মিলিত কাজ, তাই প্রত্যেকের জন্য দু'জন সাক্ষ্য আবশ্যক। আর এভাবে দু'জন করে মোট চারজন সাক্ষী হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ব্যভিচার প্রমাণে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তার এ দাবীর পক্ষে ইমাম যুহরী বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ بَعْدَهُ أَنْ لَا تَجُوْزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُوْدِ وَالدِّمَاءِ .

ইবনে আবী শায়বা, শাবী, নাখয়ী, হাসান ও যাহহাক থেকে এ ব্যাপারে তাদের মতও বর্ণনা করেন। তারা বলেন, মহিলাদের সাক্ষ্য হুদূদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাকতু, কেননা, এটি তাবেয়ীর বাণী।

ইমাম যুহরীর হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূল ﷺ এবং তার পরবর্তী দু-খলিফা সিদ্দীকে আকবার ও ফারুকে আযমের যুগে হুদূদ এবং কিসাসের মধ্যে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিল না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, ইমাম যুহরী, প্রথম দু-খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন, অন্যদের কথা উল্লেখ করালেন না। সম্ভবত এর কারণ দুটি–

১. তাদের অনুসরণের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ অর্থাৎ তোমরা আমার তিরোধানের পর আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ কর।

২. শরিয়তের মূলনীতিগুলো এবং বিভিন্ন বিধি-বিধানের শাখা-প্রশাখার প্রায় সবের বাস্তবায়ন তাদের যুগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের যুগের কথা সর্বাগ্রে চলে আসে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدَلِيَّةِ الخ : হিদায়ার লেখক এ বাক্যটি দ্বারা নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, নারীর সাক্ষ্যের মধ্যে একটি সন্দেহ রয়েছে। কেননা তাদের সাক্ষ্য হলো বদলী সাক্ষ্য। কারণ, তাদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্তরূপে প্রযোজ্য। এই স্থলাভিষিক্তকরণের প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে পাওয়া যায়। যেমন– وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

আয়াতে বলা হয়েছে– তোমাদের দুজন পুরুষকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য না পেলে এক পুরুষ এবং অপরজনের পরিবর্তে দুজন মহিলাকে সাক্ষী কর। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা সাধারণত সাক্ষী হতে পারে না। তারা বরং পুরুষ সাক্ষীর অবর্তমানে সাক্ষীর যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ও তার জবাব : হিদায়ার লেখক বলেছেন, মহিলাদের সাক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে বদলী হওয়ার সন্দেহ রয়েছে; কিন্তু আয়াত দৃষ্টে বুঝা যাচ্ছে মহিলারা প্রকৃতই বদলী সাক্ষী; এতে কোনো সন্দেহ ও অস্পষ্টতা নেই। এর উত্তর হলো মহিলারা প্রকৃতই বদলী সাক্ষী নয়। তারা প্রকৃত বদলী তখন হতো, যদি পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে মহিলাদের সাক্ষী করা অসম্ভব হতো। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়। বাস্তবে দুজন পুরুষ বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী করা যায়। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা প্রকৃতার্থে বদলী নয়; বরং তাদের মাঝে বদলী হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। অতএব, তারা সেসব ক্ষেত্রে সাক্ষী হতে পারবে না; যেসব বিষয়ে মকদ্দমা সামান্য সন্দেহ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। ব্যভিচারের হদ যেহেতু সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তাই এতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২য় শ্রেণির সাক্ষ্য হচ্ছে ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য হদ যথা– ডাকতি, চুরি, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ্যপানের হদ এবং কিসাসের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদান। এ সবের মধ্যে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এর দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

আয়াতটিতে شَهِيْدَيْنِ শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক দ্বিবনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর আবার مِنْ رِجَالِكُمْ এর তাকীদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মহিলাদের সাক্ষ্য এতে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল হলো ইমাম যুহরীর হাদীস ও "বদলী হওয়ার সন্দেহ" এর যুক্তি, যা ইতিপূর্বে ব্যভিচারের সাক্ষ্যের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে জেনে রাখা দরকার যে, শর্তানুসারে উল্লিখিত অপরাধ প্রমাণিত না হলে হদ ও কিসাস রহিত হয়ে যাবে বটে; তবে অপরাধী সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে না। বিচারক তার অবস্থানুপাতে তাকে অন্য দণ্ড দিতে পারেন, এমনকি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দিতে পারেন।

قَالَ : وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْحُقُوْقِ يُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالاً اَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ اِلَّا فِى الْاَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْهَا عَدَمُ الْقَبُوْلِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالِ الضَّبْطِ وَقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ فَاِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْاِمَارَةِ وَلِهٰذَا لَا تُقْبَلُ فِى الْحُدُوْدِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَرْبَعِ مِنْهُنَّ وَحْدَهُنَّ اِلَّا اَنَّهَا قُبِلَتْ فِى الْاَمْوَالِ ضَرُوْرَةً وَالنِّكَاحُ اَعْظَمُ خَطَرًا وَاَقَلُّ وُقُوْعًا فَلَا يَلْتَحِقُ بِمَا هُوَ اَدْنٰى خَطَرًا وَاَكْثَرُ وُجُوْدًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। চাই হকটি অর্থ সংক্রান্ত হোক অথবা অন্যকিছু যেমন বিবাহ, তালাক, উকিল বানানো ও অসিয়ত করা ইত্যাদি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য অর্থ-সম্পদ এবং এর অধীন বিষয়াবলির ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। কেননা, শাহাদাতের মধ্যে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়াই মূলনীতি, জ্ঞানের অপূর্ণাঙ্গতার স্মরণ রাখার ত্রুটি ও ওলায়াত [ক্ষমতা]-এর স্বল্পতার কারণে। কেননা, তারা নেতৃত্বের উপযুক্ত নয়। আর এ কারণেই হুদূদে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ও স্বতন্ত্রভাবে তাদের চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণযোগ্য নয়। তবে অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আর বিবাহ এর মর্যাদা অনেক উচ্চে; কিন্তু এর পরিমাণ স্বল্প। অতএব, বিবাহ এমন বিষয়ের সাথে যুক্ত হবে না [কাতারে পড়বে না] যার মর্যাদা সামান্য; কিন্তু উপস্থিতি বেশি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْحُقُوْقِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাহাদাতের তৃতীয় শ্রেণী পূর্বোক্ত হকসমূহ ছাড়া এমন হকের ব্যাপারে যাতে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ প্রকারের হকসমূহ দু ধরনের। যথা– অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে ও অর্থনৈতিক লেনদেন ছাড়া ভিন্ন বিষয়ে।

অর্থনৈতিক লেনদেনের উদাহরণ হলো ক্রয়-বিক্রয় ও এতদসংক্রান্ত বিষয়, আর ভিন্ন বিষয় যথা– বিবাহ, তালাক, উকিল বানানো, দাসমুক্তি, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনর্বার গ্রহণ, বংশ– উত্তরাধিকার মনোনয়ন, ঋণ আদান-প্রদান, কারো জামিন হওয়া ও কাউকে জামিন বানানো ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক লেনদেন ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাথে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেকের মতও অনুরূপ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুরূপ, অন্যটি ইমাম আযমের মতের সমার্থক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, শাহাদাতের মূলনীতি অনুসারে মহিলারা সাক্ষ্য প্রদানে অযোগ্য। কারণ তাদের জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ এবং স্মৃতিভ্রষ্টতার আধিক্যের কারণে তাদের স্মরণশক্তি দুর্বল। তাছাড়া খেলাফত ও নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা না থাকাতে তাদের ওলায়াত তথা ক্ষমতা প্রয়োগেও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। অথচ সাক্ষ্যদাতার পূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ স্মৃতিশক্তি ও ওলায়াতের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। যেহেতু নারীদের মধ্যে এগুলোর ত্রুটি রয়েছে, তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) আরো বলেন, সাক্ষ্য প্রদানের মূলনীতি অনুসারে নারীদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কারণেই হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য এবং স্বতন্ত্রভাবে তাদের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তির উপর একটি আপত্তি করা হয় যে, মূলনীতি অনুসারে মহিলাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হলে অর্থনৈতিক লেনদেনে তাদের সাক্ষ্য কেন গ্রহণ করা হয়?

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয় এই বলে যে, অর্থনৈতিক লেনদেনে মহিলাদের সাক্ষ্য হুকূকুল ইবাদ [মানবীয় অধিকারসমূহ] প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়, তাছাড়া অর্থনৈতিক লেনদেন মর্যাদাগতভাবে সাধারণ; কিন্তু এর ব্যবহার বহুল। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক লেনদেনেও যদি শুধুমাত্র দুজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং নারীদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং তা প্রমাণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে, যা মাবন সমাজকে সংকটে ফেলে দেবে, অথচ ইসলাম সামগ্রিকভাবে সংকট মোচন করেছে। এ কারণেই অর্থনৈতিক লেনদেন এবং এর অনুগামী বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

বিবাহ, তালাক ও স্ত্রী পুনর্বার গ্রহণে নারী সাক্ষ্যকে পুরুষদের সাথে সংযুক্ত না করার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হলেও তা মর্যাদাগতভাবে উচ্চতর এবং তা সচরাচর ঘটে না। তাই এগুলোকে কম মর্যাদাপূর্ণ ও অধিক সংঘটিত বিষয় [অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড] -এর সাথে সংযুক্ত করা যায় না। কেননা একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে শ্রেণীগত ভারসাম্যতা আবশ্যক। আমাদের আলোচ্য বিবাহ-তালাক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড -এর মাঝে সেই ভারসাম্যতা না থাকার কারণে বিবাহ-তালাককে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মতো বিবাহ-তালাক এত ব্যাপক ও বহুল সংঘটিত বিষয় নয়, তাই এতে মহিলাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হলে বড় কোনো সংকট হবে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে পুনর্বার গ্রহণ করা সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন– وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে এতে সাক্ষী রাখ। –[সূরা তালাক : আয়াত– ২]

وَلَنَا اَنَّ الاَصلَ فِيهَا القَبُولُ لِوَجُودِ مَا يَبْتَنِىْ عَلَيهِ اَهْلِيَةُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ المُشَاهَدَةُ وَالضَّبطُ وَالاَدَاءُ اِذْ بِالاَوَّلِ يَحْصُلُ العِلْمُ لِلشَّاهِدِ وَبِالثَّانِى يَبْقٰى وَبِالثَّالِثِ يَحْصُلُ العِلْمُ لِلقَاضِى وَلِهٰذَا يُقْبَلُ اَخْبَارُهَا فِى الاَخْبَارِ وَنُقْصَانُ الضَّبطِ بِزِيَادَةِ النِّسْيَانِ اِنْجَبَرَ بِضَمِّ الاُخْرٰى اِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَّا الشُّبْهَةُ فَلِهٰذَا لَا تُقْبَلُ فِيْمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبْهَاتِ وَهٰذِهِ الحُقُوقُ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَاتِ وَعَدَمُ قَبُوْلِ الاَرْبَعِ عَلٰى خِلَافِ القِيَاسِ كَيْلَا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ ـ

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াই [আমাদের] মূলনীতি। কেননা, শাহাদাতের যোগ্যতা যার উপর নির্ভরশীল তা [তাদের মধ্যে] রয়েছে। তা হলো প্রত্যক্ষ দর্শন, স্মরণশক্তি ও সাক্ষ্য প্রদান। প্রথমটি দ্বারা সাক্ষীর জ্ঞানার্জন হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা তা অব্যাহত থাকে, আর তৃতীয়টির দ্বারা বিচারকের অবগতি লাভ হয়। এ কারণেই হাদীসশাস্ত্রে নারীদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়। স্মৃতিভ্রষ্টতার আধিক্যের কারণে স্মরণ শক্তির ত্রুটিকে আরেক নারী তার সাথে যুক্ত করে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এরপর 'বদলী সাক্ষী সংক্রান্ত' সন্দেহ ছাড়া আর সমস্যা নেই। এ কারণেই নারীদের সাক্ষ্য এমন বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়, যা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর হকগুলো সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রমাণিত হয়। চারজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ [তবে রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত] যাতে নারীদের বহির্গমন বেশি না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হানাফী মাযহাবের দলিল : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের দলিল হলো, শাহাদাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া। কারণ শাহাদাতের ভিত্তি যেসব যোগ্যতার উপর তার সবই নারীদের মাঝে বিদ্যমান। শাহাদাতের যোগ্যতার শর্তাবলি হলো– ১. প্রত্যক্ষ দর্শন ২. স্মরণশক্তি ৩. সাক্ষ্য প্রদান। আমরা দেখি নারীদের মধ্যে এ তিনটি বিষয় বিদ্যমান, তাই তারা শাহাদাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থকার বলেন, প্রথমটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ঐ বিষয়ের জ্ঞান লাভ হবে যার দ্বারা সে সাক্ষ্য প্রদান করবে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ স্মরণশক্তি দ্বারা তার অর্জিত জ্ঞান অব্যাহত থাকবে। আর সাক্ষ্য প্রদান করার দ্বারা বিচারকের অবগতি লাভ হবে এবং এর সাহায্যে সে রায় প্রদান করবে। মোট কথা, যেহেতু নারীর মধ্যে শাহাদাতের যোগ্যতার সব শর্তাবলি বিদ্যমান, তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

ফতহুল কাদীর গ্রন্থে হিদায়া গ্রন্থকারের দলিলের প্রক্রিয়ার উপর আপত্তি তোলা হয়েছে। উক্ত ভাষ্যগ্রন্থের লেখক বলেন, প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্মরণশক্তি শাহাদাতের যোগ্যতা নয়; বরং শাহাদাত প্রদানের যোগ্যতা। তিনি বলেন, শাহাদাতের যোগ্যতা বা শর্ত হচ্ছে ওলায়াত। ওলায়াতের ভিত্তি দুটো বিষয়ের উপর যথা– স্বাধীন হওয়া ও উত্তরাধিকারী হওয়া। নারীরা এ দুটি বিষয়ের অধিকারী, তাই তারা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো। এরপর সাক্ষ্য ধারণ করার যোগ্যতা দুটি বিষয় দ্বারা হয়, তা হলো প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্মরণশক্তি। এ দুটোর ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের মতো। অতএব তারা শাহাদাতের যোগ্যতা ও তা ধারণ করার যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষের মতো। তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ কারণেই তো হাদীসশাস্ত্রে নারীদের বর্ণনা অর্থাৎ তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়, যে হাদীস দ্বারা উম্মতের উপর বিধিবিধান প্রয়োগ হয়।

قَوْلُهُ وَنُقْصَانُ الضَّبطِ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সার কথা হলো, যদি নারীদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথাটি সত্য হয়, তবু এর দ্বারা যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা দুজন নারীর শর্তের কারণে এর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। অর্থাৎ দুজনের স্মৃতিশক্তি সমন্বিতভাবে একজন পুরুষের স্মৃতিশক্তির

সমান হয়ে যায়। এর প্রমাণ– আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তাদের একজন ভুলে যায় অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে।' –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮২] অতএব শুধুমাত্র বদলী সাক্ষ্য এর সন্দেহ ছাড়া এখন আর কোনো দুর্বলতা রইল না। তাই যেসব দণ্ড সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায় যথা– হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যেসব দণ্ড সন্দেহ দ্বারা রহিত হয় না যথা– হদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য হক সংক্রান্ত বিষয় নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং কিতাবে উল্লিখিত হকসমূহ যথা– বিবাহ, তালাক, রাজআত [স্ত্রীকে পুনর্বার গ্রহণ] ও দাসমুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে।

বিবাহ ও তালাক সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ এ দুটি বিষয় ঠাট্টা করার দ্বারাও সংঘটিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ [তিনটি বিষয় স্বাভাবিক উক্তি ও ঠাট্টা উভয় দ্বারা সংঘটিত হয়– বিষয় তিনটি হলো বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তি]।

সুতরাং যে বিষয় ঠাট্টা দ্বারা সংঘটিত হয়, তাতো সন্দেহ দ্বারা আরো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে। এছাড়া উকিল বানানো, কারো অসিয়ত করা ইত্যাদি ব্যাপারে شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ ও كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ দ্বারা রায় প্রদান করা যায়। এ দুটোর দ্বারা এগুলোর মধ্যে রায় প্রদান সম্ভব হলে এগুলো সন্দেহ দ্বারাও প্রমাণিত হবে। অতএব এগুলোতে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

এখানে লক্ষণীয় যে, হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিতে গিয়ে স্মরণশক্তির ত্রুটিজনিত সমস্যার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানের স্বল্পতাজনিত সমস্যার কোনো উত্তর কিতাবে উল্লেখ করেননি। হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার লেখক মায়বুজী গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের আলোকে এটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের জন্য তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, শরিয়তের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান মানুষের প্রয়োজন, তা নারীদের পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে এবং এতে কোনো অপূর্ণতা নেই। তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের জ্ঞানের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর– اِسْتِعْدَادُ عَقْل যাকে عَقْل هَيُوْلَانِىْ [জন্মগত জ্ঞান] বলা হয়। এ স্তরের জ্ঞান প্রতিটি মানুষ জন্মের সাথে সাথে লাভ করে। দ্বিতীয় স্তর– نَظَر وَفِكْر [দেখা ও চিন্তা] এর সাহায্যে মানুষ نَظَرِىْ [চিন্তালব্ধ জ্ঞান] এবং غَيْر بَدْهِىْ [স্বতঃলব্ধ নয় এমন বিষয়াবলি অর্জন করার জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বিভিন্ন جُزْئِىْ-এর মধ্যে ব্যবহার করে بَدْهِىْ [স্বতঃলব্ধ জ্ঞান] সমূহকে অর্জন করে। এ স্তরের জ্ঞানকে عَقْل بِالْمَلَكَة বলা হয়। শরিয়তের বিধানের অধীন হওয়ার ভিত্তি এ স্তরের জ্ঞানই।

তৃতীয় স্তর– কোনো চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই نَظَرِيَاتٌ [চিন্তালব্ধ জ্ঞান] অর্জন করা, একে عَقْل بِالْفِعْلِ বলা হয়।

চতুর্থ স্তর– নাযরিয়াতকে স্মরণ করা যেন তা প্রত্যক্ষ দর্শনের মতো হয়ে যায়। তাকে عَقْل مُسْتَفَادٌ বলা হয়।

যেহেতু শরিয়তের সম্পর্ক عَقْل بِالْمَلَكَة-এর সাথে। আর এ ব্যাপারে মহিলাদের মাঝে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না, তাছাড়া তাদের عَقْل بِالْمَلَكَة-এর মাঝে ত্রুটি থাকলে শরিয়তের আহকামসমূহে পুরুষের থেকে নারীর হুকুম ভিন্ন হতো অথচ তারা আহকামের ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে ভিন্ন নয়। অতএব বুঝা গেল তাদের عَقْل بِالْمَلَكَة-এর মাঝে ত্রুটি নেই। তাই তারা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য।

কেউ যদি এক্ষেত্রে আপত্তি করেন যে, রাসূল ﷺ তা নারীদেরকে শরিয়তের ব্যাপারেই نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ বলেছেন অর্থাৎ عَقْل بِالْمَلَكَة-এর ব্যাপারেই, তাহলে এর উত্তর কি?

এর উত্তর হলো, রাসূল ﷺ তাদেরকে 'নাকিসাতুল আকল' বলেছেন عَقْل بِالْفِعْلِ-এর ব্যাপারে। এ কারণে নারীর ওলায়াত, খেলাফত ও নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা নেই। অতএব রাসূলের হাদীস আমাদের বর্ণিত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়নি।

قَوْلُهُ وَعَدَمُ قُبُوْلِ الْاَرْبَعِ الخ : দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি যুক্তি খণ্ডন করছেন। তিনি বলেন, যুক্তি অনুসারে যদিও দুই পুরুষের পরিবর্তে চার মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেই যুক্তিকে পরিহার করা হয়েছে ভিন্ন কারণে, [মহিলাগণ সাক্ষ্য প্রদানে অনুপযুক্ত হওয়ার কারণে নয়] আর তা হলো– এতে করে মহিলাদের বহির্গমন বেশি হবে। অথচ মহিলাদের বেশি বহির্গমন শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ, তাই দুজন পুরুষের পরিবর্তে চারজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

قَالَ : وَيُقْبَلُ فِى الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوْبِ بِالنِّسَاءِ فِى مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ اِلَيْهِ وَالْجَمْعُ الْمُحَلّٰى بِالْاَلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ الْاَقَلَّ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رح) فِى اِشْتِرَاطِ الْاَرْبَعِ وَلِاَنَّهُ اِنَّمَا سَقَطَتِ الذُّكُوْرَةُ لِيَخِفَّ النَّظَرُ لِاَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ اِلَى الْجِنْسِ اَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اِعْتِبَارُ الْعَدَدِ اِلَّا اَنَّ الْمُثَنّٰى وَالثَّلَاثَ اَحْوَطُ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْاِلْزَامِ ثُمَّ حُكْمُهَا فِى الْوِلَادَةِ شَرَحْنَاهُ فِى الطَّلَاقِ فَاَمَّا حُكْمُ الْبَكَارَةِ فَاِنْ شَهِدْنَ اَنَّهَا بِكْرٌ يُؤَجَّلُ فِى الْعِنِّيْنِ سَنَةً وَيُفَرَّقُ بَعْدَهُ لِاَنَّهَا تَأَيَّدَتْ بِمُؤَيِّدٍ اِذِ الْبَكَارَةُ اَصْلٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সন্তান প্রসব, কুমারীত্ব ও মেয়েদের এমন স্থানের ত্রুটি, যা পুরুষরা অবগত হতে পারে না– এসবে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে স্থান পুরুষ দেখতে পারে না তাতে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। আলিফ-লাম যুক্ত [নির্দিষ্ট] বহুবচন দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য করা হয়। সুতরাং তা সর্বনিম্ন সদস্যকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং এ হাদীসটি চারজনের শর্তারোপ করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। কেননা এতে পুরুষ হওয়ার কয়েদটি পরিহার করা হয়েছে, যাতে দেখা সহজ হয়। কারণ সমগোত্রের পক্ষে সমগোত্রীয় গোপনাঙ্গ দেখা সহজ। আর একইভাবে সংখ্যার বিষয় পরিহার করা হয়েছে। তবে দুজন ও তিনজনের সাক্ষী হওয়ার মধ্যে অধিকতর সতর্কতা। এতে আবশ্যক করার বিষয় বিদ্যমান থাকার কারণে। অতঃপর সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্যের হুকুম আমরা কিতাবুত তালাকে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। আর কুমারীত্বের ব্যাপারে বিধান এই যে, যদি রমণীগণ তার [স্ত্রীর] কুমারীত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তার নপুংসক স্বামীকে এক বছর সময় দেওয়া হবে এবং এরপর বিচ্ছেদ ঘটবে। কেননা সাক্ষ্যকে সমর্থনপুষ্ট করা হয়েছে একটি সমর্থনকারী বিষয় দ্বারা। তাছাড়া কুমারীত্ব হলো মূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ فِى الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوْبِ بِالنِّسَاءِ الخ : বক্ষ্যমাণ অংশে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চতুর্থ প্রকারের সাক্ষ্য হলো, একজন নারীর সাক্ষ্য যা সন্তান প্রসব, কুমারীত্ব ও নারী দেহের এমন ত্রুটি যা পুরুষরা জানতে পারে না– এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এসব বিষয়ে একজন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। অধিকতর সতর্কতার জন্য দুজন উত্তম।

এ ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ–

ইমাম মালেক (র.) বলেন, এসব ব্যাপারে দুজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শর্ত মোতাবেক তার নারী হওয়া আবশ্যক। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হয় দুজন নারী। অতএব দু'জন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হবে চারজন নারী। সে মতে যে স্থানে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রদান অসম্ভব, সেস্থানে চারজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এর চেয়ে কম নয়।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের সারমর্ম এই যে, সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে−

১. সংখ্যা

২. পুরুষ। উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে পুরুষের সাক্ষ্য প্রদান সম্ভব নয়, তবে সংখ্যার বিধি অনুসরণ সম্ভব। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সংখ্যার শর্ত অবশ্যই থাকবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলের বাণী−

عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَطَاوُسٍ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ اِلَيْهِ .

হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত এই হাদীসটি غَرِيْبٌ ; কারো কারো মতে হাদীসটি বাতিল। তবে একই অর্থে ইমাম যুহরীর বরাতে আব্দুর রাযযাক ও ইবনে আবূ শায়বা (র.) বর্ণনা করেন−

مَضَتِ السُّنَّةُ اَنْ تَجُوْزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوْبِهِنَّ .

আব্দুর রাযযাক (র.) তাঁর মুসান্নাফে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন−

عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ اِلَّا عَلٰى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَمَا يَشْبَهُ ذٰلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ .

আব্দুর রাযযাক (র.) আরো বর্ণনা করেন−

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيٰى اَنَّ عَلِيًّا اَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِى الْاِسْتِهْلَالِ .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِى الْاِسْتِهْلَالِ .

মোটকথা, হিদায়ার গ্রন্থকারের উপস্থাপিত হাদীসটি দুর্বল হলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব যেহেতু শুধুমাত্র এ হাদীসের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এ ব্যাপারে ভিন্ন সনদে ও ভিন্ন শব্দে অনেক হাদীস রয়েছে, তাই ইমাম আযমের প্রমাণ দুর্বল নয়; বরং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এখন প্রশ্ন হলো, এ হাদীস দ্বারা একজন নারীর সাক্ষ্য কিভাবে প্রমাণিত হয়?

এ প্রশ্নের জবাবে হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, شَهَادَةُ النِّسَاءِ -এর মধ্যে اَلنِّسَاءُ শব্দটি আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। আর ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বহুবচনে নির্দিষ্টবাচক আলিফ-লাম দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য হয়। আর জিনস এর প্রয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা ও অধিক সংখ্যা উভয়ের উপর হয়ে থাকে। সে মতে نِسَاءٌ একজনও উদ্দেশ্য হতে পারে। অতএব হাদীসের বক্তব্য হলো, যেসব বিষয়ে পুরুষরা অবগত হতে পারে না তাতে একজন মহিলার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এ বক্তব্য আমাদের পক্ষে বর্ণিত আলী (রা.) ও হুযায়ফা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদীস দুটির একটিতে وَحْدَهَا [একজন] অপরটিতে اَلْقَابِلَةُ [একজন ধাত্রী] শব্দ রয়েছে। যার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। কেননা তিনি চারজন মহিলা হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। হাদীসটি ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষেও দলিল। কেননা তাঁর মতে কমপক্ষে দুজন মহিলার সাক্ষ্য লাগবে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যৌক্তিক দলিল এই যে, উল্লিখিত প্রসব, কুমারীত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষ সাক্ষী শর্ত না করার কারণ হলো মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি কমানো। কেননা নারীদের প্রতি দৃষ্টিদান হারাম, আর নারীদের প্রতি নারীদের দৃষ্টি তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর। অর্থাৎ, পুরুষ মহিলাদের দেখা যতটা ক্ষতিকর ও গুনাহের কাজ, মহিলাদের প্রতি অন্য মহিলাদের দৃষ্টি ততটা মন্দ নয়। এর কারণ হলো, মহিলারা সমলিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করলে কামনার আগুনে কম পুড়ে এবং কম উত্তেজিত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ মহিলাকে দেখলে বেশি উত্তেজিত হয় এবং তার মাঝে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এ কারণে মহিলাদের সমলিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি কম ক্ষতিকর। অতএব যখন মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিকে কমানোর উদ্দেশ্যে পুরুষ সাক্ষ্যকে এসব ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়েছে, তখন একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাক্ষ্যদাতাদের সংখ্যার বিষয়টিও বাতিল করা হয়েছে। কেননা একজন মহিলার দর্শন দুই অথবা চার মহিলার দর্শন থেকে কম ক্ষতিকর ও সাধারণ, আর অধিক সংখ্যক মহিলার দর্শন বেশি ক্ষতিকর।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) মনে করেন, দুজন অথবা তিনজন মহিলার উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সাক্ষী হওয়া সতর্কতামূলকভাবে উত্তম। কেননা উল্লিখিত বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো বিষয় লাযেম করার বিষয়টি পাওয়া যায়, এ কারণেই সাক্ষ্যদাতা মহিলার স্বাধীন ও মুসলমান হওয়া শর্ত এবং সাক্ষ্যদানের সময় أَشْهَدُ শব্দ বলা এবং তা বিচারকের এজলাসে হওয়া জরুরি। এখানে লেখকের উপর একটি প্রশ্ন আরোপিত হয়, তা এই যে, তিনি ইতঃপূর্বে বলেছেন মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পুরুষ সাক্ষী ও মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে, অথচ এখানে তিনি বললেন– দুজন ও তিনজন হলে উত্তম? এর উত্তর হলো, এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়– ১. মহিলা হওয়ার দিক থেকে এখানে সাক্ষী কম হওয়া এবং একজনের বেশি না হওয়া সমীচীন। ২. আরেকটি বিষয় হলো, কোনো কিছু আবশ্যক করা, এর চাহিদা হচ্ছে একাধিক সাক্ষী হওয়া বা অধিক সংখ্যক হওয়া। লেখক উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট তবে দুজন অথবা তিনজন হওয়া উত্তম।

লেখক বলেন, প্রমাণের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হওয়া সংক্রান্ত মাসআলা কিতাবুত তালাকের অধীনস্থ ثُبُوتُ النَّسَبِ পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, সেখানে বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বিবাহের ছয় মাসের পূর্তিতে সন্তান প্রসব করে আর স্বামী তার সন্তান প্রসব অস্বীকার করে, তাহলে একজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা প্রসব প্রমাণিত হবে।

কুমারীত্ব প্রমাণ সংক্রান্ত বিধানের স্বরূপ এই যে, কোনো নপুংসক স্বামী ও তার স্ত্রীর মাঝে বিবাদ হয়েছে এই মর্মে যে, স্বামী দাবি করছে যে, সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে, আর স্ত্রী বলছে স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় কয়েকজন মহিলা স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলল, স্ত্রী এখনো কুমারী অর্থাৎ তার সাথে সহবাস করা হয়নি। তাহলে স্বামীকে একবছর সুযোগ দেওয়া হবে তার পুরুষত্ব প্রমাণের জন্য। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি স্বামী দাবি করে যে, সহবাস করেছে, আর স্ত্রী অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক সাক্ষ্য প্রদানকারী মহিলাদের বলবেন, তোমরা দেখ স্ত্রীর কুমারীত্ব বহাল আছে কিনা। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তার কুমারীত্ব এখনো বহাল আছে, তাহলে স্ত্রী বিচারকের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা লাভ করবে– স্ত্রী তখন স্বামী ও বিচ্ছেদ যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে। যদি সে বিচ্ছেদ চায়, তবে বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। কারণ এমতাবস্থায় মহিলাদের সাক্ষ্যের একটি শক্তি যোগানদাতা তথা কুমারীত্ব পাওয়া যাচ্ছে। কেননা মেয়েদের কুমারী হওয়াই আসল বা মূল অবস্থা। সুতরাং মহিলাদের সাক্ষ্য মূল অবস্থার সাহায্যে সমর্থনপুষ্ট হওয়াতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে।

লেখক আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন, তা এই যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী কুমারী হওয়ার শর্তে ক্রয় করল, এরপর দাসী তার আয়ত্তে আসার পর কিংবা আগে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দাসীর কুমারী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ হলো– ক্রেতা বলল, দাসীর কুমারীত্বের অবসান হয়েছে। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে বলল, সে কুমারী, এমতাবস্থায় দাসীটিকে মহিলাদের দেখানো হবে। যদি মহিলারা সাক্ষ্য দেয় যে, দাসীটি কুমারী, তাহলে বিক্রয় কার্যকর হবে এবং ক্রেতার বিক্রীত দ্রব্যে দোষজনিত কারণে বিক্রীত দ্রব্য ফেরত প্রদানের অধিকার রহিত হবে। কেননা এখানেও তাদের সাক্ষ্যের একটি সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো কুমারী হওয়া আসল বা মূল অবস্থা, সেটার সাক্ষ্য দিচ্ছে মহিলারা। যেহেতু মহিলাদের সাক্ষ্য মূল অবস্থার দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হচ্ছে, তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের সাক্ষ্য কুমারীত্ব অবসানের পক্ষে হয়, তাহলে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার লাভ করবে না। কেননা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার একটি শক্তিশালী অধিকার। তাই মহিলাদের দুর্বল সাক্ষ্যের দ্বারা তা প্রমাণিত হবে না। তাছাড়া তাদের সাক্ষ্যের কোনো সমর্থনকারী নেই। তবে তাদের সাক্ষ্যের কারণে ক্রেতা তার অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পাবে এবং তাদের বক্তব্য শোনা হবে। এ কারণে বিক্রেতা থেকে বিচারক শপথ তলব করবেন। যদি দাসীটি ক্রেতা নিজ আয়ত্তে নিয়ে থাকে, তাহলে বিক্রেতা বলবে– আল্লাহর কসম! বিক্রয়ের হুকুমে দাসীটিকে কুমারী রূপে অর্পণ করেছি আর যদি ক্রেতা একে নিজ আয়ত্তে না নিয়ে থাকে, তাহলে বলবে– আল্লাহর কসম! আমি একে কুমারী অবস্থায় বিক্রয় করেছি। মোটকথা হলো, যদি বিক্রেতা শপথ করে, তাহলে বিক্রয় কার্যকর হয়ে যাবে এবং ক্রেতার দোষজনিত কারণে ফেরত দানের অধিকার রহিত হয়ে যাবে, আর যদি বিক্রেতা শপথ করতে স্বীকৃত না হয়, তাহলে ক্রেতা দাসীটিকে ফেরত দিতে পারবে।

وَكَذَا فِى رَدِّ الْمَبِيْعَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهَا ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الْبَائِعُ لِيَنْضَمَّ نُكُوْلُهُ إِلَى قَوْلِهِنَّ وَالْعَيْبُ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَأَمَّا شَهَادَتُهُنَّ عَلَى إِسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِىْ حَقِّ الْإِرْثِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ إِلَّا فِىْ حَقِّ الصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ فِىْ حَقِّ الْإِرْثِ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَوْتٌ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَلَا يَحْضُرُهَا الرِّجَالُ عَادَةً فَصَارَ كَشَهَادَتِهِنَّ عَلَى نَفْسِ الْوِلَادَةِ.

অনুবাদ : এমনিভাবে বিক্রীত দাসী ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে যখন কুমরীত্বের শর্তে ক্রয় করে থাকে। যদি তারা বলে, সে [স্ত্রী] বিবাহিতা [কুমারীত্ব বিনষ্ট হয়েছে এমন] নারী, তাহলে বিক্রেতা থেকে শপথ নেওয়া হবে, যাতে তার শপথ থেকে নিবৃত্ত থাকা তাদের [সাক্ষ্যদাতা নারীদের] কথার সাথে সংযুক্ত দোষ-ক্রটি নারী সাক্ষীদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। অতএব বিক্রেতা থেকে শপথ নেওয়া হবে। তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ের শিশুর কান্না সংক্রান্ত নারীদের সাক্ষ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উত্তরাধিকার প্রমাণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা এমন বিষয় যা পুরুষরা অবগত হতে পারে। কিন্তু নামাজের ব্যাপারে [তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য]। কেননা এটা দীনি বিষয়। তবে সাহেবাইনের মতে উত্তরাধিকার প্রমাণেও গ্রহণযোগ্য। কেননা এটা ভূমিষ্ঠের সময়ের শব্দ আর সে সময় পুরুষরা সাধারণত উপস্থিত থাকে না। সুতরাং এটা যেন প্রসব সংক্রান্ত তাদের সাক্ষ্যের মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْعَيْبُ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ الخ : এ উক্তি দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, পুরুষ যেসব বিষয় জানতে পারে না, তাতে মহিলাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সে মতে মহিলাদের কুমারী না হওয়ার সাক্ষ্যের দ্বারা ক্রেতার ফেরত প্রদানের অধিকার লাভ করা উচিত ছিল। অথচ মাসআলায় বলা হলো– বিক্রেতা থেকে শপথ নেওয়া আবশ্যক। এর ফলে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটিকে কার্যত উপেক্ষা করা হলো।

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এখানে হাদীসের উপর আমল করা হয়েছে। কেননা মহিলারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, দাসীটি কুমারী নয়। ফলে দাসীটির কুমারী না হওয়া প্রমাণিত হলো। সুতরাং দাসীর কুমারী না হওয়া মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় হাদীসের উপর আমল হয়ে গেছে। এরপর বিক্রেতা থেকে শপথ নেওয়া হবে এজন্য যে, দাসী তার কাছে থাকাকালে কুমারী ছিল বলে সে দাবি করেছে। অথচ এখন দাসীটি কুমারী নয়– একথা প্রমাণিত হয়েছে। আর উক্ত ক্রটি প্রমাণিত হলে ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতার কাছে দাসী ফেরত দানের অধিকার লাভ হয়। এ হিসেবে যে, ক্রটিটি বিক্রেতার কাছে সৃষ্টি হয়েছিল। পক্ষান্তরে যে ক্রটি বিক্রেতার হাত থেকে বিক্রীত বস্তু হস্তান্তর হওয়ার পরে সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে মাল ফেরত দানের অধিকার লাভ হয় না। এখানে শপথ নেওয়া হবে বিক্রেতার কাছে দাসী কোন অবস্থায় ছিল– তা প্রমাণের জন্য, কুমারী হওয়া বা না হওয়ার জন্য নয়। অতএব এখন আর কোনো প্রশ্ন রইল না।

লেখক বলেন, কোনো শিশু জন্মের সময় কেঁদেছে বলে যদি মহিলারা সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর শিশুটি পরক্ষণেই মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার নামাজ পড়ার ব্যাপারে সব ইমামের ঐকমত্যে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য দ্বারা এ কথা প্রমাণ হবে যে, শিশুটি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে পরে মারা গিয়েছে। কেননা, জানাযার নামাজ হলো দীনি বিষয়। আর দীনি বিষয়ে এক নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যেমন– রমজান মাসের চাঁদের ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।

তবে উত্তরাধিকার প্রমাণে মহিলারদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়া বা না হওয়ার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতে, এতে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাহেবাইনের মতে, গ্রহণযোগ্য।

মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে মায়ের গর্ভে রেখে ইহলোক ত্যাগ করল। এরপর মা শিশুটি প্রসব করল। একজন মহিলা অথবা একাধিক মহিলা সাক্ষ্যদান করলে যে, শিশুটি জন্মের পর কেঁদেছিল অর্থাৎ শিশুটি জীবিত জন্মেছিল। অতএব, এ শিশুটি তার মৃত পিতার উত্তরাধিকার লাভ করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এই শিশুটির উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য তার কান্নার সাক্ষ্যের বেলায় নারী সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে। অনুরূপ মত পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী (র.)।

অন্যদিকে সাহেবাইন (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে উত্তরাধিকার প্রমাণে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এটি ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদেরও মত। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এরূপ একটি মতও বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আযম (র.) বলেন, নবজাত শিশুর কান্না এমন বিষয়, যা পুরুষগণও শুনতে পায় ও অবগত হতে পারে। আর এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো যা পুরুষ অবগত হতে পারে, তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, এতে নারী সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রসব ভিন্ন বিষয়। প্রসব বলা হয় মায়ের থেকে সন্তানের পৃথকীকরণকে। প্রসব সম্পর্কে পুরুষদের অবগত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই এতে নারী সাক্ষী আবশ্যক। এ কারণে প্রসব প্রমাণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

সাহেবাইনের দলিল : তাঁরা বলেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশু কাঁদে, এ সময়টাতে সাধারণত পুরুষ কাছে থাকে না। সুতরাং নবজাত শিশুর কান্নার সাক্ষ্য দেওয়া মূলত শিশুর জন্মের সাক্ষ্য দেওয়া, আর জন্মের বা ভূমিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তাই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়ের কান্নার ব্যাপারেও নারীদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইনের দলিলের উত্তর দেওয়া হয় এই বলে যে, পুরুষের নারী সংক্রান্ত কোনো বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব না হলে তাতে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণীয়, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ, কোনো বিষয় যদি এমন হয় যে, এটি পুরুষ অবগত হতে পারবে, তাহলে তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় নবজাত শিশুর প্রথম কান্না বা শব্দ এমন, যা পুরুষের পক্ষে শোনা সম্ভব, তাই এতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে প্রসব অর্থ যেহেতু মা থেকে সন্তান পৃথক হওয়া, এতে পুরুষের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই; তাই এতে পুরুষের অবগত হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং যেহেতু প্রসব সম্পর্কে অবগত হওয়া পুরুষের পক্ষে অসম্ভব– তাই এতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। উল্লেখ্য যে, হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে সাহেবাইনের মতটিকে অধিক উত্তম বলা হলেও ফাতওয়ায়ে শামীতে ইমাম আযমের মতের উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَلَابُدَّ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الشَّاهِدُ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَمَّا الْعَدَالَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَالْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّاهِدِ هُوَ الْعَدْلُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَلِأَنَّ الْعَدَالَةَ هِيَ الْمُعَيِّنَةُ لِلصِّدْقِ لِأَنَّ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ الْكَذِبِ قَدْ يَتَعَاطَاهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) أَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوَّةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَأْجَرُ لِوَجَاهَتِهِ وَيَمْتَنِعُ عَنِ الْكَذِبِ لِمُرُوَّتِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إِلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُّ عِنْدَنَا وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ وَأَمَّا لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فَلِأَنَّ النُّصُوصَ نَطَقَتْ بِاشْتِرَاطِهَا إِذِ الْأَمْرُ فِيهَا بِهٰذِهِ اللَّفْظَةِ وَلِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ تَوْكِيدٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ أَشْهَدُ مِنْ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ فَكَانَ الْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْكَذِبِ بِهٰذِهِ اللَّفْظَةِ أَشَدَّ وَقَوْلُهُ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَّى يُشْتَرَطَ الْعَدَالَةُ وَلَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْزَامِ حَتَّى اخْتَصَّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর শাহাদাতের মধ্যে [সাক্ষীর] ন্যায়-নীতিবান হওয়া ও শাহাদাত শব্দটি থাকা আবশ্যক। সুতরাং যদি সাক্ষ্যদাতা শাহাদাত শব্দটি উল্লেখ না করে এবং বলে "আমি জানি" বা আমি নিশ্চিত জানি তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি [ধর্তব্য] কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যেসব সাক্ষীকে তোমরা পছন্দ কর" নীতিবানই পছন্দনীয় সাক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী কর" তাছাড়া ন্যায়পরায়ণতাই সততাকে নির্ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় সে কখনো মিথ্যা বলে ফেলে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো ফাসিক যদি লোকদের মাঝে মহাসম্মানের অধিকারী ও সজ্জন ব্যক্তি হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সম্মান-আভিজাত্যের কারণে তাকে কেনা যাবে না এবং সে ভদ্র হওয়ার কারণে মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। তবে যদি কোনো বিচারক ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রায় প্রদান করে, তাহলে আমাদের মতে তা বৈধ [হয়ে যাবে]। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বৈধ নয়। এ মাসআলাটি প্রসিদ্ধ। অনন্তর শাহাদাত শব্দটি [আবশ্যক] কেননা, নসসমূহ এর শর্তারোপ করেছে। তাছাড়া নসের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে এই শব্দের সাথে সাক্ষ্য দানের নির্দেশ রয়েছে। উপরন্তু এতে খুবই তাগিদ বিদ্যমান। কেননা, "আশহাদু" শব্দটি শপথের শব্দ। ফলে এই শব্দের সাথে মিথ্যা থেকে দৃঢ়ভাবে নিবৃত্ত থাকা হয়। তার [ইমাম কুদূরীর] শব্দ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ -এর দ্বারা পূর্বোক্ত সব প্রকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনকি ন্যায়পরায়ণতা ও শাহাদাত শব্দটি প্রসব ইত্যাদিতে মহিলাদের সাক্ষ্যের মধ্যেও শর্ত করা হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, এটাও সাক্ষ্য প্রদান; যেহেতু এতে লাজেম করার বিষয় রয়েছে। এ কারণেই এটি বিচারকের এজলাসের সাথে খাস এবং সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সাক্ষীর স্বাধীন হওয়া ও মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَابُدَّ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে সাক্ষীদের আবশ্যিক গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মৌলিকভাবে সাক্ষীর আবশ্যিক গুণাবলি হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও ন্যায়পরায়ণ [আদিল] হওয়া এবং সাক্ষ্য দানের সময় শাহাদাত শব্দটি ব্যবহার করা।

সাক্ষ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ বা নীতিবান হওয়ার অর্থ হলো সাক্ষীর সৎকাজের পরিমাণ মন্দ বা গুনাহের চেয়ে বেশি হওয়া। অর্থাৎ লোকটি কবিরা গুনাহ থেকে নিবৃত্ত থাকে, ছগীরা গুনাহ বারংবার করে না, তার কল্যাণকর ও সঠিক কাজ অকল্যাণকর ও মন্দ কাজের চেয়ে বেশি।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শাহাদাতের সর্বস্তরে [চারটি স্তরেই] সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত এবং সাক্ষ্য প্রদানের সময় শাহাদাত শব্দের উল্লেখ করা আবশ্যক।

অতএব, সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলবে –আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। সে যদি বলে আমি জানি বা আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়া কেন শর্ত– লেখক এ সম্পর্কে বলেন–

১. মহান আল্লাহর বাণী– وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ .... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ তোমাদের থেকে এমন দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী কর, যাদের তোমরা পছন্দ কর। মোটকথা সাক্ষী তোমাদের পছন্দনীয় ব্যক্তি হতে হবে। আর এটা তো স্পষ্ট যে, মুসলমান সমাজে ফাসিক পছন্দনীয় হতে পারে না। অতএব আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হতে হবে– ফাসিক হলে চলবে না।

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ সৎব্যক্তিকে সাক্ষী কর।' এ আয়াত দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

৩. যুক্তি : শাহাদাত বা সাক্ষ্য সাক্ষীর সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার কারণে দলিল বিবেচিত হয়। আর ন্যায়পরায়ণতার দ্বারাই সত্য ও সততা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সত্যবাদী ও সৎ হয়। কেননা, ফাসিক দ্বীনের নিষিদ্ধ কাজ ও অপরাধের মধ্যে জড়িত থাকে। ফলে সে কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কেননা, সে যেহেতু পাপকে ভয় করে না এবং এর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না তাই সে মিথ্যাকে ভয় করবে না এবং এর থেকে সংযত থাকার চেষ্টা করবে না। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার সম্ভাবনার কারণে ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। যেহেতু মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে বলে ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, সেহেতু সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। লেখক বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ ব্যাপারে একটি মত রয়েছে– তিনি বলেন, ফাসিক ব্যক্তি যদি সমাজের শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও ভদ্র-সজ্জন হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে বিক্রি হবে না। অর্থাৎ সে তার মান-ইজ্জতের কথা চিন্তা করে বাদী অথবা আসামী থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। কেননা, এতে সে সমাজে শঠ-অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। একইভাবে ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কারণেও সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। মোটকথা, যখন সম্মানী ফাসিক ব্যক্তিকে তার সম্মান-মর্যাদা ও ভদ্রতা মিথ্যা থেকে নিবৃত্ত রাখবে, তখন তার মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর মিথ্যা বলার সম্ভাবনা না হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে।

তবে লেখক বলেন, প্রথমোক্ত মতটি অর্থাৎ সাধারণভাবে ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য চাই যে সম্মানিত ব্যক্তি হোক অথবা সাধারণ ব্যক্তি হোক– অধিক বিশুদ্ধ। এর দলিল হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি সরাসরি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, কুরআনের আয়াত– وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়াতটি অন্যায়পরায়ণ তথা ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে মুতলাক তথা শর্তহীন। অর্থাৎ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে কোনো ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আরেকটি দলিল হলো এ আয়াতটি– اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا অর্থাৎ ফাসিকের সংবাদ কোনো অনুসন্ধান না করে গ্রহণ করা যাবে না।

এ ছাড়া যুক্তি এই যে, শাহাদাত গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করা মূলত সাক্ষীকে সম্মান করা। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন।

اَكْرِمُوا الشُّهُوْدَ অর্থাৎ তোমরা সাক্ষীকে সম্মান কর। সুতরাং ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করার অর্থ হলো তাকে সম্মান করা। অথচ ফাসিককে অসম্মান ও নীচ মনে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন- اِذَا لَقِيْتَ الْفَاسِقَ فَالْقَهُ بِوَجْهٍ مُكَفْهِرٍ অর্থাৎ, যখন ফাসিকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তার সাথে বিরক্ত চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করো। মোটকথা ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। লেখক বলেন, তবে বিচারক যদি ফাসিকের সাক্ষ্য অনুসারে রায় প্রদান করেন, তাহলেও তা গ্রহণীয় এবং বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে যাবে। যদিও বিচারক গুনাহগার হবে। এটা আহনাফের মত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফাসিকের সাক্ষ্য কোনো অবস্থাতেই গ্রাহ্য হবে না এবং সে সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করা যাবে না। সুতরাং যদি কোনো বিচারক সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদানও করেন, তা বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

লেখক বলেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা, কিতাবুল কাযী -এর শুরুতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শাহাদাত শব্দের শর্ত সম্পর্কে লেখক বলেন, কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি শাহাদাত শব্দের সাথে এসেছে : যেমন- ১. اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ ২. وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ৩. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ৪. وَاَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ইত্যাদি।

উপরন্তু রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلَّا فَدَعْ অর্থাৎ, তুমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখলে সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় সাক্ষ্য প্রদান পরিহার কর। মোটকথা সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসে শাহাদাত শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সাক্ষ্য প্রদানে শাহাদাত শব্দটির স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার বৈধ নয় এবং অন্য শব্দ দ্বারা তা প্রকাশ করার চেষ্টা করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : নামাজের শুরু সম্পর্কে কুরআনের বর্ণিত শব্দ হলো- اَللّٰهُ اَكْبَرُ যেমন সূরা মুদ্দাছছিরে বলা হয়েছে- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ; এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন- اَللّٰهُ اَعْظَمُ ও اَللّٰهُ اَجَلُّ শব্দ দ্বারা নামাজ শুরু করা বৈধ। তাহলে তার মতটি কি আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়?

উত্তর : এর উত্তর হলো, তাকবীর দেওয়া হয় সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। উপরিউক্ত দু'টি বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শন সম্ভব বলে বাক্যদ্বয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর মত। তাই বাক্যদ্বয়কে তাকবীরের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য অংশে শাহাদাত শব্দটি অর্থ প্রত্যক্ষ দর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর এ অর্থ اَعْلَمُ বা اَيْقَنُ -এর মধ্যে নেই, তাই এ শব্দদ্বয় দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না।

আরেকটি দলিল এই যে, শাহাদাত শব্দটি প্রত্যক্ষ দর্শনের অর্থ প্রদান করার সুবাদে এতে তাগিদ ও দৃঢ়তা বেশি। আবার اَشْهَدُ শব্দটির মধ্যে শপথের অর্থ বিদ্যমান। কেননা, এর দ্বারা শপথের অর্থ আদায় করা হয় অথবা এটি শপথ আদায়বাচক শব্দ। ফলে এই শব্দটি ব্যবহার করার কারণে মিথ্যা সাক্ষী থেকে অধিক বিরত থাকবে, আর এটাই শাহাদাত দ্বারা উদ্দেশ্য যে, সাক্ষী মিথ্যা থেকে দূরে থাকুক। মোটকথা যেহেতু শাহাদাত শব্দটিতে দৃঢ়তা শক্তি ও মিথ্যা থেকে দূরত্ব রয়েছে, তাই সাক্ষ্যদাতাকে সাক্ষ্য প্রদানে শাহাদাত শব্দটি ব্যবহার করতেই হবে।

লেখক ইমাম কুদূরীর বাক্য وَلَابُدَّ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ -এর ব্যাপকতা সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা শাহাদাতের পূর্বে বর্ণিত চারটি স্তরই উদ্দেশ্য। চার বা সবগুলো স্তরের সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং সাক্ষ্যদাতাকে সাক্ষ্যপ্রদানে শাহাদাত শব্দটি ব্যবহার করতেই হবে।

এমনকি প্রসব প্রমাণে মহিলা সাক্ষী এর ব্যাপারেও শর্ত দুটি প্রযোজ্য। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এতে [প্রসব প্রমাণে] -ও লাজেম করার অর্থ বিদ্যমান। যেহেতু লাযেম করার অর্থ বিদ্যমান তাই প্রসবের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য শুধুমাত্র সংবাদ দানই নয়; বরং শাহাদাত বলে গণ্য হবে।

শাহাদাত হওয়ার কারণেই সাক্ষীর মুসলমান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া জরুরী এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য প্রদান করা জরুরী। এসব শর্ত নিশ্চিতভাবে শাহাদাতকেই প্রমাণ করে। মোটকথা, যেহেতু এটা শাহাদাত তাই নারী সাক্ষীকে 'শাহাদাত' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهُ شَهَادَةٌ الخ : একথা বলে গ্রন্থকার এ বিষয়ের বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইরাকের ফকীহগণের যে ভিন্নমত রয়েছে যে, সাক্ষীর প্রসব প্রমাণে শাহাদাত শব্দটি ব্যবহার করা আবশ্যক নয়- তা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

قَالَ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلٰى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِى الْمُسْلِمِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ حَالِ الشُّهُوْدِ حَتّٰى يَطْعَنَ الْخَصْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا مَحْدُوْدًا فِىْ قَذْفٍ وَمِثْلُ ذٰلِكَ مَرْوِىٌّ عَنْ عُمَرَ (رضـ) وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْاِنْزِجَارُ عَمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ دِيْنِهِ وَبِالظَّاهِرِ كِفَايَةٌ اِذْ لَا وُصُوْلَ اِلَى الْقَطْعِ اِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَاِنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الشُّهُوْدِ لِاَنَّهُ يَحْتَالُ لِاِسْقَاطِهَا فَيَشْتَرِطُ الْاِسْتِقْصَاءَ فِيْهَا وَلِاَنَّ الشُّبْهَةَ فِيْهَا دَارِئَةٌ وَاِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيْهِمْ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لِاَنَّهُ تُقَابِلُ الظَّاهِرَانِ فَيَسْأَلُ طَلَبًا لِلتَّرْجِيْحِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) لَابُدَّ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فِىْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ لِاَنَّ الْقَضَاءَ مَبْنَاهُ عَلَى الْحُجَّةِ وَهِىَ شَهَادَةُ الْعُدُوْلِ فَيَتَعَرَّفُ عَنِ الْعَدَالَةِ وَفِيْهِ صَوْنُ قَضَائِهِ عَنِ الْبُطْلَانِ وَقِيْلَ هٰذَا اِخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَالْفَتْوٰى عَلٰى قَوْلِهِمَا فِىْ هٰذَا الزَّمَانِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিচারক মুসলমান সাক্ষীর বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতার উপর [তার অনুসন্ধান] সীমিত রাখবেন। সাক্ষীদের অবস্থা অনুসন্ধান করবেন না। যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ [তাদের ব্যাপারে] সমালোচনা বা আপত্তি করে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানগণ ন্যায়পরায়ণ তাদের কতক অন্য কতকের উপর সাক্ষী, তবে অপবাদ আরোপের অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম ভিন্ন। অনুরূপ বক্তব্য হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত। আর এ কারণে যে, মুসলমানদের স্বাভাবিক অবস্থা তো এরূপ যে, তারা শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। বাহ্যিক অবস্থাকে যথেষ্ট মনে করবে। কেননা, নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয় তবে হুদুদ ও কিসাসের মধ্যে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা জরুরী। সাক্ষীদের সম্পর্কে বিচারক এগুলোর অনুসন্ধান চালাবেন। কেননা, বিচারক এতসব শাস্তি রহিত করার ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করেন। সুতরাং এতে পূর্ণ অনুসন্ধান শর্ত করা হয়েছে। তাছাড়া হুদূদের মধ্যে সন্দেহ শাস্তিকে বিদূরীত করে। আর যদি প্রতিপক্ষ সাক্ষীদের ব্যাপারে আপত্তি তুলে, তাহলে বিচারক তাদের প্রকাশ্যে ও গোপনে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কেননা, দু'টির প্রকাশ্য অবস্থা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে, তাই তিনি [একটি জাহিরকে] প্রাধান্যদানের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত করবেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সব ধরনের হকের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সম্পর্কে বিচারকের তদন্ত করা উচিত। কেননা, বিচারকার্যের ভিত্তি হলো দলিল-প্রমাণের উপর। আর তা হলো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। অতএব, ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া উচিত। আর এতেই তার বিচারকার্যকে বাতিল করা থেকে সংরক্ষণ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটা সমকালীন যুগের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুগে সাহেবাইনের উক্তির উপর ফতোয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ الخ : এ ব্যাপারে সব ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণ [আদিল] হতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি বাদী বিচারকের এজলাসে সাক্ষী উপস্থিত করে, আর বিবাদী সাক্ষীর উপর কোনো আপত্তি না করে অর্থাৎ সে সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস, অমুসলিম ও অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত ইত্যাদি না বলে, মোটকথা এমন কোনো দোষের কথা না বলে যার দ্বারা তার সাক্ষ্য বাতিল হতে পারে; তাহলে বিচারক মুসলমান সাক্ষীর বাহ্যিক অবস্থার ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিবে। তার ন্যায়পরায়ণতা যাচাই ও তদন্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এর দলিল মহানবী ﷺ -এর বাণী– اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا مَحْدُوْدًا فِىْ قَذْفٍ رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ - অর্থাৎ, সব মুসলমান ন্যায়ের উপর রয়েছে। তারা একজন অপরজনের জন্য সাক্ষী হবে। যদি অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত আসামী না হয়। কেননা, এ ব্যক্তির সাক্ষ্য কোনো মুসলমানের বিপক্ষে দলিলরূপে গণ্য হয় না। এরূপ একটি হাদীস হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা.)-এর নিকট লিখিত এক পত্রে বলেন, اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا مَحْدُوْدًا فِىْ قَذْفٍ হযরত ওমর (রা.)-এর এ বক্তব্য ও উপরে উল্লিখিত রাসূল ﷺ -এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মুসলমান ব্যক্তির সাক্ষ্য কোনো অনুসন্ধান ও তদন্ত ছাড়াই গ্রহণযোগ্য।

এ ব্যাপারে যুক্তি এই যে, মুসলমানের বাহ্যিক অবস্থা তো এরূপই হবে যে, যে দ্বীন কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ যথা– মিথ্যা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, তার এই প্রকাশ্য অবস্থার উপরই ফায়সালা হওয়া সমীচীন। কেননা, সুনিশ্চিত ও দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে সাক্ষীদের অবস্থা অবগত হওয়া মোটেও সহজ কাজ নয়; বরং এটা দুরূহ, বলতে গেলে অসম্ভব একটি কাজ। কেননা, উদাহরণস্বরূপ বিচারক সাক্ষী সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করল, আর সেই ব্যক্তি তাকে ন্যায়পরায়ণ বলল, তাতেও তার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, সে আসলেই ন্যায়পরায়ণ। তবে যদি তার সম্পর্কে মন্তব্যকারী মিথ্যাবাদী না হয়, তাহলে সাক্ষী সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় আমরা মন্তব্যকারী ব্যক্তিকে সত্যবাদী ধরে নিয়ে সাক্ষীকে সত্যবাদী ও সৎ মনে করতে পারি। তবে এখানে কেউ হয়তো বলবেন, আপনি মন্তব্যকারীকে সত্যবাদী যেভাবে মনে করছেন, সেভাবে সাক্ষী সম্পর্কে এটা মনে করুন যে, সে মিথ্যা বলবে না, কারণ, সে তো মুসলমান, আর মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। কোনো মুসলমান সম্পর্কে এই ধারণা করাই মূলত তার বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করা।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো বাহ্যিক অবস্থা বা জাহির দ্বারা কোনো হক প্রতিহত করা যায় বটে; কিন্তু এর দ্বারা হক প্রমাণ করা যায় না। অথচ ইমাম আযম (র.) বললেন, সাক্ষীদের জাহির বা বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা বাদীর জন্য তার পার্থিব বা দাবিকৃত বিষয়ের অধিকার প্রমাণ হয়। অতএব, ইমাম আযমের কথামত তো জাহিরী অবস্থা দ্বারা হক প্রমাণ করা হলো।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, কোনো বিষয় যদি জাহির [বাহ্যিক অবস্থা] -এর সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়, তাহলে জাহির দ্বারা হক প্রমাণ করা যায়। আর এখানে তাই হয়েছে। কেননা, আমরা সাক্ষীর জাহেরী তথা বাহ্যিক অবস্থার ন্যায়পরায়ণতাকে তখনই যথেষ্ট মনে করি, যখন প্রতিপক্ষ সাক্ষী সম্পর্কে কোনো আপত্তি না তুলে। এখানে প্রতিপক্ষ সাক্ষীর ব্যাপারে কোনো আপত্তি না করাতে সাক্ষীর জাহেরী ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোনো বিষয় সাংঘর্ষিক হয়নি, তাই সাক্ষীগণের জাহেরী ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা বাদীর হক প্রমাণিত হবে।

উক্ত প্রশ্নের আরেকটি উত্তর এই যে, কোনো কোনো জাহেরী অবস্থা দ্বারা হক প্রমাণিত হয়। আবার কোনো জাহির দ্বারা অধিকার প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, যে জাহির দ্বারা অধিকার প্রমাণ করা যায় না তাকে ইসতিসহার বলা হয়। ইস্‌তিসহারের অর্থের জাহির দ্বারা অধিকার [হক] প্রমাণ না করা গেলে সব জাহির দ্বারা হক প্রমাণ করা যাবে না– এটা বলা সমীচীন নয়। অতএব, প্রশ্নকারীর আপত্তি সাধারণ অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো মুসলমান সাক্ষী হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে সাক্ষ্য দিলে তার জাহিরী ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থা রেখে বিচারক রায় প্রদান করবেন না; বরং তিনি সাক্ষীগণের সম্পর্কে পরিপূর্ণ তদন্ত করবেন– বিচারক এতে প্রতিপক্ষের অভিযোগ-আপত্তির অপেক্ষা করবেন না। অর্থাৎ আসামীপক্ষ আপত্তি করুক বা না করুক বিচারক সাক্ষীগণের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করবেন।

এর কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে শরিয়তের পক্ষ থেকে বিচারকের প্রতি নির্দেশ এই যে, তারা যথাসম্ভব হুদূদ ও কিসাস বাস্তবায়ন করা থেকে আসামীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এ কারণে সাক্ষীগণের আদ্যপান্ত অবস্থা তদন্ত করবেন যাতে সাক্ষীগণের মধ্যে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে যার দ্বারা হদ বা সাজা থেকে আসামী রক্ষা পায়। ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, সামান্য সন্দেহ দ্বারা হদ বাতিল হয়ে যায়।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলিল এই যে, সাক্ষীগণের জাহেরী ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থা রাখার কারণে তাদের ন্যায়-নীতিবান হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে যায়। আর হুদূদের মধ্যে সন্দেহ হলে হদ রহিত হয়ে যায়।

অতএব, হুদূদকে সপ্রমাণ করার জন্য সাক্ষীগণের বাহ্যিক অবস্থার উপর বিচারকের অনুসন্ধান সীমিত রাখা বৈধ নয়; বরং সাক্ষীগণের পূর্ণ অবস্থা যাচাই ও তদন্ত করা আবশ্যক।

লেখক বলেন, হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য হকের ব্যাপারে যদি আসামী পক্ষ বা প্রতিপক্ষ সাক্ষীগণ সম্পর্কে এমন আপত্তি উত্থাপন করেন, যার দ্বারা তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়, এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষীগণের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ও গোপনে

উভয়ভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান করবেন, যাতে অভিযোগ প্রমাণিত হয় বা সাক্ষীর সাধুতা প্রমাণ হয়। কেননা, এখানে দু'টো জাহির পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে। একটি হলো সাক্ষীর মিথ্যাবাদী না হওয়া অপরটি হলো বিবাদী তার আপত্তির বেলায় মিথ্যাবাদী না হওয়া। বিষয়টির খোলাসা এই যে, মুসলমান হওয়ার কারণে সাক্ষীগণের জাহেরী অবস্থার দাবী হলো তারা সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যাবাদী হবেন না এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাদীর মামলার রায় প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে বিবাদীর জাহেরী অবস্থার দাবী এই যে, সে তার আপত্তির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হবে না এবং তার আপত্তির কারণে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। অতএব, দু'টি জাহির এখানে পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে –এমতাবস্থায় কোনো একটি জাহিরকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারককে সাক্ষীগণের অবস্থা তদন্ত করতে হবে। সুতরাং বিচারকের তদন্তের পর যদি সাক্ষীগণ নির্দোষ ও আপত্তিমুক্ত প্রমাণিত হন, তাহলে তাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে তাদের জাহিরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর যদি বিবাদীর উপস্থাপিত আপত্তি প্রমাণিত হয়, তাহলে বিবাদীর জাহিরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য এই যে, সব ধরনের হকের ক্ষেত্রে সাক্ষীগণের অবস্থা বিচারক প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করবেন এবং এটা না করে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। তাঁর তদন্ত বিবাদীর অভিযোগ ও আপত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। বিবাদী আপত্তি করুক বা নাই করুক, বিচারক প্রথমে তদন্ত করবেন। তারপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ বা বর্জন করবেন। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, সাক্ষীগণ যদি ন্যায়পরায়ণতা তথা দীনদারি, আমানতের প্রতি যত্নশীলতা ও সততার ক্ষেত্রে সমাজে সুপরিচিত হয়। তাহলে বিচারক তার অবস্থা তদন্ত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি তার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ এমন বিষয়ের দ্বারা কুখ্যাত হয়, যার কারণে সাক্ষ্যপ্রদান ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আর যদি নীতিবান হওয়া ও ভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ হয়, তাহলে বিচারক সাক্ষীর অবস্থা তদন্ত করবেন।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : তারা বলেন, বিচারকের রায় দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর দলিল হলো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য। সাক্ষীদের ন্যায়-নীতিবান হওয়া যেহেতু বিচারকের জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের দ্বারা উদঘাটিত হয় তাই সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা ও দীনদারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত করা বিচাবকের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, সাক্ষীদের অবস্থা যাচাই করা হলে বিচারকের রায় অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, বিচারক যদি সাক্ষীদের অবস্থা যাচাই না করে রায় প্রদান করেন আর পরবর্তী সময়ে সাক্ষীদের কোনো একজন ক্রীতদাস, অথবা কাফের অথবা অপবাদের সাজাপ্রাপ্ত আসামী বলে প্রকাশ পায়, তাহলে তার রায় অকার্যকর হয়ে যায়। আর যদি বিচারক সাক্ষীগণের অবস্থা যাচাই-তদন্ত করে রায় প্রকাশ করেন, তাহলে তার রায় অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে না। আর বিচারকের রায় যথাসম্ভব অকার্যকর হওয়া থেকে সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। তাই বিচারকের রায়কে অকার্যকর না করার জন্য সাক্ষীগণের অবস্থা তদন্ত করা জরুরী বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইনের মাঝে সে মতবিরোধ যে, সাক্ষীগণের অবস্থা পূর্ণ যাচাই করা হবে কিনা? এটা দলিল-প্রমাণের কারণে মতবিরোধ হয়নি; বরং তাদের মত বিরোধের কারণ হলো যুগের দূরত্ব। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাক্ষীগণের বাহ্যিক অবস্থার ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করেছেন ঐ যুগে, যখন লোকেরা সমাজের কল্যাণকর কাজ ও দীনের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠাবান ছিল। সর্বসাধারণ লোকেরা তখন সত্যবাদিতায় অভ্যস্ত ছিল। তার যুগ ছিল রাসূল ﷺ বর্ণিত خَيْرُ الْقُرُوْنِ-এর একটি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكِذْبُ .

এ হাদীসে রাসূল ﷺ তিনটি যুগকে পর্যায়ক্রমে উত্তম বলেছেন– সে যুগগুলো হলো সাহাবাগণের যুগ, তাবেয়ীগণের যুগ ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ। এরপর মিথ্যার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে ছিলেন, তাই তারা ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই তিনি তাদের জাহিরী অবস্থার ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) ছিলেন চতুর্থ যুগের লোক, যাদের মাঝে ব্যাপকভাবে মিথ্যা, অকল্যাণ বিদ্যমান ছিল, তাই তারা তাদের যুগের লোকদের ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থার ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করেননি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বর্তমান যুগে সাহেবাইনের মতের উপর ফতোয়া। কারণ এখনকার সাধারণ লোকদের তো কোনো কথাই নেই, বিশেষ দীনদার লোকেরাও সামান্য স্বার্থের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং অবলীলায় মিথ্যা বলে ফেলে।

ثُمَّ التَّزْكِيَةُ فِى السِّرِّ اَنْ يَبْعَثَ الْمَسْتُورَةَ اِلَى الْمُعَدِّلِ فِيْهَا النَّسَبُ وَالْحِلْىُّ وَالْمُصَلّٰى وَيَرُدَّهَا الْمُعَدِّلُ وَكُلُّ ذٰلِكَ فِى السِّرِّ كَيْلَا يَظْهَرَ فَيُخْدَعَ اَوْ يُقْصَدَ وَفِى الْعَلَانِيَةِ لَابُدَّ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ لِيَنْتَفِىَ شُبْهَةُ تَعْدِيْلِ غَيْرِهٖ وَقَدْ كَانَتِ الْعَلَانِيَةُ وَحْدَهَا فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَوَقَعَ الْاِكْتِفَاءُ فِى السِّرِّ فِىْ زَمَانِنَا تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ وَيُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ ثُمَّ قِيْلَ لَابُدَّ اَنْ يَقُوْلَ الْمُعَدِّلُ هُوَ حُرٌّ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لِاَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُعَدَّلُ وَقِيْلَ يَكْتَفِىْ بِقَوْلِهٖ هُوَ عَدْلٌ لِاَنَّ الْحُرِّيَّةَ ثَابِتَةٌ بِالدَّارِ وَهٰذَا اَصَحُّ ـ

অনুবাদ : অতঃপর গোপনে সততা যাচাই করবেন এভাবে যে, সত্যায়নকারীর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করবে যাতে সাক্ষীর নাম, বংশতালিকা, তার শারীরিক বর্ণনা ও তার নামাজ পড়ার স্থানের উল্লেখ থাকবে। এরপর সনদ প্রদানকারী জবাবি পত্র প্রেরণ করবেন [বিচারকের কাছে]। আর এ সবই হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে যাতে [তদন্ত] প্রকাশ না হয়– তা না হলে সত্যায়নকারীকে অর্থ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে অথবা কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করতে পারে। প্রকাশ্য তদন্তের মধ্যে বিচারক সত্যায়নকারী ও সাক্ষীকে একত্র করা আবশ্যক যাতে [সামনাসামনি সাক্ষীর সাধুতা প্রকাশ পায়] যাতে তাকে [সাক্ষীকে] ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে সত্যায়ন করার সন্দেহ বিদূরিত হয়। প্রথম যুগে প্রকাশ্যে চারিত্রিক সনদ প্রদান করা হতো। আমাদের সময়ে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে গোপনে তদন্ত করাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত– [তিনি বলেন,] প্রকাশ্যে চারিত্রিক সনদ প্রদান ফিতনা ও বিপদসংকুল, তারপর বলা হয়েছে সনদ প্রদানকারীকে এ কথা বলা আবশ্যক যে, সে [সাক্ষী] স্বাধীন ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষ্য প্রদানে উপযুক্ত। কেননা ক্রীতদাসও কখনো ন্যায়পরায়ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, "সে ন্যায়পরায়ণ" এতটুকু বলেই ক্ষান্ত করবে। কেননা ইসলামি রাষ্ট্র দ্বারা স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। আর এটাই বিশুদ্ধতম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ التَّزْكِيَةُ فِى السِّرِّ الخ : উল্লিখিত ইবারতে লেখক সাক্ষীদের সম্পর্কে তদন্ত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণতা আছে কিনা? তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করাকে تَزْكِيَةٌ ও تَعْدِيْلٌ [চারিত্রিক সনদ প্রদান ও কারো সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা] বলা হয়। যে কারো চারিত্রিক সনদ দিতে পারে তাকে مُعَدِّلٌ বা সত্যায়নকারী বলা হয়। বিচারক সাক্ষীর অবস্থার অনুসন্ধান করার জন্যে চারিত্রিক সনদ প্রদানকারীর কাছে যে গোপন পত্র প্রেরণ করেন– তাতে সাক্ষীর নাম-পরিচয় ও বংশলতিকা, শারীরিক বর্ণনা ও তার মহল্লার মসজিদের নাম উল্লেখ করবেন। পত্রটি সাধারণ্যের কাছে গোপন রাখা হয় বিধায় একে مَسْتُوْرَةٌ বলা হয়। মোটকথা সাক্ষীদের অবস্থা ও স্বরূপ জানার প্রক্রিয়া দু প্রকার– ১. গোপন অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং ২. প্রকাশ্য তদন্ত .

প্রথম প্রকারের প্রক্রিয়া এরূপ যে, বিচারক সাক্ষীর অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে চারিত্রিক সনদ প্রদানকারী ও সত্যায়নকারীর নামে একটি চিঠি লিখে গোপনে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে তার কাছে প্রেরণ করবেন। চিঠিতে সাক্ষীগণের নাম, বংশ-পরিচয়, তার আকার-আকৃতি ও তার মহল্লার মসজিদের নাম উল্লেখ করবেন। যদি সাক্ষী হাট-বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তার বাজার/ হাট/ মার্কেটের নাম উল্লেখ করবেন। চারিত্রিক সত্যায়নকারী ব্যক্তি সৎ, নির্লোভ, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, মুত্তাকী, আমানত রক্ষাকারী ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সমীচীন। আবার তার এমন না হওয়া উচিত যে, সব সময় বাড়িতে অবস্থান করে– কারো সাত-পাঁচে থাকে না; বরং সে এমন যে, সকলের সাথে মিশে, চোখ-কান খোলা রাখে ও সামাজিক ব্যাপারে ভূমিকা রাখে; আর সে সততা ও দীনদারির কারণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। তবে সে ব্যক্তি লোভী ও দরিদ্র ব্যক্তি না হওয়াই কাম্য। কেননা লোভী ও দরিদ্র ব্যক্তি অর্থের লোভে সঠিক কাজটি করতে ব্যর্থও হতে পারে।

মোটকথা, উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি সাক্ষীর পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমপেশাজীবী ও তার সাথে উঠা-বসা করে এমন সব ব্যক্তিদের থেকে তার সম্পর্কে জানবে এবং পূর্ণ তদন্ত করে যদি সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তাহলে বিচারকের কাছে ফিরতি চিঠিতে সাক্ষীর নাম লিখে তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করবে যে, সে ন্যায়পরায়ণ, পছন্দনীয়, গ্রহণযোগ্য ও সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তি। আর যদি সাক্ষীর ব্যাপারে তত্ত্ব-তালাশ করে তাকে নীতিভ্রষ্ট ও অসৎ বলে জানতে পারে তাহলে লিখবে– সে ন্যায়পরায়ণ নয়। ফাতওয়ায়ে কাযীখানে উল্লেখ আছে যে, তার নাম লিখে তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য লিখবে না অথবা লিখবে– আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, যাতে তার ব্যাপারটি অনুদ্ঘাটিত থাকে। মোটকথা তদন্ত ও অনুসন্ধান করে সাক্ষীগণের যেসব ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হবে, তা লিখবে না। তবে যদি সত্যায়নকারী ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হয় যে, ত্রুটিসমূহ এবং ফাসিক হওয়ার বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ না করলে বিচারক তার সাক্ষ্যের উপর রায় প্রদান করতে পারে– এমতাবস্থায় সাক্ষীগণের ত্রুটি উল্লেখ করাতে কোনো দোষ নেই।

আর যদি সনদ প্রদানকারী সাক্ষীর দোষ কিংবা গুণ তথা ন্যায়পরায়ণতা এবং ফাসেকীর কোনোটার ব্যাপারে অবগত না হয় তাহলে সাক্ষীর নামের নিচে 'রহস্যজনক' লিখে দেবে। এর অর্থ হলো, সাক্ষীর অবস্থা স্পষ্ট নয়- গোপনীয়। তিন অবস্থার যেটাই সাক্ষীর সামনে স্পষ্ট হবে এর প্রতিবেদন লিখে বিচারকের বিশ্বস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে তা বিচারকের নিকট প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য যে, ফাসিক ব্যক্তি যদি তওবা করে তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে না। তওবার পর ছয়মাস মতান্তরে একবছর অতিক্রান্ত হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণরূপে পরিচিত হয়, অতঃপর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে তারপর তওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে [সময়ক্ষেপণ ছাড়াই।] লেখক বলেন, উপরিউক্ত গোপন তদন্ত অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করবে। কেননা বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে গেলে সাক্ষী অথবা বাদী সনদ সত্যায়নকারীকে উৎকোচ দিয়ে হাত করে নেবে অথবা উৎকোচ গ্রহণ না করলে তাকে নির্যাতন করতে পারে। তাই এসবের দিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করবে।

প্রকাশ্য তদন্ত : এর প্রক্রিয়া এই যে, বিচারক সাক্ষী এবং তার চারিত্রিক সনদ প্রদানকারী ব্যক্তিকে এজলাসে একত্র করবেন। এরপর বিচারক সাক্ষী সম্পর্কে মন্তব্যকারী ও সনদ প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করবেন– আপনি যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই কি সেই সাক্ষী? তখন তিনি বলবেন, আমি সাক্ষী সম্পর্কে সত্যায়ন করেছি, তখন সে ইশারা করবে সাক্ষীর দিকে। ইশারা করা এজন্য জরুরি যে, ইশারা না করলে অন্য সাক্ষীকে সত্যায়ন করার সন্দেহ হতে পারে। কেননা কখনো দুজন ব্যক্তির নাম ও বংশ এক হয়ে যায়। যদি সনদ প্রদানকারী ইশারা না করে তাহলে সাক্ষীর নামের সাথে মিলে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি বিচারকের খেয়াল যেতে পারে, তাই সাক্ষীর প্রতি ইশারা করে বলবে।

লেখক বলেন, প্রথম যুগ তথা রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের যুগে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাক্ষীদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হতো। এমনকি সাক্ষীর কোনো দোষ থাকলে সবার সামনেই সনদ প্রদানকারী উক্ত দোষের উল্লেখ করত। কেননা সে যুগ ছিল কল্যাণ ও সততার যুগ। তখন লোকদের মাঝে পরকালের ভীতি ছিল অনেক বেশি। তাদের পার্থিব লোভ-লালসা ছিল অনেক কম। তাই সে যুগে সত্যায়নকারীর উপর বাদী কিংবা সাক্ষীর পক্ষ থেকে কোনো নির্যাতনের সম্ভাবনা ছিল না। ছিল না উৎকোচ দিয়ে কাউকে প্রভাবিত করার কোনো সম্ভাবনা। বর্তমান যুগে গোপন তদন্ত করবে– প্রকাশ্য তদন্তের পথে যাবে না। এখন প্রকাশ্য তদন্ত করা হলেও সাক্ষী ও সত্যায়নকারীর মাঝে এমনিভাবে বাদী ও মন্তব্যকারীর মাঝে দ্বন্দ-সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিভেদ ছড়িয়ে পড়বে। তাই এসব ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে গোপন তদন্তই যথেষ্ট।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রকাশ্যে তদন্ত করা এক ধরনের বিপদ ও ফিতনা। কেউ কেউ বলেন, মন্তব্যকারী ও সনদ প্রদানকারী هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ বললে যথেষ্ট হবে না; বরং সে هُوَ حُرٌّ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ [সে স্বাধীন, ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তি] বলতে হবে। কেননা ক্ষেত্রবিশেষে ক্রীতদাসও ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে। অথচ ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সাক্ষী দাস নাকি স্বাধীন তা উল্লেখ করতে হবে।

এ ব্যাপারে আরেকটি মত হলো, শুধুমাত্র هُوَ عَدْلٌ [সে ন্যায়পরায়ণ] এতটুকু বলাই যথেষ্ট। حُرٌّ [স্বাধীন] ও جَائِزُ الشَّهَادَةِ [সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত] বলার প্রয়োজন নেই। কেননা সাক্ষীর ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থান করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সে স্বাধীন হবে– দাস হবে না। শেষোক্ত মতটিকে লেখক সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলেছেন। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। ইমাম মালেক (র.) বলেন, সনদ প্রদানকারী সাক্ষী সম্পর্কে هُوَ عَادِلٌ مَرْضِيٌّ [সে ন্যায়পরায়ণ পছন্দনীয় ব্যক্তি] বলা আবশ্যক। এ দুটি শব্দের কোনো একটি উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়; বরং একই সাথে দুটিই উল্লেখ করা জরুরি।

قَالَ : وَفِىْ قَوْلِ مَنْ رَأٰى اَنْ يَسْاَلَ عَنِ الشُّهُوْدِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْخَصْمِ اَنَّهُ عَدْلٌ مَعْنَاهُ قَوْلُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يَجُوْزُ تَزْكِيَتُهُ لٰكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَضُمُّ تَزْكِيَةُ الْاٰخَرِ اِلٰى تَزْكِيَتِهِ لِاَنَّ الْعَدَدَ عِنْدَهُ شَرْطٌ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ فِىْ زَعْمِ الْمُدَّعِىْ وَشُهُوْدِهِ اَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِىْ اِنْكَارِهِ مُبْطِلٌ فِىْ اِصْرَارِهِ فَلَا يَصْلُحُ مُعَدِّلًا وَمَوْضُوْعُ الْمَسْاَلَةِ اِذَا قَالَ هُمْ عُدُوْلٌ اِلَّا اَنَّهُمْ اَخْطَأُوْا اَوْ نَسُوْا اَمَّا اِذَا قَالَ صَدَقُوْا اَوْ هُمْ عُدُوْلٌ صَدَقَةٌ فَقَدْ اِعْتَرَفَ بِالْحَقِّ ـ

অনুবাদ : তিনি বলেন, যার মতে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ আবশ্যক [তার মতানুসারে] প্রতিপক্ষ তথা বিবাদীর উক্তি- "সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ কথাটি গ্রহণ করা হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সত্যায়ন বৈধ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, অন্য আরেক ব্যক্তির সত্যায়নকে তার সত্যায়নের সাথে যুক্ত করা হবে। কেননা তাঁর নিকট [সত্যায়নকারীদের নির্ধারিত] সংখ্যা শর্ত। জাহেরী বর্ণনার দলিল এই যে, বাদী ও তার ধারণা মতে বিবাদী তার অস্বীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী আর স্বীয় অটল দাবির ব্যাপারে ভ্রান্ত। সুতরাং সে সত্যায়নকারী হওয়ার যোগ্য নয়। মাসআলার প্রকৃতি হলো, যখন সে বলল, তারা ন্যায়পরায়ণ, তবে তারা ইচ্ছাকৃত ভুল করেছে অথবা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। পক্ষান্তরে সে বলে, তারা সত্য বলেছে অথবা সত্যবাদী-ন্যায়পরায়ণ, তখন তো সে প্রতিপক্ষের হকের স্বীকারোক্তি করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : قَالَ وَفِىْ قَوْلِ مَنْ رَأٰى الخ : ইতঃপূর্বে বিশ্লেষণে আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি বিবাদী বাদীর সাক্ষীগণের ব্যাপারে আপত্তি না করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাক্ষীগণের বাহ্যিক ন্যায়পরায়ণতাকে যথেষ্ট মনে করা হবে। তার সত্যায়ন এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাহেবাইনের মতে, এমতাবস্থায়ও সাক্ষীগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি। এ অংশে সাহেবাইনের মতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, যদি বিবাদী বাদীর সাক্ষীগণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, সাক্ষী বা সাক্ষীরা ন্যায়পরায়ণ তাহলে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে বিবাদীর এ উক্তি মতে সাক্ষীগণকে সত্যায়ন করা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু নাওয়াদির রেওয়ায়েত সাহেবাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিবাদীর সত্যায়নই যথেষ্ট। আর যদি বিবাদী বাদীর সাক্ষীগণ সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এ সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ তাহলে বিবাদীর মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেই সাক্ষীগণের সাক্ষ্য মোতাবেক বিচারের রায় প্রদান করা হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিবাদীর সাক্ষ্যের সাথে আরেকজনের সাক্ষ্যকে একত্র করা হবে। অর্থাৎ বিবাদীর সত্যায়ন ছাড়া আরেকজন ব্যক্তির সত্যায়ন থাকতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো কমপক্ষে দুজন সত্যায়নকারীর সত্যায়ন দ্বারা সাক্ষী সত্যায়িত হয়, একজনের দ্বারা সত্যায়ন সঠিক হয় না।

উল্লেখ্য যে, সাহেবাইনের মাযহাবে বিবাদীর সত্যায়ন তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন বিবাদী নিজে ন্যায়পরায়ণ হবে· অতএব, যদি বিবাদী ফাসিক অথবা তার অবস্থা রহস্যজনক অথবা বিবাদীর দাবিটিকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং তার দাবির ব্যাপারে নীরব

ছিল অতঃপর বাদীর সাক্ষীগণ সম্পর্কে বলল, সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ, তাহলে বিবাদীর উক্ত সত্যায়ন সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। জাহেরী রেওয়ায়েতের এ মাসআলার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, বাদী তার দাবিকে প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষী তখনই উপস্থিত করে যখন বিবাদী বাদীর দাবিকে অস্বীকার করে এবং তার এ অস্বীকারের উপর অটল থাকে। আর বাদী তার দাবি অস্বীকার করার কারণে বিবাদীকে মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং বাদী ও তার সাক্ষীগণ বিবাদীর ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখছে যে, অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী এবং তার দাবির ব্যাপারে ভ্রান্ত। অতএব, যে বিবাদী বাদী ও সাক্ষীগণের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী ও ভ্রান্তির বেড়াজালে রয়েছে– সে ন্যায়পরায়ণ বলে গণ্য হবে না। কেননা মিথ্যাবাদী ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না। আর ন্যায়পরায়ণ না হলে সে সত্যায়নকারী ও সততার সনদ প্রদানকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। কেননা সর্বসম্মত মতানুসারে সত্যায়নকারীর জন্যে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ وَمَوْضُوْعُ الْمَسْأَلَةِ الخ : এখান থেকে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, বিবাদী সাক্ষীগণকে সত্যায়ন করার অর্থই হলো নিজের উপর বাদীর দাবিকৃত প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করে নেওয়া, আর স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর জন্যে সবার ঐকমত্যে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত নয়, তাই ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও বিবাদীর সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, মাসআলাটির বাস্তবরূপ এই যে, যখন বিবাদী বলল, এই সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ তবে সে ভুলে গিয়েছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছে। এ জাতীয় বাক্য কারো কোনো স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হয় না অথবা বিবাদীর এ বাক্যটি বাদীর হকের পক্ষে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হয় না; বরং এ জাতীয় বাক্য দ্বারা সাক্ষীগণের সত্যায়ন হয়। আর ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, সত্যায়নকারীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বিবাদী যে এখানে বাদীর সাক্ষীদের সত্যায়ন করছে তারও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। অথচ আলোচ্য মাসআলাতে বিবাদী বাদী ও তার সাক্ষীগণের বিশ্বাস অনুসারে তাদের দাবি অস্বীকার করার কারণে মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। সুতরাং যখন সে মিথ্যাবাদী ও অন্যায়পরায়ণ, তাই তার দ্বারা বাদীর সাক্ষীগণের সত্যায়ন ধর্তব্য নয়। আর যদি বিবাদী বলে যে, বাদীর সাক্ষীগণ সত্যবাদী অথবা বলে ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যবাদী তাহলে যেন সে [বিবাদী] তার নিজের উপর বাদীর হক বা অধিকারের স্বীকৃতি দান করল। আর যখন বিবাদী নিজেই বাদীর অধিকারের স্বীকৃতি দান করল, তাহলে বিচারক বাদীর স্বীকারোক্তির কারণে আদালতে রায় প্রদান করবেন; সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষীর কারণে নয়।

قَالَ : وَاِذَا كَانَ رَسُوْلُ الْقَاضِىْ الَّذِىْ يَسْأَلُ عَنِ الشُّهُوْدِ وَاحِدًا جَازَ وَالْاِثْنَانِ اَفْضَلُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَجُوْزُ اِلَّا اِثْنَانِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُزَكِّىْ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ رَسُوْلُ الْقَاضِىْ اِلَى الْمُزَكِّىْ وَالْمُتَرْجِمُ عَنِ الشَّاهِدِ لَهُ اَنَّ التَّزْكِيَةَ فِىْ مَعْنَى الشَّهَادَةِ لِاَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ تَبْتَنِىْ عَلٰى ظُهُوْرِ الْعَدَالَةِ وَهُوَ بِالتَّزْكِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيْهِ وَتُشْتَرَطُ الذُّكُوْرَةُ فِى الْمُزَكِّىْ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَلَهُمَا اَنَّهُ لَيْسَ فِىْ مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ اَمْرٌ حُكْمِىٌّ فِى الشَّهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামিউস সাগীর গ্রন্থে] বলেন, যদি বিচারকের এমন দূত [সত্যায়নকারী] যাকে সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় একজন হয় তাহলে জায়েজ। আর দুজন হলে উত্তম। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দুজন ছাড়া জায়েজ হবে না। [দূত] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্যায়নকারী। একই মতবিরোধ সত্যায়নকারীর নিকট প্রেরিত বিচারকের দূত এবং [সাক্ষীর] ভাষান্তরকারী সম্পর্কে। তাঁর [ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর] দলিল এই যে, সত্যায়ন করা সাক্ষ্য প্রদান করার সমার্থক। কেননা বিচারকার্যের ক্ষমতা ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। আর ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটে সত্যায়ন করার দ্বারা। সুতরাং এতে সংখ্যার বিষয়টি শর্ত করা হয়েছে, যেরূপ এতে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত রয়েছে। হুদূদ ও কিসাসের সত্যায়নকারীর ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া শর্ত। ইমামদ্বয়ের দলিল এই যে, এটা সাক্ষ্য প্রদানের অর্থে নয় এবং এ কারণেই এতে শাহাদাত শব্দটিকে এবং বিচারকের এজলাসকে শর্ত করা হয়নি। শাহাদাতের মধ্যে সংখ্যার শর্ত একটি ঐশী বিধান। তাই এটা শাহাদাত থেকে অন্য কিছুতে সম্প্রসারিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِذَا كَانَ رَسُوْلُ الْقَاضِىْ الخ : উপরে উল্লিখিত অংশে লেখক ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের একটি ইবারত উল্লেখ করত এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবারতের رَسُوْلُ الْقَاضِىْ হলো মাওসূফ আর اَلَّذِىْ يُسْأَلُ عَنِ الشُّهُوْدِ হলো এর সিফাত। يُسْأَلُ সীগাহটি এখানে মাজহুলরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবারতের অর্থ হলো, বিচারকের এমন দূত যাকে সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সাক্ষীদের সম্পর্কে যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাদের বলা হয় সত্যায়নকারী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইবারতের رَسُوْلُ الْقَاضِىْ দ্বারা সত্যায়নকারীই উদ্দেশ্য। মোটকথা, সত্যায়নকারীর সংখ্যা কতজন হবে তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আযম (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত হলো, সত্যায়নকারী একজন হলেই যথেষ্ট, তবে দুজন হওয়া উত্তম। তাঁদের মতে বিচারক সাক্ষীগণের অবস্থা তদন্ত করার জন্যে একজন সত্যায়নকারীর সাহায্য নিলেই যথেষ্ট হবে। তবে এ ব্যাপারে দুজন সত্যায়নকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উত্তম। এমনিভাবে বিচারক যদি একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করেন তাহলেই যথেষ্ট হবে, তবে দুজন পাঠানো উত্তম। এমনিভাবে সাক্ষীর ভাষান্তরকারী একজনই যথেষ্ট, আর দুজন হওয়া উত্তম। দুজন আবশ্যক নয়। ইমামদ্বয়ের উক্ত মতের

বিপক্ষে মত পোষণ করেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)। তাঁর মতে সত্যায়নকারী, বিচারকের দূত ও দোভাষী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দুজন হওয়া বাধ্যতামূলক। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, সত্যায়ন আর সাক্ষ্য প্রদান একই অর্থবোধক। কেননা বিচারকের কর্তৃত্ব [ওলায়াত] সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশের উপর নির্ভরশীল। আর সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণতা সত্যায়ন ও তদন্ত করার দ্বারা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণতা তখনই প্রকাশ পাবে যখন সত্যায়নকারী তাকে সত্যায়ন করে এবং সনদ প্রদান করে। সুতরাং যখন বিচারকের ক্ষমতা নির্ভর করে সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণতার উপর, আর সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা উদ্ঘাটিত হওয়া নির্ভর করে সত্যায়নের উপর। তো এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে– বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষমতা নির্ভরশীল সত্যায়ন করার উপর। আর বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষমতাটি সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা লাভ হয়। অর্থাৎ বিচারক হওয়ার যোগ্য সেই হয় যার সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং যেহেতু বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষমতা সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল, তাই সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতাও নির্ভরশীল হবে সত্যায়নের উপর অর্থাৎ সাক্ষী সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত বলে তখনই গণ্য হবে যখন সত্যায়নকারী তাকে ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করবে। যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান এর উপর নির্ভরশীল যে, সত্যায়নকারীরা সাক্ষীদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করবে তাহলে সত্যায়নকারীর সত্যায়ন সাক্ষ্যদানের সমার্থক হলো। আর সত্যায়ন যখন সাক্ষ্যদানের সমার্থক তাহলে সত্যায়নের জন্য যেসব শর্ত প্রযোজ্য, সাক্ষ্যদানের জন্যও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ সাক্ষ্যদানের জন্যে যেভাবে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত, একইভাবে সাক্ষ্যদাতা দুজন হওয়াও শর্ত। তদ্রূপ সত্যায়ন করার জন্যেও দুজন হওয়া শর্ত। একই কারণে হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে যেভাবে সাক্ষ্যদাতাদের পুরুষ হওয়া শর্ত তেমনি চার ইমামের ঐকমত্যে সত্যায়নকারীরাও পুরুষ হওয়া শর্ত। আবার ব্যভিচারের হদ প্রমাণে যেহেতু চারজন সাক্ষী আবশ্যক। তাই এতে সত্যায়নকারীও চারজন হওয়া আবশ্যক। [এ হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের বিস্তারিত বিবরণ।] পক্ষান্তরে শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের বিবরণ এরূপ যে, তাঁরা বলেন, সত্যায়ন আর সাক্ষ্যদান একই অর্থবোধক নয়। এ কারণেই সত্যায়নের মধ্যে "শাহাদাত" শব্দটির ব্যবহার আবশ্যক নয়। এমনিভাবে এতে বিচারকের এজলাসেরও প্রয়োজন নেই। অথচ এ দুটি শর্ত সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে আবশ্যক। যখন সাক্ষ্য প্রদান ও সত্যায়ন ভিন্ন বিষয়, তখন সাক্ষ্য প্রদানের শর্তাবলি সত্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ বলে লেখক শায়খাইনের পক্ষে جَوَابٌ تَسْلِيمِيٌّ প্রদান করছেন। এর সারকথা এই যে, যদি আমরা স্বীকারও করি যে, সত্যায়নের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে– তবুও সত্যায়নকারী দুজন হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে দুজন হওয়ার শর্ত যুক্তি-বিরুদ্ধভাবে কুরআনের আয়াত وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

যুক্তি পরিপন্থি হওয়ার কারণ : যুক্তির দাবি হলো, সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে সংখ্যা দুজন না হয়ে একজন হওয়াই যথেষ্ট। কেননা দুজন হলেও এতে মিথ্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হয় না। মিথ্যার সম্ভাবনা পুরোপুরি রহিত হয় তাওয়াতুর [–এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাক্ষ্যদাতা যাদের মিথ্যার উপরে ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব] দ্বারা। কেউ যদি বলেন, দুজন দ্বারা তো সত্যের সম্ভাবনা প্রবল হয়? এর উত্তর হলো, সত্যের সম্ভাবনা প্রবল হয় ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা। যেমনটি আমরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, মাত্র একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যের প্রবল সম্ভাবনা সংখ্যার দ্বারা হয় না; বরং তা ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা হয়। মোটকথা হলো, একিন বা নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তাওয়াতুর দ্বারা। আর ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা আমল অবধারিত হয়– হোক তা একজন দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং দুজন সাক্ষী দ্বারা না নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ হয়, না এর দ্বারা আমল অবধারিত হয়। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, যুক্তি সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দুজন হওয়াকে আবশ্যক করে না; বরং দুজনের শর্ত সাক্ষ্যদানের মধ্যে যুক্তি-বিরুদ্ধভাবে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা যুক্তি-পরিপন্থিভাবে যে বিষয় প্রমাণিত হয় তা অন্য বিধানে প্রযোজ্য হয় না। অতএব, দুজন হওয়ার শর্ত শাহাদাত থেকে সত্যায়নের দিকে স্থানান্তরিত হবে না এবং সত্যায়নের মধ্যে দুজন হওয়া শর্ত হবে না। মোটকথা, লেখক যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে ইমামদ্বয়ের মাযহাবকে প্রমাণিত করলেন। তাই এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব প্রমাণিত হলো না।

وَلَا يُشْتَرَطُ اَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فِى الْمُزَكِّىْ فِىْ تَزْكِيَةِ السِّرِّ حَتّٰى صَلُحَ الْعَبْدُ مُزَكِّيًا فَاَمَّا فِىْ تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ فَهُوَ شَرْطٌ وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْاِجْمَاعِ عَلٰى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ (رحـ) لِاخْتِصَاصِهَا بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَالُوْا يُشْتَرَطُ الْاَرْبَعَةُ فِىْ تَزْكِيَةِ شُهُوْدِ الزِّنَاءِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) .

অনুবাদ : গোপন সত্যায়নের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা সত্যায়নকারীর মধ্যে থাকা আবশ্যক নয়। ফলে ক্রীতদাস সত্যায়নকারীর উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। তবে প্রকাশ্য সত্যায়নে তা শর্ত। এমনিভাবে ইমাম খাসসাফ (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে ইজমা [সকলের ঐকমত্য] দ্বারা সংখ্যার বিষয়টিও শর্ত তা বিচারকের এজলাসের সাথে খাস হওয়ার কারণে। মাশায়েখে কেরাম বলেন, ব্যভিচারের সাক্ষীর সত্যায়নে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চারজন হওয়া শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ اَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোপন সত্যায়ন ও চারিত্রিক সনদ প্রদানের মধ্যে সত্যায়নকারীর সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ সত্যায়নকারীর জন্যে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত হলেও এর জন্যে সাক্ষ্য প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নয়। তাইতো ক্রীতদাসও সত্যায়নকারী হতে পারে যদিও সে সাক্ষ্য প্রদানের অধিকারী নয়। সুতরাং যদি ক্রীতদাস তার মনিব কিংবা অন্য কারো সত্যায়ন করে তাহলে তার সত্যায়ন গ্রাহ্য হবে। এমনিভাবে পিতার জন্যে পুত্রের সত্যায়ন ও পুত্রের জন্যে পিতার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য। অথচ ক্রীতদাস তার মনিবের পক্ষে আর পিতা-পুত্রের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে প্রকাশ্য সত্যায়নে সত্যায়নকারীর জন্যে সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত হওয়া শর্ত। ইমাম খাসসাফের মতে প্রকাশ্য সত্যায়নে সত্যায়নকারী দুজন হওয়া শর্ত। তিনি বলেন, এতে ওলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে। কারণ, প্রকাশ্য সত্যায়ন বিচারকের এজলাসের সাথে খাস। বিচারকের এজলাসের সাথে খাস হওয়া প্রমাণ করে যে, এটা শাহাদাতের মতো। শাহাদাতের মতো হওয়ার কারণে এতে শাহাদাতের মতো সংখ্যার শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ কমপক্ষে দুজন সত্যায়নকারী হওয়া শর্ত।

অবশ্য এখানে একটি আপত্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আপত্তিটি এই যে, প্রকাশ্য সত্যায়নে দুজনের শর্তারোপ করা গোপন সত্যায়নে শর্ত না করার মাঝে একটি বৈপরীত্য দেখা দেয়। কেননা গোপন সত্যায়নকারীই পরবর্তীতে প্রকাশ্য সত্যায়নকারী হয়। অতএব, যখন গোপন সত্যায়নে দুজন শর্ত নয় তাহলে পরে প্রকাশ্য সত্যায়নে কিভাবে দুজন শর্ত হবে ? এর উত্তর হলো, ইমাম খাসসাফ (র.)-এর মতে এটা করাতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা তাঁর মতে গোপন সত্যায়নকারী আর প্রকাশ্য সত্যায়নকারী একই মানুষ নয়। যে গোপন সত্যায়নকারী সে প্রকাশ্য সত্যায়নকারী হবে না। আর যে প্রকাশ্য সত্যায়নকারী সে গোপন সত্যায়নকারী হবে না। আর ব্যাপারটি এমন হলে বৈপরীত্য হয় না। আমাদের মতে, যে ব্যক্তি গোপন সত্যায়নকারী সেই প্রকাশ্য সত্যায়নকারী। এ কারণে সংখ্যার বিষয়টি গোপন ও প্রকাশ্য কোনো সত্যায়নে আবশ্যক নয়।

লেখক বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) যেহেতু সংখ্যার ক্ষেত্রে সত্যায়নকে সাক্ষ্য প্রদানের সমান্তরালে রেখেছেন, তাই মাশায়েখে কেরাম বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ব্যভিচারের সাক্ষীগণের সত্যায়নের জন্যেও চারজন সত্যায়নকারী অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ যেভাবে ব্যভিচার প্রমাণের জন্যে চারজন সাক্ষী আবশ্যক, তেমনি সাক্ষীদের সত্যায়নের জন্যেও চারজন সত্যায়নকারী আবশ্যক। কেননা সাক্ষ্য প্রদান ও সত্যায়ন একই অর্থবোধক।

فَصْلٌ : وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ اَحَدُهُمَا مَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالْاِقْرَارِ وَالْغَصَبِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَاِذَا سَمِعَ ذٰلِكَ الشَّاهِدُ اَوْ رَاٰهُ وَسِعَهُ اَنْ يَّشْهَدَ وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ عِلْمُ مَا هُوَ الْمُوْجِبُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الرُّكْنُ فِيْ اِطْلَاقِ الْاَدَاءِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلَّا فَدَعْ ـ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : সাক্ষী যেসব বিষয়ের সাক্ষ্য ধারণ করে তা দু প্রকার। তার একটি হলো যার হুকুম সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন– বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি, আত্মসাৎ, হত্যাকাণ্ড ও বিচারকের রায়। সুতরাং যখন সাক্ষী এসব শুনবে অথবা দেখবে তখন তার জন্যে বৈধ যে, সে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদিও তাকে এতে সাক্ষী বানানো হয়নি। কেননা সে এমন বিষয় জানতে পেরেছে যা নিজেই ওয়াজিবকারী। আর এটাই [অবগত হওয়া] সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হওয়ার রুকন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন– "তবে ঐ ব্যক্তি যে জেনেশুনে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।" রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– "যখন তুমি দিবালোকের ন্যায় জানবে তখন সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তা পরিহার কর।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : فَصْلٌ : وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ الخ : লেখক নতুন একটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। ইতঃপূর্বে সাক্ষীদের শ্রেণিবিন্যাস, তার হুকুম ও বিস্তারিত আলোচনা করার পর নতুন অনুচ্ছেদে যেসব বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তার প্রকারভেদ সম্পর্কে লেখক আলোচনা শুরু করেছেন। লেখক বলেন, সাক্ষ্যদাতা যেসব বিষয়ের সাক্ষ্য ধারণ করে বা যেসব বিষয়ে সাক্ষী হয় তা দুপ্রকার।

প্রথম প্রকার– ঐসব বিষয় যার হুকুম এমনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়। এতে সাক্ষী বানানোর প্রয়োজন হয় না। যেমন– বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি, তালাক, বিচারকের রায়, আত্মসাৎ-জবরদখল ও হত্যাকাণ্ড। প্রথমোক্ত চারটি বিষয় কথার দ্বারা বা মৌখিকভাবে সংঘটিত হয়। আর শেষোক্ত দুটি হলো যা কার্যত সম্পাদন হয়। অতএব, যখন সাক্ষ্যদাতা শ্রবণ করা যায় এমন কোনো বিষয় যথা– বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি, তালাক ও বিচারকের রায় শুনে অথবা কোনো দেখার বিষয় যথা– হত্যাকাণ্ড ও আত্মসাৎ-জবরদখল ইত্যাদি বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রবণ করে কিংবা দেখে তাহলে সে যেসব বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবে বা তার জন্যে সাক্ষ্যদান বৈধ। যদিও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষী বানানো হয়নি। কেননা সাক্ষীর শ্রবণ করে কিংবা দেখে উপযুক্ত এমন বিষয়ে জ্ঞান ও অবগতি লাভ হয়েছে, যা সাক্ষী ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ওয়াজিবকারী। তাই তার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ। কেননা সাক্ষ্য প্রদানের রুকন তথা ইলম [জ্ঞান ও অবগতি] এখানে পাওয়া গিয়েছে। সাক্ষ্য প্রদান জায়েজ হওয়ার রুকন যে ইলম তথা জ্ঞান ও অবগতি তার দলিল হলো কুরআনের আয়াত– وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া তারা যার ইবাদত করত, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা জেনেশুনে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করছে।" –[সূরা যুখরুফ : আয়াত– ৮৬] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে জ্ঞান ও অবগতি লাভ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّهَادَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَى الشَّمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلٰى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ اَوْ دَعْ اَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهٖ وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِيْ كِتَابِ الْاَحْكَامِ .

হাদীসের মর্মার্থ : রাসূল ﷺ -কে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, সূর্যকে তোমরা যেমন নিঃসন্দেহে দেখ, সেভাবে কোনো বিষয় দেখলে কিংবা জানলে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে পার, অন্যথায় সাক্ষ্য পরিহার কর। এখানে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হলো এর সাথে হিদায়ায় বর্ণিত হাদীসের সামান্য শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে। হিদায়ার মুয়াল্লিফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির শব্দ হলো– اِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ অবশ্য উভয় হাদীসের বক্তব্য একই– তা হলো নিঃসন্দেহ দ্বিধাহীনভাবে জ্ঞান লাভ করা গেলে তার সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে।

হাদীসটি সম্পর্কে হাকিম (র.) বলেছেন– صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ . তবে আল্লামা যাহাবী (র.) বলেছেন– হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এর কারণ হলো, মুহাম্মদ সুলায়মান ইবনে মাশমূল অনেকের দৃষ্টিতে দুর্বল রাবী। ইমাম নাসায়ী (র.)ও হাদীসটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসটি ইবনে আদী ও উকায়লী (র.) তাঁদের কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, কারো কোনো বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হলে সে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আর যদি তার সুনিশ্চিত বিশ্বাস না হয় তাহলে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়।

প্রশ্ন : লেখক বলেছেন, সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হওয়ার জন্যে জ্ঞান ও অবগতি হলো রুকন। অথচ আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে জ্ঞান লাভ করা শর্ত বলে মনে হয়। কেননা আয়াতের وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ [যা দ্বারা ইলমের বিষয়টি প্রমাণিত হয়] হলো حَالْ : আর ব্যাকরণ মতে حَالْ বাক্যে শর্ত হয়। এমনিভাবে হাদীসের عَلِمْتَ শব্দটির উপর اِذَا শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার দ্বারাও শর্ত বুঝা যায়। কারণ, اِذَا অভিধানগতভাবে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, লেখক রুকন শব্দটিকে রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় রুকন দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো শর্ত। শর্তকে তিনি রুকন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে ইলমের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

قَالَ : وَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ بَاعَ وَلاَ يَقُوْلُ اَشْهَدَنِىْ لِاَنَّهُ كِذْبٌ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لاَ يَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَّشْهَدَ وَلَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِىْ لاَ يَقْبَلُهُ لِاَنَّ النَّغْمَةَ تَشْبَهُ النَّغْمَةَ فَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ اِلاَّ اِذَا كَانَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَعَلِمَ اَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ سِوَاهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ وَلَيْسَ فِى الْبَيْتِ مَسْلَكٌ غَيْرُهُ فَسَمِعَ اِقْرَارَ الدَّاخِلِ وَلاَ يَرَاهُ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ لِاَنَّهُ حَصَلَ الْعِلْمُ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সে [সাক্ষী] বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে বিক্রয় করেছে। সে বলবে না যে, আমাকে সাক্ষী নিযুক্ত করেছে। কেননা এটা মিথ্যা। যদি সে পর্দার আড়াল থেকে শুনে, তাহলে তার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়। যদি সে বিচারকের কাছে বিশ্লেষণ করে, তবুও বিচারক তা গ্রহণ করবেন না। কেননা একজনের গলার স্বর অন্যজনের গলার স্বরের অনুরূপ হয়ে থাকে। ফলে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। তবে যখন সে ঘরে প্রবেশ করে এবং জানতে পারে যে, ঘরে বিবাদী ছাড়া আর কেউ নেই, অতঃপর সাক্ষী দরোজায় অবস্থান গ্রহণ করে - আর ঘরের এ দরজা ছাড়া আর কোনো দরজা না থাকে। এমতাবস্থায় সে ভিতরে অবস্থানকারীর স্বীকারোক্তি শুনে এবং তাকে না দেখে তাহলে তার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। কেননা এমতাবস্থায় সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَقُوْلُ اَشْهَدُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক প্রথম প্রকারের সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম প্রকার হলো, এমন সব বিষয় যা সাক্ষী ছাড়া নিজে নিজেই ওয়াজিবকারী। তা সম্পর্কে সাক্ষী নিশ্চিত জেনে সাক্ষ্যদান করলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। উক্ত ইবারতে নিশ্চিত জ্ঞানার্জন করার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণটি হলো, কোনো ব্যক্তি শ্রবণীয় বিষয় যথা- বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের কোনো একটি অপর ব্যক্তি থেকে শুনল। উক্তিকারী তার কথা শোনার জন্যে কাউকে সাক্ষী মনোনীত করেনি। এরপর সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন দেখা দিলে শ্রবণকারী ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করার সময় বলবে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে বিক্রয় করেছে অথবা সে ক্রয় করেছে। অথবা সে তার ঋণের স্বীকারোক্তি করেছে। সাক্ষী এ কথা বলবে না যে, আমাকে সাক্ষী নিয়োগ করেছে। কেননা এটা মিথ্যা। কেননা কেউ তাকে সাক্ষী নিয়োগ করেনি; সে তো নিজেই বিবাদীর কথা শুনে সাক্ষী হয়েছে। এ অবস্থায় এ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

আর যদি কোনো ব্যক্তি পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনে সাক্ষ্য দিতে চায় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ এক শ্রোতা শুনতে পেল যে, এক লোক ঘরের ভিতর অথবা পর্দার ওপারে বলছে যে, আমি তার কাছে বিক্রয় করেছি। অপরজন বলল, আমি ক্রয় করেছি। এমতাবস্থায় শ্রোতার জন্যে জায়েজ নেই যে, সে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিক্রয়কারী কিংবা ক্রয়কারী বলে সাক্ষ্য দেবে। আর যদি সে বিচারকের সামনে স্পষ্ট করে বলে, আমি পর্দার আড়াল থেকে শুনে সাক্ষ্য দিয়েছি তাহলেও বিচারক তা গ্রহণ করবেন না। কেননা একজনের গলার স্বর অন্যজনের গলার স্বরের সাথে কখনো কখনো মিলে যায়। অর্থাৎ শ্রোতা শুধুমাত্র গলার স্বর শুনে ব্যক্তি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না। একের গলার স্বর অন্যের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আর সন্দেহ নিশ্চিত জ্ঞানের পরিপন্থি বিষয়, তাই এর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না- যার দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করা যায়। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হওয়া আবশ্যক। মোটকথা যেহেতু পর্দার আড়াল থেকে শুনে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না, তাই পর্দার আড়াল থেকে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করাও বৈধ নয়।

তবে যদি সাক্ষী ঘরে প্রবেশ করে এবং সে জানতে পারে যে, ঘরে বিবাদী ছাড়া আর কেউ নেই। তারপর সাক্ষী ঘরের দরজায় অবস্থান গ্রহণ করে, আর ঘরটিতে এ দরজা ছাড়া অন্য দরজাও নেই এবং ঘরে প্রবেশ করার কিংবা বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। এরপর সাক্ষী ভিতরে অবস্থানকারীর শব্দ শুনতে পেল যে, সে স্বীকারোক্তি করছে, কিন্তু সাক্ষী তাকে দেখেনি। উদাহরণস্বরূপ সে শুনতে পেল যে, ভিতরে অবস্থানকারী বলছে- আমি আমার ক্রীতদাস আমরকে হামিদের কাছে বিক্রয় করেছি। অথবা যে বলল, আমার কাছে হামিদ একহাজার টাকা পায়- সাক্ষী উক্তিকারীকে দেখেনি এবং উক্তিকারীও কাউকে সাক্ষী নিয়োগ করেনি- এমতাবস্থায় উক্ত শ্রোতার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। কেননা এ অবস্থায় সাক্ষীর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণে সাক্ষ্যদানের শর্ত/রুকন পাওয়া গিয়েছে। অতএব, সাক্ষ্যদান করা তার জন্যে বৈধ এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِثْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرُ مُوْجِبَةٍ بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَصِيْرُ مُوْجِبَةً بِالنَّقْلِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَابُدَّ مِنَ الْإِنَابَةِ وَالتَّحْمِيْلِ وَ لَمْ يُوْجَدْ ـ

অনুবাদ : আরেক প্রকার সাক্ষ্য বিষয় হলো যার হুকুম এমনিতে [সাক্ষী ছাড়া] স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় না। যেমন সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দেওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্যদানকারীকে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে শুনে তাহলে শ্রোতার জন্যে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান করা বৈধ নয়, তবে সে যদি তাকে সাক্ষী নিয়োগ করে। কেননা সাক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ওয়াজিবকারী নয়। এটা তো বিচারকের এজলাসে স্থানান্তর করার দ্বারা ওয়াজিবকারী হয়। অতএব, এতে স্থলাভিষিক্ত বানানো এবং দায়িত্ব দেওয়া আবশ্যক। অথচ এখানে তা পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ الخ : দ্বিতীয় প্রকার বিষয়সমূহ হলো যা এমনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় না: বরং এতে সাক্ষী বানানোর প্রয়োজন হয় যেমন- شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ [সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য দেওয়া]। এতে যতক্ষণ মূল সাক্ষী কাউকে সাক্ষী না বানায় ততক্ষণ অন্যকোনো ব্যক্তি যদি তা শুনে সাক্ষী দিতে চায় তাহলে সাক্ষ্য দেওয়া তার জন্য বৈধ নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি খালিদ যায়েদকে বিচারকের এজলাসের বাইরে অন্য কোনো স্থানে সাক্ষ্য দিতে শুনে যে, আমর রাশেদের কাছে দুই হাজার টাকা পায়। এমতাবস্থায় খালিদের জন্যে টাকার লেনদেন সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করার অধিকার লাভ হবে না, তবে যদি মূল সাক্ষী যায়েদ খালেদকে সাক্ষী মনোনীত করে তাহলে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। এর দলিল হচ্ছে, মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে হুকুমকে ওয়াজিব করে না। সুতরাং যায়েদের সাক্ষী হওয়ার কারণে আমরের ঋণ ওয়াজিব হবে না। মূলত আসল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য তখনই ওয়াজিবকারী হয় যখন তারা তাদের সাক্ষ্যকে বিচারকের এজলাসে উপস্থাপন করে। সারকথা হলো, সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোনো বিষয়কে ওয়াজিব করে না। আর যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য কোনো বিষয় ওয়াজিব করে না; বরং তাকে ওয়াজিবকারী বানানোর জন্যে বিচারকের মজলিসে উত্থাপন করতে হয়। অতএব, মূল সাক্ষীদের উচিত যে, তারা তাদের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পরবর্তী সাক্ষীগণের উপর অর্পণ করবে এবং সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের নিজের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে, যাতে স্থলাভিষিক্তগণ মূল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করবেন। এর কারণ হলো, পরবর্তী সাক্ষীগণের সাক্ষ্যদানই হলো মূল সাক্ষীগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, মূল সাক্ষীগণের বিবাদীর বিরুদ্ধে বিধান বাস্তবায়ন করার একটি ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ তাদের এ সক্ষমতা ছিল যে, তারা তাদের সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাদীর বিরুদ্ধে বিচারকের রায় প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। কিন্তু যখন আলোচ্য মাসআলায় পরবর্তী সাক্ষীগণ মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্যকে বর্ণনা করলেন- তখন পরবর্তী সাক্ষীরা যেন মূল সাক্ষীগণের সেই ক্ষমতাকে রহিত করে দিল, যে ক্ষমতা মূল সাক্ষীগণের ছিল। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, কারো ক্ষমতা এবং হক [অধিকার] অন্য কেউ তার অনুমতি ছাড়া বিনষ্ট কিংবা রহিত করাতে পারে না- এটা তার জন্যে বৈধও নয়। অতএব, পরবর্তী বা স্থলাভিষিক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে মূল সাক্ষীদের সন্তুষ্টি ও অনুমতি আবশ্যক। মূল সাক্ষীদের অনুমতির প্রক্রিয়া এই যে, তারা পরবর্তী সাক্ষীদের তাদের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি নির্ধারণ করবেন। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে পরবর্তী সাক্ষীদের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তি এবং তাদের দায়িত্ব অর্পণ করার বিষয়টি পাওয়া যায়নি, তাই পরবর্তী সাক্ষীদের জন্যে শুধুমাত্র মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শুনতে পায় যে, মূল সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে, যেমন- রাশেদ শুনতে পেল যে, যায়েদ [মূল সাক্ষী] তার সাক্ষ্যের জন্যে অন্য কাউকে [খালিদ] সাক্ষীরূপে স্থলাভিষিক্ত করছে, এমতাবস্থায় রাশেদের জন্যে সাক্ষ্যদান করা বৈধ নয়। কারণ, সে এখানে একজন শ্রোতা বৈ কিছু নয় এবং তাকে মূল সাক্ষী তার স্থলাভিষিক্ত করেনি। কেননা, মূল সাক্ষী যায়েদ তার ক্ষমতা স্থানান্তর করে তা শ্রোতা রাশেদকে অর্পণ করেনি; বরং সে অন্য আরেকজন তথা খালিদকে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে। তাই এখানে শ্রোতার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান কোনোরূপেই বৈধ নয়। এখানে শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত খালিদের জন্যে সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েজ হবে।

وَكَذَا لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعْ لِلسَّامِعِ اَنْ يَشْهَدَ لِاَنَّهُ مَا حَمَلَهُ وَاِنَّمَا حَمَلَ غَيْرَهُ ـ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ اِذَا رَاٰى خَطَّهُ اَنْ يَشْهَدَ اِلَّا اَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ لِاَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ قِيْلَ هٰذَا عَلٰى قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ وَقِيْلَ هٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا وَجَدَ الْقَاضِىْ شَهَادَتَهُ فِىْ دِيْوَانِهِ اَوْ قَضِيَّتِهِ لِاَنَّ مَا يَكُوْنُ فِىْ قِمَطْرِهِ فَهُوَ تَحْتَ خَتْمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذٰلِكَ وَلَا كَذٰلِكَ الشَّهَادَةُ فِى الصَّكِّ لِاَنَّهُ فِىْ يَدِ غَيْرِهِ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا تَذَكَّرَ الْمَجْلِسَ الَّذِىْ كَانَ فِيْهِ الشَّهَادَةُ اَوْ اَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ اَنَّا شَهِدْنَا نَحْنُ وَاَنْتَ ـ

অনুবাদ : এমনিভাবে সে যদি শুনতে পায় মূল সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে অন্য কাউকে সাক্ষী নিয়োগ করছে তবুও শ্রোতার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। কেননা যে তাকে দায়িত্ব প্রদান করেনি, সে তো অন্যজনকে দায়িত্ব দিয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষ্যদাতার জন্যে [সাক্ষ্যদানের কথা মনে না থাকলে] নিজ পত্র দেখে সাক্ষ্যদান করা বৈধ নয়। তবে যদি তার সাক্ষ্যদান করার কথা স্মরণ থাকে। কেননা একটি পত্র অন্য পত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন হলো না। কেউ কেউ বলেন যে, মাসআলাটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে [লিখিত]। সাহেবাইনের মতে, তার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ। অন্যরা বলেন, এটা সবার ঐকমত্যের বিধান। আর মতবিরোধ ঐ অবস্থায় যে, বিচারক তার সাক্ষ্য তার নথিপত্রে অথবা রায় লিখার ফাইলে পেল। কেননা, যা তার নথিপত্রে রয়েছে তা সিলমোহরকৃত। আর তা হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মুক্ত। ফলে এর দ্বারা তার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হলো। তবে সাধারণ ডায়েরিকৃত সাক্ষ্য এরূপ নয়। কেননা তা অন্যের হাতে যায়। এরূপ মতবিরোধ রয়েছে এসব ক্ষেত্রে যে, সাক্ষীর এমন মজলিসের কথা স্মরণ হয় যেখানে সাক্ষ্য সংঘটিত হয়েছিল অথবা তাকে সংবাদ দিল এমন সব লোকজন যাদের উপর তার নির্ভরতা রয়েছে যে, আমরা এবং তুমি তা প্রত্যক্ষ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষী যদি সাক্ষ্যদানের ঘটনা বিস্মৃত হয় এমনকি সে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল তাও তার স্মরণ নেই। কিন্তু সে লিখিত একটি পত্র বা ফাইল দেখে সাক্ষ্য দেয় এমতাবস্থায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা একটি লিখিত পত্র আরেকটি পত্রের সদৃশ হয়। ফলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, লিখিত পত্রটি সাক্ষীর নাকি অন্য কোনো ব্যক্তির? আর সন্দেহ দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস বা জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ সন্দেহ হলে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। সাক্ষ্যদানের জন্যে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এ কারণে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে

না। ইমাম কুদূরী (র.) এ মাসআলাতে কোনো মতবিরোধ উল্লেখ করেননি। এমনিভাবে খাসসাফ ও কোনো মতবিরোধ বর্ণনা করেননি। তবে ফকীহ আবুল লাইছ ও শামসুল আইম্মাহ প্রমুখ এতে ইমামগণের মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন, দেখে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রাহ্য না হওয়ার মতবাদটি ইমাম হানীফা (র.)-এর। কারণ, তাঁর অনুসৃত মূলনীতিতে লিখিত কোনো পত্র বা কিতাব গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে ঘটনা সংঘটনের সময় থেকে সাক্ষ্য প্রদান করা পর্যন্ত পুরো সময়টিতে সাক্ষীর ঘটনাটি স্মরণ থাকতে হবে। তবে সাহেবাইনের মতানুসারে লিপি দেখে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। তবে কেউ কেউ মনে করেন, লিপি দেখে সাক্ষ্য দান অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তবে মতবিরোধ ঐ অবস্থায় যে, বিচারক তার নথিপত্রে দেখতে পেলেন সাক্ষীরা কোনো একটি ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছে; কিন্তু এর রায় প্রদান করা হয়নি। এরপর বাদী বিচারকের কাছে রায় তলব করল; কিন্তু বিচারক তার ঘটনার সাক্ষীদের অনুসন্ধান করে পেলেন না। যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের কথা স্মরণ হলো না– এমতাবস্থায় নথিপত্র দেখে ফয়সালা প্রদান করা বিচারকের জন্যে বৈধ নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। সাহেবাইন (র.) বলেন, বিচারক যখন তাঁর সিলমোহরকৃত নথিপত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত লিখিত কোনো নথি পেলেন, তখন তার জন্যে উক্ত লেখার উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করা বৈধ। ইমাম মালেক (র.)-ও একই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি অভিমত এরূপ।

এমনিভাবে যদি বিচারক তাঁর নথিপত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেখতে পেলেন। অর্থাৎ বিচারক তাঁর নথিপত্রে তাঁর লিখিত একটি রায় দেখতে পেলেন এবং সেই রায়ের মধ্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্যও লিখিত পেলেন। কিন্তু বিচারক তাঁর রায় প্রদান করার কথা সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে ব্যর্থ হলেন। এমতাবস্থায় তাঁর লিখিত রায় কার্যকর করা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, এর সাহায্যে রায় কার্যকর করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাইনের মতে, তা করা বৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি লিখিত পত্র আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াতে এর দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয় না। অথচ এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা জরুরি। সাহেবাইনের দলিল হলো, যে বিষয়াবলি বিচারকের নথিপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং তা যদি মোহরাঙ্কিত হয় তাহলে তা যে কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মুক্ত। সুতরাং যে সাক্ষ্য বিচারকের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাও যে কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মুক্ত এবং নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য। এ কারণে বিচারকের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হলো। আর সেই নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তার রায় প্রদান করা বৈধ।

যদি সাক্ষী তার সাক্ষ্য কোনো একটি নথিতে পায় এবং তার বিশ্বাস হয় যে, লেখাটি তার নিজেরই লেখা। তাহলে তা দেখে সাক্ষ্য দান করা বৈধ নয়। কেননা উক্ত নথি বিচারক ছাড়া অন্য লোকের কাছে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বিচারক ছাড়া অন্য লোকের কাছে নথি থাকার সম্ভাবনার কারণে তা হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মুক্ত নয়। যখন সাক্ষীর নথিপত্র সন্দেহমুক্ত নয়, তাই এটা থেকে নিশ্চিত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। আর তা থেকে নিশ্চিত জ্ঞানার্জন সম্ভব না বলে তা দেখে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ নয়।

একই মতবিরোধ দেখা যাবে যদি সাক্ষী তার সাক্ষ্য দেওয়ার মজলিসটির কথা স্মরণ করেছে বটে, কিন্তু তার সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি স্মরণ নেই। অথবা নির্ভরযোগ্য কিছু লোক তাকে জানাল যে, আমরা এবং তুমি সাক্ষ্য দিয়েছিলাম; কিন্তু এখানেও ঘটনাটি স্মরণ হলো না। এমতাবস্থায় কতিপয় লোকের মতে, সবার ঐকমত্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। আর কতিপয় লোক মনে করেন– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অবৈধ এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে বৈধ।

قَالَ : وَلاَ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ اِلاَّ النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُولَ وَوِلاَيَةَ الْقَاضِيْ فَاِنَّهُ يَسَعُهُ اَنْ يَشْهَدَ بِهٰذِهِ الاَشْيَاءِ اِذَا اَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ لاَ تَجُوزَ لاَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَذٰلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ اَنَّ هٰذِهِ الاُمُوْرَ تَخْتَصُّ بِمُعَايَنَةِ اَسْبَابِهَا خَوَاصٌّ مِنَ النَّاسِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا اَحْكَامٌ تَبْقٰى عَلٰى اِنْقِضَاءِ الْقُرُوْنِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ فِيْهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ اَدّٰى اِلَى الْحَرَجِ وَتَعْطِيْلِ الاَحْكَامِ بِخِلاَفِ الْبَيْعِ لاَنَّهُ يَسْمَعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষ্যদাতার জন্যে এমন কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান অবৈধ যা সে প্রত্যক্ষ করেনি। তবে বংশ সংক্রান্ত বিষয়, মৃত্যু, বিবাহ, স্ত্রীগমন ও বিচারকের ক্ষমতা এসব ব্যাপারে [না দেখে সাক্ষ্য প্রদান করা] তার জন্যে বৈধ - যদি তাকে এ সব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি সংবাদ দেয়। এটা ইসতিহসান। কিয়াস মতে এটা জায়েজ নয়। কেননা শাহাদাত [সাক্ষ্য প্রদান করার] শব্দটি নির্গত হয়েছে মুশাহাদা [প্রত্যক্ষ দর্শন] থেকে, আর তা দর্শন দ্বারা লাভ হয় অথচ এখানে তা লাভ হয়নি। ফলে এটা হয়ে গেল বেচাকেনার মতো। ইসতিহসানের দলিল হলো, এগুলো এমন সব বিষয়, যার উপকরণগুলোর দর্শন বিশেষ লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানগুলো একটা বিশেষ সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এতে যদি শ্রুত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তা একটা সংকট ও বিধিবিধান বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে। অবশ্য বেচাকেনা এরূপ নয়। কেননা তা প্রত্যেকেই শুনতে পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلاَ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত একটি প্রাসঙ্গিক মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পাঁচটি বিষয় ছাড়া যাবতীয় বিষয়ে না দেখে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়। পাঁচটি বিষয় না দেখে শর্তসাপেক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। বিষয় পাঁচটি হলো– ১. বংশ প্রমাণ করা ২. মৃত্যু ৩. বিবাহ ৪. স্বামীর স্ত্রীর কাছে গমন ও নির্জন অবস্থান। ৫. বিচারকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব। এ পাঁচটি বিষয় যদি সাক্ষী সরাসরি না দেখে; বরং বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শ্রুত হয় তাহলে সে উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবে। তবে কতজন ব্যক্তি থেকে শুনে সাক্ষ্য দিতে পারবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, এমন সংখ্যক লোক থেকে যদি সংবাদ জানতে পারে যাদের সম্মিলিতভাবে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। অর্থাৎ তাওয়াতুর দ্বারা জানতে হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে নির্ভরযোগ্য দুজন ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া যথেষ্ট। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি কারো বংশ সম্পর্কে এ রকম শুনতে পায় এরপর সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তার সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ হামিদ শুনতে পেল যে, রাশেদ আমরের পুত্র। অতঃপর সে বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্য দিল তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। মৃত্যুর ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের বিবরণ এই যে, সাক্ষী [হামিদ] লোকজন থেকে শুনতে পেল যে, অমুক মারা গিয়েছে অথবা সে লোকজনকে মৃতের দাফন-কাফন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত দেখতে পেল। তারপর সে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক মৃত্যুবরণ করেছে। তাহলে তার সাক্ষ্যদান বৈধ হবে যদিও সে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখেনি। বিবাহের ক্ষেত্রে মাসআলাটির উদাহরণ এই যে, সাক্ষ্যদাতা লোক মুখে শুনতে পেল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক নারীকে বিবাহ করেছে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষী যদিও বিবাহের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেনি তবুও তার বিবাহের সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। স্বামী তার স্ত্রীর কাছে গমন করার সাক্ষ্যদানের উদাহরণ এরূপ যে, সাক্ষ্যদাতা লোকমুখে শুনেছে যে, অমুক মহিলা অমুক পুরুষের স্ত্রী, আর সেই পুরুষ উক্ত মহিলার কাছে নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে গমন করে এবং নির্জন-নিরালা সময় কাটায় তাহলে সাক্ষীর এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ যে, অমুক মহিলা অমুকের স্ত্রী, যদিও এখানে সাক্ষী বিবাহের অনুষ্ঠান ও স্বামী-স্ত্রীর সহবস্থান প্রত্যক্ষ করেনি।

وَلَايَةُ قَاضٍ [বিচারকের ক্ষমতা ও পদ] সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের উদাহরণ এই যে, সাক্ষ্যদাতা লোকমুখে শুনতে পেল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক শহরের বিচারক, তাহলে তার এ সাক্ষ্যদান বৈধ যে, অমুক ব্যক্তি অমুক শহরের বিচারক। যদিও এখানে সাক্ষী সরকারপ্রধানের পক্ষ থেকে উক্ত ব্যক্তিকে বিচারকরূপে নিযুক্ত করতে দেখেনি। মোটকথা, উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির জন্যে মূল সাক্ষী থেকে শুনে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ- যদিও এতে প্রত্যক্ষ দর্শন না হয়ে থাকে।

লেখক বলেন. এ পাঁচ বিষয়ে না দেখে সাক্ষ্যদানের বৈধতা ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ, কিয়াস বা যুক্তি অনুসারে এটা বৈধ হয় নন। যুক্তিমতে না দেখে যে কোনো বিষয়ের সাক্ষ্যদান অবৈধ। কেননা শাহাদাত শব্দটি مُشَاهَدَةٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ- প্রত্যক্ষ দর্শন; তাই শ্রবণ করাকে শাহাদাত বলা হয় না। উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ে যেহেতু প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া যায়নি, তাই এগুলো বেচাকেনার মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ বেচাকেনার ক্ষেত্রে যেমন শুধুমাত্র শুনে- না দেখে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়, ঠিক তেমনি যুক্তিমতে এসব বিষয়ে শুধু শুনে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়।

লেখকের ইবারত وَذٰلِكَ بِالْعِلْمِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُعَايَنَةٌ ও مُشَاهَدَةٌ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শন ও সরাসরি অবলোকন।

লেখক ইসতিহসানের দলিল পেশ করছেন এই বলে যে, এ পাঁচটি বিষয় এমন যে, এর দর্শন বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সাধারণ রীতি মোতাবেক এসব বেশি লোকের দৃষ্টিতে পড়ে না। সাধারণভাবে এসব বিষয় সংবাদের মাধ্যমে মানুষ অবগত হয়। যেমন- সন্তান জন্মের সময় লোকজন উপস্থিত হয় না। তারা মায়ের সাথে অথবা দুগ্ধদানকারিণী মায়ের সাথে সন্তানকে দেখতে পায়। অতঃপর সন্তানকে পিতার সাথে সম্বন্ধ করে দেয়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্যলোক উপস্থিত থাকে না। সাধারণ লোকজন যখন কাফন-দাফন করতে দেখে তখন তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। এমনিভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে সব মানুষ উপস্থিত হয় না; বরং একজন অপরজনকে বলে অমুক ব্যক্তি অমুক মেয়েকে বিবাহ করেছে। এমনিভাবে সহবাস কেউই দেখতে পায় না। তবে তার কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এমনিভাবে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান বা দায়িত্ব গ্রহণ বিশিষ্ট লোকজন ছাড়া অন্যরা দেখতে পারে না। সাধারণ লোক বিচারকের এজলাসে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে রায় প্রদান ও রায় কার্যকর করতে দেখে। মোটকথা, সাধারণ নীতি অনুসারে যখন এসব বিষয় কতিপয় লোকই জানতে পারে, আর সর্বসাধারণ এসব সংবাদের উপর বিশ্বাস করে, তাই এসব ব্যাপারে সংবাদই সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে যথেষ্ট যাতে মানুষের বিভিন্ন অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এসব বিষয়ে যদি সংবাদের উপর নির্ভর না করা হয়, তাহলে উল্লিখিত বড় বড় অধিকার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকবে। অথচ এসব বিষয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। যেমন- বিবাহ, বংশপ্রমাণ ও মৃত্যুর সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীসহবাসের সাথে পূর্ণ মহর, ইদ্দত, বিবাহ ও চারিত্রিক পবিত্রতা এবং বংশপ্রমাণের সম্পর্ক রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, যদি স্ত্রীসহবাস প্রমাণ হয়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর লাভ করবে, তালাক দেওয়া হলে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনই مُحْصَنٌ [বিবাহিত] বলে প্রমাণিত হবে ও সন্তান জন্মালে তার নসব [বংশ] প্রমাণিত হবে। এসব বিষয়ে শোনার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ সাব্যস্ত না করলে বিধিবিধান বাস্তবায়নে এক বিরাট সংকট দেখা দেবে। আর অনেক বিধিবিধান অকার্যকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চাশ বছর পর এক ব্যক্তি দাবি করল যে, এ জিনিসটি আমার পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। অথবা স্ত্রী তার মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছে পূর্ণ মহর দাবি করল। অথচ উক্ত ব্যক্তির জন্মের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই এবং উক্ত মহিলার সাথে মৃত ব্যক্তির বিবাহের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও নেই। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য [যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়] গ্রহণযোগ্য না হলে প্রথম অবস্থায় উত্তরাধিকার আর দ্বিতীয় অবস্থায় মহরের হুকুম অকার্যকর হয়ে যায় এবং মহর ও উত্তরাধিকারের বিষয়ে সংকট সৃষ্টি হয়।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, হযরত আলী (রা.) আবূ তালিবের পুত্র। অথচ আমরা কেউ তাঁর জন্মের প্রত্যক্ষদর্শী নই; বরং আমরা তা লোকমুখে শুনেছি। এমনিভাবে আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, সব সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুবরণ করেছেন, যদিও আমরা তাঁদের কারো মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিনি। এমনিভাবে আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ -এর স্ত্রী, যদিও আমরা তার বিবাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা আরো সাক্ষ্য প্রদান করি যে, রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে একত্রে নির্জনে অবস্থান করেছেন; অথচ আমরা এটাও প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, শুরাইহ ইবনে হারিছ বিচারক ছিলেন, অথচ আমরা তাঁকে বিচারকরূপে নিযুক্ত হতে দেখিনি। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ। পক্ষান্তরে বেচাকেনার প্রস্তাব ও তা গ্রহণ সব লোকেই দেখতে পায়। এতে বিশেষ লোকই দেখতে পাবে অন্যরা দেখতে পাবে না- এমন কিছু নয়। এ কারণেই শুধুমাত্র শুনে- না দেখে বেচাকেনার সাক্ষ্য দান বৈধ নয়। আর বংশপ্রমাণ, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলোর দর্শন যেহেতু বিশেষ লোকজনই দেখতে পায় তাই শোনার উপর সীমাবদ্ধ না করলে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হবে।

وَاِنَّمَا يَجُوْزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَ بِالْاِشْتِهَارِ وَذٰلِكَ بِالتَّوَاتُرِ اَوْ بِاَخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهٖ كَمَا قَالَ فِى الْكِتَابِ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ عَدْلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِيَحْصُلَ لَهُ نَوْعُ عِلْمٍ وَقِيْلَ فِى الْمَوْتِ يَكْتَفِىْ بِاَخْبَارِ وَاحِدٍ اَوْ وَاحِدَةٍ لِاَنَّهُ قَلَّمَا يُشَاهِدُ حَالَهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ اِذِ الْاِنْسَانُ يُهَابُهُ وَيَكْرَهُهُ فَيَكُوْنُ فِىْ اِشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَا كَذٰلِكَ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُطْلِقَ اَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَلَا يُفَسِّرُ اَمَّا اِذَا فَسَّرَ لِلْقَاضِىْ اَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ كَمَا اَنَّ مُعَايَنَةَ الْيَدِ فِى الْاَمْلَاكِ مُطْلَقٌ لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ اِذَا فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ كَذَا هٰذَا .

অনুবাদ : [এসব ক্ষেত্রে] সাক্ষীর জন্যে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হয় প্রসিদ্ধির কারণে। আর তা [দুভাবে হয়–] তাওয়াতুর দ্বারা এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা। যেমনটি কুদূরী কিতাবে বলা হয়েছে। আর [এতে] দুটি শর্তারোপ করা হয়েছে যে, সংবাদ দেবে দুজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, যাতে তার একপ্রকার নিশ্চিত অবগতি লাভ হয়। বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ অথবা একজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। কেননা, এরূপ হওয়া খুব বিরল যে, একজন ছাড়া তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। কেননা মানুষ মৃত্যুকে ভয় ও অপছন্দ করে। ফলে এর সংখ্যার শর্ত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। বিবাহ ও বংশ প্রমাণ করার বিষয়টি এরূপ নয়। সাক্ষ্য প্রদান নিঃশর্ত হওয়া সমীচীন। এর কোনো ব্যাখ্যা করবে না। তবে যদি বিচারকের সামনে সে ব্যাখ্যা করে দেয় যে, সে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছে– তাহলে বিচারক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। যেমন মালিকানাধীন জিনিস আয়ত্তে গ্রহণ করার [কবজের] প্রত্যক্ষ দর্শন ও অবলোকন সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি প্রদানকারী। অতঃপর যখন সে ব্যাখ্যা প্রদান করল, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাও এমনই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ لِلشَّاهِدِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক একটি আপত্তি নিরসন করছেন। আপত্তিটি হলো, উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়ে না দেখে সাক্ষ্যদানের বৈধতা কুরআনের নির্দেশের লঙ্ঘন। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– ১। مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ; এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদানের সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন না করলে এবং সরাসরি না দেখলে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় না। তাই উল্লিখিত বিষয়সমূহে শুধুমাত্র শুনে- না দেখে ইসতিহসান হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতা কুরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর এরূপ করা কারো জন্যে বৈধ নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান যেভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা লাভ হয় তেমনি তা কোনো বিষয় সুবিদিত হওয়ার দ্বারাও অর্জন হয়। অর্থাৎ কোনো লোক যদি সর্বজনের কাছে সুবিদিত একটি বিষয় শুনতে পায় তাহলে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। সবার কাছে কোনো বিষয় দুভাবে সুবিদিত হয়–

১. যে বিষয়টি তাওয়াতুর দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাওয়াতুর অর্থ এমন সংখ্যক লোক কোনো বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া, যাদের মিথ্যার ব্যাপারে একজোট হওয়া অসম্ভব।

২. বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ দানের মাধ্যমেও প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত হতে পারে। যেমনটি কুদূরী কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে। তবে তাওয়াতুর হলে প্রকৃতভাবে ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হয়। আর বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা হুকমীভাবে প্রসিদ্ধ হয়। মোটকথা, শোনার উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্যদান তখনই বৈধ হবে যখন তার শোনা এমন বিষয়ে হবে যা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। প্রসিদ্ধ হওয়া প্রকৃতভাবেও হতে পারে আবার হুকমীভাবে [আইন ও বিধানগত]-ও হতে পারে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উল্লিখিত পাঁচ বিষয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ শুনে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। ইমাম কুদূরী (র.) এখানে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংখ্যার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। লেখক বলেন, সংখ্যার শর্ত অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। সে মতে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ আর দুজন ন্যায়পরায়ণ মহিলা সংবাদ দিলে তাদের সংবাদ শুনে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, প্রকৃত প্রসিদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ এমন সংখ্যক লোক থেকে শোনা আবশ্যক যারা সংখ্যায় অনেক এবং যারা মিথ্যার উপর একজোট হতে পারে না। তাঁর মতে, শুধুমাত্র দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক থেকে সংবাদ শুনে সাক্ষ্যদান বৈধ হবে না। অনেকে বলেন, মৃত্যুর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা মহিলার থেকে সংবাদ শুনে সাক্ষ্য দান বৈধ। তাদের দলিল হলো, মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং একে ভয় করে বলে সাধারণভাবে এতে একজনের বেশি উপস্থিত থাকে না। তাই এতে দুজনের পরিবর্তে একজনের সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট হবে। এক্ষেত্রে একজনের বেশি হওয়ার শর্তারোপ করা সংকট সৃষ্টি করবে। ইসলামি শরিয়তে যেহেতু সংকট দূর করা হয়েছে তাই মৃত্যুর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজনের থেকে শোনাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে সন্তান জন্ম, বিবাহ ও বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ সাধারণভাবে বেশি লোকের মাঝেই সংঘটিত হয়। যেমন– বিবাহ দুজন সাক্ষীর কমে সংঘটিত হয় না। এমনিভাবে বিচারক নিযুক্তির সময় কিংবা বিচারকার্য সম্পাদনের সময় বহু লোকের সমাগম হয়। সুতরাং মৃত্যু এবং অন্যান্য বিষয়ের মাঝে উক্ত পার্থক্যের কারণে মৃত্যুর মাঝে একাধিক সংখ্যার শর্তারোপ করা হয়নি, আর অন্যান্য বিষয়গুলোর মাঝে শর্ত করা হয়েছে।

লেখক বলেন, যেসব বিষয়ে শুনে সাক্ষ্য দেওয়া যায় সেগুলোর সাক্ষ্যকে মুতলাক [নিঃশর্ত] রাখা উচিত– বিচারকের সামনে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বংশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের পুত্র, যেমন হযরত আবূ বকর (রা.) আবূ কুহাফার পুত্র। কিংবা হযরত ওমর (রা.) খাত্তাবের পুত্র –এভাবে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। আর যদি সবিস্তারে বলে যে, আমি শুনে বলছি -অমুক অমুকের পুত্র - তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনো দ্রব্য আয়ত্তাধীন রাখতে দেখে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক দ্রব্যের মালিক। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সে সাক্ষ্য দেয় ব্যাখ্যা সহকারে যে, অমুক ব্যক্তির অধীনে এ দ্রব্য আছে- আমি তা শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে না। কেননা সে ব্যাখ্যাসহ সাক্ষ্য দিয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যাখ্যা না করে মূলবক্তব্য পেশ করত তাহলে বৈধ হতো।

তদ্রূপ আলোচ্য বংশের ব্যাপারে ব্যাখ্যা সহকারে সাক্ষ্যদানও নাজায়েজ; কিন্তু ব্যাখ্যা ছাড়া সাক্ষ্যদান করা বৈধ বিবেচিত হবে। কোনো বিষয় শ্রুত হয়ে বিচারকের সামনে ব্যাখ্যা ছাড়া সাক্ষ্যদান করা এজন্য বৈধ যে, যখন সাক্ষী বলল, অমুক ব্যক্তি অমুকের পুত্র, তখন বুঝা যাবে যে, সাক্ষীর অন্তরে এ সংবাদের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। অন্তরের বিশ্বাসের কারণে এই সাক্ষ্য পূর্ণ অবগতি সহকারে হয়েছে বুঝা যাবে, আর যে সাক্ষ্য পূর্ণজ্ঞান ও অবগতির সাথে দেওয়া হয় তা গ্রহণযোগ্য। অতএব, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষী বলে যে, আমি শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলে বুঝা যায় যে, এ সাক্ষ্যের ব্যাপারে তার পূর্ণ বিশ্বাস অন্তরে নেই; বরং শ্রবণ করাই তার সাক্ষ্যদানের ভিত্তি। আর যখন এ সংবাদের বিশ্বাস তার অন্তরে নেই, তখন সাক্ষ্য পূর্ণ অবগতির সাথে হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে, সাক্ষ্য যদি পূর্ণজ্ঞান ও অবগতির সাথে না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, ব্যাখ্যা সহকারে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَكَذَا لَوْ رَاى اِنْسَانًا جَلَسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْخُصُوْمُ حَلَّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ عَلٰى كَوْنِهِ قَاضِيًا وَكَذَا اِذَا رَاى رَجُلًا وَامْرَأَةً يَسْكُنَانِ بَيْتًا وَيَنْبَسِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلَى الْاٰخَرِ اِنْبِسَاطَ الْاَزْوَاجِ كَمَا اِذَا رَاى عَيْنًا فِىْ يَدِ غَيْرِهِ وَمَنْ شَهِدَ اَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ فُلَانٍ اَوْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌ حَتّٰى لَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِىْ قَبِلَهُ.

অনুবাদ : অনুরূপভাবে সে [সাক্ষী] যদি কোনো ব্যক্তিকে বিচারকের আসনে বসতে দেখে, যার কাছে বাদী-বিবাদীরা যাতায়াত করে। তার জন্যে উক্ত ব্যক্তির বিচারক হওয়ার সাক্ষ্যদান বৈধ। তদ্রূপ সে যদি কোনো পুরুষ ও মহিলাকে এক ঘরে বসবাস করতে দেখে যে, তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো খোলাখুলি-জড়তা ছাড়া চলাফেরা করে [তাহলে তার জন্যে তাদের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার সাক্ষ্যদান করা বৈধ] সে অন্যের হাতে কোনো দৃশ্যমান বস্তু দেখল [এবং তার মালিক হওয়ার সাক্ষ্য দিল।] আর যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের দাফনপর্বে অংশগ্রহণ করেছে, অথবা তার জানাজায় অংশগ্রহণ করেছে তাহলে তাই প্রত্যক্ষ দর্শন। এমনকি সে যদি বিচারকের কাছে ব্যাখ্যা দেয় তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ رَاى اِنْسَانًا الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে আরো কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছেন, যাতে সাক্ষীর সরাসরি দর্শন না হওয়া সত্ত্বেও বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। যেমন– কোনো ব্যক্তি একজন লোককে বিচারকের আসনে [চেয়ারে] বসতে দেখল যার কাছে বাদী-বিবাদীদের গমনাগমন হয়, তাহলে উক্ত দর্শকের জন্যে এ সাক্ষ্যদান বৈধ যে, এ লোকটি এ শহরের বিচারক। যদিও সাক্ষী বিচারকের নিযুক্তি প্রত্যক্ষ করেনি। অর্থাৎ তার এতটুকু দেখাই সাক্ষ্যদান বৈধ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি দুজন পুরুষ-মহিলাকে এক ছাদের তলায় বসবাস করতে দেখল। যারা পরস্পরে নিঃসংকোচে স্বামী-স্ত্রীর মতো খোলাখুলি আচরণ করছে। তাহলে এ ব্যক্তির জন্যে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ যে, এ মহিলা এ পুরুষের স্ত্রী। যেমন– কোনো ব্যক্তি অন্যের হাতের বা আয়ত্তাধীন কোনো মাল দেখে তার মালিক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল, তাহলে উক্ত সাক্ষ্য যেমন গ্রাহ্য হবে ঠিক তেমনি আমাদের আলোচ্য মাসআলাতেও সাক্ষীর জন্যে স্বামী ও স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান বৈধ হবে। কিন্তু যদি বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন? এর উত্তরে সাক্ষী বলেন, না। তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র শুনে সাক্ষ্যদান বৈধ যেমন মু'মিন জননীদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয়। তবে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতে দেখলে তো অবশ্যই সাক্ষ্যদান বৈধ হবে। অবশ্য কতিপয় মাশায়েখ বলেন, এ অবস্থায় সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না। তাঁদের দলিল হলো, সাক্ষী যখন বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমি বিবাহের সময় অনুপস্থিত ছিলাম এবং বিবাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিনি তাহলে যেন সে বিচারকের সামনে ব্যাখ্যা সহকারে বলল যে, আমি শুনে শুনে [-না দেখে] সাক্ষ্য দিয়েছি। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিচারকের সামনে যদি স্পষ্টভাবে বলে যে, "আমি শুনে শুনে সাক্ষ্য দিয়েছি" তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য মাসআলাটিতেও সাক্ষ্য অবৈধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ اَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ الخ : লেখক বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমি অমুকের দাফনপর্বে উপস্থিত ছিলাম কিংবা সে বলে যে, আমি অমুকের জানাজায় শরিক হয়েছি, তাহলে এটাই দর্শন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে যেন দেখেই সাক্ষ্য দিল। কারণ দাফন এবং জানাজা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিরই হয়ে থাকে। সুতরাং জানাজা ও দাফনে শরিক হওয়াই যেন তার মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা। এ কারণেই সাক্ষী যদি বিচারকের সামনে ব্যাখ্যা করে বলে তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়।

ثُمَّ قَصْرُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْكِتَابِ عَلٰى هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ يَنْفِى اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِى الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اٰخِرًا اَنَّهُ يَجُوْزُ فِى الْوَلَاءِ لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يَجُوْزُ فِى الْوَقْفِ لِاَنَّهُ يَبْقٰى عَلٰى مَرِّ الْاَعْصَارِ اِلَّا اَنَّا نَقُوْلُ الْوَلَاءُ يَبْتَنِىْ عَلٰى زَوَالِ الْمِلْكِ وَلَابُدَّ فِيْهِ مِنَ الْمُعَايَنَةِ فَكَذَا فِيْمَا يَبْتَنِىْ عَلَيْهِ وَاَمَّا الْوَقْفُ فَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ يُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِىْ اَصْلِهِ دُوْنَ شَرَائِطِهِ لِاَنَّ اَصْلَهُ هُوَ الَّذِىْ يَشْتَهِرُ .

অনুবাদ : অতঃপর মূলগ্রন্থ [তথা কুদূরীতে] এ পাঁচ বিষয়ে ব্যতিক্রমি বিধানকে সীমাবদ্ধ করা ওলা [ক্রীতদাস/ দাসী মুক্ত করা] ও ওয়াকফ -এর মধ্যে শ্রবণ করার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদানকে নাকচ করে দেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে সর্বশেষ বর্ণিত আছে যে, ওলার ক্ষেত্রে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। কেননা তা বংশ প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন, ওলা বংশীয় আত্মীয়তার মতো একটি আত্মীয়তা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়াকফের মধ্যে তা জায়েজ। কেননা তা যুগ যুগান্তরে স্থায়ী হয়। তবে আমরা বলি, ওলার ভিত্তি মালিকানা বিদূরিত হওয়ার উপর। আর মালিকানার মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শন আবশ্যক। অতএব, যার উপর এটি নির্ভরশীল তাতেও অবলোকন জরুরি আর ওয়াকফ এর ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, মূল ওয়াকফের ক্ষেত্রে শ্রুত বিষয়ের সাক্ষ্যদান বৈধ শর্তাবলির মধ্যে নয়। কেননা মূল ওয়াকফের বিষয়টিই প্রচারিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ قَصْرُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْكِتَابِ الخ : লেখক বলেন, কুদূরী কিতাবে বলা হয়েছে না দেখা বিষয়ের সাক্ষ্য শুধুমাত্র শ্রবণ করার ভিত্তিতে দেওয়া জায়েজ নয়। এরপর তিনি এ হুকুম থেকে পাঁচটি বিষয় ইসতিছনা [ব্যতিক্রমি ঘোষণা] করেছেন। কুদূরীর ইবারত হলো– وَلَا يَجُوْزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ اِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُوْلَ وَوِلَايَةَ الْقَاضِىْ; তার এ ইবারতে ব্যতিক্রমি বিষয় মাত্র পাঁচটি। শুধুমাত্র পাঁচটি বিষয়কে হুকুম থেকে পৃথক করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে শোনামাত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, وَقْف ও وَلَاء -এর মধ্যে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যদি কোনো ব্যক্তি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে দেখে অথবা কোনো জিনিসকে ওয়াকফ করতে দেখে তাহলেই কেবল তার জন্যে এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান বৈধ এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি লোকমুখে শুনে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা অবৈধ সাব্যস্ত হবে। এটা জাহেরী রেওয়ায়েত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে সর্বশেষ মত হলো, ওলা -এর মধ্যে শুধুমাত্র শুনে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। এর উদাহরণ এই– যদি হামিদ লোকমুখে শুনতে পায় যে, শাহেদ খালিদের আজাদকৃত ক্রীতদাস। কিন্তু হামিদ তাকে আজাদ করতে দেখেনি তবুও তার জন্যে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ যে, শাহেদ খালিদের আজাদকৃত ক্রীতদাস এবং তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এর ফলে শাহেদের ওলা [পরিত্যক্ত অর্থসম্পদ] খালদ প্রাপ্ত হবে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.) ও কতিপয় শাফেয়ী মাযহাব মতাবলম্বী। এর দলিল এই যে,

ওলা নসব [বংশ প্রমাণ] -এর সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন, ওলা বংশীয় আত্মীয়তার মতো একটি আত্মীয়তা। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বংশ প্রমাণের জন্যে শুধুমাত্র শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। তাই এর সমপর্যায়ভুক্ত ওলার মধ্যেও লোকমুখে শুনে সাক্ষ্যদান করা বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের আরেকটি প্রমাণ এই যে, [আমরা এ কথার সাক্ষ্য দেই যে,] কুনবার নামীয় ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস। নাফে' হযরত ইবনে ওমরের ও হযরত বিলাল (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস। এমনিভাবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস। অথচ আমরা তাঁদের আজাদ করতে দেখিনি। সুতরাং কুনবার, নাফে' প্রমুখের আজাদকৃত ক্রীতদাস হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলে উল্লিখিত মাসআলাতেও আজাদকৃত ক্রীতদাসের ব্যাপারে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া গ্রহণযোগ্য হবে।

বি. দ্র. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সর্বশেষ মত হলো এটি তবে প্রথম দিকে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ওয়াকফের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, এতে লোকমুখে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ যদি রাশেদ লোকমুখে শুনতে পায় যে, খালেদ অমুক স্থানটি অমুক মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছে তাহলে রাশেদের জন্য এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ যে, খালেদ অমুক স্থানটি অমুক মসজিদের জন্যে ওয়াকফ করেছে, যদিও সে ওয়াকফ করা প্রত্যক্ষ করেনি। এর দলিল এই যে, ওয়াকফ স্থায়ী হয় এবং যুগ-যুগান্তর পর্যন্ত বহাল থাকে। অতএব, যদিও ওয়াকফের সাক্ষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদানের শর্তারোপ করা হয়, তাহলে সাক্ষীদের মৃত্যুর পর ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। তাই ওয়াকফের স্থায়িত্বের জন্যে শুনে সাক্ষ্যদান করা বৈধ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে লেখক বলেন, ওলা মালিকানা রহিত হওয়ার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মনিব তার পূর্ববর্তী ক্রীতদাসের মালের মালিক– যখন ক্রীতদাস তার মালিকানা থেকে চলে যায়। আর এ ব্যাপারে সবার ঐকমত্য যে, মালিকানা রহিতকরণের মধ্যে সাক্ষীর প্রত্যক্ষ দর্শন আবশ্যক। অতএব, যে বিষয় মালিকানা রহিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল তাতেও প্রত্যক্ষ দর্শন আবশ্যক হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের ব্যাপারে লেখক বলেন, মূল ওয়াকফের ব্যাপারে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে। কিন্তু ওয়াকফের বিস্তারিত বিধানাবলি ও শর্তাবলির মধ্যে শোনে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়। মূল ওয়াকফের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের উদাহরণ এই যে, লোকমুখে শোনা গেল যে, রাশেদ তার অমুক জমি মালিবাগ মাদরাসার জন্যে ওয়াকফ করেছে। তাহলে তার জন্যে এ সাক্ষ্যদান বৈধ যে, রাশেদ তার জমি মালিবাগ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেছে। পক্ষান্তরে ওয়াকফের বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু লোকজনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয় নয়, তাই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَالَ : وَمَنْ كَانَ فِى يَدِهِ شَىْءٌ سِوَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَسِعَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنَّهُ لَهُ لِاَنَّ الْيَدَ اَقْصٰى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ اِذْ هِىَ مَرْجِعُ الدَّلَالَةِ فِى الْاَسْبَابِ كُلِّهَا فَيُكْتَفٰى بِهَا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذٰلِكَ اَنْ يَقَعَ فِىْ قَلْبِهِ اَنَّهُ لَهُ قَالُوْا وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا تَفْسِيْرًا لِاِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِى الرِّوَايَةِ فَيَكُوْنُ شَرْطًا عَلَى الْاِتِّفَاقِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) دَلِيْلُ الْمِلْكِ الْيَدُ مَعَ التَّصَرُّفِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا لِاَنَّ الْيَدَ مُتَنَوِّعَةٌ اِلٰى اَمَانَةٍ وَمِلْكٍ قُلْنَا وَالتَّصَرُّفُ يَتَنَوَّعُ اَيْضًا اِلٰى نِيَابَةٍ وَاَصَالَةٍ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তির আয়ত্তে দাস এবং দাসী ছাড়া অন্য কিছু রয়েছে, [তুমি সে ব্যক্তিকে দেখলে] এমতাবস্থায় তোমার জন্যে উক্ত মাল তার মালিকানাধীন বলে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। কেননা দখল হলো মালিকানার প্রতি ইঙ্গিতকারী চূড়ান্ত দলিল। তাছাড়া মালিকানার সব উপকরণের মধ্যে দখলই হলো প্রামাণ্যতার উৎস। অতএব, দখলের অবলোকনকে যথেষ্ট মনে করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দর্শনের সাথে সাক্ষীর অন্তরে তার মালিকানার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মানো শর্ত। মাশায়েখে কেরাম বলেন, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ অন্তরের সাক্ষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মুতলাক [নিঃশর্ত] বর্ণনার ব্যাখ্যা। আর তখন এটা শর্ত হবে সকলের মতানুসারে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মালিকানার দলিল হলো যথেচ্ছা ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতাসহ দখল। এ মত অবলম্বন করেছেন আমাদের কতিপয় মাশায়েখ। কেননা দখল মালিকানা ও আমানত দুভাবেই হতে পারে। আমরা বলি, যথেচ্ছা ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতাও দুভাবে হতে পারে– মূল মালিক হিসেবে ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ كَانَ فِىْ يَدِهِ الخ : দখল সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের কথা উপরের ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত মাসআলাটির উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি অন্য একজনের দখলে দাস-দাসী ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেখল। অতঃপর তা আবার [প্রথমজন ব্যতীত] অন্য ব্যক্তির হাতে দেখল। ইতঃমধ্যে প্রথম দখলদার দ্বিতীয় দখলদারের কাছে দাবি করল যে, এ জিনিসটির মালিক আমি। এমতাবস্থায় সাক্ষীর জন্যে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্যদান করা বৈধ। কেননা মালিকানা বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে নিরূপিত হয়, আর দখল ও আয়ত্ত হলো বাহ্যিক দলিল– এছাড়া অন্যান্য দলিলও এখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া মালিকানার চূড়ান্ত পর্যায়ের দলিল হলো দখল বা আয়ত্তাধীন থাকা। কেননা মালিকানার যত উপকরণ যথা– ক্রয়, দান, সদকা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সবই মালিকানার কারণ বা হেতু। পরিণতির বিচারে মালিকানার উপর দখল বা আয়ত্তই দিকনির্দেশকারী ও দলিল। উদাহরণস্বরূপ খালেদ প্রত্যক্ষ করল যে, শাহেদ হামিদ থেকে একটি কলম ক্রয় করল। সুতরাং শাহেদ [ক্রেতা] -এর মালিকানা সেই সময় বুঝা যাবে যখন বিক্রেতার মালিকানা জানা যাবে। আর বিক্রেতার মালিকানা তার দখল দ্বারা জানা যাবে।

অর্থাৎ ক্রয় করার কারণে ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের তখনই মালিক হতে পারবে, যখন বিক্রেতা এর মালিক থাকে। আর বিক্রেতার মালিকানা তার দখল দ্বারাই প্রমাণিত হবে। এমনিভাবে হেবা [দান] নিঃসন্দেহে মালিকানার একটি কারণ হেতু, তবে হেবা-দানের দ্বারা গ্রহীতার মালিকানা তখনই প্রমাণ হবে যখন দাতা নিজে এর মালিক হবে। আর দাতার মালিকানা তার দখল দ্বারা প্রমাণ হবে। এমনিভাবে সদকা [আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে দান] একটি মালিকানার কারণ। তবে সদকা দ্বারা গ্রহীতা ও দরিদ্র ব্যক্তি তখনই মালিক হবে, যখন সদকাকারী নিজে তার মালিক থাকে। আর সদকাকারীর মালিকানা তার দখল দ্বারা প্রমাণিত হয়। এমনিভাবে উত্তরাধিকারী সম্পদে উত্তরাধিকার অবশ্যই মালিকানা লাভের একটি কারণ, তবে উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিক তখনই হবে যখন জানা যাবে মৃত ব্যক্তি এটার মালিক ছিল। আর মৃতের মালিকানা প্রমাণ হবে জীবদ্দশায় তার দখল দ্বারা। মোটকথা মালিকানার যাবতীয় উপকরণ ও কারণসমূহের পরিণতির বিচারে যেহেতু দখলই হলো বাহ্যিক দলিল, তাই শুধুমাত্র দখল দেখেই মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ। তবে সাক্ষ্যদানের সময় সে এভাবে সাক্ষ্য দেবে না যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অমুক লোক এ বস্তুটির মালিক। কেননা, আমি বস্তুটি তার দখলে দেখেছি। অর্থাৎ বিচারকের সামনে দেখার ব্যাখ্যা করবে না। কারণ, দখল [আয়ত্ত] হলো মালিকানার প্রকাশ্য দলিল। আর প্রকাশ্য দলিল সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে যথেষ্ট হলেও তা বিচারকের রায় প্রদানের জন্যে যথেষ্ট নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দখল দেখেই দখলদারের মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং এতে আরেকটি শর্ত রয়েছে। শর্তটি হলো– সাক্ষীর অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে জন্মাতে হবে যে, এ বস্তুটি যার আয়ত্তে রয়েছে তার মালিকানাধীন। এ মতের দলিল এই যে, সাক্ষীর সাক্ষ্যদান তখনই বৈধ হয়, যখন তার সাক্ষ্য দেওয়া বস্তুটি সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস হয়। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ [যখন তোমার কোনো বিষয়ে দিবালোকের ন্যায় নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তখন তুমি সাক্ষ্য প্রদান কর। অন্যথায় সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাক।] তবে যখন ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্চিত বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকে না সেখানে অন্তরের সাক্ষ্যকে নিশ্চিত বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। অর্থাৎ কমপক্ষে যেন সাক্ষীর অন্তরের সাক্ষ্য দখলদারের মালিকানার পক্ষে থাকে। কেননা দখল তার দখলদারের মালিকানার পক্ষে এজন্য দিকনির্দেশ করে যে, দখল দ্বারা দখলদারের মালিকানার পক্ষে অন্তরে ধারণা জন্মে। কিন্তু যখন সাক্ষীর অন্তরে দেখার দ্বারা মালিকানার বিশ্বাস জন্মাল না, তখন সাক্ষীর অন্তরে দখলদারের মালিকানার পক্ষে কোনো ধারণা জন্মাবে না। আর সাক্ষীর অন্তরে কোনো ধারণা না জন্মালে দখলদারের মালিকানার প্রতি দিকনির্দেশ করবে না। অতএব, এটাই প্রমাণিত হলো যে, শুধুমাত্র দখল তার দখলদারের মালিকানার প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং দখল দেখার সাথে সাথে সাক্ষীর অন্তরে মালিকানার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মাতে হবে। এ কারণেই যদি কোনো দরিদ্র কৃষকের হাতে কোনো মূল্যবান মণিমুক্তা অথবা কোনো গণ্ডমূর্খের হাতে বইপত্র দেখা যায় যার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় এ দর্শকের জন্যে দরিদ্র কৃষক ও মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে উক্ত বস্তুসমূহে তার মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। মোটকথা উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র দখল মালিকানার সাক্ষ্যদানের জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং সাক্ষীর অন্তরে দখলদারের মালিক হওয়ার পক্ষে জোরালো ধারণা জন্মানো আবশ্যক।

قَوْلُهُ قَالُوْا وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ الخ : লেখক বলেন, হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মত হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্ত মতামত হচ্ছে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মুতলাক [কয়েদমুক্ত] বর্ণনা তথা কিতাবের মূল মাসআলার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) মূল ইবারতে লিখেছেন যে, দখল হলেই মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্যদান বৈধ। হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো সাক্ষীর অন্তরে মালিকানার ধারণা জন্মালে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্যদান করা বৈধ হবে। যদি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণিত মাসআলার উদ্দেশ্য তাই হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা ইমাম

মুহাম্মদ (র.)-এর এই মুতলাক বর্ণনার তাফসীর বা ব্যাখ্যা হবে। তখন সাক্ষীর অন্তরে ধারণা জন্মানো সকলের মতেই শর্ত বলে গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত এই যে, তিনি বলেন, ঐ দখল মালিকানার জন্যে দলিল হবে যাতে দখলের সাথে সাথে যথেচ্ছা ব্যবহারের ক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ যদি দখলদার তার আয়ত্তাধীন বস্তুটিকে ব্যবহার করেন তাহলে দখল তার মালিকানার পক্ষে দলিল বলে গণ্য হবে এবং সাক্ষীর জন্যে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে। আর যদি দখলদার তার দখলকৃত-আয়ত্তাধীন বস্তুটি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে শুধুমাত্র দখল তার মালিকানার জন্যে দলিল হবে না এবং সাক্ষীর জন্যে উক্ত দখলের ভিত্তিতে মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্যদান বৈধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার উক্ত দখল আমানত হিসেবে হয়েছে− মালিকানা হিসেবে নয়। মোটকথা যখন শুধুমাত্র দখল তার দখলদারের মালিকানার পক্ষে দলিল নয়, তাহলে দখল দেখেই দখলদার এর মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে না। আর যদি দখলের সাথে সাথে দখলদার তার দখলি-আয়ত্তাধীন বস্তুকে ব্যবহার করে, তাহলে ব্যবহারসহ দখল তার মালিকানার দলিল হয়। কেননা মালিকই কেবল তার দখলি বস্তুর মধ্যে ব্যবহার ক্ষমতা রাখে− আমানতদারের সেই ক্ষমতা থাকে না। অতএব, এটাই প্রমাণ হলো যে, ব্যবহারসহ দখল মালিকানার পক্ষে দলিল− শুধুমাত্র দখল মালিকানার দলিল নয়।

قَوْلُهُ قُلْنَا وَالتَّصَرُّفُ يَتَنَوَّعُ الخ : লেখক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলেন, যদি দখলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা− মালিকানার দখল ও আমানতের দখল− তাহলে ব্যবহার ক্ষমতাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা− মালিকরূপে ব্যবহার ও মালিকের স্থলাভিষিক্ত [নায়েব] রূপে ব্যবহার। কেননা মানুষ কখনো তার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার ও খরচাদি করে, আবার কখনো অন্যের নায়েব রূপেও ব্যবহার ও খরচ করে। যেমন− উকিল ও মুযারিব তারা তাদের নিজেদের জন্যে ব্যবহার-খরচ করেন না; বরং তারা তাদের মুআক্কেল এবং বিনিয়োগকারীর জন্যে কাজ করেন। সুতরাং যদি ব্যবহার ছাড়া দখল মালিকানার দলিল বলে গণ্য না হয়; বরং আমানতের সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করা হয় এবং আমানত নয় এ কথা প্রমাণের জন্যে ব্যবহার আবশ্যক হয়, তাহলে আমাদের বর্ণিত স্থলাভিষিক্ত ও নায়েবরূপে ব্যবহারের সম্ভাবনার কারণে শুধুমাত্র ব্যবহার ও মালিকানার পক্ষে দলিল বলে গণ্য হবে না। আর যদি আপনারা বলেন, স্থলাভিষিক্তরূপে ব্যবহার করার সম্ভাবনা অগ্রাহ্য, তাহলে আমরা বলব, আমানতের সম্ভাবনা ও অগ্রাহ্য। অতএব, যখন আমানতের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য হলো, তখন শুধুমাত্র দখলই দখলদারের মালিকানার জন্যে দলিল হবে এবং শুধুমাত্র দখল দেখেই দখলদারের মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। উল্লেখ্য যে, ইমাম খাসসাফ (র.) সহ কতিপয় হানাফী আলেম ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন।

ثُمَّ الْمَسْأَلَةَ عَلٰى وُجُوْهٍ إِنْ عَايَنَ الْمَالِكَ وَالْمِلْكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ بِحُدُوْدِهِ دُوْنَ الْمَالِكِ اِسْتِحْسَانًا لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَيَحْصُلُ مَعْرِفَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْهُمَا أَوْ عَايَنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمِلْكِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ فَكَذٰلِكَ لِأَنَّ الرَّقِيْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ يَدِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا صَغِيْرَانِ لَا يُعَبِّرَانِ عَنْ نَفْسِهِمَا فَكَذٰلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَإِنْ كَانَا كَبِيْرَيْنِ فَذٰلِكَ مَصْرِفُ الْاِسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا فَيَدْفَعُ يَدَ الْغَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِيْهِمَا أَيْضًا اِعْتِبَارًا بِالثِّيَابِ وَالْفَرْقُ مَا بَيَّنَّاهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : অতঃপর মাসআলাটির কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যদি সে মালিক এবং মালিকানাধীন বস্তু উভয়কে প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। এমনিভাবে যখন মালিকানাধীন বস্তুটিকে তার সীমারেখাসহ প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু মালিককে দেখেনি, তবুও তার জন্যে ইসতিহসান হিসেবে [সাক্ষ্যদান] বৈধ। কেননা বংশ প্রমাণিত হয় শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য ও সংবাদ দ্বারা। ফলে তার পরিচয় লাভ হয়। আর যদি কোনোটিকে প্রত্যক্ষ না করে অথবা মালিককে দেখল; কিন্তু মালিকানাধীন বস্তুটি দেখল না তাহলে তার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। আর দাস-দাসীর ব্যাপার এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি জানে যে, তারা উভয়ে দাস-দাসী তবে তাতেও একই হুকুম। কেননা দাস তো তার নিজ মালিকানাধীন হতে পারে না। আর যদি তারা যে দাস-দাসী তা পরিচিত না হয়, তবে তারা এমন স্বল্প বয়সী যে নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করতে অক্ষম, তাহলেও একই হুকুম। কেননা তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। আর যদি তারা বয়স্ক হয় তবে তা আলোচ্য মাসআলার ইসতিসনার [ব্যতিক্রমের] ক্ষেত্র। কারণ, তাদের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। তাই তারা অন্যের হাতকে প্রতিহত করতে পারে। ফলে মালিকানার দলিল রহিত হয়ে গেল। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ, কাপড়-এর মাসআলার উপর যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে। এতদুভয়ের পার্থক্য তা-ই যা আমরা বর্ণনা করেছি। [তবে সব ব্যাপারেই] আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى وُجُوْهٍ الخ : লেখক বলেন, উপরিউক্ত ইবারতে যে মাসআলাটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তার চারটি অবস্থা রয়েছে– ১. সাক্ষী মালিক এবং মালিকানাধীন বস্তু উভয়টি প্রত্যক্ষ করেছে। ২. কোনোটিকে প্রত্যক্ষ করেনি। ৩. মালিকানাধীন জিনিস দেখল; কিন্তু মালিককে দেখেনি। ৪. মালিককে দেখেছে; কিন্তু মালিকানাধীন বস্তু দেখেনি। এ চারটি

অবস্থাতে কিতাবের শব্দ مِلْك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَمْلُوْك তথা মালিকানাধীন। সুতরাং প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মালিককে দেখল এভাবে যে, মালিককে সে নাম, বংশ পরিচয় ও আকার-আকৃতি দেখে চিনতে পারল এবং মালিকানাধীন বস্তুটিকেও চিনল অর্থাৎ এর সীমারেখা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ চিনতে পারল। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তুটিকে কোনো বিবাদ ছাড়াই তার আয়ত্তে দেখতে পেল। সেই সাথে তার মনে এ বিশ্বাস জন্মাল যে, দখলদার উক্ত বস্তুটির মালিক। এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শীর জন্যে এ সাক্ষ্য প্রদান বৈধ যে, এ বস্তুটি দখলদারের মালিকানাধীন এবং দখলদারই উক্ত বস্তুটির মালিক। কেননা এখানে সাক্ষী জেনেশুনে সাক্ষ্য প্রদান করছে। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, যে সাক্ষী জেনেশুনে সুনিশ্চিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অতএব, এখানেও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يُعَايِنْهُمَا الخ : দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মালিক ও মালিকানাধীনবস্তু কোনোটিকে দেখেনি; বরং সে লোকমুখে শুনেছে যে, অমুক ব্যক্তির অমুক শহরে অর্থসম্পদ রয়েছে। অথচ সাক্ষী এ ব্যক্তির মালামাল প্রত্যক্ষ করেনি এবং তার আয়ত্ত ও দখল জানতে পারেনি। তাহলে সাক্ষীর জন্যে এ সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়– "এ অর্থসম্পদ অমুকের পুত্র অমুকের মালিকানাধীন।" কেননা, এ অবস্থায় সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য অনুমান নির্ভর। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্যদানের জন্যে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দেবে তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি আবশ্যক। এখানে যেহেতু উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি পাওয়া যায়নি তাই সাক্ষ্যদানও বৈধ নয়।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, সাক্ষী মালিকানাধীন বস্তুটি দেখেছে; কিন্তু সে মালিককে দেখেনি, সে মালিকের চেহারা-আকৃতি চিনে না এবং বংশ পরিচয়ও জানে না; বরং সে তার বিষয়ে শুনে অবগত হয়ে বলে যে, অমুক সম্পত্তি যা আমি দেখেছি তা অমুকের ছেলে অমুকের মালিকানাধীন। এমতাবস্থায় যুক্তি অনুসারে সাক্ষীর পক্ষে এ মাল অমুকের ছেলে অমুকের জন্যে এ কথা বলে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। কেননা এখানে مَشْهُوْدٌ لَهُ [যে ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে] অপরিচিত। নিয়মানুসারে مَشْهُوْدٌ بِهِ [যে বস্তুর সাক্ষ্য দেওয়া হয়] অপরিচিত হলে সাক্ষ্যদান যেমন অবৈধ হয় তেমনি مَشْهُوْدٌ لَهُ অপরিচিত হলেও সাক্ষ্যদান অবৈধ হয়। তাই এ সাক্ষ্য অবৈধ। কিন্তু ইসতিহসান হিসেবে এ সাক্ষ্যদানকে বৈধ করা হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় মালিকানা প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা জানা গেছে আর মালিকের পরিচয় লোকমুখে শুনে প্রমাণিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বংশ প্রমাণের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট, এর জন্যে প্রত্যক্ষ দর্শন আবশ্যক নয়। অতএব, এখানেও পরিচিত [দর্শনের মাধ্যমে] বস্তুর সাক্ষ্য পরিচিত [শোনার মাধ্যমে] ব্যক্তির জন্যে হয়েছে। অর্থাৎ مَشْهُوْدٌ لَهُ ও مَشْهُوْدٌ بِهِ উভয়েই পরিচিত হলো। আর মালিক ও মালিকানাধীন বস্তু পরিচিত হলে সাক্ষ্যদান বৈধ বলে গণ্য হয়। এ কারণেই এ অবস্থায় সাক্ষ্যদান ইসতিহসান হিসেবে বৈধ।

চতুর্থ অবস্থা হলো, সাক্ষী মালিককে দেখেছে কিন্তু মালিকানাধীন বস্তু দেখেনি। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। কেননা মালিকানাধীন বস্তু না দেখার অর্থ হলো مَشْهُوْدٌ بِهِ-কে না দেখা। আর সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য مَشْهُوْدٌ بِهِ [মাশহুদ বিহী] সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি আবশ্যক। সুতরাং যেহেতু সাক্ষ্যদানের জন্যে মাশহুদ বিহীর অবলোকন ও পূর্ণ অবগতি আবশ্যক, আর এখানে তা পাওয়া যায় না, তাই উক্ত ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দেওয়া অবৈধ।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْعَبْدُ وَالْاَمَةُ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি কারো আয়ত্তে ক্রীতদাস / দাসীকে খেদমত করতে দেখতে পেল, তাহলে যদি সে তাদের দাসত্বের ব্যাপারেও সন্দেহমুক্ত হয় তাহলে তার জন্যে যার আয়ত্তে রয়েছে তার নিশ্চিত মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। এটা কারো হাতে কাপড় দেখে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতোই হলো। তবে এখানে শর্ত হলো, প্রত্যক্ষদর্শীর জন্যে তাদের দাস/ দাসী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত অবগতি লাভ হতে হবে। আর যদি প্রত্যক্ষদর্শী তাদের দাস/

দাসী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে না জানে তাহলে তার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি প্রত্যক্ষদর্শী তাদের দাস/ দাসী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে না জানে, তাহলে দুই অবস্থা–

১. হয়তো দাস/ দাসী এত অল্পবয়স্ক যে তারা কথা বলতে পারে না বা মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম নয়, অথবা

২. এমন বয়স্ক যারা নিজেদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রথম অবস্থা অর্থাৎ দাস/ দাসী অল্পবয়স্ক হলে তাদেরকে দখল যার হাতে রয়েছে তার মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হবে। কেননা এসব ছোট শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শী তাদেরকে যার নিয়ন্ত্রণে দেখল তার মালিকানার সাক্ষ্য দিতে পারবে, যেমনটি কোনো ব্যক্তির হাতে কাপড় দেখে তার মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। তেমনি আলোচ্য মাসআলাতে যার অধীনে অল্পবয়স্ক ক্রীতদাস/ দাসী রয়েছে তার মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। আর যদি দাস/ দাসী বোধশক্তিসম্পন্ন হয় তাহলে চাই প্রাপ্তবয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক লেখক বলেন, এ অবস্থাটিকে পূর্ববর্তী হুকুম তথা দখল দেখে মালিকানার সাক্ষ্যদান বৈধ হওয়া থেকে পৃথক করা হয়েছে। মূল কিতাবের ইবারতে سِوَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ দ্বারা এ অবস্থাটিকেই ইসতিছনা করা হয়েছে।

এ অবস্থাটিতে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থায় ক্রীতদাস ও দাসীদ্বয়ের স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। তাইতো যদি বয়স্ক ক্রীতদাস জন্মগতভাবে স্বাধীন বলে দাবি করে, তাহলে তার উক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর অন্যের দখল প্রমাণিত হবে না। মোটকথা, যখন তাদের স্বীয় নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে রয়েছে, তাই এটা তাদের উপর অন্যের দখলকে হটিয়ে দেবে। যখন অন্যের দখল রইল না, তখন মালিকানার দলিল তথা দখল তিরোহিত হলো। আর মালিকানার দলিল তিরোহিত হলে প্রত্যক্ষদর্শীর জন্যে দখলদারের পক্ষে মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ হয় না। এ মাসআলাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর একটি বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, ক্রীতদাস ও দাসী বড় তথা বোধ-জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দখলদারের পক্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বৈধ বলে গণ্য হবে। তাঁর এ মতটির দলিল হলো, এ অবস্থাকে তিনি কাপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্রের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ কাপড় ইত্যাদির মধ্যে যেমন দখল দেখেই মালিকানা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ ঠিক এখানেও দখল দেখেই সাক্ষ্যদান বৈধ। যদিও ক্রীতদাস/দাসী বয়স্ক ও বড়, যারা তাদের মনের ভাবকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) থেকেও। তাহলে তো তিন ইমামের মতে সব অবস্থায় দখলই মালিকানার দলিল হলো। উদাহরণস্বরূপ যদি হামিদ কারো দখলে একটি ক্রীতদাস দেখে বলল, আমি এ ক্রীতদাসের মালিক। অন্যদিকে যার দখলে ক্রীতদাসটি রয়েছে সেও বলল, আমিই ক্রীতদাসের মালিক, তাহলে দখল যার, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অপরজনের দাবি উপেক্ষিত হবে। কেননা দখলের কারণে বাহ্যিক অবস্থা দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সমর্থন করছে। লেখক বলেন, এ অবস্থাটিকে অন্যান্য অবস্থার সাথে মিলানো ঠিক নয়। কারণ, এ অবস্থার সাথে অন্যান্য অবস্থার পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি আমরা পিছনের ইবারতে উল্লেখ করেছি। তা এই যে, কাপড়, অল্পবয়স্ক বাচ্চা ইত্যাদির মধ্যে নিজ কোনো অধিকার-নিয়ন্ত্রণ কোনো কিছুই নেই। তার এগুলোর উপর দখল ও আয়ত্তকারীর আয়ত্ত প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে বোধশক্তিসম্পন্ন ক্রীতদাস/ দাসীর যেহেতু আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে, তাই তাদের উপর দখলদারের দখল প্রমাণিত হবে না। কাপড় ইত্যাদির মধ্যে দখলদারের দখল গ্রহণযোগ্য, বিধায় এতে দখল মালিকানার জন্যে দলিল। আর বোধশক্তিসম্পন্ন দাস/ দাসীর মধ্যে যেহেতু দখল গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এতে দখলদারের জন্যে বাহ্যিক দলিল হবে না। সব ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

بَابُ مَنْ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ

পরিচ্ছেদ : কাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর কাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

ভূমিকা : পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য শোনা হবে এবং যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য শোনা হবে না তার আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে কাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, আর কাদের গ্রহণযোগ্য নয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

যেসব বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় অথবা গ্রহণ করা হয় না– সেসব বিষয় হলো সাক্ষ্যদানের মহল বা ক্ষেত্র। মহল বা ক্ষেত্র শর্তের পর্যায়ভুক্ত। শর্ত তার مَشْرُوطٌ [যার জন্যে শর্ত করা হয়েছে] -এর আগে আসে। তাই শর্তের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে, তারপর মাশরুতের আলোচনা করা হয়েছে। ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার ভাষ্যমতে, সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্য হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে অপবাদ। এ প্রসেঙ্গে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন– لَا شَهَادَةَ لِمُتَّهَمٍ
যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলিল : সাক্ষ্যদান হলো একটি সংবাদ, যা সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। তবে শরিয়ত অনুসারে সাক্ষ্য তখনই দলিল হবে যখন এতে সত্যের সম্ভাবনা প্রবল হয়। তুহমত-অপবাদের উপস্থিতিতে সত্যের দিক প্রবল হয় না, তাই অপবাদ থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য শরিয়তের দলিল বলে গণ্য হয় না। আর যখন তা অপবাদের উপস্থিতিতে শরিয়তের দলিল নয় তখন তা অগ্রাহ্য হবে। অতএব, প্রমাণ হলো যে, অপবাদের কারণে শরিয়তের সাক্ষ্য প্রদান অগ্রাহ্য হবে। তুহমত-অপবাদ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। কখনো তা এমন কারণে হতে পারে যা সাক্ষীর মধ্যে বিদ্যমান, যেমন ফিসক বা পাপাচারিতা। কেননা যে ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়া শরিয়ত নিষিদ্ধ অন্যান্য কাজ থেকে বাঁচতে পারে না– সে মিথ্যা থেকেও বাঁচতে সক্ষম হবে না। আর যেহেতু তার মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে তাই যে مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ অর্থাৎ মিথ্যাবাদিতায় অভিযুক্ত। কখনো তুহমত-অপবাদ এমন কারণে হয়ে থাকে যে কারণটি مَشْهُوْدٌ لَهُ [যার জন্য সাক্ষ্যদান করা হয়] -এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক। অর্থাৎ সাক্ষী এবং যার জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া হলো তাদের মাঝে জন্মসূত্রে আত্মীয়তা রয়েছে। এমতাবস্থায় সাক্ষী এ কথার সাথে অপবাদযুক্ত হবে যে, সাক্ষী আত্মীয়তার কারণে তার আত্মীয় এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন ব্যক্তির বিপক্ষে, যে তার অনাত্মীয়।

কখনো তুহমত-অপবাদ এমন ত্রুটির কারণে ঘটে যে ত্রুটি বাদী ও বিবাদীকে আলাদাভাবে না চেনার কারণে ঘটে। যেমন– সাক্ষী অন্ধ। অতএব, উক্ত কারণে সে বাদী ও বিবাদীকে পৃথক ও আলাদাভাবে চিনতে অক্ষম হয়।

কখনো তুহমত [অপবাদ] শরিয়ত যাকে সততার দলিল বা মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে তার অনুপস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। যেমন– অপবাদ দেওয়ার কারণে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এ সাজা পাওয়ার কারণে সে সৎ ব্যক্তিদের কাতারে গণ্য হয় না।

قَالَ : وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَعْمٰى وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) تَقْبَلُ فِيْمَا يَجْرِىْ فِيْهِ التَّسَامُعُ لِاَنَّ الْحَاجَةَ فِيْهِ اِلَى السَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيْهِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يَجُوْزُ اِذَا كَانَ بَصِيْرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُوْلِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ وَالْاَدَاءُ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُؤَفٍ وَالتَّعْرِيْفُ يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَنَا اَنَّ الْاَدَاءَ يَفْتَقِرُ اِلَى التَّمْيِيْزِ بِالْاِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُوْدِ لَهُ وَالْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ وَلَا يُمَيِّزُ الْاَعْمٰى اِلَّا بِالنَّغْمَةِ وَفِيْهِ شُبْهَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُوْدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি মত এরূপ বর্ণিত আছে যে, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য] ঐসব বিষয়ে গ্রহণীয় যাতে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া গ্রহণীয়। কেননা, এতে শ্রবণ করা প্রয়োজন, আর শ্রবণের ক্ষেত্রে তার মধ্যে ক্রটি নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [অন্ধের সাক্ষ্যদান] জায়েজ, যদি সাক্ষ্য ধারণের সময় সে দৃষ্টিমান থাকে। কেননা, তার দেখার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়েছে। সাক্ষ্য প্রদানে শুধুমাত্র মুখের ব্যবহার হয়। আর তার মুখ ক্রটিযুক্ত নয়। আর যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে তার পরিচয় বংশ বর্ণনা করার দ্বারা অর্জিত হয়। যেমনটি মৃত ব্যক্তির উপর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে হয়। আমাদের দলিল হলো, সাক্ষ্য প্রদানে মাশহূদ লাহু [যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়] ও মাশহূদ আলাইহি [যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়] -কে ইশারা করে চিহ্নিত করা আবশ্যক হয়। অন্ধ ব্যক্তি শব্দ না শুনে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে না। আর এতে এক প্রকার সন্দেহ বিদ্যমান। অন্যান্য [দৃষ্টিমান] সাক্ষী দ্বারা এর থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَعْمٰى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ও পক্ষে বিপক্ষের যুক্তিতর্ক তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এখানে মতবিরোধ এই মর্মে যে, অন্ধজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা ? এর উত্তর হলো যদি তাদের সাক্ষ্য হুদূদ ও কিসাসের ব্যাপারে হয় তাহলে সবার ঐকমত্যে তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। আর যদি হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে হয়, তাহলে দু-অবস্থা– ১. হয়তো এমন সব বিষয়ে তারা সাক্ষী হবে, যাতে সাধারণ লোকদের জন্যে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান বৈধ, যেমন– বংশপ্রমাণ ও মৃত্যু ইত্যাদির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া, অথবা ২. এমন সব ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যাতে না দেখে সাক্ষ্য দেওয়া কোনোভাবেই বৈধ নয় এবং শোনার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। যেমন– ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

প্রথম অবস্থা তথা যেসব বিষয়ে শ্রবণ করে সাক্ষ্য দেওয়া যায়- তাতে যদি অন্ধ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম যুফার (র.) -এর মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইবনে শুজা' (র.)-এর বর্ণনা মতে এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও অভিমত। দ্বিতীয়

অবস্থা তথা যদি এমন সব বিষয়ে অন্ধ সাক্ষ্য দেয়, যাতে না দেখে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ নয়। এমতাবস্থায় যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য ধারণের সময় দৃষ্টিমান থাকে এবং সাক্ষ্য প্রদানের সময় দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, আর যে বস্তুর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাও স্থাবর হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ অবস্থাতে এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে। আর যদি সাক্ষী সাক্ষ্য ধারণের সময় অন্ধ হয়ে থাকে কিংবা যে বস্তুর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তা অস্থাবর- এমতাবস্থায় ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সাক্ষ্য ধারণের সময় দৃষ্টিশক্তি থাকা শর্ত, আর ইমামদ্বয়ের মতে সাক্ষ্য ধারণের সময় থেকে শুরু করে বিচারকের রায় প্রদান করা পর্যন্ত সাক্ষীর দৃষ্টিমান থাকা শর্ত। অতএব, ইমামদ্বয়ের মতে, সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় প্রদানের পূর্বেই যদি সাক্ষী দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, তাহলে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় প্রদান সঠিক হবে না। উল্লিখিত মাসআলাতে মাযহাবগুলোর সারসংক্ষেপ এই যে, হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে কারো মতেই অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হুদূদ ও কিসাস ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্ধের সাক্ষ্য সাধারণভাবে অগ্রহণযোগ্য। সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টিতে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ হোক অথবা বৈধ না হোক– যাই হোক না কেন। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে অন্ধব্যক্তির সাক্ষ্য সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় বৈধ। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, যেসব বিষয়ে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া গ্রহণযোগ্য তাতে অন্ধের সাক্ষ্য প্রদান বৈধ। ইমাম যুফার (র.)-এর অনুরূপ একটি মত ইবনে শুজা' (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত আছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অন্ধের সাক্ষ্য দুটি শর্তের সাথে বৈধ। শর্ত দুটি হলো–

১. জন্মান্ধ না হওয়া ও ঘটনার সময় দৃষ্টিশক্তি থাকার পর দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়া।

২. দর্শনীয় ও দেখা বস্তুটি স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য হওয়া। হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণীয় না হওয়ার কারণ হলো অন্ধের সাক্ষ্যতে সন্দেহের উপস্থিতি, আর হুদূদ ও কিসাস সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। সন্দেহের উপস্থিতির ব্যাখ্যা এই যে, অন্ধের কাছে শব্দ শ্রবণ দেখার স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ অন্যদের যেসব বিষয়ে দেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় অন্ধদের সেসব বিষয়ে শব্দ শ্রবণের দ্বারা জ্ঞানার্জন হয়। অতএব, অন্ধ ব্যক্তির জন্যে শ্রবণ ও শব্দ প্রত্যক্ষদর্শনেরও স্থলাভিষিক্ত হলো। আর এটা সর্বসম্মত মত যে, মূল বিষয়ের চেয়ে স্থলাভিষিক্তের মাঝে এক ধরনের সন্দেহ থাকে। তাছাড়া শব্দ শুনে চিহ্নিতকরণের মাঝে ভুলের সম্ভাবনা থাকে প্রবল, কারণ একজনের গলার স্বর কখনো অন্যের সাথে মিলে যায়। যেহেতু সন্দেহের কারণে হুদূদ ও কিসাস বাতিল হয়ে যায়, তাই অন্ধের সাক্ষ্য হুদূদ ও কিসাসের ব্যাপারে অগ্রাহ্য।

ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিল এই যে, সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হওয়ার জন্যে সাক্ষীর ওলায়াত [বিশেষ ক্ষমতা] ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা শর্ত। অন্ধ ব্যক্তির মাঝে ওলায়াত ও ন্যায়পরায়ণতার মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। এ কারণেই অন্ধ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা হয়। মোটকথা, সাক্ষীর দুটি যোগ্যতাই [ওলায়াত এবং ন্যায়পরায়ণতা] অন্ধ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান হওয়াতে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই যে, যেসব বিষয়ের মাঝে লোকমুখে শ্রবণের ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান বৈধ, তাতে সাক্ষ্য ধারণের জন্যে শুধুমাত্র শ্রবণ করা জরুরি। আর অন্ধের শ্রবণশক্তিতে কোনো সমস্যা নেই; বরং তার শ্রবণেন্দ্রিয় সুস্থ মানুষের মতোই তৎপর; বরং বেশি শক্তিশালী। সুতরাং যখন এসব বিষয়ের মধ্যে শুধুমাত্র শ্রবণই প্রয়োজন আর অন্ধের শোনা এর মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। তাই এ সব বিষয়ে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)

-এর দলিল এই যে, অন্ধ ব্যক্তি যখন সাক্ষ্য ধারণের সময় দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল, তাই তার দর্শনের মাধ্যমেই জ্ঞান ও অবগতি লাভ হয়েছে।

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য ধারণের সময় দর্শনের মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের বিষয়টির জ্ঞান লাভ করল, তার সাক্ষ্য ধারণ সঠিক হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি বর্তমানে অন্ধ; কিন্তু সাক্ষ্য ধারণের সময় দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল, তার সাক্ষ্য ধারণ সঠিক হয়েছে। আর সাক্ষ্য প্রদান শুধুমাত্র মুখের ও কথার সাহায্যে হয়। যেহেতু অন্ধ ব্যক্তির মুখের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, তাই তার কথার মধ্যেও কোনো ত্রুটি থাকবে না। অতএব, অন্ধের সাক্ষ্য প্রদানও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। মোটকথা, উপরিউক্ত অন্ধের সাক্ষ্য ধারণ ও সাক্ষ্য প্রদান উভয়ই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং সাক্ষ্য প্রদানের প্রতিবন্ধকতা তথা বিবাদীকে না চেনার সমস্যাও তার রইল না। কেননা অন্ধের সামনে বিবাদীর বংশলতিকা বর্ণনা করার দ্বারা সে তাকে চিনে ফেলবে। অর্থাৎ যদি অন্ধ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি অমুকের জন্যে অমুকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান কর। তখন অন্ধের সামনে তার বংশ বর্ণনা করার দ্বারা অন্ধ ব্যক্তি বিবাদীকে চিনতে পারবে। এক্ষেত্রে তার জন্যে হাতের ইশারা করে চিনানোর প্রয়োজন পড়বে না– যেমন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মৃত ব্যক্তির পাওনাদাররা পাওনা দাবি করল এবং তাদের দাবি প্রমাণে সাক্ষী উপস্থিত করল। এমতাবস্থায় সাক্ষীদের পক্ষে মৃত ব্যক্তি [বিবাদী]-কে চিহ্নিত করার জন্যে ইশারা করা সম্ভব নয়। ফলে সে সাক্ষ্য প্রদান করবে এই বলে যে, বাদী অমুকের পুত্র অমুক [মৃত]-এর কাছে এত টাকা পাওনা। এর দ্বারা সাক্ষীর বিবাদী চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের মধ্যে যেমন বংশ বর্ণনা দ্বারা বিবাদী চিহ্নিত হয়ে যায়, তেমনি অন্ধের সাক্ষ্যদানের মধ্যেও বংশ বর্ণনার দ্বারা বিবাদী চিহ্নিত হয়ে যাবে। মোটকথা, যখন উল্লিখিত অন্ধের সাক্ষ্য ধারণ ও সাক্ষ্য প্রদান উভয়ই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং সাক্ষ্য প্রদানের প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়ে গেল, তখন উক্ত অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো বাধা থাকল না।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ الْاَدَاءَ يَفْتَقِرُ اِلَى التَّمْيِيْزِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, সাক্ষ্য প্রদানের অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় হলো সাক্ষী বাদী ও বিবাদীকে ইশারার মাধ্যমে চিহ্নিত করবে। অন্ধ ব্যক্তি শব্দ ও গলার স্বর শুনে বাদী-বিবাদীকে চিহ্নিত করতে পারে; কিন্তু ইশারার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না। আমরা সাধারণভাবে দেখি একজনের গলার স্বর অন্যজনের সাথে কখনো কখনো মিলে যায়, তাই কথা ও শব্দ শুনে চিহ্নিত করার মাঝে এক ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে যায়। অন্যদিকে দৃষ্টিসম্পন্ন সাক্ষীদের দ্বারা এ অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা পাওয়াও সম্ভব। এভাবে যে, দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক সাক্ষী রয়েছে, যারা বাদী ও বিবাদীকে ইশারার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। অতএব, যখন চক্ষুষ্মান সাক্ষী বিদ্যমান, আর অন্ধ ব্যক্তি যে বাদী ও বিবাদীকে ইশারা করে চিহ্নিত করতে পারে না; তখন অন্ধ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানো মোটেও সমীচীন নয়।

وَالنِّسْبَةُ لِتَعْرِيْفِ الْغَائِبِ دُوْنَ الْحَاضِرِ فَصَارَ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ عَمِىَ بَعْدَ الْاَدَاءِ يَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) فَاِنَّ قِيَامَ الْاَهْلِيَّةِ لِلشَّهَادَةِ شَرْطٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُوْرَتِهَا حُجَّةً عِنْدَهُ وَقَدْ بَطَلَتْ وَصَارَ كَمَا اِذَا خَرِسَ اَوْ جُنَّ اَوْ فَسَقَ بِخِلَافِ مَا اِذَا مَاتُوْا اَوْ غَابُوْا لِاَنَّ الْاَهْلِيَّةَ بِالْمَوْتِ قَدْ انْتَهَتْ وَبِالْغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ ـ

অনুবাদ : অংশ বর্ণনা করা হয় অনুপস্থিত সাক্ষীদের জন্যে– উপস্থিত সাক্ষীদের জন্য নয়। ফলে এটা হুদূদ ও কিসাসের মতো হয়ে গেল। যদি সে অন্ধ হয় সাক্ষ্যদানের পর [বিচারের রায় প্রদানের পূর্বে], তাহলে তার অন্ধত্ব ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে রায় প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করবে। কেননা সাক্ষ্যের জন্যে বিচারকের রায় প্রদান পর্যন্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কেননা এটা তার রায় প্রদানের সময় তার কাছে দলিল গণ্য হিসেবে হয়ে থাকে। অথচ তা [এখানে] বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফলে এটা এমন হলো যেন সাক্ষী মূক অথবা উন্মাদ অথবা ফাসিক হয়ে গেল [রায় প্রদানের পূর্বে। এসব ক্ষেত্রে যেমন রায় প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়, তেমনি এখানেও তা বাধাগ্রস্ত হবে।] তবে এর ব্যতিক্রম হলো, যখন সাক্ষীরা মৃত্যুবরণ করে অথবা অনুপস্থিত থাকে। কেননা মৃত্যুর দ্বারা সাক্ষ্যদান পূর্ণতা পেয়েছে আর অনুপস্থিতির দ্বারা তা বাতিল হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنِّسْبَةُ لِتَعْرِيْفِ الْغَائِبِ دُوْنَ الْحَاضِرِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা লেখক ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছিলেন, অন্ধব্যক্তির সামনে বাদী ও বিবাদীর বংশ বর্ণনা করা হলেই তো অন্ধ তাদের চিহ্নিত করতে পারবে। অর্থাৎ অন্ধ সাক্ষী বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করার জন্য শুধুমাত্র কথা শুনবে না; বরং কথা শোনার পর তাদের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বংশ সম্পর্কে বর্ণনা ও তাদের কথা শুনে নিশ্চিতভাবে সে তাদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। সুতরাং যখন অন্ধ সাক্ষী বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করতে সক্ষম, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

এর উত্তর হলো, বংশ বর্ণনার সাহায্যে কাউকে পরিচিত করার প্রক্রিয়া অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এটা বিচারকের এজলাসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের আলোচিত মাসআলা উপস্থিত লোকদের সম্পর্কে, তাই বংশ বর্ণনার প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর যখন বংশ বর্ণনার প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তখন অন্ধ ব্যক্তি বাদী ও বিবাদীর মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না। তার এ অক্ষমতার কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করা আবশ্যক। অতএব, উল্লিখিত বিষয়গুলো হুদূদ ও কিসাসের মতো হয়ে গেল। সুতরাং হুদূদ ও কিসাসের মধ্যে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, তেমনি এসব মাসআলাতেও অন্ধজনের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ عَمِىَ بَعْدَ الْاَدَاءِ يَمْتَنِعُ الخ : লেখক বলেন, সাক্ষী যদি সাক্ষ্য প্রদান করার সময় দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে; কিন্তু বিচারকের রায় প্রদানের আগেই অন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় প্রদান সঠিক নয়। অন্যপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায়

প্রদান সঠিক। এ ব্যাপারে ইমামদ্বয়ের মূলনীতি হলো, সাক্ষ্য ধারণের পর যে বিষয় সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হয় তা সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় প্রদানের জন্যেও প্রতিবন্ধক। সুতরাং সাক্ষ্য ধারণের পর অন্ধ হয়ে গেলে যেমন ইমামদ্বয়ের মতানুসারে সাক্ষ্য প্রদান করা যায় না, তেমনি তাদের মতে সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় প্রদানের আগে অন্ধ হয়ে গেলে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা যায় না। অন্যদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সাক্ষ্য ধারণের পর অন্ধ হয়ে যাওয়া যেমন সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে ক্ষতিকর কিংবা প্রতিবন্ধক নয়, তেমনি সাক্ষ্য প্রদানের পর রায় প্রকাশের আগে অন্ধ হয়ে গেলেও এর দ্বারা রায় প্রকাশে কোনো সমস্যা হয় না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, তিনি এ অবস্থায় অন্ধ হওয়াকে সাক্ষীর পলায়ন ও মৃত্যুর উপর কিয়াস করেছেন। তিনি বলেন, যেমনিভাবে সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগে সাক্ষী অদৃশ্য হয়ে গেলে কিংবা মারা গেলে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা জায়েজ, তেমনিভাবে অন্ধ হয়ে গেলেও বিচারকের রায় প্রদান করা যথার্থ হবে।

তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বিচারকের রায় প্রদানের সময় সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কেননা সাক্ষ্য প্রদান রায় প্রদানের সময় দলিল হিসেবে গণ্য হয়। যেহেতু রায় প্রদানের সময় অন্ধ সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকে না, তাই তা দলিল হতে পারে না। এমতাবস্থায় অন্ধের সাক্ষ্য দলিল বলে গণ্য না হওয়াতে এর ভিত্তিতে রায় প্রদানও সঠিক হয় না বা বিচারক রায় প্রদানের অনুমতি পাচ্ছেন না। কেননা বিচারক দলিল ছাড়া রায় প্রদান করতে পারেন না। এর উদাহরণ এমন যে, সাক্ষ্য প্রদানের পর সাক্ষী উন্মাদ হয়ে গেল অথবা বোবা হয়ে গেল অথবা ফাসিক হয়ে গেল। এ অবস্থাগুলোতে সাক্ষ্য প্রদানের পর সাক্ষীর যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকাতে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান বিচারকের জন্যে বৈধ নয়। তেমনি সাক্ষী অন্ধ হয়ে গেলেও বিচারকের জন্যে রায় প্রদান করা সঠিক হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا مَاتُوْا اَوْ غَابُوْا الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উত্তরের সারকথা এই যে, সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় প্রদানের আগে যদি সাক্ষী মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যুর কারণে তার যোগ্যতা বাতিল হয় না; বরং মৃত্যুর কারণে তার যোগ্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কোনো বিষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে তা প্রমাণিত হয়– রহিত হয় না। মোটকথা, যেহেতু মৃত্যুর কারণে যোগ্যতা রহিত হয় না; বরং প্রমাণিত হয়, তাই বিচারক তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারবেন। এমনিভাবে সাক্ষ্য প্রদানের পর সাক্ষী অনুপস্থিত থাকলে যেহেতু তার যোগ্যতা রহিত হয় না, তাই সাক্ষীরা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারবে। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারকের রায় ঘোষণার আগে যদি সাক্ষী অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অন্ধ হওয়ার কারণে তার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। যেহেতু অন্ধ হওয়ার দ্বারা যোগ্যতা রহিত হয়ে যায় তাই বিচারক তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে পারবেন না। কারণ, রায় ঘোষণা করা পর্যন্ত সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা থাকা শর্ত। উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় শায়েখ সদরুশ শরীয়াহ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

قَالَ : وَلَا الْمَمْلُوكَ لِاَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَا يَلِىْ نَفْسَه فَاَوْلٰى اَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلٰى غَيْرِه ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা সাক্ষ্য প্রদান ওলায়াতের অন্তর্ভুক্ত। সে তো তাঁর নিজেরই ওলী নয়। অতএব, অন্যের উপর তার ওলায়াত [ক্ষমতা প্রয়োগ] তো কোনোভাবেই সাব্যস্ত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا الْمَمْلُوكَ الخ : উল্লিখিত ইবারতে যাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য তাদের দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অন্ধের মতো ক্রীতদাসের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যদি কোনো ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করতে পারবে না। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য স্বাধীন ও পরাধীন ক্রীতদাস উভয়ের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য। সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে এ মতটি বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া উসমান বাত্তী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ও দাউদ জাহেরী এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা.) থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, দাস/ দাসীর সাক্ষ্য অন্য দাস/ দাসীর বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তাদের সাক্ষ্য কোনো স্বাধীন নাগরিকের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করা এবং ওলায়াতের অধিকারী হওয়াও শর্ত। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ ক্রীতদাস বাদী ও বিবাদীকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ওলায়াতের অধিকারী না হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা তো কোনো মৌলিক সমস্যা নয়। এটা তার মনিবের অধিকারের কারণে তার উপর আরোপিত হয় না। এটা তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি, অথবা সাক্ষ্য ধারণ কিংবা সাক্ষ্য সংরক্ষণে তার কোনো দুর্বলতার কারণে হয়নি। সুতরাং যদি ক্রীতদাস ন্যায়পরায়ণ হয় এবং বাদী ও বিবাদীকে ইশারার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া ক্রীতদাসের সাক্ষ্য যে অগ্রহণযোগ্য– এ ব্যাপারে ইজমা হয়নি। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস (র.) বলেন, ন্যায়পরায়ণ হলে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। কাজি শুরাইহ (র.) ও হযরত যুরারাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে সীরীন (র.) বলেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য নিজ মনিব ছাড়া অন্যের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। হযরত হাসান বসরী ও হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)ও ক্রীতদাসের সাক্ষ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমাদের দলিল হলো, সাক্ষ্য প্রদান ওলায়াত [কর্তৃত্ব] -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ওলায়াতের মধ্যে যেমন– تَنْفِيْذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ [অন্যের উপর নিজের কর্তৃত্ব ও কথাকে বাস্তবায়ন করা] হয়ে থাকে, তেমনি সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যেও تَنْفِيْذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ হয়ে থাকে। সুতরাং যেহেতু ওলায়াত এবং শাহাদাত সমগোত্রীয়, সেহেতু সাক্ষী সে ব্যক্তিই হতে পারবে যার ওলায়াত রয়েছে। ক্রীতদাসের নিজের উপর নিজ কর্তৃত্ব [ওলায়াত] নেই। অতএব, অন্যের উপর তার কর্তৃত্বের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যখন ক্রীতদাসের কর্তৃত্ব নেই, তাই তার সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার লাভ হবে না। আমাদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তিতে। তিনি বলেন, لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ 'ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'

মাসআলা : শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা চার ইমামেরও সব আলেমের অভিমত। কেননা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিপক্কতা হয়নি, ফলে তারা বাদী ও বিবাদীকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়।

পুনশ্চ : যদি কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের পক্ষে সাক্ষ্য ধারণ করে; কিন্তু সে সাক্ষ্য প্রদান করল না ইতোমধ্যে তার মনিব তাকে মুক্ত করে দিল, অতঃপর সে সাক্ষ্য প্রদান করলে তার সাক্ষ্য মনিবের পক্ষে গ্রাহ্য হবে। যেমন– কোনো শিশু সাক্ষ্য ধারণ করল বালেগ হওয়ার আগে, তারপর সে বালেগ হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদান করল। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে কোনো জিম্মি [মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক] যদি অমুসলমান থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য ধারণ করে, তারপর মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

وَلَا الْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ وَاِنْ تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَلِاَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِكَوْنِهِ مَانِعًا فَيَبْقٰى بَعْدَ التَّوْبَةِ كَاَصْلِهِ بِخِلَافِ الْمَحْدُوْدِ فِىْ غَيْرِ الْقَذْفِ لِاَنَّ الرَّدَّ لِلْفِسْقِ وَقَدْ اِرْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) تُقْبَلُ اِذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا اِسْتَثْنٰى التَّائِبَ قُلْنَا اَلْاِسْتِثْنَاءُ يَنْصَرِفُ اِلٰى مَا يَلِيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اَوْ هُوَ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنٰى لٰكِنْ وَلَوْ حُدَّ الْكَافِرُ فِىْ قَذْفٍ ثُمَّ اَسْلَمَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِاَنَّ لِلْكَافِرِ شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَبِالْاِسْلَامِ حَدَثَتْ لَهُ شَهَادَةٌ اُخْرٰى بِخِلَافِ الْعَبْدِ اِذَا حُدَّ ثُمَّ اُعْتِقَ لِاَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا فَتَمَامُ حَدِّهِ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ـ

অনুবাদ : এবং অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও সে তওবা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না।' এছাড়া এটা [সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া] হদ [সাজা]-এরই অংশ। কারণ এটা [সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া] অপবাদ দানকে প্রতিরোধকারী। সুতরাং মূল হদ যেমন [তওবার পর] বহাল থাকে এটাও তওবার পর বহাল থাকবে। তবে অপবাদ ছাড়া অন্যান্য হদের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার ব্যতিক্রম। কেননা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয় ফিসক-এর কারণে। আর তা তওবার দ্বারা দূর হয়ে গেছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির] সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে যখন সে তওবা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তবে যারা তওবা করে।" আল্লাহ তওবাকারীকে আলাদা করেছেন। আমরা বলি, ইসতিছনার সম্পর্ক তার নিকটবর্তী বাক্যের সাথে। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী– فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ [আর এরাই হলো ফাসিক।] অথবা এটা মুসতাছনা মুনকাতি' যা لٰكِنْ -এর অর্থে। অবশ্য যদি কোনো কাফেরকে অপবাদ আরোপের অপরাধে হদ [সাজা] দেওয়া হয় তারপর সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা কাফেরের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রয়েছে, ফলে তা [শাস্তি পাওয়ার কারণে] অগ্রাহ্য হওয়া তার শাস্তিরই অংশ। মুসলমান হওয়ার দ্বারা তার স্বতন্ত্র সাক্ষ্যদানের অধিকার অর্জিত হয়েছে। ক্রীতদাস এর ব্যতিক্রম। যদি তাকে হদ দেওয়া হয় তারপর দাসমুক্ত করা হয় [তবুও সাক্ষ্যদানের অধিকার ফিরে পাবে না।] কেননা ক্রীতদাসের আদতে সাক্ষ্যদানে কোনো অধিকার নেই। ফলে মুক্ত হওয়ার পর সাক্ষ্যদানের অধিকার বঞ্চিত হওয়া তার শাস্তির পূর্ণাঙ্গতার অংশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا الْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে সাক্ষ্যদানের অধিকার বঞ্চিত তৃতীয় প্রকার বা তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اَلْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ -এর অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি যে কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে; কিন্তু তা শরিয়তসম্মতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর উক্ত অপবাদ-কলঙ্ক আরোপ করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অপবাদ আরোপ করার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও সে তওবা করে শুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়। তার সাক্ষ্য আমৃত্যু প্রত্যাখ্যাত হওয়া তার শাস্তিরই অংশ। এটা হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত।

অন্যপক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত এই যে, উক্ত ব্যক্তি তওবা করলে তার সাক্ষ্য পুনর্বার গ্রহণযোগ্য হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে বলেছেন– وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا উক্ত আয়াতে اَبَدًا শব্দটি চিরস্থায়ী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সুস্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীনভাবে। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো অপবাদ দানের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন। যেহেতু অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির তওবার পর সাক্ষ্য গ্রহণ করা আয়াতের নির্দেশের লঙ্ঘন, তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের দ্বারা আরেকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ হয়। তা এই যে, আয়াতের لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ অংশে هُمْ-এর مَرْجِعْ হলো মাহদূদ ফিল কাযফ [অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।] অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার হুকুম মাহদূদ ফিল কাযফ সম্পর্কে। তওবা করা সত্ত্বেও উক্ত সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাহদূদ ফিল কাযফ -এর খোলস থেকে বাইরে আসতে পারছে না। সুতরাং যখন মাহদূদ ফিল কাযফ তওবা করা সত্ত্বেও মাহদূদ ফিল কাযফ-এর খোলস থেকে বের হতে পারছে না; বরং মাহদূদ ফিল কাযফ রয়ে যাচ্ছে, আর মাহদূদ ফিল কাযফ এর জন্যে সাক্ষ্য স্থায়ীভাবে অগ্রাহ্য হওয়ার হুকুম। তাই তওবার পরও মাহদূদ ফিল কাযফ -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মাহদূদ ফিল কাযফ -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া তার পূর্ণাঙ্গ শাস্তির একটা অংশ। অর্থাৎ তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করার দ্বারা তার শাস্তিকে পূর্ণতা দান করা হয়। এ কারণে তওবার পর যেমন মূল হদ বা শাস্তি বহাল থাকে এবং তওবার কারণে রহিত হয় না, তেমনি শাস্তির অংশ তথা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবার পরও বহাল থাকবে– রহিত হবে না।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে কিভাবে শাস্তির অংশ নির্ধারণ করা হলো?

উত্তর : এর উত্তর হলো, অপবাদের শাস্তি যেমনিভাবে অপবাদ দানকারীকে ভবিষ্যতে এমন করা থেকে বিরত রাখবে তেমনি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান -এর কঠোরতা অপবাদ দানকারীকে ভবিষ্যতে এমন কাজ থেকে বিরত রাখবে। শাস্তির দুটি অংশের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, বেত্রাঘাতের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় আর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার দ্বারা মন ও হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তা ব্যথিত ও অপমানিত হয়। তাছাড়া শাস্তির মধ্যে এটাও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, অপবাদ দানকারী তার মুখের সাহায্যে অপবাদ দিয়ে আরোপিত ব্যক্তির অন্তরে আঘাত করেছে, তাই তার মুখের শাস্তিস্বরূপ তার সাক্ষ্য চিরকালের জন্যে অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। মাহদূদ ফিল কাযফ ছাড়া অন্যান্য অপরাধী-ফাসিক যথা– ব্যভিচারী, চোর ও মদ্যপ এর সাক্ষ্য তওবার পর গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্যদের সাক্ষ্য তাদের ফিসক-এর কারণে অগ্রাহ্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–"যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা অনুসন্ধান কর [নির্দ্বিধায় গ্রহণ করো না] আয়াতের অর্থ এই যে, ফাসিকের দেওয়া সংবাদ সহসাই গ্রহণ করো না; বরং এর ব্যাপারে তত্ত্ব-অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হয়ে তা বিশ্বাস কর। আর ফাসিকের ফিসক তওবা -এর দ্বারা দূরীভূত হয়। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ [যে পাপ-গুনাহ করার পর তওবা করল তার যেন কোনো পাপই ছিল না।] মোটকথা, আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রতীয়মান হলো যে, ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয় ফিসকের কারণে, আর তওবা করলে ফিসক অপসৃত হয় এবং তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয় শাস্তি হিসেবে। তওবা করার পর এর মূল শাস্তি-হদ যেমন বহাল থাকে, তেমনি তওবা করার পর সংশ্লিষ্ট শাস্তি– সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়াও বহাল থাকে। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয় শুধুমাত্র তাদের ফিসকের কারণে– কোনো শাস্তির অংশ হিসেবে নয়। সুতরাং যখন তওবার দ্বারা তাদের ফিসক দূরীভূত হয়ে যায়, তখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে কোনো বাধা থাকে না।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখের দলিল হলো কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الخ

তিন ইমামের বক্তব্য হলো, আয়াতের ইসতিছনা اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا -এর সম্পর্ক لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا -এর সাথে। সে মতে আয়াতের অর্থ হবে– তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তবে যখন তারা তওবা করে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। তাদের তওবা হলো, তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে– আমি মিথ্যা অপবাদ-কলঙ্ক আরোপ করেছি। সুতরাং তওবার পর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

তাদের এ দলিলের উত্তরে আমাদের বক্তব্য হলো, আয়াতের ইসতিছনার সম্পর্ক শেষ বাক্য وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-এর সাথে : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ-এর আতফ হয়েছে فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ-এর উপরে। আতফ করা হয়েছে শাস্তির অংশ বুঝানোর জন্যে। সুতরাং শাস্তি হলো– ১. বেত্রাঘাত ২. সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়া। আবার এ দুটি শাস্তির মাঝে সম্পর্কও রয়েছে। أَبَدًا শব্দটির উদ্দেশ্য চিরস্থায়ীভাবে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়া। অন্যথায় এটিকে ব্যবহার করার কোনো উপযোগিতা এখানে থাকছে না। যদি সাক্ষ্য তওবার পরেই গ্রহণীয় হবে তবে বলা হতো– لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً আর وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ হলো একটি ভিন্ন বাক্য যাতে সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ বিবৃত হয়েছে। তারপর শেষ বাক্যটি থেকে ইসতিছনা করা হয়েছে إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا দ্বারা। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তারা ফাসিক-পাপাচারী। তবে যারা তওবা করবে তারা পাপাচারী নয়। যেহেতু তার তওবা দ্বারা ফাসিকী দূর হলো– সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার হুকুম দূর হলো না, তাই সাক্ষ্য অগ্রাহ্যই থাকবে শাস্তি হিসেবে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা হানাফী মাযহাবের একটি মূলনীতির আলোকে প্রদান করা হয়েছে। মূলনীতিটি হলো, যদি ইসতিছনাকে কয়েকটি বাক্যের পর উল্লেখ করা হয়, তাহলে ইসতিছনার সম্পর্ক হয় শেষ বাক্যের সাথে– সবগুলো বাক্যের সাথে নয়।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, আয়াতের ইসতিছনার অক্ষর إِلَّا এখানে لٰكِنْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে ইসতিছনা এখানে مُنْقَطِعٌ কারণ, তওবাকারীগণ ফাসিকীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে– এরা ফাসিক তবে যারা তওবা করে, তারা ফাসিক নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ حُدَّ الْكَافِرُ الخ : লেখক বলেন, যদি কোনো কাফেরকে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে দণ্ড দেওয়া হয়, তারপর সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তার সাক্ষ্য মুসলমান অমুসলমান সবার বিপক্ষে কার্যকর হবে। আর যদি কাফের অবস্থায় থাকে, তাহলে তার সাক্ষ্য কাফেরের বিরুদ্ধেও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যে কোনো কাফেরের স্বগোত্রীয় লোকদের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের অধিকার রয়েছে। তার উক্ত অধিকার অপবাদ দেওয়ার কারণে কেড়ে নেওয়া হবে শাস্তির অংশ হিসেবে। তাই কোনো কাফেরের বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু উক্ত কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন স্বতন্ত্র একটি সাক্ষ্যদানের অধিকারপ্রাপ্ত হলো– যা ইতঃপূর্বে রহিত সাক্ষ্যদানের অধিকার থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের আগে কাফেরের সাক্ষ্য শুধুমাত্র কাফেরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতো। ইসলাম গ্রহণের পর কাফের ও মুসলমান উভয়ের বিপক্ষে তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা অর্জিত হয়। যেহেতু অপবাদের শাস্তির অংশ হলো প্রথম সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত হওয়া– দ্বিতীয় সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত হওয়া নয়, তাই দ্বিতীয় সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত হবে না। কেননা দ্বিতীয় সাক্ষ্যদান যোগ্যতা অগ্রাহ্য হওয়া অপবাদের দণ্ডের অংশ নয়। এ মাসআলার ব্যতিক্রম হলো ঐ ক্রীতদাসের মাসআলা যাকে অপবাদ দেওয়ার অভিযোগে দণ্ডিত করা হয়েছে, অতঃপর সে আজাদ হয়ে গেছে। এ ক্রীতদাসের সাক্ষ্য আজাদির পরও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ক্রীতদাসের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা মোটেই ছিল না– মুসলমান-অমুসলমান কারো বিপক্ষেই ছিল না; বরং সে দাসমুক্তি লাভ করার পর সাক্ষ্যদানের অধিকার পেয়েছে। সুতরাং মুক্ত হওয়ার পর তার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা দণ্ডের অংশ হিসেবে রহিত হবে। মোটকথা, অপবাদের পরিপূর্ণ শাস্তি হলো আশিটি বেত্রাঘাত ও তার সাক্ষ্য চিরতরে অগ্রাহ্য হওয়া। সুতরাং সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়া যেহেতু শাস্তির অংশ, তাই আজাদ হওয়ার পর যখন ক্রীতদাস সাক্ষ্যদানের অধিকার লাভ করবে, তখন শাস্তির অংশ হিসেবে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

একটি আনুষঙ্গিক আলোচনা : ক্রীতদাসের মাসআলায় দেখা যায় যে, শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ আসার পর তার উপর শাস্তি [সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত করা] প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ আমরা অমুসলিম রাষ্ট্রে [যেখানে শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ নেই] ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, সে মুসলিম রাষ্ট্রে [যেখানে দণ্ডপ্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে] আগমন করা সত্ত্বেও তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। দুটি মাসআলায় দু-রকম বিধান কেন করা হলো?

এর উত্তর হলো, অমুসলিম রাষ্ট্রে ব্যভিচার আসামির উপর শাস্তিকে ওয়াজিব করে না। কেননা সেখানে ইসলামি হুকুমত নেই বা মুসলিম আমিরের কর্তৃত্ব চলে না। তাই সেখানের সরকার শরিয়তের পক্ষ থেকে হদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আদিষ্ট নয়। কেননা আদিষ্ট হওয়ার জন্যে সক্ষমতা থাকা জরুরি। যদি তাকে কাফের রাষ্ট্র থেকে চলে আসার পর হদ দেওয়া হয় তাহলে হদ ওয়াজিবকারী না থাকা সত্ত্বেও হদ প্রয়োগ হলো। এটা বিধিসঙ্গত নয়। আর যেটা ওয়াজিবকারী নয় তা ওয়াজিবকারীতে পরিণত হয় না। বিশেষভাবে হুদূদ -এর মধ্যে তো নয়ই। কেননা হুদূদকে যথাসম্ভব এড়ানোই কাম্য। ক্রীতদাসের ব্যাপারটি এর চেয়ে ভিন্ন। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ওয়াজিবকারী হদ রয়েছে। তবে দাসত্বের কারণে পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হওয়াতে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তার শাস্তির পূর্ণতা দান করা হবে।

قَالَ : وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِاَبَوَيْهِ وَلِاَجْدَادِهِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلاَ الزَّوْجِ لِاِمْرَأَتِهِ وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَلاَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهِ وَلاَ الْاَجِيْرِ لِمَنْ اِسْتَاجَرَهُ وَلِاَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَ الْاَوْلاَدِ وَالْاٰبَاءِ مُتَّصِلَةٌ وَلِهٰذَا لاَ يَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ اِلَيْهِمْ فَتَكُوْنُ شَهَادَةً لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ اَوْ تَتَمَكَّنُ فِيْهِ التُّهْمَةُ قَالَ (رض) اَلْمُرَادُ بِالْاَجِيْرِ عَلٰى مَا قَالُوْا التِّلْمِيْذُ الْخَاصُّ اَلَّذِىْ يَعُدُّ ضَرَرَ اُسْتَاذِهِ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَنَفْعَهُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِاَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِ اَلْاَجِيْرُ مُسَانَهَةً اَوْ مُشَاهَرَةً اَوْ مُيَاوَمَةً فَيَسْتَوْجِبُ الْاَجْرَ بِمَنَافِعِهِ عِنْدَ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيْرُ كَالْمُسْتَاجَرِ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পিতার সাক্ষ্য তার পুত্রের এবং পৌত্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে সন্তানের সাক্ষ্য তার পিতামাতা ও দাদা-দাদিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে মৌলিক দলিল মহানবী ﷺ-এর বাণী– সন্তানের সাক্ষ্য পিতার জন্যে এবং সন্তানের জন্যে পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর জন্যে এবং স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর জন্যে গ্রহণযোগ্য নয় এবং ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে ও মনিবের সাক্ষ্য তার দাসের জন্যে গ্রহণযোগ্য নয় এবং শ্রমিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় নিয়োগকারীর জন্যে। কেননা পিতা ও সন্তানের মাঝে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আর এ কারণেই তাদেরকে জাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। ফলে তা একপ্রকার নিজের জন্যেই সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে। অথবা এতে তুহমত [তথা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ] প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেন, মাশায়েখে কেরামের মতে শ্রমিক দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ ছাত্র যে স্বীয় শিক্ষকের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি এবং তার উপকারকে নিজের উপকার বলে মনে করে। আর এটাই হলো মহানবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণীর উদ্দেশ্য : যে ব্যক্তি একটি পরিবারের অধীনস্থ তার সাক্ষ্য তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। আর কেউ কেউ বলেন, শ্রমিক বা পরিচালক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বার্ষিক অথবা মাসিক অথবা দৈনন্দিন কাজের জন্যে নিয়োগকৃত শ্রমিক। কেননা সাক্ষ্যদানের সময় শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে মজুরি লাভ করে। ফলে সে হয়ে যায় ঐ ব্যক্তির মতো যাকে সাক্ষ্যদানের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ الخ : উল্লিখিত ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) ঐসব ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন যাদের সাক্ষ্য বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের পক্ষে ও বিপক্ষে গ্রহণীয় হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পিতার সাক্ষ্য সন্তানদের পক্ষে এবং সন্তানদের সাক্ষ্য পিতামাতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে

পিতার সাক্ষ্য তার সন্তানের সন্তান এবং ছেলে-মেয়েদের সাক্ষ্য তাদের দাদা-দাদি ও নানা-নানিদের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য নয়। এর দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ বলেন–

لاَ يُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلاَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَلاَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهِ وَلاَ الْاَجِيْرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ .

অর্থাৎ "সন্তানের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। আর স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে এবং স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দাসের সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে এবং মনিবের সাক্ষ্য তার দাসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমিকের সাক্ষ্য তার নিয়োগদাতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।"

প্রশ্ন : হাদীসের একটি অংশ وَلاَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ -এর উপর একটি আপত্তি হয় যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তো কারো জন্যেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং "মনিবের জন্যে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়" এ কথা আলাদা করে বলার যৌক্তিতা কোথায়?

উত্তর : এর উত্তর হলো, রাসূল ﷺ একটি বিশেষ বিষয়ে কয়েকটি অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিষয়টি এই যে, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। এটা পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে যেমন ঘটতে পারে, তেমনি দাস ও তার মালিকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। এতটুকু সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের আলোচনাটি এসেছে। যদিও ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কারো জন্যেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, হাদীসের অর্থ এরূপ করা যেতে পারে যে, যদি ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কারো পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতো, তবুও তার সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতো না। কারণ, এতে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। সারকথা হলো, এ হাদীস থেকে এ কথা জানা গেল যে, পিতার সাক্ষ্য তার সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের পক্ষে অগ্রাহ্য। এমনিভাবে সন্তানদের সাক্ষ্য তার পিতামাতা, দাদা-দাদি ও নানা-নানিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ দাবির পক্ষে যুক্তি হলো, পিতা-পুত্রের মাঝে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন– পিতার মালিকানাধীন বস্তুতে ছেলের এবং ছেলের মালিকানাধীন বস্তুতে পিতার ভোগের অধিকার রয়েছে। আর এ ভোগ অধিকার সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং সমাজের দৃষ্টিতে সমালোচিতও নয়। এ কারণে পিতার জাকাত ছেলেকে এবং ছেলের জাকাত পিতাকে প্রদান করা যায় না। সুতরাং পিতা তার ছেলে কিংবা পৌত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে অথবা ছেলে তার পিতা কিংবা দাদার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তাদের মাঝে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তা আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো হলো। অথবা এতটুকু সন্দেহের অবকাশ তো অবশ্যই থাকে যে, সে নিজের লাভ বা স্বার্থের জন্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর এটা তো সর্বসম্মত বিধান যে, সাক্ষ্যদাতার এমন সাক্ষ্য যার দ্বারা তার স্বার্থ রক্ষা হয়, অথবা তার উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমন সাক্ষ্য স্বার্থপরতার অভিযোগে বাতিল হয়ে যায়। এ কারণে পিতার সাক্ষ্য সন্তানদের জন্যে এবং সন্তানদের সাক্ষ্য পিতার জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়।

লেখক বলেন, হাদীসের أَجِيْر [শ্রমিক] শব্দের অর্থ মাশায়েখে কেরামের মতে বিশেষ এমন ছাত্র যে তার উস্তাদের লাভকে নিজের লাভ এবং উস্তাদের ক্ষতিকে নিজ ক্ষতি বলে বিবেচনা করে। উক্ত ছাত্র তার শিক্ষকের সাথে খাওয়াদাওয়া করে, উস্তাদের ঘরের একজন সদস্য বলে বিবেচিত হয় এবং এর জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকও নেই। এমতাবস্থায় এ ছাত্র ও শিষ্যের সাক্ষ্য তার উস্তাদের পক্ষে গ্রহণ করা হবে না। লেখক বলেন, রাসূল ﷺ -এর হাদীস– لاَ شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِاَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ একই প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে। হাদীসের অর্থ : "যে ব্যক্তি কোনো পরিবারের অধীন, যে তাদের কাজে সাহায্য করে এবং ফরমায়েশ খাটে, তাহলে তার সাক্ষ্য উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।" ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বর্ণনা মতে পূর্ণ হাদীসটি হচ্ছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ زِيَادِ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مُجْلَوْدٍ حَدًّا وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ وَلاَ مُجَرَّبٍ بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَلاَ الْقَانِعِ بِاَهْلِ الْبَيْتِ وَلاَ ظَنِيْنٍ فِيْ وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ .

অনুরূপ হাদীস আবূ দাউদ (র.)-ও বর্ণনা করেন। হাদীসটি حَسَنٌ পর্যায়ের। তাঁর হাদীসের সনদ হচ্ছে–

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوْعًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلٰى اَخِيْهِ وَشَهَادَةَ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ وَاَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ.

উপরে বর্ণিত ইমাম তিরমিযীর হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযীসহ অনেকেই দুর্বল বলে অভিহিত করেন। কিতাবে উল্লিখিত প্রথম হাদীস (لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهٖ) সম্পর্কে আল্লামা যাইলাঈ (র.) তাঁর কিতাব (نَصْبُ الرَّايَةِ لِاَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ) এ- লিখেন হাদীসটি "গারীব"। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বাতে এটি শুরাইহ -এর উক্তিরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। কিতাবদ্বয়ে ইবরাহীম নাখয়ী থেকে এমনই একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

অবশ্য খাসসাফ (র.) রাসূল ﷺ -এর বাণীরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ আশশামী রয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে এ ইয়াযীদ মাতরূক– অগ্রহণযোগ্য। সঠিক কথা হলো, বর্ণিত হাদীসটি শুরাইহ-এর উক্তি; তা রাসূল ﷺ -এর বাণী হওয়াটা প্রমাণিত নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কারো ঘরে ঘরবাসীদের অধীনস্থ হিসেবে বসবাস করে এবং তাদের যাবতীয় ব্যাপারে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে, তার সাক্ষ্য উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ পরিবারের সাথে সহ-অবস্থানের কারণে তারা পরস্পরে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। ফলে সাক্ষ্যের স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠতে পারে। কতিপয় ফিকহবিদ মনে করেন أَجِيْرٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশেষ চাকর যাকে বাৎসরিক অথবা মাসিক বা দৈনিক বেতন-ভাতার চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। এ চাকরের সাক্ষ্য তার নিয়োগদাতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে সাক্ষ্য প্রদানের সময় নিয়োগদাতার ও নিজের স্বার্থের বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। ফলে সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য তার নিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করবে। তাই তার সাক্ষ্য নিয়োগদাতার পক্ষে গ্রহণ করা হবে না। এমনকি সে তার সাক্ষ্যের বিনিময়ে পারিশ্রমিক লাভ করবে। ফলে এটা এমনই হলো যে, কোনো ব্যক্তি টাকা দিয়ে কাউকে সাক্ষ্যদানের জন্যে নিযুক্ত করল। ভাড়া করা ব্যক্তির সাক্ষ্য যেমন অগ্রাহ্য তেমনি চাকরের সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে অগ্রাহ্য। তবে শ্রমিক বা চাকর যদি একাধিক মালিকের অংশীদারিত্বে হয়, অথবা এমন শ্রমিক যে কাজ করে আর মজুরি নেয়– মাসিক বা বাৎসরিক বেতনের উপর না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য মালিকের পক্ষে গ্রহণ করা হবে। মুশতারিক শ্রমিকের [أَجِيْرٌ مُشْتَرَكٌ -এর] উদাহরণ হলো– মিস্ত্রি, রঙমিস্ত্রি, ধোপা ও দর্জি প্রমুখ। এরা বিশেষ কোনো ব্যক্তির কাজ করে না; বরং এদের দ্বারা সব লোকই উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে বিশেষ বেতনভুক্ত শ্রমিক-চাকর নিজেকে মালিকের হাতে সোপর্দ করে দেয়। সে এ সময়ে কাজ না করলেও বেতন পাবে। যেমন– কোনো ব্যক্তিকে দিন চুক্তি, মাস চুক্তি কিংবা বছর চুক্তিতে নেওয়া হলো। তাকে যেমন কাজ করালে এবং না করালে উভয় অবস্থায় টাকা দিতে হয়, তেমনি বিশেষ চাকর-শ্রমিককেও টাকা দিতে হবে।

وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْاٰخَرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تُقْبَلُ لِاَنَّ الْاَمْلَاكَ بَيْنَهُمَا مُتَمَيِّزَةٌ وَالْاَيْدِيْ مُتَحَيِّزَةٌ وَلِهٰذَا يَجْرِيْ الْقِصَاصُ وَالْحَبْسُ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا فِيْهِ مِنَ النَّفْعِ لِثُبُوْتِهِ ضِمْنًا كَمَا فِي الْغَرِيْمِ اِذَا شَهِدَ لِمَدْيُوْنِهِ الْمُفْلِسِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَاهُ وَلِاَنَّ الْاِنْتِفَاعَ مُتَّصِلٌ عَادَةً وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ فَيَصِيْرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ اَوْ يَصِيْرُ مُتَّهِمًا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْغَرِيْمِ لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَشْهُوْدِ بِهِ ـ

অনুবাদ : এবং স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য অপরজনের পক্ষে গ্রহণ করা হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গ্রহণ করা হবে। কেননা, তাদের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন এবং দখলও পৃথক। আর এ কারণে তাদের মাঝে [একের কারণে অন্যের উপর] কিসাস ও ঋণের জন্য গ্রেফতার করার বিধান জারি করা হয়। সাক্ষ্যদানের মাঝে তাদের পরস্পর স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি লক্ষণীয় নয়। কেননা তা গৌণ বিষয় [মুখ্য নয়]। যেমন– পাওনাদারদের ক্ষেত্রে যখন সে তার নিঃস্ব দেনাদারের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। [এখানে পাওনাদারের স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।] আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা আমরা বর্ণনা করেছি। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সাধারণত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে, আর সেটাই মুখ্য হয়। ফলে সে একপ্রকার নিজের পক্ষেই সাক্ষ্যদাতা হলো। অথবা সে পক্ষপাতদুষ্টে অভিযুক্ত হতে পারে; কিন্তু পাওনাদারের সাক্ষ্য এর ব্যতিক্রম। কেননা সে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, এতে কোনো কর্তৃত্ব নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামী ও স্ত্রীর যে কোনো একজনের সাক্ষ্য অপরজনের পক্ষে গ্রহণ করা হবে না। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও তাই। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য আরেকজনের পক্ষে গ্রহণ করা হবে।

ইবনে আবূ লায়লা, সুফিয়ান ছাওরী ও ইবরাহীম নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে, স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণ করা হবে। তাঁদের দলিল হলো, স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। কেননা স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামী থেকে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান লাভ করে। আর এভাবে স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তাই স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলে অভিযুক্ত হতে পারে এই বলে যে, স্ত্রী তার স্বার্থের খাতিরে স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, যার সাক্ষ্য স্বার্থপরতার দ্বারা অভিযুক্ত হতে পারে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়। অতএব, এখানেও স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু স্বামীর সাক্ষ্যে যেহেতু এমন কোনো অভিযোগের সম্ভাবনা নেই, তাই স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণ করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল : তিনি বলেন, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ পৃথক এবং উভয়ের দখলও ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে একজনের সম্পদে অপরের অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। তাইতো একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে হত্যাকারীকে কিসাসের বিধান অনুসারে হত্যা করা হবে। চাই সে হত্যাকারী স্বামী হোক অথবা স্ত্রী হোক এবং একজন যদি অন্যজনের কাছে ঋণগ্রস্ত হয় আর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার প্রদেয় ঋণ শোধ না করে, তাহলে ঋণদাতা স্বামী/স্ত্রী ঋণ গ্রহীতা স্বামী/স্ত্রীকে পাওনা আদায়ের জন্যে বন্দী করতে পারবে। মোটকথা, যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লেনদেনের ব্যাপারে এতটা দূরত্ব, তখন স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য আরেকজনের পক্ষে গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا فِيْهِ مِنَ النَّفْعِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে যদি স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য অন্যজনের পক্ষে গ্রহণ করা হয় তাহলে তো সাক্ষীরই স্বার্থ রক্ষা

হবে। কেননা দুজনের প্রত্যেকেই অপরের উপকৃত হওয়াকে নিজের উপকৃত হওয়া মনে করে। যেমন– কোনো বিষয়ে স্বামী লাভবান হলে স্ত্রী সেটাকে নিজের লাভ মনে করে, আবার স্ত্রী লাভবান হলে স্বামী সেটাকে নিজেরই লাভ মনে করে। মোটকথা যখন স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য দ্বারা অপরজন সুনিশ্চিতভাবে লাভবান হয়, তখন সাক্ষ্যদাতা যেহেতু যার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে তার সাক্ষী কিংবা স্ত্রী তাই তার [সাক্ষীর] ও এতে লাভ-উপকার হবে। আর যে সাক্ষ্য দ্বারা সাক্ষীর উপকার হয়, সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য আরেকজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, যে লাভ ও উপকারের কথা বলা হলো তা সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। এ লাভ তো সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে গৌণভাবে হাসিল হয়। আর যে লাভ গৌণভাবে অর্জিত হয় তা সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে একজন অপরের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা যে লাভ ও উপকার হয় তা গৌণভাবে হওয়ার কারণে তাও ধর্তব্য নয়। যখন এতটুকু উপকার ও লাভ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, তখন স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য অপরজনের পক্ষে দেওয়া বৈধ বলে গণ্য হবে। এর উদাহরণ এরূপ যে, কোনো পাওনাদার দেউলিয়া ঘোষিত ঋণগ্রহীতার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হয়। যদিও এতে ঋণদাতার কিছু লাভ ও উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা সাক্ষের দ্বারা যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি টাকা লাভ করে, তাহলে ঋণদাতার টাকা উসূল করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু যেহেতু এ লাভ-উপকার এক গৌণ বিষয়– সাক্ষ্যের উদ্দিষ্ট লাভ নয়, তাই এ লাভের বিষয়টিকে আমলে আনা হয়নি এবং ঋণদাতার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

লেখক বলেন, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের দলিল সেই হাদীস যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি– لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ; উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের যুক্তি এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরস্পর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। স্ত্রীর সম্পদের ভিত্তিতে স্বামীকে সম্পদশালী যেমন মনে করা হয় তেমনি স্বামীর সম্পদের ভিত্তিতে স্ত্রীকে সম্পদশালিনী মনে করা হয়। এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'সূরা দুহা'তে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে বিবৃত আল্লাহ তা'আলার বাণীতে। আল্লাহ বলেন, (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) 'আপনাকে আমি নিঃস্ব পেয়েছি অতঃপর ধনী করেছি [হযরত খাদিজা (রা.)-এর সম্পদ দ্বারা]। এ আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সম্পদ দ্বারা স্বামীকে ধনী মনে করা যথার্থ। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অন্তরঙ্গতা ও হৃদ্যতা এমন পর্যায়ে থাকে যা পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যেও থাকে না। এমন দেখা যায় যে, সন্তানের জন্যে যতটা কষ্ট ভোগ করে এবং তাদের সুখের জন্যে চেষ্টা করে তার চেয়ে বহুগুণে বেশি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্যে যাতনা ভোগ করে। ক্ষেত্রবিশেষে তো এমনও হয় যে, স্ত্রীর সুখের জন্যে স্বামী আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করে এবং তাদের সাথে শত্রুতা বজায় রাখে। তেমনি স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্যে পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট এমনকি চিরজীবনের জন্যে ত্যাগও করে। মোটকথা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তাদের পরস্পরের স্বার্থ খুবই ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকে। আর দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বারা উপকৃত হওয়াও উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন স্বামী-স্ত্রী মধ্যে পরস্পর স্বার্থ ও লাভ জড়িত এবং সেই লাভ উদ্দেশ্যও বটে; এমতাবস্থায় তাদের একজন যদি অপরজনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে যেন একপ্রকার নিজের জন্যেই সাক্ষ্য দিল। অথবা সে তার স্বার্থ জড়িত থাকার কারণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে। আর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম যে, মানুষ যখন নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় কিংবা সাক্ষ্যদানের দ্বারা অভিযুক্ত হয়, তখন তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর একজনের সাক্ষ্য অপরজনের পক্ষে অগ্রাহ্য হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْغَرِيمِ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো, ঋণদাতার মাশহূদ বিহী [যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে] -এর উপর কোনো ওলায়াত-কর্তৃত্ব নেই। কেননা, যে মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে তা ঋণগ্রহীতার। আর ঋণগ্রহীতার মালের উপর ঋণদাতার কোনো অধিকার নেই। সে এতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুতরাং যখন ঋণদাতার ঋণগ্রহীতার সম্পদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই, ফলে সে সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা অভিযুক্ত হবে না। আর ঋণদাতা সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা অভিযুক্ত না হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, ঋণদাতার সাক্ষ্যের উপর স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি তুলনা করা সঠিক নয়।

وَلَا شَهَادَةَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ لِاَنَّهٗ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهٖ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ اَوْ مِنْ وَجْهٍ اِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِاَنَّ الْحَالَ مَوْقُوْفٌ مُرَاعٰى وَلَا لِمُكَاتَبِهٖ لِمَا قُلْنَا وَلَا شَهَادَةَ الشَّرِيْكِ لِشَرِيْكِهٖ فِيْمَا هُوَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا لِاَنَّهٗ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهٖ مِنْ وَجْهٍ لِاِشْتِرَاكِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا تُقْبَلُ لِاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِاَخِيْهِ وَعَمِّهٖ لِاِنْعِدَامِ التُّهْمَةِ لِاَنَّ الْاَمْلَاكَ وَمَنَافِعَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ وَ لَا بُسُوْطَةَ لِبَعْضِهِمْ فِىْ مَالِ الْبَعْضِ ـ

অনুবাদ : আর মনিবের সাক্ষ্য তার দাসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা দাসের জন্যে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ সর্বোতভাবে নিজের জন্যেই সাক্ষ্য দেওয়া সাব্যস্ত হবে যদি দাসের উপর কোনো ঋণ না থাকে। আর যদি তার জিম্মায় ঋণ থাকে তাহলেও একপ্রকার নিজের জন্যে সাক্ষ্য দেওয়া। কেননা গোলামের অবস্থা [ঋণ থাকাকালে] মওকুফ ও পর্যবেক্ষণাধীন। তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত কারণে মুকাতাবের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে এক অংশীদারের পক্ষে শরিকানা বিষয়ে অন্য অংশীদারের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের পরস্পরের অংশীদারিত্বের কারণে এটা একপ্রকারের নিজের জন্যেই সাক্ষ্য দেওয়া। অবশ্য যদি তাদের যেসব বিষয়ে অংশীদারিত্ব নেই তাতে একজনের সাক্ষ্য অন্যজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এতে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ আরোপ করা যায় না এবং ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও চাচার পক্ষে ভাতিজার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা এখানে অপবাদ আরোপের অবকাশ নেই। কারণ মালিকানা ও মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি বিভক্ত হয়ে গেছে। আর একজনের মাল অন্যের ব্যবহারের উদারতাও নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا شَهَادَةَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো গোলামের মালিক যদি গোলামের অনুকূলে আদালতে সাক্ষ্য দেয় তাহলে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ গোলামের দু-অবস্থা।

১. হয়তো গোলামের দায়িত্বে নিজস্ব ঋণ আছে–

২. অথবা তার কোনো ঋণ নেই। যদি গোলামের ঋণ না থাকে তাহলে তার অনুকূলে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে যে সুবিধা অর্জিত হবে তার সবটাই মালিক ভোগ করবে। এজন্য তার দায়িত্বে ঋণ না থাকলে গোলামের পক্ষে সাক্ষ্যদান অর্থ সার্বিকভাবে নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদান করা।

আর যদি গোলামের নিজস্ব ঋণ না থাকে তাহলেও দু-অবস্থা–

১. উক্ত ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে গোলামটিকে মালিক বিক্রি করতে বাধ্য হবে। আর তখন গোলাম পাওনাদারদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে এবং তার পূর্বতন মালিক আজনবি সাব্যস্ত হবে। সে হিসেবে তার সাক্ষ্যদান করা চলে। কেননা তখন তার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান নিজের জন্যে সাক্ষ্য প্রদান সাব্যস্ত হয় না।

২. এমনও হতে পারে যে, উক্ত গোলামের যাবতীয় ঋণ মনিব পরিশোধ করে দিল। ফলে গোলামের মালিকানা তার কাছেই বহাল রইল। এমতাবস্থায় তার পক্ষে সাক্ষ্যদান নিজের জন্যে সাক্ষ্যদান বলে সাব্যস্ত হবে। মোটকথা, ঋণ থাকা অবস্থায়ও একদিক থেকে নিজের স্বার্থে সাক্ষ্যদান বলে গণ্য হয়। আর যে সাক্ষ্য সাক্ষ্যদাতার পক্ষে যায় এরূপ সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ لِمَا قُلْنَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুকাতাবের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্যদানও গ্রহণযোগ্য নয়। গোলামের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত দলিল মুকাতাবের পক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কারণে গোলামের পক্ষে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় একই কারণে মুকাতাবের ব্যাপারে মনিবের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, মুকাতাব তার বদলে কিতাবাত সম্পূর্ণ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত গোলাম থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا شَهَادَةُ الشَّرِيكِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি দুব্যক্তি পরস্পর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। অতঃপর এক অংশীদারের কিছু মালের ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তি আপত্তি জানায় যে, উক্ত মাল তার। আর মালের বর্তমান মালিক তা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় যদি তার অপর পার্টনার [অংশীদার] তার পক্ষে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মাল বর্তমান দখলদারেরই তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা যে মালের ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তি আপত্তি করেছে উক্ত মাল শরিক ও সাক্ষ্যদানকারী উভয়ের মালিকানাধীন। সুতরাং সাক্ষীর এ মালের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করা মূলত উক্ত মালের কিছু অংশ নিজ মাল বলে সাক্ষ্যদান করা সাব্যস্ত হয়। আর এ কথা এইমাত্র বলা হলো যে, নিজ মালের ব্যাপারে মালিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, মালের কিছু অংশের ব্যাপারে যেহেতু সাক্ষ্য বাতিল হলো তাহলে পুরো মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে। কেননা, সাক্ষ্যদান এমন বিষয় যা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। এমন কখনো হবে না যে, সাক্ষ্যদান কিছু মালের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু বাকি মালের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে সম্পূর্ণ মালের ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তা বাতিল হয় তাহলেও সম্পূর্ণ মালের ব্যাপারে বাতিল হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا الخ : আর যদি এক অংশীদার অন্য অংশীদারের এমন মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে যাতে তার অংশীদারিত্ব নেই তাহলে অবশ্য তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যেহেতু এ মালে সাক্ষীর অংশীদারিত্ব নেই তাই এ সাক্ষ্য প্রদান নিজের জন্যে সাক্ষ্যদান বলে সাব্যস্ত হবে না এবং এ অপবাদও আরোপ করা চলবে না যে, সে নিজ স্বার্থে সাক্ষ্য দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এক ভাইয়ের পক্ষে অন্য ভাইয়ের সাক্ষ্য এবং চাচার পক্ষে ভাতিজার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, জন্মগত আত্মীয়তা তথা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, মা-মেয়ের সম্পর্ক ইত্যাদি ছাড়া যেসব সম্পর্ক আছে সেগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য অপর নিকটাত্মীয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্য নিকটাত্মীয়ের মালিকানা এবং মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তাই সাধারণভাবে একজনের সাথে অন্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে না আর তাই শরিয়ত তাদের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। অধিকন্তু এ ধরনের আত্মীয়দের মাঝে সম্পদ ও সম্পত্তি পৃথক হওয়াতে একজনের সম্পদ অন্য আরেকজন অনুমতি ব্যতীত অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। যেহেতু তাদের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক তাই একজনের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে কোনো তোহমত/ অপবাদ দেওয়ার সুযোগ হবে না। সেহেতু তাদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তোহমতের সুযোগ নেই তাই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيِّ مِنَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ فَأَمَّا الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِيْنٌ وَفِي أَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ وَلَا نَائِحَةٍ وَلَا مُغَنِّيَةٍ لِأَنَّهُمَا تَرْتَكِبَانِ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الصَّوْتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ. قَالَ : وَلَا مُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِيْنِهِ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ لِأَنَّهُ يُورِثُ غَفْلَةً وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقِفُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُودِ سَطْحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হিজড়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন হিজড়া যারা সমকামিতায় লিপ্ত। কেননা এরূপ ব্যক্তি ফাসেক। অবশ্য যে হিজড়ার কথার মধ্যে মেয়েলি সুর, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে জন্মগতভাবে মেয়েলি ঢং আছে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং বিলাপকারিণী ও গায়িকার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা দুজন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। রাসূল ﷺ দুটি নির্বোধ [অবাঞ্ছিত] আওয়াজ তথা বিলাপকারিণী ও গায়িকার আওয়াজকে নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আমোদ-ফুর্তি করতে গিয়ে মাদকাসক্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে তার ধর্মে যা নিষিদ্ধ তাতে লিপ্ত হয়েছে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাখি নিয়ে [খেলায়] মত্ত থাকে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ মত্ততা গাফলত সৃষ্টি করে। তাছাড়া সে পাখি উড়ানোর উদ্দেশ্যে ছাদের উপরে উঠলে মেয়েদের আবরণীয় অনাবৃত স্থান দেখে ফেলবে। [অথচ আজনবি মহিলার আবরণীয় অঙ্গ দেখা হারাম।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হিজড়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) এখানে হিজড়া দ্বারা এমন হিজড়া উদ্দেশ্য করেছেন যারা নিকৃষ্ট সমকামিতায় লিপ্ত হয়। এসব হিজড়া মেয়েদের মতো আচরণ করে, কথা মেয়েদের মতো বলে এবং হাঁটাচলায় মেয়েদের মতো হেলে-দুলে চলে। এদের গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হলো এরা ফাসিক। আর ফাসিকের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

অবশ্য যেসব হিজড়া জন্মগত ত্রুটির কারণে মেয়েদের স্বরে কথা বলে এবং আচরণে মেয়েদের ছাপ এসে যায় তাদের সাক্ষ্য নিছক এ কারণে বাতিল হবে না। কারণ এটাতো তাদের স্বেচ্ছাধীন নয়।

প্রথম প্রকারের হিজড়াদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَعَنَ اللّٰهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ 'আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের মধ্যে যারা হিজড়ার বেশ ধরে তাদের অভিসম্পাত করেছেন।' এ হাদীস দ্বারা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার যৌক্তিকতা এই পাওয়া যায় যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে যথাস্থানে রাখার পরিবর্তে একে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। এটা চরম গর্হিত কাজ। এ কারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَا نَائِحَةٍ وَلَا مُغَنِّيَةٍ الخ : আলোচ্য ইবারতে পেশাদার বিলাপকারিণী মহিলা এবং গায়িকাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিলাপকারিণী দ্বারা উদ্দেশ্য এসব মহিলা যারা অন্যদের মৃত্যু ইত্যাদি বিপদাপদে গিয়ে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিলাপ করে থাকে। যারা নিজেদের বিপদাপদে বিলাপ করে তারা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

আর গায়িকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেসব মহিলা আমোদ-ফুর্তির উদ্দেশ্যে গান করে। গান-বাজনা সব ধর্মেই হারাম। বিশেষভাবে মেয়েদের গান চরমভাবে হারাম। কারণ, মেয়েদের আওয়াজকে শরিয়ত সতর সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং মেয়েদের গানের মধ্যে দুটি নিষিদ্ধ বিষয় পাওয়া গেল– ১. উচ্চ আওয়াজ করা এবং ২. গান করা। এজন্য মেয়েদের গানের ক্ষেত্রে لِلنَّاسِ -এর কয়েদ আরোপ করা হয়নি। অথচ পুরুষ গায়কের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে لِلنَّاسِ -এর শর্তারোপ করা হয়েছে।

মোটকথা, উপরিউক্ত দু-ধরনের মহিলার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো তাদের হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। তাদের উল্লিখিত কাজগুলো যে হারাম তা রাসূল ﷺ -এর হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা এই– رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّوْتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ

অর্থাৎ বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ দুটি নির্বোধ আওয়াজকে নিষিদ্ধ করেছেন– বিলাপকারিণী ও গায়িকার আওয়াজ।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) কিতাবুল জানাইযে নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ، فَوَجَدَهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَتَبْكِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ قَالَ : لَا إِنِّيْ لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ وَلٰكِنِّيْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةٍ لَعِبٍ وَلَهْوٍ وَمَزَامِيْرِ شَيْطَانٍ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ .

আলোচ্য এ হাদীস তিরমিযী শরীফ ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীসের সংকলনের মধ্যে উদ্ধৃত আছে। মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্ধৃত হাদীসটি প্রায় কাছাকাছি শব্দে তিরমিযী শরীফে পাওয়া গেল। অতএব, হাদীসটি প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا مُدْمِنَ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে শরাব বা অন্য কোনো মাদক পানে অভ্যস্ত হয় এবং এর দ্বারা সে মাদকাসক্ত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তার সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে ব্যক্তি তার বাড়িতে গোপনে মদ/ অন্যকোনো মাদক সেবন করে তাহলে তার দ্বারা তার সাক্ষ্যদান যোগ্যতা রহিত হবে না। যদিও গোপনে মদ পান করাও হারাম। কেননা প্রকাশ্যে মদ সেবনের দ্বারা কিংবা মাদকাসক্ত বলে পরিচিতি লাভ করা এমন বিষয় যার পর সে ব্যক্তির সাক্ষ্যদান করার যোগ্যতা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য থাকেনি।

قَوْلُهُ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطُّيُوْرِ الخ : মুসান্নিফ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি পাখি নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ খেলা নেশার সৃষ্টি করে। আর নেশা বা খেলায় মত্ততা মানুষের মাঝে ইবাদত তথা নামাজ-রোজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে গাফলতি / উদাসীনতা সৃষ্টি করে।

এ খেলার আরেকটি সমস্যা হলো, পাখি নিয়ে খেলতে গিয়ে মানুষ বাড়ির ছাদে / উপরে উঠে। আর উপরে উঠলে অন্যান্য বাড়ির মেয়েদের চোখে পড়ে। ফলে তার অতিরিক্ত আরেকটি গুনাহ হয় তা হলো বেগানা মহিলাদের আবরণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদান। আর কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطُّنْبُورِ وَهُوَ الْمُغَنِّي ـ قَالَ : وَلَا مَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى اِرْتِكَابِ كَبِيرَةٍ قَالَ : وَلَا مَنْ يَأْتِي بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحَدُّ لِلْفِسْقِ قَالَ : وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ اِزَارٍ لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ أَوْ يَأْكُلُ الرِّبٰوا أَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ لِأَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَكَذٰلِكَ مَنْ تَفُوتُهُ الصَّلٰوةُ لِلْاِشْتِغَالِ بِهِمَا فَأَمَّا مُجَرَّدُ اللَّعْبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَلَيْسَ بِفِسْقٍ مَانِعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ لِلْاِجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا شَرَطَ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُ الرِّبٰوا مَشْهُورًا بِهِ لِأَنَّ الْاِنْسَانَ قَلَّمَا يَنْجُو عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ رِبٰوا ـ

অনুবাদ : কিতাবের কোনো কোনো অনুলিপিতে طَيُوْر [পাখি] -এর পরিবর্তে طُنْبُوْر [তাম্বুরাতে লিপ্ত ব্যক্তি] রয়েছে। তখন এ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে গায়ক। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি লোকদের জন্যে গানের অনুষ্ঠান করে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, সে লোকদের কবীরা গুনাহে লিপ্ত করাতে জমায়েত করে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় যাতে হদ প্রয়োগ করা হয় সে ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ ব্যক্তি ফাসিক। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করে। কেননা আবরণীয় অঙ্গ [সতর] খোলা হারাম। অথবা যে সুদ খায় কিংবা দাবা ও পাশার মাধ্যমে জুয়াতে লিপ্ত হয়। কেননা এসবই কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য। অদ্রূপ তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যারা দাবা ও পাশা খেলায় ব্যস্ত থাকার কারণে নামাজ ছুটে যায়। অবশ্য কেবল দাবা খেলায় লিপ্ত হওয়াই এমন ফিসক নয় যা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদী মতভেদের অবকাশ রয়েছে। মাবসূত কিতাবে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, [সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে] সুদ খাওয়ার ক্ষেত্রে কুখ্যাতি থাকতে হবে। কেননা মানুষ ফাসিদ বেচাকেনা থেকে খুব কমই বাঁচতে পারে। আর এগুলো সবই কবীরার অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুখতাসারুল কুদূরীর কোনো কোনো অনুলিপিতে بِالطُّيُوْرِ [পাখি দ্বারা]-এর স্থলে بِالطُّنْبُوْرِ রয়েছে। طُنْبُوْر হলো এক ধরনের বাজনা। সে হিসেবে ইবারতের অর্থ হবে- যে তাম্বুরা খেলায় মত্ত থাকে তার সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যে তাম্বুরা নিয়ে মত্ত থাকে সে মূলত গায়ক/ গায়িকার সহকর্মী বাদ্যযন্ত্র বাজানোর দায়িত্বরত ব্যক্তি। গায়ক ও এর নিত্য সহকর্মীর সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যদি طُنْبُوْر নিয়ে খেলাকারী দ্বারা গায়ক উদ্দেশ্য হয় তাহলে সামনের ইবারত وَلَا مَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ -এর আলাদা কোনো অর্থ থাকে না।

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا مَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ الخ : এখানে যাদের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ কতিপয় ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে।

১. ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি লোক জমায়েত করে গানবাজনা করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে লোকদেরকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করার জন্যে জমায়েত করে। আর কবীরা গুনাহের উদ্দেশ্যে জমায়েত করাও কবীরা গুনাহ। যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত করবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না।

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি একাকী গান গায় তাহলে ইমাম সারাখসী (র.)-এর মতানুযায়ী এরূপ গান গাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা তাঁর ভাই হযরত বারা ইবনে মালিক (রা.)-এর কাছে গেলেন। হযরত বারা ইবনে মালেক (রা.) ছিলেন দরবেশ প্রকৃতির সাহাবী। তিনি তাঁর ভাইকে এ অবস্থায় পেলেন যে, তিনি গান গাইছিলেন।

পক্ষান্তরে শাইখুল ইসলাম খাওয়াহির যাদাহ (র.) -এর মতানুযায়ী গান গাওয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ। তা একাকী গাওয়া হোক কিংবা লোকজন জমায়েত করে গাওয়া হোক। তিনি হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, সম্ভবত হযরত বারা ইবনে মালিক (রা.) উপদেশমূলক কোনো ছন্দ/ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর এরূপ কাব্য/ গজল গাওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে দূষণীয় নয়।

২. قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا مَنْ يَأْتِي بَابًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, যার দ্বারা হদ [illegible]রোপ হয়। যেমন– সে চুরি করল, সতী নারীকে অপবাদ দিল ইত্যাদি। এরূপ গুনাহগারের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক বলে গণ্য হয়। আর ফাসিকের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে, কবীরা সর্বমোট মাত্র সাতটি, যা রাসূল ﷺ -এর একটি বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত আছে। সে সাতটি কবীরা গুনাহ হলো– ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা ২. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৩. পিতামাতার অবাধ্যাচারণ করা বা তাঁদের কষ্ট দেওয়া ৪. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ৫. মু'মিন নারী বা পুরুষকে অপবাদ দেওয়া ৬. মদপান করা এবং ৭. ব্যভিচার করা।

কোনো কোনো আলেম এ সাতটির সাথে সুদ খাওয়া এবং এতিমের মাল খাওয়াকেও কবীরা গুনাহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে ছ[illegible]।

কবীরা গুনাহের পরিচয় দিতে গিয়ে কোনো কোনো আলেম বলেন, যে কাজ মূলগতভাবে হারাম তাই কবীরা গুনাহ।

আবার কেউ কেউ বলেন, যে কাজের শাস্তি কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে তাই কবীরা।

কারো কারো মত হলো, যে কাজকে লোকসমাজে ঘৃণ্যভাবে দেখা হয় এবং শরিয়ত ও দীনের জন্যে অমর্যাদাকর তাই কবীরা গুনাহ।

এ ব্যাপারে আরেক মত হলো, কোনো ছোট গুনাহ যদি নিয়মিতভাবে করা হয় তাহলে সেটা কবীরার মধ্যে গণ্য হয়।

চূড়ান্ত কথা হলো, গুনাহ একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেকটি গুনাহ এমন যার উপর গুনাহ আছে আবার এর নিচেও গুনাহ থাকে। সুতরাং নিচের গুনাহের ভিত্তিতে একে কবীরা এবং এর উপরের গুনাহের হিসেবে এটি সগীরা।

৩. قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا مَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বিবস্ত্র হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সতর খোলা রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে ফাসিক। আর ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. قَوْلُهُ أَوْ يَأْكُلَ الرِّبٰوا أَوْ يُقَامِرُ الخ : অথবা যে ব্যক্তি সুদ খায় অথবা দাবা ও পাশা খেলার মাধ্যমে জুয়াতে লিপ্ত হয়। তার সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সুদ খাওয়া ও জুয়া খেলা উভয়ই নিকৃষ্ট হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহের মাধ্যমে বান্দা ফাসিকের কাতারে চলে যায়। আর ফাসিকের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য মাবসূত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি সুদ খাওয়ার মাধ্যমে কুখ্যাতি অর্জন করে তাহলেই তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। আর যদি তার সুদ খাওয়ার বিষয়টি লোকসমাজে অজ্ঞাত থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মানুষ খুব কমই ফাসিদ লেনদেন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। যদি এ শর্ত করা হয় তাহলে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, ফাসিদ লেনদেনগুলো সুদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।

যদি কেউ দাবা, পাশা অথবা অন্য কোনো নেশা জাতীয় খেলা [যেমন– তাস ইত্যাদি] -এর মাধ্যমে জুয়া খেলে তাহলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

যদি কেউ এরূপ খেলার মাধ্যমে জুয়া নাও খেলে; কিন্তু খেলাতে এরূপ মত্ত থাকে যার ফলে তাদের নামাজের কোনো খবর থাকে না তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ فَأَمَّا مُجَرَّدُ اللَّعْبِ الخ : অবশ্য যে ব্যক্তি নিছক শতরঞ্জ খেলায় অংশগ্রহণ করে। এতে জুয়া কিংবা এমন লিপ্ততা না থাকে যার দ্বারা নামাজ ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে তাহলে তা ফিসক নয়। আর তাই এর কারণে তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাও রহিত হবে না। তাছাড়া এতে ইজতিহাদী মতভেদের কারণে এর বিধান ততটা কঠোর হয়নি। উল্লেখ্য যে, শতরঞ্জ খেলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের মতে এ খেলা জায়েজ।

قَالَ : وَلَا مَنْ يَفْعَلَ الْاَفْعَالَ الْمُسْتَحْقَرَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَالْاَكْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ لِاَنَّهُ تَارِكٌ لِلْمُرُوَّةِ وَاِذَا كَانَ لَا يَسْتَحْيِىْ عَنْ مِثْلِ ذٰلِكَ لَا يَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذْبِ فَيُتَّهَمُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُوْرِ فِسْقِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَكْتُمُهُ .

অনুবাদ : তদ্রূপ যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট-লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত আছে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না। যেমন– রাস্তা-ঘাটে পেশাব করা, পথে-দোকানে খাওয়া। কেননা এরূপ ব্যক্তি ভদ্রতা বিসর্জন দেয়। যখন সে এরূপ লজ্জাজনক কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না সে মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে না। সুতরাং সে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি। তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে সালফে সালেহীনকে গালমন্দ করে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার ফাসেকী প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে গোপনে এরূপ গালমন্দ করে [তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا مَنْ يَفْعَلَ الْاَفْعَالَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যারা নিকৃষ্ট ও লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয় তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। হেদায়ার মুসান্নিফ (র.) লজ্জাজনক কাজের যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হলো– রাস্তায় পেশাব করা, হাটে, বাজারে ও রাস্তায় বসে খাওয়া-দাওয়া করা ইত্যাদি। কেননা এরূপ ব্যক্তি সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারকে বর্জন করেছে। যেহেতু সে এ জাতীয় নিকৃষ্ট কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না তাই সে মিথ্যা থেকেও বিরত থাকবে না– এটা ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং সে মিথ্যা বলতে পারে এরূপ সন্দিগ্ধ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আমাদের সালফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইয়াম্মায়ে মুজতাহিদীন প্রমুখকে গালি দেয়। কেননা এরূপ ব্যক্তির ফাসিক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি গোপনে সালফে সালেহীনকে গালমন্দ করে এবং তার এরূপ আচরণের বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোনো জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এর কারণ হলো, বাহ্যিকভাবে এ ব্যক্তির আদালত [ন্যায়পরায়ণতা] এখনো বহাল আছে এবং তার ফিসক প্রকাশিত হয়নি। অতএব, তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে না।

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ اِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا تُقْبَلُ لِاَنَّهُ اَغْلَظُ وُجُوْهِ الْفِسْقِ وَلَنَا اَنَّهُ فِسْقٌ مِنْ حَيْثُ الْاِعْتِقَادِ وَمَا اَوْقَعَهُ فِيْهِ اِلَّا تَدَيُّنُهُ فَيَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذْبِ وَصَارَ كَمَنْ يَشْرَبُ الْمُثَلَّثَ اَوْ يَاْكُلُ مَتْرُوْكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا مُسْتَبِيْحًا لِذٰلِكَ بِخِلَافِ الْفِسْقِ مِنْ حَيْثُ التَّعَاطِيْ اَمَّا الْخَطَّابِيَّةُ فَهُمْ قَوْمٌ مِنْ غُلَاةِ الرَّوَافِضِ يَعْتَقِدُوْنَ الشَّهَادَةَ لِكُلِّ مَنْ حَلَفَ عِنْدَهُمْ وَقِيْلَ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ لِشِيْعَتِهِمْ وَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التُّهْمَةُ فِيْ شَهَادَتِهِمْ لِظُهُوْرِ فِسْقِهِمْ .

অনুবাদ : প্রবৃত্তির অনুসারী ভ্রান্তদলগুলোর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তবে খাত্তাবী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা ফিসকের নিকৃষ্টতম স্তর। আমাদের দলিল হলো, এটা বিশ্বাসগত ফিসক [পাপাচার]। ধর্মীয় চেতনাই তাদের এ স্তরে নামিয়েছে। সুতরাং তারা মিথ্যা থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং সে মুছাল্লাছ শরাব পানকারীর মতোই হলো কিংবা ঐ ব্যক্তির মতো হলো যে হালাল মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে জবাইকৃত পশুর গোশত খায়। এর ব্যতিক্রম হলো আমলী ফিসক। আর খাত্তাবী সম্প্রদায়ের ব্যাপার হলো, তারা রাফেযীদের কট্টরপন্থি একটি দল। তারা তাদের সামনে যারা কসম খায় তাদের সাক্ষ্যকে বিশ্বাস্য বলে মনে করে। কেউ কেউ বলেন, তারা তাদের দলের জন্যে সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব মনে করে। সুতরাং তাদের পাপাচার প্রকাশিত হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে অপবাদ জায়গা করে নিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ الخ : উপরের ইবারতে বিদ'আতপন্থি লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اَهْلُ الْاَهْوَاءِ অর্থ– প্রবৃত্তির অনুসারী সম্প্রদায়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐসব ফিরকা যারা নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী ইসলামকে মূল্যায়ন করেছে, সর্বক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ও সালফে-সালেহীনের পথে চলেনি। এ ধরনের লোকদের পরিভাষায় ফিরাকে বাতেলা (فِرَقٌ بَاطِلَةٌ) বা বিদ'আতপন্থি বলা হয়। তারা দীন-ইসলামের যে বিষয়কে তাদের চিন্তানুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য করেনি নিজস্ব-চিন্তার আলোকে এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে এবং মৌলিক ইসলামি আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এরূপ সম্প্রদায় মৌলিকভাবে ছয়টি/ সাতটি– ১. জাবরিয়া, ২. কাদরিয়া, ৩. রাফেযী, ৪. খারেজী, ৫. মুশাব্বিহা, ৬. মুআত্তিলা ও ৭. মু'তাযিলা। এ সম্প্রদায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে। ফলে তাদের শাখাগত দলসমূহের সংখ্যা সর্বমোট বাহাত্তরটি। তাদের বাইরে রয়েছে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও দীনদার সম্প্রদায়ের জামাআত যাদেরকে সংক্ষেপে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়। উপরিউক্ত বাহাত্তর দল সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর মন্তব্য হলো– كُلُّهُمْ فِى النَّارِ তারা সকলেই জাহান্নামি। সে দলগুলোর আকিদা ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইলমুল কালামে উল্লিখিত আছে।

এখানে তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, [ফকীহগণের মতে] তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তবে তাদের মধ্যে চরমপন্থি নিকৃষ্ট দল খাত্তাবী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। খাত্তাবী সম্প্রদায়ের আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

উপরে অন্যান্য বিদ'আতি সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে যে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে তা আহনাফের মতানুসারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুযায়ী বিদ'আতিদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। তাঁর দলিল হলো, তাদের আকিদা নিকৃষ্টতম ফিসক। অন্য ফিসকের জন্যে যদি সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এ ফিসকের জন্যেও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে।

তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে আমাদের দলিল হলো, ফিরাকে বাতেলার ফিসক হলো আকিদাগত। তবে তারা যে আকিদা পোষণ করে তা একান্ত সত্য মনে করেই করে। ফলে তাদের আকিদা তাদের ধারণানুযায়ী দীন ও দীনি বিশ্বাস। তাদের আকিদা বর্জন করা তাদের বিশ্বাসানুযায়ী বদদীনি। যে ব্যক্তি দীনদার হয় সে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং উক্ত বিদ'আতপন্থি ও গোমরাহি আকিদা পোষণকারী ব্যক্তি জীবনে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে– সে সাক্ষ্য ইত্যাদি ব্যাপারে মিথ্যা বলবে এটা ভাবা উচিত নয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সারকথা হলো বিদ'আতপন্থি লোকের সাক্ষ্য আহনাফের মতানুযায়ী সঠিক।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَنْ يَشْرَبُ الْمُثَلَّثَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিদ'আতপন্থি লোকের সাক্ষ্য যেন ঐ হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তির মতো যে. মুছাল্লাছ অর্থাৎ জ্বাল দিয়ে তিনভাগের একভাগ শুকানো নবীযকে হালাল মনে করে পান করল কিংবা ঐ শাফেয়ী মতাবলম্বী ব্যক্তির ন্যায় যে হালাল মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে জবাইকৃত পশুর গোশত খায়।

বি. দ্র. উল্লেখ্য যে, যেসব বিদ'আতপন্থি লোকদের তাদের আকিদার কারণে ওলামায়ে কেরাম কাফের সাব্যস্ত করেছেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে দুররে মুখতারের ইবারত এই–

أَصْحَابُ الْبِدَعِ لَا تُكَفَّرُ كَجَبْرٍ وَقَدْرٍ وَ رَوْفَضٍ وَخُرُوجٍ وَتَشْبِيهٍ وَتَعْطِيلٍ .

অর্থাৎ বিদ'আতপন্থি লোক যাদের কাফের সাব্যস্ত করা হয়নি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য যারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছেন যেমন– জবরিয়া, কাদরিয়া, রাফেযী, খারেজী, মুশাব্বিহা ও মু'আত্তিলা- তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মূল ইবারতের أَهْلَ الْأَهْوَاءِ দ্বারা এরা উদ্দেশ্য নয়।

মোটকথা, আকিদাগত বিশ্বাসের কারণে যাদের কাফের সাব্যস্ত করা হয় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন।

قَوْلُهُ الْخَطَّابِيَّةُ أَنَّ الخ : তবে খাত্তাবী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। খাত্তাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের তিনটি মত পাওয়া যায়–

প্রথম মত : তারা রাফেযীদের একটি চরমপন্থি গ্রুপ। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবুল খাত্তাব মুহাম্মদ ইবনে আজদা'। সে কুফায় বাস করত- সে হযরত আলী (রা.)-কে বড় খোদা (إِلٰهُ أَكْبَرُ) বলত, আর হযরত জা'ফর সাদেক (র.)-কে ইলাহে আসগার বা ছোট খোদা বলত। যখন তাকে হযরত জা'ফর সাদেক (র.)-এর দরবারে হাজির করা হয় তিনি তাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করেন। তারপর থেকে সে নিজেকেই ইলাহ ঘোষণা দেয়। তখন তার মুরিদগণ হযরত জা'ফর সাদেক (র.)-কে ইলাহ এবং তাকে ইলাহে আকবর সাব্যস্ত করে। হযরত ঈসা ইবনে মূসা ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর হযরত ঈসা তাকে শূলীতে চড়িয়ে জনগণের সামনে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয় মত : খাত্তাবী সম্প্রদায়ের একটি আকিদা এই ছিল যে, যদি তাদের দলের কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোনো কিছু দাবি করে তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে দলের অন্যান্য লোকদের সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব। এমনকি সে ব্যক্তি যদি তার দাবির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয় তবুও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া অন্যদের জন্যে ওয়াজিব।

তৃতীয় মত : তাদের বিশ্বাস এই যে, যদি তাদের সামনে কোনো ব্যক্তি শপথ করে তাহলে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া তারা জায়েজ মনে করে।

উপরিউক্ত তিন মতের যে কোনো একটি মতের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। কেননা প্রথম মতানুসারে এ সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কাফের। আর কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানের বিপক্ষে অগ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন তারা তাদের দলের লোকদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকে ওয়াজিব মনে করে চাই তার দলের লোকের সাক্ষ্য সত্য হোক কিংবা মিথ্যা। অথবা যে ব্যক্তি তাদের সামনে শপথ করবে তাদের জন্যে সাক্ষ্যকে জায়েজ মনে করে চাই সে ব্যক্তি তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হোক না কেন। মোটকথা, তাদের সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে মিথ্যার সম্ভাবনা বিদ্যমান তাই তাদের সাক্ষ্য শরিয়তে অগ্রহণযোগ্য।

قَالَ : وَتَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيْ خَبَرِهِ وَلِهٰذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارٰى بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلٰى نَفْسِهِ وَعَلٰى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلٰى جِنْسِهِ وَالْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الْاِعْتِقَادِ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ مَا يَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِيْنِهِ وَالْكِذْبُ مَحْظُوْرُ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَتَقَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَغِيْظُهُ قَهْرَهُ إِيَّاهُ وَمِلَلُ الْكُفْرِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَلَا قَهْرَ فَلَا يَحْمِلُهُمُ الْغَيْظُ عَلَى التَّقَوُّلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিম্মিদের সাক্ষ্য পরস্পরের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য। যদিও তাদের মাঝে ধর্মের ভিন্নতা থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জিম্মি ফাসিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন, কাফেররাই ফাসিক। সুতরাং তাদের সংবাদ গ্রহণের ব্যাপারে বিরত থাকা আবশ্যক। এজন্যই মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং জিম্মি মুরতাদের মতো হলো। আমাদের দলিল এই যে, রাসূল ﷺ খ্রিস্টানদের একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্যকে অনুমোদন দিয়েছেন। তাছাড়া জিম্মির তার নিজের উপর ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদের সমগোত্রীয়দের ব্যাপারে তারা সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। আর আকিদাগত ফিসক সাক্ষ্যদানের জন্য বাধা নয়। কেননা সে তার ধর্মে যা হারাম বলে বিশ্বাস করে তা থেকে বিরত থাকবে। আর মিথ্যা তো সব ধর্মেই নিষিদ্ধ। মুরতাদের বিষয়টি এমন নয়। কেননা তার তো কোনো কর্তৃত্ব নেই, এবং জিম্মির মুসলমানের বিপক্ষে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি এমন নয়। কেননা মুসলমানের সামনে তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। অধিকন্তু সে মুসলমানের বিপক্ষে মিথ্যা বলতে পারে। কেননা মুসলমানের আধিপত্যের কারণে সে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আর কুফুরের বিভিন্ন ধর্মমত পরস্পরের উপর [মুসলিম রাষ্ট্রে] আধিপত্য রাখে না। সুতরাং তাদের বিদ্বেষ মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিম্মিদের সাক্ষ্য অন্য জিম্মির বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব বিধর্মী কর দিয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে থাকে তাদের জিম্মি বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, জিম্মিদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী যদি থাকে, যেমন– কেউ ইহুদি, কেউ খ্রিস্টান ইত্যাদি তবুও তাদের একজনের বিপক্ষে অপরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এটা আহনাফের ইমামগণের অভিমত।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁদের মতে এদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাই নেই। কেননা, তারা ফাসিক। ফলে তাদের পরস্পরের বিপক্ষে সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন তাদের সাক্ষ্য মুসলমানদের

বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমামদ্বয় জিম্মিদেরকে মুরতাদের সাথে তুলনা করেন। তারা বলেন, মুরতাদের যেমন ইসলাম থেকে খারেজ হওয়ার কারণে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা নেই তদ্রূপ জিম্মিগণ ইসলামে প্রবেশ না করার কারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে তারা কুরআন মাজীদের আয়াত পেশ করেন– وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'আর কাফেররাই জালেম।' আর জালেম ফাসিক হয়ে থাকে। আর ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআনের অন্যস্থানে সতর্ক করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا -"হে মু'মিনগণ যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ দেয় তাহলে এর ব্যাপারে পরীক্ষা ও যাচাই কর।"

সুতরাং কোনো ফাসিকের সংবাদ কিংবা সাক্ষ্য যাচাই করা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়। কাফের যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের ফাসিক তাই কাফেরের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।

বি. দ্র. হিদায়ার অধিকাংশ অনুলিপিতে কুরআন মাজীদের আয়াতরূপে وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ লেখা আছে। কুরআন মাজীদের আয়াত হলো– وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ হিদায়ার প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) আলোচ্য বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখানে অনুলিপিতে সামান্য ক্রটি হয়েছে। মূলে ইবারত এরূপ ছিল– قَالَ تَعَالٰى لِلْكَافِرِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্যে বলেছেন– هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'তারা ফাসিক।' তারা ফাসিক এজন্য যে, কুরআন মাজীদে কাফেরদের ظَالِم বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'আর যে জালিম হয় সে ফাসিক হয়।' সুতরাং কাফের হলো ফাসিক।

আহনাফের দলিল : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارٰى بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ 'রাসূল ﷺ নাসারাদের কতকের বিপক্ষে কতকের সাক্ষ্যকে অনুমোদন দিয়েছেন।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিম্মিদের বিপক্ষে জিম্মিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এ দলিলের উপর দু'ধরনের আপত্তি রয়েছে– ১. এ শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না। ২. এ হাদীসের দ্বারা আহনাফের দাবি বা বক্তব্য প্রমাণিত হয় না। কেননা আহনাফের বক্তব্য হলো, জিম্মিরা পরস্পরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলেও তাদের একজনের সাক্ষ্য অপরের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। অথচ উল্লিখিত দলিলে বলা হলো যে, নাসারাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সাক্ষ্যদাতা নাসারা আর যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে ইহুদি হলে সেক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এরূপ কোনো বক্তব্য দলিলে নেই।

যদি মুসান্নিফ (র.) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ -এর স্থলে نَصَارٰى উল্লেখ করতেন এভাবে যে, أَهْلَ الْكِتَابِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ আহলে কিতাবের সাক্ষ্য পরস্পরের বিপক্ষে অনুমোদন দিয়েছেন, তাহলে তার দাবি ও রেওয়ায়েত নিম্নোক্ত সনদে উদ্ধৃত আছে–

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ .

আহনাফের দ্বিতীয় দলিল হলো যুক্তি। আর তা এই যে, কাফেরের তার নিজ সত্তার উপর এবং নাবালেগ সন্তানের উপর কর্তৃত্ব আছে। শাহাদাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, যার কর্তৃত (وِلَايَةٌ) আছে তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা অর্জিত হয়। সে হিসেবে কাফের أَهْلُ شَهَادَةٍ তথা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য সাব্যস্ত হবে। অবশ্য কাফেরের সাক্ষ্য তার সমগোত্রীয় লোকদের বিপক্ষে যদিও গ্রহণযোগ্য; কিন্তু কোনো মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হলো, কুরআন মাজীদের বিধান হলো কোনো মুসলমানের বিপক্ষে কোনো কাফেরের কোনোরূপ কর্তৃত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا 'মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর কাফেরদের কোনোরূপ কর্তৃত্বের পথ কখনো দেবেন না।' মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সাক্ষ্য যেহেতু একপ্রকার কর্তৃত্ব তাই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাক্ষ্যকে মুসলমানদের বিপক্ষে অকার্যকর ঘোষণা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর জবাব : ইমামদ্বয় কাফেরের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে তাদের ফাসিক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আহনাফের বক্তব্য এই যে, তাদের ফাসিক হওয়ার বিষয়টি তাদের আকিদা ও বিশ্বাসগত। আর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, বিশ্বাস ও আকিদাগত ফিসক সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং কাফেরের আকিদাগত ফিসক সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে বাধা হবে না।

তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূল কারণ এই যে, মানুষ যে বিষয়কে তার ধর্মনুসারে হারাম ও নিষিদ্ধ মনে করে তা থেকে তারা আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আর মিথ্যা যেহেতু পৃথিবীর সকল ধর্মে হারাম ও নিষিদ্ধ তাই ধর্মনুসারী কাফেরের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের পক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যেমন মুরতাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ কিয়াসের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কাফেরকে মুরতাদের উপর কিয়াস করা উচিত নয়। কারণ, মুরতাদের নিজের উপরই কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং তার নাবালেগ সন্তানের উপরও কোনো কর্তৃত্ব নেই। যেহেতু মুরতাদের নিজের উপর ও তার নাবালেগ সন্তানের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তাই সে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে অন্যের উপর কোনো কর্তৃত্ব জাহির করতে পারবে না। মোটকথা, যেহেতু মুরতাদের কোনোরূপ কর্তৃত্ব [ওলায়াত] নেই, তাই তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সাব্যস্ত হবে না। কারণ, সাক্ষ্যদানের জন্যে ওলায়াত আবশ্যিক শর্ত।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ شَهَادَةِ الذِّمِّيِّ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। তাঁর জবাবের সারকথা এই যে, জিম্মির সাক্ষ্য মুসলমানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, জিম্মির তার নিজের ও নাবালেগ সন্তানের উপর যদিও ওলায়াত আছে; কিন্তু মুসলমানের উপর তার ওলায়াত নেই। কেননা জিম্মি কাফের, আর কোনো মুসলমানের উপর কোনো কাফেরের কোনো প্রকার ওলায়াত নেই তা ইতঃপূর্বে আমরা দলিলসহ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, কাফের [জিম্মি] মুসলমানের সাথে তার ধর্মীয় সংঘাতের কারণে মুসলমানের ক্ষতিসাধনের সুযোগ থাকে। তাছাড়া মুসলমানদের অধীনতার কারণে তাদের মাঝে একপ্রকার ক্ষোভ বিদ্যমান থাকে তাই সে তার ক্ষোভ ও মানসিক যন্ত্রণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলমানের বিপক্ষে অপবাদ আরোপ করে। সুতরাং যদি মুসলমানের বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সে অপবাদ আরোপের চেষ্টা চালাবে। এ কারণে শরিয়ত কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানের বিপক্ষে গ্রহণ করেনি।

পক্ষান্তরে যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদের পরস্পরের মাঝে ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকলেও তাদের একদল অন্যদলের উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না ফলে তাদের পরস্পরের মাঝে কোনো ক্ষোভ থাকে না তাই তাদের একদল অন্যদলের বিপক্ষে অপবাদ আরোপ করবে এমন সম্ভাবনা কম। আর এজন্যই একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ মাসআলায় ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর একটি ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, যদি সাক্ষ্যদাতা এবং যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তারা উভয়ে এক ধর্মের অনুসারী হয় যেমন উভয়ে ইহুদি কিংবা উভয়ে খ্রিস্টান তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। তিনি এ মতের পক্ষে একটি হাদীস দ্বারা দলিল দেন। তা এই যে,

لَا شَهَادَةَ لِأَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَشَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِلَلِ .

অর্থাৎ "এক ধর্মের অনুসারীর বিপক্ষে অন্য ধর্মানুসারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তবে মুসলমানদের সাক্ষ্য সব ধর্মাবলম্বীদের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য।"

ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ হাদীসের বক্তব্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের বিপক্ষে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 'আর কাফেররা পরস্পর বন্ধু।' এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কাফেরদের পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সুতরাং তাদের মাঝের এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের ওলায়াত হাসিল হবে। পক্ষান্তরে হাদীসের দ্বারা এর উল্টো বুঝা যায়। যেহেতু আয়াত ও হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, তাই আয়াতের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে এবং হাদীসকে এ স্থানে আমলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করা হবে না।

قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ أَرَادَ بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ الْمُسْتَأْمَنَ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَهُوَ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হারবী কাফেরের সাক্ষ্য জিম্মি কাফেরের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। [মুসান্নিফ (র.) বলেন,] ইমাম কুদূরী (র.) হারবী দ্বারা মুসলিম দেশে নিরাপত্তা নিয়ে আগত হারবীকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য সব বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, হারবীর জিম্মির উপর ওলায়াত নেই। কেননা জিম্মি আমাদের [মুসলমান অধ্যুষিত] রাষ্ট্রের বাসিন্দা। সুতরাং তার অবস্থা হারবী থেকে উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিম্মির বিরুদ্ধে হারবীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, কাফের রাষ্ট্রে বসবাসরত কাফেরকে হারবী বলা হয়। কেননা ইসলামি পরিভাষায় কাফের অধ্যুষিত রাষ্ট্রকে দারুল হারব বা শত্রু কবলিত রাষ্ট্র বলা হয়। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের ব্যাখ্যায় হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) হারবী দ্বারা এখানে কাফের রাষ্ট্রে বসবাসরত কাফেরকে বুঝাননি; বরং তিনি মুসলিম রাষ্ট্রে ভিসা তথা নিরাপত্তা নিয়ে আগত হারবীকে এখানে উদ্দেশ্য করেছেন। তবে যেহেতু ইমাম কুদূরী (র.) সত্যিকারভাবে নিরাপত্তা নিয়ে আগত ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করেছেন কিনা তা হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) জানতেন না, তাই তিনি وَاللّٰهُ أَعْلَمُ বলে আল্লাহর সাহায্য নিয়েছেন।

হারবীর সাক্ষ্য জিম্মির বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার যুক্তি এই যে, জিম্মির উপর হারবীর ওলায়াত [কর্তৃত্ব] নেই। কেননা হারবী দারুল হারবের অধিবাসী আর জিম্মি দারুল ইসলাম তথা ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী। ফিকহের নিয়মানুযায়ী اِخْتِلَافُ دَارَيْن বা দেশের ভিন্নতা পাওয়া যাওয়া অবস্থায় ওলায়াত [কর্তৃত্ব] থাকে না। অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী এবং কাফের রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির একজনের উপর অন্যের ওলায়াত নেই।

উপরের বর্ণনানুযায়ী যেহেতু ভিসা নিয়ে আগত হারবীর ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী জিম্মির উপর কর্তৃত্ব নেই তাই হারবীর সাক্ষ্য জিম্মির বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না।

জিম্মির বিপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার অন্য আরেকটি কারণ হলো, জিম্মির অবস্থা হারবীর চেয়ে উত্তম। কেননা, জিম্মির সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ট এবং তারা মুসলমানদের সাথে সহ-অবস্থানকারী। তাদের এ ঘনিষ্টতার কারণ হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের আমির তাদের কর [জিজিয়া] গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে মুসলমানদের সাথে সহ-অবস্থানের সুযোগ দিয়েছেন এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছেন। এমনকি কোনো মুসলমান যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের কাউকে হত্যা করে তাহলে সে হত্যার কিসাস হিসেবে মুসলমানকে হত্যা করা হবে; কিন্তু কোনো মুসলমান যদি কোনো হারবীকে হত্যা করে তাহলে এর বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা হয় না। মোটকথা, উল্লিখিত বিষয়গুলোর কারণে জিম্মির অবস্থা হারবীর মর্যাদা থেকে অনেক বেশি। যেহেতু হারবীর চেয়ে জিম্মির মান ও অবস্থা অনেক ভালো তাই জিম্মির বিপক্ষে হারবীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

বি. দ্র. হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) হারবী দ্বারা মুসতামান বা নিরাপত্তা নিয়ে আগত হারবী উদ্দেশ্য করেছেন এবং এটাকে ইমাম কুদূরীর উদ্দেশ্য বলে ব্যক্ত করেছেন। কেননা, মুসতামান ছাড়া অন্য হারবীর সাক্ষ্যদানের সুযোগ নেই। কারণ, সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে বিচারক [কাযী]-এর মজলিস হওয়া জরুরি। আর বিচারকার্য তথা قَضَاءٌ -এর জন্যে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। সুতরাং দারুল হারবে অবস্থানরত হারবীর পক্ষে উক্ত শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়– তাকে কাযীর মজলিসে সাক্ষ্য দিতে হলে অবশ্যই ইসলামি রাষ্ট্রে আসতে হবে। আর ইসলামি রাষ্ট্রে আসতে হলে প্রথমে ভিসা গ্রহণ করতে হবে। আর যখন কোনো হারবী ইসলামি রাষ্ট্রে আসার জন্যে ভিসা গ্রহণ করবে সেই মুসতামান বলে গণ্য হবে।

আর যদি কোনো হারবী ভিসা না নিয়ে ইসলামি হুকুমতে প্রবেশ করে বিচারকের মজলিসে হাজির হয়ে যায় তাহলে সে গোলাম সাব্যস্ত হবে। আর গোলামের সাক্ষ্য যেহেতু কারো বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় তাই সে অবস্থাতেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الذِّمِّيِّ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوْا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ دَارَيْنِ كَالرُّوْمِ وَالتُّرْكِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ إِخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ يَقْطَعُ الْوِلَايَةَ وَلِهٰذَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ ـ

অনুবাদ : তবে হারবীর বিপক্ষে জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যেমন কোনো মুসলমানের সাক্ষ্য তার ও জিম্মির বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। আর নিরাপত্তা নিয়ে আগত হারবীদের একজনের সাক্ষ্য অন্যজনের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য যদি তারা সকলে একদেশের অধিবাসী হয়। আর যদি দু-দেশের হয় যেমন একজন রোমের অধিবাসী আর অন্যজন তুর্কের অধিবাসী তাহলে একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা দেশের ভিন্নতা ওলায়াতকে বাতিল করে দেয়। আর এজন্যই দু-দেশের অধিবাসীদের মাঝে উত্তরাধিকার বণ্টন হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ الخ : উপরের ইবারতে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে–

১. হারবীর বিপক্ষে জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা মুসলমানদের সাথে জিম্মির নৈকট্যের কারণে হারবীর চেয়ে জিম্মির অবস্থা ও মর্যাদা উত্তম এবং হারবীর অবস্থা তার চেয়ে নিম্নমানের। একই কারণে মুসলমানের সাক্ষ্য হারবী ও জিম্মির বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

২. যদি কাফের রাষ্ট্রের কতিপয় কাফের সদস্য ভিসা/নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামি হুকুমতের মধ্যে আসে। অতঃপর তাদের মাঝে কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তারা বাদী-বিবাদী উভয়ে একদেশের অধিবাসী হতে হবে। তারা যদি দুজন দু'দেশের অধিবাসী হয় যেমন একজন নেপালের অধিবাসী আর অন্যজন ভারতের অধিবাসী তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) দুজন হারবীর দেশ ভিন্ন হওয়ার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হলো একজন তুরস্কের অন্যজন রোমের [যা এক সময় বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। এর অধীনের এলাকাগুলো এখন বিভিন্ন রাষ্ট্র]। এর মধ্যে কতক দেশ মুসলিম অধ্যুষিতও আছে যেমন– সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি। মোটকথা হারবীর দেশের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলো বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্র তাই আমরা ভারত ও নেপালের উদাহরণ দিয়েছি।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ : মুসান্নিফ (র.) إِخْتِلَافُ دَارَيْنِ যে ওলায়াতকে বাতিল করে দেয় এর আরেকটি নজির পেশ করেছেন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, ভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণে যেমন একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না তদ্রূপ ভিন্ন দেশের অধিবাসী হলে ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয় থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। মোটকথা, একদেশের কাফের অধিবাসীর সাক্ষ্য অন্যদেশের কাফেরের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلَا كَذٰلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالرَّجُلُ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ هٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ إِذْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ تَوَقِّي الْكَبَائِرِ كُلِّهَا .

অনুবাদ : জিম্মির সাক্ষ্য এর ব্যতিক্রম। কেননা সে আমাদের [মুসলিমদের] দেশেরই অধিবাসী। মুসতামানের বিষয়টি এমন নয়। [কোনো ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণ না হওয়া সম্পর্কে] ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো লোকের গুনাহের চেয়ে নেকি বেশি হয় এবং সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যদিও সে কোনো ছোট [সগীরা] গুনাহে লিপ্ত হয়। ন্যায়পরায়ণ হওয়ার সংজ্ঞার ব্যাপারে এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা তার যাবতীয় কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ الخ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উপর যে প্রশ্নটি আরোপিত হয় তা হলো আপনি বলেছেন, একদেশের কাফেরের বিপক্ষে অন্যদেশের কাফেরের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। সে হিসেবে জিম্মি কাফেরের সাক্ষ্য মুসতামান বা নিরাপত্তা নিয়ে আগত ভিনদেশের কাফেরের বিপক্ষেও অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কেননা এখানেও তো اِخْتِلَافُ دَارَيْنِ পাওয়া গিয়েছে। অথচ মুসতামানের বিপক্ষে জিম্মির সাক্ষ্য আপনারা গ্রহণ করে থাকেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু জিম্মি দারুল ইসলাম বা ইসলামি রাষ্ট্রে থাকে তাই তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। উক্ত মর্যাদা বলে সে মুসলমানের মতো وِلَايَةٌ عَامَّةٌ বা সর্বজনীন ওলায়াতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ মুসলমানের সাক্ষ্য যেরূপ দেশী-বিদেশী সকলের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ জিম্মির সাক্ষ্যও সকলের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য। তবে তার ওলায়াতে আম্মাহর অর্থ এই নয় যে, তার সাক্ষ্য মুসলমানদের বিপক্ষেও গ্রহণযোগ্য। কেননা তাদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ভিন্ন দলিল আছে, যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হলো আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন– وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

আর হারবী মুসতামানের ব্যাপারে যেহেতু এরূপ কোনো দলিল নেই তাই তার বিপক্ষে জিম্মি কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হারবী মুসতামান তো বর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থান করছে। সুতরাং তারও তো জিম্মির মতো ওলায়াত থাকা উচিত। অথচ তার তো কোনো ওলায়াত নেই, এর উত্তর হলো। হারবি ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষণস্থায়ী/অস্থায়ীভাবে থাকে। তার এ সামান্য অবস্থানের দ্বারা সে জিম্মির অনুরূপ মর্যাদা লাভ করবে না।

প্রকাশ থাকে যে, জিম্মিরা যদি বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হয়; কিন্তু তারা বর্তমানে কোনো মুসলিম দেশে অবস্থান করছে তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্য অপরের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের জিম্মি হওয়ার পূর্বের দেশের ভিন্নতা জিম্মি হওয়ার পরের অবস্থার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ, বর্তমানে তারা মুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। অর্থাৎ যেহেতু তারা বর্তমানে একদেশের অধিবাসী তাই তাদের একজনের সাক্ষ্য অন্যের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে সে ন্যায়পরায়ণতার শর্তারোপ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। ইবারতে বলা হয়েছে যে, عَدَالَةٌ বা ন্যায়পরায়ণতার নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ সংজ্ঞা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তির মন্দ ও গুনাহের কাজের চেয়ে নেক ও ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ভালো কাজ বেশি হওয়া ও মন্দ কাজ কম হওয়ার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, কোনো লোক যদি ফরজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে, কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং اِصْرَارٌ عَلَى الصَّغَائِرِ অর্থাৎ কোনো সগীরা গুনাহ বারবার না করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে সব গুনাহ থেকে সব সময় বেঁচে থাকার শর্ত নেই; বরং যদি কোনো সময় সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাতে তার ন্যায়পরায়ণতা বাতিল হবে না। তবে তাকে অবশ্যই কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সব গুনাহে সগীরা থেকে বেঁচে থাকার শর্ত এজন্য করা হয়নি যে, যদি এরূপ শর্ত করা হতো যে, কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে সব সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে তাহলে সাক্ষ্য দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত। কারণ, বর্তমান যুগে কয়জন লোক এমন পাওয়া যাবে যে তারা সব সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে? এরূপ লোক পাওয়াও যাবে না তাহলে সাক্ষ্য দেওয়াও হবে না। ফলে মানুষের দৈনন্দিন লেনদেন, মামলা-মকাদ্দমা বন্ধ ও স্থবির হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। অথচ সাক্ষ্য প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের হকসমূহের বাস্তবায়ন মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্যে অতীব জরুরি। আর তাই শরিয়ত সগীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মু'মিন সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ন্যায়পরায়ণ থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

তাছাড়া নবীগণের পর এমন কোনো লোক কি পাওয়া সম্ভব? যে সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয় না। সুতরাং মানুষের অধিকার ও হক প্রতিষ্ঠার জন্যে সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যও শরিয়তে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হবে।

وَبَعْدَ ذٰلِكَ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرْنَا فَامَّا الْاِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشْرُوْطَةُ فَلَا يُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْمَشْرُوْعَةُ لِاَنَّ فِىْ اعْتِبَارِ اجْتِنَابِهِ الْكُلَّ سَدَّ بَابِهِ وَهُوَ مَفْتُوْحٌ اِحْيَاءً لِلْحُقُوْقِ . قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَقْلَفِ لِاَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ اِلَّا اِذَا تَرَكَهُ اِسْتِخْفَافًا بِالدِّيْنِ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِهٰذَا الصَّنِيْعِ عَدْلًا قَالَ : وَالْخَصِىُّ فَاِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِىِّ وَلِاَنَّهُ قُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ ظُلْمًا فَصَارَ كَمَا اِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ .

অনুবাদ : এরপর সগীরা ও ছোট গুনাহের ব্যাপারে ধর্তব্য হলো প্রবলতা যা আমরা উল্লেখ করলাম। সগীরা গুনাহে লিপ্ততা দ্বারা শর্তকৃত ন্যায়পরায়ণতা দোষযুক্ত হয় না। সুতরাং শরিয়ত অনুমোদিত সাক্ষ্য এর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় না। তাছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শর্ত করা মূলত সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রকে বন্ধ করার নামান্তর। অথচ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়কে শরিয়ত উন্মোচিত করেছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খতনাবিহীন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা [খতনা না করা] এটা ন্যায়পরায়ণতার জন্যে ক্ষতিকর নয়। তবে যদি কেউ খতনাকে ধর্মীয় বিধানের প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্জন করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তখন এরূপ কাজ করার পর সে ন্যায়পরায়ণ থাকতে পারে না। তিনি বলেন, এবং নপুংসকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা হযরত ওমর (রা.) আলকামা (র.)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যিনি নপুংসক ছিলেন। কেননা এরূপ ব্যক্তির অঙ্গ জোরপূর্বক কেটে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হলো যার হাত কর্তন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَقْلَفِ الخ : চলমান ইবারতে খতনাবিহীন এবং নপুংসক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। اَقْلَفُ শব্দের অর্থ– এমন ব্যক্তি যার এখনো খতনা করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতানুযায়ী খতনা করা সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতানুযায়ী খতনা করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফ (র.) খতনা করার জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হলো, কোনো কিছুর মেয়াদ নির্ধারিত হয় শরিয়তের নির্দেশের দ্বারা। যেহেতু এ ব্যাপারে শরিয়তের কোনো বিধান নেই, তাই এর মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সমীচীন নয়।

অবশ্য আহনাফের উত্তরাসূরিগণ এ ব্যাপারে মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। তাদের কারো কারো মতে সাত বছর থেকে দশ বছর সময়ের মধ্যে খতনা করতে হবে। কোনো কোনো ফকীহ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, জন্মের সপ্তম দিন কিংবা তারপর যে কোনো সময়ের মধ্যে খতনা করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলিল দেন যে, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-কে সপ্তম দিনে খতনা করানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, তাদের বর্ণিত এ দলিলকে মুহাদ্দিসীন "সায" বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

কোনো কোনো ফকীহ জন্মের দশম বছরকে খতনার সময় সাব্যস্ত করেছেন।

মোটকথা, ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খতনাবিহীন লোকের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য। কারণ, আমাদের মতে খতনা করা সুন্নত। আর সুন্নত বর্জন করার কারণে কারো আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা বাতিল হয় না। সুতরাং খতনা না হওয়ার কারণে কারো ন্যায়পরায়ণতা বাতিল হবে না।

অবশ্য কোনো আল্লাহর বান্দা যদি খতনা সম্পর্কিত শরিয়তের বিধানকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং এর সমালোচনা ইত্যাদি করে খতনা বর্জন করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কারণ, শরিয়তের কোনো বিধানের প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা মুসলমানের আদালত নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়; বরং কোনো কোনো উক্ত অবজ্ঞাকারী কাফেরও হয়ে যায়।

মোটকথা, কোনো ব্যক্তি যদি অবজ্ঞা কিংবা তাচ্ছিল্যের কারণে খতনা না করে তাহলে তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। আর যদি কোনো ব্যক্তি সমস্যার কারণে খতনা না করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْخَصِيُّ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নপুংসকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। خَصِي বলা হয় এমন ব্যক্তি বা পুরুষ প্রাণীকে যার অণ্ডকোষ কেটে নেওয়া হয়েছে কিংবা অণ্ডকোষের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরূপ খাসি করা পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.) হযরত কুদামা ইবনে মাযউনের বিপক্ষে আলকামা (র.)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। অথচ আলকামা নপুংসক ছিলেন। হযরত কুদামা ইবনে মাযউন (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.)-এর মামা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে এক পর্যায়ে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি উক্ত পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন।

তার ব্যাপারে আলকামার সাক্ষ্যগ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ– আব্দুল কাইস ইবনুল বাহরাইনের নেতা জারুদ কুদামা ইবনে মাযউন (রা.)-এর বিপক্ষে মদপানের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কি কেউ সাক্ষ্য দেবে? তখন আলকামা নপুংসকও তাঁর বিপক্ষে এ সাক্ষ্য দেন যে, হ্যাঁ আমিও তাঁকে মদ পান করতে দেখেছি। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাঁর মদপানের শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করেন।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হলো, নপুংসকের বিশেষ অঙ্গ জুলুম করে কেটে ফেলা বা নষ্ট করে দেওয়া হয়। সুতরাং যেন তার হাত/পা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। আর এ কথা সকলের কাছে স্বীকৃত যে, কোনো ব্যক্তির হাত/পা কর্তিত থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। হাত/পা কর্তিত হওয়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয় না। তদ্রূপ অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়াও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না।

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার অণ্ডকোষ ফেলে দেয় কিংবা বর্তমান যুগে যেমন কাউকে স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে দেখা যায় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَالَ : وَوَلَدُ الزِّنَاءِ لِأَنَّ فِسْقَ الْأَبَوَيْنِ لَا يُوجِبُ فِسْقَ الْوَلَدِ كَكُفْرِهِمَا وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا تُقْبَلُ فِي الزِّنَاءِ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ كَمِثْلِهِ فَيُتَّهَمُ قُلْنَا الْعَدْلُ لَا يَخْتَارُ ذٰلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ وَالْكَلَامُ فِي الْعَدْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ব্যভিচারের [জারজ] সন্তানের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। কেননা [তার] পিতামাতার পাপাচার সন্তানের পাপাচারকে আবশ্যক করে না। যেমন, পিতামাতা কাফের হওয়া সত্ত্বেও সন্তান মুসলমান হতে পারে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, ব্যভিচারের ব্যাপারে জারজ সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। [তাঁর যুক্তি হলো] কেননা তার মতো অন্যরাও হোক, এটা সে কামনা করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে সে অভিযুক্ত হতে পারে। [তাঁর উত্তরে] আমরা বলব যে, নীতিবান লোক এটা চাইবে না এবং এরূপ কাজ পছন্দও করবে না। আর আমাদের আলোচনা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَوَلَدُ الزِّنَاءِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জারজ বা হারাম সন্তানের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে মুসান্নিফ (র.)-এর দলিল এই যে, ব্যভিচার একটি মারাত্মক গুনাহ। এ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ব্যভিচারের ফলে তার ন্যায়পরায়ণতা বাতিল হয়ে যায়। তবে ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানটির তো কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ তার পিতামাতার। তাদের অপরাধ বা পাপাচারের কারণে সন্তানকে তো শাস্তি দেওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত সন্তানের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য। যেমন কোনো সন্তানের পিতামাতা যদি কাফের হয়; কিন্তু সন্তান ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। পিতামাতার অমুসলিম হওয়া তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয় না। তদ্রূপ পিতামাতা ব্যভিচারী হলেও সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত এই যে, জারজ সন্তানের সাক্ষ্য সব ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হলেও ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর যুক্তি এই যে, উক্ত ব্যক্তি ব্যভিচার প্রমাণের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিবান নাও থাকতে পারে। যেহেতু সে জারজ সন্তান তাই সে অন্য আরেকজন জারজ হোক এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ব্যভিচার না হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিতে পারে। যেহেতু এ ব্যাপারে সে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় তাই তার সাক্ষ্য শরিয়তে অন্য সব ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হলেও ব্যভিচারের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক (র.)-এর উক্ত মত ও যুক্তির জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপ সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া সাক্ষ্যদানের জন্যে সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। অনীতিবান মানুষের সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কোনো ব্যক্তি নীতিবান হয় তাহলে সে এরূপ অনৈতিক কাজ করবে না, সে কখনো অন্যায় সাক্ষ্য দেবে না যে, সেও আমার মতো জারজ হোক; বরং সে এরূপ কাজ পছন্দও করবে না। আর যদি সে এরূপ কাজ করে তাহলে তো আদেলই নয়। আর অন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য শরিয়তে অগ্রাহ্য।

قَالَ : وَشَهَادَةُ الْخُنْثٰى جَائِزَةٌ لِاَنَّهُ رَجُلٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ وَشَهَادَةُ الْجِنْسَيْنِ مَقْبُوْلَةٌ بِالنَّصِّ قَالَ : وَشَهَادَةُ الْعُمَّالِ جَائِزَةٌ وَالْمُرَادُ عُمَّالُ السُّلْطَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ لِاَنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسْقٍ اِلَّا اِذَا كَانُوْا اَعْوَانًا عَلَى الظُّلْمِ وَقِيْلَ الْعَامِلُ اِذَا كَانَ وَجِيْهًا فِى النَّاسِ ذَا مُرُوَّةٍ لَا يُجَازِفُ فِىْ كَلَامِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فِى الْفَاسِقِ لِاَنَّهُ لِوَجَاهَتِهِ لَا يُقْدِمُ عَلَى الْكِذْبِ حِفْظًا لِلْمُرُوَّةِ وَلِمَهَابَتِهِ لَا يَسْتَاْجِرُ عَلَى الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হিজড়ার সাক্ষ্য জায়েজ। কেননা হিজড়া হয় পুরুষ কিংবা সে স্ত্রী। আর নারী ও পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এখানে কর্মচারী দ্বারা রাজকর্মচারী উদ্দেশ্য। এটা অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। কেননা তাদের পেশাগত কাজ ফিসক নয়। তবে যদি তারা অত্যাচারের সহযোগী হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, যদি কোনো রাজকর্মচারী লোকদের মাঝে মর্যাদাসম্পন্ন ও ভদ্র হন এবং কথাবার্তায় মার্জিত বলে গণ্য হন তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যেমন ফাসিকের ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, মর্যাদাসম্পন্ন ফাসিক তার মর্যাদা [ও সামাজিক অবস্থানের] কারণে এবং ভদ্রতার খাতিরে মিথ্যা বলতে এগিয়ে আসে না এবং সম্মানের কারণে কোনো কিছুর বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَشَهَادَةُ الْخُنْثٰى جَائِزَةٌ الخ : উক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে–

প্রথম মাসআলা : হিজড়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়। হিজড়া এমন লোকদের বলা হয় যাদের মাঝে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্মগত আলামত রয়েছে। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে যুক্তি এই যে, হিজড়া হয়তো নারী জাতির অন্তর্ভুক্ত কিংবা সে পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কুরআনে নারী ও পুরুষ উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ আয়াত হলো–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ ـ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী রাখ। আর যদি দুজন পুরুষ সাক্ষ্যদাতা না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলাকে সাক্ষী রাখ। –[সূরা বাকারা : আয়াত– ২৮২]

তবে ওলামায়ে কেরাম হিজড়ার সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, হিজড়ার সাথে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি হিজড়া নারী জাতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে একজন পুরুষের সাথে দুজন মহিলার সাক্ষ্য হলো। আর যদি সে পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য তো হলো, সেই সাথে একজন মহিলার সাক্ষ্য অতিরিক্ত হলো।

ওলামায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কারণ, হিজড়া নারী জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ হদ ও কিসাসের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য; নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা : রাজ-কর্মচারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে عُمَّالٌ শব্দ রয়েছে। عُمَّالٌ শব্দটি عَامِلٌ-এর বহুবচন। عَامِلٌ বলা হয় যে ব্যক্তি নিজ কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সাধারণভাবে খেটে খাওয়া মানুষকে যেমন عَامِلٌ বলা হয় তদ্রূপ যারা সরকার নিযুক্ত কর্মচারী তাদেরও عَامِلٌ বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে عُمَّالٌ দ্বারা সাধারণ কর্মচারী উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো সরকারি কোষাগার সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বিভিন্ন কর ও জাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীবৃন্দ। তারা সাধারণত অত্যাচারী স্বভাবের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, অধিকাংশ মাশায়েখের মতে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে যুক্তি এই যে, তাদের রাজ-কর্মচারী হওয়া বা সরকারি কাজে লিপ্ত হওয়া তো দোষের কিছু নয়। তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে উপার্জন করছে মাত্র। মোটকথা তাদের কর্ম যেহেতু ফিসক নয় তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য যদি তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে জালেমের অংশীদার হয় এবং জুলুম-অত্যাচারের সহযোগী হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্তমান যুগে দেখা যায় যারা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বা আমলা হয় তারা সাধারণ মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচারের স্টিমরোলার চালায়। এসব অত্যাচারী আমলাদের সাক্ষ্য শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় কাজের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে যারা আমেল হয় তারা নির্দোষ এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ইসলামের স্বর্ণযুগে রাসূল ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন সাহাবীদের বিভিন্ন এলাকায় শাসক (عَامِلٌ) নিযুক্ত করেন। আর তাঁরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْعَامِلُ اِذَا كَانَ وَجِيْهًا الخ : কোনো কোনো ফকীহ বলেন, যদি কোনো রাজ-কর্মচারী অত্যাচারের সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের সম্মানিত ও অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য হয় এবং বাজে কথা বলার লোক না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের এ মত "সমাজের সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ফাসিক হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়" –ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের সাথে মিলে যায়।

তাদের যুক্তি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যে গণ্য হয় এবং সমাজে তার বিশেষ মান-মর্যাদা থাকে তাহলে সে মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলতে আগ্রহী হবে না এবং তার অবস্থানগত মর্যাদার কারণে বিক্রি হবে না ও উৎকোচের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। যেহেতু এরূপ ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, কতিপয় ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে, সাধারণভাবে যারা নিজ হাতে উপার্জন করেন এবং কর্মের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের সে মতকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যেই ইমাম কুদূরী (র.) এ মাসআলার অবতারণা করেছেন। কেননা যারা নিজ হাতের উপার্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন তারা তো আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা। তাদের সম্পর্কে হাদীসে রাসূল ﷺ -এ অনেক ফজিলতের কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গে একস্থানে রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ - 'উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর হাবীব।' অন্যস্থানে ইরশাদ হয়েছে– اَفْضَلُ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهٖ অর্থাৎ "আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যে নিজ হাতের উপার্জন খায়।"

قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إِلَى فُلَانٍ وَالْوَصِيُّ يَدَّعِي ذٰلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَصِيُّ لَمْ يَجُزْ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَإِنِ ادَّعَى وَعَلَى هٰذَا إِذَا شَهِدَ الْمُوصَى لَهُمَا بِذٰلِكَ أَوْ غَرِيمَانِ لَهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ أَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ . وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ نَصْبِ الْوَصِيِّ إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مَعْرُوفًا فَيَكْفِي الْقَاضِي بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ مُؤْنَةَ التَّعْيِينِ لَا أَنْ يَثْبُتَ بِهَا شَيْءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন দু ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের বাবা অমুককে অসিয়ত করেছে, আর অছি ও এরূপ দাবি করে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য ইসতিহসানের ভিত্তিতে জায়েজ সাব্যস্ত হবে। আর যদি অছি বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে তা জায়েজ নয়। অবশ্য কিয়াসানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য জায়েজ নয় যদিও অছি তা দাবি করে। অনুরূপভাবে যাদের জন্যে ওসীয়ত করা হয়েছে তাদের দুজন যদি অসিয়তের সাক্ষ্য দেয় অথবা পাওনাদার যদি তাদের জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কিংবা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের দুজনের কাছে মৃত ব্যক্তি টাকা পায় কিংবা এ মর্মে অছি দুজনে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের দুজনের সাথে এ ব্যক্তিকে অসিয়ত করেছে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিয়াসের দলিল এই যে, এটা তো সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হলো। কেননা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে উপকার লাভ হবে তাতো তার পক্ষে আসছে। ইসতিহসানের দলিল এই যে, যদি অছি চায় তাহলে বিচারক অছি নিযুক্ত করতে পারে। আর মৃত্যুর বিষয়টি [সকলের] জ্ঞাত। সুতরাং বিচারক এ সাক্ষ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার কাজটি সম্পাদন করতে পারেন। এ সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা হলো এমন নয়। সুতরাং এটি লটারি করার মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে সাক্ষ্যদানের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মাসআলাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথম মাসআলা : মৃত ব্যক্তির দু-সন্তান এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, আমাদের পিতা মৃত্যুর আগে হামেদ নামের এক ব্যক্তিকে অছি নিযুক্ত করে গেছেন। আর হামেদ [অছি]-ও বিষয়টি স্বীকার করল।

দ্বিতীয় মাসআলা : যাদেরকে মাল-সম্পদ ইত্যাদি দেওয়ার অসিয়ত করা হয়েছে তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে হামেদ নামের এক ব্যক্তি অছি নিযুক্ত করেছেন। আর হামেদও তা স্বীকার করল।

তৃতীয় মাসআলা : দুজন পাওনাদার যারা মৃত ব্যক্তির কাছে টাকা পায় বলে দাবি করছে তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে হামেদ নামের এক ব্যক্তিকে অছি নিযুক্ত করেছে। আর হামেদও বিষয়টি স্বীকার করল।

চতুর্থ মাসআলা : দুজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাদের কাছে মৃত ব্যক্তি টাকা পায় তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার আগে হামেদ নামের এক ব্যক্তিকে অছি নিযুক্ত করেছে আর হামেদও তার স্বীকারোক্তি দিল।

পঞ্চম মাসআলা : দুজন অছি এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি মারা যাওয়ার আগে আমাদের দুজনের সাথে আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে আমাদের সাথে অছি নিযুক্ত করেছে। আব্দুর রহমান নিজেও এর স্বীকারোক্তি দিল।

উপরিউক্ত পাঁচ মাসআলার ব্যাপারে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ পাঁচটি সুরত ইসতিহসানের ভিত্তিতে জায়েজ; কিন্তু কিয়াসের বিবেচনায় নাজায়েজ।

এ মাসআলায় আইম্মায়ে ছালাছা তথা ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) কিয়াসের পক্ষে তাদের মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে আহনাফ ইসতিহসানের পক্ষে মত পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত পাঁচটি সুরতে যদি অছি সাক্ষীদের কিংবা অন্য অছিদের কথাকে অস্বীকার করে, তাহলে কিয়াস ও ইসতিহসান কোনোভাবেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যদি অছি উল্লিখিত পাঁচ সুরতে দাবিদার হয়, তাহলে কিয়াসের বিবেচনায় সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পিছনে যুক্তি এই যে, এ সুরতগুলোতে সাক্ষ্যদাতা তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে। আর উসূলুল ফিকহের নিয়মানুযায়ী কোনো সাক্ষ্য দ্বারা যদি সাক্ষ্যদাতার উপকার হয়, তাহলে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সুরতগুলোতে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সাক্ষ্যদাতা কি উপায়ে লাভবান হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার বিষয়। নিম্নে পাঁচটি সুরতে কিভাবে সাক্ষীরা লাভবান হয় তাই দেখানো হয়েছে।

প্রথম সুরত এই যে, কোনো মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাদের পিতা মৃত্যুর আগে হামেদকে অছি নিযুক্ত করেছে। যখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে তখন অছি তাদের অভিভাবক সাব্যস্ত হবে। ফলে সে তাদের হকসমূহ প্রাপ্তিতে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে তাদের পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ দান করবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসআলায় যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে এবং যারা পাওনাদার তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে তারা তাদেরকে অসিয়তকৃত মাল পাবে এবং তাদের পাওনা পরোশোধ হবে।

চতুর্থ মাসআলা সাক্ষ্যদানের মাধ্যম যখন অছি ঠিক তখন ঋণগ্রহীতা তার ঋণ আদায়ের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হবে। দায়মুক্তি এটাও একটা ফায়দা।

পঞ্চম মাসআলায় দু সাক্ষী তথা অছি তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাদের একজন সহযোগী পেয়ে যাচ্ছে। আর সহযোগী পাওয়াও তো একটি সুবিধা, যা তারা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে লাভ করেছে।

মোটকথা, উল্লিখিত পাঁচটি মাসআলাতে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সাক্ষ্যদাতারা বিশেষ উপকার লাভ করছে। সেহেতু সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে ফায়দা ভোগ করলে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না, তাই কিয়াসানুযায়ী উক্ত সাক্ষ্যসমূহ অগ্রহণযোগ্য হওয়াই উচিত।

পক্ষান্তরে এ মাসআলাগুলোতে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম যুক্তি এই যে, বিচারকের অছি নিয়োগ দানের অধিকার আছে। যেহেতু মাসআলাগুলোতে অছি তার অছি নিযুক্ত হওয়ার স্বীকার করছে এবং মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার বিষয়টিও সকলের জ্ঞাত আছে তাই তাকে অছি মেনে নেওয়া বিচারকের জন্যে বৈধ। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, যখন মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার বিষয়টি লোকসমাজে স্বীকৃত অথচ তার কোনো অছি নেই কিংবা তার অছি যে আছে সে তার কর্তব্য পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে এ উভয় অবস্থায় বিচারকের অছি নিয়োগ দানের অধিকার আছে। শরিয়ত বিচারককে এ অধিকার এজন্য দান করেছে যাতে মানুষের অর্থসম্পদ বিনষ্ট না হয় এবং সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীগণ তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মোটকথা, অছি না থাকা অবস্থায় অছি নির্ধারণ করা বিচারকের কর্তব্য। সুতরাং বিচারক নীতিবান, আমানতদার-বিশ্বস্ত ও সচেতন কাউকে মৃত ব্যক্তির অছি নির্ধারণ করবেন।

যেহেতু বিচরকের দায়িত্ব অছি নির্ধারণ করা তাই আলোচ্য পাঁচটি মাসআলায় হামেদ/আব্দুর রহমান নামের যে ব্যক্তিকে অছি মেনে নেওয়া হয়েছে সে মূলত বিচারকের ফায়সালার মাধ্যমে অছি নিযুক্ত হয়েছে– সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এখানে অছি নিযুক্ত হয়নি; বরং অছি নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান সুনির্দিষ্ট করার ফায়দা দিচ্ছে। অর্থাৎ সাক্ষ্য পাওয়া যাওয়াতে বিচারকের জন্যে অছির আমানতদারী-বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতা যাচাইয়ের জন্যে আলাদা পরিশ্রমের দরকার হচ্ছে না; বরং উক্ত সাক্ষ্যের সহায়তায় বিচারক অছি নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

মুসান্নিফ (র.) উক্ত সাক্ষ্যগুলোকে লটারির সাথে তুলনা করেছেন। লটারির মাধ্যমে কোনো একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয় মাত্র। এর দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা হয় না। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হতে পারে। যেমন– বিচারক দুজনের মাঝে দশকাঠা জমি বণ্টন করলেন। তারা দুজনেই ৫ কাঠা করে পেল। কিন্তু দশকাঠার জমির উত্তরাংশ কে পাবে আর দক্ষিণাংশ কে পাবে? তা নির্দিষ্ট করার জন্যে বিচারক লটারির ব্যবস্থা করলেন। লটারির মাধ্যমে উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশের মালিক নির্ধারণ করা হলো মাত্র। এ উদাহরণে লটারির মাধ্যমে জমি বণ্টন প্রক্রিয়া প্রমাণিত হয়নি। লটারির মাধ্যমে জমির অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে মাত্র। লটারির সাহায্যে বিচারক কাকে কোন অংশ দেবেন এর ঝামেলা এড়ালেন মাত্র। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাগুলোতে বিচারকের জন্যে অছি নির্ধারণ করতেই হতো। বিচারককে যাচাই-বাছাই করে তা করতে হতো। কিন্তু অছির হিসেবে হামেদের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাওয়াতে বিচারকের আর যাচাই-বাছাইয়ের কষ্ট করতে হচ্ছে না। সুতরাং হামেদকে অছি হিসেবে বিচারকই নির্ধারণ করেছেন। সাক্ষ্যের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ নেওয়া হয়েছে মাত্র।

মোটকথা, আলোচ্য মাসআলাগুলোতে সাক্ষ্যদান প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য নয়। যেহেতু সাক্ষ্য এখানে প্রমাণ নয় তাই একে সাক্ষ্য বা শাহাদাত বলা যায় না। সুতরাং সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সাক্ষ্যদাতার উপকার হচ্ছে এটা বলা ঠিক নয়।

وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَّا أَنَّ مَعَهُمَا ثَالِثًا يَمْلِكُ الْقَاضِي نَصَبَ ثَالِثٍ مَعَهُمَا لِعَجْزِهِمَا عَنِ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَافِهِمَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَنْكَرَ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوْتَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ نَصْبِ الْوَصِيِّ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِيَ الْمُوجِبَةُ .

অনুবাদ : আর অছি দুজন যখন এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করল যে, তাদের সাথে আরেকজন আছে তখন বিচারক তৃতীয় ব্যক্তিকে তাদের দুজনের সাথে নির্ধারণ করতে পারবে। কেননা তারা উক্ত স্বীকারোক্তির কারণে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে গেছে। এর ব্যতিক্রম হলো ঐ অবস্থায় যখন অছি অস্বীকার করে কিংবা মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার বিষয় জ্ঞাত না হয়। কেননা, সে অবস্থায় বিচারকের অছি নির্ধারণ করার ক্ষমতা নেই। ফলে এ অবস্থায় সাক্ষ্যই হবে বিষয় প্রমাণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَّا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি লুক্কায়িত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, পঞ্চম মাসআলায় যেহেতু দুজন অছি আগ থেকেই নির্ধারিত আছে তাই তৃতীয় অছি নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তৃতীয় অছি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আগের দুজন অছির সাক্ষ্য অভিযুক্ত হবে। মোটকথা তৃতীয় অছির ক্ষেত্রে বিচারকের জন্যে আগের দুজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা উচিত। অথচ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কথার উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যখন আগের অছি দুজন তাদের সাথে তৃতীয় অছি আছে বলে স্বীকারোক্তি দান করল তখন বিচারকের জন্যে তৃতীয় অছি নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা এখন যদি বিচারক তৃতীয় অছি নির্ধারণ না করেন তাহলে আগের দু-অছির পক্ষে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না। সুতরাং তাদের তৃতীয় অছি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া যেন এ কথার স্বীকারোক্তি দান করা যে, আমরা তৃতীয়জন ছাড়া কাজ করতে অক্ষম। যেহেতু তারা তৃতীয়জন ছাড়া কাজ করতে অক্ষম তাই বিচারকের তৃতীয় ব্যক্তিকে অছি হিসেবে নিয়োগ দান করা মূলত মৃত ব্যক্তির অছি বানানো। সুতরাং মৃতের অছি বানানো যে পর্যায়ের জরুরি তৃতীয় ব্যক্তিকে অছি মেনে নেওয়া সে পর্যায়ের জরুরি তাই তাকে অছি মেনে নেওয়া ছাড়া বিচারকের গত্যন্তর নেই।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَنْكَرَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত পাঁচ মাসআলায় অছি তার অছি হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। তাই মাসআলাগুলো অছির নিয়োগ দান যথার্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি অছি উল্লিখিত পাঁচ সুরতের কোনো একটি সুরতে অছি হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে বিচারক তাকে অছি বানাতে পারবেন না। কেননা বিচারকের কাউকে জবরদস্তিভাবে [তার অমতে] অছি বানানোর অধিকার নেই। সুতরাং অছি বানাতে হলে সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে অছি বানানো আবশ্যক হবে। আর তখন তাদের সাক্ষ্য ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয়। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাদের সাক্ষ্য দলিল বা ওয়াজিবকারী হতে পারে না।

قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوْتَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের মাঝে বিদিত না হয় তাহলেও বিচারকের জন্যে অছির নিয়োগ দান অবৈধ। কারণ তখন তার মৃত্যুর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে। আর এখানে প্রমাণ হলো তাদের সাক্ষ্য। অথচ ইতঃপূর্বে আমরা তাদের সাক্ষ্যকে প্রমাণ হিসেবে অকার্যকর সাব্যস্ত করেছি, তাই তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মৃত্যু প্রমাণ করা যাবে না।

وَفِى الْغَرِيْمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعْرُوْفًا لِاَنَّهُمَا يُقِرَّانِ عَلٰى اَنْفُسِهِمَا فَيَثْبُتُ الْمَوْتُ بِاعْتِرَافِهِمَا فِىْ حَقِّهِمَا وَاِنْ شَهِدَا اَنَّ اَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دُيُوْنِهِ بِالْكُوْفَةِ فَادَّعَى الْوَكِيْلُ اَوْ اَنْكَرَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِاَنَّ الْقَاضِىْ لَا يَمْلِكُ نَصَبَ الْوَكِيْلِ عَنِ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ اِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِىَ غَيْرُ مُوْجِبَةٍ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি দুজন ঋণগ্রস্ত হয় যে, মৃত ব্যক্তি তাদের কাছে টাকা পায় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যদিও মৃত্যুর বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে। কেননা তারা দুজন তাদের নিজেদের কাছে মৃত ব্যক্তি পায় বলে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি প্রমাণিত হবে। আর যদি তারা দুজনে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের অনুপস্থিত পিতা এক ব্যক্তিকে তার ঋণ গ্রহণের জন্য কুফা শহরে উকিল বানিয়েছে অতঃপর উকিল দাবি করুক অথবা অস্বীকার করুক তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিচারক অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে উকিল নিযুক্ত করার অধিকার রাখেন না। সুতরাং এ মাসআলায় যদি ওকালাত প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্যের দ্বারা ওকালাত সাব্যস্ত হবে। অথচ তাদের সাক্ষ্য তোহমতের কারণে ওয়াজিবকারী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْغَرِيْمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا الخ : মুসান্নিফ (র.) اَوْ لَمْ يُعْرَفِ الْمَوْتُ থেকে ৪র্থ মাসআলাকে বাদ দিয়েছেন বা ইসতিছনা করেছেন। আগে বলা হয়েছিল যে, যদি মৃত্যুর বিষয়টি জ্ঞাত না হয় তাহলে সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর বিষয়টি সবার কাছে অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ৪র্থ মাসআলায় ঋণ গ্রহীতাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ৪র্থ মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, দুজন দেনাদার এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, হামেদ নামের এক ব্যক্তি মরহুম অমুকের অছি। তাদের সাক্ষ্য মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বিষয়টি অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে তোহমত নেই। কেননা, তাদের এ সাক্ষ্যের মধ্যে তাদের লাভের চেয়ে বাহ্যিক ক্ষতির দিক বেশি। কারণ, তাদের সাক্ষ্যের সাহায্যে অছি নিযুক্ত হলে তাদের টাকা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য তাদের পক্ষে না হয়ে তাদের বিপক্ষে গেল। আর উসূলুল ফিকহের নিয়মানুযায়ী কোনো লোকের সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না; তার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

মোটকথা, ৪র্থ মাসআলায় দেনাদার দুজনের সাক্ষ্য মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়া অজ্ঞাত হলেও গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَاِنْ شَهِدَ اَنَّ اَبَاهُمَا الخ : উপরের ইবারতে অনুপস্থিত পিতা সম্পর্কে তার সন্তানদ্বয়ের এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তিনি কোনো ব্যক্তিকে উকিল বা দায়িত্বশীল নির্ধারণ করেছেন— এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় সন্তানের সাক্ষ্য অনুপস্থিত পিতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। উকিল তাদের সাথে একমত হলেও গ্রহণযোগ্য নয়, আর একমত না হলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

এ মাসআলায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির উকিল নিয়োগ করার অধিকার বিচারকের নেই। তাই এখানে যদি উকিল নিযুক্ত করতে হয় তাহলে বিচারকের কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে তা নিযুক্ত করতে হবে। যেমন— আলোচ্য মাসআলায় পুত্রদ্বয়ের সাক্ষ্য দ্বারা তা নিযুক্ত করা যেতে পারে। আর যদি শুধুমাত্র তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে উকিল নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হবে। যেহেতু তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে তোহমতের অবকাশ আছে তাই তাদের সাক্ষ্য নিজেদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাক্ষ্যের মধ্যে তোহমতের অবকাশ এই যে, সন্তানদ্বয় তাদের পিতার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাছাড়া এতে তাদের উপকারও আছে। কেননা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে উকিল নিযুক্ত হলে উক্ত উকিল তাদের পক্ষে বিভিন্ন লেনদেন করবে। ফলে তারা লাভবান হবে।

قَالَ : وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِىْ الشَّهَادَةَ عَلٰى جُرْحٍ مُجَرَّدٍ وَلَا يَحْكُمُ بِذٰلِكَ لِاَنَّ الْفِسْقَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِاَنَّ لَهُ الرَّفْعَ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْاِلْزَامُ وَلِاَنَّ فِيْهِ هَتْكَ السِّتْرِ وَالسِّتْرُ وَاجِبٌ وَالْاِشَاعَةُ حَرَامٌ وَاِنَّمَا يُرَخَّصُ ضَرُوْرَةَ اِحْيَاءِ الْحُقُوْقِ وَذٰلِكَ فِيْمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ اِلَّا اِذَا شَهِدُوْا عَلٰى اِقْرَارِ الْمُدَّعِىْ بِذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِقْرَارَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক [বাদীর সাক্ষীদের] খালিস সমালোচনা (جَرْح مُجَرَّدْ) -এর ব্যাপারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবেন না এবং সে সাক্ষ্যানুযায়ী রায়ও প্রদান করবেন না। কেননা ফিসক এমন পাপাচারের মধ্যে গণ্য যা বিচারকার্যের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে না। কেননা এটা তওবার মাধ্যমে রহিত হয়। সুতরাং এতে লাযেম করার দিক নেই। অধিকন্তু এতে কারো গোপন দোষ প্রকাশ করা হয়, অথচ শরিয়তে দোষ গোপন রাখা ওয়াজিব এবং তা চর্চা ও প্রকাশ করা হারাম। [শরিয়তে তা প্রকাশ করার] অনুমতি প্রদান করা হয়েছে কেবল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর তা ঐ ফিসকের ক্ষেত্রে যা বিচারকার্যের অধীনে। অবশ্য যদি সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বাদী এমন স্বীকার করেছে [তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য]। কেননা স্বীকারোক্তি এমন বিষয়ের মধ্যে গণ্য যা বিচারকার্যের আওতাভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِىْ الشَّهَادَةَ الخ : উপরের ইবারতে সাক্ষীদের কোন কোন সমালোচনা গ্রহণযোগ্য আর কোন কোন সমালোচনা অগ্রহণযোগ্য? তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, جَرْح শব্দের অর্থ– কারো কোনো বিষয়ে সমালোচনা করা বা তার কোনো দোষের উল্লেখ করা। جَرْح দু প্রকার– ১. جَرْح مُجَرَّدْ ২. جَرْح غَيْرُ مُجَرَّدْ

جَرْح مُجَرَّدْ **-এর সংজ্ঞা :** এর দুটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়–

ক. কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট অপরাধ / গুনাহ ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা। যেমন– কাউকে চোর, ব্যভিচারী, ডাকাত ইত্যাদি বলা।

খ. কাউকে এমন দোষে দুষ্ট করা যে দোষ/ অপরাধ বিচারকের বিচারকার্যের অধীন নয়। যেমন বিবাদী বলল, বাদীর সাক্ষী ফাসিক/ ব্যভিচারী/ মদ্যপ/ সুদখোর ইত্যাদি। কাউকে এরূপ দোষ উল্লেখ করার দ্বারা হদ ওয়াজিব হয় না। যেমন বলা হলো– হামেদ চোর, তাহলে বিচারক হামেদের হাত কাটতে পারবেন না।

جَرْح غَيْرُ مُجَرَّدْ **-এর সংজ্ঞা :** এরও দুটি সংজ্ঞা হতে পারে–

ক. কাউকে সুনির্দিষ্ট দোষে/ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা। যেমন– হামেদ সম্পর্কে একথা বলা যে, হামেদ গত শুক্রবার আব্দুর রহমানের বাড়িতে চুরি করেছে।

খ. কারো এমন দোষ/ অপরাধের উল্লেখ করা যে অপরাধ বিচার কার্যের অধীনে। যেমন– বিবাদী বাদীর সাক্ষীদের সম্পর্কে বলল যে, অমুক সাক্ষী অমুক দিন চুরি করেছে কিংবা অমুক সাক্ষী অমুক দিন ব্যভিচার করেছে ইত্যাদি। এরূপ দাবি করার

পর যদি এ দাবির স্বপক্ষে সাক্ষীদের হাজির করা যায় তাহলে শরিয়ত উক্ত ব্যক্তির উপর হদ ওয়াজিব করবে। এ দাবি আল্লাহর হকের ব্যাপারে যেমন হতে পারে– যেমনটা উপরে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ বান্দার হকের ব্যাপারেও হতে পারে। যেমন– বিবাদী বিচারকের সামনে বলল যে, বাদীর সাক্ষীরা আমার থেকে এক হাজার টাকা উৎকোচ নিয়ে এ ব্যাপারে আমার সাথে চুক্তি করেছে যে, তারা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না। তাদের চুক্তিমতো আমি এক হাজার টাকা পরিশোধও করেছি; কিন্তু তারা এখন সে শর্ত পূরণ করছে না। আমি তাদের ব্যাপারে উক্ত অভিযোগ দাখিলের পূর্ব থেকেই তাদের কাছে আমার পরিশোধ করা এক হাজার টাকা চেয়েছি; কিন্তু তারা তা আদায় করছে না। যদি এ অভিযোগের পক্ষে বিবাদী সাক্ষী হাজির করে তাহলে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা তার অভিযোগ বান্দার এমন হকের ব্যাপারে যা বিচারকের বিচারকার্যের অধীনে। কেননা এরূপ অভিযোগ পেলে বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাওনাদারের হক/ পাওনা পরিশোধ করতে বলবেন। মোটকথা, এটা جَرْح غَيْرُ مُجَرَّدْ ; আর جَرْح غَيْرُ مُجَرَّدْ বান্দার হক সংশ্লিষ্টও হতে পারে আবার আল্লাহর হক সংশ্লিষ্টও হতে পারে। جَرْح مُجَرَّدْ -এর ক্ষেত্রে বিচারক সাক্ষীদের বক্তব্য শুনবেন না; কিন্তু جَرْح غَيْرُ مُجَرَّدْ -এর ব্যাপারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনবেন।

উপরের উক্ত ভূমিকার পর ইবারতের মাসআলা আলোচনা করা যাক। সূরতে মাসআলা হলো, কোনো বিষয়ে বাদী তার দাবির পক্ষে আদালতে সাক্ষী হাজির করল। অতঃপর বিবাদী সাক্ষীদের বিপক্ষে আপত্তি জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে جَرْح مُجَرَّدْ করল। সে বলল, এ সাক্ষী ফাসিক/ চোর/ ব্যভিচারী/ সুদখোর। তারপর সে তার দাবির পক্ষ্যে সাক্ষীও হাজির করল; যারা সাক্ষীর বিপক্ষে উপরিউক্ত দোষাবলির কোনো একটি দোষের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায়ও প্রদান করবেন না। এ ব্যাপারে দলিল হলো, বিচারক সাক্ষ্য এজন্যই গ্রহণ করে থাকেন যাতে সাক্ষ্যানুসারে রায় প্রদান করতে সক্ষম হন। সুতরাং যেহেতু রায় প্রদানের জন্যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাই যে ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তা এমন হতে হবে যা বিচারকার্যের অধীন বা যে বিষয়ের বিচার করা সম্ভব। কিন্তু جَرْح مُجَرَّدْ বা সুনির্দিষ্ট দোষ ব্যতিরেকে এমনিতে কাউকে দোষারোপ করা, যার সারকথা হলো– কাউকে ফাসিক বলা ইত্যাদি এমন বিষয় যা বিচার প্রক্রিয়ার অধীন নয়। কেননা বিচারকের রায় مَشْهُوْدٌ بِهٖ -কে আবশ্যক (لازم) করে অথচ বিচারকের পক্ষে ফিসককে আবশ্যক করার অধিকার নেই। কারণ, ফিসক তো তওবার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। যেহেতু ফিসক তওবার দ্বারা রহিত করা যায় তাই ফিস্কের মধ্যে লাযেম করার বিষয়টি অনুপস্থিত। যেহেতু একে লাযেম করা যায় তাই এটাকে বিচার প্রক্রিয়ার অধীন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ফিসকের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, ফিসক বিচারকের বিচারকার্যের অধীন নয়, আর তাই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

جَرْح مُجَرَّدْ -এর ব্যাপারে সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, বাদীর সাক্ষীদের ব্যাপারে ফাসিক/ ব্যভিচারী/ সুদখোর/ মাদকাসক্ত ইত্যাদির সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা বিবাদীর সাক্ষীরা; বরং ফাসিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন সাক্ষীরাই ফাসিক বলে গণ্য হয় তখন তাদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা যায়।

সাক্ষীদের ফাসিক হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, সাক্ষীরা বাদীর সাক্ষীদের ব্যাপারে উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের অজ্ঞাত দোষগুলোকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিল। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো, ইসলাম প্রয়োজন ছাড়া কারো দোষ প্রকাশ করাকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং সেসব গোপন রাখাকে ওয়াজিব করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইরশাদ হলো– إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ অর্থাৎ "যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীল দোষচর্চা করতে পছন্দ করে তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।" আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা فَاحِشَةٌ তথা অশ্লীলতাকে প্রচার করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণীর উল্লেখ করেছেন।

আর এরূপ কঠোর সতর্কবাণী কেবল হারাম কাজের ব্যাপারেই এসে থাকে। যারা হারাম কাজে লিপ্ত তাদের শরিয়তের পরিভাষায় ফাসিক বলা হয়। আলোচ্য মাসআলায় বাদীর সাক্ষীদের ব্যাপারে বিচারকের মজলিসে আম জনতার মাঝে বিবাদীর সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে যে, তারা ফাসিক/ ব্যভিচারী/ সুদখোর ইত্যাদি শরিয়তের নির্দেশিত 'দোষ গোপন করা'র হুকুমকে লঙ্ঘন করেছে যা হারাম আর এ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াতে তারা ফাসিক বলে গণ্য হবে। যেহেতু ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য তাই বিবাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُرَخِّصُ ضَرُوْرَةً الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যেহেতু মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ওয়াজিব এবং তা প্রকাশ করা হারাম সুতরাং ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত হবে না এবং এর দ্বারা মানুষের সম্মানহানি করা হবে। অথচ কুরআন-হাদীসের অন্যস্থানে এসব ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের বিধান রাখা হয়েছে।

উত্তর : এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, চুরি ইত্যাদি দ্বারা মানুষ ও আল্লাহর হক নষ্ট হয়। যদি এসব বিষয়ে সাক্ষ্য না দেওয়া হয় তাহলে মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হক নষ্ট হতেই থাকবে। আর তাই মানুষের অধিকার রক্ষায় এসব ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের অনুমতি প্রদান করেছে যেসব বিষয় বিচারকার্যের অধীন। মোটকথা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা যেহেতু বিচারকার্যের অধীন বা বলা যায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই আদালত ও আইনের সৃষ্টি তাই এসব ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে جَرْحٌ غَيْرُ مُجَرَّدٍ -এর আলোচনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا شَهِدُوْا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আগের মাসআলায় বর্ণিত বিষয় থেকে ইসতিছনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, আগে বলা হয়েছিল جَرْحٌ مُجَرَّدٌ -এর ব্যাপারে সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে যে, যদি বাদী তার সাক্ষীদের ব্যাপারে এরূপ স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে যে, তার সাক্ষীরা ফাসিক/ চোর/ ব্যভিচারী ইত্যাদি। আর বিবাদীর সাক্ষীরা তার উক্ত স্বীকারোক্তি শুনে থাকে অতঃপর বিচারকের আদালতে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বাদী তার সাক্ষীরা চোর/ ব্যভিচারী ইত্যাদি হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছেন তাহলে বিবাদী সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাদীর সাক্ষীদের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য। কেননা এ সুরতে বাদীর সাক্ষীদের جَرْحٌ مُجَرَّدٌ -এর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়নি; বরং বাদীর স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। আর স্বীকারোক্তি তো এমন বিষয় যা বিচারকার্যের অধীনে।

উল্লেখ্য যে, এ সুরতটি মৌলিকভাবে ইসতিছনা নয়। কারণ, এখানে جَرْحٌ مُجَرَّدٌ -এর কোনো সুরতকে ইসতিছনা করা হয়নি। আলোচ্য মাসআলাটি مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হয়েছে বলা যায়।

قَالَ : وَلَوْ اَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِىْ اِسْتَاْجَرَ الشُّهُوْدَ لَمْ تُقْبَلْ لِاَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلٰى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ وَالْاِسْتِيْجَارُ وَاِنْ كَانَ اَمْرًا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلَا خَصْمَ فِىْ اِثْبَاتِهِ لِاَنَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ اَجْنَبِىٌّ عَنْهُ حَتّٰى لَوْ اَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِىْ اِسْتَاْجَرَ الشُّهُوْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِيُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ وَاَعْطَاهُمُ الْعَشَرَةَ مِنْ مَالِ الَّذِىْ كَانَ فِىْ يَدِهِ تُقْبَلُ لِاَنَّهُ خَصْمٌ فِىْ ذٰلِكَ ثُمَّ يُثْبِتُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَيْهِ وَكَذَا اِذَا اَقَامَهَا عَلٰى اَنِّىْ صَالَحْتُ هٰؤُلَاءِ الشُّهُوْدَ عَلٰى كَذَا مِنَ الْمَالِ وَدَفَعْتُهُ اِلَيْهِمْ عَلٰى اَنْ لَا يَشْهَدُوْا عَلَىَّ بِهٰذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوْا وَطَالَبَهُمْ بِرَدِّ ذٰلِكَ الْمَالِ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِنَّهُ لَوْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّ الشَّاهِدَ عَبْدٌ اَوْ مَحْدُوْدٌ فِىْ قَذْفٍ اَوْ شَارِبُ خَمْرٍ اَوْ قَاذِفٌ اَوْ شَرِيْكُ الْمُدَّعِىْ تُقْبَلُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বিবাদী এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, বাদী সাক্ষীদের ভাড়ায় এনেছে তাহলে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা নিছক অভিযোগের [جَرْحٍ مُجَرَّدٍ -এর] উপর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থের বিনিময়ে সাক্ষী বানানো যদিও নিছক অভিযোগের চেয়ে বাড়তি কিছু; কিন্তু এ অভিযোগের ব্যাপারে সে তো প্রতিপক্ষ নয়। কেননা এ ব্যাপারে বিবাদী আজনবি তথা অপরিচিতের ন্যায়। অবশ্য যদি বিবাদী এরূপ সাক্ষ্য উপস্থাপন করে যে, বাদী দশ দিরহামের বিনিময়ে সাক্ষীদের ভাড়ায় এনেছে যাতে তারা সাক্ষ্য দেয় এবং সে তাদেরকে নিজ হাত থেকে দশ দিরহাম পরিশোধও করেছে। এরূপ হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য । কেননা সে নিজেই এ মাসআলায় প্রতিপক্ষ। অতঃপর যে ভিত্তিতেই সে অভিযোগ প্রমাণ করেছে তদ্রূপ যদি সে এ মর্মে প্রমাণ দেয় যে, আমি এ সাক্ষীদের সাথে সমঝোতা করেছি এত পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে যে, তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করবে না। আর তারা ইতোমধ্যে সাক্ষ্য দিয়ে দিয়েছে এবং বিবাদী তাদের কাছ থেকে তার প্রদানকৃত অর্থ ফেরত চাচ্ছে। এজন্যই আমরা বলেছি, বিবাদী এরূপ প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সাক্ষী গোলাম অথবা অপবাদ দেওয়ার অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত অথবা মাদকাসক্ত কিংবা অপবাদদাতা/বাদীর অংশীদার তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَوْ اَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ الخ : উপরের ইবারতে বাদীর সাক্ষীদের বিপক্ষে কখন বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর কখন গ্রহণযোগ্য নয় এর কয়েকটি সুরত আলোচনা করা হয়েছে–

মাসআলা : যদি বাদীর সাক্ষীদের বিপক্ষে বিবাদী বিচারকের আদালতে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, বাদী সাক্ষীদের ভাড়ায় বা অর্থের বিনিময়ে আদালতে নিয়ে এসেছে তাহলে বিবাদীর এ সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। কেননা তার এ সাক্ষ্য

নিছক অভিযোগের [جَرْح مُجَرَّدْ-এর] সাক্ষ্য। ইতঃপূর্বে এ কথা বলা হয়েছে যে, নিছক অভিযোগের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। إِسْتِيْجَارْ-এর বিষয় جَرْح مُجَرَّدْ-এর উপর একটি অতিরিক্ত বিষয় বলে মুসান্নিফ (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, বিবাদী যে বলেছে, বাদী অর্থের বিনিময়ে সাক্ষী এনেছে এটা তো جَرْح مُجَرَّدْ নয়; বরং এতে একটি অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে। বিষয়টি হলো, সাক্ষীদের ভাড়ায় নেওয়া মানে অর্থের বিনিময়ে সাক্ষী কেনা। আর এটা করা হয়েছে বাদীর হক প্রমাণ করার জন্যে। এর দ্বারা মৌলিকভাবে যদিও বাদীর হক সাবেত করা হয়; কিন্তু পরোক্ষভাবে এর দ্বারা جَرْح প্রমাণ হয়। কেননা যখন বিবাদী এ কথা বলল যে, এ সাক্ষীগণকে অর্থের বিনিময়ে আনা হয়েছে তখন সে যেন বলল যে, সাক্ষীগণ ফাসিক ও পাপাচারী। মোটকথা, বিবাদী মৌলিকভাবে বাদীর ভাড়া করার বিষয়টি প্রমাণ করেছে সেই সাথে পরোক্ষভাবে সাক্ষীগণের ত্রুটিও প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং আলোচ্য جَرْح টি جَرْح مُجَرَّدْ নয়; বরং جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ; কারণ, যে جَرْح দ্বারা বান্দার হক প্রমাণ করা হয়, তাকে جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ বলা হয়। যেহেতু এটা جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ প্রমাণ হলো তাই এ ক্ষেত্রে বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। অথচ ইবারতে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, إِسْتِيْجَارْ যদিও جَرْح مُجَرَّدْ-এর উপর অতিরিক্ত বিষয়; কিন্তু বিবাদী বাদীর হক প্রমাণ করার জন্যে বাদীর পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত হয়নি; বরং উক্ত অর্থের বিনিময়ে সাক্ষীদের নেওয়ার বিষয়টির ক্ষেত্রে বিবাদী আজনবি বলে গণ্য। যেহেতু সে আজনবি তাই তার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে ভাড়া নেওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা অগ্রহণযোগ্য। অতঃপর যেহেতু তার দ্বারা جَرْح مُجَرَّدْ-এর উপর অতিরিক্ত বিষয়টি প্রমাণ সম্ভব হলো না, এখন শুধু جَرْح مُجَرَّدْ বাকি রইল। নিছক অভিযোগ (جَرْح مُجَرَّدْ) -এর ক্ষেত্রে বিবাদীর সাক্ষ্য যেহেতু অগ্রহণযোগ্য সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও বিবাদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَوْ اَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে ভিন্ন একটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। মাসআলাটি হলো, যদি বিবাদী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, দশ দিরহামের বিনিময়ে বাদী অমুককে সাক্ষী হিসেবে এনেছে আর সে দশ দিরহাম আমার মাল থেকে নিয়েছে যা বাদীর দখলে ছিল। আমি এ ব্যাপারে বাদীর বিচারপ্রার্থী। তার এ কথার ভিত্তিতে সাক্ষীদের جَرْح প্রমাণিত হয়। এখানে অবশ্য মৌলিকভাবে বিবাদী বাদীর কাছে তার মাল থেকে প্রদত্ত দশ দিরহাম চাচ্ছে। এ চাওয়ার সাথে সাথে বাদীর সাক্ষীরা ফাসিক হওয়াও প্রমাণিত হয়ে গেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করতে পারেন। কেননা বিবাদী যখন বিচারকের সামনে এ সাক্ষ্য প্রদান করল যে, বাদী তার সাক্ষীদের অর্থ তার মাল থেকে সাক্ষীদের দিয়েছে তখন সে বাদীর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। [আগের মাসআলার মতো বিবাদী এখানে আজনবি নয়] যেহেতু সে প্রতিপক্ষ এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে সাক্ষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগও প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তারা তাদের সাক্ষ্যকে বিক্রি করার মাধ্যমে ফাসিক হয়েছে। মোটকথা, এখানে বিবাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষীদের ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু এ দোষারোপের মধ্যে মানুষের হক প্রমাণ করার বিষয়টি নিহিত আছে তাই এটি নিছক কোনো অভিযোগ বা جَرْح مُجَرَّدْ নয়। যেহেতু جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তাই আলোচ্য সুরতে বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا اَقَامَهَا عَلٰى اَنِّىْ صَالَحْتُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে উপরের মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা পেশ করেছেন। মাসআলাটি হলো, বিবাদী এ কথার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, আমি বাদীর এ সাক্ষীদের এ চুক্তির ভিত্তিতে পাঁচশত টাকা দিয়েছি যে, তারা আমার বিপক্ষে কোনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। অথচ তারা চুক্তির খেলাফ সাক্ষ্য দিয়েছে। এমতাবস্থায় বিবাদী যদি বলে যে, যেহেতু তারা আমার শর্ত মোতাবেক সাক্ষ্য দেয়নি তাই আমি আমার টাকা ফেরত চাই তাহলে এ সুরতে বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা এখানে বিবাদী নিছক কোনো অভিযোগ (جَرْح مُجَرَّدْ) করেনি; বরং

এটি جَرْح مُجَرَّدْ; আর جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-এ বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য যদি বিবাদী এ কথা তার সাক্ষ্যের মধ্যে না বলত যে, আমি তাদের পাঁচশত টাকা দিয়েছি তাহলে তার সাক্ষ্য جَرْح مُجَرَّدْ হতো। আর তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতো না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِنَّهُ لَوْ اَقَامَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মূলনীতির কথা আলোচিত হয়েছে যে جَرْح مُجَرَّدْ-এর ব্যাপারে বিবাদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য এবং جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-এর ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য– এর আলোকে আমরা বলব যে, যদি বিবাদী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সাক্ষী/সাক্ষীগণ গোলাম অথবা অপবাদ দেওয়ার কারণে সাজাপ্রাপ্ত অথবা মাদকাসক্ত অথবা অপবাদদানকারী কিংবা বাদীর অংশীদার তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা উল্লিখিত সবগুলো বিষয় جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-এর ব্যাপারে বিবাদীর সাক্ষ্য যেহেতু গ্রহণযোগ্য তাই উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে বিবাদীর সাক্ষ্য সাক্ষীদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য এখানে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, এ বিষয়গুলো جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ কিভাবে হলো? এর উত্তর হচ্ছে, ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যদি কোনো অভিযোগের দ্বারা বান্দা কিংবা আল্লাহ কারো হক প্রমাণ হয় তাহলেই তা جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ; আলোচ্য বিষয়গুলোতে হক প্রমাণের বিষয় পাওয়া যায়। যেমন–

১. বিবাদী বলল যে, বাদীর সাক্ষীগুলো গোলাম বা ক্রীতদাস। সে যেন এ কথা বলে সাক্ষীর গোলাম হওয়া প্রমাণ করল। আর গোলাম হওয়া এক ধরনের দুর্বলতা। এ দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো গোলামের ওলায়াত রহিত হয়ে যাওয়া। আর কারো ওলায়াত বা কর্তৃত্ব বাতিল করা আল্লাহর হক। সুতরাং সাক্ষীকে গোলাম বলে আল্লাহর হক প্রমাণ করা হলো।

২. যদি বিবাদী এ কথা বলে যে, বাদীর সাক্ষী অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তি পেয়েছে তবে যেন সে বলল, সাক্ষীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। কেননা কোনো ব্যক্তির অপবাদ দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হলে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। কারো সাক্ষ্য বাতিল করা আল্লাহর হক। যেহেতু আল্লাহর হক প্রমাণিত হলো তাই এটি جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ-

৩. যদি বিবাদী বাদীর সাক্ষীর বিপক্ষে এ কথা বলে যে, সাক্ষী মাদকাসক্ত তাহলে তার এ বক্তব্য/সাক্ষ্য দ্বারা সাক্ষীর উপর হক ওয়াজিব হবে। আর হদ ওয়াজিব হওয়াও আল্লাহর হক।

৪. যদি সে সাক্ষীর ব্যাপারে বলে যে, সাক্ষী অপবাদ দান করার দোষে অভিযুক্ত তাহলে সে যেন বলল, তার উপর হদ ওয়াজিব হয়েছে। হদ ওয়াজিব হওয়া যেহেতু অপবাদ দেওয়ার মধ্যে বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের হক বিদ্যমান; কিন্তু আল্লাহর হক প্রবল তাই এটিও جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মাঝে আল্লাহর হক বিবাদীর অভিযোগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বিবাদীর অভিযোগ নিছক কোনো অভিযোগ (جَرْح مُجَرَّدْ) নয়; বরং বিবাদীর অভিযোগগুলো جَرْح غَيْر مُجَرَّدْ বলে সাব্যস্ত হবে।

৫. যদি বিবাদী বিচারকের আদালতে এ মর্মে প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, বাদীর সাক্ষী মালের দাবি করার ক্ষেত্রে বাদীরই অংশীদার তাহলে সাক্ষী তার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হয় এ কারণে তার বিপক্ষে বিবাদীর সাক্ষ্য কবুল করা হবে এবং বাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে।

قَالَ : وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحْ حَتّٰى قَالَ اَوْهَمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِىْ فَاِنْ كَانَ عَدْلًا جَازَتْ شَهَادَتُهٗ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ اَوْهَمْتُ اَىْ اَخْطَأْتُ بِنِسْيَانِ مَا كَانَ بِحَقٍّ عَلٰى ذِكْرِهٖ اَوْ بِزِيَادَةٍ كَانَتْ بَاطِلَةً وَوَجْهُهٗ اَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يُبْتَلٰى بِمِثْلِهٖ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَانَ الْعُذْرُ وَاضِحًا فَتُقْبَلُ اِذَا تَدَارَكَهٗ فِىْ اَوَانِهٖ وَهُوَ عَدْلٌ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ اَوْهَمْتُ لِاَنَّهٗ يُوْهِمُ الزِّيَادَةَ مِنَ الْمُدَّعِىْ بِتَلْبِيْسٍ وَخِيَانَةٍ فَوَجَبَ الْاِحْتِيَاطُ وَلِاَنَّ الْمَجْلِسَ اِذَا اتَّحَدَ لَحِقَ الْمُلْحَقُ بِاَصْلِ الشَّهَادَةِ فَصَارَ كَكَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَا كَذٰلِكَ اِذَا اخْتَلَفَ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِىْ بَعْضِ الْحُدُوْدِ اَوْ فِىْ بَعْضِ النَّسَبِ وَهٰذَا اِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ فَاَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا بَأْسَ بِاِعَادَةِ الْكَلَامِ مِثْلُ اَنْ يَدَعَ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَا يَجْرِىْ مَجْرٰى ذٰلِكَ وَاِنْ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ عَدْلًا وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ يُقْبَلُ قَوْلُهٗ فِىْ غَيْرِ الْمَجْلِسِ اِذَا كَانَ عَدْلًا وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের পর আপন স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই যদি বলে যে, আমি আমার সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে ভুল করেছি তাহলে যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তার সাক্ষ্য জায়েজ হবে। তার উক্তি– اوهمت। অর্থ হলো– আমার যা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল তা ভুলে যাওয়ার কারণে ক্রটি করেছি কিংবা ভুল বিষয় অতিরিক্ত বলা হয়েছে। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, কখনো বিচারকের মজলিসের ভাবগম্ভীর পরিবেশে সাক্ষী ভড়কে যায় তাই ওজরটি স্পষ্ট। সুতরাং যদি যথাসময়ে সে তার সাক্ষ্যকে সংশোধন করে, আর সে ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি মজলিস ছেড়ে যায় অতঃপর পুনরায় মজলিসে আসে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এরূপ করা বাদীর পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র কিংবা খিয়ানতের মাধ্যমে সংযোজন করার সন্দেহ সৃষ্টি করে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। তাছাড়া যখন মজলিস পরিবর্তন না হয় তখন সংযোজিত সাক্ষ্য মূল সাক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য হয়। সুতরাং পুরো কথা একটি কথা বলে গণ্য হবে। আর মজলিস পরিবর্তন হলে বিষয়টি এরূপ থাকে না। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ফয়সালা হবে যদি কোনো সাক্ষী সীমানা বর্ণনায় কিংবা বংশ বর্ণনায় ভুল করে। অবশ্য এ বিধান তখনই হবে যদি বিষয়টি সন্দেহপ্রবণ কোনো বিষয় হয়, পক্ষান্তরে যদি সন্দেহের উদ্রেক না হয় তাহলে কথা পুনরুক্ত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন– কোনো সাক্ষী শাহাদাত শব্দটি বা এ জাতীয় কোনো কিছু বলল না। যদি সে মজলিস ছেড়ে চলে যায় তবে সে ন্যায়পরায়ণ হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তার সাক্ষ্য সব মজলিসেই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য জাহেরী রেওয়ায়েতের বর্ণনা সেটাই যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحْ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্যদানের পর সাক্ষ্য দেওয়া বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু সংশোধন করতে চাইলে কখন তা গ্রহণ করা হবে আর কখন তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্যদানের জন্যে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর সাক্ষ্যদানের একপর্যায়ে বলে যে, আমি যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছি তাতে ভুল করে ফেলেছি অর্থাৎ সে বলে যে, আমার সাক্ষ্য দেওয়া বিষয়ে আরো কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করতে চাই তাহলে তার এ বক্তব্য উক্ত মজলিসে থাকা অবস্থায় যদি হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সাক্ষ্যদানের পর বিচারকের মজলিস ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় অতঃপর আবার বিচারকের মজলিসে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি ন্যায়পরায়ণ না হয় তাহলে তার বক্তব্য কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না– প্রথম মজলিসে হোক কিংবা পরবর্তী মজলিসে হোক।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষী أَوْهَمْتُ বলে যদি কোনো পরিমাণ অথবা কোনো প্রকার কিংবা কারণ বর্ণনায় ত্রুটি হয়েছে বলে উল্লেখ করে তাহলে তার বক্তব্য ন্যায়পরায়ণ হলে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি أَوْهَمْتُ বলে সে মূল বক্তব্য প্রত্যাহার করতে চায় তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত মূল মাসআলার দলিল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বিচারকের মজলিস ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, অনেকের জন্যে সেটা ভীতিকরও হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশে অনভ্যস্ত ব্যক্তি অনেক সময় এরূপ পরিবেশে এসে ঘাবড়ে যায়। ফলে তার সাক্ষ্যের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। তখন সে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ভুল করে বসে। এরপর যখন সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং তার সাক্ষ্য সংশোধন করে। যেহেতু সাক্ষীর উক্ত ঘাবড়ে যাওয়ার সমস্যা বা ওজর সকলের কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য তাই তার সংশোধিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। মোটকথা, সাক্ষীর ওজর প্রথম মজলিসে থাকা অবস্থায় গ্রহণযোগ্য যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়।

পক্ষান্তরে যদি সাক্ষী প্রথম মজলিস ত্যাগ করার পর তার বক্তব্য সংশোধন করতে চায় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল এই যে, বিচারকের মজলিস ছেড়ে যাওয়ার পর সাক্ষীর সাথে বাদীর দেখা হবে। বাদী সাক্ষীকে বিভিন্ন লোভ-প্রলোভনের মাধ্যমে তার সাক্ষ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাদী সাক্ষীকে বলতে পারে যে, তুমি বল বিবাদী আমার কাছে এক হাজার নয়; বরং পাঁচশত টাকা পায়। যদি তুমি এরূপ বল তাহলে তোমাকে একশত টাকা দেব ইত্যাদি। সাক্ষী চিন্তা করতে পারে যে, যদি একশত টাকা পাই তাহলে মন্দ কি সাক্ষ্যটা পরিবর্তন করে ফেলি। মোটকথা, বিচারকের মজলিস ছেড়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য পরিবর্তনের ব্যাপারে ঘোরতম সন্দেহ আছে। আর এজন্য তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার মধ্যে অধিকতর সতর্কতা রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বিচারকের মজলিস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সাক্ষীর মজলিস একটি। একটি মজলিসে অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিষয়কে মজলিস অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। একটি মজলিসে অনুষ্ঠিত সব কথাবার্তা একটি কালাম বলে সাব্যস্ত হয়। অতএব, সাক্ষী কর্তৃক তার কথা সংশোধন যেন ভিন্ন কিছু নয়, তার মূল কথার অংশবিশেষ মাত্র। অতএব, সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়া বিষয়ের সংশোধন ভিন্ন কথা বলে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে যখন সে মজলিস ছেড়ে চলে যাবে তখন তার কথা পূর্ববর্তী কথার সাথে যুক্ত হবে না। কারণ, মজলিস খতম হওয়াতে তার আগের কথার সাথে পরের কথার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। যেহেতু দু-কথার মাঝে সম্পর্ক নেই, তাই পরের বক্তব্য মূল সাক্ষ্যের সাথে যুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا إِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মজলিসের মাঝে দেওয়া বক্তব্য এবং মজলিস খতম হওয়ার পর দেওয়া বক্তব্যের মাঝে যে পার্থক্য উপরে আলোচিত হয়েছে উক্ত পার্থক্য প্রযোজ্য হবে যদি কেউ হদসমূহের ক্ষেত্রে কিংবা বংশ বর্ণনায় ভুল করে পরে তা সংশোধন করে। যেমন– এক ব্যক্তি বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলার সাথে ঐ ঘরের পশ্চিম কোণে ব্যভিচার করেছেন– আমি তা দেখেছি। অতঃপর বিচারকের মজলিস ত্যাগ করার পূর্বেই সাক্ষ্য সংশোধন করে বলল যে, আসলে তারা ঘরের পূর্ব কোণে ব্যভিচার করেছে তাহলে সাক্ষীর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সে মজলিস থেকে চলে আসে, তারপর তার আগের বক্তব্যের মাঝে কোনো সংশোধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন করে তাহলে তার সে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

বংশ বর্ণনায় এর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্য দিল যে, খালেদের ছেলে হারুন, হারুনের ছেলে রাশেদ। অতঃপর মজলিসে থাকাবস্থায় তার মাঝে সংশোধনী দিয়ে বলল যে, খালেদের ছেলে রাশেদ, রাশেদের ছেলে হারুন। তার এ সংশোধনী গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে যদি মজলিস খতম হওয়ার পর তার বক্তব্য সংশোধন করে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক মজলিসে থাকাবস্থায় সাক্ষ্যের মধ্যে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন গ্রহণযোগ্য হওয়া, আর মজলিস খতম হওয়ার পর তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিধান তখনই হবে যদি সাক্ষ্যের ব্যাপারে প্রতারণা কিংবা খিয়ানত করার কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যদি সাক্ষীর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না হয়, তাহলে সাক্ষীর বক্তব্য সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মজলিস থাকাবস্থায় যেমন গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ মজলিস খতম হওয়ার পরও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, আর স্বাভাবিক বিধানও তাই যে, কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণত মানুষের সন্দেহের উদ্রেক হয় না। সাক্ষীর ভুলের উদাহরণ এই যে, সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে أَشْهَدُ শব্দটি ভুলে গেল, অথচ তার أَشْهَدُ শব্দটি উচ্চারণ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয়। অথবা সাক্ষী বাদী কিংবা বিবাদী কোনো একজনের নাম ভুলে গেল কিংবা তাদের দুজনের কারো প্রতি ইশারা করতে ভুলে গেল ইত্যাদি। পরবর্তীতে সে তার কথা শুধরে أَشْهَدُ সহ বলল অথবা বাদী/ বিবাদীর নামোল্লেখ করল কিংবা ইশারা করল তবে তা মূল সাক্ষ্যের সাথে যুক্ত হবে এবং তার এ শুধরানো বৈধ সাব্যস্ত হবে। প্রথম মজলিস থাকাবস্থায় হোক কিংবা মজলিস খতম হওয়ার পর পরবর্তী মজলিসে যেভাবেই হোক না কেন।

আর যদি বিচারকের কাছে সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট না হয় তাহলে বিচারক সাক্ষী সম্পর্কে জানতে চাইবেন। যদি সাক্ষী সম্পর্কে লোকেরা সাক্ষ্যদান করে যে, সে ন্যায়পরায়ণ ও ভালো, তাহলেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তার সম্পর্কে লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে ন্যায়পরায়ণ নয় তাহলে তার পরবর্তীতে দেওয়া বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يُقْبَلُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জাহেরী রেওয়ায়েতের বিপরীত মতের উল্লেখ করছেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা জাহেরী রেওয়ায়েতের অনুযায়ী। এর বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যদি সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তার সংশোধনী বক্তব্য এক মজলিসে থাকা অবস্থায় যেমন গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ মজলিস পরিবর্তন হওয়ার পরও গ্রহণযোগ্য। সংশোধিত বক্তব্য সন্দেহজনক হলেও গ্রহণযোগ্য আর সন্দেহজনক না হলেও গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে জাহেরী রেওয়ায়েতের বক্তব্য হলো সন্দেহজনক না হলেই গ্রহণযোগ্য।

بَابُ الْاِخْتِلَافِ فِى الشَّهَادَةِ

قَالَ : اَلشَّهَادَةُ اِذَا وَافَقَتِ الدَّعْوٰى قُبِلَتْ وَاِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ لِاَنَّ تَقَدُّمَ الدَّعْوٰى فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قُبُوْلِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِيْمَا يُوَافِقُهَا وَانْعَدَمَتْ فِيْمَا يُخَالِفُهَا ـ

পরিচ্ছেদ : সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সাক্ষ্য দাবির অনুযায়ী হয় তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর যদি সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী না হয় তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মানুষের হক সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তই হলো আগে সে হকের দাবি করতে হবে। যে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী হয় সেখানে সে শর্ত পাওয়া গিয়েছে। যেখানে দাবি অনুযায়ী হয় না সেখানে সে শর্ত অনুপস্থিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : এ পরিচ্ছেদে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের মতৈক্য সম্পর্কিত বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। মতৈক্য হলো আসল বা স্বাভাবিক আর মতপার্থক্য হলো অস্বাভাবিক। এজন্য মুসান্নিফ (র.) মতপার্থক্যের পরিচ্ছেদ পরে এনেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : اَلشَّهَادَةُ اِذَا وَافَقَتْ الخ : دَعْوٰى বা দাবি বলা হয় কোনো ব্যক্তির বিচারকের মজলিসে তার কোনো হকের দাবি করা। তবে সে তার অনুকূলে হক প্রমাণিত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বাদীর দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য না দেওয়া হয় তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দাবি ও সাক্ষ্য আরযের [عَرَض-এর] নয়টি বিষয়েরই অনুকূল হওয়া। যেমন– ১. نَوْع ২. كَيْف ৩. كَمْ ৪. زَمَانْ ৫. مَكَانْ ৬. فِعْل ৭. اِنْفِعَالْ ৮. وَضْع ৯. مِلْك ইত্যাদি সর্ববিষয়ে একটি অপরটির অনুযায়ী হওয়া।

১. সুতরাং বাদী যদি বিবাদীর কাছে দশ দিরহাম দাবি করে, অতঃপর সাক্ষীরা দশ দিনারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা نَوْع বা প্রকারগতভাবে দুই দাবি ও সাক্ষ্যের মাঝে মিল পাওয়া যায়নি।

২. অদ্রূপ যদি বাদী বিবাদীর কাছে বিশ দিরহাম দাবি করে, আর সাক্ষীরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে সে বিবাদীর কাছে ত্রিশ দিরহাম পায় তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সংখ্যাগতভাবে [كَمِّيَّةٌ-এর দিক থেকে] দাবি ও সাক্ষ্য এক হয়নি।

৩. তদ্রূপ যদি বাদী দাবি করে আমার লাল কাপড় অমুকে চুরি করেছে কিন্তু সাক্ষীরা বলে যে, তার নীল কাপড় বিবাদী চুরি করেছে তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে كَيْف-এর দিক থেকে দাবি ও সাক্ষ্যের মধ্যে অমিল রয়েছে।

৪. অনুরূপভাবে যদি বাদী দাবি করে যে, অমুকে গত শনিবার ঢাকায় আমার থেকে দশ হাজার টাকা নিয়েছে, আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী গত সোমবারে বরিশালে দশ হাজার টাকা নিয়েছে তাহলে স্থান ও জামানার দিক থেকে সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী না হওয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. অদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, বিবাদী আমার ব্যাগ কেটে তা থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী তার ব্যাগ খুলে তা থেকে টাকা নিয়েছে তাহলে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে اِنْفِعَالْ وَفِعْل-এর দিক থেকে দাবি ও সাক্ষ্য এক হয়নি।

৬. অনুরূপভাবে যদি কেউ দাবি করে যে, অমুকে আমার পশ্চিম দিকের জমি দখল করেছে, আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, বিবাদী তার পূর্ব দিকের জমি দখল করেছে তাহলে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ সাক্ষ্য وَضْع -এর দিক থেকে দাবির অনুযায়ী হয়নি।

৭. কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, অমুক বস্তু আমার মালিকানাধীন আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, বস্তুটি তার ছেলের মালিকানাধীন তাহলে সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী না হওয়ার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এখানে مِلْك -এর দিক দিয়ে দাবি ও সাক্ষ্য ভিন্ন হয়ে গেছে।

৮. যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, অমুক আমার গোলাম। কেননা সে আমার খাদীজা নামের দাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে, সে তার ফাতেমা নামের দাসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে এমতাবস্থায় নিসবত তথা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের সাথে দাবির মিল না হওয়াতে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত সব বিষয়ে দাবির সাথে সাক্ষ্যের মিল হলে সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী হয়েছে তা ধরে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কোনো একটি বিষয়ে যদি দাবি ও সাক্ষ্যের মাঝে মিল না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, হুকূকুল ইবাদ বা মানুষের বিভিন্ন হকের ক্ষেত্রে প্রথমে দাবি উত্থাপন করতে হবে। অতঃপর যখন সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী হলো তখন তো দাবি আগে হয়েছে এ শর্তটি পাওয়া গেল আর তাই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী না হলে দাবি আগে করার শর্তটি না পাওয়াতে সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।

এখন আমাদের এ বিষয়টি জানা দরকার যে, সাক্ষ্যদানের পূর্বে দাবি করার শর্ত কেন আরোপ করা হয়েছে। এর উত্তর হলো, বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্যে। আর বিচারকার্য সম্পাদনের প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন বাদী ও বিবাদীর মাঝে ঝগড়া করার বিষয় প্রমাণিত হয়। ঝগড়া বা বিবাদের উৎপত্তি হলো বাদী কর্তৃক কোনো কিছুর দাবি করা। সুতরাং দাবি সর্বাগ্রে করা জরুরি।

অতঃপর বাদীর সাক্ষ্য যখন দাবি অনুযায়ী হয় তখন আগে দাবি করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আর সাক্ষ্য বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা দাবিকে সমর্থন ও প্রমাণিত করে। সুতরাং যখন সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেবে তারা যেন দাবিকে সত্যায়ন করছে। আর কোনো বিষয়ের সত্যায়নের জন্যে সে বিষয়টি প্রথম থেকে অস্তিত্ববান থাকা আবশ্যক। মোটকথা যখন সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী হলো তখন দাবি অগ্রবর্তী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত তথা দাবি অগ্রবর্তী হওয়ার শর্তও পাওয়া গেল। অতএব, এখানে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে যখন দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য না হয় সেখানে সাক্ষী সত্যবাদী এ কথা প্রমাণিত হয়, বাদীর সত্যবাদিতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং সাক্ষীর সাক্ষ্য যেহেতু দাবির সাথে মিলছে না তাই সাক্ষীগণ দাবিকৃত বিষয়টি মিথ্যা এ কথা বলছে। দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার অর্থ দাবি না থাকা। সুতরাং এখানে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে দাবি থাকতে হবে এ শর্তটি পাওয়া গেল না। অথচ এটাই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত। যখন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তই পাওয়া গেল না তখন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা নিয়ম হলো– إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ যখন শর্ত না থাকে তখন শর্ত সম্পর্কিত বিষয়টি অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

قَالَ : وَيُعْتَبَرُ اِتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فَاِنْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِاَلْفٍ وَالْاٰخَرُ بِاَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهٗ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْاَلْفِ اِذَا كَانَ الْمُدَّعِىْ يَدَّعِى الْاَلْفَيْنِ وَعَلٰى هٰذَا الْمِائَةُ وَالْمِائَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالثَّلٰثُ لَهُمَا اَنَّهُمَا اِتَّفَقَا عَلَى الْاَلْفِ اَوِ الطَّلْقَةِ وَتَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا بِالزِّيَادَةِ فَيَثْبُتُ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ دُوْنَ مَا تَفَرَّدَ بِهٖ اَحَدُهُمَا فَصَارَ كَالْاَلْفِ وَالْاَلْفِ وَالْخَمْسِ مِائَةٍ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُمَا اِخْتَلَفَا لَفْظًا وَذٰلِكَ يَدُلُّ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْمَعْنٰى لِاَنَّهٗ يُسْتَفَادُ بِاللَّفْظِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْاَلْفَ لَا يُعَبَّرُ بِهٖ عَنِ الْاَلْفَيْنِ بَلْ هُمَا جُمْلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَحَصَلَ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَصَارَ كَمَا اِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَالِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী উভয় সাক্ষীর বক্তব্য শব্দগত ও অর্থগতভাবে একইরূপ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি দুজনের একজন একহাজার টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, আর অন্যজন দু-হাজার টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী যদি বাদী দুহাজারের দাবি করে তাহলে একহাজারের পক্ষে তাদের উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ মতবিরোধ যদি একশত/ দুশতের ব্যাপারে হয় কিংবা এক তালাক/ দু-তালাকের ব্যাপারে হয় কিংবা এক তালাক ও তিন তালাকের ব্যাপারে হয় [তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী দুয়ের মাঝে যে সংখ্যা কম তার উপর উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য বাতিল।] সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তারা একটি সংখ্যার ব্যাপারে উভয়ে একমত হয়েছে। [যেমন– দুহাজার ও একহাজারের মধ্যে এক হাজারের ব্যাপারে অথবা এক তালাকের ব্যাপারে উভয়ে একমত।] অতঃপর যেন একজন বেশী দাবি করছে। সুতরাং তারা যে বিষয়ে উভয়ে একমত হয়েছে তাই প্রমাণিত হবে, একজন আলাদা করে যা বলছে তা প্রমাণিত হবে না। সুতরাং সাক্ষীদ্বয়ের একজন একহাজার আর অন্যজন যেন দেড় হাজার -এর সাক্ষ্য দিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, তাদের দুজনের বক্তব্যের মাঝে শব্দগত পার্থক্য হয়েছে। আর শব্দগত পার্থক্য অর্থগত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিতবহন করে। কেননা শব্দ থেকে অর্থের সৃষ্টি হয়। শব্দগত পার্থক্যের কারণ এই যে, একহাজার (اَلْف) বলে দুহাজারকে বুঝানো যায় না; বরং দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য। সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয়ে একজন করে সাক্ষী হলো। যেন ভিন্ন মালে ভিন্ন সাক্ষী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَيُعْتَبَرُ اِتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের যে মতবিরোধ তার একটি উদাহরণ ইমাম কুদূরী (র.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে সাহেবাইন (র.)-এর মতবিরোধও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্যের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত মিল থাকতে হবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষীদ্বয়ের একজন এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের কাছে একহাজার টাকা পায়। আর অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার কাছে দুহাজার টাকা পায়। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ নিয়ে ইমাম আযমের সাথে সাহেবাইন (র.)-এর মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম সাহেবের মতে, এরূপ সাক্ষ্য বাতিল। কেননা সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্যের মাঝে শব্দগত ও অর্থগত পার্থক্য বিদ্যমান।

সাহেবাইন (র.) বলেন, এ অবস্থায় এক হাজারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য; দু-হাজারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বাতিল। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো বাদী দু-হাজারের দাবিদার হতে হবে।

একই ধরনের মতবিরোধ রয়েছে যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন দু তালাকের কথা বলে, আর অন্যজন এক তালাকের কথা বলে তদ্রূপ একজন একশত টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর অন্যজন দু-শত টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এসব সুরতে দু-সংখ্যার মধ্যে যেটা কম তার উপর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সাহেবাইনের মতানুযায়ী। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবের মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য বাতিল।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন যে, দুজন সাক্ষী একটি সংখ্যার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে, তা হলো নিম্নের সংখ্যা। যেমন দু-সংখ্যার দুই ও একহাজারের মধ্যে তারা একহাজারের ব্যাপারে উভয়ে একমত হয়েছে যে, বাদী একহাজার টাকা পায়। অতঃপর একজন বলছে আরো এক হাজার (১০০০+১০০০= ২০০০) পায়। সুতরাং তাদের ঐকমত্যের সংখ্যা হলো একহাজার আর মতবিরোধের সংখ্যা হলো দুই হাজার। সাহেবাইন (র.) বলেন, তারা যে সংখ্যার ব্যাপারে একমত হয়েছে আমরা সেটা গ্রহণ করব, আর যে সংখ্যার ব্যাপারে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে সেটা অগ্রাহ্য হবে।

একই হুকুম প্রযোজ্য হবে একশত ও দুইশত টাকার ব্যাপারে যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়। এক সাক্ষী বলল, বাদী একশত টাকা পায়। অন্যজন বলল, বাদী দুশত টাকা পায়।

তদ্রূপ যদি দুজন সাক্ষীর একজন বলে যে, বাদী এক তালাক দিয়েছে আর অন্যজন বলে যে, বাদী দু-তালাক দিয়েছে। আর এ ব্যাপারে বাদীর বক্তব্য দুতালাক হয়ে থাকে তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য এক তালাকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে এবং দু'তালাকের ব্যাপারে অগ্রাহ্য হবে।

সাহেবাইন (র.) তাদের বক্তব্যের পক্ষে একটি ঐকমত্যের মাসআলা দিয়ে মজবুত করছেন। মাসআলাটি হলো, যদি দুজন সাক্ষীর একজন বলে যে, বাদী একহাজার টাকা পায় আর অন্যজন বলে যে, বাদী দেড়হাজার টাকা পায় তাহলে একহাজারের ব্যাপারে উভয়ের সাক্ষ্য সবার ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, দেড়হাজার ও একহাজারের। তাদের উভয়ের বক্তব্য পার্থক্যপূর্ণ হওয়ার পরও যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ সকলের মতে একহাজারের ব্যাপারে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে একহাজার ও দুহাজারের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও এক হাজারের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُمَا اِخْتَلَفَا الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্যে শব্দগত পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, একজন বলেছে– একহাজার টাকা পায়। আর অন্যজন বলেছে– দু-হাজার টাকা পায়। আর শব্দগত পার্থক্য থেকেই অর্থগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কেননা অর্থের উৎস হলো শব্দ। এখানে এটা স্পষ্ট যে, একহাজার যা বুঝায়, দু-হাজার তা বুঝায় না এবং একহাজার (اَلْفٌ) বলে দু'হাজার (اَلْفَانِ) বুঝানো যায় না। তদ্রূপ দু'হাজার (اَلْفَانِ) বলে এক হাজার (اَلْفٌ) -কে ব্যক্ত করা যায় না। সারকথা সাক্ষীদ্বয়ের একজনের বক্তব্য অন্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং দুজনের বক্তব্যের মর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। যেহেতু দুজনের বক্তব্য দুরকম সুতরাং একেকটি বাক্যে একজন করে সাক্ষী সাব্যস্ত হলো। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, পারিভাষিক সাক্ষ্য (شَهَادَةٌ) বলা হয় দুজন সাক্ষীর সম্মিলিত সাক্ষ্য/ বক্তব্যকে। একজনের সাক্ষ্যকে পরিভাষায় সাক্ষ্য বলে না। সুতরাং দুজনের কারো বক্তব্যে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষ্য পাওয়া গেল না তাই তাদের কারো বক্তব্য প্রমাণিত হবে না; বরং তাদের বক্তব্য যেন ভিন্ন ধরনের দুটি মালের ব্যাপারে হলো। যেমন– সাক্ষীদ্বয়ের একজন যেন বলল, বাদী একহাজার কেজি ধান পায় আর অন্যজন বলল, একহাজার কেজি গম পায়। সেক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্যের মাঝে মতবিরোধ পাওয়া যাওয়াতে যেমন কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَالَ : وَاِنْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِاَلْفٍ وَالْاٰخَرُ بِاَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَالْمُدَّعِىْ يَدَّعِىْ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْاَلْفِ لِاِتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا لَفْظًا وَمَعْنًى لِاَنَّ الْاَلْفَ وَالْخَمْسَ مِائَةَ جُمْلَتَانِ عُطِفَ اِحْدٰيهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى وَالْعَطْفُ يُقَرِّرُ الْاَوَّلَ وَنَظِيْرُهُ الطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالنِّصْفُ وَالْمِائَةُ وَالْمِائَةُ وَالْخَمْسُوْنَ بِخِلَافِ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ لِاَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ فَهُوَ نَظِيْرُ الْاَلْفِ وَالْاَلْفَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সাক্ষীদ্বয়ের একজন একহাজার টাকা পায় বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্যজন দেড়হাজার টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এমতাবস্থায় বাদী যদি দেড় হাজার টাকার দাবি করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য দেড় হাজারের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সাক্ষীদ্বয় এক হাজারের ব্যাপারে শব্দগত ও অর্থগতভাবে ঐকমত্যে পৌছেছে। [উল্লেখ্য যে,] اَلْاَلْفُ وَالْخَمْسُ مِائَةَ দুটি বাক্য যার একটিকে অপরটির সাথে আতফ [সংযুক্ত] করা হয়েছে। আতফ প্রথমটিকে প্রমাণ করে। এর নজির হলো, একজন সাক্ষী এক তালাক এবং অন্য সাক্ষী এক তালাক ও অর্ধেক তালাক বলা। একজন একশত টাকা আর অন্যজন একশত ও পঞ্চাশ [দেড়শত]। এর ব্যতিক্রম হলো দশ (عَشَرَةٌ) ও পনের (خَمْسَةَ عَشَرَ)। কেননা এ দু-সংখ্যার মাঝে কোনো আত্‌ফের হরফ নেই। সুতরাং এটি এক হাজার ও দু-হাজারের অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِنْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِاَلْفٍ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) আগের ইবারতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি মাসআলার আলোচনা করেছেন। আগের মাসআলার সাথে এ মাসআলার পার্থক্য হলো, আগের মাসআলায় ইমামগণের মতবিরোধ ছিল, আর এ মাসআলা সর্বসম্মত। তাছাড়া এ মাসআলার আলোচনা দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর একটি জবাব হয়ে গিয়েছে। সাহেবাইন (র.) اَلْفٌ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ-কে- اَلْفٌ وَاَلْفَيْنِ-এর উপর কিয়াস করেছিলেন।

মাসআলা : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কেউ দেড়হাজার টাকা বিবাদীর কাছে দাবি করে অতঃপর দুজন সাক্ষী উপস্থিত করে। সাক্ষীদ্বয়ের একজন যদি বলে, বাদী একহাজার টাকা পায় আর অন্যজন বলল, বাদী দেড়হাজার টাকা পায়। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে যে মতবিরোধ পাওয়া গেল তার কারণে কোনো ইমামের মতেই তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী বাতিল না হওয়ার কারণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মতে, শব্দগত মিল থাকা আবশ্যক নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বাতিল হবে না। কারণ, তাঁর মতে, উভয় সাক্ষীর বক্তব্যের মধ্যে যে শব্দগত মিল থাকা শর্ত তা এতে খণ্ডিত হয়নি।

উভয় সাক্ষীর বক্তব্যের মাঝে যে শব্দগত মিল আছে তার বর্ণনা হলো, اَلْاَلْفُ وَالْخَمْسُ مِائَةَ এ বক্তব্যে দুটি বাক্য আছে। দুটি বাক্যের মাঝে একটি حَرْفُ عَطْفٍ-ও আছে। আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী বাক্য দুটি পরস্পর বিপরীত। কেননা প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো আতফ বৈপরীত্য প্রমাণ করে এবং আতফ প্রথম অংশ তথা مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ-কে প্রমাণ করে। সুতরাং দ্বিতীয় সাক্ষী

যখন اَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ -কে আতফের সাথে বলল, তখন সে যেন একহাজারকে প্রমাণ করল আর প্রথম সাক্ষী তো একহাজার (الف) -এর কথা বলেছিলই। সারকথা উভয় সাক্ষী তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে শব্দগতভাবে একহাজারকে প্রমাণ করেছে। যখন উভয় সাক্ষী যুগপৎভাবে বাদী একহাজার টাকা পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে তখন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত পাওয়া যাওয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُهُ الطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالنِّصْفُ الخ : মুসান্নিফ (র.) উপরের মাসআলার সমর্থনে এখানে আরো দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। প্রথম মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি দাবি করল, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। অতঃপর দুজন সাক্ষী তার পক্ষে তালাকের সাক্ষ্য দিল। একজন বলল, সে এক তালাক দিয়েছে আর অন্যজন বলল, এক তালাক এবং অর্ধেক তালাক দিয়েছে। আর বাদীর বক্তব্য দ্বিতীয় সাক্ষীর অনুযায়ী। এমতাবস্থায় সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী এক তালাকের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ মাসআলাতেও দ্বিতীয় সাক্ষীর বক্তব্য প্রথম সাক্ষীর বক্তব্যের চেয়ে বাহ্যিকভাবে ভিন্ন হলেও তার বক্তব্য মূলে শাব্দিকভাবে প্রথম সাক্ষীর বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন নয়। কারণ, দ্বিতীয় সাক্ষী তার বক্তব্য আতফের সাথে বলেছে। আর مَعْطُوْف عَلَيْه হলো এক তালাক। আতফ একে প্রমাণ করছে। অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তির পক্ষে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে বিবাদীর কাছে একশত টাকা পায়। আর অন্য সাক্ষী বলল যে, সে একশত এবং পঞ্চাশ (১০০+৫০=১৫০) তথা দেড়শত টাকা পায়। এখানেও একশত টাকার পক্ষে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে উপরের মাসআলার ব্যতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করছেন। তা এই যে, এক ব্যক্তি বিচারকের সামনে অন্যের কাছে পনের (خَمْسَةَ عَشَرَ) টাকা পাওয়ার দাবি করল। অতঃপর দুজন সাক্ষী তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল। তবে তাদের একজন বলল, সে বিবাদীর কাছে দশ টাকা পায় আর অন্যজন বলল, সে বিবাদীর কাছে পনের (خَمْسَةَ عَشَرَ) টাকা পায়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সাক্ষীর বক্তব্য শাব্দিকভাবে প্রথম সাক্ষীর বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন হয়েছে। কেননা, দ্বিতীয় সাক্ষী পনের কথাটি আতফ ছাড়া বলেছে। সে خَمْسَةٌ وَعَشَرٌ বলেনি। যেহেতু আতফ ছাড়া خَمْسَةَ عَشَرَ -এর হুকুম এক, সেহেতু عَشَرَ এবং خَمْسَةَ عَشَرَ -এর মাঝে تَبَايُنْ বৈপরীত্যের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং দু'জন সাক্ষীর বক্তব্য পরস্পর ভিন্ন হলো তাই এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। অবশ্য সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য দশের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সাহেবাইন উভয় সাক্ষীর বক্তব্যের মধ্যে শাব্দিক মিলের শর্তারোপ করেননি। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু সাক্ষীর বক্তব্য এক হয়নি, সুতরাং এটি এক হাজার ও দু'হাজারের মতই হলো।

জ্ঞাতব্য : প্রকাশ থাকে যে, এক হাজার ও এক হাজার পাঁচশত এবং একশত ও একশত পঞ্চাশ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এক হাজার ও একশতের ব্যাপারে সাক্ষ্য তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি কথাগুলো সাক্ষীরা আরবীতে বলে। যদি তারা বাংলায় বলে তাহলে দ্বিতীয় সাক্ষী এক হাজার ও পাঁচশত/একশত ও পঞ্চাশ বলতে হবে। যদি সাক্ষী অন্যভাষায় আতফ ছাড়া বলে যেমন সাক্ষী বলল, পনেরশত/দেড়শত তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। মোটকথা সাক্ষী যে ভাষাতেই সাক্ষ্য দিবে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে আতফসহ বলতে হবে। নচেৎ তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيْ لَمْ يَكُنْ لِيْ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَلْفُ فَشَهَادَةُ الَّذِيْ شَهِدَ بِالْأَلْفِ وَالْخَمْسِ مِائَةٍ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ الْمُدَّعِيْ فِي الْمَشْهُوْدِ بِهِ وَكَذَا إِذَا سَكَتَ إِلَّا عَنْ دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ التَّكْذِيْبَ ظَاهِرٌ فَلَابُدَّ مِنَ التَّوْفِيْقِ وَلَوْ قَالَ كَانَ أَصْلُ حَقِّيْ أَلْفًا وَّخَمْسَ مِائَةٍ وَلٰكِنِّيْ اِسْتَوْفَيْتُ خَمْسَ مِائَةٍ أَوْ أَبْرَأْتُهُ عَنْهَا قُبِلَتْ لِتَوْفِيْقِهِ ـ

অনুবাদ : যদি বাদী এরূপ বলে যে, তার কাছে আমার পাওনা কেবল এক হাজার। তাহলে যে সাক্ষী দেড় হাজারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। কেননা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তাতে বাদী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। তদ্রূপ যদি এক হাজার ব্যতীত অন্য ব্যাপারে বাদী চুপ থাকে তাহলেও দেড় হাজারের সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল। কেননা এখানেও মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা দু বক্তব্যের সমন্বয় আবশ্যক। আর যদি বাদী বলে যে, আমার মোট পাওনা পনেরো শত, তবে আমি পাঁচশত উসুল করে নিয়েছি কিংবা পাঁচশত টাকা দেনা থেকে মুক্ত করে দিয়েছি, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কেননা তখন দু বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيْ لَمْ يَكُنْ لِيْ الخ : উপরের ইবারতের মাসআলাটি আগের মাসআলাগুলোর সাথে অনেকটা সম্পর্কিত। আগে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছিল যে, দুজন সাক্ষী যদি দু রকম বক্তব্য পেশ করে, সে অবস্থায় বাদী যদি বেশি সংখ্যা দাবি করে তাহলে তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ ইবারতে বলা হয়েছে যে, যদি বাদী কম সংখ্যা দাবি করে, তাহলে যে সাক্ষী বেশি সংখ্যার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

মাসআলার সুরত এই যে, এক ব্যক্তি বিচারকের আদালতে বলেছে যে, আমি অমুকের কাছে মাত্র এক হাজার টাকা পাই, অতঃপর দুজনের দুজন সাক্ষীর মধ্য থেকে কোনো একজন সাক্ষী তার পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, বাদী অমুকের কাছে দেড় হাজার টাকা পায়, তাহলে এ সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সাক্ষীর বক্তব্য বাদীর দাবির দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

মাসআলার আরেকটি সুরত এই যে, বাদী আদালতে এক হাজার টাকার দাবি করল; কিন্তু এর বেশি পায় কিনা? এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা হতে বিরত রইল। এমতাবস্থায়ও সাক্ষীর দেড় হাজারের বক্তব্য অগ্রাহ্য হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, বাদী তো পনেরো শত টাকার ব্যাপারে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে পাঁচশত টাকার ব্যাপারে। সুতরাং এক হাজারের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। অথচ তার সাক্ষ্য একেবারেই অগ্রাহ্য হলো।

এর উত্তর হলো যখন বাদী সাক্ষীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়াতে ফাসিক হয়ে গেল। আর ফাসিকের সাক্ষ্য কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এক হাজারের ক্ষেত্রেও তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

মোটকথা, যখন বাদীর মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে গেল, তখন বাদীর দাবির পক্ষে একজন সাক্ষী রইল। আর একজন সাক্ষীর দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় বাদীর দাবিকৃত এক হাজার টাকা প্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণ হবে না।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنَ التَّوْفِيْقِ : এখানে সাক্ষীর বক্তব্যের সাথে বাদীর বক্তব্যের সরাসরি বিরোধ হলে সেটা কেন পরিত্যাজ্য, গ্রন্থকার তা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, দুজনের বক্তব্যের মাঝে যেভাবেই হোক সমন্বয় করতে হবে। যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সাক্ষীর বক্তব্য পরিত্যাজ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ كَانَ أَصْلُ حَقِّيْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বাদী এরূপ বলে যে, আমার মূল পাওনা পনেরো শত ছিল। অতঃপর আমি তার থেকে পাঁচশত টাকা আদায় করে নিয়েছি কিংবা যদি বলে, আমি পাঁচশত টাকা দায় থেকে তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। এ অবস্থায় বাদী ও সাক্ষীর বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় হওয়াতে সাক্ষীর বক্তব্য গ্রাহ্য হবে। সমন্বয় এভাবে করা যায় যে, সাক্ষী মূল লেনদেন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর বাদীর পাওনা সংক্রান্ত দাবি পরবর্তীতে সংঘটিত লেনদেন/কথাবার্তার ভিত্তিতে হয়েছে। সাক্ষী সম্ভবত তাদের মাঝে পরে সংঘটিত কথাবার্তা সম্পর্কে অবগত নয়। এজন্য সে প্রথম লেনদেনের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়েছে। মোটকথা এ সুরতে যেহেতু দু'জনের বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় সম্ভব তাই সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এক হাজার টাকা বাদীর পাওনা বলে সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَاِذَا شَهِدَا بِالْفٍ وَقَالَ اَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْاَلْفِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ اِنَّهُ قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ لِاَنَّهُ شَهَادَةُ فَرْدٍ اِلَّا اَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ اٰخَرُ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَقْضِىْ بِخَمْسِ مِائَةٍ لِاَنَّ شَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُوْنُ شَهَادَتِهِ اَنْ لَا دَيْنَ اِلَّا خَمْسَ مِائَةٍ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু'জন সাক্ষী এক হাজার টাকা পাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর এক সাক্ষী বলে যে, দেনাদার পাঁচশত টাকা পরিশোধ করেছে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এক হাজার টাকার ব্যাপারে। কেননা, তারা উভয়ে এক হাজার টাকার ব্যাপারে একমত হয়েছে। তবে যে সাক্ষী বলেছে, পাঁচশত পরিশোধ করেছে, তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটি তো এক ব্যক্তির সাক্ষ্য [তথা উক্তি, একজনের উক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা হয় না] অবশ্য যদি তার সাথে আরেকজন সাক্ষ্য দেয় [তাহলে সেই বক্তব্য কার্যকর হবে।] ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচারক এ অবস্থায় পাঁচশত টাকা প্রদান করার রায় দিবেন। কেননা, পরিশোধ করা হয়েছে বলে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তার সাক্ষ্যের মূল বক্তব্য এই যে, তার পাওনা [মাত্র] পাঁচশত। [আর ইতোপূর্বে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, দু-সাক্ষীর মধ্যে যে কম পরিমাণ উল্লেখ করেছে তার সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারক রায় দিবেন।] তার বক্তব্যের জবাব আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا شَهِدَا بِالْفٍ وَقَالَ اَحَدُهُمَا الخ : সাক্ষীদের বক্তব্যের মাঝে মতপার্থক্য সংক্রান্ত আরেকটি মাসআলা এ ইবারতে আলোচিত হয়েছে।

সূরতে মাসআলা এই যে, দুজন সাক্ষী কারো পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে অমুকের কাছে এক হাজার টাকা পায়। অতঃপর দুজনের একজন বলল যে, বিবাদী এক হাজার থেকে পাঁচশত টাকা পরিশোধ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় এক হাজার টাকা পাওনা সংক্রান্ত তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পরবর্তীতে একজন সাক্ষী যে বলেছে যে, দেনাদার পাঁচশত টাকা পরিশোধ করেছে, তার সে বক্তব্য শুনা হবে না অর্থাৎ গ্রাহ্য নয়। কেননা এক হাজার টাকা পাওনার ব্যাপারে দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে, তার পাঁচশত টাকা পরিশোধের ব্যাপারে একজন বলেছে। আর যে কোনো প্রমাণের জন্য কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। একজনের বক্তব্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। সুতরাং দুজনের সাক্ষ্য দ্বারা যা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, একজনের বক্তব্য দ্বারা সেটাকে বাতিল করা যাবে না। তবে যদি অপর সাক্ষী তার সাথে একমত হয়ে যায় যে, দেনাদার তার দেনা থেকে পাঁচশত টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা পাঁচশত টাকা পরিশোধের ব্যাপারে দুজনের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য এই যে, পাঁচশত টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত একজন সাক্ষীর বক্তব্য এখানে গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারে তার যুক্তি এই যে, একজন সাক্ষীর প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যের সার এইযে, বাদী যেন বিবাদীর কাছে মোট টাকা পায় পাঁচশত টাকা। ইতিপূর্বে এ কথা বলা হয়েছে যে, দু'জন সাক্ষীর যে কম সংখ্যা উল্লেখ করে, তার বক্তব্য সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী গ্রহণযোগ্য হয়।

قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا : মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর জবাবে উল্লেখ করেন যে, তার মতের বিপক্ষে জবাব আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তা এই যে, এক হাজারের ব্যাপারে দু-জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে এবং পাঁচশত টাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে মাত্র একজন। আর কোনো কিছু আরোপিত হওয়ার জন্য দু-জনের সাক্ষ্য আবশ্যক। একজনের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু আবশ্যক হয় না। সুতরাং পাঁচশত টাকার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এক হাজারের ব্যাপারে উভয় সাক্ষী একমত হওয়াতে সেটাই বাস্তবায়িত হবে।

قَالَ : وَيَنْبَغِيْ لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ بِذٰلِكَ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتّٰى يُقِرَّ الْمُدَّعِيْ أَنَّهُ قَبَضَ خَمْسَ مِائَةٍ كَيْلَا يَصِيْرَ مُعِيْنًا عَلَى الظُّلْمِ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ رَجُلَانِ شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ بِقَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ قَضَاهَا فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَرْضِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَضَاءِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) لِأَنَّ الْمُدَّعِيْ أَكْذَبَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ قُلْنَا هٰذَا إِكْذَابٌ فِيْ غَيْرِ الْمَشْهُوْدِ بِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَرْضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَعُ الْقُبُوْلَ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাক্ষীর জন্য উচিত হলো, যখন সে জানতে পারবে যে, বিবাদী পাঁচশত টাকা আদায় করেছে সে এক হাজার টাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে না। তবে যখন বাদী স্বীকারোক্তি দেবে যে, সে পাঁচশত টাকা উসুল করেছে [তখনই সাক্ষ্য দেবে] যাতে সে অত্যাচারীর সাহায্যকারী না হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, দুজন সাক্ষী এক ব্যক্তির ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দিল যে, তার এক হাজার টাকা কর্জ রয়েছে অতঃপর তাদের একজন সাক্ষ্য দিল যে, তা আদায় করে দিয়েছে। তাহলে ঐকমত্যের কারণে দুজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর আদায় করার ব্যাপারে একজন, যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম তাহাবী (র.) উল্লেখ করেন যে, আমাদের ইমামগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যুফার (র.)-এর মত এটাই। কেননা বাদী পরিশোধের ব্যাপারে সাক্ষীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর জবাবে আমরা বলব, প্রথম যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া অন্য বিষয়ে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম সাক্ষ্য ছিল কর্জের ব্যাপারে। আর এরূপ বিষয় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتّٰى يُقِرَّ الْمُدَّعِيْ الخ : ইবারতে বর্ণিত মাসআলার সুরত এই যে, এক ব্যক্তি অন্য আরেক জনের কাছে এক হাজার টাকা কর্জ পাওয়ার দাবি করল। সেই সাথে এও দাবি করল যে, তার কাছে দুজন সাক্ষী আছে। সাক্ষীদের একজন অবশ্য একথা জানে যে, ঋণগ্রহীতা বাদীকে পাঁচশত টাকা পরিশোধ করেছে এবং বাদী সেটা উসুল করেছে। এমতাবস্থায় উক্ত সাক্ষীর নৈতিক দায়িত্ব এই যে, সে বাদীর পক্ষে এক হাজার টাকা পায় এ কথায় সাক্ষী না দেওয়া; বরং সে বাদী পাঁচশত টাকা গ্রহণ করেছে এ স্বীকারোক্তি দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এতে করে বাদীর উপর চাপ সৃষ্টি হবে এবং সে সঠিক কথা বলতে বাধ্য হবে। কেননা বাদীর এরূপ স্বীকারোক্তি দেওয়ার আগেই যদি সে সাক্ষ্য দিয়ে দেয়, তাহলে বিবাদীর উপর জুলুম হলো। আর জুলুমের সাহায্যকারী হলো স্বয়ং সাক্ষী। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষীর জন্যে জেনে-শুনে অন্যের জুলুমের সাক্ষী হওয়া উচিত নয়।

আর যদি সে এরূপ করে যে, এক হাজার টাকা পায় বলে সাক্ষ্য দিল। ফলে একহাজার টাকার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী হলো। অতঃপর তাদের পাঁচশত টাকা পরিশোধ হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিল। যেহেতু একহাজারের ব্যাপারে সাক্ষী দু'জন আর পাঁচশত টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সাক্ষী একজন, তাই এক হাজারের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, আর পাঁচশতের ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, বিবাদীর উপর পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত অবিচার করে চাপিয়ে দেওয়া

হলো। আর এ চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন সাক্ষী সে অবিচারের সহায়তাকারী। পক্ষান্তরে সাক্ষী বাদীর স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর সাক্ষ্য দিলে বিচারক বাদীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পাঁচশত টাকার পক্ষে ফয়সালা দেবেন। ফলে বিবাদীর উপর কোনো অবিচার হবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটি জামিউস সাগীর গ্রন্থে এভাবে আছে যে, দু'ব্যক্তি [সাক্ষী] এক ব্যক্তির বিপক্ষে এভাবে সাক্ষ্য দিল যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি একহাজার টাকা পায় অতঃপর তাদের একজন সাক্ষ্য দিল যে, সে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তাহলে কর্জের ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী একমত হওয়াতে কর্জ অবধারিত হবে। আর পরিশোধের ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য হওয়াতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

জামিউস সাগীর ও কুদূরীর মাসআলায় পার্থক্য এই যে, কুদূরীর মাসআলায় একজন সাক্ষী পাঁচশত টাকা বা অর্ধেক ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। আর জামিউস সাগীরের মাসআলায় দু'জন সাক্ষীর একজন পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِىُّ الخ : এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর মত এই যে, তিনি বলেন, এ মাসআলায় আমাদের কতিপয় মাশায়েখের মতে, এই কর্জের ব্যাপারে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য থাকবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতও তাই। তিনি বলেন, বাদী এক হাজার টাকা দাবি করছে অথচ সাক্ষীদের একজন বলছে, তা পরিশোধ করা হয়েছে। বাদীর স্বীকারোক্তি দ্বারা উক্ত সাক্ষী মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে সে ফাসিক হয়ে যায়। আর ফাসিকের সাক্ষ্য বাতিল, তাই এখানে একজনের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে গেল। এরপর একজনের সাক্ষ্য অবশিষ্ট রইল। একজনের সাক্ষ্য দ্বারা যেহেতু কোনো কিছু প্রমাণ হয় না। তাই এখানে একহাজার টাকা প্রমাণ হবে না।

قَوْلُهُ قُلْنَا هٰذَا اِكْذَابٌ فِىْ غَيْرِ الْمَشْهُوْدِ بِهِ الخ : তাদের বক্তব্যের উত্তরে আমরা বলব, বাদী উক্ত সাক্ষীকে তার প্রথম বক্তব্য/সাক্ষী দেওয়ার বিষয়ে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেনি অর্থাৎ বাদী একহাজার টাকার ব্যাপারে তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেনি তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে তার পরবর্তী বক্তব্যের ব্যাপারে। তার পরবর্তী বক্তব্য হলো বিবাদী পাঁচশত টাকা পরিশোধ করেছে। এভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

এর উদাহরণ এই যে, দু'ব্যক্তি রাশেদের পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, রাশেদ হামেদের কাছে এক হাজার টাকা পায়। এরপর তারা আবার সাক্ষ্য দিল যে, খালিদ রাশেদের কাছে এক হাজার টাকা পায়। তাদের দ্বিতীয় সাক্ষ্যের ব্যাপারে রাশেদ তাদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল তার মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার দ্বারা। তাদের প্রথম দেওয়া বক্তব্য বাতিল হবে না; বরং বিচারক তাদের প্রথম বক্তব্যানুযায়ী রাশেদের জন্য এক হাজার টাকা আরোপ করবে, এখানে যদিও রাশেদ সাক্ষীদ্বয়কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে, তবুও তাদের প্রথম সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রাশেদের পক্ষে ফায়সালা দিয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী বক্তব্যের কারণে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার দ্বারা প্রথম সাক্ষ্য বাতিল হয় না।

প্রকাশ থাকে য, স্বাভাবিকভাবে কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করার দ্বারা তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রহিত হয়। তবে ফাসিক সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ইখতিয়ারী হতে হবে। যদি কেউ ইয্‌তিরারীভাবে কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করে, তাহলে তার ফাসিক সাব্যস্ত করার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ফাসিক হয় না।

এখন আমাদের জানা দরকার যে, কোন ধরনের تَفْسِيْق বা ফাসিক সাব্যস্ত করা ইখতিয়ারী (اِخْتِيَارِىْ), আর কোন ধরনের ফাসিক সাব্যস্ত করা اِضْطِرَارِىْ -

এর উত্তর এই যে, বাদী তার সাক্ষীদের ফাসিক সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইখতিয়ারী [স্বেচ্ছাধীন] আর তাই কোন বাদী যদি তার সাক্ষীদের ফাসিক সাব্যস্ত করে, তাহলে এর দ্বারা তাদের ফাসিক হওয়া আবশ্যক হবে।

পক্ষান্তরে বিবাদী কর্তৃক বাদীর সাক্ষীদের ফাসিক সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়াটি ইয্‌তিয়ারী ফাসিক সাব্যস্ত করা। এজন্য বিবাদীর ফাসিক সাব্যস্ত করার দ্বারা সাক্ষীগণ ফাসিক হবেন না।

বিবাদীর ক্ষেত্রে এটি اِضْطِرَارِىْ এভাবে যে, বিবাদীর উপর বাদীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিবাদীর জন্য কষ্টকর। আর তাই সে একে দূর করার ক্ষেত্রে বাধ্য (مُضْطَرٌ) এবং এর প্রতি মুখাপেক্ষী আর নিয়মানুযায়ী এ ধরনের ব্যক্তির ফাসিক সাব্যস্ত করার দ্বারা সাক্ষী ফাসিক হয় না।

قَالَ : وَاِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ اٰخَرَانِ اَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوْفَةِ وَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَقْبَلِ الشَّهَادَتَيْنِ لِاَنَّ اَحَدَهُمَا كَاذِبَةٌ بِيَقِيْنٍ وَلَيْسَتْ اِحْدٰيهُمَا بِاَوْلٰى مِنَ الْاُخْرٰى فَاِنْ سَبَقَتْ اِحْدٰهُمَا وَقَضٰى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتِ الْاُخْرٰى لَمْ تُقْبَلْ لِاَنَّ الْاُوْلٰى قَدْ تَرَجَّحَتْ بِاِتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلَا تَنْتَقِضُ بِالثَّانِيَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু'জন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অমুক ব্যক্তি কুরবানির দিন মক্কা শরীফে যায়েদকে হত্যা করেছে। কিন্তু অন্য দুজন সাক্ষী দেয় যে, তাকে সে কুরবানির দিন কুফা নগরে হত্যা করেছে। অতঃপর তারা সকলে বিচারকের দরবারে হাজির হয়। এমতাবস্থায় বিচারক তাদের উভয় দলের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। কেননা, তাদের একটি সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে মিথ্যা। অথচ তাদের কোনো একটি সাক্ষ্য অন্যের সাক্ষ্যের তুলনায় অগ্রবর্তী নয়। অবশ্য যদি কোনো একটা সাক্ষ্য অগ্রবর্তী হয় এবং বিচারক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন অতঃপর অপর সাক্ষী তার সাক্ষ্য হাজির করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, প্রথম সাক্ষ্যটি বিচারকের রায়ের মাধ্যমে প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং তা দ্বিতীয় সাক্ষ্য দ্বারা বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, দু'সাক্ষীর সাক্ষ্য স্থান ও কালের দিক থেকে এক হতে হবে। যদি স্থান কিংবা কালের কোনো একদিক থেকে এক সাক্ষীর সাক্ষ্য অন্য থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। চলমান ইবারতে দু'সাক্ষ্যের বক্তব্যে স্থানের ভিন্নতার কারণে বাতিল হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : দু'জন সাক্ষী রাশেদের বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য ছিল যে, রাশেদ যায়েদকে কুরবানীর ঈদের দিন মক্কা শরীফে হত্যা করেছে। কিন্তু অপর দু'সাক্ষী বলল, রাশেদ যায়েদকে কুরবানীর ঈদের দিন কুফা নগরীতে হত্যা করেছে। তারা এ সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে একত্রে দিল। তাহলে তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তাদের এ পরস্পর বিরোধপূর্ণ সাক্ষ্যের কোনো একটি নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা। কারণ, এক ব্যক্তিকে দু'স্থানে হত্যা করা অসম্ভব। আর যে বিষয় অসম্ভবকে আবশ্যক করে, তাও অসম্ভব। আবার কোনো একটি সাক্ষ্য আগে দেওয়া হয়নি যে, সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। মোটকথা পরস্পর বিরোধপূর্ণ এ দু'সাক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় অসম্ভব বলে সাক্ষ্য দু'টিই অগ্রাহ্য হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ سَبَقَتْ اِحْدٰهُمَا وَقَضٰى بِهَا الخ মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি দু'সাক্ষ্যের কোনো একটি অগ্রবর্তী হয়। আর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করেন, তাহলে এ সাক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করবে। এরপর যদি অন্য সাক্ষ্য হাজির করা হয়, তাহলে সে সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রথম সাক্ষ্যের সাথে বিচারকের রায় যুক্ত হওয়াতে সেটি প্রাধান্য লাভ করেছে। পরবর্তী সাক্ষ্যের মধ্যে যেহেতু বিচারকের রায় নেই কিংবা সে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে রায় প্রদানের পর, তাই সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَالَ : وَاِذَا شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ اَنَّهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِىْ لَوْنِهَا قُطِعَ وَاِنْ قَالَ اَحَدُهُمَا بَقَرَةٌ وَالْاٰخَرُ ثَوْرًا لَمْ يُقْطَعْ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يُقْطَعُ فِى الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا وَقِيْلَ الْاِخْتِلَافُ فِىْ لَوْنَيْنِ يَتَشَابَهَانِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَا فِى السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَقِيْلَ هُوَ فِىْ جَمِيْعِ الْاَلْوَانِ لَهُمَا اَنَّ السَّرِقَةَ فِى السَّوْدَاءِ غَيْرُهَا فِى الْبَيْضَاءِ فَلَمْ يَتِمَّ عَلٰى كُلِّ فِعْلٍ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْغَصَبِ بَلْ اَوْلٰى لِاَنَّ اَمْرَ الْحَدِّ اَهَمُّ وَصَارَ كَالذُّكُوْرَةِ وَالْاُنُوْثَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু'জন সাক্ষী কোনো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে একটি গাভী চুরি করেছে। কিন্তু তাদের মাঝে এর রঙের ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় [অর্থাৎ একজন বলে যে, এটা লাল রঙের, অন্যজন বলে সাদা রঙের] তবুও তার [চোরের] হাত কেটে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দু'সাক্ষীর মধ্যে এরূপ মতপার্থক্য হয় যে, একজন বলে– গাভী। অন্যজন বলে– বলদ, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, উপরের দু'সুরতের কোনো সুরতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কর্তন করা হবে না। কোনো কোনো ইমাম বলেন, তাদের মাঝে মতবিরোধ এরূপ রঙের ক্ষেত্রে যার একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– লাল ও কালো রঙ। সাদা-কালোর মধ্যে এ মতবিরোধ নয়। কোনো কোনো ইমাম বলেন, তাদের মতপার্থক্য সব রঙের ক্ষেত্রেই। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, কালো রঙের গরু চুরি আর সাদা রঙের গরু চুরি এক নয়। সুতরাং কোনোটির ব্যাপারে চুরির পর্যাপ্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি এবং সেটা গছবের মত হলো বরং; গছবের চেয়ে চুরির ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা, হদের বিষয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এটা যেন পুরুষ গরু এবং মাদী গরুর সাক্ষ্যের মত হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ اَنَّهُ سَرَقَ بَقَرَةً الخ : এখানে সাক্ষীদের মাঝে পরস্পর মতপার্থক্যের আরেকটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত দুটি মাসআলা রয়েছে। ১ম মাসআলার সুরত এই যে, দুজন সাক্ষী কারো ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে একটি গরু চুরি করেছে। এতটুকুতে দু-সাক্ষী একমত হলেও গরুটির রঙ কিরূপ ছিল, তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একজন সাক্ষী বলল, গরুটি লাল রঙের, আর অন্যজন বলল, গরুটি হলুদ বর্ণের। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো গরুটির রঙের ব্যাপারে সাক্ষীদের পরস্পর মতপার্থক্য থাকাসত্ত্বেও অভিযুক্ত চোরের হাত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষীদের উক্ত মতপার্থক্যের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কর্তন করা হবে না।

২য় মাসআলার সূরত এই যে, দুজন সাক্ষী চুরির ব্যাপারে একমত হলো। অতঃপর তাদের মধ্যে চুরিকৃত প্রাণীটি গাভী নাকি পুরুষ গরু এটা নিয়ে মতবিরোধ হলো। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) সকলের মতানুযায়ীই অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কাটা হবে না।

এ উভয় মাসআলায় তিন ইমাম তথা ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর অনুরূপ মতপোষণ করেন।

ভাষ্যকারগণ বলেন, যদি গরুর মালিক গরুর রঙ বর্ণনা করে দেন যে, গরুটি লাল রঙের, তারপরেও তাদের মাঝে মতবিরোধ থাকে, তবে সকল ইমামের মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ অবস্থায় মালিক একজন সাক্ষীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে। সুতরাং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তারপর একজন সাক্ষীই বাকি থাকে। আর একজন সাক্ষী দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না।

প্রথম মাসআলায় যদি মালিক গরুর রঙ বর্ণনা না করে অতঃপর সাক্ষীদের মাঝে রঙের ব্যাপারে মতবিরোধ হয় তাহলে ইমাম সাহেবের মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাশায়েখে কেরামের মধ্যে তিন ইমামের মত বিরোধের ক্ষেত্রমূল কি? এ নিয়ে সামান্য মতবিরোধ দেখা যায়।

কতিপয় মাশায়েখের মতে, তাদের মতবিরোধ সাদৃশ্যপূর্ণ রঙের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ লাল, খয়েরী, কালো ও গোলাপি এসব রঙ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এরূপ রঙের ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ হলো যে রঙের সাথে অন্য রঙের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন– সাদা ও কালো এক্ষেত্রে তাদের সকলের মত একই। অর্থাৎ কারো মতেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কোনো কোনো ফকীহের মত অবশ্য এরূপ নয়, তাদের মতে সব রঙের ক্ষেত্রেই তাদের মতবিরোধ।

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ فِى السَّوْدَاءِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। তাদের যুক্তি এই যে, সাদা গরু চুরি করা আর কালো গরু চুরি করা এক নয়। যেহেতু দুটি পৃথক দুটি কাজ। সুতরাং সাদা গরু চুরির ব্যাপারে সাক্ষী হলো একজন। আর কালো গরু চুরির ব্যাপারে সাক্ষী একজন। সুতরাং কোনোটির ব্যাপারে পূর্ণ সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া গেল না।

তারা বলেন, এটি গছবের মত হলো। যেমন একব্যক্তি সম্পর্কে দু-জন সাক্ষীর একজন বলল যে, সে কালো গরু গছব [ছিনতাই] করেছে। আর অন্য সাক্ষী বলল যে, সে লাল গরু ছিনতাই করেছে। তাদের এরূপ মতবিরোধের কারণে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ছিনতাই প্রমাণিত হবে না। তদ্রূপ এখানে তাদের মতপার্থক্যের কারণে চুরি প্রমাণিত হবে না।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالذُّكُورَةِ وَالْاُنُوثَةِ : মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি সমর্থনপুষ্ট মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের গরুর রঙের ব্যাপারে মতপার্থক্যটি গরুর লিঙ্গের ব্যাপারে মতপার্থক্যের মতই। অর্থাৎ দু-সাক্ষীর একজন যদি বলে প্রাণীটি গাভী ছিল। আর অন্যজন্য বলে, সেটা গরু, তাহলে তাদের সাক্ষ্য যেমন অগ্রাহ্য তদ্রূপ রঙের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হলেও তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيْقَ مُمْكِنٌ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِى اللَّيَالِىْ مِنْ بَعِيْدٍ وَاللَّوْنَانِ يَتَشَابَهَانِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ فِىْ وَاحِدٍ فَيَكُوْنُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ وَهٰذَا يُبْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبٍ أٰخَرَ وَهٰذَا يُشَاهِدُهُ بِخِلَافِ الْغَصَبِ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِيْهِ بِالنَّهَارِ عَلٰى قُرْبٍ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, রঙের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের মতপার্থক্যের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। কেননা, রাতের বেলায় এরূপ বিষয় সাধারণত দূর থেকে অবলোকন করা হয়। আর দু-রঙের মাঝে সাদৃশ্য থাকে অথবা কোনো একটি গরুর মধ্যে দুটি রঙই পাওয়া যায়। ফলে একদিক থেকে সেটা কালো বর্ণের হয়। আর সেটাই সে দেখে। আর অন্য দিক থেকে সেটা সাদা বর্ণের হয় সেটা অন্যসাক্ষী দেখে। গছবের ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা, গছব দিনের বেলায় নিকটবর্তী স্থান থেকে অবলোকন করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيْقَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, প্রাণীর রঙের ব্যাপারে তাদের যে মতপার্থক্য তাতে সমন্বয় করা এবং ঐক্যের একটি ক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব। তা এই যে, সাধারণত রাতের বেলা চুরি হয়ে থাকে। আর যাদের পক্ষে এরূপ চুরি দেখা সম্ভব হয়, তারাও দূর থেকে দেখে থাকে। কেননা, দর্শক/প্রত্যক্ষকারী কাছে থাকলে তো চুরি করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যখন রাতের বেলায় সাক্ষ্য ধারণ করা হয় বা অবলোকন করা হয় এবং সেটা দূর থেকে করা হয়, তখন এতে দৃষ্টি-বিভ্রাট হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। রঙ দু'টির মাঝে সাদৃশ্য থাকলে যেমন দৃষ্টি-বিভ্রাট হতে পারে তদ্রূপ স্পষ্টত পার্থক্যপূর্ণ হলেও বিভ্রাট হতে পারে। যেমন একটি গরুর ডান পার্শ্ব সাদা রঙের, আর বামপার্শ্ব কালো রঙের। দু'সাক্ষীর একজন ডান দিকের অংশ দেখে সে সাক্ষ্য দিল যে, গরুটি সাদা রঙের, আর অপর সাক্ষী বাম দিকের অংশ দেখে সাক্ষ্য দিল যে, গরুটি কালো রঙের। সাক্ষীদের যে যে অংশ দেখেছে, সে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। অতএব, তাদের উভয়ের সাক্ষ্য চুরি যাওয়া একটি গরু সম্পর্কেই হয়েছে। তাই কারো সাক্ষ্য বাতিল হবে না; বরং উভয়ের সাক্ষ্য এক হওয়াতে গরু চুরি হওয়া প্রমাণিত হবে এবং চোরের হাত কাটার রায় প্রদান করা হবে।

প্রথম সূরতে অর্থাৎ যখন দু'টি রঙের মাঝে সাদৃশ্য হয়, তখনও আলো-কম হওয়া ও বেশি হওয়ার কারণে তাদের দেখার মধ্যে রঙের পার্থক্য হতে পারে। যেমন– একজন সাক্ষী ডান দিকের অংশ দেখল; যাতে আলো ছিল তাই সে গরুর প্রকৃত রঙ লাল দেখতে পেল। অপরজন বাম দিকের অংশ দেখল; যাতে আলো কম ছিল তাই দূর থেকে তার কাছে কালো মনে হলো। এজন্য দুজন দু'রকম বর্ণনা করেছে। মোটকথা রঙের ব্যাপারে যে মতপার্থক্য তা সমন্বয় করা সম্ভব বলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাদের এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে চোরের হাত কাটার পক্ষে মত প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْغَصَبِ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপক্ষে সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে যে মাসআলাগুলো দ্বারা সমর্থন নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর জবাব দেওয়া হচ্ছে।

সাহেবাইন (র.) গছব [ছিনতাই]-এর উপর কিয়াস করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে, ছিনতাইয়ের উপর চুরিকে কিয়াস করা উচিত নয়। কারণ, চুরি হয় রাতের বেলায় অন্ধকারে। আর ছিনতাই/ডাকাতি হয় দিনের আলোতে প্রকাশ্য দিবালোকে। ছিনতাই নিকট থেকে দেখা সম্ভব হয়। তাই দিবালোকে নিকট থেকে দেখা বস্তুর মাঝে সন্দেহ হওয়া বা মতবিরোধ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য গছবের মধ্যে সাক্ষীদের এরূপ মতপার্থক্যপূর্ণ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য।

وَالذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ وَاحِدَةٍ وَكَذَا الْوُقُوفُ عَلَى ذٰلِكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ فَلَا يَشْتَبِهُ ـ قَالَ : وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرٰى عَبْدًا مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ اٰخَرُ أَنَّهُ اشْتَرٰى بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ إِثْبَاتُ السَّبَبِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُوْدُ بِهٖ وَلَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ الْمُدَّعِيْ يُكَذِّبُ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ ـ

অনুবাদ : মাদী ও পুরুষ [পশুর বিষয়টি এমন নয় যে,] একটি পশুর মধ্যে তা পাওয়া যাবে। তাছাড়া এ বিষয়টি প্রাণীর নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং এর মধ্যে সন্দেহ হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কারো পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুক ব্যক্তি থেকে এক হাজার টাকায় একটি গোলাম খরিদ করেছে। অপর সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে দেড় হাজার টাকায় গোলাম খরিদ করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হলো সবব তথা বেচা-কেনার চুক্তি প্রমাণ করা। মূল্যগত পার্থক্যের কারণে বেচাকেনার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। ফলে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাও ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। এ কারণে কোনো বিষয়েই সাক্ষ্যদানের সংখ্যা তথা দুজন পাওয়া গেল না। তাছাড়া বাদী একজন সাক্ষীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ وَاحِدَةٍ الخ : এখান থেকে সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে বর্ণিত আরেকটি মাসআলার জবাব দিয়েছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে দু'টি রঙ একটি প্রাণীর মাঝে একত্র হতে পারে; কিন্তু দু'টি লিঙ্গ একটি প্রাণীর মাঝে একত্র হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ একটি প্রাণী পুরুষও হবে আবার মাদীও হবে এটা অসম্ভব। তাছাড়া মাদী/পুরুষ নিকট থেকে দেখা ব্যতীত নির্ণয় করা যায় না। যেহেতু নিকট থেকে দেখেই নারী/পুরুষ নির্ণয় করা হয়, তাই এক্ষেত্রে সাক্ষীদের ভুল/মতপার্থক্য অগ্রহণযোগ্য। মোটকথা সাহেবাইন (র.) যে দু'টি মাসআলার উপর রঙের মাসআলাকে কিয়াস করেছেন, সে কিয়াস সঠিক নয়। কারণ, কিয়াসের জন্য مَقِيْس عَلَيْه ও مَقِيْس একই ধরনের হতে হয়। এখানে তা মোটেই হয়নি।

قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرٰى عَبْدًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বেচাকেনার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের মতপার্থক্যের একটি মাসআলা এখানে উল্লেখ করছেন। সূরতে মাসআলা এই যে, একব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সে এক হাজার টাকায় একটি গোলাম খরিদ করেছে। কিন্তু অন্য সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে দেড় হাজার টাকায় গোলাম ক্রয় করেছে। এমতাবস্থায় সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে।

এখানে বাদী তথা ক্রেতা যদি এক হাজার টাকায় গোলাম খরিদ করার দাবি করে কিংবা দেড় হাজার টাকায় গোলাম ক্রয় করার দাবি করে অতঃপর সাক্ষীদ্বয় তার পক্ষে এরূপ মতপার্থক্যসহ সাক্ষ্য দেয়, তাহলে উভয় অবস্থায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার প্রথম দলিল এই যে, এখানে সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য সবব তথা বেচাকেনা প্রমাণ করা। আর বেচাকেনা সংক্রান্ত চুক্তি মূল্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং এক হাজার মূল্যের বিক্রি দেড় হাজার মূল্যের বিক্রির চেয়ে ভিন্ন। সুতরাং তারা দুজন যে দুটি সাক্ষ্য দিল তা এক বিক্রির ব্যাপারে হয়নি; বরং দুটি পৃথক বিক্রির জন্য দুটি সাক্ষ্য হলো, অতএব কোনো বিক্রির ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের নেসাব পূর্ণ হয়নি। সাক্ষ্যের নেসাব হলো দুজন। এখানে প্রত্যেক বিক্রির জন্য একটি করে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আর একটি সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ/ অপ্রমাণ করা যায় না, তাই এখানে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দলিল এই যে, বাদী দুজন সাক্ষীর একজনকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। একজন মিথ্যাবাদী হওয়ার অর্থ সে ফাসিক। আর ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং সাক্ষী রইল একজন। আর একজন সাক্ষী দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না।

وَكَذٰلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْبَائِعُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِيْ اَقَلَّ الْمَالَيْنِ اَوْ اَكْثَرَهُمَا لِمَا بَيَّنَّا وَكَذٰلِكَ الْكِتَابَةُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الْعَقْدُ اِنْ كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْعَبْدُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا اِذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلٰى لِاَنَّ الْعِتْقَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْاَدَاءِ فَكَانَ الْمَقْصُوْدُ اِثْبَاتَ السَّبَبِ وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْاِعْتَاقُ عَلٰى مَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ اِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْمَرْاَةُ وَالْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ اِثْبَاتُ الْعَقْدِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَتِ الدَّعْوٰى مِنْ جَانِبٍ اٰخَرَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَى الدَّيْنِ فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ لِاَنَّهُ يُثْبِتُ الْعَفْوَ وَالْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ بِاعْتِرَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَبَقِيَ الدَّعْوٰى فِي الدَّيْنِ وَفِي الرَّهْنِ اِنْ كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الرَّاهِنُ لَا يُقْبَلُ لِاَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الرَّهْنِ فَعَرِيَتِ الشَّهَادَةُ عَنِ الدَّعْوٰى وَاِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَى الدَّيْنِ وَفِي الْاِجَارَةِ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ فِيْ اَوَّلِ الْمُدَّةِ فَهُوَ نَظِيْرُ الْبَيْعِ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَالْمُدَّعِيْ هُوَ الْاٰجِرُ فَهُوَ دَعْوَى الدَّيْنِ -

অনুবাদ : একই হুকুম হবে যদি বাদী বিক্রেতা হয়। বাদী সাক্ষীদের থেকে মূল্যমান কম দাবি করুক কিংবা বেশি দাবি করুক এতে কোনো পার্থক্য নেই। ইতঃপূর্বে আমরা এর কারণ উল্লেখ করেছি। কিতাবাতের হুকুমও তাই। কেননা, [কিতাবাতের মধ্যে] উদ্দেশ্য হলো চুক্তি। যদি কিতাবাতের মধ্যে বাদী গোলাম হয়, তাহলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। একই হুকুম হবে যদি বাদী মুনিব হয়। কেননা, কিতাবাতে বর্ণিত পরিমাণ টাকা আদায় করার আগে আজাদী প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উদ্দেশ্য হলো সবব প্রমাণ করা। খোলা এবং মালের বিনিময়ে গোলাম আজাদ করার চুক্তির হুকুমও এরূপই। স্বেচ্ছায় কৃত হত্যার আপোষ চুক্তির হুকুমও এমনই যদি বাদী মহিলা, গোলাম এবং হত্যাকারী হয়। কেননা, উদ্দেশ্য হলো চুক্তি প্রমাণ করা, আর এরূপ করার প্রয়োজনও রয়েছে। আর যদি বাদী বিপরীত দিক থেকে আসে তাহলে এটি কর্জের দাবির মতো হবে। এর কারণগুলো আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা, এগুলো ক্ষমা, আজাদী ও তালাককে প্রমাণ করে হকদারের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। সুতরাং ঋণের ক্ষেত্রে দাবি বাকি রইল। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে যদি বন্ধকদাতা বাদী হয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার কোনো হক থাকে না। সুতরাং সাক্ষ্যের পূর্বে কোনো দাবি নেই [আর দাবি ছাড়া সাক্ষ্য] প্রমাণিত হয় না। আর যদি বাদী মুরতাহিন [যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে] হয়, তাহলে সেটা কর্জের দাবির মতো হবে। আর ভাড়া চুক্তির মধ্যে সেটা প্রথম মেয়াদে হয়, তাহলে তা বেচাকেনার অনুরূপ। আর যদি তা মেয়াদান্তে হয় এবং ভাড়াদাতা [তথা মালিক] হয়, তাহলে সেটা ঋণের অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْبَائِعُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত মাসআলায় বাদী হিসেবে ক্রেতাকে দেখানো হয়েছে। ক্রেতার মতো বিক্রেতা যদি বাদী হয়, তাহলেও একই হুকুম হবে। যেমন– বিক্রেতা বলল, আমি অমুক দাস পাঁচশত

টাকায় বিক্রি করেছি। ক্রেতা সেটা অস্বীকার করলে বিক্রেতা দুজন সাক্ষী দাঁড় করাল। কিন্তু সাক্ষীদের একজন বলল, বিক্রেতা এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। আরেকজন বলল, পাঁচশত টাকায় বিক্রি করেছে। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে। কারণ তারা দুজন দুটি বিক্রি সম্পর্কে পৃথক পৃথক সাক্ষ্য দিয়েছে। যেহেতু কোনো বিক্রির ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া যায়নি এবং বাদী একজনকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছে, এজন্য তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَدَّعِيَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বেচাকেনার মাসআলায় বাদী তার মূল্যের পরিমাণ বেশি দাবি করা এবং কম দাবি করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ বাদী দেড় হাজার দাবি করলে যে হুকুম, বাদী এক হাজার দাবি করলেও একই হুকুম হবে। কর্জের মাসআলায় বাদীর বেশি দাবি করার শর্ত করা হয়েছিল। এখানে এরূপ কোনো শর্ত নেই।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْكِتَابَةُ الخ : বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরের মুসান্নিফ (র.) একই ধরনের আটটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। আটটি মাসআলার প্রথম মাসআলাটি আগের ইবারতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি ছিল বেচাকেনার মাসআলা। এ ইবারতে বাকি মাসআলাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এ ইবারতের প্রথম মাসআলা কিতাবাত চুক্তির মাসআলা। এটা হুবহু বেচাকেনার মাসআলার মতো।

প্রথম মাসআলা : সূরতে মাসআলা হলো, রাশেদের মালিকের সাথে রাশেদ চুক্তি করল যে, সে তার মালিককে এক হাজার টাকা দিলে তার মালিক তাকে মুক্ত করে দিবে। কিন্তু মালিকের সাথে পরবর্তীতে বিতর্ক হলো বদলে কিতাবাতের পরিমাণ নিয়ে। মালিক বদলে কিতাবাত এক হাজার টাকা হওয়ার কথা অস্বীকার করল। ফলে রাশেদ তার পক্ষে দু'জন সাক্ষী হাজির করল; কিন্তু সাক্ষীদের একজন বলল, বদলে কিতাবাত একহাজার টাকা, অন্যজন বলল, বদলে কিতাবাত দেড় হাজার টাকা। এমতাবস্থায় কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, বেচাকেনার মত বদলে কিতাবাত ভিন্ন হলে কিতাবাত চুক্তি ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং একহাজারের সাক্ষী একজন এবং দেড় হাজারের ব্যাপারে সাক্ষী একজন। কোনোটির ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া গেল না। অতএব, সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : উপরে বর্ণিত সুরতে বাদী হলো গোলাম। একই হুকুম হবে যদি মুনীব বাদী হয় আর গোলাম সেটা অস্বীকার করে। অতঃপর সাক্ষীদের মধ্যে একহাজার ও দেড় হাজারের মতপার্থক্য হয়। অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এখানেও উদ্দেশ্য হলো কিতাবাতের চুক্তিটি প্রমাণ করা। তা এভাবে যে, মনিবের উদ্দেশ্য গোলামকে আজাদ করা। আর গোলামের আজাদী বদলে কিতাবাত আদায় করার পূর্বে কখনো বাস্তবায়িত হবে না। আর বদলে কিতাবাত আদায়ের জন্য কিতাবাত চুক্তিটি প্রমাণ করা আবশ্যক। সুতরাং এ কথাই প্রমাণ হলো যে, কিতাবাত চুক্তিটি আসল উদ্দেশ্য।

তৃতীয় মাসআলাটি خُلْع সম্পর্কিত, চতুর্থ মাসআলাটি মাল বা অর্থের বিনিময়ে আজাদ করা এবং পঞ্চম মাসআলাটি স্বেচ্ছায় যে হত্যা করেছে তার উপর কিসাস আরোপ করার পরিবর্তে দিয়তের উপর আপোষ-চুক্তি করা। এ তিন মাসআলা বেচাকেনা ও কিতাবতের অনুরূপ তখনই যখন খুলার মধ্যে মহিলা বাদী হবে, মালের বিনিময়ে আজাদ করার ক্ষেত্রে গোলাম বাদী হবে এবং হত্যার দিয়তের ক্ষেত্রে হত্যাকারী বাদী হবে।

উল্লেখ্য যে, বেচাকেনা ও কিতাবাত চুক্তির মধ্যে ক্রেতা বা বিক্রেতা এবং গোলাম বা মনিব উভয়ে বাদী হতে পারে।

তৃতীয় মাসআলা : সূরতে মাসআলা হলো, স্ত্রী দাবি করল যে, সে তার স্বামীর সাথে খুলা করেছে, কিন্তু তার স্বামী খুলা করার কথা অস্বীকার করল। অতঃপর মহিলা খুলার পক্ষে দুজন সাক্ষী আনল। সাক্ষীদ্বয়ের একজন বলল, মহিলা তার এক হাজার টাকার বিনিময়ে খুলা করেছে। অন্য সাক্ষী বলল, মহিলা দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে খুলা করেছে, এমতাবস্থায় তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সাক্ষীদের মতপার্থক্যের কারণে খুলা চুক্তিটির মধ্যে ভিন্নতা চলে এসেছে। কোনো খুলার ব্যাপারে একের অধিক সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এক হাজার কিংবা দেড় হাজার কোনো খুলাই প্রমাণিত হলো না।

চতুর্থ মাসআলা : চতুর্থ মাসআলার সুরত এই যে, গোলাম তার মনিবের কাছে মালের বিনিময়ে তাকে আজাদ করার চুক্তি হয়েছে বলে দাবি করল। মনিব এ ধরনের কোনো চুক্তি হওয়ার কথা অস্বীকার করল। অতঃপর গোলাম তার দাবির পক্ষে দুজন

সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদ্বয়ের একজন বলল, দেড় হাজারের বিনিময়ে আজাদ করার চুক্তি হয়েছে। আর অন্যজন বলল, এক হাজারের বিনিময়ে আজাদ করার চুক্তি হয়েছে। সুতরাং দু-চুক্তির কোনোটির উপর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য না পাওয়াতে সাক্ষ্য বাতিল হবে। আর সাক্ষ্য বাতিল হলে চুক্তি অপ্রমাণিত রইল।

পঞ্চম মাসআলা : ৫ম মাসআলার সুরত হলো, এক হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির অলিদের সাথে তার হত্যার দিয়্যতের ব্যাপারে চুক্তি হওয়ার দাবি করল। কিন্তু নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন সেটা অস্বীকার করল। তারা বলল, এরূপ কোনো চুক্তি হয়নি। অতঃপর হত্যাকারী দুজন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদ্বয়ের একজন বলল, দেড় লাখের উপর চুক্তি হয়েছে। অন্যজন বলল, এক লাখের উপর চুক্তি হয়েছে। এমতাবস্থায় উপরের চুক্তিগুলোর মত কোনোটিতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য না পাওয়াতে কোনো চুক্তি কার্যকর হবে না। অতএব, তাদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

উপরে উল্লিখিত এ তিনটি মাসআলায় যদি বাদী তারা না হয়ে অন্য কেউ হয়, যেমন– প্রথম মাসআলায় স্বামী, দ্বিতীয় মাসআলায় মনিব ও তৃতীয় মাসআলায় নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন হয়, তাহলে তাদের দাবিগুলো ঋণের দাবির মতো হবে। যেমন– স্বামী দাবি করল দেড় হাজার টাকার উপর খুলা হয়েছে, আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে বলল, এক হাজার টাকার উপর খুলা হয়েছে। ঋণের মত হবে এজন্য যে, তারা উক্ত চুক্তিগুলোর মালের হকদার। যখন তারা স্বীকার করবে যে, চুক্তি এত টাকার উপর হয়েছে তালাক, আযাদী ও মাফ করা পাওয়া যাবে। তা এভাবে যে, যখন স্বামী স্বীকার করবে যে, এত টাকার উপর খুলা হয়েছে, তখন স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দিয়ে দেওয়ার স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল। তদ্রূপ যখন গোলামের মালিক একথা বলল যে, এত টাকার বিনিময়ে আজাদ করা হয়েছে, তখন তার পক্ষ থেকে আজাদির স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল। এমনিভাবে যখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের পক্ষ থেকে এ স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল যে, এত টাকার বিনিময়ে তার সাথে আপোষ চুক্তি হয়েছে, তার ফলাফল এই হলো যে, তারা হত্যাকারীর কিসাসকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এখন তাদের প্রতিপক্ষের কাছে ঋণ হিসেবে কিছু টাকাই পাওনা রয়েছে। চুক্তি হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কর্জের ক্ষেত্রে ঐসব সূরত আসবে, যা ইতঃপূর্বে আমরা কর্জের দাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। যেখানে বলা হয়েছিল যে, যদি বাদী তথা এখানের স্বামী, মনিব ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবক এক হাজার টাকা দাবি করে। অতঃপর তার সাক্ষীদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের একজন একহাজার আর অন্যজন দেড় হাজার টাকার কথা বলে, তাহলে এক হাজার টাকার ব্যাপারে রায় প্রদান করা হয়। আর যদি বাদী দু-হাজার দাবি করে, আর সাক্ষীদের মধ্যে এক হাজার ও দু-হাজারের ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের সাক্ষ্য এক হাজারের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি। আর উপরিউক্ত স্বামী, মনিব ও নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন যদি কম সংখ্যা দাবি করে, তাহলে দু সুরত। যদি তার দাবি ও সাক্ষীদের যে বেশি সংখ্যার সাক্ষ্য দিচ্ছে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব হয়, তাহলে তো ভাল। অর্থাৎ তার পক্ষে সমন্বিত মালের সাক্ষ্য দেওয়া হবে। অন্যথায় সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে।

ষষ্ঠ মাসআলা বন্ধক সম্পর্কিত : যদি বন্ধকদাতা (رَاهِنٌ) বাদী হয় তাহলে মাসআলার সুরত এই যে, বন্ধকদাতা এ দাবি করল যে, সে অমুকের কাছে আমার ঐ বস্তু বন্ধক রাখা আছে। কিন্তু মুরতাহিন বিষয়টি অস্বীকার করে বলল, আমার কাছে তার কোনো বস্তু রাখা হয়নি। অতঃপর বন্ধকদাতা দু'জন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদের একজন বলল, অমুকের কাছে বাদীর ঐ বস্তু এক হাজার টাকা ঋণের বিপরীতে রাখা আছে। কিন্তু অন্য সাক্ষী বলল, তার কাছে বাদীর ঐ বস্তু দেড় হাজার টাকা ঋণের বিপরীতে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় বন্ধকদাতার পক্ষে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে বন্ধকী বস্তুর মধ্যে বন্ধকদাতার অধিকার স্বীকৃত হয় না।

সুতরাং ঋণ পরিশোধের পূর্বে যদি বন্ধকদাতা তার বন্ধকী বস্তু ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। সুতরাং তার দাবি তার জন্য উপকারী নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তার দাবি থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান যেহেতু তার দাবি অনস্তিত্বের পর্যায়ে। সুতরাং যেন সে দাবি ছাড়া সাক্ষী পেশ করল। আর এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দাবি ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য আলোচ্য মাসআলায় বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আর যদি বন্ধকের মাসআলায় মুরতাহিন বাদী হয়, তাহলে মাসআলার সুরত হলো, অমুকের ঐ বন্ধকী বস্তুর বিপরীতে আমি তার কাছে দশ হাজার টাকা পাই। কিন্তু বন্ধকদাতা বিষয়টি অস্বীকার করল। অতঃপর মুরতাহিন তার পক্ষে দুজন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদের একজন বলল, মুরতাহিন বন্ধকদাতার কাছে দশ হাজার টাকা পায়। আর অন্যজন্য বলল, পনের হাজার টাকা পায়। এমতাবস্থায় দু-সাক্ষীর যে কম পরিমাণ উল্লেখ করেছে, তার কথাকে গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ দশ হাজারের কথা যে বলেছে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

এর দলিল হলো, বন্ধকি বস্তু ফেরত দিয়ে বন্ধকের যে চুক্তি হয়েছে মুরতাহিনের তা বাতিল করার ইখতিয়ার আছে। সুতরাং মুরতাহিনের ক্ষেত্রে বন্ধকীচুক্তি একটি অনাবশ্যক চুক্তি। যেহেতু বন্ধকীচুক্তি মুরতাহিনের জন্য একটি অনাবশ্যক চুক্তি তাই এটি অনস্তিত্বের পর্যায়ে গণ্য করা হবে। সুতরাং মুরতাহিনের জন্য পাওনা/ ঋণের দাবিই এখন বহাল রইল। ঋণের অবস্থায় সাক্ষীদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যে সাক্ষী কম পরিমাণের কথা উল্লেখ করে সেটাই কার্যকর করা হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় মুরতাহিনের পক্ষে দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির রায় দেওয়া হবে।

সপ্তম মাসআলা ইজারা সম্পর্কিত : মাসআলার দু'টি সূরত হতে পারে প্রথম সূরত হলো ভাড়া দানকারী ব্যক্তির সাথে ভাড়াটিয়া ব্যক্তির মেয়াদের মধ্যে ভাড়ার পরিমাণের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়া।

দ্বিতীয় সুরত হলো তাদের মধ্যে মেয়াদান্তে ভাড়ার পরিমাণের ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়া। যদি মেয়াদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তাহলে সেটা বেচাকেনার অনুরূপ হবে। অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তির মত সাক্ষীদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। কেননা এ অবস্থাতে ইজারা-চুক্তিটি বাস্তবায়ন করাই উদ্দেশ্য। আর ইজারা-চুক্তি বেচাকেনার চুক্তির মতো, চুক্তির অর্থ কমবেশি হলে চুক্তিটি এককে থাকে না; বরং দু-রকম পরিমাণ হলে চুক্তি দুটি হয়ে যায়। আলোচ্য মাসআলায় ইজারা-চুক্তির [মেয়াদ থাকা অবস্থাতে] সাক্ষীদের একজন বলল, এক হাজার টাকার বিনিময়ে চুক্তি হয়েছে, কিন্তু অন্য সাক্ষী বলল, দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে ইজারা-চুক্তি হয়েছে। এমতাবস্থায় সাক্ষীদের মতপার্থক্যের কারণে একটি ইজারা-চুক্তিতে দুজনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। আর দুজনের কমে যেহেতু সাক্ষ্যের নেসাব হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাসআলার দ্বিতীয় সুরত হলো, সাক্ষীদের মাঝে ইজারা-চুক্তির পরিমাণের ব্যাপারে মতবিরোধ হবে ইজারার মেয়াদান্তে। এর আবার দুটি সুরত হতে পারে। বাদী মালিক বা ভাড়াদাতা হবেন, বাদী হবে ভাড়াটিয়া। যদি মালিক বাদী হয় এবং সে পরবর্তী সাক্ষীদের উল্লিখিত দু সংখ্যার বেশি যেটি, সে তা দাবি করে। যেমন– সে দাবি করল দেড় হাজার টাকায় বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, আর সাক্ষীদের একজন বলল, দেড় হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছে, আর অন্যজন বলল, এক হাজার টাকায় বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। এ অবস্থায় দু সংখ্যার কম সংখ্যা যেটি অর্থাৎ, এক হাজার টাকার পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী রায় প্রদান করা হবে। কেননা ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে ইজারা নিয়ে এখন আর মতবিরোধ নেই। এখন মতবিরোধ হলো তাদের ভাড়ার পরিমাণ নিয়ে। এ যেন এমন যে, এক ব্যক্তি অন্যের কাছে দেড় হাজার টাকা পাওয়ার দাবি করল। অতঃপর বিবাদী সেটা অস্বীকার করল। তারপর সাক্ষীদের একজন এক হাজার টাকার পক্ষে সাক্ষ্য দিল, আর অন্যজন দেড় হাজারের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। এমতাবস্থায় পূর্বের বর্ণিত মাসআলা অনুযায়ী এক হাজারের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় এক হাজারের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে।

আর যদি ভাড়াটিয়া বাদী হয়, আর ভাড়াদাতা মালিক সেটা অস্বীকার করে, তাহলে ভাড়াটিয়া যে পরিমাণ ভাড়া দানের স্বীকারোক্তি করবে, ততটুকুতেই ভাড়া প্রদান করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হবে। সাক্ষীদ্বয়ের মতৈক্য থেকে কিংবা মতপার্থক্য থেকে উভয় অবস্থাতে একই হুকুম। কেননা ভাড়াটিয়া যদি দেড় হাজারের দাবি করে, তাহলে তো মালিকের সাথে কোনো ঝগড়া থাকে না। আর যদি সে এক হাজার টাকা দাবি করে তাহলেও সে সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে এক হাজারই লাভ করবে। কারণ, সে দাবি করল এক হাজার। আর বিবাদী সেটা অস্বীকার করে বলল, দেড় হাজার টাকা পাওনা। অতঃপর বাদী তার সাক্ষীদ্বয় হাজির করল। সাক্ষীদের মাঝে মতবিরোধ হলো। একজন বলল, এক হাজার টাকা পাওনা আর অন্যজন বলল, দেড়হাজার টাকা পাওনা। এমতাবস্থায় এক হাজারের সাক্ষ্য গ্রহণ করত এর পক্ষে রায় প্রদান করা হবে। মোটকথা, বাদী যা স্বীকার করবে সে ফায়সালাই করা হবে। চাই সে বেশি দাবি করুক কিংবা কম দাবি করুক।

قَالَ : فَأَمَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ بِالْفٍ إِسْتِحْسَانًا وَقَالَا هٰذَا بَاطِلٌ فِي النِّكَاحِ اَيْضًا ذُكِرَ فِي الْأَمَالِيْ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) مَعَ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَهُمَا اَنَّ هٰذَا اِخْتِلَافٌ فِي الْعَقْدِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَاَشْبَهَ الْبَيْعَ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ تَابِعٌ وَالْاَصْلَ فِيْهِ الْحِلُّ وَالْاِزْدِوَاجُ وَالْمِلْكُ وَلَا اِخْتِلَافَ فِيْمَا هُوَ الْاَصْلُ فَيَثْبُتُ ثُمَّ اِذَا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِي التَّبْعِ يُقْضٰى بِالْاَقَلِّ لِاِتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَيَسْتَوِيْ دَعْوٰى اَقَلِّ الْمَالَيْنِ اَوْ اَكْثَرِهِمَا فِي الصَّحِيْحِ ثُمَّ قِيْلَ الْاِخْتِلَافُ فِيْمَا اِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَفِيْمَا اِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الزَّوْجُ اِجْمَاعٌ عَلٰى اَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لِاَنَّ مَقْصُوْدَهَا قَدْ يَكُوْنُ الْمَالُ وَمَقْصُوْدُهُ لَيْسَ اِلَّا الْعَقْدُ وَقِيْلَ الْخِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَهٰذَا اَصَحُّ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর বিবাহ-চুক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী ইসতিহসানের ভিত্তিতে এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে জায়েজ। সাহেবাইন (র.) বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রেও এটা বাতিল। "আমালী" কিতাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতামত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, এটা তো চুক্তির ব্যাপারে মতবিরোধ। কেননা, পাত্র ও পাত্রী উভয়ের উদ্দেশ্য হলো সবব। সুতরাং এটা বেচাকেনার মত হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, বিবাহের মধ্যে মাল গৌণ, আর হালাল হওয়া, দাম্পত্য সম্পর্ক এবং মালিকানা হলো মূল। মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নেই। সুতরাং বিবাহ প্রমাণিত হবে। অতঃপর তাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে গৌণ বিষয়ে। তাই কম পরিমাণের পক্ষে রায় প্রদান করা হবে সাক্ষীদের এতে মতৈক্যের কারণে। [অর্থাৎ এক হাজার মহর হওয়ার ব্যাপারে উভয় সাক্ষীই একমত হয়েছে। অতঃপর একজন এক হাজারের কিছু বেশি দাবি করছে।] আর সহীহ মতানুযায়ী দু'পরিমাণের মধ্যে কম দাবি করাও বেশি দাবি করা একই পর্যায়ের। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, মহিলা বাদী হওয়ার অবস্থাতেই ইমামগণের মতবিরোধ। আর স্বামী বাদী হলে সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা [ঐকমত্য] রয়েছে। কেননা, অনেক সময় মাল পাওয়াই স্ত্রীর উদ্দেশ্য হয়। আর স্বামীর উদ্দেশ্য তো বিবাহ চুক্তি। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, উভয় সূরতেই ইমামগণের ইখতিলাফ রয়েছে। এ মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। আর দলিল আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَأَمَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ بِالْفٍ إِسْتِحْسَانًا الخ : ইতঃপূর্বে আল্লামা ইবনুল ইমাম (র.) একই ধরনের যে আটটি মাসআলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এর অষ্টম মাসআলা হলো বিবাহ। এতে স্ত্রী বাদী হতে পারে। আবার স্বামীও বাদী হতে পারে। সূরতে মাসআলা এই যে, স্ত্রী দাবি করল যে, অমুকের সাথে আমার দেড় হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ হয়েছে। স্বামীর বক্তব্য হলো– আমাদের বিবাহের মহর এক হাজার টাকা, দেড় হাজার নয়। যেহেতু স্বামী বিবাদী ও অস্বীকারকারী, তাই স্ত্রী তার পক্ষে দু'জন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদের একজন বলল, তাদের বিবাহ দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে সম্পন্ন হয়েছে। অন্য সাক্ষী বলল, তাদের বিবাহ এক হাজার টাকা মহর সাব্যস্ত হয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী এ বিবাহ এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে ইসতিহসানের ভিত্তিতে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের বিবাহ বাতিল। কারণ, সাক্ষীদের মতপার্থক্যের কারণে বিবাহ চুক্তিতে সাক্ষ্যের নেসাব পাওয়া যায়নি। যেহেতু পর্যাপ্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি, তাই বিবাহ প্রমাণিত হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর আমালী (اَلْاَمَالِىْ) কিতাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেন। সুতরাং আমালীর বর্ণনা অনুযায়ী শায়খাইনের মতানুযায়ী ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিবাহ এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী বিবাহের সাক্ষ্য বাতিল হওয়ায় বিবাহ বাতিল।

জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : তারা বলেন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের উদ্দেশ্য হলো, বিবাহ-চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রমাণ করা। কিন্তু বাদীর সাক্ষীদের মতপার্থক্যের কারণে বিবাহ-চুক্তিতে ইখতিলাফ হয়ে গেল। এখন দুটি সম্ভবনা রয়েছে। ১. এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ। ২. দেড় হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ। এ দুটির কোনো একটিতে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং এক হাজার/ দেড় হাজার মহর কোনটির বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। সুতরাং সাক্ষ্যের অভাবে বিবাহ পর্যন্ত বাতিল হয়েছে প্রমাণিত হবে।

তাদের মতে বিবাহ-চুক্তিটি বেচাকেনা-চুক্তির অনুরূপ। বেচাকেনার মধ্যে সাক্ষীদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যেমন চুক্তি বাতিল সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْمَالَ الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইসতিহসানের দলিল মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিবাহের মাল/ অর্থ গৌণ ও অনুগামী বিষয়– মুখ্য বিষয় নয়। এজন্য মহর উল্লেখ ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহে আসল ও মুখ্য বিষয় হলো, স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের উপর স্বামীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শরিয়তে এ তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। এ তিনটি বিষয়ে আলোচ্য মাসআলায় স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। স্বামী তিনটি বিষয় যেমন স্বীকার করে তদ্রূপ স্ত্রীও এ তিনটি বিষয়ের কোনোটি অস্বীকার করে না।

বাকি রইল মহরের বিষয়। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো শরিয়ত মহর নির্ধারণ করেছে স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। কেননা যদি স্বামী বিনামূল্যে সে অঙ্গের মালিক হয়ে যায়, তাহলে এর মর্যাদা প্রমাণ হয় না। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, বিবাহের মধ্যে মহর মূল/ মুখ্য বিষয় নয় এবং এটিও প্রতীয়মান হলো যে, সাক্ষীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, তা মূল বিষয় নয়; বরং তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে মহরের পরিমাণ নিয়ে। তাদের একজন এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর অন্যজন দেড় হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ দু সংখ্যার মধ্যে এক হাজার মহর হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো মতবিরোধ নেই। তাদের মতবিরোধ দেড় হাজারের ব্যাপারে। সুতরাং তাদের মতৈক্যের সংখ্যাকে মহর সাব্যস্ত করে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে রায় প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَوِىْ دَعْوٰى اَقَلِّ الْمَالَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় মহিলা তার মহরের ক্ষেত্রে দু সংখ্যার কম দাবি করুক কিংবা বেশি দাবি করুক, এতে মাসআলার কোনো বিধানগত পার্থক্য হবে না। অর্থাৎ উভয় অবস্থায় স্ত্রী এক হাজার টাকাই লাভ করবে। এটাই সহীহ মত।

قَوْلُهُ ثُمَّ قِيْلَ اَلْاِخْتِلَافُ فِيْمَا اِذَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কোনো কোনো ফকীহ / শায়খের মত এই যে, সাহেবাইন (র.) ও ইমাম সাহেবের মাঝে যে মতপার্থক্য, তা তখনই প্রযোজ্য যখন মহিলা বাদী হয়। কেননা, স্ত্রীর উদ্দেশ্য কখনো কখনো শুধু মহর লাভ করাই হয়ে থাকে। বিবাহের আক্‌দ তার উদ্দেশ্য হয় না।

অথচ স্বামীর উদ্দেশ্য কেবলই বিবাহের আক্‌দ। যেহেতু স্বামীর এক্ষেত্রে মাল দিতে হয়, তাই মাল তার উদ্দেশ্য হবে কি করে? সুতরাং স্বামী বাদী হলে যেহেতু তার আক্‌দ প্রমাণই উদ্দেশ্য হয়, আর আক্‌দ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর ঐক্যমত জরুরী। অথচ এখানে দুজনের ঐকমত্য পাওয়া যায়নি। তাই স্বামী বাদী হওয়ার সূরতে 'নেসাবে শাহাদাত' না হওয়াতে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হলে বিবাহ প্রমাণিত হবে না।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اَلْخِلَافُ فِى الْفَصْلَيْنِ الخ : কতিপয় মাশায়েখ মনে করেন– ইমামগণের মতবিরোধ উভয় অবস্থাতে। অর্থাৎ স্বামী বাদী হলে যেমন মতবিরোধ, তদ্রূপ স্ত্রী বাদী হলেও মতবিরোধ। হেদায়ার মুসান্নিফ (র.) এ মতকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলেছেন। এ মত বিশুদ্ধ হওয়ার যুক্তি এ ইবারতের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

فَصْلٌ فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الْاِرْثِ

قَالَ : وَمَنْ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلٰى دَارٍ اَنَّهَا كَانَتْ لِاَبِيْهِ اَعَارَهَا اَوْ اَوْدَعَهَا الَّذِىْ هِىَ فِىْ يَدِهٖ فَاِنَّهٗ يَاْخُذُهَا وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ اَنَّهٗ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهٗ وَاَصْلُهٗ اَنَّهٗ مَتٰى ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوْرِثِ لَا يُقْضٰى بِهٖ لِلْوَارِثِ حَتّٰى يَشْهَدَ الشُّهُوْدُ اَنَّهٗ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ يَقُوْلُ اِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكُ الْمُوْرِثِ فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُوْرِثِ شَهَادَةً بِهٖ لِلْوَارِثِ وَهُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَجَدِّدٌ فِىْ حَقِّ الْعَيْنِ حَتّٰى يَجِبَ عَلَيْهِ الْاِسْتِبْرَاءُ فِى الْجَارِيَةِ الْمَوْرُوْثَةِ وَيَحِلُّ لِلْوَارِثِ الْغَنِىِّ مَا كَانَ صَدَقَةً عَلَى الْمُوْرِثِ الْفَقِيْرِ فَلَابُدَّ مِنَ النَّقْلِ اِلَّا اَنَّهٗ يَكْتَفِىْ بِالشَّهَادَةِ عَلٰى قِيَامِ مِلْكِ الْمُوْرِثِ وَقْتَ الْمَوْتِ لِثُبُوْتِ الْاِنْتِقَالِ ضَرُوْرَةً ـ

অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি একটি বাড়ির ব্যাপারে এ মর্মে প্রমাণ [সাক্ষ্য] পেশ করল যে, বাড়িটি ছিল তার পিতার, তিনি যার দখলে বাড়িটি বর্তমানে আছে, তাকে তা ধার হিসেবে কিংবা আমানত হিসেবে দিয়েছেন। সুতরাং সে [বাদী] বাড়িটি [সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে] গ্রহণ করবে। তার পিতা মারা গেছেন এবং তার জন্য বাড়িটি ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে রেখে গেছেন এ সবের প্রমাণ দাখিল করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে না। এ ব্যাপারে তরফাইন (র.)-এর মূলনীতি এই যে, যখন ওয়ারিশদাতার মালিকানা প্রমাণ হয়ে যায়, তখন সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, সে মারা গেছে এবং সে সম্পত্তি ত্যাজ্য হিসেবে রেখে গেছে -এর আগ পর্যন্ত ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণ হয় না। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়ারিশের মালিকানাই ওয়ারিশদাতার মালিকানা। সুতরাং ওয়ারিশদাতার মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা ওয়ারিশের মালিকানার সাক্ষ্য দেওয়া হয়ে যায়। তরফাইন (র.) বলেন, বস্তুর উপর ওয়ারিশের মালিকানা একটি নতুন মালিকানা। এজন্যই তো ওয়ারিশী সূত্রে পাওয়া দাসীর জরায়ুর ইস্‌তিব্‌রা ওয়াজিব এবং দরিদ্র ওয়ারিশদাতার জন্য যা সদকাহ ছিল, তা ধনী ওয়ারিশের জন্য হালাল। সুতরাং মালিকানা স্থানান্তর/বদল হওয়া আবশ্যক। অবশ্য ওয়ারিশদাতার মৃত্যুর সময় তার মালিকানা ছিল এতটুকুর উপর সাক্ষ্য থাকাটাই যথেষ্ট, যাতে করে পরোক্ষভাবে মালিকানা বদল হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বের সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলোতে জীবিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষ্যদান ও তা গ্রহণ করা যায় কিনা, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে তিনি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সাক্ষ্যদান ও তা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। জীবিত মানেই অস্তিত্ববান প্রাণী, আর মৃত হলো যার অস্তিত্ব বিলোপ হয়েছে। জীবিতের সাক্ষ্যের আলোচনার পর মৃতের সাক্ষ্যের আলোচনা আনা যুক্তিসঙ্গত। অতএব, এ অনুচ্ছেদের সাথে আগের আলোচনাগুলোর সুন্দর মুনাসাবাত রয়েছে।

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلٰى دَارٍ الخ : উপরের ইবারতে ত্যাজ্য সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্যদানের আলোচনা শুরু হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) প্রথম যে মাসআলাটি চয়ন করেছেন তা এই যে, কোনো একব্যক্তির পিতা মারা গিয়েছে। তিনি একটি বাড়ি ধার হিসেবে কিংবা আমানত হিসেবে অন্য একব্যক্তির কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পুত্র সে বাড়িটি বর্তমান দখলদারের কাছে দাবি

করলে সে সেটা দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর মৃতের পুত্র এ মর্মে প্রমাণ/সাক্ষী পেশ করল যে, বাড়িটি তার পিতার ছিল, তিনি সেটা বর্তমান দখলদারের কাছে ধার বা আমানত হিসেবে দিয়েছিলেন। এতটুকু প্রমাণ পেশ করতে পারলে তিনি বাড়ি পেয়ে যাবেন। এখানে পুত্রকে এ প্রমাণ আলাদা করে দিতে হবে না যে, তার পিতা মারা গেছেন এবং মরহুম এ বাড়িটির উত্তরাধিকারী ছেলেকে করে গেছেন। মূলত এ হুকুম ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) সকলের ঐকমত্যানুযায়ী।

কিন্তু তাখরীযে এ ব্যাপারে মতবিরোধের উল্লেখ আছে। যেমন– হেদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, মীরাসের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে তরফাইন (র.)-এর নিকট এ মূলনীতি যে, যখন মালিক তথা ওয়ারিশ এর মালিকানা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তারপর তার ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণের জন্য আগের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়; বরং ওয়ারিশের কর্তব্য হলো সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করা যে, তার ওয়ারিশদাতা যেমন– তার পিতা মারা গেছে এবং তিনি তার জন্য এ বাড়িটি ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে রেখে দিয়েছেন ইত্যাদি। মোটকথা এ বর্ণনানুযায়ী ওয়ারিশকে দু-বার সাক্ষী হাজির করতে হবে। প্রথমবার তার ওয়ারিশদাতার মালিকানা প্রমাণের জন্য। আর দ্বিতীয়বার তার ওয়ারিশদাতার মৃত্যু এবং তার মালিকানা প্রমাণের জন্য।

অবশ্য তাদের এ মূলনীতির সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) একমত নন, তার মতে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে তার পিতার/ওয়ারিশ দাতার মালিকানা এর দ্বারা পুত্রের/ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কেননা, ওয়ারিশদাতার যে মালিকানা ছিল সেটাই ওয়ারিশের জন্য প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী আমাদের মূল ইবারত [মতন]-এর মাসআলা স্পষ্ট। মতনের দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়ারিশের মালিকানার জন্য নতুন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতও তাই। কিন্তু তরফাইনের বর্ণিত মূলনীতির সাথে মতনের মাসআলাতে বাহ্যত সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে। কেননা, তাদের বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী দু'টি সাক্ষ্যের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়; অথচ মতনের মাসআলা অনুযায়ী একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট; বরং মতনে তো এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে ওয়ারিশদাতার মৃত্যু ও তার মালিকানা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য পেশ করতে বাধ্য করা হবে না।

মতন ও মূলনীতির মধ্যে যে বিরোধ তার নিরসন এই যে, মূলনীতি অনুযায়ী তো দু-বার সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। প্রথমে সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে হবে ওয়ারিশদাতার মালিকানা প্রমাণের জন্য। অতঃপর দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য পেশ করতে হবে ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণের জন্য। তবে এ মাসআলাতে একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। এর কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে আমাদের জানা দরকার কেন মূলনীতি অনুযায়ী দু'বার সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে হবে। এর কারণ এই যে, ওয়ারিশের উত্তরাধিকারের সূত্রে যে বস্তুর উপর মালিকানা আসে, সেটা একটা নতুন মালিকানা। ওয়ারিশদাতার মালিকানা হুবহু ওয়ারিশের মালিকানা নয়। মালিকানা যে নতুন এর দলিল এই যে, কোনো ব্যক্তি ওয়ারিশী সূত্রে একটি দাসী লাভ করল। ইসতিবরা করার পূর্বে উক্ত দাসী ব্যবহার করা তার জন্য জায়েজ নয়। ইসতিবরা বলা হয় মহিলার জরায়ুতে অন্যকোনো পুরুষের বীর্য আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য এক হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করা। যদি এক মাসের মধ্যে হায়েজ হয়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে যে, মহিলার জুরায়ুতে অন্য পুরুষের বীর্য নেই। মোটকথা ওয়ারিশের ক্ষেত্রে নতুন মালিকানা হয় বলেই ইসতিবরা করতে হয়। যদি ওয়ারিশদাতার মালিকানা ওয়ারিশের জন্য প্রমাণ হতো তাহলে ইসতিবরার প্রয়োজন হতো না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, দরিদ্র ওয়ারিশদাতার জন্য যে সদকা হালাল ছিল তা ধনী ওয়ারিশের জন্য হালাল হয়ে যায়। যদি নতুনভাবে ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণ না হতো, তাহলে তার জন্য সদকা হালাল হতো না। কেননা ধনীর জন্য সদকা হালাল নয়; সদকা কেবলই দ্ররিদ্রের জন্য হালাল। সুতরাং ওয়ারিশের প্রতি মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। আর তা হলো ওয়ারিশের মালিকানা লাভ করা নতুনভাবে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে। মোটকথা তরফাইন (র.)-এর মূলনীতি অনুযায়ী ওয়ারিশদাতার মালিকানার জন্য একবার সাক্ষ্য পেশ করা দরকার। আর ওয়ারিশের মালিকানার জন্য পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। তাদের এ মূলনীতির শাখা-প্রশাখাগত অনেক মাসআলা বের হয়ে আসে।

বাকি রইল ইবারতের মাসআলার মধ্যে তরফাইন (র.)-এর মতানুযায়ী একটি সাক্ষ্যকে কি করে যথেষ্ট মনে করা হলো?

এর জবাব এই যে, যখন ওয়ারিশদাতার মৃত্যুর সময় তার মালিকানার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তখন মৃত্যুর সময় তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু মৃত্যুর সময় তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই তার মৃত্যুর সাথে ইখতিয়ার ছাড়াই ওয়ারিশের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যেহেতু মালিকানা এমনিতেই ওয়ারিশের প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তাই ওয়ারিশের মালিকানা প্রমাণের জন্য নতুন করে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু মালিকানা প্রমাণে সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই তাই ওয়ারিশদাতার সাক্ষ্যই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

وَكَذَا عَلٰى قِيَامِ يَدِهٖ عَلٰى مَا نَذْكُرُهٗ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَدْ وُجِدَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ فِيْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُوْدِعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهٖ فَأَغْنٰى ذٰلِكَ عَنِ الْجَرِّ وَالنَّقْلِ ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ মৃত্যুর সময় সম্পত্তিতে যে তার দখল আছে এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এর আলোচনা আমরা পরবর্তীতে করব ইনশাআল্লাহ। আলোচ্য মাসআলায় দখলের ব্যাপারে সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। কেননা ধার গ্রহীতা এবং আমানত গ্রহীতার দখল মালিকের দখলের স্থলাভিষিক্ত। ফলে এটা মালিকানা বদলকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذَا عَلٰى قِيَامِ يَدِهٖ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ওয়ারিশদাতার দখলের ব্যাপারেও সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তা এভাবে যে, মাসআলায় مُسْتَعِيْر [ধারগ্রহণকারী, مُوْدِعْ [আমানত গ্রহীতা] ও مُسْتَأْجِرْ [ভাড়াটিয়া] -এর দখল থাকার বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাদের দখল ওয়ারিশদাতার দখলের স্থলবর্তী হয়েছে। তাদের দখল প্রমাণিত করা যেন মালিক [ওয়ারিশদাতা] -এর দখলকেই প্রমাণ করা। যেহেতু তার দখল প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং দখলের সাথে মালিকানাও প্রমাণিত হয়েছে। কেননা দখল মালিকানার বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ।

অতঃপর যখন পিতার মালিকানা প্রমাণিত হলো তখন তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার মালিকানা পুত্রের প্রতি স্থানান্তরিত হবে। এখানে ছেলের মালিকানার জন্য কোনো আলাদা প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهَا كَانَتْ فِيْ يَدِ فُلَانٍ مَاتَ وَهِيَ فِيْ يَدِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبُ يَدَ مِلْكٍ بِوَاسِطَةِ الضَّمَانِ وَالْأَمَانَةُ تَصِيْرُ مَضْمُوْنَةً بِالتَّجْهِيْلِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلٰى قِيَامِ مِلْكِهٖ وَقْتَ الْمَوْتِ ـ

অনুবাদ : আর যদি সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ বাড়িটি অমুকের দখলে ছিল। তারপর তার দখলে থাকা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে এ সাক্ষ্য জায়েজ । কেননা মৃত্যুর সময় যে দখল থাকে তা যেমানের মাধ্যমে মালিকানার দখলে রূপান্তরিত হয়। আর আমানত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা এর জামানত চলে আসে। সুতরাং তা মৃত্যুর সময় তার মালিকানা থাকার উপর সাক্ষ্যদানের পর্যায়ে গণ্য হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهَا كَانَتْ فِيْ يَدِ فُلَانٍ الخ : ইবারতের মাসআলার সূরত এই যে, শাহেদ নামের একব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হিসেবে পিতার দখলে থাকা একটি বাড়ির দাবি করল। অতঃপর তার পক্ষে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে, বাড়িটি শাহেদের পিতার দখলে ছিল এবং তার দখলে থাকা অবস্থাতেই সে মারা যায়, তাহলে তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ সাক্ষ্যের ফলে শাহেদ [ওয়ারিশ] সেই বাড়ির মালিক হবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়ারিশদাতার দখল তিন প্রকার হতে পারে। ১. মালিকানার দখল ২. গছব বা জবরদস্তির দখল ও ৩. আমানতের দখল। যদি তার দখল মালিকানার দখল হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুর পর তার দখলকৃত বাড়ি শাহেদের মালিকানায় চলে আসবে। কেননা, মৃতব্যক্তি তথা ওয়ারিশদাতার মৃত্যুর পর তার মালিকানাধীন সব সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের দখলে চলে আসে।

দ্বিতীয় সূরতে অর্থাৎ তার দখল যদি জবরদস্তি হয়ে থাকে, তাহলে গাছেবের মৃত্যুর সাথে সাথে গছবকৃত বস্তুর উপর জরিমানা চলে আসবে। আর নিয়মানুযায়ী যদি কোনো গাছেবের উপর গছবকৃত বস্তুর বিপরীতে জরিমানা আরোপ করা হয় তাহলে গাছেব গছবকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যায়। সুতরাং যেহেতু তার উপর জরিমানা আরোপের ফলে সে উক্ত বস্তুর মালিক হয়ে গেছে তাই তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ সে বস্তুর মালিক হয়ে যাবে।

তৃতীয় সূরত এই যে, বাড়ির উপর শাহেদের পিতার দখল ছিল আমানতের দখল। কিন্তু সে যেহেতু কার আমানত সেটা বলে যায়নি; বরং সে বিষয়টি অস্পষ্ট রেখে মারা গিয়েছে, তাই সে আখিরাতে এ বাড়ির যেমান দিতে বাধ্য হবে। যেহেতু তার উপর যেমান [জরিমানা] আসছে তাই সে তার মালিকানাধীন অবস্থায় বাড়িটি রেখে মারা গিয়েছে সাব্যস্ত হবে। ওয়ারিশদাতা যে সকল বস্তু তার মালিকানাধীন অবস্থায় রেখে মারা গেছে তার উত্তরাধীকারীগণ সে সকল বস্তুর মালিক হয়ে যায়। মোটকথা আমানতের এ সূরতেও ওয়ারিশ তার ওয়ারিশদাতার জমিনের/স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

সারকথা এই যে, ওয়ারিশদাতার মৃত্যুর সময় যদি তার মালিকানা উপরিউক্ত তিন সুরতের কোনো এক সুরতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে ওয়ারিশদাতা সে সম্পদের মালিক হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ তার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। তার ওয়ারিশগণ মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে না যে, ওয়ারিশদাতার মালিকানা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল অতঃপর ওয়ারিশগণ সেটার মালিকানা লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত মাসআলা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বাদী যে ওয়ারিশ, এ বিষয়টি অজ্ঞাত হয়।

وَإِنْ قَالُوْا لِرَجُلٍ حَيٍّ نَشْهَدُ أَنَّهَا كَانَتْ فِيْ يَدِ الْمُدَّعِيْ مُنْذُ أَشْهُرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الْيَدَ مَقْصُوْدَةٌ كَالْمِلْكِ وَلَوْ شَهِدُوْا أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَهُ تُقْبَلُ فَكَذَا هٰذَا وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوْا بِالْأَخْذِ مِنَ الْمُدَّعِيْ وَجْهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا إِنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ بِمَجْهُوْلٍ لِأَنَّ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ وَهِيَ مُتَنَوِّعَةٌ إِلٰى مِلْكٍ وَأَمَانَةٍ وَضَمَانٍ فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجْهُوْلِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَعْلُوْمٌ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ وَبِخِلَافِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ مَعْلُوْمٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি সাক্ষীরা কোনো জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বাড়িটি বাদীর হাতে গত কয়েক মাস থেকে ছিল, তাহলে [তাদের] সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মালিকানার মত কবজ [দখল]ও উদ্দেশ্য। আর যদি সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়িটি তার মালিকানাধীন ছিল, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তদ্রূপ এ সাক্ষ্যও [গ্রহণযোগ্য]। এটা সাক্ষীরা বাদী থেকে জমি গ্রহণ করার সাক্ষ্য দেওয়ার মত হলো। জাহেরী রেওয়ায়েত যা তরফাইন (র.)-এর অভিমত, এর দলিল এই যে, এখানে একটি অজ্ঞাত বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, বাদীর দখল শেষ হয়ে গিয়েছে। আর দখলও তিন প্রকার। মালিকানার দখল, আমানতের দখল এবং জামানতের দখল। সুতরাং অজ্ঞাত দখলের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে রায় দেওয়া অসম্ভব। মালিকানার বিষয়টি এমন নয়। কেননা, মালিকানা হলো জ্ঞাত ও অভিন্ন। তার থেকে দখল নিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, এটি পরিজ্ঞাত বিষয় এবং এর হুকুমও জানা আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالُوْا لِرَجُلٍ حَيٍّ نَشْهَدُ الخ : মুসান্নিফ (র.) দখল সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার আরেকটি মাসআলা এখানে উল্লেখ করেছেন। এ মাসআলাটি অবশ্য মীরাসের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত নয়, প্রাসঙ্গিক আলোচনার অধীনে এটি চলে এসেছে। মৌলিকভাবে এটি এ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত নয়।

মাসআলার স্বরূপ এই যে, একজন জীবিত ব্যক্তির দখলে একটি বাড়ি আছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি বাড়িটি তার বলে দাবী করল। সে আদালতে এ বলে দাবি করল যে, বাড়িটি আমার; কিন্তু বর্তমান দখলদার জোরপূর্বক আমার থেকে বাড়িটি দখল করে রেখেছে। বিবাদী বিষয়টি অস্বীকার করলে বাদী তার অনুকূলে সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, বাড়িটি ইতঃপূর্বে কয়েক মাস বাদীর দখলে ছিল। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ সাক্ষ্য গ্রহণ করে বাদীর পক্ষে বাড়ির ফয়সালা দেওয়া হবে না। এ মাসআলাটি জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী লিখিত এবং তরফাইন (র.)-এর মত এরূপই। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উপরিউক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বাদীর হাতে তার জমি ফিরিয়ে দিবেন।

উল্লেখ্য যে, মূল ইবারতে (لِرَجُلٍ حَيٍّ) জীবিত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এর সুস্পষ্ট উল্লেখের পরে মাসআলার মধ্যে মতবিরোধ বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবিত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অবস্থাতে মাসআলার মধ্যে মতবিরোধ। অন্যথায় যদি সাক্ষ্যদাতারা কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সে সাক্ষ্য সকলের ঐক্যমতে গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা জীবিত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুরতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তাঁর দলিল এইযে, দখল মালিকানার মতোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মালিকানা যেরূপ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হয় তদ্রূপ দখলে থাকাটাও ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। মালিকানার ব্যাপারে যদি বাদীর পক্ষে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় তাহলে সকলের ঐক্যমতে সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। মালিকানার ব্যাপারে যেহেতু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় সুতরাং দখলের ব্যাপারেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াটা যুক্তির দাবি। কেননা, মালিকানার মত দখলও মানুষের উদ্দেশ্য হয়।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوْا الخ : মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের সমর্থনে আরেকটি মাসআলা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, দখলের ব্যাপারে সাক্ষ্যটা যেন এমন হলো যে, সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, বাড়িটি মূলে বাদীর ছিল। অতঃপর বিবাদী বাদীর কাছ থেকে ভোগ করার জন্য বাড়িটির দখল কিছুদিনের জন্য নিজ হাতে নিয়েছে। এমতাবস্থায় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করে বিচারক বিবাদীকে বাদীর কাছে বাড়ির দখল ফেরত দেওয়ার আদেশ করবেন।

সারকথা হলো বিবাদী বাড়িটি নিয়েছে এ সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য, তদ্রূপ বাড়ির ব্যাপারে বাদীর পূর্ববর্তী দখলের সাক্ষ্য ও গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জাহেরী রেওয়ায়েত তথা তরফাইন (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। দলিলের সারকথা এই যে, বাদী বর্তমানে জমির দখলদার নয়; বরং সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অতীতে বাদীর দখলে জমি ছিল। কিন্তু তার দখল কিরূপ ছিল তার কোনো ব্যাখ্যা সাক্ষীদের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়নি। জমির উপর বাদীর পূর্ববর্তী দখল তিন ধরনের হতে পারে–

১. বাদীর দখল ছিল মালিকানার দখল। অর্থাৎ বাদী মালিক হিসেবে জমিটি দখলে রেখেছিল।

২. আমানতের দখল। অর্থাৎ একজন আমানতদার হিসেবে বাদী জমিটি দখলে রেখেছিল।

৩. জামানতের তথা গছবের দখল। অর্থাৎ বাদী জমিটি গছব করে জবরদস্তিমূলক দখল করে রেখেছিল।

মোটকথা আলোচ্য জমির উপর বাদীর দখল তিন সুরতের কোনো একটি সুরতে হতে পারে। সে সুরতগুলোর মধ্য থেকে কোন সুরতে বাদীর দখল ছিল তা সাক্ষীদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট নয়। সুতরাং সাক্ষীদের বক্তব্য এক্ষেত্রে মাজহুল বা অস্পষ্ট। সে অস্পষ্টতা বর্তমানে দূর করাও মুশকিল। কেননা, তার দখল তো এখন বিলুপ্ত। এমতাবস্থায় অজ্ঞাত বিষয় ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা/ রায় প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতএব, এখন বিবাদীর দখলকে বাতিল করে বাদীর দখল সাব্যস্ত করে রায় প্রদান করা বিচারকের পক্ষে অসম্ভব।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمِلْكِ الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছিলেন, মালিকানার মত দখলও উদ্দেশ্য। সুতরাং মালিকানার পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলে দখলের পক্ষেও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, দখল আর মালিকানা এক নয়। মালিকানার বিষয়টি স্পষ্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর দখল তিন ধরনের হতে পারে। অতএব, দখলকে মালিকানার সাথে কিয়াস করা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْاَخْذِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর আরেকটি দলিলের জবাব দিয়েছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, যদি সাক্ষীরা "বাদী থেকে বিবাদী জোরপূর্বক জমি গ্রহণ করেছে"– এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিষয়টি তো আগে বাদীর দখলে থাকার মতই হলো। অতএব, বাদীর দখল সংক্রান্ত তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিবাদী কর্তৃক জমি গ্রহণকরা বা নিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এমন নয়। কেননা, এখানে বাদী থেকে বিবাদী বাড়ি/জমি জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে স্পষ্ট ও জ্ঞাত হয়ে গেছে। যেহেতু এটি একটি জ্ঞাত বিষয়, তাই এর উপর অজ্ঞাত দখলকে কিয়াস করা সঠিক নয়। সুতরাং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় কিয়াসটি مَقِيْس عَلَيْه ও مَقِيْس -এর মাঝে ব্যবধান থাকায় গ্রহণযোগ্য হলো না।

وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ وُجُوبُ الرَّدِّ وَلِأَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايَنٌ وَيَدَ الْمُدَّعِي مَشْهُودٌ بِهِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِذٰلِكَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ دُفِعَتْ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ هٰهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ ـ

অনুবাদ : এর হুকুম হলো এটিকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তাছাড়া দখলদারের দখল দৃশ্যমান। আর বাদীর দখল সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত। আর [এটা সুবিদিত যে,] সংবাদ প্রত্যক্ষ দর্শনের মত নয়। যদি এ ব্যাপারে বিবাদী স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে বাড়ি বাদীকে ফেরত দেওয়া হবে। কেননা যে বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়, তাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকার স্বীকারোক্তি অবিশুদ্ধ হয় না। আর যদি দু'জন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিবাদী এ স্বীকারোক্তি করেছে যে, বাড়িটি বাদীর দখলে ছিল, তাহলেও বাদীর কাছে বাড়িটি ফেরত দেওয়া হবে। কেননা, এখানে যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তা হলো স্বীকারোক্তি। আর এটা জ্ঞাত বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিবাদী কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়টি যেমন স্পষ্ট, তদ্রূপ এর হুকুমও স্পষ্ট। এর হুকুম হলো ছিনতাই বা জবরদস্তিমূলক গ্রহণ করা সম্পদ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايَنٌ الخ : এখান থেকে তরফাইন (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল পেশ করা হয়েছে। দলিলের সার এই যে, বর্তমান দখলদার তথা বিবাদীর দখল দৃশ্যমান। অর্থাৎ এটা সবারই জানা ও দেখা যে, বর্তমানে তা অমুকের দখলে আছে। পক্ষান্তরে বাদীর দখল দৃশ্যমান নয়। অতীতে কোনো এক সময়ে তার দখল যে ছিল, তা প্রমাণ করা হয়েছে সাক্ষ্য দ্বারা; যা মূলত খবর বা সংবাদ। আর খবর ও দৃশ্যমান এ দু'টি বিষয়ের মাঝে দৃশ্যমান হওয়া বেশি শক্তিশালী। সুতরাং দুটি দখলের মধ্যে বর্তমান দখল হলো বিবাদীর দখল। আর এটা বেশি শক্তিশালী। আর পূর্বের দখল যা বাদীর দখল, তা তুলনামূলক কম শক্তিশালী। অতএব, বেশি শক্তিশালী দখলের পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা হবে। বাদীর কাছে জমি ফেরত দেওয়ার ফয়সালা প্রদান করা হবে না।

মোটকথা জাহেরী রেওয়ায়েতের দলিলের মাধ্যমে তরফাইন (র.)-এর মাযহাব অধিক শক্তিশালী হওয়া প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِذٰلِكَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الخ : উপরের বর্ণিত মাসআলা পূর্বোল্লিখিত মাসআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতে উল্লেখ করেন- যদি বাদী কোনো একটি বাড়ির মালিকানা দাবি করে যা তার দখলে নেই, দখলে আছে বিবাদীর। এমতাবস্থায় যদি বিবাদী এ স্বীকারোক্তি দেয় যে, বাড়িটি আগে বাদীর দখলে ছিল, তাহলে বাড়িটি বাদীর কাছে ফেরত দেওয়া হবে। অবশ্য শুধুমাত্র ফেরত দেওয়ার দ্বারা বাদী বাড়ির মালিক এ কথা প্রমাণিত হবে না।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে যে, বিবাদী তো বাদীর অস্পষ্ট দখলের পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করছে। অস্পষ্ট দখলের পক্ষে যেহেতু ইতিপূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। সুতরাং অস্পষ্ট দখলের পক্ষে স্বীকারোক্তি অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে বিষয়ে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট থাকা অবস্থাতেও ইক্‌রার [স্বীকারোক্তি] গ্রহণযোগ্য হয়। মোটকথা ইক্‌রারকৃত বিষয় অস্পষ্ট হওয়া স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয় না। অতএব, বিবাদীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাড়িটি বাদীর হাতে ফেরত দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ الخ : আর যদি দু'জন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিবাদী বাদীর পক্ষে বাড়ির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তাহলেও বাদীর কাছে বাড়ি ফেরত দেওয়া হবে। কেননা, সাক্ষীরা এক্ষেত্রে যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছে, তা হলো ইক্‌রার। আর একটি জ্ঞাত বিষয়, যদিও আলোচ্য মাসআলায় مُقَرّ بِهٖ [সে বিষয়ে ইকরার করা হয়েছে] তথা দখলের ধরণ অজ্ঞাত। তবে مُقَرّ بِهٖ অজ্ঞাত হলেও ইক্‌রার যে গ্রহণযোগ্য হয়, তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য সুরতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ইক্‌রার প্রমাণ হবে। আর ইকরারের দ্বারা বাদীর দখল প্রমাণিত হবে। আর এজন্য বাদীর কাছে তার বাড়ি ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। মোটকথা সাক্ষীরা যে বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছে, তা হলো ইকরার। আর ইকরার একটি জ্ঞাত বিষয়। অতএব, আলোচ্য সুরতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

قَالَ : اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِىْ كُلِّ حَقٍّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ اِلَيْهَا اِذْ شَاهِدُ الْاَصْلِ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِبَعْضِ الْعَوَارِضِ فَلَوْ لَمْ يَجُزِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ اَدّٰى اِلٰى اِتْوَاءِ الْحُقُوْقِ وَلِهٰذَا جَوَّزْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَاِنْ كَثُرَتْ اِلَّا اَنَّ فِيْهَا شُبْهَةً مِنْ حَيْثُ الْبَدْلِيَّةِ اَوْ مِنْ حَيْثُ اَنَّ فِيْهَا زِيَادَةُ اِحْتِمَالٍ وَقَدْ اَمْكَنَ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ بِجِنْسِ الشُّهُوْدِ فَلَا تُقْبَلُ فِيْمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ ـ

পরিচ্ছেদ : সাক্ষ্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল হক সন্দেহ দ্বারা বাতিল হয় না, তাতে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জায়েজ। বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় বলে ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে এটি জায়েজ সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, মূল সাক্ষী কখনো সমস্যার কারণে তার সাক্ষ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় যদি সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান বৈধ না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হকসমূহ বিনষ্ট হবে। এজন্য আমরা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি। যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। তবে এতে বদলী সাক্ষ্য হওয়ার দিক থেকে এবং ভুলের সম্ভাবনা পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে অবশ্য মূল সাক্ষীদের মাধ্যমে ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এ কারণে যে সকল বিষয় সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়, সেগুলো– যেমন হদসমূহ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ হলো شَهَادَةٌ-এর فَرْع ; আর মূল শাহাদাত হলো আসল। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) মূল সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদে এর فَرْع বা অনুগামী বিষয় তথা شَهَادَةٌ عَلٰى شَهَادَةٍ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) আসল এর আলোচনা আগে করা উচিত বলে এর আলোচনা প্রথমে করেছেন। আর فَرْع এর আলোচনা পরে এনেছেন যুক্তির দাবি অনুসারেই।

قَوْلُهُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ الخ : اَلشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ অর্থ হলো মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে অন্যরা সাক্ষ্য দেওয়া। যেহেতু এ সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের/প্রত্যক্ষ শ্রোতার সাক্ষ্য নয়; বরং এতে তার বা মাধ্যম চলে এসেছে, তাই এ সাক্ষ্য সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ সাক্ষ্য যেসব বিষয় সন্দেহ দ্বারা বাতিল হয় না এবং সামান্য সন্দেহ থাকাসত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হয়, তাতে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান কিয়াসের ভিত্তিতে জায়েজ নয়, ইসতিহ্‌সানের ভিত্তিতে জায়েজ।

কিয়াসের দিক এই যে, সাক্ষ্যদান একটি দৈহিক ইবাদত। এ ইবাদত মূল সাক্ষীর উপর শরিয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত হয়। তাছাড়া যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সাক্ষ্যদান তার হক নয়। এজন্য সাক্ষীদের সাথে তার বিতর্ক করার কিংবা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বাধ্য করার কোনো অধিকার তাদের নেই। মোটকথা সাক্ষ্যদান একটি দৈহিক ইবাদত। আর ইবাদতে কোনো স্থলবর্তী করা চলে না। সুতরাং সাক্ষ্য শুনে সেই ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি বৈধ হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে স্থলবর্তী হয়েই সাক্ষ্যদান করছে।

কিন্তু কিয়াসের বিপরীতে মানুষের হকসমূহ বাস্তবায়নের তাগিদে শরিয়ত এক্ষেত্রে ইসতিহসানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছে।

ইসতিহসানের দিক এই যে, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া একটি জরুরী বিষয়। কেননা, অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার কারণে সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। যেমন– মূল সাক্ষী গুরুতর অসুস্থ কিংবা সফরে থাকার কারণে আদালতে হাজির হতে পারল না। তখন তার পক্ষ থেকে যদি কেউ সাক্ষ্য না দিতে পারে, তাহলে প্রমাণের অভাবে বাদীর হক বাতিল হওয়ার পক্ষে বিচারক রায় প্রদান করবেন। ফলে সে তার হক থেকে বঞ্চিত হবে। এমনভাবে এক এক করে বহু মানুষের হক বাতিল হতে থাকবে। অথচ ইসলামি শরিয়তের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ হক যেন তার হক নিজে বুঝে পায়; অধিকন্তু মানুষের হক নষ্ট করা নাজায়েজ এবং হক প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব।

মানুষের হকসমূহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনকি স্থলবর্তী সাক্ষী যদি সংখ্যায় বেশিও হয়, তবুও সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ।

স্থলবর্তী সাক্ষী বেশি হওয়া– হেদায়ার ভাষ্যকারগণ এ কথাটির দুটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

১. মূল সাক্ষী দুজনকে তার স্থলবর্তী করেছে। তারা আবার দু'জনকে স্থলবর্তী করেছে। তারা আবার স্থলবর্তী করেছে। এভাবে বেশি হওয়াকে وَاِنْ كَثُرَتْ -এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে وَاِنْ كَثُرَتْ টা وَاِنْ بَعُدَتْ-এর অর্থে।
২. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, মূল সাক্ষী দুজন। তারা প্রত্যেকে দুজন করে সাক্ষী বানালো। তাহলে স্থলবর্তী সাক্ষী হলো চারজন। তাদের প্রত্যেকে আবার দু'জন করে সাক্ষী বানালো। ফলে তাদের স্থলবর্তী হলো আটজন। এ অর্থে وَاِنْ كَثُرَتْ শব্দটি আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা অনুগামী বা স্থলবর্তী যত বেশি সাক্ষী হোক না কেন তাতে এক প্রকার সন্দেহ থেকেই যায়। এ সন্দেহ দুভাবের কোনো একভাবে কিংবা উভয়ভাবে হতে পারে–

১. স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীদের বদল। আর মানুষ তখনই বদলের দ্বারস্থ হয়, যখন আসল বিষয়ে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। আর এখানেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ, মূল সাক্ষীদের না পেয়ে স্থলবর্তী সাক্ষীদের দ্বারস্থ হয়েছে। মোটকথা স্থলবর্তী সাক্ষীগণ হলেন বদল। আর বদলী সাক্ষীদের মধ্যে আসল সাক্ষীদের তুলনায় এক প্রকার দুর্বলতা থেকে যায়।
২. দ্বিতীয় যে সন্দেহ দেখা যায়, তা হলো মিথ্যার সম্ভাবনা। কেননা মূল সাক্ষী যারা, তাদেরই মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তারা আদেল [ন্যায়পরায়ণ]। মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা এজন্য যে, তারা গুনাহ থেকে পূত-পবিত্র নয়। মূল সাক্ষীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা যতটুকু, তারচেয়ে বেশি সম্ভাবনা পরবর্তী সাক্ষীদের ব্যাপারে। কেননা, তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়।

মোটকথা স্থলবর্তী সাক্ষীদের মধ্যে সন্দেহের দিক প্রবল। তাছাড়া মূল সাক্ষীদের মাধ্যমে পরবর্তী ও স্থলবর্তী সাক্ষীদের থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবও বটে। সম্ভব এভাবে যে, মূল সাক্ষী সংখ্যায় অনেক দিলেন। তাদের কেউ কেউ সাক্ষ্যদানে অপারগতা প্রকাশ করলেও অন্যরা সাক্ষ্য দিতে পারবে।

যেহেতু মূল সাক্ষীদের মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন পূরণ হওয়া সম্ভব এবং স্থলবর্তী সাক্ষীদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান, তাই স্থলবর্তী সাক্ষ্য এমন বিষয়সমূহে গ্রহণযোগ্য হবে না, যাতে সন্দেহপূর্ণ বিষয় অগ্রাহ্য হয়। ইসলামি বিচারকার্যে হদ ও কিসাস হলো এমন বিষয়, যাতে সন্দেহপূর্ণ বিষয় গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং হদ ও কিসাসের মধ্যে স্থলবর্তী সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে।

وَيَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجُوزُ إِلَّا الْأَرْبَعُ عَلَى كُلِّ اَصْلٍ اِثْنَانِ لِاَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَالْمَرْأَتَيْنِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ اِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَلِاَنَّ نَقْلَ شَهَادَةِ الْاَصْلِ مِنَ الْحُقُوْقِ فَهُمَا شَهِدَا بِحَقٍّ ثُمَّ شَهِدَا بِحَقٍّ اٰخَرَ فَتُقْبَلُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ (رحـ) وَلِاَنَّهُ حَقٌّ مِنَ الْحُقُوْقِ فَلَابُدَّ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ ـ

অনুবাদ : দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে দুজন সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতি মূল সাক্ষীর জন্য দুজন সাক্ষী [স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে এ মূলনীতির ভিত্তিতে দুজনের সাক্ষ্যের জন্য চারজন লাগবে।] কেননা প্রতি দুজন সাক্ষী একজন সাক্ষীর স্থলবর্তী। সুতরাং এটি [একজন পুরুষের স্থলবর্তী] দুজন স্ত্রীলোকের ন্যায় হলো। আর আমাদের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর বাণী– 'একজন লোকের সাক্ষ্যের উপর দুজনের সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।' অধিকন্তু এ কারণে যে, মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করা হুকুকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং স্থলবর্তী সাক্ষীরা যেন প্রথমে একটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল অতঃপর আরেকটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে একজনের ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। আর এজন্য যে, এটা মানুষের হকসমূহের অর্ন্তগত বিষয়। তাই তাতে সাক্ষ্যদানের নেসাবের অপরিহার্যতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী দুজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করতে পারবেন। দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী মূল দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে এভাবে সাক্ষ্য নকল করবেন যে, প্রথমে তারা একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য দুজনের নকল করবেন। অতঃপর তারা আরেক মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে নকল করবে।

পক্ষান্তরে এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, প্রত্যেক মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য দুজনে নকল করতে হবে এবং একজনের সাক্ষ্য যারা নকল করেছে তারা অপরজনের সাক্ষ্য নকল করতে পারবে না। এভাবে দুজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য চারজন নকল করতে হবে।

আর ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব হলো, প্রতি একজনের সাক্ষ্য একজনই নকল করতে পারবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষী যেহেতু মূল সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে তাই সে মূল সাক্ষীর সমমর্যাদার হবে। সে যেন মূল সাক্ষীর প্রেরিত প্রতিনিধি। মূল সাক্ষী যদি তার কোনো প্রতিনিধিরূপে কাউকে প্রেরণ করে তাহলে সে একা সাক্ষ্য দিলেই যথেষ্ট হয় তদ্রূপ স্থলবর্তী সাক্ষী একজন হলে মূল সাক্ষীর পরিবর্তে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া তিনি স্থলবর্তিতার বিষয়টিকে হাদীস বেওয়ায়েতের উপর কিয়াস করেছেন। হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে একজন থেকে একজনের বর্ণনা যেরূপ সহীহ তদ্রূপ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন থেকে একজনের সাক্ষ্য নকল করা সহীহ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, প্রত্যেক মূল সাক্ষীর স্থলবর্তী হয় দুজন সাক্ষী যেমন প্রত্যেক পুরুষ সাক্ষীর স্থলবর্তী হয় দুজন মহিলা সাক্ষী। এ মতে দুজন সাক্ষীর স্থলবর্তী হবে চারজন সাক্ষী। অতএব, চারজন সাক্ষীর স্থলবর্তিতার মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রমাণিত হবে।

আহনাফের দলিল : আহনাফের দলিল হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তার উক্তি [মওকুফ হাদীস– لَا يَجُوْزُ عَلٰى شَهَادَةِ رَجُلٍ اِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ 'একজন লোকের সাক্ষ্যের উপর দুজনের সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়।' এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য দুজনে নকল করলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় নয়। এ হাদীস দ্বারা প্রত্যেকের বিপরীতে দুজন সাক্ষী আলাদা করে থাকতে হবে– এ কথা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং দুজন স্থলবর্তী প্রথমে একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করবে অতঃপর তারা দুজনই অপর মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করবে। এভাবে সাক্ষ্য দিলে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দুজনেই নকল করল। সেই সাথে দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী দ্বারাই স্থলবর্তিতার বিষয়টি আদায়ও হয়ে গেল। চারজনের প্রয়োজন হয়নি।
উল্লেখ্য যে, আহনাফ হযরত আলী (রা.)-এর উক্তিটি নকল করেছেন। এ শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না। এরূপ একটি হাদীস মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে নিম্নোক্ত শব্দে পাওয়া যায়– لَا يَجُوْزُ عَلٰى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ اِلَّا رَجُلَانِ

قَوْلُهٗ وَلِاَنَّ نَقْلَ شَهَادَةِ الْاَصْلِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের পক্ষে দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলের মূলকথা হলো, মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য নকল করা মানুষের অধিকারসমূহের অর্ন্তগত বিষয়। আর কারো অধিকার তথা হক প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া যাওয়া একটি জরুরি বিষয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় যখন দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করার মাধ্যমে মানুষের হকসমূহের মধ্য থেকে একটি হক প্রমাণ করল, তখন মানুষের হকসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া যাওয়া জরুরি। সাক্ষ্যদানের নেসাব হয় দুজন সাক্ষী দ্বারা। এখানে দুজন সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে।

অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হলো, দুজন সাক্ষী প্রথমে একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করার পর তারা আরেকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করল। তারা যেন দ্বিতীয় মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকলের মাধ্যমে নতুন একটি হক নকল করল। প্রথম হকের ব্যাপারে অর্থাৎ একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ দ্বিতীয় হক তথা দ্বিতীয় মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করার ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

যেহেতু ফকীহদের মতানুযায়ী দুজন সাক্ষী পালাক্রমে একাধিক হুকুকের সাক্ষ্য দিতে পারে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দুজন সাক্ষী প্রথমে একজনের সাক্ষ্য নকল করার পর দ্বিতীয় একজনের সাক্ষ্য নকল করল। তারা যেন প্রথমে একটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার পর আরেকটি হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। এ উভয় সাক্ষ্যের মধ্যে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া গেল। যেহেতু উভয় সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া গেছে তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

মহিলার সাক্ষ্যদানের বিষয়টি এমন নয়। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে দুজন স্ত্রীলোক একত্রে একজন পুরুষের সমতুল্য। সুতরাং যখন দুজন মহিলা কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় সে ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের নেসাব পাওয়া যায় না। অতএব, মহিলাদের উপর স্থলবর্তী সাক্ষীকে কিয়াস করা সঠিক নয়।

ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের জবাব হলো, তাঁর মাযহাব হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি। হাদীসের পরিপন্থি হওয়ার কারণে তাঁর মত অগ্রহণযোগ্য। হাদীসের মধ্যে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, একজন মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী নকল করতে হবে। অথচ ইমাম মালেক (র.) বলেন যে, একজনের সাক্ষ্য একজনই নকল করতে পারবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে যৌক্তিক দলিল হলো, সাক্ষ্য নকল করা মানুষের অন্যান্য অধিকারের মতো একটি অধিকার। অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সাক্ষ্যদানের নেসাব তথা দুজন পুরুষ / একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্যদান জরুরি। যেহেতু আলোচ্য মাসআলাটি হুককুল ইহসানের অন্তর্ভুক্ত তাই এর মধ্যে দু ব্যক্তির সাক্ষ্য থাকতে হবে।

وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ اَنْ يَقُوْلَ شَاهِدُ الْاَصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ اِشْهَدْ وَعَلٰى شَهَادَتِىْ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ اَقَرَّ عِنْدِىْ بِكَذَا وَاَشْهَدَنِىْ عَلٰى نَفْسِهٖ لِاَنَّ الْفَرْعَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَابُدَّ مِنَ التَّحْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ عَلٰى مَا مَرَّ وَلَابُدَّ اَنْ يَشْهَدَ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِىْ لِيَنْقُلَهُ اِلٰى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ اَشْهَدَنِىْ عَلٰى نَفْسِهٖ جَازَ لِاَنَّ مَنْ سَمِعَ اِقْرَارَ غَيْرِهٖ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ اِشْهَدْ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষী বানানোর পদ্ধতি হলো, মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীকে বলবে, তুমি আমার সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সাক্ষী থাক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুকের পুত্র আমার কাছে এ স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে যে, তার কাছে অমুকে এত টাকা পায় এবং সে তার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী রেখেছে। কেননা স্থলবর্তী সাক্ষী তার নায়েবের মতো। সুতরাং তার জন্য সাক্ষ্য ধারণ করা ও উকিল বানানো জরুরি। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মূল সাক্ষীর উচিত এমনভাবে সাক্ষ্য দেওয়া যেভাবে সে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যাতে করে স্থলবর্তী সাক্ষী তার সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়। আর যদি সে اَشْهَدَنِىْ عَلٰى نَفْسِهٖ [সে আমাকে তার নিজের ব্যাপারে সাক্ষী করেছে] না বলে তবুও কোনো সমস্যা নেই। কেননা সে অন্যকে স্বীকারোক্তি করতে শুনেছে তার জন্য স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ। যদিও সে اِشْهَدْ না বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصِفَةُ الْاِشْهَادِ اَنْ يَقُوْلَ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার নিয়ম ও ভাষাগত / শব্দগত কি বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রথমত মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীর সামনে তার সাক্ষ্য পেশ করবে। মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীকে বলবে, তুমি আমার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর স্থলবর্তী সাক্ষীর সামনে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুকের ছেলে অমুক আমার সামনে অমুকের ছেলে অমুকের জন্য দশহাজার টাকা প্রদান করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর স্বীকারোক্তি প্রদানকারী তার নিজ স্বীকারোক্তির ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী করেছে।

আলোচ্য ইবারত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মূল সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে স্থলবর্তী সাক্ষীকে প্রথমে সাক্ষী সাব্যস্ত করেছে। সাক্ষী সাব্যস্ত করার কারণ হলো, স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর নায়েবের মতো। আর নায়েব / স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য নায়েব বানানো জরুরি। মূল সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে স্থলবর্তী সাক্ষীকে সাক্ষী বানিয়ে এখানে নায়েব বানানো হয়েছে। অবশ্য পুরোপুরি নায়েব বানানো হয়নি। এজন্য মুসান্নিফ (র.) তার সম্পর্কে বলেছেন– كَالنَّائِبِ عَنْهُ অর্থাৎ 'সে নায়েবের মতো।' নায়েব তখনই হতো যদি মূল সাক্ষী তাকে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তার নায়েব সাব্যস্ত করত। অথচ মূল সাক্ষী এখানে مَشْهُوْد بِهٖ -এর ব্যাপারে তাকে নায়েব সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنَ التَّحْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া তখনই দলিল রূপে গণ্য হয় যখন স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে গিয়ে নকল করে অর্থাৎ মূল সাক্ষী যেভাবে সাক্ষ্য দিয়েছে হুবহু সে শব্দে তা বিচারকের মজলিসে গিয়ে অবিকল বলতে পারে। আর এজন্য মূল সাক্ষীকে স্থলবর্তী সাক্ষীর সামনে সে যেভাবে দেখেছে সেভাবে বলতে হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করবে। মোটকথা, এ বিষয় প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য تَحْمِيْل অর্থাৎ মূল সাক্ষী কর্তৃক স্থলবর্তী সাক্ষীকে اِشْهَدْ عَلٰى شَهَادَتِىْ বলে তার দায়িত্বে সাক্ষ্য অর্পণ করা এবং তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত স্থলবর্তী সাক্ষী যেহেতু মূল সাক্ষীর উকিল বা দায়িত্ব পালনকারী তাই মূল সাক্ষীর উচিত তার দায়িত্ব/ওকালত স্থলবর্তী সাক্ষীর স্কন্ধে তুলে দেওয়া। এ সম্পর্কে বিস্তারিত فَصْلُ مَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ اَشْهَدَنِىْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মূল সাক্ষী তার বক্তব্য স্থলবর্তী সাক্ষীর সামনে উপস্থাপন করার সময় এ কথা না বলে– اَشْهَدَنِىْ عَلٰى نَفْسِهٖ [আমাকে স্বীকারোক্তি দানকারী তার নিজের উপর সাক্ষী রেখেছে] তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের স্বীকারোক্তি শ্রবণ করেছে তার জন্য সেই ব্যক্তি স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। যদিও সে এ কথা না বলে যে, সে আমাকে সাক্ষী রেখেছে।

وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْأَدَاءِ اَشْهَدُ اَنَّ فُلَانًا اَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ اَنَّ فُلَانًا اَقَرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا اَوْ قَالَ لِيْ اِشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِيْ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِ وَذِكْرِهِ شَهَادَةَ الْاَصْلِ وَذِكْرِهِ التَّحْمِيلَ وَلَهَا لَفْظٌ اَطْوَلُ مِنْ هٰذَا وَاَقْصَرُ مِنْهُ وَخَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এভাবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী করেছে, অমুক ব্যক্তি তার সামনে এত টাকার দেনার স্বীকারোক্তি করেছে এবং সে আমাকে বলেছে, তুমি ঐ বিষয়ে আমার প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দাও। কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং সে কর্তৃক মূল সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা এবং তাকে সাক্ষ্য সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রদানের কথা উল্লেখ করা জরুরি। স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানে অধিকতর দীর্ঘ এবং খুবই সংক্ষিপ্ত [উভয়] ইবারত রয়েছে। তবে সব বিষয়ে মধ্যম পন্থাই উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ الخ : এ ইবারতে বিচারকের সামনে কিভাবে স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষী বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলবে– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক তথা মূল সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী বানিয়েছে যে, তার সামনে অমুক ব্যক্তি এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তার কাছে অমুকের ছেলে অমুক এত হাজার টাকা পায় অতঃপর সে আমাকে বলেছে, তুমি আমার প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দাও।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِ وَذِكْرِهِ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) এসে উল্লেখ করেন যে, স্থলবর্তী সাক্ষীর জন্যে কয়েকটি বিষয় তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করা দরকার–

১. তার সাক্ষ্য বা শাহাদাত শব্দের উল্লেখ করতে হবে।

২. মূল সাক্ষীর শাহাদাত উল্লেখ করতে হবে।

৩. মূল সাক্ষী যে তাকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার উল্লেখ করতে হবে। স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে। এ তিনটির কোনো একটি উল্লেখ না করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তার সাক্ষ্যের মধ্যে শাহাদাত শব্দের উল্লেখ তো এজন্য করতে হবে যে, শাহাদাত শব্দের উল্লেখ ব্যতীত কোনো ধরনের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

মূল সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে একই কারণে শাহাদাত শব্দের উল্লেখ করতে হবে। আর দায়িত্ব অর্পণ বা সাক্ষ্য বহন করানো যে জরুরি তা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর এর উল্লেখ এজন্য জরুরি যে, এর মাধ্যমে বিচারক অবগত হবেন যে, মূল সাক্ষী তাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উকিল বানিয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَهَا لَفْظٌ اَطْوَلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষী বিচারকের সামনে তার সাক্ষ্য পেশ করার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ বাক্য যেমন ব্যবহার করতে পারে তদ্রূপ খুবই সংক্ষিপ্ত বাক্যও ব্যবহার করতে পারে। দীর্ঘ বাক্যের উদাহরণ হলো, সাক্ষী বলল– اَشْهَدُ اَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدِيْ اَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا مِنَ الْمَالِ وَاَشْهَدَنِيْ عَلَى شَهَادَتِهِ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَاَنَا اَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذٰلِكَ الْاٰنَ .

আবার একেবারে সংক্ষিপ্ত বাক্যও বলতে পারে। যেমন– اَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ هٰكَذَا

মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষীর উচিত মধ্যম মানের বাক্য ব্যবহার করা। কারণ, خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

وَمَنْ قَالَ اَشْهَدَنِىْ فُلَانٌ عَلٰى نَفْسِهٖ لَمْ يَشْهَدِ السَّامِعُ عَلٰى شَهَادَتِهٖ حَتّٰى يَقُوْلَ اِشْهَدْ عَلٰى شَهَادَتِىْ لِاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنَ التَّحْمِيْلِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَهٗ بِشَهَادَةِ الْفُرُوْعِ وَالْاُصُوْلِ جَمِيْعًا حَتّٰى اِشْتَرَكُوْا فِى الضَّمَانِ عِنْدَ الرُّجُوْعِ وَكَذَا عِنْدَهُمَا لِاَنَّهٗ لَابُدَّ مِنْ نَقْلِ شَهَادَةِ الْاُصُوْلِ لِتَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظْهَرُ تَحْمِيْلُ مَا هُوَ حُجَّةٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তার নিজের উপর সাক্ষী রেখেছে, তাহলে এ বক্তব্যের কোনো শ্রোতার জন্য তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ হবে না। তবে যদি সে বলে, তুমি আমার প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দাও তাহলে তার জন্য সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ। কেননা সাক্ষ্য নকল করার জন্য সাক্ষ্য বহন করানো/ দায়িত্ব দেওয়া জরুরি। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী স্পষ্ট। কেননা তাঁর মতানুযায়ী বিচারকের রায় এ অবস্থাতে মূল সাক্ষী এবং স্থলবর্তী সাক্ষী সকলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এ কারণে সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেওয়া হলে যে জরিমানা আরোপ করা হয় তাতে সকলে অংশীদার হয়। তদ্রূপ শায়খাইনের মতানুযায়ীও। কেননা [তাঁদের মতানুযায়ী] মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য নকল করা জরুরি যাতে তাদের সাক্ষ্য দলিল সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যা দলিল হয় তা ধারণ করানো অপরিহার্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ قَالَ اَشْهَدَنِىْ فُلَانٌ الخ : উপরের ইবারতে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার তিনটি শর্তের তৃতীয় শর্ত তথা تَحْمِيْل সম্পর্কে শাখা-প্রশাখাগত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, شَهَادَةٌ عَلٰى شَهَادَةٍ -এর মধ্যে تَحْمِيْل তথা সাক্ষ্য নকল করার দায়িত্ব দেওয়া জরুরি। ইবারতের মাসআলার সুরত হলো, ফারুক নামের একজন সাক্ষী বলল যে, অমুক স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি আমাকে তার নিজের সাক্ষী বানিয়েছে। ফারুকের এ কথাটি জনৈক শাহেদ শুনল। এমতাবস্থায় শাহেদের জন্য ফারুকের সাক্ষ্য নকল করার অধিকার লাভ হবে না। কারণ ফারুক শাহেদকে তার সাক্ষ্য নকল করার দায়িত্ব দেয়নি।

অবশ্য যদি মূল সাক্ষী ফারুক তার শ্রোতা তথা শাহেদকে বলে যে, তুমি আমার সাক্ষ্যের সাক্ষী হয়ে যাও তাহলে শাহেদের জন্য তখন সে বক্তব্য নকল করার অধিকার লাভ হবে। এ মাসআলার দলিল হলো, আমরা যা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য تَحْمِيْل শর্ত। আর এখানে সে শর্তটি পাওয়া যায়নি। تَحْمِيْل -এর শর্তটি সকল ইমামের মতানুযায়ী প্রযোজ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এজন্য যে, স্থলবর্তী সাক্ষীর যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকে না; বরং সে তো মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে বহন করে নিয়ে যায়। অতঃপর বিচারক মূল সাক্ষীবর্গ ও স্থলবর্তী সাক্ষীবর্গ উভয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় প্রদান করেন। অর্থাৎ বিচারকের রায়ে উভয় সাক্ষীর সাক্ষ্যের অবদানে স্বীকৃত হয়। এজন্য সাক্ষীদের উভয়ে যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে উভয়ের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। অবশ্য উভয়ের উপর জরিমানা আরোপের অর্থ এই নয় যে, উভয়ের উপর অর্ধাধি জরিমানা আরোপ করা হবে; বরং এর

উদ্দেশ্য এই যে, যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে সে উভয়ের কাছে তার ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। এর উদাহরণ এরূপ যে, এক ব্যক্তি কারো থেকে কোনো বস্তু গসব করল। অতঃপর এ গাসেব থেকে আরেক ব্যক্তি ছিনতাইকৃত বস্তুটি গসব / ছিনতাই করে নিল। এখন মূল মালিকের এখতিয়ার থাকবে– সে ইচ্ছা করলে প্রথম গাসেব থেকে তার ছিনতাইকৃত মাল ফেরত চাইতে পারে, আবার সে দ্বিতীয় গাসেব থেকেও তার মাল ফেরত নিতে পারে। মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দ্বিতীয়/ স্থলবর্তী সাক্ষী প্রথম/ মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে উকিল সাব্যস্ত হয়ে তার সাক্ষ্য স্থানান্তর করে। আর কাউকে তখনই উকিল সাব্যস্ত করা যায় যখন মুআক্কিল তাকে ওকালত দান করে। সুতরাং স্থলবর্তী সাক্ষী তখনই উকিল হবে যখন মূল সাক্ষী তাকে তার সাক্ষ্য নকল করার আদেশ করবে। আর সাক্ষ্য নকলের আদেশই হলো تَحْمِيْل। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষ্য বহন করা (تَحْمِيْل شَهَادَةٌ) একটি অপরিহার্য বিষয়।

আর শায়খাইনের মতে এটা এজন্য জরুরি যে, তাঁদের মতে স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে উকিল হয় না। এজন্য যদি মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীকে প্রথমে বলে যে, তুমি আমার সাক্ষ্য বিচারকের কাছে পেশ কর, তারপর আবার তাকে সাক্ষ্য পেশ করতে নিষেধ করে তাহলেও স্থলবর্তী সাক্ষীর জন্য তার সাক্ষ্য নকল করার অধিকার রহিত হবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে উকিল সাব্যস্ত হয় না। কেননা যদি উকিল সাব্যস্ত হতো তাহলে স্থলবর্তী সাক্ষীর অধিকার রহিত হতো। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করার অধিকার থাকে না। মোটকথা, যদিও শায়খাইনের মতে স্থলবর্তী সাক্ষী মূল সাক্ষীর উকিল হয় না; কিন্তু মূল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দলিল হতে হলে অবশ্যই স্থলবর্তী সাক্ষী কর্তৃক তা বিচারকের মজলিস পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কেননা সাক্ষ্য এমনিতে দলিল বলে গণ্য হয় না। দলিল তখনই হয় যখন তা বিচারকের মজলিসে পেশ করা হয়। মোটকথা, এটা বুঝা গেল যে, স্থলবর্তী সাক্ষীর উপর মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে পৌছানো জরুরি। আর তা পৌছানোর জন্য মূল সাক্ষী কর্তৃক تَحْمِيْل পাওয়া যাওয়া জরুরি। অর্থাৎ মূল সাক্ষী স্থলবর্তী সাক্ষীকে তার সাক্ষ্য পৌছানোর জন্য এ দায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পণ করতে হবে। এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শায়খাইনের মতানুযায়ীও সাক্ষ্য পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা [তথা تَحْمِيْل] জরুরি।

قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفُرُوْعِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ أَوْ يَغِيْبُوْا مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أَوْ يَمْرَضُوْا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ مَعَهُ حُضُوْرَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ جَوَازَهَا لِلْحَاجَةِ وَإِنَّمَا تَمَسُّ عِنْدَ عَجْزِ الْأَصْلِ وَبِهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا السَّفَرَ لِأَنَّ الْمُعْجِزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيْدَةٌ حُكْمًا حَتّٰى أُدِيْرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الْأَحْكَامِ فَكَذَا سَبِيْلُ هٰذَا الْحُكْمِ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَكَانٍ لَوْ غَدَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبِيْتَ فِيْ أَهْلِهِ صَحَّ الْإِشْهَادُ إِحْيَاءً لِحُقُوْقِ النَّاسِ قَالُوْا الْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَالثَّانِيْ أَوْفَقُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيْهُ أَبُو اللَّيْثِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না তবে যদি মূল সাক্ষীগণ মারা যায় অথবা তারা তিন দিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করে কিংবা তারা এমন রোগাক্রান্ত হয় যার কারণে বিচারকের মজলিসে হাজির হতে অক্ষম হয়। কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য বৈধ হয় [মূল সাক্ষীদের বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হতে] অপারগতার কারণে এবং স্থলবর্তী সাক্ষীর প্রয়োজন দেখা দেয় মূল সাক্ষীগণের অক্ষমতা প্রমাণ হলে। আর বিষয়গুলো দ্বারা অক্ষমতা প্রমাণ হয়। আমরা সফরকে ধর্তব্য করেছি। কেননা মূল অক্ষমকারী হলো স্থানের দূরত্ব। আর সফরের মেয়াদ [তিনদিন] হলো বিধানগতভাবে দূরবর্তী বলে গণ্য। এজন্যই এর উপর বিভিন্ন আহকাম আবর্তিত হয়। সুতরাং এ মাসআলারও একই হুকুম হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মূল সাক্ষী এমন স্থানে অবস্থান করে যে, সেখান থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সকালে রওয়ানা করলে রাত পর্যন্ত এসে ঘরে রাত কাটাতে পারবে না তাহলে মানুষের হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তার জন্য অন্যকে সাক্ষী বানানো জায়েজ। মাশায়েখে কেরাম বলেন, প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর উত্তম। আর দ্বিতীয় মতটি অধিকতর সহজ। ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী (র.) এটাকেই গ্রহণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূল সাক্ষীর পরিবর্তে স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য তিন অবস্থাতে গ্রহণযোগ্য হয়– ১. যদি মূল সাক্ষী মারা যান। ২. তিনদিনে অতিক্রম্য দূরত্বে অবস্থান করেন। অর্থাৎ শরয়ী মুসাফিরের দূরত্বে অবস্থান করেন। ৩. মূল সাক্ষী এমন কঠিন রোগাক্রান্ত হোন যে, এর কারণে বিচারকের মজলিসে হাজির হতে তিনি অক্ষম। এ তিন অবস্থায় মূল সাক্ষীর পরিবর্তে স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অতঃপর মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত মাসআলার দলিল দিচ্ছেন এই বলে যে, স্থলবর্তিতাকে জায়েজ করা হয়েছে প্রয়োজনের জন্য। প্রয়োজন হলো মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। এ প্রয়োজন তখনই দেখা দেবে যখন মূল সাক্ষীর পক্ষে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হবে। বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হওয়া উল্লিখিত বিষয়গুলোর কারণে অসম্ভব হয়।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اِعْتَبَرْنَا السَّفَرَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় অবস্থা তথা সফরের দূরত্বে অবস্থান করলে স্থলবর্তিতা জায়েজ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্থানগত দূরত্বের ক্ষেত্রে আমরা সফরের মেয়াদকে আমলে নিয়েছি– কারণ সফরের ক্ষেত্রে মূল অক্ষমকারী হলো স্থানের দূরত্ব, মেয়াদ নয়। তবে মেয়াদ বিধিগতভাবে দূরবর্তী বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা স্থানের দূরত্বের কারণে সফরের মেয়াদ তথা তিনদিন অনেক বিধিবিধানের ভিত্তি। সুতরাং যদি কেউ সফরের মেয়াদের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করে তাহলে তার জন্য নামাজ কসর করা জায়েজ হয় এবং রমজান মাসে ইফতার করা অর্থাৎ রোজা ভাঙ্গা জায়েজ হয়ে যায়। এমনিভাবে মোজার উপর মাসাহ করার মেয়াদ একদিন একরাত থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিনদিন তিনরাত হয়ে যায়। তদ্রূপ কুরবানি করা ও জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত বিধান রহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে মহিলার জন্য মাহরাম/ স্বামী ব্যতীত সফরে বের হওয়া হারাম করে দেয়।

সফরের মেয়াদ তথা তিনদিনের স্থানের দূরত্বের কারণে যেরূপভাবে উপরোল্লিখিত মাসআলাগুলো আরোপিত হয় তদ্রূপ সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদানও জায়েজ হয়।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মূল সাক্ষী এমন স্থানে অবস্থান করে যেখান থেকে সকালে রওয়ানা করলে রাতে এসে নিজ বাড়িতে থাকা সম্ভব হয় না, এতটুকু দূরত্ব হলেই মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ হয়ে যায়। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি দুটি–

১. তিনদিনের শর্তারোপের মধ্যে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যে, তিনদিনের কম দূরত্বের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া নাজায়েজ সাব্যস্ত হয়। অথচ অনেক সময় এর চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থানরত মূল সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে আসতে অপারগতা জানায়। একদিনের দূরত্বের শর্ত দ্বারা উক্ত সমস্যা দূরীভূত হয়।

২. মানুষের হকসমূহ সহজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়।

قَوْلُهُ قَالُوْا الْاَوَّلُ اَحْسَنُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাশায়েখে কেরাম তারফাইন (র.)-এর মতকে অধিক উত্তম বলেছেন। কেননা তাঁদের মতে শরিয়তের দলিল রয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সফরের মেয়াদ/ দূরত্ব এমন যার দ্বারা শরিয়তের অনেক মাসআলায় সহজ বিধান চলে এসেছে। সুতরাং সফরের দূরত্বে অবস্থান করলে মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়াও জায়েজ হবে।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব মানুষের হকসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ। যাখীরাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটিকে অনেক ফকীহ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফকীহ আবুল লাইছ সামারকন্দী (র.)।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া সর্বাবস্থায় জায়েজ। এমনকি তাঁর মত এমনও পাওয়া যায় যে, যদি মসজিদের এক কোণে মূল সাক্ষী অবস্থান করে, আর অপর কোণে বসে তাঁর সাক্ষ্য সম্পর্কে স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তাহলেও তা জায়েজ।

ইমাম সারাখসী (র.) বলেন, সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী জায়েজ হওয়াই উচিত। কেননা তাঁদের মতে تَوْكِيْلٌ بِالْخُصُوْمَةِ প্রতিপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জায়েজ। তবে ইমাম আযমের মতানুযায়ী তা জায়েজ নয়।

قَالَ : فَإِنْ عَدَّلَ شُهُوْدَ الْأَصْلِ شُهُوْدُ الْفَرْعِ جَازَ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةً لَهُ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِ لٰكِنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَّهَمُ بِمِثْلِهِ كَمَا لَا يُتَّهَمُ فِيْ شَهَادَةِ نَفْسِهِ كَيْفَ وَأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُوْلٌ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَةُ صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মূল সাক্ষীগণকে স্থলবর্তী সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ বলে সাব্যস্ত করেন তাহলে তা জায়েজ। কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ন করার যোগ্য। তদ্রূপ যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, আর তাদের একজন অপরজনকে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করে তাহলেও তা সহীহ আমাদের বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে। বেশির চেয়ে বেশি এই যে, এতে তার উপকারিতা রয়েছে। এভাবে যে, তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় প্রদান করা হয়। তবে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে এ জাতীয় [ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করার] বিষয় দ্বারা অভিযুক্ত করা যায় না। সেরূপভাবে তার নিজ সাক্ষ্যের ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করা যায় না। আর কিভাবে তাকে অভিযুক্ত করা সম্ভব? অথচ তার বক্তব্য এমনিতেই নিজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। আর যদি তার সাথির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয় তবুও কোনো অভিযোগ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ عَدَّلَ شُهُوْدَ الخ : ইবারতের شُهُوْدَ الْأَصْلِ হলো যবরবিশিষ্ট, মাফউলের ভিত্তিতে, আর عَدَّلَ-এর ফায়েল হলো شُهُوْدُ الْفَرْعِ -

ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, যদি দুজন স্থলবর্তী সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় আর বিচারক তাদের প্রত্যেক সম্পর্কে জানতে পারে যে, তারা ন্যায়পরায়ণ এবং তারা যাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে অর্থাৎ মূল সাক্ষীদ্বয় তারাও ন্যায়পরায়ণ তাহলে বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করবেন।

আর যদি বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন বটে; কিন্তু মূল সাক্ষীদের সম্পর্কে প্রথমে অবগত না হন তাহলে স্থলবর্তী সাক্ষীদের কাছে মূল সাক্ষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অতঃপর তারা যদি মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করে তাহলে তাদের সত্যায়ন জায়েজ হবে এবং বিচারক তাদের ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়নের ভিত্তিতে রায় প্রদান করবেন। কেননা দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষীগণ সত্যায়ন করার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন।

আশরাফুল হিদায়ার ভাষ্যকার মাসআলাটির স্বরূপ উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে মাসআলার চারটি সুরত বের করেছেন–

১. বিচারক মূল সাক্ষী ও স্থলবর্তী সাক্ষী উভয় দলের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হবেন।

২. বিচারক কোনো দলের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবগত নন।

৩. বিচারক মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবগত আছেন; কিন্তু স্থলবর্তীদের সম্পর্কে অবগত নন।

৪. স্থলবর্তীদের সম্পর্কে অবগত আছেন; কিন্তু মূল সাক্ষীদের সম্পর্কে জানেন না। এ চার সুরতের প্রথম সুরতে বিচারক তাদের সম্পর্কে কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়া রায় প্রদান করবেন। দ্বিতীয় সুরতে উভয় দলের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তৃতীয়

সুরতে স্থলবর্তীদের ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করবেন। চতুর্থ সুরতে মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে স্থলবর্তী সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ সুরতে যদি স্থলবর্তীগণ মূল সাক্ষী সম্পর্কে ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ন করেন তাহলে তাদের এ সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে এবং মূল সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত হবেন। এ মাসআলার ব্যাপারে চার ইমামের ঐকমত্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো বিষয়ে দুজন সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করে তাহলে তাদের এ সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে এবং পরস্পরের সত্যায়নের দ্বারা উভয়ে ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত হবে। এটা আগের মাসআলার অনুরূপ। মাসআলার দলিলও পূর্বের মাসআলার দলিলের অনুরূপ।

প্রশ্ন : এখানে অবশ্য একটি আপত্তি আসতে পারে যে, আলোচ্য দু সাক্ষীর একজনের অন্যজনকে ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করার মধ্যে তার নিজের লাভ হয়। কেননা তার সঙ্গী সাক্ষীকে সত্যায়ন করার দ্বারা তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। যদি সে তার সঙ্গীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি সত্যায়ন না করে তাহলে তার দু সাক্ষ্যের একটি বাতিল হয়ে যায়। আর এক সাক্ষ্য দ্বারা যেহেতু কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না তাই এটাও অনর্থক বলে গণ্য হয়। মোটকথা, যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করছে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ এর দ্বারা হাসিল হচ্ছে, তাই এ সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, দু সাক্ষীর একজন যে সত্যায়ন করছে তার ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি বিচারক জানেন। বিচারক অপরজনের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি জানেন না। আর যে ব্যক্তিকে বিচারক ন্যায়পরায়ণ বলে জানেন সে ব্যক্তি এ জাতীয় অভিযোগের দ্বারা অভিযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষী অভিযুক্ত হবে না। তাছাড়া তার সত্যায়ন করার ফলে যে অভিযোগ তার বিপক্ষে তোলা হয়েছে সে অভিযোগ তো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার দ্বারা উঠতে পারে। অথচ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তো এরূপ অভিযোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এরূপ অভিযোগের ব্যাখ্যা হলো, লোকেরা এ কথা বলতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি এ কারণে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চায় এটা যেন সকলে জানতে পারে যে, বিচারক তার কথা / সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেন এবং তার সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারের রায় প্রদান করেন। অথচ এ মাসআলায় তার সাক্ষ্য কোনো অবধারিত কিছু ছিল না।

মোটকথা, এরূপ একটি ফায়দা হওয়ার বা সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় এবং সে অভিযুক্ত হয় না। তদ্রূপ তার সত্যায়ন করার ফলে তার সুনাম হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ كَيْفَ وَاَنَّ قَوْلَهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আপত্তি উত্থাপনকারীদের جَوَابِ اِنْكَارِيْ প্রদান করছেন। তিনি বলেন, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী কর্তৃক অন্য সাক্ষীকে সত্যায়ন করার দ্বারা তার বিরুদ্ধে কিভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা [আমার] বোধগম্য নয়। কারণ, এ ব্যক্তির সত্যায়ন করার কারণে আদতে কোনো লাভ তো হয় না, যা সত্যায়ন না করলে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেননা তার সাক্ষ্যতো এমনিতেই গ্রহণযোগ্য। যদি তার সঙ্গীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয় তাহলে তো নেসাবে শাহাদাত তথা দুজনের সাক্ষ্য না পাওয়ার কারণে রায় প্রদান করা যাবে না। কিন্তু তার একজনের সাক্ষ্য তো অগ্রাহ্য হয় না; বরং এরূপ সম্ভাবনা তখন থাকবে যে, তার সঙ্গীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার পর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের জন্যে এগিয়ে আসবে এবং বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আর তখন নেসাবে শাহাদাত পাওয়া যাওয়াতে বিচারকের রায় প্রদানে কোনো বাধা থাকবে না।

সারকথা হলো, সত্যায়ন না করার কারণে সত্যায়নকারীর কোনো সুবিধা বাদ পড়েনি। সুতরাং ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সত্যায়ন করার কারণে তার সুবিধা লাভ হয়নি। যেহেতু সত্যায়ন করার দ্বারা তার কোনো উপকার হয়নি তাই তার সত্যায়ন করার কারণে অভিযুক্ত হওয়ার আপত্তিটি সঠিক নয়। যেহেতু তাকে সত্যায়ন করার কারণে অভিযুক্ত করা যায় না তাই তার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে।

قَالَ : وَاِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِيْلِهِمْ جَازَ وَيَنْظُرُ الْقَاضِىْ فِىْ حَالِهِمْ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا تُقْبَلُ لِاَنَّهُ لَا شَهَادَةَ اِلَّا بِالْعَدَالَةِ فَاِنْ لَمْ يَعْرِفُوْهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا تُقْبَلُ وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمَاخُوْذَ عَلَيْهِمُ النَّقْلُ دُوْنَ التَّعْدِيْلِ لِاَنَّهُ قَدْ يَخْفٰى عَلَيْهِمْ وَاِذَا نَقَلُوْا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِى الْعَدَالَةَ كَمَا اِذَا حَضَرُوْا بِاَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوْا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি স্থলবর্তী সাক্ষীগণ মূল সাক্ষীদের সত্যায়ন না করে চুপ থাকেন তাহলেও তাদের সাক্ষ্য জায়েজ। বিচারক তাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য [এ অবস্থায়] গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদি স্থলবর্তীগণ মূল সাক্ষীদের সম্পর্কে না জানে তাহলে তাদের সাক্ষ্য নকল করবে না। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তীদের জন্য সাক্ষ্য স্থানান্তর করা ওয়াজিব, ন্যায়পরায়ণতার সত্যায়ন করা তাদের কর্তব্য নয়। কেননা অনেক সময় স্থলবর্তীদের কাছে মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা গোপন থাকে। সুতরাং যখন তারা সাক্ষ্য নকল করে পেশ করবে বিচারক তাদের ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করবেন। যেমন তিনি যাচাই করেন মূল সাক্ষীগণ সশরীরে হাজির হওয়ার অবস্থাতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِيْلِهِمْ الخ : ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিতে আসার পর মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে, মূল সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ কিনা? উত্তরে স্থলবর্তী সাক্ষীগণ নীরব রইলেন অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে ভালোমন্দ কিছুই বললেন না। অথবা বললেন যে, আমরা তাদের চিনি না। এমতাবস্থায় মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী এ অবস্থায় স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তখন বিচারক নিজ দায়িত্বে মূল সাক্ষীদের অবস্থা অনুসন্ধান করে নেবেন। অর্থাৎ তিনি মূল সাক্ষীদের চিনে এমন লোকদেরকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি স্থলবর্তী সাক্ষী ব্যতীত নীতিবান অন্য লোকেরা তাদের ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন করে তাহলে বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারের রায় প্রদান করবেন। যদি অন্য নীতিবান লোকেরা তাদের ন্যায়পরায়ণ বলে সত্যায়ন না করে তাহলে বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করা হতে বিরত থাকবেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো, স্থলবর্তী সাক্ষীগণ মূল সাক্ষীদের সত্যায়ন না করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য এজন্যই গ্রহণ করা হয় যে, তারা মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্থানান্তর করছে। আর মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য তারা ন্যায়পরায়ণ না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং বলা যায় যে, ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত

কোনো সাক্ষ্য শাহাদাত বলে বিবেচিত হয় না। যেহেতু আলোচ্য সুরতে স্থলবর্তী সাক্ষীদের মূল সাক্ষীগণের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তাই মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তাদের সাক্ষ্য সাক্ষ্য বলেই বিবেচিত হবে না। যেহেতু মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণিত হলো না সেহেতু স্থলবর্তী সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্য স্থানান্তর করার বিষয়টি পাওয়া গেল না। সুতরাং এখানে স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمَاخُوْذَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তী সাক্ষীদের দায়িত্ব হলো কেবল মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্থানান্তর করা। মূল সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ কিনা এটা সত্যায়ন করা তাদের দায়িত্ব নয়। কেননা অনেক সময় মূল সাক্ষীদের অবস্থা স্থলবর্তী সাক্ষীদের কাছে গোপন থাকে। সাধারণভাবে তাদের অবস্থা যাচাইয়ের কোনো সুযোগ থাকে না। যখন স্থলবর্তী সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য মূল সাক্ষীদের পক্ষ থেকে বিচারকের সামনে পেশ করে দিল তখন তারা দায়িত্বমুক্ত হলো। এখন বিচারকের দায়িত্ব হলো মূল সাক্ষীদের অবস্থা যাচাই করত রায় প্রদান করা। বিচারক তাদের কাছ থেকে মূল সাক্ষীদের অবস্থা জেনে নেবেন। আর যদি তাদের কাছে জানা সম্ভব না হয় তাহলে অন্য নীতিবান লোকদের থেকে তাদের অবস্থা জেনে নেবেন। যেমন স্বয়ং মূল সাক্ষীগণ উপস্থিত হলে বিচারকগণ তাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। তখন যেভাবে বিচারক তাদের ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করেন আলোচ্য মাসআলায়ও একইভাবে তাদের সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন।

তবে আলোচ্য মাসআলায় পার্থক্য এতটুকু যে, যদি স্থলবর্তী সাক্ষীদের থেকে মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় এবং তারাও ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তাদের থেকে জেনে নেওয়াটা সহজ বলে তাদের থেকেই জেনে নেবেন।

জ্ঞাতব্য : শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) উল্লেখ করেন যে, যদি বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের কাছে মূল সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানতে চান, আর এর উত্তরে স্থলবর্তীগণ বলেন যে, তার ব্যাপারে আমরা আপনাকে কিছু বলব না তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

এটা জাহেরী রেওয়ায়েতের মাসআলা। কেননা তাদের এ উত্তর মূল সাক্ষীদের উপর আপত্তিকর। যেমন যদি তারা বলে যে, আমরা তাদের অভিযুক্ত করি। অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটা মূল সাক্ষীদের ব্যাপারে আপত্তিকর বিবেচিত হবে না; বরং এটাই তাদের যথার্থ মন্তব্য বিবেচিত হবে। সুতরাং সন্দেহ থাকাবস্থায় তাদের বক্তব্য মূল সাক্ষীদের ব্যাপারে আপত্তিজনক হবে না।

قَالَ : وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَرْعِ لِأَنَّ التَّحْمِيْلَ لَمْ يَثْبُتْ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি মূল সাক্ষীগণ সাক্ষ্যদানের বিষয় অস্বীকার করে তাহলে স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সাক্ষ্য বহন করানো পাওয়া যায়নি দুটি সংবাদের বৈপরীত্যের কারণে। অথচ সাক্ষ্য বহন করানো স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মূল সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করে। যেমন সাক্ষীরা বলল, এ মামলায় আমাদের কোনো সাক্ষ্য নেই। অতঃপর স্থলবর্তী সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য নকল করে বিচারকের সামনে পেশ করে তাহলে তাদের এ সাক্ষ্য বিচারক গ্রহণ করবেন না। কেননা মূল সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্যকে অস্বীকার করা মূলত তাদের যেন এ বক্তব্য দেওয়া যে, আমরা আমাদের সাক্ষ্য স্থানান্তর করতে কাউকে দায়িত্ব দেইনি। অথচ স্থলবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মূল সাক্ষী কর্তৃক সাক্ষ্য বহন করানো / দায়িত্ব প্রদান করা শর্ত। সুতরাং যেহেতু সাক্ষ্য গ্রহণের শর্ত পাওয়া যায়নি তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ দলিলটি মুসান্নিফ (র.) তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন যে, যখন মূল সাক্ষীরা বলল, আমরা এ ঘটনার সাক্ষী নই। আর যেহেতু আমরা নিজেরাই সাক্ষী নই তাহলে অন্যকে সাক্ষী বানানোর প্রশ্নই তো আসে না। যেন মূল সাক্ষীরা স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানানোর বিষয়টি অস্বীকার করছে। অন্যদিকে স্থলবর্তী সাক্ষীরা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে যেন এ দাবি করছে যে, মূল সাক্ষীরা আমাদের সাক্ষী বানিয়েছে। এ দুটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্টত বিরোধ রয়েছে। যেহেতু تَحْمِيْل নিয়েই বিরোধ, এমতাবস্থায় تَحْمِيْل প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অথচ স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য تَحْمِيْل পাওয়া যাওয়া একান্তভাবে জরুরি। কেননা ইতঃপূর্বে স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য تَحْمِيْل -কে শর্ত বলা হয়েছে। যেহেতু শর্ত পাওয়া যায়নি তাই شُرُوْط [শর্তযুক্ত বিষয়টি] অবধারিতভাবে পাওয়া যাবে না।

وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَا أَخْبَرَانَا أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِهَا فَجَاءَ بِامْرَأَةٍ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهِيَ هٰذِهٖ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمُدَّعِيْ هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَالْمُدَّعِيْ يَدَّعِي الْحَقَّ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَابُدَّ مِنْ تَعْرِيْفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَنَظِيْرُ هٰذَا إِذَا تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ بِبَيْعِ مَحْدُوْدَةٍ يُذْكَرُ حُدُوْدُهَا وَشَهِدُوْا عَلَى الْمُشْتَرِيْ لَابُدَّ مِنْ أُخْرَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُوْدَ بِهَا فِيْ يَدِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ أَنَّ الْحُدُوْدَ الْمَذْكُوْرَةَ فِي الشَّهَادَةِ حُدُوْدُ مَا فِيْ يَدَيْهِ ـ

অনুবাদ : যদি দু ব্যক্তি দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে– অমুক বংশের অমুকের মেয়ে অমুকের কাছে অমুকে একহাজার টাকা পায় এবং তারা [স্থলবর্তী সাক্ষীগণ] বলে যে, মূল সাক্ষীগণ আমাদের এ সংবাদও দিয়েছে তারা সে মহিলাকে চিনে। অতঃপর বাদী একজন মহিলা নিয়ে আসল; কিন্তু স্থলবর্তী সাক্ষীরা বলল, আমরা জানি না এ মহিলা সে মহিলা কিনা? অতঃপর বাদীকে বলা হবে তুমি দুজন সাক্ষী নিয়ে এসো যারা সাক্ষ্য দেবে যে, এ সে মহিলা। কেননা মহিলার বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য তো সম্পূর্ণ হয়েছে। আর বাদী উপস্থিত মহিলার কাছে তার হক দাবি করছে। হতে পারে সে অন্য মহিলা। সুতরাং তার ঐ বংশের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এ মাসআলার নজির হলো, কিছু সাক্ষী একটি সীমাবদ্ধ বস্তু খরিদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করল যার চতুর্সীমা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা ক্রেতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল। এমতাবস্থায় আরো দুজন সাক্ষী দরকার যারা সাক্ষ্য দেবে যে, সীমা নির্ধারিত জমিটি বিবাদীর হাতে রয়েছে। তদ্রূপ যদি বিবাদী সাক্ষ্যে উল্লিখিত সীমানা অস্বীকার করে তার দখলে থাকা জমির সীমানার বিপরীতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ الخ : ইবারতের প্রথম মাসআলার স্বরূপ হলো, স্থলবর্তী সাক্ষীগণ মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক বংশের অমুকের মেয়ে অমুক উদাহণস্বরূপ বলল, কুরাইশ বংশের রাশেদের মেয়ে ফাতেমার কাছে অমুক ব্যক্তি একহাজার টাকা পায়। স্থলবর্তী সাক্ষীরা এও বলল, মূল সাক্ষীরা আমাদের জানিয়েছে যে, তারা সে মহিলাটিকে চিনে। অতঃপর সাক্ষ্যে উল্লিখিত বাদী একজন মহিলাকে বিচারকের মজলিসে নিয়ে এসে বলল, এ মহিলাই ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী। স্থলবর্তী সাক্ষীরা বলল, আমাদের জানা নেই ইনি ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী কিনা ? তখন বিচারক বাদীকে বলবেন, ইনি যে ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী তা প্রমাণ করার জন্য দুজন সাক্ষী আনুন, যারা তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। যদি বাদী এরূপ দুজন সাক্ষী আনতে পারে তাহলে বিচারক বাদীর পক্ষে উক্ত মহিলার উপর একহাজার টাকা দেনার রায় প্রদান করবেন। কেননা একহাজার দেনার ব্যাপারে এমন এক মহিলার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান পেশ করা হয়েছে যিনি তার বংশের সাহায্যে আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। ইতঃপূর্বে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে, ফাতেমা

বিনতে রাশেদ আল কুরাইশীর কাছে একহাজার টাকা পাওনা আছে; কিন্তু বাদী যে মহিলাকে ধরে এনেছেন এবং দাবি করছেন যে, তিনি এ মহিলার কাছে একহাজার টাকা পান। এখন এ মহিলা ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী কিনা তা জানা নেই। হতে পারে এ মহিলাই ফাতেমা, আবার সে ফাতেমা নাও হতে পারে; বরং সে যে অন্য মহিলা যাকে বাদী অনর্থক হয়রানির উদ্দেশ্যে ধরে এনেছে। এ পরিস্থিতিতে জরুরি হয়ে পড়েছে এ মহিলা ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী কিনা তা প্রমাণ করা। এ প্রমাণের জন্য আবারো দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন যারা বলবে যে, এ মহিলাই ফাতেমা। যদি এরূপ দুজন সাক্ষী পাওয়া যায় তাহলে বিচারক পাওনা সংক্রান্ত সাক্ষীদ্বয় এবং হাজির করা মহিলার পরিচয় দানকারী সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্যের ভিত্তিতে এ মহিলার উপর একহাজার টাকা প্রদানের রায় দেবেন।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُ هٰذَا إِذَا تَحَمَّلُوْا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) মতনে উল্লিখিত মাসআলার একটি নজির বা অনুরূপ মাসআলা পেশ করছেন। মাসআলাটি হলো, খালেদ নামে এক ব্যক্তি আব্দুল করীমের কাছে চৌহদ্দি নির্ধারণ করা হয়েছে এমন একটি জমি বিক্রি করেছে। ক্রেতা আব্দুল করীম জমিটি বিক্রেতার হাত থেকে নিজ দখলেও নিয়ে এসেছে। অতঃপর রাশেদ নামের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনার হাতে যে জমিটি আছে সেটার মধ্যে আমি শুফ'আর অধিকার দাবি করছি। সুতরাং আপনি আমাকে জমি ফেরত দেন। কিন্তু তখন আব্দুল করীম অস্বীকার করে বসল। সে বলল, আপনি যে চৌহদ্দির জমির কথা বলছেন, আমার কাছে এমন কোনো জমি নেই। যেহেতু আব্দুল করীম অস্বীকার করছে তার শুফআর দাবিদার ব্যক্তি দুজন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিল যে, আব্দুল করীম অমুক শহর/গ্রামে খালেদ থেকে এরূপ চৌহদ্দির একটি জমি খরিদ করেছে। তবে সাক্ষীরা বলল যে, আমরা জমিটি সুনির্দিষ্টভাবে চিনি না। এমতাবস্থায় শুফ'আর দাবিদার ব্যক্তিকে বলা হবে– আপনি দুজন সাক্ষী আনুন যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আপনার দাবি ও সাক্ষীগণের সাক্ষ্যে যে চৌহদ্দিসহ জমিনের বর্ণনা আছে সে জমিটি বর্তমানে আব্দুল করীমের দখলে আছে। কেননা, এরূপ সাক্ষ্য না দিলে বিচারক বাদীর পক্ষে জমিটির রায় প্রদান করতে পারবেন না।

সুতরাং এ মাসআলার মধ্যে যেরূপ দুজন অতিরিক্ত সাক্ষী এজন্য দরকার যে, তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, ক্রেতার দখলে যে জমিটিই আছে সে জমির কথা বাদীর দাবি ও ক্রয়ের সাক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখ আছে। তদ্রূপ আমাদের মূল ইবারতে [মতনে] উল্লিখিত মাসআলায়ও দুজন অতিরিক্ত সাক্ষ্য দরকার যারা এ সাক্ষ্য দেবে যে, বাদী সেই মহিলাকেই ধরে এনেছে যে মহিলার বংশের কথা বাদীর দাবিতে এবং স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখ আছে।

মতনের মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি দাবি করল অমুক ব্যক্তির দখলে এ চৌহদ্দির সাথে যে জমি আছে সেটা আমার। অতঃপর তার দাবির স্বপক্ষে দুজন সাক্ষীও হাজির করল। সাক্ষীরা বাদীর দাবির মধ্যে যে চৌহদ্দির কথা উল্লেখ আছে সে অনুযায়ী সাক্ষ্য দিল যে, এরূপ চৌহদ্দির সাথে অমুকের দখলে যে জমি আছে তা বাদীর মালিকানাধীন; কিন্তু বিবাদী সে জমি অন্যায়ভাবে দখল করে আছে।

এমতাবস্থায় বিবাদীকে বিচারক ডাকালে বিবাদী বলল যে, আমার দখলে যে জমি আছে সে জমির চৌহদ্দি এরূপ নয় যা বাদী দাবি করছে এবং তার সাক্ষীরা সাক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখ করেছে; বরং আমার জমির চৌহদ্দি তাদের বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। মোটকথা, সাক্ষ্যের মধ্যে সে চৌহদ্দি বা সীমানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিবাদী সেটাকে অস্বীকার করে বলল, এরূপ চৌহদ্দির কোনো জমি আমার দখলে নেই। যেহেতু বিবাদী অস্বীকার করছে তাই বাদীকে বলা হবে– ভাই! আপনি দুজন সাক্ষী পেশ করুন, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, বিবাদীর কাছে প্রথম সাক্ষ্যের মধ্যে যে সীমানার/ চৌহদ্দির জমির উল্লেখ করা হয়েছে সে চৌহদ্দির জমি আছে। যাহোক এ মাসআলায়ও দ্বিতীয়বার দুজন সাক্ষী তলব করা হয়েছে প্রথম সাক্ষ্যের বক্তব্য প্রমাণের জন্য। সুতরাং এ মাসআলাটিও মতনের মাসআলার অনুরূপ হলো।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ لِاَنَّهٗ فِىْ مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ اِلَّا اَنَّ الْقَاضِىَ لِكَمَالِ دِيَانَتِهٖ وَوُفُوْرِ وِلَايَتِهٖ يَتَفَرَّدُ بِالنَّقْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [এ মর্মে লিখিত] এক বিচারকের পক্ষ থেকে অন্য বিচারকের নিকট পত্রের একই হুকুম। কেননা এরূপ পত্র সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো। তবে বিচারক তার পূর্ণমাত্রার দীনদারি ও পর্যাপ্ত ওলায়াতের কারণে মূল সাক্ষ্যের সাক্ষ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একাই যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَكَذٰلِكَ كِتَابُ الْقَاضِىْ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করে আরেক মাসআলার আলোচনা শুরু করছেন। মাসআলাটি অবশ্য আগের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। মাসআলাটি হলো, এক শহরের বিচারক অন্য শহরের বিচারকের নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, আমার সামনে দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, অমুকের ছেলে অমুক বাদী ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশীর কাছে একহাজার টাকা বর্তমানে পরিশোধযোগ্য পাওনা আছে। সুতরাং বিবাদীর ব্যাপারে এ বিষয়ে রায় প্রদান করে তা কার্যকর করুন! অতঃপর যখন প্রাপকের কাছে এ প্রেরিত পত্র হস্তগত হলো তখন বাদী একজন মহিলা উক্ত বিচারকের এজলাসে হাজির করিয়ে বলল, এ মহিলাই ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী। আমি এ মহিলার কাছে একহাজার টাকা পাই। এখনই এ টাকা আমাকে তার পরিশোধ করার কথা। কিন্তু মহিলাটি বলল, আমি ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী নই। আমার নাম ও পরিচয় ভিন্ন।

এমতাবস্থায় বিচারক বাদীকে বলবেন, আপনি দুজন সাক্ষী আনুন, যারা এ মহিলাই ফাতেমা বিনতে রাশেদ আল কুরাইশী হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যার কথা আমার কাছে বিচারকের পত্রে রয়েছে। আপনি এরূপ সাক্ষ্য আনলে আমি রায় প্রদানের সময় এ মহিলার প্রতি ইশারা করে রায় প্রদান করতে পারব।

এ মাসআলা যে, আগের মাসআলার অনুরূপ এর দলিল মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করছেন এই বলে যে, এক বিচারকের পক্ষ থেকে অন্য বিচারকের নামে প্রেরিত পত্র সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার মতোই। যেন মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে পত্র লেখক বিচারক তাদের স্থলবর্তী হয়ে পত্র প্রাপক বিচারকের কাছে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে একটা আপত্তি সৃষ্টি হয় যে, একজন বিচারক দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য কিভাবে নকল করবেন। কেননা ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, একজন দুজনের সাক্ষ্যকে স্থানান্তর করতে পারেন না।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব উল্লেখ করে তাকে হাদীসের আলোকে রদ করা হয়েছিল। সুতরাং আলোচ্য সুরতে বিচারক একা দুজনের সাক্ষ্যকে কিভাবে স্থানান্তর করবেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেন যে, স্থলবর্তী সাক্ষী তো দুজন জরুরি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচারক তাঁর পূর্ণ আমানতদারি ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলায়াতের কারণে একাই দুব্যক্তির স্থলবর্তী বলে গণ্য হবেন। বিচারকের ক্ষেত্রে সাক্ষী দুজন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

وَلَوْ قَالُوْا فِىْ هٰذَيْنِ الْبَابَيْنِ التَّمِيْمِيَّةَ لَمْ يَجُزْ حَتّٰى يَنْسُبُوْهَا اِلٰى فَخِذِهَا وَهِىَ الْقَبِيْلَةُ الْخَاصَّةُ وَهٰذَا لِاَنَّ التَّعْرِيْفَ لَابُدَّ مِنْهُ فِىْ هٰذَا وَلَا يَتَحَصَّلُ بِالنِّسْبَةِ الْعَامَّةِ وَهِىَ عَامَّةٌ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى بَنِىْ تَمِيْمٍ لِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُحْصَوْنَ وَيَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْفَخِذِ لِاَنَّهَا خَاصَّةٌ وَقِيْلَ الْفَرْغَانِيَّةُ نِسْبَةٌ عَامَّةٌ وَالْاَوْزْجَنْدِيَّةُ خَاصَّةٌ وَقِيْلَ السَّمَرْقَنْدِيَّةُ وَالْبُخَارِيَّةُ عَامَّةٌ وَقِيْلَ اِلَى السِّكَّةِ الصَّغِيْرَةِ خَاصَّةٌ وَاِلَى الْمَحَلَّةِ الْكَبِيْرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ ثُمَّ التَّعْرِيْفُ وَاِنْ كَانَ يَتِمُّ بِذِكْرِ الْجَدِّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) عَلَى الظَّاهِرِ الرِّوَايَاتِ فَذِكْرُ الْفَخِذِ يَقُوْمُ مَقَامَ الْجَدِّ لِاَنَّهُ اِسْمُ الْجَدِّ الْاَعْلٰى فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ الْاَدْنٰى ـ

অনুবাদ : যদি সাক্ষীগণ উপরের দুসুরত [তথা সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান ও এক বিচারকের পক্ষ থেকে অন্য বিচারকের কাছে প্রেরিত পত্রে] বলে অমুক তামীমী গোত্রের মেয়ে তাহলে তা জায়েজ হবে না– যে পর্যন্ত না তার শাখা গোত্রের উল্লেখ না করবে। আর শাখা গোত্র হলো তার খাস গোত্র। এ হুকুম এজন্য যে, এ ব্যাপারে পূর্ণ পরিচয় আবশ্যক। আর তা ব্যাপকতার দিকে নিসবত করে হাসিল হবে না। মহিলাকে বনু তামীমের দিকে নিসবত করা হলে সে সাধারণ [অপরিচিত] মহিলা বলেই গণ্য হবে। কেননা তামীম গোত্রে অগণিত লোক রয়েছে। তবে শাখা গোত্রের দিকে নিসবত করে পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কেননা শাখা গোত্র হলো খাস। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, ফারগানী হলো সাধারণ ও ব্যাপক পরিচয়বোধক, আর আউযজিন্দিয়া হলো খাস পরিচয়। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, সমরকন্দী ও বুখারী হলো সাধারণ ও ব্যাপক পরিচয়বোধক। কেউ কেউ বলেন, ছোট গলির নিসবত হলো বিশেষ পরিচয়বোধক, আর বড় মহল্লা ও শহরের দিকের নিসবত হলো ব্যাপক পরিচয়বোধক। অতঃপর তারফাইন (র.)-এর মতানুযায়ী জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে যদিও দাদার নামোল্লেখ দ্বারা পরিচয় পূর্ণ হয়; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। [তারা বলেন,] শাখা গোত্রের উল্লেখ দাদার স্থলবর্তী হয়। কেননা শাখাগোত্র হলো সম্প্রদায়ের আদি পিতার নাম। সুতরাং এটা পিতামহের স্থলবর্তী সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوْا فِىْ هٰذَيْنِ الْبَابَيْنِ الخ : উপরের ইবারতে কারো পরিচিতির জন্য বংশের কোন অংশের উল্লেখ প্রয়োজন এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহান রাব্বুল আলামীন মানুষে মানুষে পরিচয়ের জন্য লোকদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও শাখা গোত্রের পরিচয় দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা হুজুরাতে তাঁর ইরশাদ এই– وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا 'আর আমি তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও শাখা গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার।' সম্প্রদায় ও গোত্রকে মুহাক্কিকীন ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন– ১. شَعْب ২. قَبِيْلَة ৩. فَصِيْلَة ৪. عَمَارَه ৫. بَطْن ৬. فَخِذ ; এ ছয়টির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হলো شَعْب এরপর উপরের বিন্যাসানুসারে ব্যাপকতা কমেছে। সুতরাং فَخِذ হলো

সবচেয়ে খাস পরিচায়ক বংশ। এজন্য বলা হয় যে, شَعْب অন্তর্ভুক্ত করে قَبَائِلْ -কে, قَبَائِلْ অন্তর্ভুক্ত করে فَصَائِلْ -কে, فَصِيْلَه অন্তর্ভুক্ত করে عَمَائِرْ -কে, আর عَمَارَة অন্তর্ভুক্ত করে بُطُوْن -কে, بَطْن অন্তর্ভুক্ত করে اَفْخَاذْ -কে।

অবশ্য কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে فخذ -এর পর فَصِيْلَه -এর স্তর। সুতরাং তাদের মতে فَصِيْلَه হবে সবচেয়ে খাস। শেষোক্ত মতানুযায়ী خُزَيْمَه হলো شَعْب ; তার অধীনে كِنَانَه হলো قَبِيْلَه , এর অধীন قُرَيْش হলো عَمَارَة , এর অধীনে قُصَيْ হলো بَطْن , আর هَاشِم হলো فَخْذ , আর عَبَّاس হলো فَصِيْلَه ।

ইমাম কুদূরী (র.) প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী فَخْذ -এর নিচে কোনো বংশ নেই।

এখন মূল মাসআলায় আসা যাক, ইতঃপূর্বে আলোচিত সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যে ও এক বিচারকের পক্ষ থেকে অন্য বিচারকের নিকট প্রেরিত পত্রে দেনাদার যে মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে তার বংশ পরিচয়ের জন্য বংশের কথা উল্লেখ করতে হবে। এখন যদি সাক্ষীগণ কিংবা বিচারক তার পত্রে মহিলার সাধারণ বংশ উল্লেখ করেন এবং খাস বংশ উল্লেখ না করেন তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও বিচারকের পত্র কোনোটাই প্রামাণ্য বলে সাব্যস্ত হবে না। যেমন– সাক্ষীগণ বললেন, ফাতেমা বিনতে রাশেদ আততামীমী। এরূপ বলা নাজায়েজ। যদি বৃহৎ বংশের উল্লেখ না করে মহিলা তামীম সম্প্রদায়ের যে খাস / বিশিষ্ট শাখা গোত্রের অধীনে সেটা উল্লেখ করা হতো তাহলে তা জায়েজ হতো।

কারণ, বংশ উল্লেখের প্রয়োজন মূলত ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য। আর ব্যক্তির নামের সাথে তার ব্যাপক বিস্তৃত বংশ উল্লেখ করার দ্বারা ব্যক্তি সমাজে পরিচিত হয় না। বনু তামীম একটি বিরাট গোত্র। এর অনেক শাখা গোত্র রয়েছে। সে শাখা গোত্রগুলোর মধ্যে ফাতেমা নামে অনেক মহিলা থাকতে পারে, যাদের বাবার নাম রাশেদ, এমতাবস্থায় যদি কেউ ফাতেমা বিনতে রাশেদ আততামীমীয়া বলে তাহলে কোন ফাতেমাকে বুঝাবে? সুতরাং এতটুকু বলার দ্বারা মহিলা পরিচিত হবে না; বরং অস্পষ্টতা থেকে যাবে। তাই মহিলাকে তামীম গোত্রের যে শাখার মধ্যে তার জন্ম সে শাখার সাথে খাস করে উল্লেখ করতে হবে।

এরপর মুসান্নিফ (র.) খাস পরিচয়ের ব্যাপারে মাশায়েখে কেরামের বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন– মাশায়েখে কেরামের একদল মনে করেন যে, ফারগানা নামি প্রদেশ রয়েছে সে প্রদেশের দিকে নিসবত করে যদি কারো পরিচয় দেওয়া হয় তাহলে তা হবে সাধারণ পরিচয় যার দ্বারা ব্যক্তিটি পরিচিত হবে না। অবশ্য সে প্রদেশের কোনো একটি শহরের দিকে যদি নিসবত করা হয় তাহলে সেটা হবে খাস/ বিশিষ্ট পরিচায়ক। যেমন আউযজিন্দিয়ার লোক অমুকের ছেলে অমুক বলা হলে সে পরিচিত হবে।

কিন্তু ভাষ্যকারগণ এ মতের উপর আপত্তি করে বলেন, তাদের এ মত বর্তমানে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে ভাবা উচিত। কেননা, আউযজিন্দিয়া এক সময় খুব বড় শহর ছিল না বটে; কিন্তু এখন সেটা অনেক বড় ও ব্যাপক বিস্তৃত শহর। এখন ঐ শহরের দিকে নিসবত করা হলে সম্পৃক্ত ব্যক্তির পরিচয় পূর্ণতা লাভ করবে না।

কোনো কোনো ফকীহের মত হলো, বুখারা ও সমরকন্দ হলো সাধারণ নিসবত। শহর দুটির কোনো গলি/ ছোট মহল্লার দিকে নিসবত হলো খাস নিসবত বা বিশিষ্ট পরিচায়ক। আর বড় মহল্লা কিংবা শহরের দিকে নিসবত হলো সাধারণ নিসবত।

قَوْلُهُ ثُمَّ التَّعْرِيْفُ وَاِنْ كَانَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) পরিচয়ের জন্য আপন দাদার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন সম্পর্কে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত এই যে, কারো দাদার নামের উল্লেখ আবশ্যক নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আযম (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী বাবার নামের সাথে তার দাদার নামের উল্লেখ করা আবশ্যক। এটা জাহেরী রেওয়ায়েতের মাসআলা।

قَوْلُهُ تَذْكُرُ الْفَخْذِ يَقُوْمُ مَقَامَ الْجَدِّ الخ : তবে তারফাইন (র.) এটাও বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির নামের সাথে তার দাদার নাম উল্লেখ না করে فَخْذ তথা তার শাখা-বংশের আদি পিতার নাম উল্লেখ করে। [যেমন– মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাশেমী] তাহলে তাও যথেষ্ট হবে। কেননা فَخْذ হলো তার উর্ধ্বতন দাদার নাম। সুতরাং উর্ধ্বতন দাদা নিজ দাদার স্থলাভিষিক্ত হবে।

فَصْلٌ : قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) شَاهِدُ الزُّوْرِ اُشَهِّرُهُ فِى السُّوْقِ وَلَا اُعَزِّرُهُ وَقَالَا نُوْجِعُهُ ضَرْبًا وَنَحْبِسُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَهُمَا مَا رُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّوْرِ اَرْبَعِيْنَ سَوْطًا وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَلِاَنَّ هٰذِهِ كَبِيْرَةٌ يَتَعَدّٰى ضَرَرُهَا اِلَى الْعِبَادِ وَلَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ وَلَهُ اَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُشَهِّرُهُ وَلَا يَضْرِبُ وَلِاَنَّ الْاِنْزِجَارَ يَحْصُلُ بِالتَّشْهِيْرِ فَيَكْتَفِىْ بِهِ وَالضَّرْبُ وَاِنْ كَانَ مُبَالَغَةً فِى الزَّجْرِ وَلٰكِنَّهُ يَقَعُ مَانِعًا عَنِ الرُّجُوْعِ فَوَجَبَ التَّخْفِيْفُ نَظَرًا اِلٰى هٰذَا الْوَجْهِ وَحَدِيْثُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ بِدَلَالَةِ التَّبْلِيْغِ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَالتَّسْخِيْمِ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে আমি হাটে-বাজারে ঘোষণা করে পরিচয় করিয়ে দেব। তাকে কোনো শাস্তি দেব না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, আমরা কঠিনভাবে প্রহার করব এবং গ্রেফতার করব। এটাই ইমাম শাফেয়ী (ব.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং তার মুখকে মলিন করেছেন। তাছাড়া এটা একটা বড় অপরাধ। এর ক্ষতি সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্তার করে। আর তাতে কোনো সুনির্দিষ্ট হদ [শাস্তি] নেই। সুতরাং তাকে তা'যীর করা হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রখ্যাত কাজি আবূ শুরাইহ (র.) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে লোকসমাজে ঘোষণা করে পরিচয় করিয়ে দিতেন; কিন্তু প্রহার করতেন না। অধিকন্তু এভাবে রাষ্ট্র করানোর দ্বারা চরমভাবে সতর্কীকরণ হয়। সুতরাং এরূপ করাকে যথেষ্ট মনে করা হবে। আর প্রহার করা যদিও সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যবস্থা, তবে তা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে তা সহজ করা উচিত। আর হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, এটি শাসনের একটি পর্যায়। কারণ এতে প্রহার চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং মুখে কালি লেপন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ : قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : উপরের ইবারতে একটি নতুন অনুচ্ছেদের অবতারণা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মিথ্যা সাক্ষীর সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষ্য অধ্যায়ের শেষভাগে আলোচনা করেছেন। কারণ, মূল হলো সত্যবাদী সাক্ষ্য সম্পর্কিত আলোচনা। মূল আলোচনা শেষ করার পর মিথ্যা সাক্ষী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। মিথ্যা সাক্ষীর বিষয়টি কয়েকভাবে প্রমাণিত হতে পারে–

১. সাক্ষী নিজেই স্বীকার করল যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি। অথবা
২. এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, অমুককে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল লোকটি জীবিত। মোটকথা, স্বীকারোক্তি কিংবা অন্যকোনো উপায়ে কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্যদানে মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হওয়া দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা নিশ্চিত হবে।

যদি কোনো সাক্ষী এরূপ মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে? এ ব্যাপারে আহনাফের ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, এরূপ মিথ্যা সাক্ষীকে আমি হাটে-বাজারে ঘোষণা দিয়ে তার মিথ্যুক হওয়ার বিষয়টি লোকদের জানিয়ে দেব এবং তার বিষয়টি সকলের জ্ঞাত করব। এটাই এরূপ মিথ্যা সাক্ষীর শাস্তি। তাঁর মতে এরূপ সাক্ষীকে বেত্রাঘাত কিংবা প্রহারের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হলো, মিথ্যা সাক্ষীর শাস্তি হলো প্রহার করা ও কয়েদ করে রাখা। বাকি তিন ইমাম তথা ইমাম আহমদ (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) সাহেবাইন (র.)-এর অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, অতঃপর তার মুখে কালি মেখে দিয়েছেন। তাঁর এ হাদীস দ্বারা মিথ্যা সাক্ষীদাতাকে প্রহার করার দলিল পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ওয়ালিদ ইবনে আবূ মালিক (র.) বর্ণিত হাদীস থেকেও জানা যায়।

তাঁর বর্ণিত হাদীসটি হলো–

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلٰى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ أَنَّ شَاهِدَ الزُّوْرِ يُضْرَبُ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ فِى الْحُدُوْدِ بِسَنَدِ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ -

অর্থাৎ 'হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় নিযুক্ত শাসকদের কাছে লিখিত পত্রে বলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হবে, চেহারা কালিমাযুক্ত করা হবে, মাথার চুল মুণ্ডে ফেলা হবে এবং দীর্ঘসময় কয়েদ করে রাখা হবে।' হযরতের এ হাদীস দ্বারাও প্রহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রা.) খলিফা থাকাকালে এ ফরমান জারি করেছেন, কেউ সেটার প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা যায় না। সুতরাং আমাদের জন্য এটা বড় দলিল গণ্য হবে।

অবশ্য সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের উপর এ আপত্তি হয় যে, হাদীসের মধ্যে তো মাথা মুণ্ডানোর এবং মুখ কালিমাযুক্ত করার কথা রয়েছে অথচ সাহেবাইন (র.) এ দুটিকে জায়েজ মনে করেন না।

দ্বিতীয় আপত্তি হলো, تَعْزِيْر -এর সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো ৩৯ [উনচল্লিশটি] অথচ হাদীসের মধ্যে চল্লিশের উল্লেখ রয়েছে।

এর জবাবে সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, হাদীস দ্বারা বেত্রাঘাতের সংখ্যা এখানে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো হাদীস দ্বারা تَعْزِيْر বা প্রহারকে প্রমাণ করা, যা ইমাম আযম (র.) অস্বীকার করেন।

সাহেবাইন (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, মিথ্যাসাক্ষ্য একটি কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ। পবিত্র কুরআনে মূর্তিপূজার সাথে মিথ্যাসাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ অর্থাৎ 'তোমরা মূর্তি পূজার নাপাকি ও মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক।'

মিথ্যাসাক্ষ্য কবীরা গুনাহ হওয়ার কথা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন রাসূল ﷺ -এর বাণী–

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَازَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ -

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহের কথা বলব ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা এবং পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করা। তিনি ছিলেন হেলানরত অবস্থায় অতঃপর বসে বললেন, সাবধান মিথ্যাকথা/ মিথ্যাসাক্ষী [কবিরা গুনাহ] তিনি বারবার বলতে থাকলেন এমনকি আমার মনে হলো তিনি চুপ করবেন না।'

কোনো কোনো রেওয়ায়েতের শব্দ হলো– রাবী বলেন, হায় তিনি যদি চুপ করতেন। মোটকথা মিথ্যাসাক্ষ্য কবীরা গুনাহ হওয়ার বিষয়টি হাদীস ও কুরআন মাজীদ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর এটা এমন কবীরা গুনাহ যার ক্ষতি সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্তার করে। মানুষের জন্য ক্ষতিকর কবীরা গুনাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তবে শাস্তি কি হবে এ ব্যাপারে শরিয়তে সুস্পষ্ট ও অকাট্য কোনো নির্দেশনা নেই। তাই সাধারণ মানুষের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা উচিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সাহাবী যুগের বিখ্যাত কাজি আবূ শুরাইহ (র.) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে হাট-বাজার ও জনপদে ঘোষণা দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

কাজি শুরাইহ (র.) সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত পাওয়া গেছে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আছারে উল্লেখ করেছেন। এর কাছাকাছি আরেকটি বর্ণনা মুসান্নাফে আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাতে উদ্ধৃত হয়েছে। মুসান্নাফের রেওয়ায়েতটি এখানে দেওয়া হলো–

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ شُرَيْحٌ يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّوْرِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهٖ اَوْ إِلَى سُوْقِهٖ وَيَقُوْلُ : إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هٰذَا وَفِىْ لَفْظٍ كَانَ يَكْتُبُ إِسْمَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهٖ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِىْ بَعَثَ إِلَى سُوْقِهٖ يُعْلِمُهُمْ ذٰلِكَ ـ

এ রেওয়ায়েত দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাজি শুরাইহ মিথ্যা সাক্ষীদের মসজিদে, হাটে-বাজারে মিথ্যাবাদীরূপে তার পরিচয় করিয়ে দিতেন। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শারীরিক কোনো শাস্তিদানের কথা শুরাইহের রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় না।

প্রকাশ থাকে যে, কাজি শুরাইহ হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং বিরাট সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সামনে তার কর্ম সম্পাদন করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ব্যাপারে তার পদক্ষেপ সাহাবায়ে কেরামের সামনে গোপনীয় থাকেনি। কিন্তু কোনো সাহাবী থেকে এর কোনো প্রতিবাদের কোনো কথা হাদীসের ভাণ্ডারে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে চুপ ছিলেন। চুপ থাকা বা মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। সুতরাং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইজমা হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। অতএব, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে শারীরিক কোনো শাস্তি না দেওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মিথ্যা সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিরত রাখা হলো উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য তাকে লোকসমাজে মিথ্যাবাদী রূপে উপস্থাপন করার দ্বারাই হাসিল হয়ে যায়। কেননা তখন মানুষ সামাজিকভাবে অপদস্ত হওয়ার ভয়ে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। মোটকথা, যেহেতু মিথ্যাবাদীরূপে প্রচার করার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় তাই এতটুকুকে যথেষ্ট মনে করা হবে। সুতরাং তাকে প্রহার ও মারপিটের শাস্তি দেওয়া হবে না।

তাছাড়া প্রহার করা যদিও মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত রাখার জন্য সহায়ক; কিন্তু এর একটি ক্ষতির দিকও আছে। তা হলো, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা যখন প্রহারের কথা চিন্তা করবে তখন সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে এর স্বীকারোক্তি করবে না এবং সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, এর থেকে ফিরে আসবে না। ফলে মানুষের হকসমূহ বিনষ্ট হবে। এ ক্ষতি একটি বড় ক্ষতি। এ ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করে লঘু শাস্তি তথা تَشْهِيْر করাই সমীচীন।

আর হাদীসের জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে প্রহার করার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা শাসনের একটি বিশেষ দিক। অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) তাঁর শাসনব্যবস্থাকে মজবুত রাখার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ব্যাপারে এরূপ কঠোর শাস্তির বিধান জারি করেছিলেন। এটা শাসনব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। এর দলিল হলো, তিনি অপরাধীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ করেছিলেন অথচ চল্লিশ বেত্রাঘাত গোলাম বাঁদির অপবাদের শাস্তি। শরিয়তে তা'যীর হিসেবে যে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে এর মধ্যে একটি শর্ত এই আছে– তার দণ্ড কোনো হদের দণ্ডের সমপর্যায়ের না হতে হবে; বরং তা'যীরের শাস্তি হদের শাস্তির চেয়ে কম হতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ। 'কোনো ব্যক্তি যে হদের অপরাধ করেনি তাকে যে হদের শাস্তি প্রদান করবে সে সীমালঙ্ঘনকারীর মধ্যে গণ্য হবে।' যেহেতু হযরত ওমর (রা.) এরূপ সতর্কবাণীর পরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং করার আদেশ করেছেন তাহলে বুঝা যায় তাঁর এ শাস্তি প্রদান তা'যীর হিসেবে ছিল না। তাছাড়া তিনি মুখে কালিমা লেপন করেছিলেন। অথচ মুখে কালি মাখাও তা'যীরের অংশ নয়। সুতরাং তাঁর শাস্তিদান শাসন প্রক্রিয়ার অংশ বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত মুখে কালিমা লেপনকে কেউ কেউ অপদস্থ করার অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেননা অপদস্থ করাকে রূপকভাবে মুখে কালিমাখা বলে ব্যক্ত করা হয়। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا [অর্থাৎ যখন কুরাইশ কাফেরদের কাউকে কন্যা-সন্তান জন্মানোর সুসংবাদ দেওয়া হতো তখন তার চেহারা কালো হয়ে যেত।] এখানে চেহারা কালো হওয়ার অর্থ তারা নিজেদের চরম অসম্মানিত ও অপদস্থ মনে করত। সুতরাং হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসে যে মুখে কালিমা লেপনের কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা অপদস্থ করা উদ্দেশ্য। আর অপদস্থ করার বিষয়টি সাক্ষ্যদাতা মিথ্যুক হিসেবে সমাজে পরিচিত করার দ্বারাই হয়ে থাকে। যদি এভাবে হাদীসের অর্থ করা হয় তাহলে হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে না।

ثُمَّ تَفْسِيْرُ التَّشْهِيْرِ مَنْقُوْلٌ عَنْ شُرَيْحٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهُ إِلَى سُوْقِهِ إِنْ كَانَ سُوْقِيًّا وَإِلَى قَوْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ سُوْقِيٍّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَجْمَعَ مَا كَانُوْا وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ شُرَيْحًا يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ إِنَّا وَجَدْنَا هٰذَا شَاهِدَ زُوْرٍ فَاحْذَرُوْهُ وَحَذِّرُوا النَّاسَ مِنْهُ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (رحـ) أَنَّهُ يُشَهَّرُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَالتَّعْزِيْرُ وَالْحَبْسُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْقَاضِيْ عِنْدَهُمَا وَكَيْفِيَّةُ التَّعْزِيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحُدُوْدِ .

অনুবাদ : অতঃপর تَشْهِيْر -এর ব্যাখ্যা কাজি শুরাইহ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে আসরের পর সবচেয়ে বেশি লোক সমাগমের স্থানে পাঠাতেন যদি সে বাজারের লোক হতো, আর যদি সম্প্রদায়ের সাথে থাকার লোক হতো তাহলে তাকে নিজ গোত্রের কাছে পাঠাতেন এবং [তার] লোকেরা বলবেন, কাজি শুরাইহ আপনাদের সালাম দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, এ লোকটিকে আমরা মিথ্যা সাক্ষীরূপে পেয়েছি। সুতরাং আপনারা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং অন্যলোকদের তার ব্যাপারে সতর্ক করুন। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) বলেন, সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ীও মিথ্যা সাক্ষীর বিষয় ঘোষণা দিয়ে পরিচিত করানো হবে। তাঁদের মতে শারীরিক শাস্তি ও গ্রেফতারির বিষয়টি বিচারকের হাতে ন্যস্ত করা হবে। শাস্তি দেওয়ার সুরত সেটাই যা আমরা হুদুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ تَفْسِيْرُ التَّشْهِيْرِ الخ : এখানে থেকে মুসান্নিফ (র.) মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে সমাজে কিভাবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতারূপে পরিচয় করিয়ে দেবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাকে পরিচিত করার প্রক্রিয়া কাজি শুরাইহ (র.) এভাবে গ্রহণ করতেন যে, লোকটি যদি বাজারে কারবার করে কিংবা বাজারে থাকে এমন হতো, তাহলে তিনি বিচার বিভাগের লোকদের দিয়ে তাকে বাজারে প্রেরণ করতেন। অতঃপর বাজারে যে স্থানে সে সময়ে সবচেয়ে বেশি লোক সমাগম হতো সেখানে তাকে নিয়ে গিয়ে বিচার বিভাগের লোকেরা ঘোষণা করতেন– ভাই সকল! কাজি শুরাইহ আপনাদের সালাম দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, এই [ইশারা করে লোকটিকে দেখিয়ে] ব্যক্তিকে আমরা মিথ্যাসাক্ষ্যদাতারূপে পেয়েছি। তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং অন্যান্য লোকদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

আর যদি সে কোনো গ্রাম / জনপদের / সম্প্রদায়ের বাসিন্দা হয় তাহলে তাকে সে গ্রাম / সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করে উপরিউক্ত সূরতে তার ব্যাপারে ঘোষণা করাবেন।

قَوْلُهُ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) বলেছেন, সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ীও মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার ব্যাপারটি রাষ্ট্র কর্তৃক করানো হবে। আর তাঁদের মতে যে, তা'যীর করা ও আটক রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে তা বিচারকের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাদেরকে শারীরিক প্রহার করবেন। তাঁর মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার উপর শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ সাহেবাইন (র.)-এর মতে কোনো আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নয় যার প্রয়োগ করতেই হবে; বরং এটা বিচারকের বিবেচনাধীন বিষয়। কোনো কোনো ফকীহ মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার বিষয়টির তাফসীল করেন এভাবে যে, যদি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা অনুতাপ ও তওবার মানসিকতায় তার পূর্ব সাক্ষ্যকে প্রত্যাহার করে তাহলে তাকে কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই।

আর যদি সে মিথ্যার উপর অটল থাকে; কিন্তু তার মিথ্যা দলিল-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে। এতেও কোনো মতবিরোধ নেই।

যদি তার প্রকৃত অবস্থা জানা না যায়, আর তার সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় সে সুরতেই মতবিরোধ যে, তাকে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে কিনা?

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ شَاهِدَانِ اَقَرَّا اَنَّهُمَا شَهِدَا بِزُوْرٍ لَمْ يُضْرَبَا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ وَفَائِدَتُهُ اَنَّ شَاهِدَ الزُّوْرِ فِىْ حَقِّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحُكْمِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلٰى نَفْسِهٖ بِذٰلِكَ فَاَمَّا لَا طَرِيْقَ اِلٰى اِثْبَاتِ ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لِاَنَّهُ نَفْىُ الشَّهَادَةِ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْاِثْبَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : জামিউস সাগীর গ্রন্থে এ মাসআলা রয়েছে যে, দুজন সাক্ষী এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিল যে, তারা মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে তাহলে তাদের প্রহার করা হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের তা'যীর করা হবে। উপরিউক্ত ইবারতের ফায়েদা এই যে, মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপারে আমরা যে বিধান আলোচনা করেছি তা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার স্বীকারোক্তি দেবে। এছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা মিথ্যাসাক্ষ্য প্রমাণ করার সুযোগ নেই। কেননা মিথ্যাসাক্ষ্য তো সাক্ষ্যকে বাতিল করা। আর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় কোনো কিছু প্রমাণ / প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الخ : উপরের আলোচনায় মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার যে তিনটি সুরতের বর্ণনা করা হয়েছিল তন্মধ্যে স্বীকারোক্তির সুরত নিয়ে জামিউস সাগীরে বর্ণিত মাসআলার আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

জামিউস সাগীরের ইবারতে বর্ণিত আছে যে, দুজন সাক্ষী বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পর পরবর্তীতে এ মর্মে স্বীকারোক্তি দিল যে, তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে সেটা মিথ্যাসাক্ষ্য। এরূপ স্বীকারোক্তি দেওয়ার কারণে [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবনুযায়ী] তাদের প্রহার করা হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব হলো, এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যদানের স্বীকারোক্তিদাতা সাক্ষীদ্বয়কে তা'যীর হিসেবে প্রহার করা হবে।

মুসান্নিফ (র.) জামিউস সাগীরের ইবারত নকল করার পর তাঁর মন্তব্য পেশ করেন এভাবে যে, জামিউস সাগীরের ইবারত থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাক্ষীর মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কারণ সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অর্থ হলো সাক্ষীর সাক্ষ্যকে নফী/ বাতিল করা। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য, কোনো কিছু নফী করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় না। সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার প্রমাণের উপায় হলো সাক্ষীর স্বীকারোক্তি মাত্র।

অবশ্য জামিউস সাগীরের এ ইবারতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের আরেকটি সুরত সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি। সে সুরত হলো, সাক্ষ্য বাস্তবতার পরিপন্থি হওয়া। যেমন কেউ সাক্ষ্য দিল যে, অমুক নিহত হয়েছে। অতঃপর দেখা গেল যে, সে লোকটি জীবিত। এর জবাব হলো, এরূপ অবস্থাতে তার স্বীকারোক্তির সুরতই আসে। যেমন– এরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার পর যদি বলা হয়– কৈ সে লোকটি তো জীবিত, তখন সে বলবে, আমি ঠিক বলিনি/ আমি ধারণা করেছিলাম এরূপ, কিন্তু এখন তো দেখছি সে আসলেই জীবিত/ আমি শুনেছিলাম সে মারা গিয়েছে সে হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম ইত্যাদি। মোটকথা এরূপ সুরতে সাক্ষী এক পর্যায়ে তার সাক্ষ্য যে সঠিক ছিল না এটা মেনে নেয়। তার মেনে নেওয়া তার স্বীকারোক্তি দেওয়ারই নামান্তর। সব বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

كِتَابُ الرُّجُوْعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

قَالَ : وَإِذَا رَجَعَ الشُّهُوْدُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ لِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَاضِيْ لَا يَقْضِيْ بِكَلَامٍ مُتَنَاقِضٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَا عَلَى الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يُفْسَخِ الْحُكْمُ لِأَنَّ اٰخِرَ كَلَامِهِمْ يُنَاقِضُ أَوَّلَهُ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالتَّنَاقُضِ وَلِأَنَّهُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّدْقِ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوْهُ بِشَهَادَتِهِمْ لِإِقْرَارِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ .

অধ্যায় : সাক্ষ্য প্রত্যাহার

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সাক্ষীগণ তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে রায় প্রদানের পূর্বে ফিরে আসে তাহলে তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়। কেননা কারো অধিকার রায় প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় আর বিচারকের পক্ষে পরস্পর বিরোধ কথার সাহায্যে রায় প্রদান করা সম্ভব নয়। অবশ্য সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। কেননা তারা [সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে] কোনোকিছু নষ্ট করেনি। বাদী বা বিবাদীর কারো কোনো ক্ষতি করেনি। আর যদি বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করেন অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে রায় রহিত করা হবে না। কেননা তাদের শেষকথা প্রথম কথার সাথে বিরোধপূর্ণ। সুতরাং বিরোধপূর্ণ কথার কারণে রায় বাতিল করা হবে না। তাছাড়া তাদের পরবর্তী কথা সত্য হওয়ার বিবেচনায় প্রথম কথার অনুরূপ; বরং প্রথম কথার সাথে রায় যুক্ত হওয়ার কারণে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে সাক্ষীগণ নিজেদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে জরিমানার সববকে আবশ্যক করার কারণে তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যে ক্ষতি তারা করেছে এর জরিমানা তাদের উপর আরোপিত হবে। আর পরস্পর বিরোধপূর্ণ কথা স্বীকারোক্তি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয় না। এর বর্ণনা সামনে আমরা পেশ করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : এ অধ্যায়টি কিতাবুশ শাহাদাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটা এভাবে যে, সাক্ষ্যদানের পর সে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন আসে। মুসান্নিফ (র.) শাহাদাত অধ্যায়ের পর এজন্য সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত অধ্যায়ের আলোচনা এনেছেন। তাছাড়া শাহাদাত অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ মিথ্যাসাক্ষ্যের সাথেও এ অধ্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেওয়াটাই দলিল যে, তার আগে প্রদানকৃত সাক্ষ্য সত্য ছিল না। মিথ্যাসাক্ষ্য প্রত্যাহার করা শরিয়তের দৃষ্টিতে খুব পছন্দনীয় কাজ। মিথ্যাসাক্ষ্য প্রত্যাহার করার মাধ্যমে বান্দা তার পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে এবং পৃথিবীতে মানসিক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। কেননা যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا رَجَعَ الشُّهُوْدُ الخ : উপরের ইবারতের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রত্যাহার অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহারের দুটি অবস্থা হতে পারে– ১. ঐ সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারের রায় প্রদানের আগে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা। ২. বিচারের রায় প্রদানের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা।

যদি সাক্ষীগণ / সাক্ষীদ্বয় রায় প্রদানের আগে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে। যেমন– সাক্ষীরা বিচারকের এজলাসে থাকাবস্থায় বলল যে, আমরা আমাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছি অথবা বলল যে, আমরা যে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলাম তা মিথ্যা ছিল, তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এ সাক্ষ্য দ্বারা কারো পক্ষে/ বিপক্ষে কোনো রায় প্রদান করা যাবে না। কেননা কারো হক/ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বিচারকের রায়ের মাধ্যমে। অথচ আলোচ্য সুরতে তখনও কোনো রায় দেওয়া হয়নি। তাছাড়া বিচাকের পক্ষে রায় প্রদান করা এ অবস্থায় সম্ভবও নয়। কারণ সাক্ষীদের প্রথম ও শেষকথার মধ্যে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। এ অবস্থায় প্রথম কথার দ্বারা ফয়সালা দিলে শেষকথার সাথে রায়ের সংঘর্ষ হয় আর শেষকথার দ্বারা ফয়সালা দিলে প্রথম কথার সাথে রায়ের সংঘর্ষ হয়। যেহেতু এ অবস্থায় রায় প্রদান করা অসম্ভব তাই বিচারক রায় প্রদান থেকে বিরত থাকবেন। রায় প্রদান সম্ভব না হওয়াতে এ সাক্ষ্য বাদীর পক্ষে বিবাদীর বিপক্ষে কোনো হক আরোপিত করবে না।

এ অবস্থায় এ সাক্ষ্য প্রত্যাহারের কারণে সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। কারণ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের রায়ের অযোগ্য হওয়াতে বিচারের রায় আসবে না। রায় ঘোষণা না করলে সাক্ষ্যের কারণে কারো কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না। আর ক্ষতি না হলে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা আরোপিত হয় না।

উল্লেখ্য যে, বাদী ও বিবাদী দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। বিবাদীর ক্ষতি না হওয়া তো এখানে স্পষ্ট। কারণ সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় প্রদান করা হলে বিবাদীর ক্ষতি হতো। এখানে তো সাক্ষ্যের মাধ্যমে রায় প্রদান করা হয়নি।

অবশ্য বাদীর ক্ষতি হতে পারে। তা এভাবে যে, সাক্ষীগণ প্রথমে যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাই সঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সত্য বিষয় গোপন করার উদ্দেশ্যে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এমন হতে পারে। এমন করা হলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের দ্বারা বাদীর হক নষ্ট হলো। ফলে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু যেহেতু সাক্ষ্য গোপনকারীর উপর কোনো জরিমানা আরোপের বিধান নেই তাই সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না।

মোটকথা, বিচারের রায় প্রদানের আগে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ/ জরিমানা আরোপ করা হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا الخ : আর যদি বিচারক সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন, তারপর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে বিচারকের রায় বাতিল হবে না, রায় বহাল থাকবে। রায় বাতিল না হওয়ার কারণ হলো, সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার পর দেখা গেল যে, সাক্ষীরা প্রথমে এক ধরনের বক্তব্য দিয়েছে তারপর পরবর্তীতে ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছে। যেমন সাক্ষীরা প্রথমে বলল, রাশেদ খালেদকে হত্যা করেছে। পরে বলল, রাশেদ খালেদকে হত্যা করেনি। সুতরাং তার প্রথম ও শেষ কথাতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। শরিয়ত ও সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য অগ্রাহ্য ও বাতিল বলে গণ্য হয়। এরূপ বক্তব্য দ্বারা বিচারকের রায় বাতিল করা যায় না। সুতরাং সাক্ষীদের পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা বিচারকের রায় বাতিল হবে না; বরং রায় বহাল থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য অগ্রাহ্য কেন? এর উত্তর হলো, পরস্পর বিরোধী বক্তব্য গ্রহণ করা হলে এক অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা (تَسَلْسُلْ) লাযেম হবে। যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারকে গ্রহণ করে বিচারের রায় বাতিল করা হয়, তারপর নতুন রায় প্রদান করা হয়। তারপর এরূপ সম্ভবনা আছে যে, সাক্ষীরা তাদের প্রত্যাহার বক্তব্য থেকে আবার ফিরে আসল। অর্থাৎ তারা বলতে পারে যে, আমাদের প্রথম বক্তব্যই সঠিক তাহলে তাদের এ বক্তব্যকেও গ্রহণ করা উচিত। তাহলে দ্বিতীয়বারের মতো বিচারকের রায় পরিবর্তন করতে হবে। এরপর যদি বিচারকের কাছে সাক্ষী তৃতীয়বারের মতো মত পরিবর্তন করে বলে যে, আমি দ্বিতীয় দফায় যা বলেছি তাই সঠিক তাহলে বিচারক তৃতীয়বার তার রায় পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন। এভাবে বিচারকের রায় পরিবর্তন হতেই থাকবে। যেহেতু সাক্ষীদের একটি কথাকে আরেকটি কথার উপর প্রাধান্য দানের সুযোগ নেই তাই বিচারকের রায় ঘোষণা ও রায় বাতিল করার এ প্রক্রিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সেহেতু এরূপ تَسَلْسُلْ অসম্ভব বিষয়। সুতরাং যে বিষয় تَسَلْسُلْ -কে আবশ্যক করে তাও অসম্ভব হয়। এ অসম্ভব সিলসিলাকে বন্ধ করার জন্য শরিয়ত পরস্পর বিরোধপূর্ণ কথার ভিত্তিতে রায় প্রদানকে বাতিল করেছে।

রায় বাতিল না করার দ্বিতীয় দলিল হলো, সাক্ষ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত কথাটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে প্রথম সাক্ষ্যের সমপর্যায়ের। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাহার কথাটি বেশি সত্য, আর প্রদত্ত সাক্ষ্যটি কম সত্য এমন নয়; বরং বিচারকের নিকট যেহেতু বাস্তবতার কোনো প্রমাণ নেই তাই তাঁর কাছে উভয় বাক্য সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে সমান সম্ভবনাময়। অবশ্য প্রথম বক্তব্য/ সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রবর্তী। কেননা প্রথম বক্তব্য বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রথম সাক্ষ্যের সাথে রায় যুক্ত হওয়ায় সেটা প্রাধান্য লাভ করবে। সুতরাং প্রাধান্যপ্রাপ্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে যে রায় দেওয়া হয়েছে তা কম প্রাধান্যের বক্তব্য দ্বারা খণ্ডিত হবে না।

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا اَتْلَفُوْا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপ সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যের কারণে যে ক্ষতি বিবাদী/ বাদীর হবে তার ক্ষতিপূরণ তাদের প্রদান করতে হবে। যেমন– তাদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদী বাদীকে দশ হাজার টাকা দিয়েছে। এখন বিচারক এ সাক্ষীদেরকে বলবেন, তোমরা বিবাদীকে দশ হাজার টাকা প্রদান কর। কারণ তোমাদের সাক্ষ্যের কারণে তার উপর আদালত দশ হাজার টাকা প্রদানের আদেশ করেছে। তাছাড়া সাক্ষীরা নিজেরাও এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, তাদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদীর উপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং তারা যেন বলেছে, যেহেতু আমরা আমাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছি সুতরাং আমরাই বিবাদীর মাল নষ্ট করলাম। আমরাই এর ক্ষতিপূরণ আদায় করব। মোটকথা, সাক্ষীরা জরিমানা আরোপের সববের ব্যাপারে নিজেরাই স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এ কারণে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে।

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে কেউ এরূপ আপত্তি করতে পারে যে, বাদী/ বিবাদীর ক্ষতির কারণ তো সাক্ষীদের সাক্ষ্য নয়; বরং বিচারকের রায়ের কারণেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং বিচারকের উপর জরিমানা আরোপ করা উচিত। অথচ বিচারকদের উপর জরিমানা আরোপের কথা বলা হচ্ছে না।

উত্তর : এর উত্তর হলো, বাহ্যত যদিও এমন মনে হয় যে, বিচারকের রায়ের কারণে বাদী/ বিবাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচারকের রায় মূল কারণ নয়; বরং উপলক্ষ মাত্র। মূল কারণ তো সাক্ষ্য। কেননা সাক্ষ্য না দেওয়া হলে বিচারক এ সম্পর্কে রায় প্রদান করতেন না। সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে বিচারক এরূপ রায় প্রদান করেছেন। সুতরাং দায় সাক্ষ্যের সাক্ষীদাতাদের উপর বর্তাবে। বিচারকের রায়কে দায়ী করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে সাক্ষ্যের কারণে বিচারক এরূপ রায় প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতে হুকুম মূল সববের সাথে সম্পৃক্ত হয়, বাহ্যিক ইল্লতের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। যেহেতু ক্ষতির দায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য, তাই সাক্ষীদের উক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যক হবে।

এর একটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি রাস্তার মধ্যে একটি কূপ খনন করেছে। অতঃপর এক পথিক সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কূপে পড়ে মারা গেল। এখানে বাহ্যিকভাবে মারা যাওয়ার কারণ হলো পথিকের কূপে পড়ে যাওয়া, কিন্তু মৃত্যুর মূল কারণ হলো রাস্তার মধ্যে কূপ খনন করা। এমতাবস্থায় কূপ খননকারীর উপর দিয়াত দেওয়া ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীগণের উপর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা জরুরি হবে।

قَوْلُهُ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যখন সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন তাদের প্রথম ও শেষ কথার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হলো। আর পরস্পর বিরোধপূর্ণ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ অগ্রহণযোগ্য কথা তথা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে তার উপর জরিমানা আরোপ করা উচিত?

উত্তর : এর উত্তর হলো, সাক্ষীদের প্রথম কথার সাথে দ্বিতীয় কথার নিঃসন্দেহে বৈপরীত্য রয়েছে তবে এ বৈপরীত্য ইকরার [স্বীকারোক্তি] সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। অর্থাৎ সাক্ষীরা যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল যে, তারা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছিল তা সহীহ হয়ে যাবে, আর এ স্বীকারোক্তির কারণেই তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের উপর তা'যীর প্রয়োগ করা হবে কিনা? এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) কোনো বর্ণনা দেননি। কারণ, এ পরিচ্ছেদের আগের অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে আলোচনা চলে গিয়েছে।

وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِلشَّهَادَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنَ الْمَجْلِسِ وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَاضِيْ اَيُّ قَاضٍ كَانَ وَلِاَنَّ الرُّجُوْعَ تَوْبَةٌ وَالتَّوْبَةُ عَلٰى حَسْبِ الْجِنَايَةِ فَالسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْاِعْلَانُ بِالْاِعْلَانِ وَاِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوْعُ فِيْ غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِيْ فَلَوْ اِدَّعَى الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ رُجُوْعَهُمَا وَاَرَادَ يَمِيْنَهُمَا لَا يُحْلَفَانِ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِمَا لِاَنَّهُ اِدَّعٰى رُجُوْعًا بَاطِلًا حَتّٰى لَوْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضٍ كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ لِاَنَّ السَّبَبَ صَحِيْحٌ .

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন,] বিচারকের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা সহীহ নয়। কেননা এটা সাক্ষ্যকে রহিত করা। সুতরাং সাক্ষ্য যেমন মজলিসের সাথে খাস এটাও এর সাথে খাস হবে। আর মজলিস হলো বিচারকের মজলিস। যে কোনো বিচারক হোক না কেন। তাছাড়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার হলো তওবা। আর অপরাধ অনুযায়ী তওবা হয়ে থাকে। গোপন অপরাধের তওবা গোপনে, আর প্রকাশ্য অপরাধের তওবা প্রকাশ্যে। যেহেতু সাক্ষ্য প্রত্যাহার বিচারকের মজলিস ব্যতীত সহীহ নয়। তাই যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে যদি সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের দাবি করে এবং তাদের শপথ চায় তাহলে তাদের থেকে শপথ নেওয়া হবে না। তদ্রূপ তাদের বিপক্ষে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে একটি বাতিল সাক্ষ্য প্রত্যাহারের দাবি করছে। তবে যদি সে এরূপ সাক্ষ্য দাঁড় করায় যে সাক্ষী অমুক বিচারকের কাছে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এবং বিচারক তার মালে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এখানে সববটি সহীহ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারকের উপস্থিতি ছাড়া সাক্ষী প্রত্যাহার সহীহ নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যে কোনো বিচারকের সামনে প্রত্যাহার করলে চলবে। সে যে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল সে বিচারক হোক কিংবা অন্য বিচারক হোক। মোটকথা সাক্ষ্য প্রত্যাহার বৈধ হওয়ার জন্যে বিচারকের মজলিস হওয়া আবশ্যক।

কোনো কোনো ফকীহের মতে, কেবল বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলেই চলবে না; বরং বিচারক কর্তৃক সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে হবে এবং বিচারক সাক্ষীদ্বয়কে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করবেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ فَسْخٌ لِلشَّهَادَةِ الخ : এখান থেকে মতনের মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা যেন সাক্ষ্যকে রহিত (فَسْخ) করা। সুতরাং সাক্ষ্য যে মজলিসের সাথে খাস সাক্ষ্য প্রত্যাহারও সে মজলিসের সাথে খাস হবে। আর ইতঃপূর্বে সাক্ষ্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা বিচারকের মজলিসের সাথে খাস এবং বিচারকের মজলিস ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া কিতাবের টীকাতে এ স্থানে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এই বলে যে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের জন্যে বিচারকের মজলিস খাস– এটা আমরা মানি না। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের অর্থ হলো সাক্ষীরা নিজেদের ব্যাপারে বিবাদীর জরিমানা আদায়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করা। তারা যেন এ কথা বলছে যে, আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে তোমার যে ক্ষতি করেছি

তার ক্ষতিপূরণ আমরা দেব। আর মালের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার স্বীকারোক্তির মধ্যে বিচারকের মজলিসের কোনো শর্ত নেই। সুতরাং সাক্ষ্য প্রত্যাহারের মধ্যেও বিচারকের মজলিস শর্ত না হওয়া উচিত।

ভাষ্যাকারগণ এ আপত্তির দুটি জবাব দিয়েছেন। প্রথম উত্তর এই যে, যে বিষয় শুরুতে থাকা শর্ত সে বিষয়টি পরিণামে থাকাও শর্ত। যেমন বেচাকেনা সহীহ হওয়ার জন্যে বিক্রয়পণ্য থাকা শর্ত তদ্রূপ বেচাকেনা রহিত করার জন্যে বিক্রয়পণ্য বিদ্যমান থাকা শর্ত। অর্থাৎ যদি বিক্রয়পণ্য না থাকে তাহলে যেমন বেচাকেনা-চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে না তদ্রূপ বিক্রয়পণ্য না থাকলে বেচাকেনাকে বাতিল/ রহিত করা যায় না। সুতরাং সাক্ষ্য সহীহ হওয়ার জন্য যেভাবে বিচারকের মজলিস শর্ত ছিল তদ্রূপ সাক্ষ্য প্রত্যাহারের জন্যে বিচারকের মজলিস শর্ত হবে।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করার পর বিবাদীর উপর বাদীর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সে অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত বাতিল হয় না যতক্ষণ সাক্ষ্য বাকি আছে। সুতরাং বাদীর অধিকারের দাবি বাতিল করার সাক্ষ্য রহিত হওয়া আবশ্যক। অথচ বিচারকের মজলিস ব্যতীত অন্যস্থানে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সে সাক্ষ্য রহিত বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা বিচারকের মজলিস ব্যতীত অন্যস্থানে সাক্ষ্য রহিত করা যায় না। সুতরাং বিচারকের মজলিস ব্যতীত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা নাজায়েজ। আর সাক্ষীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে তাতো সাক্ষ্য প্রত্যাহারের অধীন হয়ে প্রমাণ হয়েছে, মৌলিকভাবে এখানে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়নি। এখানে মৌলিকভাবে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে মাত্র। যেহেতু সাক্ষ্য প্রত্যাহারের অধীনে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তাই স্বীকারোক্তি লক্ষ্যণীয় বিষয় হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ تَوْبَةٌ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষ্য প্রত্যাহার বিচারকের মজলিসের সাথে খাস হওয়ার দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করছেন। দলিলের সার এই যে, সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা মূলত মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে যে গুনাহ করেছিল তা থেকে তওবা করা। তওবার ধরন অপরাধের ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ অপরাধ/ গুনাহ যে ধরনের হয় এর তওবাও সে অনুযায়ী হয়। গুনাহ যদি প্রকাশ্য করা হয় তওবাও প্রকাশ্যে হওয়া উচিত। গুনাহ যদি গোপনে করা হয় তাহলে তওবাও গোপনে করা উচিত। যেহেতু মিথ্যা সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে সকলের সামনে হয়েছে তাই এর তওবা বিচারকের মজলিসে সকলের সামনে প্রকাশ্যে হতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু বিচারকের মজলিস ছাড়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা সহীহ নয় এজন্য যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে [বিবাদী] যদি বলে সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এবং সে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করে অথবা সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হয়ে সাক্ষীদেরকে শপথ তলব করে তাহলে বিচারক সাক্ষীদের বিরুদ্ধে বিবাদীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং সাক্ষীদেরকে শপথ করতে বলবেন না। কেননা সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং শপথ নেওয়া হয় যদি দাবি সহীহ হয়। অথচ আলোচ্য সুরতে বিবাদীর দাবিই সঠিক নয়। কারণ বিচারকের মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এরূপ দাবি সঠিক নয়। যেহেতু দাবিটি বাতিল তাই উক্ত দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য বাতিল এবং সাক্ষ্যের পরিবর্তে শপথ দাবি করাও বাতিল।

অবশ্য যদি বিবাদী এরূপ দাবি করে যে, সাক্ষীরা অমুক বিচারকের সামনে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এবং বিচারক আমার ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছেন। অতঃপর সে সাক্ষী হাজির করে। আর সাক্ষীরা বলে যে, অমুক বিচারকের সামনে তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে। অতঃপর তাদেরকে বিচারক বিবাদীর জরিমানা আদায় করতে বলেছেন। কিন্তু সাক্ষীরা আমার জরিমানা এখনো পরিশোধ করেনি। এক্ষেত্রে বিচারক বিবাদী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। কেননা এ অবস্থায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহীহ দাবির বিপরীতে পেশ করা হয়েছে। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, দাবি সঠিক হলে এর পক্ষে উত্থাপিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়।

قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّسْبِيْبَ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّيْ سَبَبُ الضَّمَانِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَقَدْ سَبَّبَا لِلْإِتْلَافِ تَعَدِّيًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَضْمَنَانِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيْبِ عِنْدَ وُجُوْدِ الْمُبَاشَرَةِ قُلْنَا تَعَذَّرَ إِيْجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُوَ الْقَاضِيْ لِأَنَّهُ كَالْمُلْجَإِ إِلَى الْقَضَاءِ وَفِيْ إِيْجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلُّدِهِ وَتَعَذَّرَ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِيْ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَاضٍ فَاعْتُبِرَ التَّسْبِيْبُ وَإِنَّمَا يَضْمَنَانِ إِذَا قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا لِأَنَّ الْإِتْلَافَ بِهِ يَتَحَقَّقُ وَلِأَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ أَخْذِ الْعَيْنِ وَإِلْزَامِ الدَّيْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দুজন সাক্ষী [কারো বিপক্ষে] মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর বিচারক সে মাল প্রদান করার জন্যে [বিবাদীর বিপক্ষে] রায় প্রদান করেন। তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা বিবাদীর মালের ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা বাড়াবাড়িমূলক কারণ তৈরি করা জরিমানার সবব। যেমন– কূপ খননকারী। আর [এখানে] মাল বিনষ্ট করার জন্যে তারা নীতি বহির্ভূত কারণ সৃষ্টি করেছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা মালের ক্ষতিপূরণের জামিন হবে না। কেননা সরাসরি কর্ম পাওয়ার সুরতে সবব বা কারণের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। আমরা বলব, কর্তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা অসম্ভব। আর কর্তা হলেন স্বয়ং বিচারক। কেননা সে রায় প্রদানে বাধ্যগত ব্যক্তির ন্যায়। আর তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করা হলে মানুষকে বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রদানের ব্যাপারে বিরত রাখা হবে এবং বাদীর কাছ থেকে তা উসুল করাও সম্ভব নয়। কেননা বিচারকের রায় কার্যকর হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে কারণ সৃষ্টি করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে। আর সাক্ষীদ্বয় তখনই দায়িত্ব নেবে যখন বাদী মাল তার দখলে নেয়। চাই সে মাল অর্থ জাতীয় হোক কিংবা দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিয়ে হোক। কেননা কবজ করার দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। তাছাড়া এজন্য যে, দৃশ্যমান নির্ধারিত বস্তু উসুল করা আর পাওনা আরোপ করার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় সুরতের সাক্ষ্য প্রত্যাহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় সুরতের প্রত্যাহার হলো বিচারক রায় প্রদানের পর সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা।

সুরতে মাসআলা হলো, দুজন সাক্ষী বিচারকের সামনে কারো বিপক্ষে মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। অর্থাৎ বলল, আব্দুল করীমের কাছে হামেদ দশ হাজার টাকা পায়। বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী আব্দুল করীমকে দশ হাজার টাকা প্রদানের রায় দিলেন। আব্দুল করীম সে টাকা হামেদ [বাদী] -কে দিয়ে দিলেন। অতঃপর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলল, আব্দুল করীমের কাছে হামেদ কোনো টাকা পায় না। আমরা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। এমতাবস্থায় সাক্ষীরা বিবাদী যে মাল বাদীকে প্রদান করেছিল সে পরিমাণ বিবাদীকে ফেরত দেবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতও তাই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ ব্যাপারে দুটি মত আছে। তাঁর বিশুদ্ধ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের অনুরূপ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি দুর্বল মত এরূপ আছে যে, সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক নয়; বরং বিচারকের উপর জরিমানা আরোপ করা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ দুর্বল মতটিকেই হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّسْبِيْبَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের দলিল উল্লেখ করছেন। দলিলের সার এই যে, অন্যায়ভাবে কারণ বা হেতু সৃষ্টি করা যেমান/ জরিমানার সবব হয়। [উল্লেখ্য যে, এখানে সবব দ্বারা উদ্দেশ্য ইল্লত, যা হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল কারণ বলে বিবেচিত হয়। যেমন– রাস্তার মধ্যে কূপ খননকারী কূপে পতিত হয়ে নিহত ব্যক্তির নিহত হওয়ার মূল কারণ। আর পতিত হওয়াটা মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ। কূপ খননকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তির যেমান দিতে বাধ্য তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদ্বয়কে বিবাদীর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা তারা অন্যায়ভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বিবাদীকে টাকা দিতে বাধ্য করেছে বা বিবাদীর ক্ষতি সাধন করেছে।]

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَضْمَنَانِ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর [দুর্বল] মতের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাক্ষীরা জরিমানা দেবে না। কারণ বিবাদীর ক্ষতি হওয়ার ক্ষেত্রে বিচারক সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন, অর্থাৎ বিচারক বিবাদীকে টাকা প্রদান করার জন্যে রায় দিয়েছেন। সুতরাং বিচারক দায়ী হবেন। এখন আর সবব খোঁজা হবে না; বরং বিচারক রায় দেওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবেন। এর উদাহরণ এরূপ যে, রাশেদ হামেদকে বলল, তুমি আব্দুল করীমের হাত কেটে দাও। হামেদ আব্দুল করীমের হাত কেটে দিল তাহলে হামেদকে দায়ী করা হবে। রাশেদকে এখানে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্যে বলা হবে না। কারণ সরাসরি হাত কেটেছে হামেদ, তাই রাশেদের হুকুম বা আদেশের এখানে কোনো ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ قُلْنَا تَعَذَّرَ إِيْجَابُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের পক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিচারক ও রায় প্রদানকারীর উপর জরিমানা আরোপ করা একটা অসম্ভব ও অন্যায় কাজ। কারণ বিচারক তো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে বাধ্যগত ব্যক্তির ন্যায়।

উল্লেখ্য যে, ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বিচারককে বাধ্যগতের মতো বলেছেন, বাধ্যগত বলেননি। কেননা সত্যিকারভাবে ঐ ব্যক্তি বাধ্যগত বলে বিবেচিত হয় যে দুনিয়াবি শাস্তির ভয় করে। আলোচ্য সুরতে বিচারক দুনিয়াবি শাস্তির ভয় করছে না, ভয় করছে আখিরাতের শাস্তির। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের ভয়ে কোনো কাজ ছেড়ে দেয় তাকে আখিরাতের ভয়ের কারণে বাধ্যগত বলা হয় না।

মোটকথা, বিচারক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করতে বাধ্যগত ব্যক্তির মতো বলে তাকে দোষী ও দায়ী করা যাবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি বিচারককে এ জাতীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বলা হয় তাহলে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নিতে কেউই এগিয়ে আসবে না। সবাই যখন বিচার পরিচালনার দায়িত্ব এড়াতে চাবে তখন সকল মানুষের ক্ষতি হবে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ঠিক রাখার ক্ষেত্রে বিরাট অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

মোটকথা, বিচার বিভাগকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে বিচারককে দায়ী করে তার উপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না। সুতরাং বিচারকের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবে কে? বাদীর উপরও ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যায় না। কেননা বিচারকের রায় কার্যকর হয়ে গেছে। এজন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার ফলে আগের রায় বাতিলের খাতায় ফেলা যাবে না। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার

করার সংবাদ তাদের প্রথম কথার চেয়ে শক্তিশালী নয়। যেহেতু প্রথম কথার চেয়ে দ্বিতীয় কথা বেশি শক্তিশালী নয় তাই প্রথম কথার মাধ্যমে যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল হবে না। অতঃপর যেহেতু বিচারকের রায় পরিবর্তন হলো না সেহেতু বাদীর জন্যে ঐ মাল ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয় যে মাল বিচাকের রায় অনুযায়ী সে লাভ করেছিল।

মোটকথা, যেহেতু বিচারকের উপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি ওয়াজিব করা যায় না এবং বাদী থেকে ফেরত দেওয়ার অবকাশও নেই। সুতরাং অন্যায়ভাবে সবব সৃষ্টি করাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে দায়ী করা হবে। অতএব যারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে ক্ষতিপূরণের সবব সৃষ্টি করেছে তাদের উপর জরিমানা আরোপের ফয়সালা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَضْمَنَانِ إِذَا قَبَضَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কখন মালের জরিমানা ওয়াজিব হবে এ সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষীরা বিবাদীকে তখনই জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য হবে যখন তাদের প্রদানকৃত মাল বাদী গ্রহণ করবে এবং তার কবজায় নিয়ে নেবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, দাইন ও আইন উভয় প্রকার মাল এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দাইন (دَيْن) বলা হয় যা জিম্মায় ওয়াজিব হয়। যেমন– স্বর্ণ, রুপা ও কাগজের মুদ্রা ইত্যাদি। আর আইন (عَيْن) বলা হয় বস্তুগত দৃশ্যমান মাল, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। বাদী তার কবজায় নিলে সাক্ষীদের উপর জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক হওয়ার দলিল হলো, সাক্ষীরা বিবাদীকে মাল ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে এ কারণেই বাধ্য হয় যে, তারা তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার দ্বারা বিবাদীর মাল বিনষ্ট করেছে। আর বিবাদীর মাল নষ্ট হয়েছে– এটা তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন বাদী বিবাদীর মাল কবজ করেছে। যদি বাদী কবজ না করে; বরং মাল বিবাদীর হাতেই থেকে যায় তাহলে তা নষ্ট হয়েছে– এটা কেউ বলবে না। সুতরাং যেহেতু বাদী কবজ করার পরই বিবাদীর মাল নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সাক্ষীরা তখন মালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে, এর আগে নয়।

এর দ্বিতীয় দলিল হলো, যেমান বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শর্ত হলো যার যেমান ওয়াজিব হবে তা সাদৃশ্যপূর্ণ (مُمَاثِلٌ) হতে হবে। অথচ যদি কবজ -এর আগে সাক্ষীদের উপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্ত করা হয় তাহলে مُمَاثَلَتْ পাওয়া যায় না। আর তা এভাবে যে, সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাদীর উপর যা ওয়াজিব করে তা হলো দাইন (دَيْن) তথা مَا وَجَبَ فِى الذِّمَّةِ [যা জিম্মায় ওয়াজিব হয়]। সুতরাং যদি বাদী বিবাদীর মাল কবজ করার পূর্বে সাক্ষীদেরকে বিবাদীর মালের জামিন বানানো হয় তাহলে তাদের দাইনের জামিন বানানো হবে। অথচ বিবাদী পরবর্তীতে সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যা আদায় করবে তা হলো আইন বা নির্দিষ্ট বস্তু। ফলে যেন এমন হলো যে, সাক্ষীরা তাদের উপরে ওয়াজিব দাইনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বস্তু (عَيْن) আদায় করল। অথচ দাইনের সাথে আইন -এর কোনো সাদৃশ্য নেই। যেহেতু বিনিময়ের মাঝে সাদৃশ্য নেই তাই এ অবস্থায় সাক্ষীদেরকে জামিন বানানো বা তাদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে যখন বাদী বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত বস্তু / টাকা ইত্যাদি গ্রহণ করবে তখন তা আর দাইন থাকবে না; বরং তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর সাক্ষীদের যা আদায় করা হবে তাও নির্দিষ্ট। অতএব, নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু হলো। সুতরাং তখন সাক্ষীদের জামিন বানালে কোনো সমস্যা হবে না।

মোটকথা, যেহেতু বাদী বিবাদীর প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করার আগে সাক্ষীদের জামিন বানালে একাধিক সমস্যা হয় বা জামিন বানানোই সহীহ হয় না তাই ফকীহগণ সাক্ষীদের জামিন বানানোর জন্যে বাদী কর্তৃক বিবাদীর প্রদত্ত মাল কবজ করার শর্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণনানুযায়ী দাইন ও নির্দিষ্ট বস্তু উভয়ের হুকুম এক বুঝা যায় এবং এর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে বলে বুঝা যায় না। এটা শামসুল আইম্মা আল্লামা সারাখসী (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে শাইখুল ইসলামের মতানুযায়ী দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। তাঁর মতে যে বস্তুর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা যদি নির্দিষ্ট বস্তু হয় তাহলে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে। যদিও সে বস্তু কবজ না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি সে বস্তু অনির্দিষ্ট জাতীয় হয় তাহলে তা কবজ না করা হলে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক নয়।

قَالَ : فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هٰذَا بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ نِصْفُ الْحَقِّ وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلٰثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ بَاقٍ بِالْحُجَّةِ وَالْمُتْلَفُ مَتٰى اِسْتَحَقَّ سَقَطَ الضَّمَانُ فَأَوْلٰى أَنْ يَمْتَنِعَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দুজন সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সে অর্ধেক মালের জামিন হবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তাকে সে অবস্থায় বহাল রাখা, আর যে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাকে প্রত্যাহারের উপর না রাখাই ধর্তব্য। সুতরাং যে সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে সে অর্ধেক হক বাকি রাখল, আর যদি মালের ব্যাপারে তিনজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপর কোনো যেমান নেই। কেননা যারা সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তাদের মাধ্যমে পূর্ণ হক অবশিষ্ট আছে। আর তা এ কারণে যে, অধিকার প্রাপ্তি প্রমাণের সাথে বহাল থাকে। আর যে বস্তু নষ্ট করা হয়েছে তার কোনো হকদার যদি বের হয় তাহলে নষ্টকারীর উপর যে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছিল তা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং [তিনজনের] যে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা থেকে বিরত থাকা আরো স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) সাক্ষীদের সবাই যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে; বরং একজন অথবা দুয়ের অধিক সাক্ষী থাকাবস্থায় দুজন সাক্ষী প্রত্যাহার করে কিংবা দুজন মহিলা সাক্ষীর একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রথম মাসআলা : যদি দুজন সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে আর ইতোমধ্যে বাদী-বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত মাল হস্তগত করে থাকে তাহলে প্রত্যাহারকারী সাক্ষী বিবাদীর অর্ধেক মালের জামিন হবে। উদাহরণস্বরূপ সাক্ষী দুজন সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, বাদী পাঁচ হাজার টাকা পায়। বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী পাঁচ হাজার টাকা বিবাদীকে প্রদান করতে বলেন, অতঃপর বিবাদী সেটা আদায় করে দিল এবং বাদী সে টাকা গ্রহণ করল, এখন সাক্ষীদের একজন বলল, বাদী-বিবাদীর কাছে কোনো টাকা পায় না, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। কিন্তু অপর সাক্ষী তার প্রদত্ত সাক্ষ্যের ব্যাপারে অটল থাকে তাহলে বিচারক প্রত্যাহারকারী সাক্ষীর উপর আড়াই হাজার টাকা বিবাদীকে প্রদান করতে আদেশ করবেন।

قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসআলা এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে আংশিক সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে শরিয়তের মূলনীতি। মূলনীতিটি এই যে, যদি সাক্ষীদের একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে আর অন্যজন তার প্রদত্ত সাক্ষ্যের ব্যাপারে অটল থাকে তাহলে যে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তার প্রত্যাহার শরিয়তে ধর্তব্য নয়। অবশ্য যে তার বক্তব্যে অটল আছে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

এ মূলনীতির দলিল হলো, বিবাদীর উপর বাদীর হক কমপক্ষে দুসাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। দুয়ের অধিক যদি সাক্ষী থাকে সেটা বিচারকের বিচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না। অবশ্য দুয়ের অধিক সাক্ষী থাকা অবস্থায় যেমন তিন / চারজন

সাক্ষী সাক্ষ্য দিল তখন বিচারকের রায় এবং হক প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি তিন/ চার সাক্ষীর সকলের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। কেননা তিন / চার সাক্ষী সকলের অবস্থা একই পর্যায়ের। একজনকে অপর দুজনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে যদি সাক্ষীদের কেউ তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তখন তাদের মধ্যে সমন্তরের বিষয়টি থাকে না। তখন হুকুমের সম্পর্ক অবশিষ্ট দুজনের সাথে সম্পর্কিত হয়। যদি দুজন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সে সাক্ষী তার সাক্ষ্যের উপর অটল থাকে তাকে শরিয়ত মূল্যায়ন করে, বাকি দুজনকে নয়। মোটকথা, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের অবস্থায় যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যের উপর অটল থাকে সে ধর্তব্য নয়। আর যে সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে সে ধর্তব্য হয় না। কেননা, যদি যে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাকে বিবেচনায় আনতে হয় তাহলে সাক্ষী তিনজন হওয়া অবস্থায় যে সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করতে হবে। অন্যদিকে আবার তাকে বাদ দিয়ে যে দুজন সাক্ষী আছে তাদের দ্বারা সাক্ষ্যদানের নেসাব পূর্ণ হওয়াতে বাদীর হকও ওয়াজিব হয়ে যায়। অর্থাৎ একই সাথে পুরো হক দেওয়া ও জরিমানা করা লাযেম আসে। অথচ এটা একটা হাস্যকর ও যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়।

সুতরাং এটাই যুক্তিসঙ্গত যে, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাকে আমলে না নেওয়া। এ মূলনীতিটি জামে' কবীরের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত আছে।

এ মূলনীতির আলোকে ১ম মাসআলায় যদি দুজন সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে যে প্রত্যাহার করেছে সে পুরো হক / মালের অর্ধেকের জামিন হবে। কেননা, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তার সাক্ষ্য দ্বারা অর্ধেক মাল বাকি থাকে। কেননা দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে পুরো মাল ওয়াজিব হয়। সুতরাং একজনের দ্বারা অর্ধেক মাল ওয়াজিব হয়েছে। এজন্যই তো যদি সাক্ষীদের উভয়ে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মাল জরিমানারূপে প্রদান করতে হয়। সুতরাং যদি একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপর অর্ধেক মালের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর অপরজন তার সাক্ষ্যসহ অর্ধেক মালের উপর বহাল থাকবে।

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে একটি আপত্তি খুব স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে যে, একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে একজন সাক্ষী বাকি থাকে। আর একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অর্ধেক মালের ফয়সালা দেওয়া আমাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যে সাক্ষ্য এখন বহাল আছে তা একজনের সাক্ষ্য, আর একজনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না। যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় একজনের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় না, তাই পরবর্তী অবস্থাতেও একজনের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ আলোচ্য মাসআলায় একজনের সাক্ষ্য অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেও এর দ্বারা অর্ধেক মাল প্রমাণ করা হচ্ছে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, প্রাথমিক অবস্থার তুলনায় বহাল থাকার অবস্থা সহজ ও এর বিধানও তুলনামূলক হালকা। এজন্য এটা খুব সম্ভব যে, একটা বিষয় প্রাথমিক অবস্থায় জায়েজ হয় না; কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেই অবস্থায় তা জায়েজ হয়ে যাবে। এর উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তির অংশীদারি ব্যবসায় একটা অংশ রয়েছে, যা এককভাবে নেসাব পরিমাণ নয়; কিন্তু তার পার্টনারের অংশ মিলালে সেটা নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অংশ তার অংশীদারের অংশ সহ নেসাব পরিমাণ হওয়াতে এর জাকাত প্রদান করতে হবে। অতঃপর একবছর নেসাবের পরিমাণ মাল ছিল। বছরান্তে দেখা গেল যে, তার এক অংশে নেসাব পরিমাণ মাল নেই। কারণ আরেক অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের বিধান হলো যে মাল তার কাছে বর্তমানে বিদ্যমান এর থেকে জাকাত প্রদান করতে হবে। এখানে লক্ষণীয় হলো, জাকাতের নেসাবের একটা অংশ তো প্রাথমিক অবস্থায় নেসাব হওয়া কিংবা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না; কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতিতে একটা অংশের জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রাথমিক অবস্থার হুকুমের সাথে পরবর্তী অবস্থার হুকুমের

কখনো কখনো পার্থক্য হয়। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় প্রাথমিক অবস্থায় একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হলেও পরবর্তীতে একজনের মাধ্যমে সাক্ষ্য বহাল থাকে এবং সেটা গ্রহণযোগ্যও হয়।

দ্বিতীয় মাসআলা : সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির বিপক্ষে তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা পায়। অতঃপর তিন সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর কোনো জরিমানা প্রদান করতে হবে না। কেননা যারা সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তারা দুজন নেসাবে শাহাদাত। তাদের মাধ্যমে পুরো হক/মাল ওয়াজিব হয়ে যায়। যেহেতু দুজন সাক্ষী এখনো তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তাই তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদী কর্তৃক বাদীকে পুরো মাল দেওয়ার বিধান বহাল থাকবে এবং প্রত্যাহারকারী সাক্ষীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِسْتِحْقَاقَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দলিল বর্ণনা করছেন। দলিলের সারকথা হলো, যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাতে বাদীর অধিকারের দাবি পূর্ণ দলিলের সাথে বাকি আছে। অর্থাৎ প্রত্যাহারকারী সাক্ষী ছাড়া অন্য দুজন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে যার দ্বারা বাদী তার হক লাভ করবে। যেহেতু সাক্ষ্য দ্বারা বাদী পূর্ণ হক লাভ করছে সুতরাং প্রত্যাহারকারী সাক্ষীর উপর কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে না। তার প্রমাণস্বরূপ মুসান্নিফ (র.) আরেকটি দলিল পেশ করছেন। তা যদি কেউ কারো মাল নষ্ট করে অতঃপর বিচারক মাল বরবাদকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা প্রদানের রায় দেন। অতঃপর এ মালের কোনো হকদার পাওয়া গেল। সে বরবাদকারীর থেকে তার জরিমানা আদায় করল। সুতরাং মালিকের জন্য যে জরিমানা বিচারকের রায়ের মাধ্যমে ওয়াজিব করা হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে।

আলোচ্য মাসআলায় যখন দুজন অবশিষ্ট সাক্ষী দ্বারা বাদীর পক্ষে পুরো হক/ মাল প্রমাণিত হয়ে গেল, তাহলে প্রত্যাহারকারী সাক্ষীর উপর উপরের মাসআলার বিবরণ অনুযায়ী কোনোভাবেই জরিমানা আসবে না। অর্থাৎ যেহেতু হকদার বের হলে জরিমানা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং হকদার বের না হওয়ার সুরতে আরো ভালোভাবে জরিমানা আরোপ হবে না। কেননা জরিমানা আরোপিত হওয়ার পর তা বাতিল হওয়ার তুলনায় জরিমানা আরোপ না হওয়া সহজ।

উপরের মাসআলার সুরত এই যে, খালেদ নামের এক ব্যক্তি রাশেদের মাল নষ্ট করল। অতঃপর বিচারক খালেদের [নষ্টকারীর] বিপক্ষে এ ফয়সালা দিলেন যে, সে যেন রাশেদকে জরিমানা প্রদান করে; কিন্তু ইতোমধ্যে আরিফ নামের এক ব্যক্তি এসে নষ্টকৃত মালের মালিকানা দাবি করে বসল এবং নষ্টকারী তথা খালেদ থেকে তার মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিল যে ক্ষতিপূরণ রাশেদকে প্রদান করতে বিচারক আদেশ করেছিলেন। এখন আর এ ক্ষতিপূরণ রাশেদকে প্রদান করতে হবে না; বরং তা রহিত হয়ে যাবে।

সুতরাং অনুরূপভাবে যখন তিন সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল যেন সে তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে সাক্ষ্যের মাধ্যমে যে হক বাদীর জন্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা বাতিল করল এবং যেন বিবাদী এর হকদার হলো। এ হিসেবে প্রত্যাহারকারী বিবাদীর জন্য জামিন হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু বাদীর হক অপর দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত থাকে এজন্য বরং এটা প্রকাশ পায় যে, বাদীই এর হকদার, বিবাদী এর হকদার নয়। সুতরাং যেহেতু অবশিষ্ট দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে বাদীর হকদার হওয়া প্রমাণিত হলো তাই প্রত্যাহারকারী সাক্ষী বিবাদীর জন্য আরো ভালোভাবে জামিন হবে না।

فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفَ الْحَقِّ لِأَنَّ بِبَقَاءِ أَحَدِهِمْ يَبْقَى نِصْفُ الْحَقِّ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ إِمْرَأَةٌ ضَمِنَتْ رُبُعَ الْحَقِّ لِبَقَاءِ ثَلَثَةِ الْأَرْبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَقِّ ـ

অনুবাদ : অতঃপর [একজনের পর] আরেকজন যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে প্রত্যাহারকারী দুজন অর্ধেক হকের জামিন হবে। কেননা একজন সাক্ষ্য বহাল থাকার কারণে অর্ধেক হক এখনো বহাল আছে। আর যদি একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর একজন মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে পুরো মালের এক চতুর্থাংশের জামিন হবে। কেননা যারা সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে তাদের মাধ্যমে তিন চতুর্থাংশ মাল / হক বহাল আছে। আর যদি দুজন মহিলা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা অর্ধেক মালের জামিন হবে। কেননা একজন পুরুষের সাক্ষ্যের দ্বারা অর্ধেক হক বহাল আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الخ : আর যদি তিনজনের একজনের প্রত্যাহার করার পর আরেকজন প্রত্যাহার করে এবং একজন সাক্ষী বাকি থাকে তাহলে দুজন প্রত্যাহারকারী সাক্ষী পুরো মালের অর্ধেকের জামিন হবে। অর্থাৎ অর্ধেক মালের ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহারকারী সাক্ষী দুজন থেকে আদায় করা হবে। কেননা তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার মাধ্যমে বিবাদীর অর্ধেক মাল যেন নষ্ট করেছে। আর অর্ধেক নষ্ট করার কারণে তাদেরকে অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন : এখানে অবশ্য এ রকম একটি আপত্তির সুযোগ আছে যে, যে সাক্ষী প্রথমে তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপ না করাই উচিত। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, তিনজনের একজন যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে বাকি দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই ধর্তব্য। যে প্রত্যাহার করেছে তার সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং সে নিয়মানুযায়ী যেহেতু দুজন সাক্ষী দ্বারা সাক্ষ্যদানের নেসাব বাকি ছিল তাই কোনো কিছু তখন নষ্ট হয়নি। কিন্তু তারপর যখন দু-সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন সে পুরো হকের অর্ধেক নষ্ট করল। আর বাকি অর্ধেক মাল একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে বহাল রইল। যেহেতু তার দ্বারা অর্ধেক মাল নষ্ট হলো তাই শুধু তাকেই অর্ধেক মালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা দরকার ছিল, তার সাথে প্রথম প্রত্যাহারকারীকে শরিক করা কি ঠিক হবে?

উত্তর : এ আপত্তির জবাব হলো, যখন তিন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল তখন তিন সাক্ষীর মাধ্যমে বাদীর হক প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থাৎ বাদীর হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনজনের অবদানই সমপর্যায়ের ছিল। কিন্তু তারপর যখন একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল সে মিথ্যাবাদী, এটা প্রমাণিত হলো। কেননা দু-সাক্ষীতো তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল ছিল। অবশ্য তখন অপর দু সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার ও মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তারপর যখন দুসাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন ধরে নেওয়া হবে যে, হক নষ্ট করার ব্যাপারে প্রত্যাহারকারী দুজনেই শুরু থেকে পরিকল্পনায় শরিক ছিল। যেহেতু এরূপ একটি সম্ভাবনা আছে তাই দুজন প্রত্যাহারকারীর প্রত্যেককে সমানভাবে দায়ী করা উচিত এবং তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে যে অর্ধেক জরিমানা আরোপিত হয়েছে তাও দুজনের উপর বণ্টন করে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় জবাব হলো, বিচারের রায় দেওয়া হয়েছিল সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে প্রত্যাহারকারী দুজনেই শরিক ছিলেন। প্রথমজন যখন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখনই হক নষ্ট করার বিষয়টি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হক নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তখন ভিন্ন একটি বাধার কারণে ধর্তব্য হয়নি। আর তা হলো তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার পরও সাক্ষ্যদানের নেসাব বাকি থাকা। অতঃপর যখন আরেকজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন সে বাধা দূরীভূত হলো। এখন বাস্তবতার আলোকে উভয়কে দাবি করে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে ৩য় মাসআলার আলোচনা শুরু করছেন। সূরতে মাসআলা হলো, কোনো একটি পাওনার বিষয়ে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিল। তারপর দু-মহিলার একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তাহলে সে পুরো মালের এক চতুর্থাংশের জরিমানা দেবে। কেননা এখনো হকের পক্ষে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ্য বহাল আছে। একজন পুরুষ যেহেতু দুজন মহিলার সমকক্ষ, তাই পুরুষের দুইভাগ আর একজন মহিলার একভাগ। মোট তিনভাগ হক রয়ে যাচ্ছে। আর এক মহিলার সাক্ষ্য প্রত্যাহার দ্বারা একভাগের হক নষ্ট করা হচ্ছে, তাই একজন মহিলা চারভাগের একভাগের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِنَّ رُبُعُ الْحَقِّ لِأَنَّهُ بَقِيَ النِّصْفُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ وَالرُّبُعُ بِشَهَادَةِ الْبَاقِيَةِ فَبَقِيَ ثَلٰثَةُ الْأَرْبَاعِ وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ لِأَنَّهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا بِانْضِمَامِ رَجُلٍ -

---

অনুবাদ : আর যদি একজন পুরুষ ও দশজন মহিলা সাক্ষ্য দেয় অতঃপর আটজন মহিলা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। কেননা, যাদের অবশিষ্ট থাকার ফলে পুরো হক বহাল থাকে তারা সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে। অতঃপর যদি একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের [নয়জনের] সকলের উপর পুরো হকের এক চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা একজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা অর্ধেক হক বাকি রয়েছে, আর চারভাগের একভাগ অবশিষ্ট মহিলা দ্বারা বহাল রয়েছে। সুতরাং [মোট] বাকি রইল তিন চতুর্থাংশ। আর যদি পুরুষ সাক্ষী ও মহিলা সাক্ষীগণ [সকলে] সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী পুরুষ পুরো হকের এক ষষ্ঠভাগের জরিমানা দেবে, আর মহিলাগণ ছয়ভাগের পাঁচ অংশের জরিমানা প্রদান করবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, পুরুষের উপর অর্ধেকের জরিমানা আর মহিলাগণের উপর বাকি অর্ধেকের জরিমানা আরোপিত হবে। কেননা [সাহেবাইন (র.)-এর মতে] মহিলা সংখ্যায় [দুইয়ের] বেশি হলেও একজন পুরুষের স্থলবর্তী হয়। আর এজন্যই তাদের সাক্ষ্য পুরুষের সাথে মিলানো ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ الخ : উপরের ইবারতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাক্ষ্যদান ও তারপর তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত আরো কয়েকটি সুরতের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলার সুরত হলো, কোনো একটি হকের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দশজন মহিলা সাক্ষ্য দিল। কিন্তু পরবর্তীতে আটজন মহিলাই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। বাকি রইল দুজন মহিলা ও একজন পুরুষ সাক্ষী। এমতাবস্থায় যে আটজন মহিলা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাদের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। কেননা আট সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার পরও এত সাক্ষী বাকি আছে যাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পুরো হক বহাল আছে। উল্লেখ্য যে, একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা হক প্রমাণিত হয়। আলোচ্য সুরতে আট মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহরের পরও একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য বহাল আছে। যেহেতু বাদীর পুরো হক বহাল আছে তাই প্রত্যাহারকারী মহিলাদের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

অবশ্য ইমাম আহমদ (র.)-এর মতানুযায়ী প্রত্যাহারকারী আট মহিলার উপর চার ষষ্ঠাংশের পরিমাণ হকের জরিমানা প্রদান করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে।

আর যদি অবশিষ্ট দু-মহিলা সাক্ষীর একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সব মহিলা এক চতুর্থাংশের জরিমান প্রদান করবে। কেননা সাক্ষ্যদানের উপর একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বহাল আছে। একজন পুরুষের দ্বারা অর্ধেক হক বাকি আছে, আর একজন মহিলার দ্বারা চারভাগের একভাগ বাকি আছে। তাহলে সাক্ষ্যের মাধ্যমে মোট বাকি আছে পুরো হকের তিন চতুর্থাংশ আর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে বাদ পড়েছে চারভাগের একভাগ। অতএব, প্রত্যাহারকারী নয় মহিলা এক চতুর্থাংশের জরিমানা প্রদান করবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে দ্বিতীয় মাসআলার আলোচনা শুরু করছেন। যদি পুরুষ সাক্ষী ও দশ মহিলা সাক্ষীর সকলেই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে পুরুষ সাক্ষী ও মহিলা সাক্ষীদেরকে কত ভাগের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী পুরুষ সাক্ষী পুরো হকের ছয়ভাগের একভাগের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে, আর মহিলা সাক্ষীগণ বাকি পাঁচভাগের ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও তাই।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মত হলো, পুরুষ সাক্ষী অর্ধেক হকের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, আর বাকি অর্ধেক হকের ক্ষতিপূরণ দশ মহিলা সাক্ষীরা সম্মিলিতভাবে আদায় করবে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মহিলা সংখ্যায় বেশি হলেও তারা সবাই একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ কারণে পুরুষ সাক্ষী ছাড়া মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং দশ মহিলার সাক্ষ্য দু-মহিলার অনুরূপই হলো। এখন তাদের সকলের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে যে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হচ্ছে তা মহিলাদের উপর অর্ধেক আর পুরুষের উপর অর্ধেক এভাবে বণ্টিত হবে। অতঃপর দশ মহিলার মাঝে সে অর্ধেক সমান হারে বণ্টন করে দেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ মহিলাদের ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা বিশ হাজার টাকা বিবাদীকে প্রদান করতে বলা হলো। অতঃপর সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এখন তাদের সকলের দায়িত্বে বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশ হাজার টাকা দেওয়ার রায় প্রদান করা হলো।

সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী পুরুষ সাক্ষী দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দেবে, আর দশ মহিলা সাক্ষী এক হাজার করে দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দশ মহিলার প্রত্যেক দুজন একজন পুরুষের সমকক্ষ। এর দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বিখ্যাত একটি হাদীস। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– عَدَلَتْ شَهَادَةُ كُلِّ اِثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ 'প্রত্যেক দু-মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষ সাক্ষীর সমকক্ষ।' এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.) থেকে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেন–

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارَ فَاِنِّىْ رَأَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ ؟ فَقَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىْ وَلَا تُصَلِّىْ وَتُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَهٰذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ .

এ হাদীসের মধ্যে রাসূল ﷺ বলেছেন, দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। মোটকথা হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। সুতরাং একজন পুরুষ ও দশজন মহিলার সাক্ষ্য যেন ছয়জন পুরুষের সাক্ষ্যের মতো হলো। ছয়জন পুরুষ একত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার পর যদি তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ জরিমানা প্রদানের ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কাউকে বেশি জরিমানার দায় দেওয়া যাবে না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় প্রত্যেক দুজন মহিলা একজন পুরুষের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং একজন পুরুষ ছয়ের একের জরিমানা দেবে, আর দশজন মহিলা ছয়ের পাঁচের জরিমানা প্রদান করবে।

وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ كُلَّ إِمْرَأَتَيْنِ قَامَتَا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ نُقْصَانِ عَقْلِهِنَّ عَدَلَتْ شَهَادَةُ إِثْنَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ بِذٰلِكَ سِتَّةُ رِجَالٍ ثُمَّ رَجَعُوْا فَإِنْ رَجَعَ النِّسْوَةُ الْعَشَرَةُ دُوْنَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعُوْا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُوْنَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتْ بِشَاهِدَةٍ بَلْ هِيَ بَعْضُ الشَّاهِدِ فَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দুজন মহিলা একজন পুরুষের স্থলবর্তী হয়। রাসূল ﷺ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন– তাদের দুজনের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হয়। সুতরাং যেন এমন হলো যে, বিষয়টি সম্পর্কে ছয়জন পুরুষ সাক্ষ্য দিয়েছে। অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। আর যদি পুরুষ সাক্ষী ছাড়া বাকি দশজন মহিলাই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে উভয় মতানুযায়ী মহিলাদের উপর অর্ধেক হকের জরিমানা আরোপিত হবে। এর দলিল আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি কোনো মালের ব্যাপারে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর তারা সকলে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে জরিমানা পুরুষ সাক্ষীদ্বয়ের উপর আরোপিত হবে, মহিলার কোনো জরিমানা নেই। কেননা মহিলা মূলত সাক্ষীই নয়; বরং সে এক সাক্ষীর অংশবিশেষ মাত্র। সুতরাং তার সাথে হুকুমের সম্পর্ক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعَ النِّسْوَةُ الْعَشَرَةُ الخ : আর যদি দশ মহিলা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে; কিন্তু পুরুষ সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করে তাহলে মহিলারা সকলে মিলে অর্ধেক হকের জরিমানা প্রদান করবে। এটা সব ইমামের ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত। কেননা ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যের উপর বহাল থাকে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, আর যারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ মূলনীতি অনুযায়ী অবশিষ্ট একজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যানুযায়ী অর্ধেক হক ওয়াজিব হবে। বাকি অর্ধেক হকের জরিমানা প্রদান করবে অন্যান্য মহিলা সাক্ষীগণ। কেননা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে অর্ধেক হক নষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ الخ : এখানে আরেকটি মাসআলার সুরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা সকলেই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে দুজন পুরুষের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। প্রত্যাহারকারী মহিলার উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। কারণ, প্রত্যাহারকারী মহিলা একজন। আর এক মহিলা সাক্ষী হতে পারে না। সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য দুজন মহিলা শর্ত। একজন মহিলা একটা সাক্ষ্যের অর্ধেক বলে বিবেচিত হয়। বিচারকের রায় একজন সাক্ষীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। একটা সাক্ষ্যের অংশবিশেষের প্রতি বিচারকের সাক্ষ্য সম্পর্কিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য সুরতে এক মহিলার সাক্ষ্যের সাথে বিচারকের রায় সম্বন্ধযুক্ত হয়নি। যেহেতু সাক্ষ্য সম্বন্ধযুক্ত হয়নি তাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার সুরতে মহিলার উপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না।

قَالَ : وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلٰى اِمْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَكَذٰلِكَ إِذَا شَهِدَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ عِنْدَ الْإِتْلَافِ لِأَنَّ التَّضْمِيْنَ يَسْتَدْعِي الْمُمَاثَلَةَ عَلٰى مَا عُرِفَ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِ لِأَنَّهَا تَصِيْرُ مُتَقَوَّمَةً ضَرُوْرَةَ الْمِلْكِ إِبَانَةً لِخَطَرِ الْمَحَلِّ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি দুজন সাক্ষী একজন মহিলার 'মহরে মিছিল'-এর বিনিময়ে বিবাহ হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর সাক্ষী দুজন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। তদ্রূপ যদি তারা 'মহরে মিছিল'-এর কমে বিবাহ হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয়। কেননা বিনষ্ট হওয়ার সময় বিশেষ অঙ্গের সুবিধাদির মূল্যমান নির্ণয় করা যায় না। কারণ, ক্ষতিপূরণ আরোপ করার জন্য বস্তুটি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া দরকার। বিষয়টি ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া কোনো বিষয়ের ক্ষতিপূরণ আরোপ করা ও মূল্যমান নির্ধারিত হয় মালিক হওয়ার দ্বারা। কেননা মালিকানার অবস্থায় মহলের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনের খাতিরে মূল্যমানসম্পন্ন হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ الخ : মাসআলার সুরত হলো, একজন পুরুষ দাবি করল যে, অমুক মহিলার সাথে তার বিবাহ হয়েছে। অতঃপর মহিলা অস্বীকার করলে সে দুজন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীরা বিবাহ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং বিচারকও বিবাহ সংঘটিত হয়েছে বলে রায় প্রদান করলেন। পরবর্তীতে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলল, আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। তাদের এ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার দ্বারা বিবাহ রহিত হবে না এবং তারা কোনো কিছু প্রদান করার ব্যাপারে জামিনও হবে না। বিবাহ রহিত না হওয়া সম্পর্কিত মাসআলা হিদায়া কিতাবের ২য় খণ্ডে فَصْلٌ فِيْ نِكَاحِ الْمُحَرَّمَاتِ 'মাহরাম মহিলার বিবাহ' অনুচ্ছেদের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি বিচারক মিথ্যা সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো ফয়সালা প্রদান করেন তাহলে বিচারকের রায় জাহেরী ও বাতেনী উভয় উপায়ে কার্যকর হয়ে যাবে। অর্থাৎ রায় প্রদানের পর যদি সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে রায় প্রত্যাহার করা হবে না; বরং বিচারকের প্রদানকৃত রায় বহাল থাকবে।

সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় বিচারক বিবাহ সংঘটিত হওয়ার যে রায় প্রদান করেছিলেন তা সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার পরও বহাল থাকবে। যদিও সাক্ষ্য প্রত্যাহারের দ্বারা রায়ের সাক্ষ্য মিথ্যা ছিল প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু রায় প্রত্যাহার করা হবে না।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হলো, সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে মহিলার যে ক্ষতি করেছে এর ক্ষতিপূরণ তাদের উপর কেন আরোপ করা হবে না?

উত্তর : এর জবাব হলো, সাক্ষীরা মহিলার مَنَافِعِ بُضْعٍ বা বিশেষ অঙ্গের সুবিধাকে নষ্ট করেছে। আগে মহিলা مَنَافِعِ بُضْعٍ -এর মালিক ছিল। সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে তার হককে নষ্ট করেছে। এখন মহিলা আর তার مَنَافِعِ بُضْعٍ -এর মালিক নয়। এখন তার মালিক হলো অন্য পুরুষ। সুতরাং সাক্ষীরা মহিলার ক্ষতি করেছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু যে অবস্থায় সাক্ষীরা مَنَافِعِ بُضْعٍ -এর ক্ষতি করেছে সে অবস্থায় এটি মূল্যমানসম্পন্ন নয়। নিয়ম হলো, যে বস্তু মূল্যমানসম্পন্ন হয় না এর

ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। যেহেতু مَنَافِع بُضْع মূল্যমানসম্পন্ন নয়, তাই এটি নষ্ট করার কারণে সাক্ষীদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে না।

অবশ্য স্বাভাবিকভাবে এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, مَنَافِع بُضْع মূল্যমানসম্পন্ন নয় কেন?

এর উত্তর হলো, কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ আরোপ করার দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, যে বস্তুর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছে সে বস্তু এবং ক্ষতিপূরণের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। অথচ مَنَافِع بُضْع এবং এর ক্ষতিপূরণ যাকে সাব্যস্ত করা হবে এ দুয়ের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই। কেননা যে বস্তু ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে তা হলো عَيْن ; আর যার ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো مَنْفَعَتْ , যা عَرَض ; عَيْن আর مَنْفَعَتْ -এর মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য নেই। মোটকথা, যেহেতু عَيْن ও مَنْفَعَتْ -এর মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই তাই مَنَافِع بُضْع -এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর যে বস্তুর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যায় না তা غَيْر مُتَقَوَّمْ বা মূল্যমানসম্পন্ন হয় না। সুতরাং مَنَافِع بُضْع মূল্যমানসম্পন্ন না হওয়া প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যেহেতু مَنَافِع بُضْع -এর মূল্য সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় তাই এর মালিক হওয়ার সুরতেও মূল্য সাব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই তাই উভয়ের হুকুম এক রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এক সুরতে এটা মূল্যমানহীন সাব্যস্ত হলে অন্য সুরতেও সেটা মূল্যমানহীনই হবে। কিন্তু সকলের মতে যখন স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন তখন তার বিশেষ অঙ্গ মূল্যমানসম্পন্ন (مُتَقَوَّمْ) সাব্যস্ত হয়। তখন স্বামীর জন্য মহর অবধারিত হয়।

উত্তর : এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যখন এর উপর অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হয় তখন এর মর্যাদা প্রমাণের জন্যে শরিয়ত এর একটি মূল্য সাব্যস্ত করে। কেননা এ অঙ্গের মাধ্যমে মানুষের বংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অঙ্গটি মানবজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গের মধ্যে গণ্য হয়। এজন্য মালিকানার অবস্থায় এটা মূল্যমানসম্পন্ন সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে যখন এর উপর মালিকানা থাকে না তখন এটা মানবজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় না, তাই তখন এর মূল্যমানসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য যে, এটা ছাড়াও মালিকানার সময় কিছু বিষয় শর্ত থাকে যা মালিকানা চলে যাওয়ার অর্থাৎ তালাক দেওয়ার সময় শর্ত হয় না যেমন– مَنَافِع بُضْع স্বামীর মালিকানায় স্ত্রী যাওয়ার সময় অর্থাৎ বিবাহের সময় ওলী ও সাক্ষীগণের শর্ত রয়েছে। অন্যসময় এরূপ কোনো শর্ত নেই । মোটকথা মালিকানার অবস্থায় হুকুম অন্য অবস্থার তুলনায় সব সময় এক হয় না।

وَكَذٰلِكَ إِذَا شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ بِتَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ بِعِوَضٍ لِمَا أَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوَّمٌ حَالَ الدُّخُوْلِ فِى الْمِلْكِ وَالْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كُلَّا إِتْلَافٌ وَهٰذَا لِأَنَّ مَبْنَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْإِتْلَافِ بِعِوَضٍ وَبَيْنَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ـ

অনুবাদ : অনুরূপভাবে যদি কোনো এক ব্যক্তি মহরে মিছিলের বিনিময়ে কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে এ মর্মে দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়। কেননা এতে বিনিময় আছে এমন বস্তুকে নষ্ট করা হয়েছে। কারণ, মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অবস্থায় বিশেষ অঙ্গটি মূল্যমানসম্পন্ন সাব্যস্ত হয়। আর বিনিময়ের বিপরীতে নষ্ট করা নষ্ট না করার মতো। আর তা এ কারণে যে, ক্ষতিপূরণের ভিত্তি সাদৃশ্য থাকার উপর। বিনিময়ের বিপরীতে কোনো কিছু নষ্ট করা এবং বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু নষ্ট করার মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই। আর যদি সাক্ষী দুজন মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি বিনিময়ে বিবাহ হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা দুজন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে অতিরিক্ত বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। কেননা তারা অতিরিক্ত অংশ বিনিময় ছাড়া নষ্ট করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ إِذَا شَهِدَا عَلٰى الخ : ইবারতের মাসআলাটি আগের মাসআলার বিপরীত। মাসআলাটি হলো, এক মহিলা একজন পুরুষের বিপক্ষে এ মর্মে দাবি করল যে পুরুষ তাকে বিবাহ করেছে। সে বলল, এ পুরুষের সাথে আমার মহরে মিছিলের বিনিময়ে বিবাহ হয়েছে। পুরুষ লোকটি অস্বীকার করে বলল, আমি তাকে বিবাহ করিনি। অতঃপর দুজন সাক্ষী মহিলার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য দিল। বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী আদালতে মহরে মিছিলের বিনিময়ে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার রায় প্রদান করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার কারণে বিবাহ রহিত হবে না এবং সাক্ষীদের উপর মহরে মিছিলের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার রায়ও দেওয়া হবে না।

বিবাহ রহিত না হওয়ার কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণিত মাসআলায় উল্লেখ করেছি তাই এখানে পুনর্বার তা উল্লেখ করা হলো না। তবে প্রত্যাহারকারী সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ না করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, সাক্ষীরা স্বামীর মহরে মিছিলের পরিমাণ মাল তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে নষ্ট যে করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মহরে মিছিলের বিনিময়ে তারা স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ সম্ভোগ করার অধিকার স্বামীর জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। আর স্বামীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় যেহেতু বিশেষ অঙ্গের সম্ভোগ মূল্যমানসম্পন্ন হয় তাই মহরে মিছিলকে এর বিনিময় সাব্যস্ত করা এবং একে মহরে মিছিলের বিনিময় সাব্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

মোটকথা, যদিও সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বামীর মহরে মিছিল পরিমাণ মাল নষ্ট করেছে; কিন্তু মহরে মিছিলের বিনিময়ে স্বামীর একজন মহিলার বিশেষ অঙ্গ ভোগ করার অধিকার অর্জিত হয়েছে। অতএব, স্বামীর ক্ষতি إِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ হলো। অর্থাৎ ক্ষতির বিনিময়ে অন্য কিছুর অধিকার অর্জিত হলো। যেহেতু إِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষতিই নয় তাই এর কারণে সাক্ষীদ্বয়ের উপর জরিমানা আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّ مَبْنَى الضَّمَانِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ-এর সাথে اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ-এর যে কোনো সাদৃশ্য নেই তা বর্ণনা করেছেন। اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ প্রমাণিত হলে এর জরিমানা প্রদান করা নসের দ্বারা ওয়াজিব হয়। কিন্তু اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ যেহেতু اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ-এর অনুরূপ নয় তাই এটা পাওয়া গেলে এর জরিমানা প্রদান করা ওয়াজিব হবে না।

اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ-এর অবস্থায় জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, এক ব্যক্তি রাশেদের দশ কেজি চাল নষ্ট করে দিল। রাশেদ সেই ব্যক্তি থেকে এর বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করল না; বরং বিচারকের কাছে এর ক্ষতিপূরণ দাবি করল। এমতাবস্থায় বিচারক ঐ ব্যক্তিকে রাশেদের ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করবেন।

মোটকথা, اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ-এর সুরতে যেহেতু ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না তাই আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করা হবে না। কেননা সাক্ষীরা যদিও স্বামীর মহরে মিছিল পরিমাণ মাল নষ্ট করেছে; কিন্তু স্বামী তো এর বিনিময়ে বিশেষ অঙ্গের মালিকানা লাভ করেছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ شَهِدَا بِاَكْثَرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি সাক্ষীদ্বয় মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি মহরে বিবাহ করেছে বলে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা অতিরিক্ত মহরের জরিমানা প্রদান করবে।

সূরতে মাসআলা হলো, এক মহিলা কোনো পুরুষের বিপক্ষে এ দাবি করল যে, পুরুষটি তাকে মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। উদাহরণস্বরূপ মহিলার মহরে মিছিল হলো দশ হাজার টাকা, মহিলা দাবি করল যে, লোকটি তাকে পনের হাজার টাকার বিনিময়ে বিবাহ করেছে। কিন্তু পুরুষ লোকটি পুরো বিষয়টি অস্বীকার করল। অতঃপর দুজন সাক্ষী মহিলার দাবির অনুকূলে সাক্ষ্য দিল যে, মহিলাকে পনের হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। অতঃপর বিচারক সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারের রায় প্রদান করল। পরবর্তীতে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ রহিত হবে না, তবে সাক্ষীরা মহরে মিছিলের চেয়ে যে পাঁচ হাজার টাকা বেশি মহর হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কেননা মহরে মিছিল তথা দশ হাজার টাকার ক্ষতি তো اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ আর اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ-এর সুরতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি যে পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতি তারা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে করেছে সেটা اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ হয়েছে। আর اِتْلَافٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ-এর ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেহেতু ওয়াজিব, তাই সাক্ষীরা পাঁচ হাজারের জরিমানা প্রদান করবে। পাঁচ হাজার টাকা اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ এজন্য যে, পাঁচ হাজারের বিনিময়ে স্বামীর কোনো কিছু অর্জিত হয়নি। স্বামী তো মহিলার বিশেষ অঙ্গের মালিকানা দশ হাজার টাকার বিনিময়েই হাসিল করেছে। অতএব, পাঁচ হাজার টাকা اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ হয়েছে।

قَالَ : وَاِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اَوْ اَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا لِاَنَّهُ لَيْسَ بِاِتْلَافٍ مَعْنًى نَظْرًا اِلَى الْعِوَضِ وَاِنْ كَانَ بِاَقَلَّ مِنَ الْقِيْمَةِ ضَمِنَا لِنُقْصَانِ لِاَنَّهُمَا اَتْلَفَا هٰذَا الْجُزْءَ بِلَا عِوَضٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ بَاتًّا اَوْ فِيْهِ خِيَارُ الْبَائِعِ لِاَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُضَافُ الْحُكْمُ عِنْدَ سُقُوْطِ الْخِيَارِ اِلَيْهِ فَيُضَافُ التَّلَفُ اِلَيْهِمْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সাক্ষীদ্বয় বাজারমূল্য কিংবা তার চেয়ে বেশি মূল্যে কোনো কিছু বিক্রি হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না। কেননা বিনিময়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা মর্মার্থের বিবেচনায় ক্ষতিসাধন হয়নি। আর যদি তারা বাজারমূল্যের কমের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে কম পরিমাণের ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা তারা এ অংশটি বিনিময় ছাড়া নষ্ট করেছে। উল্লেখ্য যে, বেচাকেনা অনিবার্য হওয়া অথবা এতে বিক্রেতার এখতিয়ার থাকার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সবব হলো পূর্ববর্তী বিক্রি। সুতরাং এখতিয়ার রহিত করার অবস্থায় হুকুম এর প্রতি সম্বন্ধ করা হবে। সুতরাং বিনষ্ট করার বিষয়টি তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ الخ : ইবারতের মাসআলার স্বরূপ এই যে, হামিদ নামের এক ক্রেতা দাবি করল যে, রাশেদ তার গোলাম [যার বাজারমূল্য একহাজার টাকা] আমার কাছে একহাজার কিংবা দেড়হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। কিন্তু বিক্রেতা অস্বীকার করে বলল, আমি এটা বিক্রি করিনি। অতঃপর ক্রেতা সাক্ষী পেশ করল সাক্ষীরা বাদীর দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য দিল। তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারক রায় প্রদান করলেন। কিন্তু সাক্ষীরা পরবর্তীতে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিক্রেতার যে ক্ষতি করেছে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। কেননা আলোচ্য সুরতে যদিও বিক্রেতার গোলাম তার হাতছাড়া করার মাধ্যমে সাক্ষীরা তার ক্ষতি করেছে; কিন্তু এর বিনিময়ে তো বিক্রেতা গোলামের মূল্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং এটা اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ হলো। আর ইতঃপূর্বে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ-এর সুরতে مُتْلِفٌ বা বিনষ্টকারীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় না। কারণ, اِتْلَافٌ بِالْعِوَضِ মূলত عَدَمُ اِتْلَافٍ-এর পর্যায়ের। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে না।

অবশ্য যদি ক্রেতা গোলামটিকে বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে খরিদ করেছে বলে দাবি করে আর সাক্ষীরা তার দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করে। যেমন ক্রেতা একহাজার টাকা মূল্যের গোলাম পাঁচশত টাকায় খরিদ করেছে বলে দাবি করল। এমতাবস্থায় সাক্ষীদের উপর বাজারমূল্যের চেয়ে যে পরিমাণ কম বলা হয়েছে সে পরিমাণ টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। আলোচ্য সুরতে সাক্ষীরা পাঁচশত টাকার জরিমানা বিক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। কেননা গোলামের যে অংশ পাঁচশত টাকার বিনিময়ে সাব্যস্ত হয় তারা এর اِتْلَافٌ করেছেন যা মূলত اِتْلَافٌ بِلَا عِوَضٍ হয়েছে। অর্থাৎ গোলামের প্রকৃত মূল্য হলো একহাজার; কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের কারণে বিক্রেতা মাত্র পাঁচশত টাকা পেয়েছে। সুতরাং সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিক্রেতার পাঁচশত টাকা নষ্ট করেছে। যেহেতু তারা বিক্রেতার পাঁচশত টাকা নষ্ট করেছে তাই তারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, সাক্ষীদের উপর বাজারমূল্যের কমের সুরতে যে ক্ষতিপূরণ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে তা বেচাকেনা কার্যকর হওয়ার অবস্থায় যেমন দিতে হবে, তদ্রূপ বেচাকেনা বিক্রেতার এখতিয়ারের উপর মওকুফ থাকা অবস্থাতেও দিতে হবে।

মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতের মাধ্যমে একটি লুক্কায়িত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, সাক্ষীদের উপর বাজারমূল্যের কমের সুরতে যে জরিমানা আরোপ করার কথা বলা হয়েছে তা বিক্রেতার এখতিয়ার থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য না হওয়া উচিত। কেননা এ অবস্থায় সাক্ষীরা মূলত বিক্রেতার কোনো ক্ষতি করেনি। কেননা সাক্ষীরা এমন একটি বেচাকেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে যা তখনও কার্যকর হয়নি। বেচাকেনাটি বিক্রেতার মতামতের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর নিয়ম হলো, বেচাকেনায় যদি বিক্রেতার এখতিয়ারের শর্তারোপ করা হয় তাহলে বিক্রয়পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয় না। সুতরাং আলোচ্য সুরতে যেহেতু বিক্রেতার এখতিয়ারের শর্ত রয়েছে তাই সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য বিক্রেতার বিপক্ষে দেওয়া সত্ত্বেও গোলাম [বিক্রয়পণ্য] বিক্রেতার মালিকানায় বহাল আছে। অতঃপর যখন এখতিয়ারের মেয়াদ তিনদিন শেষ হয়ে গেল এবং বিক্রেতা চুপ রইল তখন বিক্রয়টি কার্যকর হলো ফলে বিক্রয়পণ্য তার মালিকানাধীন রইল না। যেহেতু বিক্রেতা তার এখতিয়ারের সময়টিতে চুপ থেকেছে এবং বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে রহিত করেনি তাই বুঝা যায় যে, বিক্রেতা উক্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল। বাজারমূল্যের চেয়ে কমে পণ্যটি সে ইচ্ছাকৃতভাবেই ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যেন কোনো ক্ষতি করেনি; বরং বিক্রেতা স্বেচ্ছায় এ সবই করেছে। অতএব, বিক্রেতার এখতিয়ার থাকার সুরতে সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য বিক্রয় [যাতে বিক্রেতার এখতিয়ার রয়েছে] যদিও বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্যটিকে বের করে দেয়নি এবং বিক্রেতা তার ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার সে ক্ষমতার প্রয়োগ না করে স্বেচ্ছায় তার ক্ষতি মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ এখতিয়ারের তিনদিনের মেয়াদে সে বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং নিজ ক্ষতিকে মেনে নিয়েছে। তাছাড়া বিক্রেতার নিজ ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া সাক্ষীদের ক্ষতিপূরণ আরোপ করে না তদুপরি বিক্রয়পণ্যের উপর থেকে বিক্রেতার মালিকানা চলে যাওয়ার সবব; কিন্তু সেই প্রথম বিক্রয়টি, অন্য কিছু নয়। আর সে বিক্রিটি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমেই কার্যকর হয়েছে। অতএব, খিয়ারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিক্রয়পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রথম বিক্রিটিকেই চিহ্নিত করা হবে যাকে সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মোটকথা, যেহেতু বিক্রেতার মালিকানা রহিত হওয়ার সবব; প্রথম বিক্রিটি, আর বিক্রিটি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে। অতএব, বিক্রয়পণ্য নষ্ট হওয়ার জন্যে সাক্ষীদের দায়ী করে তাদের উপর এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ফয়সালা দেওয়া হবে। তবে যেহেতু বিক্রেতা বাজারমূল্যের অর্ধেক পেয়েছে তাই বাকি অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ তাদের দিতে হবে; পূর্ণ মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

وَاِنْ شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ اَنَّهٗ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ لِاَنَّهُمَا اَكَّدَا ضَمَانًا عَلٰى شَرَفِ السُّقُوْطِ اَلَا تَرٰى اَنَّهَا لَوْ طَاوَعَتِ ابْنَ الزَّوْجِ اَوِ ارْتَدَّتْ سَقَطَ الْمَهْرُ اَصْلًا وَلِاَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِىْ مَعْنَى الْفَسْخِ فَيُوْجِبُ سُقُوْطَ جَمِيْعِ الْمَهْرِ كَمَا مَرَّ فِى النِّكَاحِ ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ اِبْتِدَاءً بِطَرِيْقِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ وَاجِبًا بِشَهَادَتِهِمَا ـ

অনুবাদ : আর যদি দুজন সাক্ষী কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে সহবাসের আগেই তালাক দিয়েছে। অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা অর্ধেক মহরের ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা তারা এমন একটি আর্থিক দায়কে নিশ্চিত করেছে যা বাতিল হওয়ার খুব কাছাকাছি ছিল। আপনি লক্ষ্য করুন যদি স্ত্রী স্বামীর ছেলেকে প্রশ্রয় দিত কিংবা মুরতাদ হয়ে যেত তাহলে মূল থেকে মহর রহিত হয়ে যেত। তাছাড়া সহবাসের আগে বিচ্ছেদ তো বিবাহ রহিত করার মতো। সুতরাং পুরো মহর বাতিল করাকে ওয়াজিব করবে। যেমনটা বিবাহ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর নতুনভাবে মুতআ হিসেবে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। সুতরাং তা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ওয়াজিব হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ الخ : মাসআলার স্বরূপ হলো, কোনো স্ত্রী এই মর্মে দাবি করল যে, তার স্বামী তাকে সহবাস বা নিভৃতে অবস্থান করার আগেই তালাক দিয়েছে। কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করল। অতঃপর দুজন সাক্ষী মহিলার দাবি অনুযায়ী সাক্ষ্য দিল যে, মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের আগেই তালাক দিয়েছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করেন যে, স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচারক তাদের মাঝে মহর নির্দিষ্ট থাকলে অর্ধেক মোহর স্ত্রীকে প্রদান করতে বলবেন, আর যদি মহর নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে মুতআ প্রদান করার আদেশ দেবেন।

কিন্তু এ রায়ের পর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল। এমতাবস্থায় যদি মহর নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সাক্ষীরা অর্ধেক মহরের জামিন হবে। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এরূপ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত এরূপ।

এর দলিল হলো, স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার অবস্থায় মহর একবারে রহিত হওয়ার একটা সম্ভবনা ছিল, তা এভাবে যে, যদি স্ত্রী স্বামীর আরেক স্ত্রীর যুবক ছেলের সাথে পরকীয়া করত। অর্থাৎ স্বামীর ছেলেকে তার সাথে সহবাস করার প্রশ্রয় দিত তাহলে সে পুরো মহর থেকেই বঞ্চিত হতো। মোটকথা, যে মহর সহবাসের পূর্বে স্বামীর দায়িত্বে নিশ্চিত ছিল না; বরং তা রহিত হওয়ার সম্ভাবনার মুখে ছিল। কিন্তু সাক্ষীরা তালাকের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে পুরো মহর রহিত হওয়ার সে সম্ভবনাকে বাতিল করে অর্ধেক মহর দেওয়াকে ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা সহবাস/ স্ত্রীর সাথে নিভৃতে অবস্থান করার আগে তালাক দেওয়া হলে তা অর্ধেক মহরকে ওয়াজিব করে। আর নিয়ম হলো, ওয়াজিবকারীর উপর যা লাযেম হয় মুআক্কিদ বা তাকীদকারীর উপর তা-ই লাযেম হয়। আরেক নিয়ম হলো, সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যদি কারো দায়িত্বে কোনো কিছু

লাযেম [অপরিহার্য] করে, অতঃপর তারা যে সাক্ষ্যের মাধ্যমে অপরিহার্য করেছিল সে সাক্ষ্য যদি প্রত্যাহার করে তাহলে জরিমানা সাক্ষীদের উপর আরোপিত হয়। মোটকথা, যেহেতু সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে মহর তাকীদ করেছে তাই সাক্ষীদের উপর অর্ধেক মহরের জরিমানা আদায় করতে হবে।

হিদায়া কিতাবের বিখ্যাত ভাষ্যকার ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) আলোচ্য মাসআলার দুটি নজির পেশ করেছেন–

১. প্রথম নজির হলো, যদি মুহরিম ইহরাম অবস্থায় হেরেম শরীফের কোনো শিকার ধরে অতঃপর অপর ব্যক্তি সে পশুটিকে হত্যা করে তাহলে এর জরিমানা শিকার যে ধরেছে তার উপর আরোপ করা হবে। আর সে হত্যাকারী থেকে সেই জরিমানা উসূল করে নেবে। কেননা সে হত্যা করে এর জরিমানাকে তাকীদ করেছে। যদি সে হত্যা না করত তাহলে এ সম্ভাবনা ছিল যে, মুহরিম তওবা করে শিকারটি ছেড়ে দিত। ফলে তার উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হতো না।

২. দ্বিতীয় নজির হলো, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে [যার সাথে এখানো সহবাস হয়নি] তালাক দিতে বাধ্য করল। স্বামী বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। এমতাবস্থায় স্বামীর উপর স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে অর্ধেক মহর জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য স্বামীকে যে জবরদস্তি করেছে তার থেকে সে অর্ধেক মহর পরিমাণ টাকা আদায় করে নেবে। কেননা জবরদস্তিকারী তালাক দিতে বাধ্য করে অর্ধেক মহরকে নিশ্চিত করেছে। যদি সে এরূপ না করত তাহলে এমন সম্ভবনা ছিল যে, মহিলা তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর ঘরের সন্তানের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে পুরো মহরের অধিকার হারাত, কিংবা মহিলা হয়তো ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে মুরতাদ হতো। আর তখনও সে পূর্ণ মহরের অধিকার হারাত।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) মূল মাসআলার দ্বিতীয় দলিল পেশ করেছেন। দলিলের সারকথা হলো, সহবাস করার আগে তালাক দেওয়ার অবস্থাটি বিবাহ প্রত্যাহার (فَسْخ) করার অনুরূপ। কেননা এ অবস্থায় যে অঙ্গের ব্যাপারে বিবাহ চুক্তি হয়েছে সে অঙ্গ অক্ষত ও স্পর্শহীন অবস্থায় ফিরে এসেছে। আর বিবাহ প্রত্যাহার করা হলে পুরো মহর রহিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বিবাহ অধ্যায়ের মহর পরিচ্ছেদে আলোচনা গত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, বিবাহ প্রত্যাহার করার অবস্থায় পুরো মহর কেন রহিত হয়? এর জবাব হলো, বিবাহ প্রত্যাহার করার অবস্থাটি যেন এমন যে, তাদের মাঝে বিবাহই হয়নি। অবশ্য স্বামীর উপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কারণে নতুনভাবে অর্ধেক মহর মুতআ হিসেবে ওয়াজিব হয়। সুতরাং যেন সাক্ষীদের কারণেই অর্ধেক মহর ওয়াজিব হয়। অতএব, যখন সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন তাদের কাছ থেকে অর্ধেক মহর আদায় করবে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সহবাসের আগে তালাককে মুসান্নিফ (র.) প্রত্যাহারের মতো বলেছেন– বিবাহ প্রত্যাহার তো বলেননি। এর উত্তর হলো, বিবাহ কার্যকর হওয়ার পর প্রত্যাহার হতে পারে না। তবে যেহেতু আলোচ্য সুরতে স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসল তখন এটা প্রত্যাহারের অনুরূপ হলো। প্রকৃত প্রত্যাহার এটাকে বলা যায় না। এজন্য মুসান্নিফ (র.) একে প্রত্যাহারের অনুরূপ বলেছেন।

قَالَ : وَاِنْ شَهِدَا عَلٰى اَنَّهُ اَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا قِيْمَتَهُ لِاَنَّهُمَا اَتْلَفَا مَالِيَّةَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِاَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَحَوَّلُ اِلَيْهِمَا بِهٰذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ اِلَيْهِمَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দুজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে আজাদ করেছে অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তারা গোলামের বাজারমূল্যে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেননা তারা গোলামের অর্থমূল্য কোনো বিনিময় ছাড়াই নষ্ট করেছে। আর ওলা পাবে আজাদকারী। কেননা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণে আজাদ করার বিষয় তাদের কাছে স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং তাদের প্রতি ওলা স্থানান্তর হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنْ شَهِدَا عَلٰى الخ : ইবারতের মাসআলার স্বরূপ হলো, দু ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল আরিফ নামের এক ব্যক্তি তার গোলাম [আব্দুল করীম]-কে সে আজাদ করেছে। বিচারক তাদের বক্তব্য অনুযায়ী রায় প্রদান করলেন যে, আরিফ তার গোলাম আজাদ করে দিয়েছে। কিন্তু রায় প্রদানের পর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলল, আরিফ আসলে তার গোলামকে আজাদ করেনি আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি। এ অবস্থায় গোলামের আজাদি বহাল থাকবে, অবশ্য সাক্ষীরা যেহেতু আরিফের আর্থিক ক্ষতি করেছে তাই তারা গোলামের বাজারমূল্যের পরিমাণ জরিমানা আরিফকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষীরা সম্পদশালী নাকি তারা গরিব তা লক্ষণীয় হবে না। তাদের উপর জরিমানা আরোপ করার কারণ হলো, তারা যা নষ্ট করেছে তা মূল্যমানসম্পন্ন, আর তারা বিনষ্ট করেছে কোনো বিনিময় ছাড়াই।

যেহেতু ইতঃপূর্বে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি বিনিময় ছাড়া কোনো কিছুকে নষ্ট করা জরিমানাকে ওয়াজিব করে। তাই গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা দুই সাক্ষী গোলামের মালিককে গোলামের বাজারমূল্য পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদিও জরিমানা প্রদান করবে সাক্ষীদ্বয়, কিন্তু সাক্ষীরা গোলামের ওলা [পরিত্যক্ত সম্পদ] পাবে না। ওলা পাবে গোলামের মালিক। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা যদিও আজাদ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু আজাদ করার কাজ তো মালিক দ্বারা হয়েছে। যেহেতু মালিক আজাদ করেছে, সুতরাং اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-এর নিয়মের ভিত্তিতে মালিকই ওলা পাবে। মোটকথা, গোলামের মৃত্যুর পর গোলামের সম্পত্তি যদি তার কোনো ওয়ারিশ না থাকে তাহলে পূর্বতন মালিক সে ওয়ারিশ পাবেন।

উল্লেখ্য যে, এখানে একটি আপত্তি এটা আসতে পারে যে, যেহেতু গোলামের মালিক গোলামকে আজাদ করেছে বলে অস্বীকার করছে তাই গোলামের ত্যাজ্য সম্পত্তি গোলামের মালিক না পাওয়া উচিত। মালিক যে বিষয়টি অস্বীকার করছে তার দলিল হলো, দুজন সাক্ষী গোলামের আজাদির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। যদি মালিক আজাদ করার কথা স্বীকার করত তাহলে তো সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিত না। মোটকথা যেহেতু গোলামের মালিক আজাদ করার কথা অস্বীকার করছে তাই তার ওলা পাওয়া উচিত নয়।

এর উত্তর এই যে, মালিক অস্বীকারকারী এতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচারকের রায়ের মাধ্যমে শরিয়তের দৃষ্টিতে মালিক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তিকে শরিয়ত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তার কথা ধর্তব্য নয়। সুতরাং এ মাসআলায় মালিকের কথা ধর্তব্য হবে না। যেহেতু মালিকের কথা বিবেচ্য নয় তাই মালিক আজাদ করেছে এটাই সাব্যস্ত হবে এবং ওলার অধিকার সেই প্রাপ্ত হবে।

وَإِنْ شَهِدُوْا بِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعُوْا بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يُقْتَصُّ مِنْهُمْ لِوُجُوْدِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ تَسْبِيْبًا فَاَشْبَهَ الْمُكْرِهَ بَلْ اَوْلٰى لِاَنَّ الْوَلِيَّ يُعَانُ وَالْمُكْرِهَ يُمْنَعُ وَلَنَا اَنَّ الْقَتْلَ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوْجَدْ وَكَذَا تَسْبِيْبًا لِاَنَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِيْ اِلَيْهِ غَالِبًا وَهٰهُنَا لَا يُفْضِيْ لِاَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوْبٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি সাক্ষীরা কিসাসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে দিয়তের জরিমানা প্রদান করবে। হত্যার ব্যাপারে তাদের কিসাস নেওয়া হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা হত্যার সবব হওয়ার কারণে তাদের কিসাস নেওয়া হবে। সুতরাং [তাদের হত্যা] জবরদস্তিকারীর অনুরূপ হলো; বরং তাদের হত্যার চেয়ে মারাত্মক। কেননা নিহত ব্যক্তির ওলীকে সাহায্য করা হয়। আর যাকে হত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে তাকে বাধা দেওয়া হয়। আর আমাদের দলিল হলো, সরাসরি হত্যা তো [সাক্ষীদের থেকে] পাওয়া যায়নি। তদ্রূপ [তাদের থেকে] হত্যার সবব হওয়ার বিষয়টিও পাওয়া যায়নি। কেননা সবব তো সাধারণভাবে হত্যা পর্যন্ত পৌছে দেয়। আর এখানে সাক্ষ্য হত্যা পর্যন্ত পৌছায় না। এজন্য মাফ করে দেওয়া মুস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ شَهِدُوْا بِقِصَاصٍ ثُمَّ الخ : উপরের ইবারতে যে মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে এর স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি দাবি করল যে, আমার পিতাকে খালেদ নামের এক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করেছে। কিন্তু অভিযুক্ত খালেদ তা অস্বীকার করল। অতঃপর বাদী দুজন সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে, খালেদ অমুকের পিতাকে হত্যা করেছে। বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করলেন যে, খালেদকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। খালেদকে হত্যা করার পর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। তারা বলল, খালেদ হত্যা করেনি। এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষীদেরকে বলবেন, তোমরা খালেদের উত্তরাধিকারীদের দিয়ত প্রদান করবে। দিয়ত সাক্ষীদের আকেলাদের উপর ওয়াজিব হবে। অবশ্য সাক্ষীদের থেকে কিসাস নেওয়া হবে না। ইমাম মালিক (র.) একই মত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো, সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীদেরকে কিসাসের ভিত্তিতে হত্যা করা হবে। আর ইমাম আহমদ (র.) এ মত পোষণ করেন যে, যদি সাক্ষীরা অনুতপ্ত হয়ে বলে যে, আমরা ভুলে সাক্ষ্য দিয়ে দিয়েছি তাহলেও তাদের দিয়ত পরিমাণ জরিমানা প্রদান করতে হবে। অবশ্য যদি সাক্ষীরা বলে যে, আমরা স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় এরূপ সাক্ষ্য দিয়েছি তাহলে তাদের উপর কিসাস আরোপিত হবে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিল হলো, খালেদকে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কারণে কেসাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত হত্যাকারী যেন সাক্ষীরাই। অতঃপর যদি সাক্ষীরা বলে যে, আমরা ভুলে সাক্ষ্য দিয়েছি তাহলে এটা ভুলে হত্যা (قَتْلُ خَطَاء) সাব্যস্ত হবে। আর যদি সাক্ষীরা ইচ্ছাকৃত সাক্ষী দিয়ে তা প্রত্যাহার করে তাহলে সেটা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে।

শরিয়তে ভুলক্রমে হত্যার শাস্তি দিয়ত, আর ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হলো কিসাস। সে মতে সাক্ষীরা যদি ভুলক্রমে সাক্ষ্য দিয়ে তা প্রত্যাহার করে তাহলে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর যদি সাক্ষীরা ইচ্ছাকৃত হত্যার পর তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কিসাস আরোপিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় "খালেদ হত্যার" মুসাব্বিব হলো সাক্ষীগণ। অর্থাৎ খালেদের হত্যার কারণ হলো সাক্ষীদের সাক্ষ্য। যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য না দিত তাহলে খালেদকে হত্যা করা হতো না। সাক্ষীরা কার্যত হত্যা করেনি; বরং কার্যত হত্যা করেছে নিহত ব্যক্তির ওলী / অভিভাবক।

এরূপ যদি কেউ আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে কাউকে বাধ্য করে তাহলে সে হত্যা করার মুসাব্বিব হয়। সত্যিকার হত্যাকারী সে হয় না। উদাহরণস্বরূপ খালেদ নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে রাশেদ আব্দুল করিমকে বলল, তুমি খালেদকে হত্যা কর। যদি খালেদকে হত্যা না কর তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। এ হুমকির কারণে আব্দুল করিম খালেদকে হত্যা করল। আলোচ্য সুরতে জবরদস্তিকারী / হুমকিদাতা হলো রাশেদ। সে খালেদকে হত্যা না করলেও হত্যার সবব। মোটকথা, সাক্ষী মুসাব্বিব হওয়া এবং সরাসরি হত্যাকাণ্ডে শরিক না হওয়ার ব্যাপারে জবরদস্তিকারীর অনুরূপ। জবরদস্তির সুরতে ইমামগণের ঐকমত্যের মাসআলা হলো, মুসাব্বিবকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়। সুতরাং অনুরূপভাবে হত্যার ক্ষেত্রে সাক্ষীরা যেহেতু হত্যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তারা সরাসরি হত্যা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেনি তাই তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদেরকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْوَلِيَّ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষী মুসাব্বিব হওয়ার ক্ষেত্রে জবরদস্তিকারীর চেয়ে অগ্রগামী। সাক্ষ্য সবব ও হত্যার করার প্রতি ধাবিতকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী এভাবে যে, সাক্ষ্যদানের পর হত্যাকারীর হত্যা করাটা সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আর হত্যাকারীকে কিসাসের ভিত্তিতে হত্যা করার ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে সাহায্যও করা হয়। সাধারণত কিসাসের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে কেউ কিসাস গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। পক্ষান্তরে জবরদস্তি করার ক্ষেত্রে হত্যা করাটা নিশ্চিত হয় না; বরং হত্যা না করাটা সাধারণভাবে বেশি হয়। এর ব্যাখ্যা হলো, উদাহরণস্বরূপ রাশেদ নামের এক ব্যক্তি শাহেদকে বাধ্য করল যেন সে খালেদকে হত্যা করে। শাহেদ [যাকে বাধ্য করা হয়েছে] শরিয়তের দৃষ্টিতে হত্যা করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়; সামাজিকভাবেও তাকে হত্যা করতে বাধা দেওয়া হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে বাধা এভাবে যে, শাহেদ নিজে এ কথা জানে যে, তাকে হত্যা করা আমার জন্যে নাজায়েজ ও হারাম। এজন্য সে আখিরাতের ভয়ে ও ঈমানের দাবির কারণে এরূপ অন্যায় হত্যা থেকে নিজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এছাড়া সামাজিকভাবেও এ ধরনের কাজের বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ যাকে এরূপ অন্যায় হত্যাকাণ্ডে বাধ্য করা হয় তাকে কিছুলোক এরূপ ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ করতে বাধা প্রদান করে থাকে। মোটকথা, বাধ্যগত ব্যক্তি হত্যার ব্যাপারে শরিয়ত ও সমাজ উভয় দিক থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষ্যদানের কারণে শরিয়ত ও সমাজ উভয় দিক হতে হত্যা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া যায়। সুতরাং জবরদস্তি হত্যা করার দিকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু সাক্ষ্য হত্যা করার প্রতি ধাবিত করবে। মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষ্য সবব হওয়া এবং হত্যার প্রতি ধাবিত করার ক্ষেত্রে জবরদস্তি থেকে অগ্রগামী। আর জবরদস্তির সুরতে জবরদস্তিকারী তথা মুসাব্বিবকে কিসাস হিসেবে হত্যার ফয়সালা হয়। সুতরাং সাক্ষ্যদাতা [যে মুসাব্বিব হওয়ার ব্যাপারে জবরদস্তিকারী থেকে অগ্রগামী সে,] আরো ভালোভাবে হত্যার উপযুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে আহনাফের দলিল বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আহনাফের দলিল হলো, সাক্ষ্যদাতার উপর কিসাস আরোপিত হবে না। কারণ সাক্ষ্যদাতা হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়নি। হত্যা করেছে কিসাসের ওলী বা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের উপর কিসাস আরোপিত হয় না। অথচ সে সরাসরি হত্যা করেছে। সুতরাং যেহেতু হত্যাকারী [কিসাসের ওলী]-র ব্যাপারে কিসাসের বিধান আরোপ হয় না। তাই যে কার্যত হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি [অর্থাৎ সাক্ষীগণ] তাদের ব্যাপারে হত্যার ফয়সালা কিভাবে নেওয়া যায়?

قَوْلُهُ وَكَذَا تَسْبِيبًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্ষীরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি এবং তারা হত্যার ক্ষেত্রে মুসাব্বিবও নয়। অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্যকে সবব সাব্যস্ত করা যায় না। এটা মূলত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন যে, সাক্ষীরা সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করলেও তারাতো হত্যার ক্ষেত্রে সবব সাব্যস্ত হবেন। সবব নয় এজন্য যে, সবব বলা হয় এমন কার্যকারণকে যা সাধারণত কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ مُفْضِىْ إِلَى الشَّيْءِ কোনো شَيْءٌ বা বস্তুর সবব হয়। অথচ আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সাধারণভাবে مُفْضِىْ إِلَى الْقَتْلِ হয় না। কারণ সাক্ষ্যদানের পরও নিহত ব্যক্তির ওলী হয় হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে পারে। আর মাফ করে দেওয়া মুস্তাহাবও বটে। শুধু হত্যাকারীকে নয়; বরং শরিয়তের হুকুম হলো যে কোনো ব্যাপারে ক্ষমার পথ অবলম্বন করা। যেমন যার সাথে সহবাস করা

হয়নি এমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মহরের ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদ হলো– وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى 'তোমাদের স্ত্রীর কাছ থেকে মহর না নিয়ে তার মহর মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার নিকটবর্তী কাজ।' –[সূরা বাকারা] এ আয়াতের তাফসীর হলো, যদি তৎকালীন আরবদের প্রথানুযায়ী কেউ বিবাহের সাথে সাথে স্ত্রীকে তার পূর্ণ মহর দিয়ে দেয় অতঃপর স্ত্রীকে মিলনের পূর্বে তালাক দেয় এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রী থেকে যে অর্ধেক মহর পায় সে অর্ধেক মহর মাফ করে দেয় অর্থাৎ তার স্ত্রীকে পুরো দিয়ে দেয় তাহলে সেটা তাকওয়ার কাজ বলে গণ্য হবে।

সূরা মায়েদার এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالْجُرُوْحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ 'আঘাতের বদলা আঘাত দ্বারা করা হবে। অবশ্য যদি আহত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের আঘাতের বদলা না নিয়ে মাফ করে দেয় তাহলে সেটা তার গুনাহের জন্যে কাফফারা সাব্যস্ত হবে।' হাদীসের মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ এরূপই উল্লেখ আছে।

মোটকথা, উভয় আয়াত দ্বারা মাফ করা যে প্রশংসনীয় ও মুস্তাহাব কাজ তা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া এ সম্পর্কিত অনেক হাদীসে মাফ করার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনি এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنْفَاذِهٖ مَلَاَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ اَمْنًا وَاِيْمَانًا 'যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ সে তা বাস্তবায়নের শক্তি রাখে। মহান আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির অন্তরকে নিরাপত্তা ও ঈমান দ্বারা ভরে দেন।'

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– نَادٰى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَ اُجُوْرُهُمْ عَلَى اللّٰهِ فَلَا يَقُوْمُ اِلَّا مَنْ عَفَا 'কিয়ামতের দিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে তারা কোথায় যাদের প্রতিদান প্রদানকে আল্লাহ নিজের উপর অপরিহার্য করেছেন? তখন যারা মানুষকে ক্ষমা করত তারা দণ্ডায়মান হবে।'

উপরের আয়াত দুটির মতো এ হাদীসদ্বয়ের দ্বারা মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের কাছে ক্ষমা করা যে পছন্দনীয় তা প্রমাণিত হয়।

মোটকথা, হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া মুস্তাহাব এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কাছে পছন্দনীয় কাজ বলে প্রমাণিত হলো। সুতরাং এরূপ সম্ভাবনা প্রচুর আছে যে, কিসাসের ওলী হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে। যেহেতু হত্যাকারীকে মাফ করে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর তাই সাক্ষ্য হত্যা করার প্রতি নিয়ে যাবে না। সুতরাং আলোচ্য সাক্ষ্য হত্যার সবব এবং সাক্ষীরা হত্যার মুসাব্বিব হবে না। পক্ষান্তরে যাকে হত্যা করার জন্যে জবরদস্তি করা হয় যেমন বলা হলো– তুমি যদি অমুককে হত্যা না কর তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় জবরদস্তি বা চাপপ্রয়োগ তাকে হত্যা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর বাধ্য ব্যক্তি তার নিজ জানের মায়ায় ও আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা করতে যাবে। সুতরাং জবরদস্তির সুরতে হত্যা করার সম্ভাবনা প্রবল এবং জবরদস্তি مُفْضِىْ اِلَى الْقَتْلِ সাব্যস্ত হলো। যেহেতু জবরদস্তি ও চাপপ্রয়োগ مُفْضِىْ اِلَى الْقَتْلِ হলো তাই চাপপ্রয়োগকারী ব্যক্তি মুসাব্বিব (مُسَبِّبْ) বলে বিবেচিত হবে। ইতঃপূর্বে সিদ্ধান্তাকারে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাব্বিবকে কিসাসের ভিত্তিতে হত্যা করা যায়; যে মুসাব্বিব হয় না তাকে হত্যা করা যায় না। সুতরাং সাক্ষীরা যেহেতু হত্যার জন্যে মুসাব্বিব হয়নি তাই সাক্ষীদের হত্যা করা যাবে না। পক্ষান্তরে জবরদস্তিকারী যেহেতু মুসাব্বিব সাব্যস্ত হয় তাই তাকে হত্যা করা যাবে। তাছাড়া চাপ প্রয়োগকারী ব্যক্তি মুসাব্বিব; কিন্তু সাক্ষীগণ মুসাব্বিব নয়। অতএব, চাপপ্রয়োগকারীর উপর সাক্ষীগণকে কিয়াস করা যাবে না। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) شَاهِدْ-কে- مُكْرِهْ-এর উপর যে কিয়াস করেছেন সে কিয়াস সঠিক নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, আমরা এটা স্বীকার করি যে, সাক্ষীরা হত্যাকারীকে হত্যা করার সবব হয়েছেন। কিন্তু হত্যা করার কাজটি কিসাসের অভিভাবক অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওলী করেছেন। আর কিসাসের ওলী এ কাজটি করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি হত্যা না করে ক্ষমা করে দিতে পারতেন। কোনো কাজ যদি স্বেচ্ছায়ও স্বজ্ঞানে করা হয় তাহলে সে কাজের নিসবত ঐ ব্যক্তির দিকেই করা হয়। এ কাজের দায় অন্যের উপর আরোপ করা যায় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় হত্যা করার কর্মটি কিসাসের ওলীর সাথে সম্পর্কিত হবে; সাক্ষীদের প্রতি হত্যা করার নিসবত করা হবে না।

যেহেতু قَتْل -এর নিসবত সাক্ষীদের প্রতি করা হয়নি। সুতরাং সাক্ষীরা হত্যাকারীকে হত্যা করেছে– এটা সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং সাক্ষীদেরকে কিসাসের ভিত্তিতে হত্যা করা চলবে না।

وَبِخِلَافِ الْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ حَيَاتَهُ ظَاهِرًا وَلِأَنَّ الْفِعْلَ الْاِخْتِيَارِيَّ مِمَّا يَقْطَعُ النِّسْبَةَ ثُمَّ لَا اَقَلَّ مِنَ الشُّبْهَةِ وَهِيَ دَارِئَةٌ لِلْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ وَالْبَاقِيْ يُعْرَفُ فِي الْمُخْتَلَفِ ـ

অনুবাদ : অবশ্য জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির বিষয়টি এমন নয়। কেননা সে বাহ্যিকভাবে বেঁচে থাকাকে অগ্রাধিকার দেবে। তাছাড়া স্বেচ্ছাধীন কাজ এমন যা অন্যদিকে সম্পৃক্ততাকে রহিত করে। অতঃপর এটা তো সন্দেহের চেয়ে কম নয়। অথচ সন্দেহ কিসাসকে প্রতিহত করে। মালের বিষয়টি এমন নয়। কেননা মাল তো সন্দেহ বিদ্যমান থাকা অবস্থাতে প্রমাণিত হয়। অবশিষ্ট আলোচনা [ফকীহ আবুল লাইস রচিত] মুখতালাফ (مُخْتَلَفٌ) কিতাবে জানা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا اَقَلَّ مِنَ الشُّبْهَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জবাবে তাসলীমী তথা স্বীকৃতিসূচক জবাব পেশ করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি আমরা এ কথা মেনে নেই যে, সাক্ষীদের প্রতি হত্যা করার নিসবত একেবারে বাতিল করা যায় না; বরং তারা মুসাব্বিব ছিলেন বলে তাদের প্রতি হত্যার নিসবত করা যায়। কিন্তু এ নিসবতের কারণে তাদের হত্যার শাস্তি হিসেবে কোনো দণ্ডে দণ্ডিত করা যায় না। কারণ, কতলের শাস্তির ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, হত্যার শাস্তি আরোপের জন্যে প্রমাণ সন্দেহমুক্ত হতে হয়। এ সম্পর্কে শরিয়তের প্রসিদ্ধ নীতি হচ্ছে– اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ 'হদ সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়।' আলোচ্য মাসআলায় সাক্ষীদের উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ এভাবে পাওয়া যায় যে, হত্যাকারীকে কার্যত হত্যা করেছে নিহত ব্যক্তির ওলী/ কিসাসের ওলী। আর সাক্ষীরা হলো এর সবব। সুতরাং হত্যার সবব হওয়ার কারণে সাক্ষীদেরকে হত্যাকারী বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় কিসাসের ওলীই হত্যাকারী। যেহেতু এক বিবেচনায় ওলী হত্যাকারী হলেন, আর অন্য বিবেচনায় সাক্ষীরা হত্যাকারী হলেন। সুতরাং সাক্ষীদের উপর কিসাস আরোপ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ চলে আসল। আর ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সন্দেহ দ্বারা হদ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সাক্ষীদের উপর হদ হিসেবে হত্যার শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

প্রশ্ন : অবশ্য এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে দিয়্যত হলো কেসাসের বদল। যদি সন্দেহের কারণে কিসাস আরোপ করা না যায় তাহলে তো দিয়ত আরোপ করাও উচিত হবে না। সুতরাং সাক্ষীদের থেকে কিসাসের মতো দিয়তও রহিত হয়ে যাওয়া উচিত।

উত্তর : এর জবাব হলো, দিয়ত হচ্ছে আর্থিক দণ্ড। আর আর্থিক বিষয় সন্দেহের উপস্থিতিতেও প্রমাণিত হয়ে যায়। সুতরাং দিয়ত আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। অতএব, কিসাসের উপর দিয়তকে কিয়াস করা উচিত নয়। কিসাস সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যাবে কিন্তু এর পরিবর্তে দিয়ত ওয়াজিব হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, জবরদস্তিকারী (مُكْرِهٌ) -এর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যাকে জবরদস্তি করা হয়েছে (مُكْرَهٌ) তার এখতিয়ার ফাসিদ ছিল। পক্ষান্তরে مُكْرِهٌ -এর এখতিয়ার ফাসিদ ছিল না। আর উসূলুল ফিকহের নিয়ম, সহীহ এখতিয়ারের বিপরীতে যদি ফাসিদ এখতিয়ার আসে তাহলে ফাসিদ এখতিয়ার বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে مُكْرِهٌ -এর জন্যে মাধ্যম সাব্যস্ত হবে। সে যেন বাধ্যকারীর অস্ত্র, আর বাধ্যকারী হলো হত্যাকারী। সুতরাং হত্যার কাজটি বাধ্যকারী থেকেই পাওয়া গেছে। যেহেতু قَتْل বাধ্যকারীর দ্বারা হয়েছে তাই কিসাস হিসেবে তাকেই হত্যা করা হবে। আর যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে যেহেতু অস্ত্রের পর্যায়ে তাই তাকে দায়ী করা হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার বাকি আলোচনা ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী (র.)-এর مُخْتَلَفُ الرِّوَايَةِ কিতাবে রয়েছে।

قَالَ : وَإِذَا رَجَعَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ ضَمِنُوْا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ صَدَرَتْ مِنْهُمْ فَكَانَ التَّلَفُ مُضَافًا إِلَيْهِمْ وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ وَقَالُوْا لَمْ نَشْهَدْ شُهُوْدَ الْفَرْعِ عَلٰى شَهَادَتِنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ وَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ فَصَارَ كَرُجُوْعِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি স্থলবর্তী সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে জরিমানা প্রদান করবে। কেননা বিচারকের মজলিসে তাদের থেকে সাক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ক্ষতি করার বিষয়টি তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে। আর যদি মূল সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেন এবং বলেন, আমরা আমাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানাইনি তাহলে তাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা মূল সাক্ষীগণ সববকে অস্বীকার করেছেন। আর সবব হলো সাক্ষী বানানো। অবশ্য বিচারের রায় বাতিল হবে না। কেননা এটা এমন সংবাদ যাতে সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটা সাক্ষী প্রত্যাহারের মতো হলো। বিচারের রায় প্রদানের পূর্বের বিষয়টি এমন নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا رَجَعَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ الخ : উপরের ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলার সূরত হলো, দুজন মূল সাক্ষী দুজনকে তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে স্থলবর্তী করল। অতঃপর স্থলবর্তী সাক্ষী দুজন বিচারালয়ে গিয়ে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করল। কিন্তু পরবর্তীতে স্থলবর্তী সাক্ষী দুজন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহারের কারণে বিবাদীর যে ক্ষতি হয়েছে এর দায় কার উপর আরোপিত হবে- মূল সাক্ষীদের উপর নাকি স্থলবর্তী সাক্ষীগণের উপর? মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্থলবর্তী সাক্ষীরাই ক্ষতিপূরণ দেবে। এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে। কেননা বিচারকের আদালতে স্থলবর্তী সাক্ষীরাই সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তারাই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে। সুতরাং সাক্ষ্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যে ক্ষতি হয়েছে এর দায়ও তাদের উপর আরোপ হবে। কারণ, নিয়মানুযায়ী যে ক্ষতি করেছে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে। দ্বিতীয় মাসআলার সূরত হলো, মূল সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল অতঃপর বলল যে, আমরা স্থলবর্তী সাক্ষীদেরকে আমাদের সাক্ষ্য নকলের দায়িত্ব দেইনি এবং আমাদের সাক্ষ্য তাদের শুনিয়ে সাক্ষী বানাইনি। অন্যদিকে স্থলবর্তী সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল রইল। স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদী বাদীকে যে অর্থ দিয়েছিল এর জরিমানা মূল সাক্ষীদের উপর আরোপিত হবে না। কেননা মূল সাক্ষীগণ বিবাদীর মালের যে ক্ষতি এর সববকে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ তারা স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানানোর কথা অস্বীকার করেছে। তারা দাবি করছে, স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদীর যে মাল বাদীকে দিতে হয়েছে এর জন্য আমরা সবব নই [এবং দায়ীও নই]। কারণ, আমরা স্থলবর্তীদেরকে আমাদের সাক্ষ্য দানের জন্যে সাক্ষী বানাইনি।

মোটকথা যেহেতু মূল সাক্ষীগণ বিবাদীর মাল নষ্ট করার সববকে অস্বীকার করছে সুতরাং তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না। আর স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে রায় বিচারক প্রদান করেছেন এরও কোনো পরিবর্তন হবে না। রায় বাতিল না হওয়ার কারণ এই যে, মূল সাক্ষীরা স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানায়নি বলে যে বক্তব্য দিয়েছে তা সত্য/মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ মূল সাক্ষীরা বলেছে আমরা স্থলবর্তীদের সাক্ষী বানাইনি। এ কথাটি সত্যও হতে পারে, আবার তাদের কথা মিথ্যাও হতে পারে। সুতরাং শুধুমাত্র সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিচারকের রায় বাতিল করা ঠিক নয়।

তাছাড়া যদি মূল সাক্ষী বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য পেশ করে অতঃপর বিচারক তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করে তারপর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তবুও বিচারকের রায় বাতিল করা যায় না। সুতরাং যেহেতু বিচারকের রায় মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার অবস্থায় বাতিল হয় না। তাই স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানানোর কথা অস্বীকারের অবস্থাতেও বিচারকের রায় বাতিল না হওয়াই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদানের আগে মূল সাক্ষীরা স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষী বানানোর কথা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করবেন না। যেমন বিচারক রায় প্রদানের আগে যদি মূল সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে বিচারক রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আবুল মানসূর আল বাগদাদী কৃত কুদূরী গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত মাসআলাটিতে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। বর্ণিত মাসআলাটি শায়খাইনের মতানুযায়ী লিখিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল সাক্ষীরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে।

وَإِنْ قَالُوْا اَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ضَمِنُوْا وَهٰذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِاَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوْعِ لِاَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِيْ بِمَا يُعَايِنُ مِنَ الْحُجَّةِ وَهِيَ شَهَادَتُهُمْ وَلَهُ اَنَّ الْفُرُوْعَ نَقَلُوْا شَهَادَةَ الْاُصُوْلِ فَصَارَ كَاَنَّهُمْ حَضَرُوْا ـ

অনুবাদ : আর যদি মূল সাক্ষীরা বলে– আমরা স্থলবর্তীদের সাক্ষী বানিয়েছি এবং আমরা এতে ভুল করেছি তাহলে মূল সাক্ষীগণ ক্ষতিপূরণ দেবেন। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী তাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা বিচারের রায় স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রদান করেছেন। [আর তারা এখনও তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল আছে।] তাছাড়া বিচারক প্রত্যক্ষ দলিলের ভিত্তিতে রায় প্রদান করে থাকেন। [এখানে] তা হলো স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তী সাক্ষীরা মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য নকল করেছে। সুতরাং মূল সাক্ষীরা যেন হাজির আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالُوْا اَشْهَدْنَاهُمْ الخ : উপরের ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, কোনো একটি বিষয়ে মূল সাক্ষীদের পক্ষে স্থলবর্তী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল। অতঃপর তাদের রায়ের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মূল সাক্ষীরা বলল, আমরা স্থলবর্তীদের ভুল করে সাক্ষী বানিয়েছি। সুতরাং তাদের সাক্ষী যথার্থ নয়। অন্যদিকে স্থলবর্তী সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্যের উপর বহাল রইল। এ অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মূল সাক্ষীদের উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর মতে মূল সাক্ষীদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) الخ : শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য মোতাবেক রায় প্রদান করেছেন। কেননা তিনি সেই সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন যা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এখানে বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদেরকে তাঁর আদালতে প্রত্যক্ষ করেছেন, মূল সাক্ষীদের তিনি দেখেননি। মূল সাক্ষীরা তো বিচারকের আদালতে আসেনি। মোটকথা, বিচারক যেহেতু স্থলবর্তী সাক্ষীদের দেখেছেন এবং তারা তাঁর মজলিসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতএব, তাদের সাক্ষ্য তাঁর কাছে দলিল সাব্যস্ত হবে এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি রায় প্রদান করবেন। আর মূল সাক্ষীদের যেহেতু বিচারক দেখেননি এবং তাদের বক্তব্য শোনেননি তাই তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং পরবর্তীতে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাঁদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার বিবাদীর মাল নষ্ট করার সবব সাব্যস্ত হবে না।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তী সাক্ষীরা মূল সাক্ষীর সাক্ষ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মূল সাক্ষীদের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। এজন্যই তো বিচারকের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল সাক্ষীদেরও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। যেহেতু স্থলবর্তীরা মূল সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হয় আর তারা মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যই বিচারকের এজলাসে স্থানান্তর করছে সুতরাং যেন মূল সাক্ষীরাই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয়েছে। অতঃপর তারা যেন তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করছে। এরূপ অবস্থায় মূল সাক্ষীদের উপর জরিমানা আসে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় মূল সাক্ষীরা জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُوْلُ وَالْفُرُوْعُ جَمِيْعًا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفُرُوْعِ لَا غَيْرَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَلْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْأُصُوْلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفُرُوْعَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوْعِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَا وَبِشَهَادَةِ الْأُصُوْلِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِيْ ذُكِرَ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَالْجِهَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّضْمِيْنِ وَإِنْ قَالَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ أَوْ غَلِطُوْا فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى ذٰلِكَ لِأَنَّ مَا أُمْضِيَ مِنَ الْقَضَاءِ لَا يُنْتَقَضُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ مَا رَجَعُوْا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّمَا شَهِدُوْا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرُّجُوْعِ ـ

অনুবাদ : আর যদি মূল সাক্ষীগণ ও স্থলবর্তীরা উভয়ে তাদের সাক্ষ্য একযোগে প্রত্যাহার করে তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতানুযায়ী স্থলবর্তী সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে। অন্যদের উপর হবে না। কেননা বিচারের রায় তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী প্রদান করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার এখতিয়ার থাকবে। সে মূল সাক্ষীদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য করবে কিংবা স্থলবর্তী সাক্ষীদের উপর জরিমানা আরোপ করবে। কেননা বিচারের রায় স্থলবর্তী সাক্ষীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ঐ পদ্ধতিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ঐভাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সে এদের দুজনের কোনো একজন থেকে জরিমানা উসুল করার ব্যাপারে এখতিয়ার পাবে। দুটি পদ্ধতি পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং সেগুলো সমন্বিত হবে না জরিমানা প্রদানের ক্ষেত্রে। আর যদি স্থলবর্তী সাক্ষীরা বলে যে, মূল সাক্ষীরা মিথ্যা বলছে কিংবা তারা ভুল করছে তাহলে এ বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। কেননা যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা তাদের কথায় বাতিল হবে না এবং তাদের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না। কেননা তারা তো তাদের সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসেনি; বরং তারা অন্যদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُوْلُ وَالْفُرُوْعُ الخ : উপরের ইবারতে মূল সাক্ষী ও তাদের স্থলবর্তী সাক্ষী উভয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মূল ও স্থলবর্তী সাক্ষীগণ একযোগে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেন তাহলে কাদের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব এ ব্যাপারে আহনাফের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান।

শায়খাইন (র.)-এর মতে শুধুমাত্র স্থলবর্তী সাক্ষীগণ জরিমানা প্রদান করবেন। মূল সাক্ষীগণের জরিমানা দিতে হবে না। তাদের যুক্তি এই যে, স্থলবর্তীগণ বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের সাক্ষ্যানুযায়ী বিচারক রায় প্রদান করেছেন। স্থলবর্তীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন এজন্য বলা হবে যে, সাধারণভাবে বিচারকগণ ঐ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন যা বাস্তবে দৃশ্যমান। যেহেতু স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিচারকের মজলিসে দেওয়া হয় তাই বিচারক সে সাক্ষ্য দেখেন এবং শুনেন। অতএব বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করে সেই ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন বলে সাব্যস্ত

হবে। সুতরাং যেহেতু বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করছেন তাই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার مَشْهُوْد بِهٖ যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা বিনষ্ট হওয়ার সবব বলে গণ্য হবে। তাদের সাক্ষ্য যেহেতু مَشْهُوْد بِهٖ বিনষ্ট হওয়ার সবব তাই তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল সাক্ষীদের দায়ী করা হবে না এবং তাদের থেকে কোনো জরিমানা আদায় করা হবে না।

قَوْلُهٗ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اَلْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো, এ ক্ষেত্রে বিবাদীর এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে মূল সাক্ষীদের থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। চাইলে সে স্থলবর্তী সাক্ষীদের থেকেও জরিমানা আদায় করতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, শায়খাইন (র.)-এর দলিল দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, বিচারক স্থলবর্তী সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, স্থলবর্তী সাক্ষীরা মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্য নকল করেছেন। সুতরাং বিচারক মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। স্থলবর্তী সাক্ষীরা সাক্ষ্য বহন করেছেন মাত্র। সুতরাং শায়খাইন (র.)-এর দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, স্থলবর্তী সাক্ষীরা জরিমানা দেবে আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল দ্বারা মূল সাক্ষীরা জরিমানা দেবে এটা প্রমাণ হয়। উভয় দলিলের উপর আমল করা উত্তম কোনো একটি ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে। সে হিসেবে বিবাদী এখতিয়ার পাবে। সে ইচ্ছা করলে মূল সাক্ষীদের কাছে জরিমানা চাইতে পারে, ইচ্ছা করলে স্থলবর্তী সাক্ষীদের কাছে জরিমানা চাইতে পারে।

প্রশ্ন : এখানে কেউ আপত্তি স্বরূপ বলতে পারে তবে তো উভয় সাক্ষীকে অর্ধেক করে জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) সেই পথে কেন গেলেন না?

উত্তর : এর উত্তর হলো, দুটি দলিল পরস্পর ভিন্ন। এ দুটির মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা মূল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বাদীর হকের ব্যাপারে, আর স্থলবর্তীদের সাক্ষ্য মূল সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ব্যাপারে। সুতরাং দু দলিলের মাঝে ঐক্যের কোনো সূত্র নেই। যেহেতু দু দলিলের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই তাই মূল সাক্ষ্য ও স্থলবর্তী সাক্ষ্যকে এক করে একটি সাক্ষ্য সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ নেই। যদি একটি সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা যেত তাহলে জরিমানাকে উভয় সাক্ষীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া যেত। যেহেতু সাক্ষ্যদ্বয়ের মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা নেই তাই উভয় সাক্ষীদলকে আলাদা আলাদা জামিন বানানো হবে। অতঃপর বিবাদীর এখতিয়ার থাকবে সে উভয় দলের যে কারো কাছে থেকে তার জরিমানা নিতে পারে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَالَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বিচারের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর মূল সাক্ষীদের ব্যাপারে স্থলবর্তী সাক্ষীরা এ অভিযোগ করে যে, মূল সাক্ষীগণ বিবাদীর ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে কিংবা তারা ভুল সাক্ষ্য দিয়েছে তাহলে তাদের এ বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কেননা বিচারক ইতোমধ্যে তার রায় প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাদের এরূপ বক্তব্যের কারণে বিচারকের রায়ে কোনো পরিবর্তন করা হবে না। কেননা স্থলবর্তী সাক্ষীদের এ বক্তব্যে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এরূপ সম্ভাবনাময় বক্তব্যের দ্বারা রায় বাতিল করা যায় না। অতএব, বিচারকের পূর্ব রায় বহাল থাকবে। এ বক্তব্যের কারণে স্থলবর্তীদের উপর জরিমানাও আরোপ করা যাবে না। কেননা তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেনি। তারা বলছে যে, মূল সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করছে। মূল সাক্ষীরা বিচারকের মজলিসে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে এরূপ কথাও বলেনি। আর এটা তো সকলেই জানে যে, বিচারকের মজলিস ব্যতীত সাক্ষ্য প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, স্থলবর্তী সাক্ষীদের উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদেরকে যেমন জরিমানা করা যায় না তদ্রূপ মূল সাক্ষীদেরও জরিমানা দিতে বাধ্য করা যায় না।

قَالَ : وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُّوْنَ عَنِ التَّزْكِيَةِ ضَمِنُوْا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَضْمَنُوْنَ لِاَنَّهُمْ اَثْنَوْا عَلَى الشُّهُوْدِ خَيْرًا فَصَارُوْا كَشُهُوْدِ الْاِحْصَانِ وَلَهُ اَنَّ التَّزْكِيَةَ اِعْمَالٌ لِلشَّهَادَةِ اِذِ الْقَاضِىْ لَا يَعْمَلُ بِهَا اِلَّا بِالتَّزْكِيَةِ فَصَارَتْ بِمَعْنٰى عِلَّةِ الْعِلَّةِ بِخِلَافِ شُهُوْدِ الْاِحْصَانِ لِاَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি [সাক্ষীদের] সত্যায়নকারীরা তাদের সত্যায়ন প্রত্যাহার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী সত্যায়নকারী তার ক্ষতিপূরণ দেবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে না। কেননা তারা সাক্ষীদের ব্যাপারে প্রশংসা করেছে। সুতরাং তারা ব্যভিচারের ব্যাপারে বিবাহিত বা রজমযোগ্য (مُحْصَنٌ) হওয়ার সাক্ষীগণের মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সত্যায়ন সাক্ষ্যকে কার্যকর করে। কেননা বিচারক সত্যায়ন ছাড়া সাক্ষ্য দ্বারা কোনো ফয়সালা দিতে পারেন না। সুতরাং এটা কার্যকারণের কার্যকারণ সাব্যস্ত হলো। ব্যভিচারের ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবাহিত হওয়ার সাক্ষ্য এরূপ নয়। কেননা তা ব্যভিচারের বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি শর্তমাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُّوْنَ الخ : উপরের ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, সাক্ষীদের যারা সত্যায়ন করে তারা যদি প্রথমে সাক্ষীদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করে অতঃপর বিচারক তাদের মন্তব্যানুযায়ী সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বিচারের রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে যদি সত্যায়নকারীরা তাদের সত্যায়ন প্রত্যাহার করেন। অর্থাৎ তারা বলেন যে, আমরা সাক্ষীদের সম্পর্কে যে ভালো রিপোর্ট দিয়েছিলাম তা সঠিক নয়। এমতাবস্থায় সাক্ষ্যের দ্বারা বিবাদীর বিপক্ষে বিচারক যে রায় দিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার জন্যে সত্যায়নকারীদের জরিমানা করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী সাক্ষীদের সত্যায়নকারীদের জরিমানা করা হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন, সত্যায়নকারীগণ শুধুমাত্র সাক্ষীদের ব্যাপারে প্রশংসা করেছে। তারা তো কোনো দাবির পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়নি যে, সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক কোনো রায় প্রদান করেছেন। সুতরাং বিচারকের যে রায়ের কারণে বিবাদীর মাল নষ্ট হয়েছে তা সত্যায়নের কারণে হয়নি; বরং সে ক্ষতি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দ্বারা হয়েছে। যেহেতু সাক্ষীদের সাক্ষ্যের কারণে বিবাদীর ক্ষতি সাধিত হয়েছে, সত্যায়নের কারণে হয়নি তাই বিবাদীর ক্ষতির সম্পর্ক সত্যায়নকারীদের সাথে হবে না। সেহেতু ক্ষতির সাথে সত্যায়নের সম্পর্ক নেই তাই সত্যায়ন প্রত্যাহার করার কারণে সত্যায়নকারীদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না।

قَوْلُهُ فَصَارُوْا كَشُهُوْدِ الْاِحْصَانِ الخ : সুতরাং সত্যায়নকারীরা ব্যভিচারের ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিবাহিত বলে সাক্ষ্যদানকারীদের মতো হলো। ইবারতের ব্যাখ্যা হলো, চারজন সাক্ষী আরিফ নামের এক ব্যক্তির ব্যাপারে প্রথমে সাক্ষ্য দিল যে, লোকটি ব্যভিচার করেছে। অতঃপর তারা এও সাক্ষ্য দিল যে, আরিফ বিবাহিত। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক

আরিফের ব্যাপারে রজমের রায় প্রদান করলেন। তাকে রজম মারা হলো। পরবর্তীতে সাক্ষীরা অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহিত হওয়ার যে বক্তব্য দিয়েছিল তা প্রত্যাহার করল। তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাহারের কারণে রজমে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের দিয়ত দিতে হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইহসানের (اِحْصَانْ) সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের কারণে যেমন প্রত্যাহারকারীদের জরিমানা করা হয় না তদ্রূপ সত্যায়নকারীরা সত্যায়ন প্রত্যাহার করলে জরিমানা দিতে হবে না।

ইমাম আযম (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সত্যায়ন সাক্ষ্যকে কার্যকর করে। অর্থাৎ সাক্ষ্য কার্যকর হওয়ার ইল্লত হলো সত্যায়ন। বিচারক ঐ সাক্ষ্যানুযায়ী রায় প্রদান করেন যে সাক্ষ্যকে সত্যায়ন করা হয়েছে। এমনিতে বিচারকের রায়ের ইল্লত হলো সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্যের ইল্লত হলো সত্যায়ন। মোটকথা, সাক্ষ্য হলো রায়ের ইল্লতের মতো আর সাক্ষ্য কার্যকর হওয়ার ইল্লতের মতো হলো সত্যায়ন। সুতরাং সত্যায়ন রায়ের عِلَّةُ الْعِلَّةِ হলো। উসূলুল ফিকহের নিয়মানুযায়ী হুকুম যেমন ইল্লতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তদ্রূপ ইল্লতের প্রতিও সম্বন্ধ হয়। অতএব, আলোচ্য সুরতে বিবাদীর মাল বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য ও সাক্ষ্যের সত্যায়ন ইল্লত ও ইল্লতের ইল্লতরূপে হুকুমের সাথে সম্পর্কিত হবে। যেহেতু মাল বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি সত্যায়নের সাথে সম্পর্কিত হলো তাই সত্যায়ন প্রত্যাহার করার অবস্থায় সত্যায়নকারীকে জরিমানা করা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ شُهُوْدِ الْاِحْصَانِ الخ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। সাহেবাইন (র.) ইহসানের সাক্ষীদের উপর সত্যায়নকারীদেরকে কিয়াস করেছিলেন। জবাবের সারকথা হলো, সত্যায়ন ইল্লতের মতো সাব্যস্ত হয়েছে ইতোমধ্যে। পক্ষান্তরে বিবাহিত হওয়া (اِحْصَانْ) ব্যভিচারীর উপর রজম আরোপের জন্য ইল্লতের ইল্লতের মতো নয়; বরং শর্তমাত্র। কেননা ব্যভিচারের শাস্তির ইল্লত হলো ব্যভিচার। ইহসানের সাক্ষীরা ব্যভিচার প্রমাণ করে না। ব্যভিচার তো আগেই প্রমাণ হয়ে যায়। সুতরাং যেহেতু ইহসানের সাক্ষীরা ব্যভিচার প্রমাণ করে না তাই ইহসান ব্যভিচারের শাস্তির ইল্লতের ইল্লত সাব্যস্ত হবে না। মোটকথা, ইহসান ইল্লতের ইল্লত হয় না, কিন্তু সত্যায়ন ইল্লতের ইল্লত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সত্যায়নকে ইহসানের উপর কিয়াস করা উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) সত্যায়নকে ইল্লতের অর্থে বলেছেন। সরাসরি ইল্লতের ইল্লত বলেননি। কারণ, যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা বিনষ্ট হওয়ার ইল্লত সাক্ষ্যকে সাব্যস্ত করা যায় না; বরং সাক্ষ্যকে এর সবব বলা যেতে পারে, যে সববের প্রতি বিচারকের রায় সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। যেহেতু সাক্ষ্য ইল্লত সাব্যস্ত হয়নি, তাহলে সত্যায়ন ইল্লতের ইল্লত হবে না। এজন্য মুসান্নিফ সত্যায়নকে ইল্লতের ইল্লতের অর্থে বলেছেন।

জ্ঞাতব্য : ইবারতে উল্লিখিত শব্দ যথা– ১. عِلَّةْ ২. سَبَبْ ৩. شَرْط ও ৪. عَلَامَةْ -এর মাঝে কি ধরনের পার্থক্য তা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। عِلَّةْ বলা হয় এমন কার্যকারণকে যা হুকুমের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে। سَبَبْ হলো যা مُفْضِىْ اِلَى الْحُكْمِ হয় কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে।

আর শর্ত হুকুমের মাঝে কোনো প্রভাবও সৃষ্টি করে না এবং مُفْضِىْ اِلَى الْحُكْمِ [হুকুমের প্রতি ধাবিতকারী] ও হয় না; বরং শর্ত হলো হুকুমের অস্তিত্ব যার উপর নির্ভরশীল হয়। আর عَلَامَةْ হলো, যার প্রতি হুকুম দিকনির্দেশ করে। তবে হুকুমের অস্তিত্ব এর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এ বাক্যের اَنْتِ طَالِقٌ শব্দটি তালাক সংঘটিত হওয়ার ইল্লত। আর ঘরে প্রবেশ করা এর শর্ত।

আর বিচারকের রায়ের জন্যে সাক্ষ্য হলো সবব। আর আলামতের উদাহরণ হলো, রেলগাড়ি আসার পূর্বে যে ঘণ্টা বাজানো হয় তা রেলগাড়ি আসার আলামত।

قَالَ : وَاِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِيْنِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُوْدِ الشَّرْطِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَالضَّمَانُ عَلٰى شُهُوْدِ الْيَمِيْنِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ وَالتَّلَفُ يُضَافُ اِلٰى مُثْبِتِي السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرْطِ الْمَحْضِ اَلَا تَرٰى اَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِيْ بِشَهَادَةِ الْيَمِيْنِ دُوْنَ شُهُوْدِ الشَّرْطِ وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الشَّرْطِ وَحْدَهُمْ اِخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيْهِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ يَمِيْنُ الْعِتَاقِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দুজন সাক্ষী শর্তারোপের সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দুজন শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সাক্ষ্য দেয় অতঃপর তারা সকলেই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে শুধুমাত্র শর্তারোপের সাক্ষীগণের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। কেননা শর্তারোপের সাক্ষ্যই রায়ের সবব। আর ক্ষতির সম্পর্ক সবব প্রতিষ্ঠাকারীর সাথে হয়। কেবল শর্তের অস্তিত্বদাতার সাথে সম্পৃক্ত হয় না। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বিচারক শর্তারোপকারী সাক্ষ্যের দ্বারা রায় প্রদান করেন– শর্তের সাক্ষ্যদাতাদের দ্বারা নয়। আর যদি শর্তের সাক্ষীরাই শুধু সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে [ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে] মাশায়েখ -এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। মাসআলায় শর্তের অর্থ হলো, আজাদ করার এবং সহবাসের পূর্বে তালাকের ব্যাপারে শর্তারোপ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ الخ : মাসআলার সূরত হলো, দুজন সাক্ষী কারো ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার গোলামকে শর্তসাপেক্ষে আজাদ করেছে। যেমন– তারা বলল, আজাদকারী বলেছে, যদি তুমি আমার ঘরে প্রবেশ কর তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অথবা সে তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলেছে, যদি তুমি আমার ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আজাদ। অথবা তারা বলল, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে তালাক দিয়েছে। যেমন– সে তার স্ত্রীকে বলেছে, যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি তালাক। এ দুজন এরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার পর অন্য দুব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আজাদ করার এবং তালাক দেওয়ার ব্যাপারে যে শর্ত করেছিল তা পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তারা বলল, গোলাম এবং স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করেছে সুতরাং তারা আজাদ ও তালাক হয়ে গেছে। তাদের এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক রায় প্রদান করলেন যে, অমুকের গোলাম আজাদ ও অমুকের স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীতে প্রথম দুসাক্ষী ও দ্বিতীয় দুসাক্ষী সকলেই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। এমতাবস্থায় গোলামের বাজারমূল্য পরিমাণ ও স্ত্রীর অর্ধেক মহর পরিমাণ শুধুমাত্র শর্তারোপ করেছে বলে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের প্রদান করতে হবে। যারা শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের কোনো জরিমানা দিতে হবে না।

এ মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁর মতে জরিমানা চারজনকেই সমান ভাগ করে প্রদান করতে হবে। তাঁর দলিল হলো, গোলামের হাতছাড়া হওয়ার এবং স্ত্রী তালাক হওয়ার ক্ষতি তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হয়েছে। যেহেতু ক্ষতির সম্পর্ক সকলের সাথে তাই ক্ষতির দায় সকলকেই বহন করতে হবে।

আমাদের দলিল হলো, গোলামের আজাদ হওয়ার এবং স্ত্রী তালাক হওয়ার সবব তো উল্লিখিত শর্ত। কেননা গোলাম ঘরে প্রবেশ করার কারণেই আজাদ হয়েছে, তদ্রূপ স্ত্রীও ঘরে প্রবেশ করার কারণে তালাক হয়েছে। সুতরাং আজাদ হওয়ার ও তালাক হওয়ার সবব হলো ঘরে প্রবেশের শর্তারোপের সাক্ষ্য। আর ঘরে প্রবেশ হলো তালাক হওয়ার শর্ত। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সববের প্রতি ক্ষতির নিসবত হয়– শর্তের প্রতি নিসবত হয় না। সুতরাং যেহেতু সববের প্রতি হুকুমের নিসবত হয় তাই আলোচ্য মাসআলায় ঐ সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি ক্ষতির দায় আরোপিত হবে যারা ঘরে প্রবেশের শর্তারোপের সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। যারা শুধুমাত্র শর্তের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের প্রতি হুকুমের নিসবত করা হবে না।

মোটকথা, যখন পরবর্তীতে সবাই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল তখন শর্তারোপের সাক্ষ্য যারা দিয়েছিল তাদের গোলামের বাজারমূল্য পরিমাণ কিংবা স্ত্রী অর্ধেক মোহর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব হবে। যারা শর্ত পাওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الشَّرْطِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাক্ষীরা শুধুমাত্র তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে কাদের জরিমানা করা হবে? এ ব্যাপারে মাশায়েখের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, এ অবস্থায় প্রত্যাহার সাক্ষীগণের উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিন্তু শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)-সহ অন্যদের মত হলো, শর্তের সাক্ষীদের উপর কখনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। এটাই সহীহ্ মাযহাব। যিয়াদাত কিতাবে বিষয়টি বর্ণিত আছে।

জ্ঞাতব্য : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসআলা দ্বারা উদ্দেশ্য গোলাম আজাদ করার শর্ত এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা। তালাকের ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে তালাকের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, যদি সহবাসের পর তালাক শর্তারোপ করে দেওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া হয়, অতঃপর সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সাক্ষীরা মহরের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয় না। কেননা স্ত্রীর সাথে সহবাসের ফলে স্বামীর দায়িত্বে পুরো মোহর ওয়াজিব হয়ে আছে। তাই সাক্ষীগণ তালাকের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে স্বামীর আর্থিক কোনো ক্ষতি করেনি। যেহেতু তারা আর্থিক ক্ষতি করেনি তাই তাদের আর্থিক জরিমানা করা যাবে না।

كِتَابُ الْوَكَالَةِ
অধ্যায় : ওয়াকালাহ

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : شَهَادَتْ-এর হুকুম-আহকাম বর্ণনার পরে ওয়াকালাহর হুকুম-আহকাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুয়ের পারস্পরিক যোগসূত্র হলো, শাহাদাত এবং ওকালাত উভয়ের প্রত্যেকটিই আল্লাহ তা'আলার صِفَةٌ বা বিশেষণ। কাজেই আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হয়েছে– ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ প্রথম আয়াতে شَهِيْد আল্লাহর সিফত আর দ্বিতীয় আয়াতে উকিল আল্লাহ তা'আলার সিফত বা বিশেষণ। দ্বিতীয় আরেকটি সামঞ্জস্য হলো, শাহাদাত এবং ওকালাত প্রতিটির দ্বারাই অন্য মানুষের সাহায্য করা হয় এবং তার অধিকারকে রক্ষা করা হয়।

তৃতীয় সামঞ্জস্য হলো, শাহাদাত এবং ওকালাত প্রত্যেকটিই ছওয়াব হাসিলের মাধ্যম। এসব সামঞ্জস্য এবং মুনাসাবাতের কারণে كِتَابُ الشَّهَادَةِ-এর পরে كِتَابُ الْوَكَالَةِ -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَكَالَتْ-এর وَاوْ-কে যবর দিয়েও পড়া যায়, যের দিয়েও পড়া যায়। অর্থ হলো, সমর্পণ করা। এও বলা হয়েছে যে, وَكَالَةٌ ওকালাতের অর্থ হলো– হেফাজত করা, এখান থেকে আল্লাহর নাম وَكِيْل হয়েছে। যার অর্থ– হেফাজতকারী। আর শব্দটি تَوْكِيْلٌ-এর– اِسْم-ও। تَوْكِيْل-এর অর্থ নিজের অক্ষমতা এবং অন্যের উপর ভরসাকে প্রকাশ করা। উকিল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে নিজের উপর আরোপিত কাজ আঞ্জাম দেয়। وَكِيْلٌ শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় ওকালাত বলা হয় কোনো ব্যক্তির কোনো কাজে অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা।

ওকালত শরিয়তে বৈধ হওয়ার سَبَبْ বা কারণ তাই যা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ تَعَلُّقُ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ بِتَعَاطِيْهَا জীবনযাপনের স্থায়িত্ব পরস্পর লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত।" আর যেহেতু পরস্পর লেনদেনের জন্য কখনো কখনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা অন্যের উপর সোপর্দ করার প্রয়োজন দেখা দেয়– এ কারণে ওকালাত শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে। ওকালাতের رُكْن বা স্তম্ভ হলো, "আমি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করলাম।" এ বাক্য এবং এ বাক্যের সমার্থক বাক্যসমূহ।

ওকালাতের শর্ত হলো, মুওয়াক্কিল যে কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করবে, মুআক্কিল নিজেও সে কাজের অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। সুতরাং যে কাজ মুওয়াক্কিল নিজে সম্পাদন করতে পারে সে কাজের জন্য অন্যকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে। আর যে কাজ নিজেই সম্পাদন করার অধিকার রাখে না সে কাজের জন্য অন্যকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে না।

ওকালাতের হুকুম হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে যে কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করে, উকিলের সে কাজে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার লাভ হয়।

ওকালাতের সিফত বা বিশেষণ হলো, ওকালাত একটি বৈধ চুক্তি। মুওয়াক্কিল এবং উকিলের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে অপরের সম্মতি ছাড়া চুক্তি বাতিল করার। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের অধিকার রয়েছে উকিলকে উকিলের সম্মতি ছাড়াই বরখাস্ত করার তদ্রূপ উকিলের অধিকার আছে মুওয়াক্কিলের অনুমতি ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার। ওকালত চুক্তির বৈধতা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস চার দলিল দ্বারাই প্রমাণিত।

কুরআনিক দলিল : আল্লাহ তা'আলা أَصْحَاب كَهْف তথা গুহাবাসীদের ঘটনায় বর্ণনা করেছেন– فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ. "আসহাবে কাহাফ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলল, এখন নিজেদের থেকে কাউকে এ শহরে পয়সা দিয়ে পাঠাও সে যেন দেখে কোন খাবার পরিচ্ছন্ন, সুতরাং সেই খাবার থেকে তোমাদের কাছে যেন কিছু নিয়ে আসে।" উল্লিখিত ঘটনায় আসহাবে কাহাফ এক ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে হালাল খাবার খরিদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। আর এটাই তো ওকালাত। কুরআন মাজীদে এ ঘটনাটি কোনো অস্বীকৃতি ছাড়া বিবৃত হয়েছে। আর মূলনীতি স্বীকৃত আছে যে, কুরআন মাজীদ যদি পূর্ববর্তী উম্মতের সাথে সম্পৃক্ত কোনো হুকুম কোনো অস্বীকৃতি ছাড়া বর্ণনা করে, তাহলে সেই হুকুম আমাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ওকালত আমাদের জন্য বৈধ।

হাদীসের দলিল : আর হাদীস থেকে ওকালাতের বৈধতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ হাকীম ইবনে হিযাম এবং উরওয়া বারেকী (রা.)-কে কুরবানির জানোয়ার খরিদ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। –[তিরমিযী]

আর আমর ইবনে উমাইয়্যাহকে উম্মে হাবীবা বিনতে আবী সুফিয়ান (রা.)-এর বিবাহ কবুলের জন্য উকিল বানিয়েছিলেন এবং হযরত রাফে (রা.)-কে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ কবুলের জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন।

ইজমার দলিল : ইজমা থেকে এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওকালাতের বৈধতার উপর সর্বসম্মতিক্রমে মত এবং আমল বিদ্যমান।

যৌক্তিক দলিল : যুক্তি এবং কিয়াস দ্বারা ওকালতের বৈধতা এভাবে সাব্যস্ত হয় যে, অনেক সময় দীর্ঘ সফরের কারণে মানুষ নিজের সম্পদ হেফাজত করতে অপারগ হয়ে যায়। আবার কখনো ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্যতা না থাকার কারণে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। কখনো এমনও হয় যে, অধিক ব্যস্ততার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ফুরসত হয় না। আবার কখনো দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের কারণে অক্ষম হয়ে যায়। সুতরাং এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে ওকালতের আবশ্যকতা দেখা দেয়। তাই শরিয়তে ওকালতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ

قَالَ : كُلُّ عَقْدٍ جَازَ اَنْ يَعْقِدَهُ الْاِنْسَانُ بِنَفْسِهٖ جَازَ اَنْ يُوَكِّلَ بِهٖ غَيْرَهُ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهٖ عَلٰى اِعْتِبَارِ بَعْضِ الْاَحْوَالِ فَيَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُوَكِّلَ بِهٖ غَيْرَهُ فَيَكُوْنُ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَّلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ وَبِالتَّزْوِيْجِ عُمَرَ بْنَ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে চুক্তি মানুষ নিজে সম্পন্ন করতে পারে সেটা সম্পন্ন করার জন্য অন্যকে সে উকিল নিযুক্ত করতে পারে। কেননা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ কখনো কখনো নিজে কার্য সম্পাদন করতে অপারগ হয়ে যায়, তখন সে ঐ বিষয়ে অন্যকে উকিল বানানোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজন পূরণের জন্য তার অবকাশ থাকবে। আর বিশুদ্ধ রূপে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ খরিদ করার জন্য হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-কে এবং বিবাহের জন্য ওমর ইবনে উম্মে সালামা (রা.)-কে উকিল নিযুক্ত করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : كُلُّ عَقْدٍ جَازَ اَنْ يَعْقِدَهُ الخ : উকিল নিযুক্ত করার ব্যাপারে ইমাম কুদূরী (র.) এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যে চুক্তি মানুষ নিজে সম্পন্ন করতে পারে সে চুক্তির জন্য সে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে। ইমাম কুদূরীর এ ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা যায়– যদিও তিনি তা ব্যক্ত করেননি যে, 'যে চুক্তি নিজে সম্পন্ন করা যায় না তার জন্য অন্যকে উকিল নিযুক্ত করা যাবে না। এক্ষেত্রে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুসলমান কর্তৃক কোনো জিম্মিকে মদ বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তকরণের প্রসিদ্ধ মাসআলা এ মূলনীতির পরিপন্থি হয়। কেননা কোনো মুসলমান নিজে মদ লেনদেন করতে পারে না তথাপি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো জিম্মিকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারে। নাতায়েজুল আফকারে এ আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কোনো মূলনীতির বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে তার উপর আপত্তি তোলা যায় না; বরং সরল দিক যথার্থ হলেই সে মূলনীতি সঠিক বলে বিবেচ্য হয়। (اِبْطَالُ الْقَوَاعِدِ بِاِبْطَالِ الطَّرْدِ لَا الْعَكْسُ) তাই কুদূরীতে উল্লিখিত মূলনীতিতে যা ব্যক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র বিপরীত বিবেচনার ভিত্তিতে তার উপর আপত্তি অযৌক্তিক। এখানে তো শুধু কোন ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ এতটুকু বর্ণনা করাই ইমাম কুদূরীর উদ্দেশ্য। কোন ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয় তা বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ! কুদূরীতে উল্লিখিত মূলনীতির উপর এই আপত্তি করা যেতে পারে যে, জিম্মি নিজে তো মদ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, কিন্তু কোনো মুসলমানকে এর জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারে না। অথচ মূলনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে নিজে যে চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবে তার জন্য অন্যকে উকিলও নিযুক্ত করতে পারবে। এ আপত্তির উত্তর হলো, জিম্মি যেভাবে নিজে মদ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে; অন্যকে এর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকিলও নিযুক্ত করতে পারে। কাজেই যদি এক জিম্মি অন্য জিম্মিকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে তবে তা বৈধ হয়। বাকি থাকল একথা যে, মুসলমানকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্তকরণ অবৈধ হওয়া, তো এর কারণ হলো, মুসলমানকে মদ ও মদের কাজ-কারবার থেকে পৃথক থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই শরয়ী বিধানের কারণে এক্ষেত্রে মুসলমানকে উকিল নির্ধারণ অবৈধ হয়েছে। সার কথা হলো– উকিল তো মুসলমানকেও নিযুক্ত করা বৈধ। কিন্তু যেহেতু মুসলমানকে মদ থেকে দূরে থাকার

আদেশ দেওয়া হয়েছে এজন্য এ প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলমানকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করা অবৈধ হয়েছে। সুতরাং মুসলমানকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করা অবৈধ হওয়ার এ মূলনীতির উপর কোনোরূপ আপত্তি আসবে না। মূলনীতিটি তো সস্থানে যথার্থ, তবে এক্ষেত্রে মূলনীতি কার্যকর না হওয়া প্রতিবন্ধকতার কারণে। যেমন কেউ বলল, যে সঠিক নিয়মে বিবাহ করবে তার জন্য বিবাহিতার সাথে সহবাস করা বৈধ। এখন এ কথার উপর এই আপত্তি হবে না যে, এই বিবাহিতা যদি হায়েযা হয় অথবা এহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তো তার সাথে সহবাস করা বৈধ হয় না, কাজেই উল্লিখিত মূলনীতি যথার্থ নয়। কেননা এ আপত্তির উত্তর এই হবে যে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম তো সর্বাবস্থায় বৈধ; কিন্তু এখানে সঙ্গম নিষিদ্ধ হয়েছে কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে আর সেই প্রতিবন্ধকতা হলো স্ত্রীর ঋতুস্রাব অথবা এহরাম অবস্থায় থাকা। আর কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে কোনো মূলনীতি কোথাও কার্যকর না হলে মূলনীতিটিকেই সঠিক নয় বলা একেবারেই অযৌক্তিক।

যাহোক ইমাম কুদূরী (র.) যে মূলনীতি বর্ণনা করলেন তা যথার্থই রইল' যে চুক্তি মানুষ নিজে সম্পন্ন করতে পারবে সে চুক্তির জন্য অন্যকে উকিলও নিযুক্ত করতে পারেবে।' এখন হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা এই মূলনীতির স্বপক্ষে তিনটি দলিল উল্লেখ করবেন। একটি আকলী বা যুক্তিভিত্তিক ও অপর দুটি নকলী বা বর্ণনাভিত্তিক।

আকলী দলিলের সারমর্ম হলো, মানুষ কখনো কখনো বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজে কার্য সম্পাদন করতে অপারগ হয়ে যায়। যেমন লেনদেনের অভিজ্ঞতা থাকে না, অথবা নিজের পদমর্যাদার এবং সম্মানের কারণে স্বয়ং ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না, অথবা অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে বাজারে যাওয়ার শক্তি থাকে না। যে প্রকারেই হোক, এসব অবস্থায় যেহেতু অন্যকে উকিল নিযুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাই প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যকে উকিল নিযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ যুক্তির উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, উকিল নিযুক্তকরণের সপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হলো এ থেকে তো শুধু অপারগতার ক্ষেত্রেই উকিল নিযুক্ত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ কোনো অপারগতা না থাকলেও তো উকিল নিয়োগ বৈধ? ইনায়া গ্রন্থপ্রণেতা এর উত্তরে বলেন– ذَكَرَ الْخَاصَّ وَاَرَادَ الْعَامَّ অর্থাৎ যদিও এখানে বিশেষ প্রয়োজনে অক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি উদ্দেশ্য যে কোনো প্রয়োজন। অপারগতা থাক বা না থাক প্রয়োজন দেখা দিলেই অন্যকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে। এর উপর এ আপত্তি আসে যে, প্রয়োজন ছাড়া تَرَفُّهًا তথা বিলাসিতার জন্য উকিল নিযুক্ত করাও বৈধ। তাই আরেকটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, এটা এ বিধানের হেকমত বা তাৎপর্য; মূল হেতু বা ইল্লত নয়। আর হেকমত বা তাৎপর্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাওয়া আবশ্যক নয়; বরং সমষ্টির ভেতর কোথাও পাওয়াই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : এখান থেকে বর্ণনা ভিত্তিক দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূল ﷺ খরিদ করার জন্য হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-কে উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ দাউদ শরীফে এবং তিরমিযী শরিফে এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِيْ لَهُ اُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ فَبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ وَاشْتَرٰى اُضْحِيَةً بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ بِدِيْنَارٍ وَاُضْحِيَةٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ وَدَعَا لَهُ اَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيْ تِجَارَتِهِ.

অর্থাৎ হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার তাকে এক দিনার দিয়ে পাঠালেন একটি কুরবানির জন্তু ক্রয় করার জন্য। তো তিনি একটি জন্তু এক দিনারের বিনিময়ে খরিদ করে দুই দিনারের বিনিময়ে সেটা বিক্রি করে দিলেন। এরপর ফিরে গিয়ে এক দিনারের বিনিময়ে আরেকটি জন্তু ক্রয় করলেন এবং রাসূল ﷺ -এর খেদমতে এক

দিনার ও একটি জন্তু নিয়ে হাজির হলেন। রাসূল ﷺ দিনার তো সদকা করে দিলেন আর হাকীম ইবনে হিযামের জন্য তার ব্যবসার বরকতের দোয়া করে দিলেন।" ঠিক এমনই একটি ঘটনা হযরত উরওয়া বারেকী (রা.) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ دِيْنَارًا يَشْتَرِيْ اُضْحِيَّةً اَوْ شَاةً فَاشْتَرٰى شَاتَيْنِ فَبَاعَ اَحَدَهُمَا بِدِيْنَارٍ وَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهٖ فَكَانَ لَوْ اِشْتَرٰى تُرَابًا رَبِحَ فِيْهِ ـ (اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالْاَرْبَعَةُ سِوَى النَّسَائِيِّ وَاَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ اَثْنَاءِ حَدِيْثٍ)

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ উরওয়া বারেকি (রা.)-কে কুরবানির পশু অথবা বকরি খরিদ করার জন্য এক দিনার দিলেন। তিনি এক দিনার দিয়েই দুটি বকরি খরিদ করলেন এরপর দুটি থেকে একটিকে এক দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন এবং রাসূল ﷺ -এর খেদমতে একটি বকরি ও এক দিনার নিয়ে হাজির হলেন। রাসূল ﷺ উরওয়ার জন্য তার ব্যবসায় বরকতের দোয়া করলেন [সে দোয়া এমনই কবুল হলো] যে, যদি উরওয়া মাটিও খরিদ করতেন তাতেও লাভ করতেন।" এই দু বর্ণনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ وَبِالتَّزْوِيْجِ عُمَرَ بْنَ اُمِّ سَلَمَةَ : হাকীম ইবনে হিযামের হাদীসে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রাসূল ﷺ -এর উকিল নিযুক্ত করার প্রমাণ ছিল। এ হাদীসে বিবাহ-শাদিতে উকিল নিযুক্ত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবূ ইয়া'লা এবং ইবনে হিব্বান এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থসমূহে বিবৃত করেছেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ اِلَيْهَا يَخْطُبُهَا فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَزَوَّجَهٗ اِيَّاهَا ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন তো হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, 'ওঠ হে ওমর! রাসূলের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।' ওমর রাসূলকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন।" কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ওমর হলো ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। যেমন হাফেজ ইবনে হাজার (র.) দেরায়াতে উল্লেখ করেছেন– وَلٰكِنِ اخْتُلِفَ فِى الْمُرَادِ بِعُمَرَ فَقِيْلَ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ وَقِيْلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ অর্থাৎ যদি ওমর দ্বারা ওমর ইবনুল খাত্তাব-ই উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো কোনো আপত্তি উঠে না। কিন্তু যদি عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ উদ্দেশ্য হয় যেমন নাকি অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারাও বোঝা যায়। সে ক্ষেত্রে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ওমর ইবনে আবি সালামা কি করে তার মায়ের বিয়ের উকিল হবেন অথচ اِبْنُ الْجَوْزِيْ এবং -এর ভাষ্য অনুসারে তার বয়স তখন ছিল মাত্র এক বৎসর এবং وَاقِدِيْ -এর ভাষ্য অনুসারে তখন তার বয়স ছিল মাত্র তিন বৎসর। আমরা তার উত্তরে বলব تَنْقِيْحٌ গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে আব্দুল হাদী وَاقِدِيْ এবং اِبْنُ الْجَوْزِيْ উভয়ের ভাষ্যকে খণ্ডন করে اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন– وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : اِنَّهٗ وُلِدَ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ اِلَى الْحَبْشَةِ অর্থাৎ সালামা [মুসলমানদের] হাবশায় হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর জন্মগ্রহণ করেন। তাই যদি হয় তাহলে তিনি তার মায়ের বিবাহের সময় সমঝদার কিশোরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে ওমর ইবনে আবি সালামাকে উকিল নিযুক্ত করা যথার্থই। কেননা উকিল হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত নয়; বরং সমঝদার বালককেও উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। যেমন হিদায়ার ১৭৯ নং পৃষ্ঠায় ইমাম কুদূরী (র.)-এর নিম্নোক্ত ভাষ্য বিবৃত হয়েছে–

وَاِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُوْرًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ اَوْ عَبْدًا مَحْجُوْرًا جَازَ الخ

قَالَ : وَيَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْحَاجَةِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِيْ إِلَى وُجُوْهِ الْخُصُوْمَاتِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا (رض) وَكَّلَ فِيْهَا عَقِيْلًا وَبَعْدَ مَا أَسَنَّ وَكَّلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ (رض) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যাবতীয় হক -এর ক্ষেত্রে স্বপক্ষ সমর্থনে উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ রয়েছে। কারণ সেই প্রয়োজন, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা প্রত্যেকে স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের সব ব্যাপার বুঝতে পারে না। আর বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত আলী (র.) আকীল [ইবনে আবূ তালিব]-কে স্বপক্ষ প্রমাণের উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। আর আকীল বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে উকিল নিযুক্ত করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُوْمَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যাবতীয় দাবি-দাওয়া এবং পাওনা হক বা অধিকার আদায়ের জন্য মামলা মকদ্দমা দায়ের করা ও দাবি উত্থাপনের জন্য উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ রয়েছে। কারণ এখানেও প্রয়োজন রয়েছে। আর আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রয়োজনের কারণে ওকালতকে বৈধ রাখা হয়েছে। মামলা মকদ্দমায় ওকালতের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট, কেননা সব মানুষ সঠিকভাবে মকদ্দমা চালাতে জানে না এবং আদালতের মারপ্যাঁচ ঝক্কি-ঝামেলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে না। সে ক্ষেত্রে যে এসব বুঝে তার উপর দায়িত্ব অর্পণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিধায় এ প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মামলা-মকদ্দমা চালানোর জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ।

قَوْلُهُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا الخ : মুসান্নেফ (র.) একটি মাওকূফ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন- كَانَ عَلِيٌّ يَكْرَهُ الْخُصُوْمَةَ وَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُوْمَةٌ وَكَّلَ فِيْهَا عَقِيْلَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَلَمَّا كَبُرَ عَقِيْلٌ وَكَّلَنِيْ . অর্থাৎ " হযরত আলী (রা.) মামলা-মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজে যাওয়া অপছন্দ করতেন। তাই যদি কখনো তাঁর মকদ্দমার প্রয়োজন হতো আকীল ইবনে আবী তালিবকে উকিল নিযুক্ত করে দিতেন। হযরত আকীল যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন আম-াকে উকিল নিযুক্ত করলেন। عَقِيْلُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ-কে নির্বাচন করার কারণ হলো তিনি খুব মেধাবী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একদিন আকীল (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসছিলেন আকীলের সাথে একটা লাঠি ছিল। হযরত আলী (রা.) কৌতুক করে বললেন, আমি, তুমি এবং এই লাঠি তিনটার ভেতর একটা আহাম্মক। আকীল সাথে সাথে উত্তরে বললেন, আমি আর আমার এ লাঠি তো আকলমন্দ। অর্থাৎ বাকি থাকছ তুমি, তোমারটা তুমিই ভালো জান, আর তুমি তো বলেই দিয়েছ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ أَحْمَقُ ; আকীল হযরত আলী (রা.) ও হযরত জাফর তাইয়ারের (রা.)-এর ভাই এবং দুজনের চেয়ে বড়। তিন ভাই মুসলমান হয়েছিলেন। আবূ তালেবের চার পুত্র ছিল তিনজন ইসলাম গ্রহণ ধন্য হয়েছেন। চতুর্থজনের নাম তালিব। তিনি বদর যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় না। হযরত আকীল (রা.) ৬০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আলী (রা.) কি কারণে মামলা মকদ্দমায় নিজে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করতেন না তা অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আলী (রা.) বলেন- إِنَّ لَهَا قُحَمًا وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَحْضُرُهَا অর্থাৎ "মামলায় অনেক কাঠিন্য থাকে এবং সেখানে শয়তানরা উপস্থিত হয়।" এ কারণে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, خُصُوْمَةٌ বা মকদ্দমায় নিজে শরিক না হয়ে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করা উত্তম। কেউ কেউ এর বিপরীত মতও পোষণ করেন।

وَكَذَا بِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا إِلَّا فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهِمَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُمَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَشُبْهَةُ الْعَفْوِ ثَابِتَةٌ حَالَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِلنَّدْبِ الشَّرْعِيِّ بِخِلَافِ غَيْبَةِ الشَّاهِدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الرُّجُوْعِ وَبِخِلَافِ حَالَةِ الْحَضْرَةِ لِانْتِفَاءِ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُحْسِنُ الْاِسْتِيفَاءَ فَلَوْ مُنِعَ عَنْهُ يَنْسَدُّ بَابُ الْاِسْتِيفَاءِ أَصْلًا وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) .

অনুবাদ : তদ্রূপ হদ্দসমূহ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য হক আদায়ের জন্য ও উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। ঐ দুটি উসুল করার ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়, যদি মুওয়াক্কিল হক উসুলের মজলিসে অনুপস্থিত থাকে। কেননা এ দুটি সামান্য সন্দেহের সম্ভাবনা দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে ক্ষমা করে দেওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান; বরং শরিয়তের উৎসাহ দানের প্রেক্ষিতে এটাই স্পষ্ট। সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সাক্ষ্য প্রত্যাহার না করাই স্বাভাবিক। তদ্রূপ মুওয়াক্কিলের উপস্থিতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ সন্দেহ রহিত হয়ে যায়। আর প্রত্যেকে হক উসুল করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যদি এ বিষয়ে উকিল নিয়োগ নিষেধ করা হয়, তাহলে হক উসুল করার রাস্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই যা কিছু উল্লেখ করলাম [যে যাবতীয় হকের ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ] তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا بِإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, হক আদায় এবং উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত। অর্থাৎ হদ্দ ও কিসাস উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়। সুতরাং কাজির আদালতে যদি মুওয়াক্কিল উপস্থিত না থাকে তাহলে উকিলের হদ্দ অথবা কিসাস উসুল করার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে উকিলের জন্য হদ্দ ও কিসাস উসুল করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। আর যদি মুওয়াক্কিল আদালতে উপস্থিত থাকে সে ক্ষেত্রে তো ইমাম চতুষ্টয়ের এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, উকিল হদ্দ এবং কিসাস উশুল করতে পারবে। সারকথা এই যে, মুওয়াক্কিলের উপস্থিতিতে উকিল চার ইমামের নিকটেই হদ্দ ও কিসাস উসুল করতে পারবে। কিন্তু মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে আহনাফের নিকট উকিলের জন্য হদ্দ ও কিসাস উসুল করা বৈধ নয়, আর অন্য তিন ইমামের মতানুসারে মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতেও উকিলের জন্য হদ্দ ও কিসাস উসুল করা বৈধ। -[আইনী]

আয়েম্মায়ে ছালাছার দলিল : আয়েম্মায়ে ছালাছার দলিল হলো, হদ্দ ও কিসাস হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, যাবতীয় হক্কুল ইবাদ আদায় এবং উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। কাজেই হদ্দ ও কিসাস উসুল করার জন্যও উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হবে। আর উকিলের জন্য হদ্দ ও কিসাস উসুল করা সর্বাবস্থায় বৈধ হবে। মুওয়াক্কিল আদালতে উপস্থিত থাক বা না থাক।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ الخ : আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, হদ্দ ও কিসাস عُقُوْبَاتٌ তথা দণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর দণ্ড شُبُهَاتٌ বা সংশয়ের কারণে রহিত হয়ে যায়। মুওয়াক্কিল আদালতে অনুপস্থিত হওয়ার সুরতে এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, যদি মুয়াক্কিল আদালতে উপস্থিত থাকত তাহলে সে খুনিকে খুনের দায় থেকে মুক্তি দিয়ে দিত এবং দয়ার্দ্র হয়ে ক্ষমা করে দিত; বরং এ সম্ভাবনা প্রবল। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَإِنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এবং فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ -এর ভিত্তিতে খুনি এবং অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া শরিয়তে পছন্দনীয়। সুতরাং যখন মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে খুনিকে ক্ষমা করে দেওয়ার شُبْهَة বা সন্দেহ-সম্ভাবনা বিদ্যমান, আর সন্দেহের কারণে عُقُوْبَاتٌ তথা দণ্ড অর্থাৎ হদ্দ ও কিসাস বর্জিত হয়, তখন মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে এ شُبْهَة বা সন্দেহের কারণে তার উকিলের হদ্দ এবং কিসাস উসুল করার এখতিয়ার থাকবে না। যেহেতু হদ্দ এবং কিসাস شُبُهَاتٌ তথা সন্দেহ-সংশয়ের দ্বারা বর্জিত হয়ে যায়।

شُبُهَاتٌ বা যে কোনো ধরনের সংশয়ের দ্বারা যে হদ্দ ও কিসাস রহিত বা বর্জিত হয়ে যায়– এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। যথা–

১. كِتَابُ الْقَاضِيْ اِلَى الْقَاضِيْ অর্থাৎ এক বিচারকের আদালতে দণ্ড প্রমাণিত হলো; কিন্তু তিনি হদ্দ বা কিসাস প্রয়োগ না করে যদি অন্য বিচারকের কাছে পত্র প্রেরণ করেন, তাহলে যেহেতু এক্ষেত্রে بَدَلِيَّتْ বা বিকল্প হওয়ার شُبْهَه থেকে যায় তাই অন্য বিচারকের জন্য অপরাধীর উপর শাস্তি প্রয়োগ বৈধ হয় না।

২. ঠিক তেমনিভাবে একই কারণে شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ -এর ভিত্তিতে হদও কিসাস প্রয়োগ করা যায় না। شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ -এর অর্থ হলো, মূল সাক্ষীর অনুপস্থিতে সাক্ষীর সাক্ষ্য যে প্রত্যক্ষ করেছে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩. শুবাহ বা সংশয়ের কারণে হদ্দ বা কিসাস বর্জিত হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ অর্থাৎ পুরুষের সাথে নারী সাক্ষীর ভিত্তিতে যদি কোনো দণ্ড প্রমাণিত হয় তা বর্জন করা হয়। অথচ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, شُبُهَاتٌ দ্বারা দণ্ড তথা হদ্দ এবং কিসাস রহিত বা বর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে উকিলের জন্য হদ্দ বা কিসাস উসুল করা কোনো ক্রমেই বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি হদ্দ অথবা কিসাসের সাক্ষ্য দেওয়ার পর সাক্ষী কাজির মজলিস থেকে চলে যায় তো সে ক্ষেত্রে সাক্ষীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও হদ্দ এবং কিসাস উসুল করা যায়। যদিও সেখানে সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসার شُبْهَه বা সন্দেহ থেকে যায়। কেননা বাহ্যিকভাবে তো এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষী তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসবে না। এজন্য যে, সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন তার فِسْق [পাপাচার] এবং كِذْب [মিথ্যাচার] -এর উপর ভিত্তি করেই হবে। আর মুসলমানের ক্ষেত্রে পাপাচার এবং মিথ্যাচার স্বাভাবিকত্বের পরিপন্থি বা خِلَافِ ظَاهِرٌ ; সুতরাং পাপাচার এবং মিথ্যাচারের দায় থেকে বাঁচার জন্য এটাই স্বাভাবিক যে সাক্ষী নিজের সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসবে না। আর যখন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন না করার ধারণাটাই প্রবল হলো, তখন তার অনুপস্থিতিতে হদ্দ ও কিসাস উসুল করার কোনো সমস্যা এবং বাধা নেই। অনুরূপ যদি মুওয়াক্কিল আদালতে উপস্থিত থাকে তাহলে উকিলের জন্য কিসাস উসুল করা বৈধ। কেননা মুওয়াক্কিল যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার ইচ্ছা করত তাহলে ক্ষমা করে দিত। কিন্তু যখন ক্ষমা করল না অথচ মুওয়াক্কিল আদালতে উপস্থিত, তখন ক্ষমা করে দেওয়ার شُبْهَه বা সম্ভাবনা বাকি থাকল না। আর যখন ক্ষমার সম্ভাবনা বা সন্দেহ বাকি থাকল না তখন কিসাস বর্জিত হবে না। আর যেহেতু কিসাস বর্জিত হয়নি তাই উকিল তা উসুল করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ يُحْسِنُ الْاِسْتِيْفَاءَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন :

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো, মুওয়াক্কিল যখন নিজেই আদালতে উপস্থিত তখন উকিল বানানোর কি প্রয়োজন, মুওয়াক্কিল নিজেই কিসাস উসুল করতে পারেন। কাজেই মুওয়াক্কিল উপস্থিত থাকা অবস্থায় উকিল বানানো বৈধ না হওয়াই উচিত।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সব মানুষ কিসাস উসুল করতে সক্ষম হয় না এবং ভালোভাবে কিসাস উসুলের যোগ্যতা রাখে না। এমতাবস্থায় যদি উকিল বানানোর অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে কিসাস উসুলের পথই বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেননা উকিল বানানোর তো আপনি অনুমতি দিচ্ছেন না। আর সে যে নিজে নিজে কিসাস উসুল করবে, এ যোগ্যতা তার নেই। কাজেই কিসাস উসুল করার পথই বন্ধ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَهٰذَا الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, এই যা কিছু আমরা উল্লেখ করলাম তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। هٰذَا الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ 'যা কিছু উল্লেখ করলাম' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য– وَيَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ الخ অর্থাৎ যাবতীয় হকের ক্ষেত্রে স্বপক্ষ সমর্থনে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। আর যেহেতু হদ্দ ও কিসাসও হকের অন্তর্ভুক্ত তাই হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রেও স্বপক্ষ সমর্থনে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। হ্যাঁ, অন্যান্য হক এবং হদ্দ ও কিসাসের মাঝে পার্থক্য আছে আর তা হলো, অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে যেমন স্বপক্ষ সমর্থনে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ তদ্রূপ সেসব হক আদায় ও উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করাও বৈধ। পক্ষান্তরে হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে যদিও স্বপক্ষ সমর্থনের উকিল নিযুক্ত করা বৈধ তথাপি এ দুটি আদায় ও উসুল করার ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয় যদি মুওয়াক্কিল হক আদায়ের মজলিসে অনুপস্থিত থাকে। হ্যাঁ, যদি মুওয়াক্কিল হদ্দ ও কিসাস উসুল করার মজলিসে উপস্থিত থাকে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য হকের মতো এখানেও উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। এ বিস্তৃত বিশ্লেষণ থেকে একথা বোঝা গেল যে, সাক্ষী দাঁড় করিয়ে হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। এ বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। যার সার-সংক্ষেপ হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যদি মুওয়াক্কিল আদালতে অনুপস্থিত থাকে তাহলে হদ্দ এবং কিসাস উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়; যেমনটি দলিল প্রমাণসহ উপরে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা সর্বাবস্থায় বৈধ।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِإِثْبَاتِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشُّهُوْدِ اَيْضًا وَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقِيْلَ مَعَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقِيْلَ هٰذَا اِخْتِلَافٌ فِىْ غَيْبَتِهٖ دُوْنَ حَضْرَتِهٖ لِاَنَّ كَلَامَ الْوَكِيْلِ يَنْتَقِلُ اِلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ حُضُوْرِهٖ فَصَارَ كَاَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِنَفْسِهٖ لَهُ اَنَّ التَّوْكِيْلَ اِنَابَةٌ وَشُبْهَةُ النِّيَابَةِ يُتَحَرَّزُ عَنْهَا فِىْ هٰذَا الْبَابِ كَمَا فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَمَا فِى الْاِسْتِيْفَاءِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْخُصُوْمَةَ شَرْطٌ مَحْضٌ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ مُضَافٌ اِلَى الْجِنَايَةِ وَالظُّهُوْرَ اِلَى الشَّهَادَةِ فَيَجْرِىْ فِيْهِ التَّوْكِيْلُ كَمَا فِىْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, [হদ্দ ও কিসাস উসুল করার ক্ষেত্রে যেমন উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয় তেমনিভাবে] সাক্ষী পেশ করার মাধ্যমে হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্যও উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুকূলে। আর কারো কারো মতে তা ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অনুকূলে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ মতপার্থক্য হলো মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, উপস্থিতির ক্ষেত্রে নয়। কেননা মুওয়াক্কিলের উপস্থিতির ক্ষেত্রে উকিলের বক্তব্য মুওয়াক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এমন হলো যেন সে নিজেই বক্তব্য প্রদান করছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উকিল নিযুক্ত করার অর্থ হলো নায়েব ও স্থলবর্তী নিযুক্ত করা। অথচ হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতার সন্দেহও পরিহার করা কর্তব্য। যেমন [এ বিষয়ে] সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে [সংশয়ের কারণে হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সাবধানতাবশত সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য আগ্রাহ্য হয়] এবং যেমন হদ্দ ও কিসাস উসুল করার ক্ষেত্রে [সন্দেহ-সংশয় থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তদ্রূপ হদ্দ ও কিসাস সাবেত করার ক্ষেত্রেও যে কোনো সংশয় ও সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা কর্তব্য]। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দাবি উত্থাপন হলো [হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য] নিছক শর্ত। [এর দ্বারা হদ্দ ও কিসাস ওয়াজিব হয় না এবং অপরাধও প্রকাশ পায় না।] কেননা হদ্দ ও কিসাস ওয়াজিব হওয়া অপরাধের দিকে সম্পৃক্ত। আর অপরাধের প্রকাশ সাক্ষ্যের দিকে সম্পৃক্ত হয়। [সাব্যস্ত করার আইনী প্রয়াসের দিকে নয়] সুতরাং অন্য সব হুকুমের ন্যায় এক্ষেত্রেও উকিল নিয়োগ চলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَجُوْزُ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যেমন হদ্দ ও কিসাস উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়, তদ্রূপ হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করাও বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত দ্বিধাবিভক্ত সুতরাং কেউ কেউ বলেন ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে। কোনো কোনো আলিম একথাও বলেছেন যে, ইমাম

আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মধ্যকার মতানৈক্য সেই ক্ষেত্রে, যখন মুওয়াক্কিল আদালতে অনুপস্থিত থাকে। কেননা মুওয়াক্কিলের উপস্থিতিতে উকিলের বক্তব্য মুওয়াক্কিলের দিকেই ফিরে আসে। সুতরাং এমন হলো যেন মুওয়াক্কিল নিজেই কথা বলেছে। আর কথা যখন মুওয়াক্কিল বলেছে বলেই ধরে নেওয়া হলো তখন হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করতে কোনো বাধা থাকল না।

قَوْلُهُ لَهُ اَنَّ التَّوْكِيْلَ اِنَابَةٌ وَشُبْهَةُ الخ :

বিতর্কিত মাসআলায় উভয় পক্ষের দলিল : উল্লিখিত মাসাআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে হদ্দ এবং কিসাস সাব্যস্ত করার জন উকিল নিযুক্ত করার অর্থ হলো নিজের নায়েব ও স্থলবর্তী নিযুক্ত করা আর স্থলবর্তীতার মাঝে সন্দেহ ও শুবাহ বিদ্যমান। অথচ হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে স্থলবর্তীতার সন্দেহও পরিহার করা হয়। কেননা হদ্দ ও কিসাস যে কোনো ধরনের সন্দেহের দ্বারা سَاقِطٌ তথা বর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং স্থলবর্তীতার সন্দেহের কারণে হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ নয়। যেমন স্থলবর্তীতার সন্দেহের কারণেই হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না এবং শুবাহ ও সন্দেহের কারণে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য দ্বারা হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ-এর মাধ্যমেও হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ [যেমন] ক্ষমা করে দেওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে কিসাস উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হয় না। তেমনিভাবে স্থলবর্তীতার সন্দেহের কারণে হদ্দ এবং কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দাবি উত্থাপন হলো হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য নিছক শর্ত। দাবি উত্থাপন ব্যতীত হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। আর দাবি উত্থাপন এবং মামলা দায়ের করা নিছক শর্ত এজন্য যে, দাবি উত্থাপনের দ্বারা হদ্দ ও কিসাস ওয়াজিব হয় না এবং অপরাধও প্রকাশ পায় না। কেননা হদ্দ ও কিসাস ওয়াজিব হওয়া অপরাধের দিকে সম্পৃক্ত আর অপরাধের প্রকাশ সাক্ষ্যের দিকে সম্পৃক্ত হয়, সাব্যস্ত করার আইনী প্রয়াসের দিকে নয়। সুতরাং দাবি উত্থাপন হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একটি শর্ত মাত্র। আর শর্ত হকসমূহের মাঝে একটি হক। আর ইতঃপূর্বে একথা বলা হয়েছে যে, যাবতীয় হকের ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। সুতরাং অন্যসব হকের ন্যায় এক্ষেত্রেও উকিল নিয়োগ বৈধ হবে।

وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ التَّوْكِيْلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ وَكَلَامُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِيْهِ أَظْهَرُ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّفْعَ غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَ الْوَكِيْلِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ عَلَيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ شُبْهَةِ عَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَا يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاءِ الْخَصْمِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مَرِيْضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا .

অনুবাদ : একই রকম মতপার্থক্যপূর্ণ যার বিরুদ্ধে হদ্দ বা কিসাসের দাবি উত্থাপিত হয়েছে, তার পক্ষ থেকে জবাবদিহি করার উকিল নিযুক্ত করার বিষয়টি। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট। কেননা [অন্যের দাবি] রোধ করার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ বাধা সৃষ্টি করে না। তবে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এক্ষেত্রে এ সন্দেহের অবকাশ আছে যে, মুওয়াক্কিল তাকে এ ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেনি। [কিন্তু সে মুওয়াক্কিলকে বিপদে ফেলানোর অভিসন্ধি করেছে।] ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মামলার কিংবা সাফাইয়ের উকিল নিয়োগ বৈধ নয়। তবে যদি মুওয়াক্কিল অসুস্থ হয়, কিংবা তিনদিন বা তাতোধিক দূরত্বে অনুপস্থিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ التَّوْكِيْلُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যার বিরুদ্ধে হদ্দ বা কিসাসের দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার পক্ষ থেকে জবাবদিহি করার উকিল নিযুক্ত করার বিষয়টি একই রকম মতপার্থক্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যার বিরুদ্ধে হদ্দ বা কিসাসের দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার পক্ষ থেকে জবাবদিহি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বৈধ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য এক্ষেত্রেও দ্বিধা-বিভক্ত।

قَوْلُهُ وَكَلَامُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِيْهِ أَظْهَرُ الخ : উল্লিখিত মাসআলা অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার পক্ষ থেকে জবাবদিহি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা– এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য পূর্বের মাসআলার তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট। অর্থাৎ যখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হদ্দ ও কিসাস সাব্যস্ত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হলো তো যার উপর হদ্দ অথবা কিসাস আরোপিত হয়েছে তার পক্ষ থেকে হদ্দ এবং কিসাস প্রতিহত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা আরো বেশি বৈধতার দাবি রাখে। কেননা যেই شُبْهِ بَدَلِيَّتْ বা স্থলবর্তীতার সন্দেহের কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) পূর্বের মাসআলায় উকিল নিযুক্ত করা অবৈধ বলেছিলেন, তা হদ্দ এবং কিসাস প্রতিহত করার প্রতিবন্ধক হয় না। অর্থাৎ شُبُهَاتْ তথা সন্দেহ-সংশয় থাকা সত্ত্বেও হদ্দ এবং কিসাস প্রতিহত হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ বলে মূলনীতি বিদ্যমান থাকলেও دَفْعُ الْحُدُوْدِ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ বলে কোনো মূলনীতি নেই। এ কারণেই সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য এবং পুরুষ-নারীর সম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা কিসাস ক্ষমা করা প্রমাণিত হলে তা সাব্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ মূল সাক্ষীর পক্ষ থেকে যদি যৌগিক সাক্ষীরা এ সাক্ষ্য দেয় যে, নিহতের অভিভাবকরা কিসাস ক্ষমা করে দিয়েছে, অথবা একজন পুরুষ এবং দুজন

মহিলা সাক্ষ্য দেয় যে, নিহতের অভিভাবকরা কিসাস ক্ষমা করে দিয়েছে তো এই شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ তথা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য এবং شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ তথা নারী পুরুষের সম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা কিসাস থেকে নিষ্কৃতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন শুবাহ বা সন্দেহ থাকা অবস্থায় হদ্দ ও কিসাস থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, তো যার বিরুদ্ধে হদ্দ বা কিসাসের দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার উকিল নিযুক্ত করা شُبْهَةَ بَدَلِيَّتْ তথা স্থলবর্তীতার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও বৈধ হবে। হ্যাঁ, এখানে এতটুকু কথা অবশ্য বলতেই হয় যে, যদি উকিল কাজির মজলিসে নিজের মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়। অর্থাৎ এমন বলে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমার মুওয়াক্কিলই হত্যাকারী, তো উকিলের এ স্বীকারোক্তি اِسْتِحْسَانٌ তথা সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে না। যদিও কিয়াস এবং যুক্তির দাবি হচ্ছে উকিলের এ স্বীকারোক্তি কবুল করা। উকিলের এ স্বীকারোক্তি কবুল করা যে যুক্তি এবং قِيَاسٌ -এর দাবি, তার কারণ হলো, উকিল নিয়োগ বিশুদ্ধ হলে উকিল মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হয়, কাজেই উকিলের স্বীকার করা মুওয়াক্কিলের স্বীকারোক্তির মতোই হবে। আর মুওয়াক্কিলের নিজের বিরুদ্ধে নিজের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয় তাই তার উকিলের স্বীকারোক্তিও গ্রহণযোগ্য হবে। اِسْتِحْسَانٌ বা সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে উকিলের স্বীকারোক্তি সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ হলো, উকিলের স্বীকারোক্তি মুওয়াক্কিলের স্বীকারোক্তির স্থলবর্তী বা قَائِم مَقَامْ হয়। আর কিসাস এমন হুজ্জত দ্বারা উসুল করা যায় না যা অন্যের স্থলবর্তী হয়। এছাড়া আরো একটি কারণ আছে যেটাকে লেখক لِمَا فِيْهِ مِنْ شُبْهَةِ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো, এক্ষেত্রে এ شُبَه বা সন্দেহও বিদ্যমান যে মুওয়াক্কিল উকিলকে স্বীকার করার নির্দেশ প্রদান করেনি। আর মুওয়াক্কিলের আদেশ ছাড়া উকিলের স্বীকারোক্তির অধিকার নেই। আর যখন উকিলের স্বীকারোক্তির অনুমতি থাকল না, তখন এই شُبَه তথা সন্দেহের কারণে মুওয়াক্কিলের বিরুদ্ধে উকিলের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يَجُوْزُ الخ : হেদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মামলার উকিল নিয়োগের ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মামলার উকিল নিয়োগ বৈধ নয়। চাই মুওয়াক্কিল বাদী হোক বা বিবাদী হোক।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاءِ الْخَصْمِ : প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া এক্ষেত্রে পুরুষ-নারী, পর্দানশিন-বেপর্দা, কুমারী-বিবাহিতা সবাই সমান। অর্থাৎ যদি বিবাদীর সম্মতি ছাড়া মামলা পরিচালনার উকিল নিয়োগ করে তাহলেও নাজায়েজ। আর যদি বিবাদী বাদীর সম্মতি ছাড়া মকদ্দমার জবাবদিহির জন্য উকিল নিয়োগ করে তাও নাজায়েজ।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِّلُ الخ : হ্যাঁ, যদি মুওয়াক্কিল অসুস্থ হয় অথবা তিনদিন বা ততোধিক দূরত্বে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া উকিল নিয়োগ করতে পারবে। অসুস্থতা বলতে যে কোনো রোগ-ব্যাধি বুঝানো উদ্দেশ্য। অবশ্য কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, অসুস্থতা দ্বারা এমন রোগ উদ্দেশ্য যে রোগের কারণে সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে কাজির দরবারে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর হয়। অথবা নড়াচড়ার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

وَ قَالَا يَجُوزُ التَّوْكِيْلُ بِغَيْرِ رِضَاءِ الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اللُّزُوْمِ لَهُمَا أَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفٌ فِيْ خَالِصِ حَقِّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى رِضَاءِ غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيْلِ بِتَقَاضِي الدُّيُوْنِ وَلَهُ أَنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحِقٌّ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهٰذَا يَسْتَحْضِرُهُ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُوْنَ فِي الْخُصُوْمَةِ فَلَوْ قُلْنَا بِلُزُوْمِهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى رِضَاهُ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا كَاتَبَهُ اَحَدُهُمَا يَتَخَيَّرُ الْاٰخَرُ بِخِلَافِ الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا اَرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقُّقِ الضَّرُوْرَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةً لَمْ تَجْرِ عَادَتُهَا بِالْبُرُوْزِ وَحُضُوْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ قَالَ الرَّازِيُّ (رحـ) يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ لِأَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ لَا يُمْكِنُهَا اَنْ تَنْطِقَ بِحَقِّهَا لِحَيَائِهَا فَيَلْزَمُ تَوْكِيْلُهَا قَالَ (رضـ) وَهٰذَا شَيْءٌ اِسْتَحْسَنَهُ الْمُتَاَخِّرُوْنَ .

অনুবাদ : সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়াও উকিলের নিযুক্তি বৈধ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এ অভিমত। নিযুক্তির বৈধতা সম্পর্কে মতভিন্নতা নয়; বরং মতভিন্নতা হলো [প্রতিপক্ষের উপর] বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে। সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে, এটা হলো খালেস তার নিজস্ব হক -এর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ। সুতরাং অন্যের সম্মতির উপর তা নির্ভর করবে না। যেমন− ঋণ উসুল করার ব্যাপারে উকিল নিযুক্তকরণ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জওয়াব তলব করা হচ্ছে প্রতিপক্ষের কাছে বাদীর প্রাপ্য অধিকার। এ কারণেই বাদী কাজির মজলিসে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি দাবি করতে পারে। আর দাবি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বেশকম হয়ে থাকে। সুতরাং উকিল নিযুক্তির বিষয়টিকে প্রতিপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক বলে রায় দিলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং সেটা তার সম্মতির উপর নির্ভর করবে। যেমন− শরিকি গোলামের সাথে যদি দুই মনিবের একজন কিতাবাত চুক্তি করে তাহলে অপরজন ইচ্ছাধিকার লাভ করে। অসুস্থ ও মুসাফিরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে জওয়াব তলব করা তাদের কাছে [বাদীর] প্রাপ্য অধিকার নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেমন মুসাফিরের পক্ষ হতে উকিলের নিযুক্তি [প্রতিপক্ষের জন্য] বাধ্যতামূলক, তেমনি প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সফরের এরাদা করলেও বাধ্যতামূলক হবে। আর স্ত্রীলোক যদি এমন পর্দানশিন হয় যে, বাইরে বের হওয়া এবং কাজির মজলিসে যাওয়ার অভ্যাস তার নেই, সেক্ষেত্রে আবূ বকর রাযী (র.) বলেন, তার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্তি বাধ্যতামূলক। কেননা সে উপস্থিত হলেও লজ্জার কারণে নিজের হক সম্পর্কে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তার উকিল নিযুক্ত করা [প্রতিপক্ষের জন্য] জরুরি হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, مُتَاَخِّرِيْن ফকীহগণ এ বক্তব্য পছন্দ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَا يَجُوزُ التَّوْكِيْلُ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, প্রতিপক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত উকিল নিয়োগ বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এ অভিমত। এ একই অভিমত ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও।

হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা এবং সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মামলায় উকিল নিযুক্তির বৈধতা নিয়ে কোনো মতভিন্নতা নেই; বরং মতভিন্নতা হলো প্রতিপক্ষের উপর বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে। অর্থাৎ যদি মুওয়াক্কিল প্রতিপক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়াই কাউকে মামলা পরিচালনার উকিল নিয়োগ করে তো এ উকিল নিযুক্তি ইমাম আবূ হানীফা এবং

সাহেবাইন (র.) তিনজনের মতেই বৈধ। কিন্তু আবশ্যকতা এবং বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ উকিল নিয়োগ বাধ্যতামূলক হবে না; বরং প্রতিপক্ষের রদ করার দ্বারা রদ হয়ে যাবে। আর প্রতিপক্ষের রদ করার পরে যদি উকিল কাজির আদালতে মামলা পেশ করে তো প্রতিপক্ষের উপর কাজির আদালতে উপস্থিত হওয়াও আবশ্যক হবে না এবং জবাব দেওয়াও আবশ্যক হবে না।

আর সাহেবাইনের মতে এ নিযুক্তি বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যক হবে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের রদ করার দ্বারা উকিল নিযুক্তি রদ হবে না; বরং প্রতিপক্ষের উপর কাজির আদালতে হাজির হয়ে উকিলের দায়ের করা মামলার জবাব দেওয়া আবশ্যক হবে। হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতার এই মন্তব্য যে, "মতভিন্নতা বাধ্যতামূলক হওয়া সম্পর্কে" এর উপর ভিত্তি করে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য لَا يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ -এর অর্থ হবে لَا يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ الخ অর্থাৎ جَوَازٌ বা বৈধতা বলে لُزُوْم বা বাধ্যতা বুঝানো হয়েছে। আর ইবারতের তরজমা হলো, ইমাম সাহেব বলেন যে, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মামলা পরিচালনার উকিল নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি মুওয়াক্কিল অসুস্থ হয় অথবা তিনদিন বা ততোধিক দূরত্বে অবস্থিত থাকে। আর সাহেবাইন বলেন যে, প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া উকিল নিয়োগ করলে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মামলা মুকদ্দমায় উকিল নিয়োগ করলে তা প্রতিপক্ষের জন্যে বাধ্যতামূলক হয় না; বরং প্রতিপক্ষের রদ করার দ্বারা তা রদ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তবে যদি মুওয়াক্কিল অসুস্থ থাকে অথবা মুসাফির হয়। আর সাহেবাইনের মতে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া উকিল নিয়োগ বাধ্যতামূলক হয়। প্রতিপক্ষের রদ করার দ্বারা তা রদ হয় না।

একটি আপত্তি ও তার উত্তর : এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) لَا يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ الخ এখানে হেদায়া গ্রন্থপ্রণেতা لَا يَجُوْزُ -কে- لَا يَلْزَمُ -এর অর্থ করলেন কিভাবে? جَوَازٌ আর لُزُوْم কি এক? এর উত্তর হলো, جَوَازٌ যদিও لُزُوْم -এর সমার্থক নয় তথাপি যা لَازِم হয় তা নাজায়েজ হতে পারে না; বরং যা লাজেম হয় তা জায়েজ হতে বাধ্য। অন্য কথায় جَوَازٌ টা لُزُوْم -এর জন্য আবশ্যক। তথা فَيَكُوْنُ مِنْ لَوَازِمِ اللُّزُوْمِ আর مَجَازًا তথা ذِكْرِ اللَّازِمِ وَاِرَادَةِ الْمَلْزُوْمِ অর্থাৎ কোনো বস্তু উল্লেখ করে তার জন্য যা আবশ্যক তা বুঝানো উদ্দেশ্য। রূপক অর্থে এমন বহু ব্যবহার বিদ্যমান।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفٌ فِىْ خَالِصِ الخ : সাহেবাঈনের দলিল হলো, উকিল নিযুক্তি একান্ত তার নিজস্ব হকের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ। কেননা মুওয়াক্কিল হয়তো মামলার উকিল নিযুক্ত করবে অথবা জবাবদিহির জন্য উকিল নিযুক্ত করবে। আর এ দুটোই মুওয়াক্কিলের নিজস্ব হক। আর যা একান্ত নিজস্ব হক হয় তাতে পদক্ষেপ গ্রহণ অন্য কারো সম্মতির উপর মওকুফ থাকতে পারে না। তাই মামলা মকদ্দমায় উকিল নিযুক্তি প্রতিপক্ষের সম্মতির উপর মওকুফ থাকবে না। যেমন– ঋণ উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা ঋণগ্রহীতাদের সম্মতির উপর নির্ভর করে না। কেননা মুওয়াক্কিলের ঋণ উসুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা একান্ত নিজস্ব হকের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ। কাজেই এ উকিল নিযুক্তি ঋণগ্রহীতাদের সম্মতির উপর নির্ভর করবে না এবং ঋণ পরিশোধের জন্য উকিল নিযুক্তি ঋণদাতাদের সম্মতির উপর নির্ভর করবে না। কেননা ঋণ পরিশোধের জন্য উকিল নিযুক্তি মুওয়াক্কিলের নিজস্ব হক। কাজেই এ উকিল নিযুক্তিকরণ ঋণদাতাদের সম্মতির উপর নির্ভর করবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحِقٌّ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সাহেবাঈনের একথা বলা যে, মামলা-মকদ্দমায় উকিল নিযুক্তি মুওয়াক্কিলের একান্ত নিজস্ব হকে পদক্ষেপ গ্রহণ– আমরা একথা মানি না। কেননা [উদাহরণত] বিবাদীর কাছে জবাব তলব করা হচ্ছে বাদীর প্রাপ্য অধিকার এবং জবাব দেওয়া বিবাদীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই বাদী প্রতিপক্ষকে কাজির মজলিসে উপস্থিত করার দাবি করতে পারে। সুতরাং যখন প্রতিপক্ষের কাছে জবাব তলব করা বাদীর প্রাপ্য হক হলো তখন জবাবদিহি শুধুই বিবাদীর হক থাকল না। এখন যদি বিবাদী জবাব দেওয়ার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে এ উকিল নিযুক্তি শুধুই বিবাদীর নিজস্ব হকের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ হবে না; বরং বাদীর হকের মাঝেও হস্তক্ষেপ হবে। তাই বিবাদী যদি জবাবদিহির জন্য উকিল নিযুক্ত করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে বাদীর সম্মতি পেতে হবে। বাদীর সম্মতি ছাড়া বিবাদীর পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ বৈধ হবে না।

এ দলিল শুধু সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' যেখানে বিবাদীর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে বাদীর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করা কেন প্রতিপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না? সে বিষয়টি উপরিউক্ত দলিল দ্বারা স্পষ্ট হয় না। তাই লেখক وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُوْنَ الخ দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি দলিল বর্ণনা করেছেন। এ দলিলের সারমর্ম হলো, আমরা মেনে নিলাম যে, উকিল নিযুক্তি একান্ত মুওয়াক্কিলের নিজস্ব হকে পদক্ষেপ গ্রহণ, কিন্তু মানুষের নিজস্ব ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা তখনই শুদ্ধ

হয় যখন পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি না হয়। আর যদি সেই পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে অন্য কারো ক্ষতি সাধিত হয় তো সে ক্ষেত্রে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ হবে না। এখানেও ঠিক একই কথা। অর্থাৎ যখন মুওয়াক্কিল মামলায় কাউকে উকিল নিয়োগ করে তো এই উকিল নিযুক্তির দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় নিজের প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেননা মামলা মকদ্দমায় মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হয়। কেউ কেউ এমন চতুর এবং পটু হয় যে, সে ভুলকেও শুদ্ধ প্রমাণিত করে ছাড়ে। আর কতক এমন বোকা এবং অপটু হয় যে, সঠিক কথাকেও সঠিক প্রমাণিত করতে পারে না। সুতরাং একথার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায় যে, মুওয়াক্কিল মামলা পরিচালনার জন্য এমন চতুর এবং বাকপটু মানুষকে উকিল করবে যার দ্বারা তার প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধিত হবে। এ কারণেই যদি আমরা একথা বলি যে, মামলা-মকদ্দমায় উকিল নিযুক্তি বৈধ আর এ নিযুক্তি প্রতিপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের প্রতিহত করার দ্বারা তা প্রতিহত হবে না। তাহ-লে এর দ্বারা তার প্রতিপক্ষের ক্ষতি হবে। আর যেহেতু মুওয়াক্কিলের প্রতিপক্ষের ক্ষতি হয় তাই উকিল নিয়োগ করতে হলে মুওয়াক্কিলকে অবশ্যই তার প্রতিপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। তার সম্মতি ছাড়া এ নিযুক্তি তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। যেমন– শরিকি গোলামের সাথে যদি দুই মনিবের একজন কিতাবাত চুক্তি করে, তাহলে এ চুক্তি অপর মনিবের জন্য বাধ্যতামূলক হয় না; বরং অপরজন ইচ্ছাধিকার লাভ করে। ইচ্ছা করলে সে কিতাবাত চুক্তিকে বহাল রাখতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে তা বাতিলও করে দিতে পারে। কেননা শরিকি গোলামের সাথে কিতাবাত চুক্তি করা যদিও একান্ত চুক্তিকারীর নিজস্ব হকে পদক্ষেপ গ্রহণ, তথাপি এ চুক্তির কারণে অন্য শরিকের ক্ষতিও হয়। এ কারণে গোলামের সাথে কৃত কিতাবাত চুক্তির স্থায়িত্ব অপর শরিকের সম্মতির উপর নির্ভর করবে। মাসআলাটিকে স্পষ্ট করার জন্য আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যথা– এক ব্যক্তি কারো কোনো ঘোড়া সওয়ারির জন্য ভাড়া নিল। এখন যদি ভাড়াগ্রহীতা ঐ ঘোড়াটি অন্য কোনো মানুষকে ভাড়ারূপে প্রদান করে। তো ভাড়াগ্রহীতা কর্তৃক ঘোড়াটি অন্য কারো কাছে ভাড়া প্রদান যদিও নিজস্ব হকে পদক্ষেপ গ্রহণ তথাপি এমনটি বৈধ নয়। কেননা এতে মূল মালিকের ক্ষতি হয়। এ কারণে যে, আরোহণের ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রকম হয়। কেউ খুব অভিজ্ঞ হয়, তার আরোহণে জানোয়ারের একদম ক্লান্তি আসে না। আবার কেউ এমন আনাড়ি এবং অনভিজ্ঞ হয় যে, তাঁর আরোহণে জন্তুর খুব কষ্ট হয়। সুতরাং এ ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে ভাড়াগ্রহীতার জন্য মালিকের সম্মতি ব্যতীত ঘোড়া ভাড়া দেওয়া বৈধ নয়।

ঋণ উসুলের জন্য উকিল নিযুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা ঋণ হলো ঋণদাতার একটি সুনির্ধারিত হক। উকিল এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ক্ষতি সাধন ব্যতীত তা কবজা করতে পারবে। এ কারণে ঋণ উসুলের জন্য ঋণগ্রহীতার সম্মতি ছাড়াই উকিল নিয়োগ বৈধ।

বাকি রইল একথা যে, ইমাম সাহেবের মতে মুওয়াক্কিল অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকাকালীন সময়ে প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়াই উকিল নিযুক্তি বৈধ কেন?

এর উত্তর হলো, মুওয়াক্কিল [বিবাদী] যদি অসুস্থ হয় তাহলে অসুস্থতার কারণে তার উপর জবাব প্রদান ওয়াজিব নয়। আর যদি মুসাফির হয় তাহলে অনুপস্থিতির কারণে জবাব প্রদান ওয়াজিব নয়। আর যখন উল্লিখিত অপারগতার কারণে তার উপর জবাব প্রদান ওয়াজিব থাকল না, তখন সে উকিল বানিয়ে একান্ত নিজের হকে পদক্ষেপ গ্রহণ করল। আর এর দ্বারা বাদীর ক্ষতি সাধনও তার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই যখন অসুস্থ এবং মুসাফিরের উকিল নিযুক্তির উদ্দেশ্য কারো ক্ষতি সাধন এবং একান্ত নিজস্ব হকে প্রদক্ষেপ গ্রহণ না হয় তখন তার এ পদক্ষেপ প্রতিপক্ষের সম্মতির উপর নির্ভর করবে না; বরং তার সম্মতি ব্যতীতই উকিল নিয়োগ বৈধ হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ عِنْدَهُ الخ : হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেমন প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া মুসাফিরের পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ বৈধ তদ্রূপ যখন মুওয়াক্কিল সফরের এরাদা করে তখনও প্রতিপক্ষের সম্মতি ছাড়া উকিল নিযুক্তি বৈধ। কেননা এক্ষেত্রে উকিল নিযুক্তির প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু কাজি তাকে তার সফরের এরাদার ব্যাপারে সত্যায়িত করবেন না; বরং তার সফরসঙ্গীদের কাছে খোঁজখবর নেবেন। অথবা তার বেশভূষা এবং সফরের প্রস্তুতি দেখবেন। অর্থাৎ যদি নিদর্শনাদি অবলোকনে তার সফরের এরাদা সঠিক বলে বিবেচিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্তি গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় গ্রহণ করা হবে না। –[কাযীখান]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةً الخ : উক্ত ইবারতে হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা একথা বলেন যে, যদি কোনো স্ত্রীলোক এমন পর্দানশিন হয় যে বাইরে বের হওয়ার এবং কাজির মজলিসে যাওয়ার অভ্যাস তার নেই, তো ইমাম আবূ বকর জাসসাস রাযী (র.) বলেন, এমন স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের সম্মতি ব্যতীতই উকিল নিযুক্তি প্রতিপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক বলে বিবেচ্য। কেননা যদি সে আদালতে উপস্থিত হয়, তাহলে যেহেতু সে লজ্জায় কথা বলতে পারবে না, সুতরাং তার হক বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই তার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ এবং বাধ্যতামূলক হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটাকে مُتَأَخِّرِيْن ফকীহগণ পছন্দ করেছেন।

قَالَ : وَمِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ اَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْاَحْكَامُ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مَالِكًا لِيَمْلِكَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ الْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ لِاَنَّهُ يَقُوْمُ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِى الْعِبَارَةِ فَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْعِبَارَةِ حَتّٰى لَوْ كَانَ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ اَوْ مَجْنُوْنًا كَانَ التَّوْكِيْلُ بَاطِلًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিল নিয়োগ করার জন্য শর্ত হলো, মুওয়াক্কিলকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে এবং সে কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হয়। কেননা উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হয়ে থাকে। সুতরাং মুওয়াক্কিল নিজে [ঐ পদক্ষেপ গ্রহণের] মালিক হতে হবে যাতে সে অন্যকে মালিক বানাতে পারে। আর এ-ও শর্ত যে, উকিল এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে চুক্তি কি তা বোঝে এবং এর ইচ্ছা করতে সক্ষম। কেননা বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উকিল মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী হয়ে থাকে। সুতরাং তার বক্তব্য দানের যোগ্য হওয়া শর্ত হবে। তাই যদি এমন নাবালক হয় যে চুক্তির বোধ রাখে না কিংবা পাগল হয়, তাহলে তার উকিল নিযুক্তি বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ اَنْ يَكُوْنَ الخ : উপরিউক্ত ভাষ্যে লেখক ওকালতের দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি শর্ত মুওয়াক্কিলের জন্য আবশ্যক অপরটি উকিলের জন্য আবশ্যক। প্রথম শর্তটি হলো, মুওয়াক্কিল এমন ব্যক্তি হতে হবে যে নিজে কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে এবং সে কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হয়। আর এর দলিল হলো, উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হয়ে থাকে এবং মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি নিজেই কোনো জিনিসের উপর সক্ষম নয় সে অন্যকে সক্ষমতা দেবে কিভাবে? কাজেই মুওয়াক্কিলের নিজেই ঐ পদক্ষেপ গ্রহণের মালিক হতে হবে যাতে সে অন্যকে মালিক বানাতে পারে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) মুওয়াক্কিলের স্বয়ং পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হওয়া এবং কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হওয়া উভয়টিকে মুওয়াক্কিলের মাঝে একটি শর্ত বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনুল হুমাম দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন শর্তরূপে গণ্য করেছেন–

১. মুওয়াক্কিলকে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হতে হবে।

২. কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হতে হবে।

এ দ্বিতীয় শর্তটি দ্বারা বারণকৃত শিশু এবং বারণকৃত দাস [যার ব্যবসায় ইত্যাদির অনুমতি থাকে না] বেরিয়ে যায়। কেননা তাদের উপর কোনো বিধান কার্যকর হয়নি। কাজেই তারা দুজন যদি কোনো কিছু ক্রয় করে তারা তার মালিক হবে না। অর্থাৎ ক্রয় চুক্তি তাদের উপর কার্যকর হবে না। সুতরাং যখন এরা দুজন নিজেদের ক্রয়কৃত বস্তুর মালিক হতে পারে না, তখন এরা কাউকে উকিল নিয়োগ করলে তা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে? মূলভাষ্যে উল্লিখিত শর্ত দুটি হোক অথবা দুটি মিলে একটি

হোক। যাহোক উল্লিখিত ভাষ্যের উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুওয়াক্কিলের জন্য এ শর্ত করা যে, মুওয়াক্কিল নিজেও পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হতে হবে এটি সাহেবাইনের মত অনুযায়ী তো ঠিক হয়। কেননা সাহেবাইনের মতে মুসলমান কর্তৃক জিম্মিকে মদ এবং শূকর ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তি বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী তো এ শর্ত যথাযথ নয়। কেননা ইমাম সাহেবের মতে, মুসলমান কর্তৃক কোনো জিম্মিকে মদ ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তি বৈধ। অথচ মুসলমান মুওয়াক্কিল নিজে এ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী নয়। অর্থাৎ [শরিয়তের পক্ষ থেকে] মুসলমান মদ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। অদ্রূপ মুহরিম [ইহরাম অবস্থায়] মুহরিম নয় এমন ব্যক্তিকে শিকারি জানোয়ার বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করতে পারে, কিন্তু মুওয়াক্কিল নিজে তার অধিকার রাখে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের উপর উত্থাপিত আপত্তির উত্তর হলো, মুওয়াক্কিলের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হওয়ার অর্থ হলো, মূল পদক্ষেপের অধিকারী হবে। যদিও কোনোস্থানে কোনো কারণবশত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা থাকায় সক্ষম না হয়। সুতরাং মৌলিক বিবেচনায় মুসলমানের জন্য মদ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ছিল। যদিও নিষেধাজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর নিষেধের কারণে মদ ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অদ্রূপ মুহরিম মৌলিক বিবেচনায় শিকারি জানোয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী, যদিও নিষেধাজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা তথা রাসূল ﷺ-এর নিষেধের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

যাহোক যখন মুসলমান মৌলিক বিবেচনায় মদ ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী, আর মুহরিম শিকারি জানোয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী তখন মুওয়াক্কিলের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হওয়া বলতে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মুওয়াক্কিলের শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের أَهْلِيَّتْ তথা যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা থাকা। অর্থাৎ আকেল বালেগ হওয়া, যার দ্বারা কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হয়। সুতরাং যদি মুওয়াক্কিল আকেল তথা জ্ঞানসম্পন্ন এবং বালেগ তথা সাবালক হয় তাহলে তার জন্য অন্যকে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। এ উত্তরের পরে আর উল্লিখিত আপত্তি আসবে না। কেননা মুসলমানের জন্য মদ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া এবং মুহরিমের জন্য শিকারি জানোয়ার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া এবং তার أَهْلِيَّتْ বা উপযুক্ততাকে শেষ করে দেয় না।

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَكِيْلُ مِمَّنْ الخ : দ্বিতীয় শর্ত যেটা উকিলের মাঝে থাকা আবশ্যক সেটা হলো, উকিল এমন ব্যক্তি হতে হবে যে চুক্তির অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম অর্থাৎ সে যেন একথা বুঝে যে, বিক্রয়ের দ্বারা বিক্রেতার মালিকানা শেষ হয়ে যায় এবং ক্রয়ের দ্বারা ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়। অদ্রূপ সে যেন غَبْن يَسِيْر তথা সামান্য লোকসান এবং غَبْن فَاحِشْ তথা অস্বাভাবিক লোকসান সম্পর্কে অবহিত হয়। আর উকিল যেন চুক্তির ইচ্ছা করে অর্থাৎ সে যেন চুক্তি করতে কৌতুকের আশ্রয় গ্রহণকারী না হয়; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মনিয়োগকারী হয়।

দলিল হলো, কথা বলার ক্ষেত্রে উকিল মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী। এ কারণেই উকিলের মাঝে কথা বলার যোগ্যতা থাকা একান্ত আবশ্যক এবং শর্ত। আর কথা বলার যোগ্যতা যেহেতু বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা হয়, তাই উকিলের আকেল বা বুদ্ধি-বিচারসম্পন্ন মানুষ হওয়াও আবশ্যক। কাজেই যদি উকিল অবুঝ শিশু অথবা বয়স্ক পাগল হয় তাহলে এ নিযুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এদের কথার সাথে কোনো হুকুম সম্পৃক্ত হয় না।

وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ وَالْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مَالِكٌ لِلتَّصَرُّفِ وَالْوَكِيلَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا جَازَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلِهِمَا لِأَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَالْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ عَلَى نَفْسِهِ مَالِكٌ لَهُ وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَالتَّوْكِيلُ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا الْتِزَامُ الْعُهْدَةِ أَمَّا الصَّبِيُّ لِقُصُورِ أَهْلِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ لِحَقِّ سَيِّدِهِ فَتَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ يَتَخَيَّرُ كَمَا إِذَا عَثَرَ عَلَى عَيْبٍ ـ

অনুবাদ : আর যদি আকেল বালেগ স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তাদের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তবে তা বৈধ। কেননা এখানে মুওয়াক্কিল পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী আর উকিলও বক্তব্যদানের যোগ্য। তদ্রূপ যদি সে এমন কোনো নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বালককে যে ক্রয়-বিক্রয় বুঝে কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে তা জায়েজ হবে। তবে চুক্তির হক [ও বিধান] তাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং তাদের মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা এ ধরনের নাবালক তো বক্তব্য দানের যোগ্য। এ কারণেই তো তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তার পদক্ষেপ কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে গোলাম হলো নিজের উপর হস্তক্ষেপ করার যোগ্য ও অধিকারী। শুধু মনিবের ক্ষেত্রে সে এর অধিকারী নয়। [তাই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়েও স্থগিত থাকে] আর তাকে উকিল বানানো মনিবের হকের মধ্যে হস্তক্ষেপ নয়। তবে এ দুজনের পক্ষ থেকে দায় গ্রহণ বৈধ নয়। নাবালকের ক্ষেত্রে এজন্য যে, তার যোগ্যতা ত্রুটিপূর্ণ। আর গোলামের ক্ষেত্রে তার মনিবের হক বিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং তা মুওয়াক্কিলের উপরই অবশ্য সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ক্রেতা যদি বিক্রেতার অবস্থা সম্পর্কে না জানে আর পরে জানতে পারে যে, সে নাবালক কিংবা [মাঝে মধ্যে দেখা দেয় এমন] পাগল কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত তাহলে তার উক্ত চুক্তি বাতিল করার ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা সে এ ধারণাবশত চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যে, তার প্রাপ্য হকসমূহের সম্পর্ক হবে চুক্তিকারীর সাথে। সুতরাং যখন তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেল তখন সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমনটা [বিক্রীত দ্রব্যের] দোষ সম্পর্কে অবহিত হলে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الخ : যদি আকেল, বালেগ, স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তাদের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তবে তা বৈধ। উপরিউক্ত ভাষ্য ইমাম কুদূরী (র.)-এর। নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা বলেন, "ইমাম কুদূরী (র.)-এর উচিত ছিল এখানে আকেলের قَيْد সংযোজন করার। কেননা পাগল যদি কাউকে উকিল বানায় তবে তা শুদ্ধ হয় না। আর সম্ভবত ইমাম কুদূরী (র.) এ শর্তকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেননি এ কারণে যে, এ শর্ত সকলের নিকট

স্বীকৃত তাই নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেননি। অথবা এ কারণে যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে আকেলই হয়। মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ভিন্নভাবে আকেল قَيْد যুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি।"

সাহেবে নাতায়েজের এ বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, কুদূরীতে عَاقِلْ কয়েদটি অনুপস্থিত এবং নাতায়েজের বক্তব্য যথার্থ প্রমাণিত হয় মুখতাসারুল কুদূরীর বাংলাদেশী নুসখা এবং হিন্দুস্থানী নুসখা দেখলে। তদ্রূপ আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবগার পরিশোধিত মিসরী নুসখাও আকেল কয়েদমুক্ত। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের হিদায়ার নুসখাসমূহে কুদূরীর যে ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে তাতে عَاقِلْ -এর কয়েদ বিদ্যমান। আমাদের ধারণা সম্ভবত হিদায়া প্রণেতা মতনের মাঝে নিজে থেকেই عَاقِلْ -এর কয়েদ বাড়িয়ে দিয়েছেন। অথবা পরবর্তী কোনো نَاسِخْ তথা কিতাব নকলকারী এ বাড়তি কয়েদ সংযোজন করেছেন। যাহোক তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, যদি আকেল বালেগ স্বাধীন ব্যক্তি কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তাদের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তবে তা বৈধ। আল্লামা কাকী (র.) বলেন, এর এ অর্থ নয় যে, উকিল মুওয়াক্কিলের মতো না হলে ওকালত শুদ্ধ হবে না; বরং যখন নিজের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করলে তা বৈধ হয় তখন নিজের চেয়ে উত্তম অবস্থাসম্পন্ন মানুষকে উকিল বানালে তো তা আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে। عَقْلِىْ বা যুক্তিগতভাবে এর তিন সুরত বের হয় আর তিনটি সুরতই বৈধ। যথা–

১. নিজের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করা যথা– স্বাধীন আকেল বালেগ কোনো স্বাধীন ব্যক্তি আকেল বালেগকে অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কোনো অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে উকিল নিযুক্ত করা।

২. নিজের চেয়ে ভালো অবস্থার কাউকে উকিল নিযুক্ত করা। যথা – অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কর্তৃক কোনো স্বাধীন আকেল বালেগকে উকিল বানানো।

৩. নিজের চেয়ে নিচের কাউকে উকিল নিযুক্ত করা। যথা– স্বাধীন মানুষ কর্তৃক কোনো অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে উকিল বানানো। তিন সুরতেই উকিল নিযুক্তির বৈধতার দলিল হলো, তিন সুরতেই মুওয়াক্কিল পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী এবং উকিল বক্তব্যদানের যোগ্য। আর যেখানে মুওয়াক্কিল পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হয় এবং উকিল বক্তব্যদানের যোগ্য হয় সেখানে ওকালত শুদ্ধ হয়। কাজেই উল্লিখিত তিন সুরতেই ওকালত শুদ্ধ এবং বৈধ হবে।

এ বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরে এখানে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য إِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا الخ অর্থাৎ যদি বালেগ স্বাধীন কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তাদের মতো কাউকে উকিল নিযুক্ত করে এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, উকিল মুওয়াক্কিলের মতো বা অনুরূপ হলেই শুধু নিযুক্তি শুদ্ধ হবে তা নয়; বরং উপরে বিবৃত ব্যাখ্যা অনুসারে মুওয়াক্কিলের অধঃস্তন এবং উর্ধ্বতন কাউকে উকিল নিয়োগ করলে তাও শুদ্ধ হবে। তাই ইমাম কুদূরীর مِثْلَهُمَا বলা ত্রুটিপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। যদিও ইনায়া ভাষ্যগ্রন্থ প্রণেতা একে শুদ্ধ করার জন্য তাবীলের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু নাতায়েজ প্রণেতার বক্তব্যই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তিনি বলেন, কুদূরীর ইবারত আপত্তিমুক্ত নয়। এ স্থলে যদি এভাবে ব্যক্ত করা হয়– وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ كُلًّا مِنْهُمَا তাহলে সেটিই যথাযথ এবং অধিক শুদ্ধ বিবেচিত হবে। সদরুশ শরীয়া বেকায়ার টীকাগ্রন্থে এমন মতই প্রকাশ করেছেন– قَالَ صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ فِىْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ : وَلَوْ قَالَ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ أَشْمَلُ الخ

قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো স্বাধীন আকেল বালেগ এমন কোনো নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বালককে উকিল বানায় যে ক্রয়-বিক্রয় বোঝে কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামকে উকিল বানায় তো এ উকিল নিযুক্তি বৈধ। তবে এ দুজনের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো হক সম্পৃক্ত হবে না; বরং এদের মুওয়াক্কিলদের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এ একই মত ইমাম আহমদেরও।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বালক এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামকে উকিল বানানো বৈধ নয়।

আহনাফের দলিল হলো, ওকালত শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত। একটি হলো, মুওয়াক্কিল পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হবে এবং কর্মের বিধান তার উপর কার্যকর হতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো, উকিল এমন ব্যক্তি হতে হবে যে চুক্তি কি? তা বোঝে এবং

বক্তব্য দানের উপযুক্ত হবে। আলোচ্য মাসআলায় তো দুই শর্তই বিদ্যমান। কেননা মুওয়াক্কিল স্বাধীন আকেল বালেগ হওয়ার কারণে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী এবং তার উপর চুক্তির বিধানও কার্যকর হয়। আর উকিল সমঝদার বালক। আর আকেল তথা সমঝদার বালক বক্তব্যদানের যোগ্য। এ কারণেই তো সমঝদার বালকের পদক্ষেপ তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে কার্যকর হয়। সুতরাং যখন আকেল বালক বক্তব্যদানের যোগ্যতা রাখে, তার উকিল হওয়ার জন্য এটাই আবশ্যক, তো আকেল বালকের উকিল হওয়া শুদ্ধ এবং বৈধ হতে কোনো বাঁধা রইল না। বাকি থাকল গোলাম তো সেও পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী এবং নিজের উপর পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রাখে। এ কারণেই তো যদি গোলাম নিজের উপর কারো সম্পদের দায় স্বীকার করে তাহলে স্বাধীন হওয়ার পর তার উপর তা আদায় করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তদ্রূপ গোলামের নিজের উপর হদ্দ ও কিসাস স্বীকার করাও শুদ্ধ সাব্যস্ত হয়। যাহোক গোলাম নিজের জাতের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্য যদিও মনিবের হকের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী নয়। আর মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে কোনো গোলামকে উকিল নিযুক্ত করা তার মনিবের হকে হস্তক্ষেপ নয়। কেননা নিযুক্তির শুদ্ধতা উকিলের বক্তব্যদানের সক্ষমতা এবং উপযুক্ততার সাথে সম্পৃক্ত। আর এ দু বিষয়েই গোলাম মানুষ হিসেবে মৌলিক স্বাধীনতা তার আছে। অর্থাৎ সে এই দু-বিষয়ে স্বাধীন মানুষের সমান। কাজেই যখন গোলাম নিজের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী, আর উকিল নিযুক্তি মনিবের হকের মধ্যে হস্তক্ষেপের ব্যাপারেও নয়, তখন গোলামকে উকিল বানানো সর্বতভাবেই শুদ্ধ। হ্যাঁ, এতটুকু কথা অবশ্যই থেকে যায় যে, বালক এবং গোলামের উপর কোনো দায় আপতিত হবে না। বালকের উপর তো এজন্যে যে, নাবালেগ হওয়ার কারণে তার উপযুক্ততা এবং যোগ্যতা অসম্পূর্ণ। আর গোলামের উপর এজন্য যে, তার মনিবের ক্ষতি হবে। বিধায় মনিবের হকের কারণে মনিবের ক্ষতি দূর করার জন্য গোলামের উপর কোনো জিম্মাদারি বর্তাবে না। যাহোক যখন বালক এবং গোলামের উপর কোনো জিম্মাদারি বা দায় বর্তাতে পারে না, তখন এদের দুজনের সাথে হক সম্পৃক্ত হবে না; বরং এদের মুওয়াক্কিলদের সাথে হক সম্পৃক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمُشْتَرِىْ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, যদি ক্রয়ের সময় ক্রেতা বিক্রেতার [বিক্রেতার উকিলের] অবস্থা জানতে না পারে যে, সে স্বাধীন আকেল বালেগ কিনা? পরবর্তীতে সে জানতে পেল যে, বিক্রেতা নাবালক অথবা পাগল কিংবা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত তাহলে তার উক্ত চুক্তি বাতিল করার ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা ক্রেতা এ ধারণাবশত চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যে, তার প্রাপ্য হকসমূহের সম্পর্ক হবে চুক্তিকারীর সাথে। সুতরাং যখন তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেল তখন সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমন বিক্রীত দ্রব্যের দোষ সম্পর্কে অবহিত হলে ক্রেতা خِيَارِ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করার পরিপূর্ণ অধিকার লাভ করে।

জ্ঞাতব্য : এখানে মূল ইবারতে তিনটি শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। صَبِىٌّ، مَجْنُوْنٌ، مَحْجُوْرٌ তথা বালক, পাগল এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত। এ ইবারতকে শুদ্ধ মেনে নিলে পাগল দ্বারা এমন পাগল উদ্দেশ্য হবে যে কখনো কখনো মানসিক ভারসাম্যতা ফিরে পায় আর তখন সে ক্রয়-বিক্রয় বুঝতে পারে। সুতরাং এ সূরতে পাগলের হুকুম তাই হবে যেমনটি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত নাবালক এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের বেলায় হয়। কিন্তু লেখকের [হিদায়া প্রণেতার] লিখিত নুসখার হাশিয়ায় مَجْنُوْن -এর স্থলে مَحْجُوْر শব্দ রয়েছে অর্থাৎ এভাবে ইবারত লিখিত আছে– ثُمَّ عُلِمَ اَنَّهُ .... اَوْ مَحْجُوْرٌ নাতায়েজুল আফকারের নুসখায়ও مَجْنُوْن শব্দ অনুপস্থিত সেখানে ইবারত এভাবে লিখিত হয়েছে– ثُمَّ عُلِمَ اَنَّهُ صَبِىٌّ اَوْ عَبْدٌ مَحْجُوْرٌ আল্লামা নাসাফী (র.) -এর اَلْكَافِىْ -তেও مَجْنُوْن শব্দ অনুপস্থিত সেখানে ইবারত এভাবে বিবৃত হয়েছে– ثُمَّ عُلِمَ اَنَّهُ صَبِىٌّ مَحْجُوْرٌ اَوْ عَبْدٌ مَحْجُوْرٌ এসব উদ্ধৃতি থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, مَجْنُوْن শব্দটি ইবারতে পরবর্তী কোনো লেখকদের থেকে ভুলক্রমে এসে গিয়েছে مَجْنُوْن -এর স্থলে مَحْجُوْر শব্দটিই শুদ্ধ বলে অনুমিত হয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ

قَالَ : وَالْعَقْدُ الَّذِىْ يَعْقِدُهُ الْوُكَلَاءُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ كُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ إِلٰى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوْقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيْلِ دُوْنَ الْمُوَكِّلِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْحُقُوْقَ تَابِعَةٌ لِحُكْمِ التَّصَرُّفِ وَالْحُكْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ فَكَذَا تَوَابِعُهُ وَصَارَ كَالرَّسُوْلِ وَالْوَكِيْلِ فِى النِّكَاحِ وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيْلَ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيْقَةً لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقُوْمُ بِالْكَلَامِ وَصِحَّةُ عِبَارَتِهِ لِكَوْنِهِ أٰدَمِيًّا وَكَذَا حُكْمًا لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِىْ عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ كَانَ سَفِيْرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنٰى عَنْ ذٰلِكَ كَالرَّسُوْلِ إِذَا كَانَ كَذٰلِكَ كَانَ أَصِيْلًا فِى الْحُقُوْقِ فَيَتَعَلَّقُ حُقُوْقُ الْعَقْدِ بِهِ وَلِهٰذَا قَالَ فِى الْكِتَابِ يُسَلِّمُ الْمَبِيْعَ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرٰى وَيَقْبِضُ الْمَبِيْعَ وَيُخَاصِمُ فِى الْعَيْبِ وَيُخَاصَمُ فِيْهِ لِأَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مِنَ الْحُقُوْقِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ خِلَافَةً عَنْهُ إِعْتِبَارًا لِلتَّوْكِيْلِ السَّابِقِ كَالْعَبْدِ يَتَّهِبُ وَيَصْطَادُ وَيَحْتَطِبُ هُوَ الصَّحِيْحُ قَالَ وَفِىْ مَسْأَلَةِ الْعَيْبِ تَفْصِيْلٌ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিল যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে, তা দু প্রকার। এমন সব চুক্তি যা উকিল নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে। যেমন– বিক্রয় চুক্তি এবং ইজারা ও ভাড়া চুক্তি, এগুলোর যাবতীয় হক উকিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে– মুওয়াক্কিলের সঙ্গে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কেননা যাবতীয় হক চুক্তিলব্ধ বিধানের অনুগামী। আর চুক্তিলব্ধ বিধান তথা মালিকানা মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং অনুগামীগুলোও মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। এভাবে সে প্রেরিত দূত এবং বিবাহের উকিলের মতো হবে।
আমাদের দলিল হলো, প্রকৃতপক্ষে উকিলই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী। কেননা চুক্তি নির্ধারিত বক্তব্য দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে। আর তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা [উকিল হওয়ার সূত্রে নয়; বরং] মনিব হওয়ার সূত্রে বৈধ। তদ্রূপ বিধানের দিক থেকেও [উকিলই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী] কেননা তার চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি সে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে শুধু বার্তবাহক হতো তাহলে চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারত না। প্রেরিত দূতের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে। উকিল যখন এ অবস্থানের অধিকারী হলো তখন যাবতীয় হক [প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য] -এর ক্ষেত্রে সেই হবে মূল ব্যক্তি। সুতরাং চুক্তির হকসমূহ তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে। এজন্যই কিতাবে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, উকিলই বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করবে এবং মূল্য গ্রহণ করবে এবং যদি সে খরিদ করে তাহলে তার কাছে মূল্য দাবি করা হবে। আর সে-ই বিক্রীত দ্রব্য কবজা করবে। আর [বিক্রীত হলে] দোষ সম্পর্কে তাকেই বিবাদী করা হবে; পক্ষান্তরে [ক্রেতা হলে] সেই দোষ সম্পর্কে বাদী হবে। কেননা এসবই হলো চুক্তিলব্ধ হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর মুওয়াক্কিলের জন্য যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়, সেটা পূর্ববর্তী উকিল নিযুক্তির ভিত্তিতে উকিলের বদল হিসেবে। যেমন– গোলাম হেবা কবুল করে, শিকার করে এবং কাঠ সংগ্রহ করে আর মনিব সেগুলোর মালিক হয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। গ্রন্থকার (র.) বলেন, দোষ সংক্রান্ত মাসআলায় বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْعَقْدُ الَّذِىْ يَعْقِدُهُ الْوُكَلَاءُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিল যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে তা দু প্রকার– ১. এমন সব চুক্তি যা উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ২. ঐসব চুক্তি যার হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা একটু পরে ভিন্ন প্যারাগ্রাফে আসছে।

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, প্রত্যেক ঐ চুক্তি উকিল যেটাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে, আর তার এ সম্পর্কযুক্ত করা শুদ্ধ হয়। আর মুওয়াক্কিলের দিকে সেই চুক্তি সম্পৃক্ত করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। যেমন– বিক্রয় চুক্তি এবং ইজারা ও ভাড়া চুক্তি। তো এ চুক্তির হকসমূহ উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে– মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। অর্থাৎ এ চুক্তির দায়ভার উকিলের উপর বর্তাবে। মুওয়াক্কিলের উপর কোনো দায়দায়িত্ব আসবে না। যেমন উকিল বলল, আমি তোমার হাতে এ জিনিস বিক্রয় করলাম। তো পণ্য হস্তান্তর করা উকিলের দায়িত্ব।

নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা এ মূলনীতির উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, উকিল যদি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বালক বা গোলাম হয় তাহলে তাদের উভয়ের চুক্তির যাবতীয় হক মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যদিও চুক্তিকে উকিল নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে। যেমন পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ চুক্তির হকসমূহের দায়-দায়িত্ব মুওয়াক্কিলের উপর বর্তাবে– উকিলের উপর নয়। এ একই অভিমত ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তির হকসমূহ حُكْم تَصَرُّفْ তথা মালিকানার অনুগামী আর حُكْم তথা মালিকানা মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ যদি চুক্তির হস্তক্ষেপ বিক্রয়ের উকিল করে থাকে, তাহলে মুওয়াক্কিলই মূল্যের মালিক হবে আর যদি ক্রয়ের উকিল চুক্তির হস্তক্ষেপ করে থাকে তাহলে মুওয়াক্কিলই পণ্যের মালিক হবে। মোটকথা, সর্বাবস্থায় মালিকানা মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হয়। আর যখন মালিকানা মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হয় তখন তার تَوَابِعْ অর্থাৎ চুক্তির হকসমূহও মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হবে এবং মুওয়াক্কিলের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর এভাবে উকিল ব্যক্তি প্রেরিত দূত এবং বিবাহের উকিলের মতো হয়ে গেল। আর প্রেরিত দূত এবং বিবাহের উকিল সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তির হকসমূহের দায়িত্বশীল হয় না অর্থাৎ হকসমূহ না প্রেরিত দূতের দিকে ফিরে, না বিবাহের উকিলের দিকে ফিরে। সুতরাং এভাবেই এ ক্ষেত্রেও চুক্তির হকসমূহ উকিলের দিকে ফিরবে না; বরং মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরবে।

প্রেরিত দূতের উদাহরণ : যায়েদ ওমরকে বকরের কাছে প্রেরণ করল। ওমর পয়গাম পৌছাল যে, যায়েদ এ পয়গাম দিয়েছে– আমি তোমার ঘোড়া একশত টাকায় ক্রয় করলাম। আর বকর এটাকে মঞ্জুর করল তো প্রেরিত দূত অর্থাৎ ওমরের সাথে কোনো হক সম্পৃক্ত হবে না। অর্থাৎ তার উপর কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না। তদ্রূপ বিবাহের উকিল দায়িত্বশীল নয়। অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের উকিলও দায়ীত্বশীল নয়; বরং মুওয়াক্কিল দায়িত্বশীল।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ الْوَكِيْلَ هُوَ الْعَاقِدُ الخ : আমাদের দলিল হলো, এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী حَقِيْقَةً অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেও এবং حُكْمًا তথা বিধানগতভাবেও উকিল। উকিল প্রকৃত প্রস্তাবে তো এজন্য চুক্তি সম্পাদনকারী যে, চুক্তি নির্ধারিত বক্তব্য দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে। আর বক্তব্য প্রদানকারী উকিল– মুয়াক্কিল নয়। কাজেই চুক্তি সম্পাদনকারী উকিল হলো– মুওয়াক্কিল নয়। আর উকিলের বক্তব্য শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্যও; কিন্তু উকিলের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা উকিল হওয়ার সূত্রে নয়; বরং একজন আকেল মানুষ হওয়ার সূত্রে। অর্থাৎ আকেল মানুষ হওয়ার কারণে উকিলের اِيْجَابْ তথা প্রস্তাব দান এবং اِسْتِيْجَابْ তথা প্রস্তাব গ্রহণের যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা রয়েছে। উকিল হওয়ার কারণে এই উপযুক্ততা অর্জিত হয়েছে এমন নয়; বরং মানব

হওয়ার সূত্রে। সুতরাং যখন চুক্তি নির্ধারিত বক্তব্য দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে, আর উকিলের মাঝে মানুষ হওয়ার সূত্রে বক্তব্য প্রদান অর্থাৎ ইজাব কবুল তথা প্রস্তাব দান এবং প্রস্তাব গ্রহণের যোগ্যতা এবং উপযুক্ততাও বিদ্যমান তখন এ চুক্তি উকিলের দিক থেকেই সংঘটিত হবে এবং উকিলই চুক্তি সম্পাদনকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا حُكْمًا الخ : তদ্রূপ বিধানের দিক থেকেও উকিলই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী। حُكْمًا তথা বিধানগতভাবে উকিল চুক্তি সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, উকিলের চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে শুধু বার্তাবাহক হতো তাহলে চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারত না। যেমন– প্রেরিত দূত প্রেরণকারীর দিকে চুক্তিকে সম্পৃক্ত না করে পারে না এবং বিবাহের উকিল মুওয়াক্কিলের দিকে বিবাহ চুক্তি সম্পৃক্ত না করে পারে না। আর যখন এমনই হলো অর্থাৎ উকিল এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবেও চুক্তি সম্পাদনকারী এবং বিধানগতভাবেও চুক্তি সম্পাদনকারী, তখন যাবতীয় প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য হকের ক্ষেত্রে সেই হবে মূল ব্যক্তি বা اَصْل; আর যখন উকিল চুক্তির যাবতীয় হকের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি সাব্যস্ত হলো তখন চুক্তির হকসমূহ তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে এবং তার দিকেই ফিরবে।

قَوْلُهُ فَلِهٰذَا قَالَ فِى الْكِتَابِ الخ : আর উকিল যেহেতু যাবতীয় হকের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি বা اَصْل হয়, এ কারণেই ইমাম কুদূরী مُخْتَصَرُ الْقُدُوْرِىْ-তে বলেন। কেউ কেউ বলেন, قَالَ-এর فَاعِلْ হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)। আর اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ অথবা اَلْمَبْسُوْطُ।

ইমাম কুদূরী বা ইমাম মুহাম্মদ যেই হন তারা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি বিক্রয়ের উকিল হয় তাহলে সেই বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করবে এবং মূল্য গ্রহণ করবে। আর যদি ক্রয়ের উকিল হয় তাহলে তার কাছে মূল্য দাবি করা হবে, আর সেই বিক্রীত দ্রব্য কবজা করবে। আর যদি উকিল বিক্রেতা হয় আর ক্রেতার কাছে পণ্যের কোনো দোষ প্রকাশিত হয় তো সেক্ষেত্রে ক্রেতা সেই দোষ সম্পর্কে উকিলকেই বিবাদী করবে। আর যদি উকিল ক্রেতা হয় আর বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে কোনো দোষ পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উকিলই সেই দোষ সম্পর্কে বাদী হয়ে বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলবে– মুওয়াক্কিল নয়। কেননা এসবই চুক্তিলব্ধ হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যাবতীয় চুক্তিলব্ধ হক উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কাজেই উল্লিখিত সমস্ত বিষয় উকিলের দিকেই ফিরবে। আর উকিলই এসবের জিম্মাদার এবং দায়িত্বশীল হবে।

قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ خِلَافَةً عَنْهُ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জওয়াব দেওয়া উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই ছিল যে, উকিল যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে তার সবই মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। তার কারণ যাবতীয় হক চুক্তিলব্ধ বিধানের অনুগামী। আর চুক্তিলব্ধ বিধান তথা মালিকানা মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং অনুগামীগুলোও মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। জওয়াবের সারাংশ হলো, পূর্ববর্তী উকিল নিযুক্তির ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের জন্য মালিকানা যদিও শুরুতেই সাব্যস্ত হয় তথাপি সেটা اِصَالَةً বা মৌলিকভাবে নয়; বরং উকিলের نِيَابَةً বা স্থলাভিষিক্ততার ক্ষেত্রে। আর মুওয়াক্কিল উকিলের নায়েব মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে। যাহোক মালিকানা মুওয়াক্কিলের জন্য শুরুতেই সাব্যস্ত হয়ে যায়, যদিও মৌলিকভাবে সাব্যস্ত হয় না; বরং স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন মুওয়াক্কিলের জন্য মৌলিকভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, তখন মালিকানার অনুগামী হয়ে চুক্তির হকসমূহও মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হয় না। আর যখন মুওয়াক্কিলের জন্যে হকসমূহ সাব্যস্ত হয় না, তখন উকিলের জন্য সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ كَالْعَبْدِ يَتَّهِبُ وَيَصْطَادُ الخ : মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের উকিলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এমনই যেমন গোলাম হেবা কবুল করে, শিকার করে এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আর মনিব সেগুলোর মালিক হয়। অর্থাৎ হেবাকৃত বস্তু, শিকার এবং কাষ্ঠের মালিক শুরুতেই মনিব হয়, কিন্তু মৌলিকভাবে নয়; বরং গোলামের স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতে মনিবের মালিকানা অর্জিত হয়। কেননা উপরিউক্ত মাধ্যমসমূহ দ্বারা মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে মনিব গোলামের স্থলাভিষিক্ত। তদ্রূপ উকিলের স্থলাভিষিক্ততায় মুওয়াক্কিলের জন্য।

قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ الخ : মুওয়াক্কিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করার এ পদ্ধতি আবূ তাহের দাবাবাস -এর পদ্ধতি। এটাকেই অধিকাংশ হানাফী পছন্দ করেছেন। সারাখসী (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। আর হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতাও বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু শায়খ আবুল হাসান আল কারখী (র.) বলেন যে, ক্রয় সূত্রে মালিকানা তো শুরুতেই উকিলের জন্য সাব্যস্ত হয়, কিন্তু পুনরায় মুওয়াক্কিলের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং যখন ইমাম কারখী (র.)-এর মতে মালিকানা শুরুতে উকিলের জন্য সাব্যস্ত হয় তখন মালিকানার অনুগামী হয়ে চুক্তির হকসমূহও উকিলের জন্য সাব্যস্ত হবে– মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হবে না।

সারকথা হলো, শায়খ আবূ তাহের দাবাবাসের মতে উকিলের কোনো বস্তু ক্রয় করার সূত্রে মালিকানা শুরুতেই মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হয় কিন্তু তা মৌলিকভাবে নয়; বরং উকিলের স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতে। আর ইমাম কারখী (র.)-এর মতে মালিকানা শুরুতে তো উকিলের জন্য সাব্যস্ত হয়; কিন্তু এরপর মুওয়াক্কিলের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

আবূ তাহের দাব্বাসের মত সঠিক হওয়ার দলিল হলো, যদি উকিল নিজের স্ত্রীকে খরিদ করে যে অন্যের দাসী অথবা নিজের কোনো মাহরাম নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করে যে অন্যের গোলাম তো না এই বিবাহ ফাসেদ হয় আর না ঐ নিকটাত্মীয় তার উপর আজাদ হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, ক্রেতা অর্থাৎ উকিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয় না; বরং শুরুতেই মুওয়াক্কিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়। যদিও তা উকিলের স্থলাভিষিক্ততার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়। কেননা যদি উকিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে প্রথম সুরুতে তার বিবাহ ফাসেদ হয়ে যায়। এজন্যে যে, স্বত্বাধিকারীর বিবাহের দ্বারা বিবাহের মালিকানা ফাসেদ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় সুরতে ক্রয়কৃত গোলাম আজাদ হয়ে যায়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ ; ইমাম কারখী (র.)-এর পক্ষ থেকে দাবাবাসের যুক্তির এ উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, عِتْق কার্যকর হওয়ার জন্য مِلْك مُسْتَقَرّ তথা স্থিতিশীল মালিকানার প্রয়োজন। আর উকিলের মালিকানা স্থিতিশীল নয়; বরং তা বিনা বিলম্বে মুওয়াক্কিলের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তাই এ অস্থিতিশীল মালিকানার কারণে উকিলের নিকটাত্মীয় উকিলের ক্রয়ের কারণে আজাদ হয়ে যাবে না। কিন্তু এ উত্তর আপত্তিকর। কেননা তা রাসূল ﷺ -এর বক্তব্য مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ -এর إِطْلَاق তথা কয়েদমুক্ততার পরিপন্থি। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে নিকটাত্মীয়ের মালিক হবে– তিনি স্থায়ী মালিক হওয়ার কয়েদ লাগাননি। কাজেই দাবাবাসের যুক্তির বিপক্ষে কারখীর কোনো যুক্তি গ্রাহ্য না থাকায় একথা বলতেই হয় যে, দাববাসের বক্তব্যটিই অধিক বিশুদ্ধ।

নাতায়েজুল আফকার গ্রন্থপ্রণেতা এবং ইনায়া প্রণেতা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জওয়াব এবং উকিলের জন্য চুক্তির হকসমূহ সাব্যস্ত করার জন্য এভাবে দলিল বর্ণনা করেছেন যে, উকিলের পদক্ষেপের দুটি দিক রয়েছে–

১. উকিলের বক্তব্য দ্বারা পদক্ষেপ অর্জিত হওয়া।

২. পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিলের নায়েব হওয়া। এখন যদি আমরা প্রথম দিকটির ধর্তব্য করে মালিকানা এবং হকসমূহ উভয়টিকেই উকিলের জন্য সাব্যস্ত করে দেই যেমনটি যুক্তিরও দাবি, তাহলে মুওয়াক্কিল তাকে উকিল নিযুক্ত করা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ সুরতে উকিল আর উকিল থাকবে না; বরং মূল হয়ে যাবে। অথচ উকিল পদক্ষেপ গ্রহণে মুওয়াক্কিল নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত– মূল ব্যক্তি নয়। আর যদি মালিকানা এবং হক উভয়টিকে উকিলের জন্য সাব্যস্ত করি তাহলে উকিলের চুক্তির জন্য বক্তব্য প্রদান নিরর্থক হয়ে যাবে। অথচ চুক্তি উকিলের কথার দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। সুতরাং দুই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা মালিকানা তো মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত করেছি। কেননা মালিকানা হাসিল করাই উকিল নিযুক্তির লক্ষ্য হয়। এদিকেই হিদায়া প্রণেতা اِعْتِبَارًا لِلتَّوْكِيْلِ السَّابِقِ দ্বারা ইশারা করেছেন। আর হকসমূহ উকিলের জন্য সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, চুক্তির এই প্রথম প্রকারে হকসমূহ উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়, মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

قَوْلُهُ وَفِىْ مَسْأَلَةِ الْعَيْبِ الخ : লেখক বলেন, عَيْب -এর মাসআলায় কিছুটা তফসীল আছে যেটাকে আমরা اَلْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ।

قَالَ : وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ إِلَى مُوَكِّلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُوْنَ الْوَكِيْلِ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيْلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيْمُهَا لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِيْ عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُوْلِ وَهٰذَا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيْهَا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَيَتَلَاشٰى فَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُوْرُهُ مِنْ شَخْصٍ وَثُبُوْتُ حُكْمِهِ لِغَيْرِهِ فَكَانَ سَفِيْرًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, যে সমস্ত চুক্তি উকিল তার মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে, যেমন– বিবাহ, খোলা, স্বেচ্ছাকৃত হত্যা থেকে সমঝোতা; এ সকল ক্ষেত্রে চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে; উকিলের সঙ্গে নয়। সুতরাং স্বামীর উকিলের কাছে মহরের তাগাদা করা যাবে না। তদ্রূপ স্ত্রীর উকিলের দায়িত্ব নয় স্ত্রীকে স্বামীর হাতে অর্পণ করা। কেননা এ সকল চুক্তির ক্ষেত্রে উকিল হলো শুধু বার্তাবাহক। তুমি কি জান না যে, এ কারণেই উকিল চুক্তিগুলোকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারে না। তাই [বিবাহের ক্ষেত্রে] যদি চুক্তিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে বিবাহ তার জন্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সে [এ সকল চুক্তির ক্ষেত্রে] প্রেরিত দূতের মতো হলো। এর কারণ হলো, এ সকল চুক্তির ক্ষেত্রে বিধান তার কারণ থেকে পৃথক হয় না। কেননা এ চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে سَبَبْ বা কারণটি হচ্ছে রহিতকরণ জাতীয়। এখানে হুকুমটি বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এটা কল্পনা করা সম্ভব নয় যে, سَبَبْ [বা কারণ] মৌলিকভাবে একজন থেকে প্রকাশ পাবে আর বিধান সাব্যস্ত হবে অন্যের অনুকূলে। কাজেই উকিল [এক্ষেত্রে] সাফীর বা মধ্যস্থতাকারী হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ إِلَى مُوَكِّلِهِ الخ : উকিলরা যে সকল চুক্তি সম্পাদন করে তা দু ধরনের। কিছু চুক্তি আছে যেগুলোকে উকিল নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে, আর কতক চুক্তি আছে যেগুলোকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে। এতক্ষণ প্রথম প্রকারের আলোচনা হয়েছে। এখান থেকে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

উল্লিখিত ভাষ্যে ইমাম কুদূরী (র.) দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ঐ সকল চুক্তি যেগুলোকে উকিল মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে– এ ব্যাপারে মূলনীতি বর্ণনা করছেন যে, যে সকল চুক্তি মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না; বরং মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক এবং জরুরি হয়, সে সকল চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে– উকিলের সাথে নয়। অর্থাৎ চুক্তির যাবতীয় হকের দায়িত্বশীল মুওয়াক্কিল হবে। আর উকিলের উপর কোনো দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। যথা– বিবাহ, খুলা এবং স্বেচ্ছাকৃত হত্যা থেকে সমঝোতা; এ সকল ক্ষেত্রে চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। যাবতীয় হক মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরবে– উকিলের দিকে ফিরবে না। কাজেই বিবাহ চুক্তিতে যদি কেউ স্বামীর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয় তাহলে মহরের তাগাদা স্বামীর কাছে করতে হবে। উকিলের কাছে মহরের তাগাদা করা যাবে না। তদ্রূপ যদি

মহিলার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয়, তাহলে উকিলের দায়িত্ব হবে না স্ত্রীকে স্বামীর কাছে অর্পণ করা; বরং স্ত্রীর উপর আবশ্যক হবে নিজেকে নিজে অর্পণ করা। আর খুলার চুক্তিতে যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয় তাহলে খুলার বিনিময় আদায়ের তাগাদা উকিলের কাছে করা যাবে না; বরং স্ত্রীর কাছে করতে হবে। আর যদি স্বামীর পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয় তাহলে খুলার বিনিময়ের তাগাদার অধিকার স্বামীর হবে– উকিলের হবে না। অনুরূপ স্বেচ্ছাকৃত হত্যা থেকে সমঝোতার ক্ষেত্রে যদি নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে উকিল হয় তাহলে হত্যাকারী থেকে بَدَل صُلْح তথা সমঝোতায় নির্ধারিত বিনিময় এবং بَدَل قِصَاص-এর তাগাদার অধিকার উকিলের হবে না; বরং নিহতের অভিভাবকদের হবে। আর যদি হত্যাকারীর পক্ষ থেকে উকিল হয় তাহলে কিসাসের বিনিময়ের তাগাদা হত্যাকারীর কাছেই করা হবে– উকিলের কাছে নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ الخ : এ সকল হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হলো, এসব চুক্তিতে উকিল শুধু বার্তাবাহক এবং ব্যক্তকারী হয়। আর বার্তাবাহক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে অন্যের বক্তব্য নকল করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যের বক্তব্য নকল করে তার উপর অন্যের বক্তব্যের বিধানাবলি আবশ্যক হয় না। যেমন– যদি খালেদ শাহেদের ঐ বক্তব্য নকল করে যা দ্বারা শাহেদ হামেদকে অপবাদ দিয়েছিল তাহলে এ নকলের কারণে খালেদ না অপবাদদানকারী বলে গণ্য হবে আর না খালেদের উপর অপবাদের [হদ্দে কযফ ইত্যাদি] বিধানাবলি আবশ্যক হবে। সুতরাং এভাবে উল্লিখিত চুক্তিসমূহে যেহেতু উকিল শুধু বার্তাবাহক এবং মুওয়াক্কিলের বক্তব্য বর্ণনাকারী, এজন্য উল্লিখিত চুক্তিসমূহের বিধানাবলি এবং হকসমূহের দায়িত্বশীল উকিল হবে না; বরং মুওয়াক্কিল হবে।

قَوْلُهُ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِىْ الخ : এ ভাষ্যে লেখক উল্লিখিত চুক্তিসমূহের উকিলের শুধু বার্তাবাহক হওয়ার যৌক্তিকতা বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো, উকিল এসব চুক্তি মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে পারে না; বরং উকিল এভাবে বলে যে, 'আমার মুওয়াক্কিল তোমার সাথে বিবাহ করল।' আর যদি উকিল এভাবে না বলে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে উদাহারণত পাত্রীকে বলল, 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।' তাহলে এটা ওকালতের বিধান থেকে বেরিয়ে গেল অথচ আমাদের আলে-াচনা ওকালাত সম্পর্কে। যাহোক যখন এ প্রকারের চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক হলো আর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার অনুমতি রইল না। তখন একথা অনুমিত হলো যে, এ সকল চুক্তিতে উকিলের অবস্থান শুধু বার্তাবাহক এবং মুওয়াক্কিলের বক্তব্য বর্ণনাকারীর পদ। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আর যখন কথা এমনই হলো তখন এ দ্বিতীয় প্রকারে উকিলের অবস্থান এমনই যেমন প্রথম প্রকারে প্রেরিত দূতের অবস্থান। আর প্রথম প্রকারের আলোচনায় অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, দূত প্রেরণের ক্ষেত্রে বিধানাবলি প্রেরিত দূতের দিকে ফিরে না; বরং প্রেরণকারীর দিকে ফিরে। সুতরাং তদ্রূপ দ্বিতীয় প্রকারের বিধানসমূহ উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না; বরং মুওয়াক্কিলের দিকে করবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّ الْحُكْمَ الخ : উক্ত ইবারত থেকে হিদায়া প্রণেতা প্রথমে উল্লিখিত عَقْلِىْ বা যুক্তিগত দলিলের কারণ এবং عِلَّتْ বর্ণনা করেছেন। নাতায়েজুল আফকার রচয়িতা বলেন, হিদায়া প্রণেতার হিদায়া গ্রন্থে অনুসৃত রীতিসমূহের একটি হলো, তিনি কোনো মাসআলার দলিল উল্লেখের পর বলেন– وَهٰذَا لِاَنَّ الخ এটা এ কারণে যে– .... আর এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হয় প্রথম দলিল উল্লেখের পরে দ্বিতীয় আরেকটি দলিল উল্লেখ করা। আর এ দ্বিতীয় দলিলে প্রথম দলিলের কারণ, যুক্তি ও ইল্লত বর্ণনা করেন। প্রথম দলিলটি دَلِيْل اِنِّىْ হয়, আর দ্বিতীয় দলিলটি دَلِيْل لِمِّىْ হয়।

আলামতের মাধ্যমে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুধাবনকে دَلِيْل اِنِّىْ বলা হয়। যেমন কারো কান্না শুনে তার দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা ইত্যাদি।

আর কোনো ইল্লতের অস্তিত্বের কারণে মা'লূলের অস্তিত্ব অনুধাবনকে বলা হয় دَلِيْل لِمِّىْ যেমন আগুনের অস্তিত্ব দেখে উত্তাপ এবং সূর্যের অস্তিত্ব দেখে জ্যোতির অস্তিত্ব অনুধাবন করা।

دَلِيلِ إِنِّىْ হলো আলামত বা চিহ্ন দেখে বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা, আর دَلِيلِ لِمِّىْ হলো عِلَّتْ বা মৌল কারণ দেখে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ।

সুতরাং যখন হিদায়া প্রণেতা দ্বিতীয় প্রকারে মুওয়াক্কিলের সাথে চুক্তির হকসমূহ সম্পৃক্ত হওয়ার স্বপক্ষে دَلِيلِ إِنِّىْ তথা আলামত নির্ভর প্রমাণ উল্লেখ করলেন। অর্থাৎ এ দ্বিতীয় প্রকারে উকিলের শুধু বার্তাবাহক হওয়া এবং মুওয়াক্কিলের দিকে চুক্তি সম্পৃক্ত করতে উকিলের নিরুপায় হওয়া এ কথার আলামত যে, হকসমূহ মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরবে– উকিলের দিকে নয়। তো এখন তারপর دَلِيلِ لِمِّىْ থেকে উকিলের শুধু বার্তাবাহক হওয়ার যুক্তি এবং عِلَّتْ অর্থাৎ وَهٰذَا لِاَنَّ الْحُكْمَ الخ [তথা মূল হেতু– নির্ভর প্রমাণ] বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন যে, এ দ্বিতীয় প্রকারে উকিলের শুধু বার্তাবাহক হওয়ার হেতু এবং عِلَّتْ হলো– বিবাহ ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে বিধান তার কারণ থেকে পৃথক হয় না। অর্থাৎ خِيَار شَرْط তথা শর্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকারের কারণে বিবাহের বিধান অর্থাৎ مِلْك بُضْع তথা যৌনাঙ্গের মালিকানা স্বামীর জন্য হালাল হওয়া বিবাহ থেকে পৃথক হয় না। অর্থাৎ এমন হয় না যে, বিবাহ [যা سَبَبْ বা মাধ্যম] তো সংঘটিত হয়ে গেল; কিন্তু خِيَار شَرْط-এর কারণে বিধান [যৌনাঙ্গের মালিকানা] স্বামীর জন্য সাব্যস্ত হলো না। যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; বরং سَبَبْ তথা মাধ্যম ও কারণ [বিবাহের]-এর সাথে সাথে বিধানও সাব্যস্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اِسْقَاطٌ الخ : এ দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বিধান سَبَبْ বা কারণ থেকে এজন্য পৃথক হয় না যে, এ চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে سَبَبْ বা কারণটি হচ্ছে রহিতকরণ জাতীয়। সুতরাং খুলা-চুক্তি এবং স্বেচ্ছাকৃত হত্যা থেকে সমঝোতা এ দুটির রহিতকরণ জাতীয় হওয়ার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। এভাবে যে, স্বামী খুলার চুক্তিতে যৌনাঙ্গের থেকে নিজের স্বত্বাধিকার বা মালিকানাকে রহিত করে। আর বিবাহ রহিতকরণ জাতীয় এই জন্য যে, আদমের সমস্ত কন্যা-সন্তান অর্থাৎ মহিলারা মৌল দৃষ্টিকোণে স্বাধীন। আর তাদের স্বাধীন হওয়া এই দাবি করে যে, বিবাহ ইত্যাদির কারণে কেউ তাদের মালিক না হোক। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত মানুষের প্রজননকে টিকিয়ে রাখার খাতিরে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের কারণে তার উপরে এক ধরনের মালিকানা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং যেই স্বত্বাধিকার বা স্বাধিকার নারীর জন্য মৌলিকভাবে স্বাধীনতার কারণে সাব্যস্ত ছিল বিবাহের মাধ্যমে নারী সেটাকে রহিত করে দিয়েছে। এই ভিত্তিতে বিবাহও রহিতকরণ জাতীয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় কারণ হলো, যৌনাঙ্গে মূলত حُرْمَتْ এবং নিষেধাজ্ঞা থাকে। কিন্তু বিবাহ ঐ حُرْمَتْ বা নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করে দেয়। যা হোক যে কোনো কারণেই হোক, বিবাহও রহিতকারী জাতীয়। সারকথা হলো, দ্বিতীয় প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত চুক্তির سَبَبْ বা কারণ রহিতকরণ জাতীয়। অর্থাৎ উল্লিখিত চুক্তিগুলো রহিতকরণ জাতীয়। আর রহিতকরণ জাতীয় বস্তুসমূহ নিতান্ত দুর্বল হওয়ার কারণে এগুলো বিলীন হয়ে যায়। তাই এ দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিগুলোতে এমনটি কল্পনা করা সম্ভব নয় যে, سَبَبْ বা কারণ মৌলিকভাবে একজন থেকে প্রকাশ পাবে আর বিধান সাব্যস্ত হবে অন্যের অনুকূলে। আর এভাবে سَبَبْ বা কারণ এবং حُكْم বা বিধানের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি হবে। যেমনটি প্রথম প্রকারে হয়। কেননা এটা অসম্ভব যে, একটা বস্তু উকিল থেকে রহিত হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত হয়ে তা মুওয়াক্কিল থেকে রহিত হবে। এজন্য যে, রহিতকৃত বস্তু ফিরে আসে না। হ্যাঁ তবে যদি কোনো নতুন سَبَبْ বা কারণ পাওয়া যায়। সুতরাং যখন বিষয়টি এমনই হলো তখন দ্বিতীয় প্রকারে উকিলের মাধ্যমে চুক্তিও মুওয়াক্কিল থেকে প্রকাশ পাবে, হুকুম বা বিধানও মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর যখন চুক্তির [বা سَبَبْ-এর] প্রকাশও মুওয়াক্কিল থেকে হলো যদিও উকিলের মাধ্যমে হয়েছে এবং বিধানও তার জন্য সাব্যস্ত হলো, তখন উকিল শুধু বার্তাবাহক এবং মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বক্তব্য নকলকারী হবে। এর চেয়ে বেশি উকিলের অন্য কোনো পদ হবে না।

وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ اَخَوَاتِهِ الْعِتْقُ عَلٰى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عَنِ الْاِنْكَارِ فَاَمَّا الصُّلْحُ الَّذِيْ هُوَ جَارٍ مَجْرَى الْبَيْعِ فَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الْاَوَّلِ وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْاِعَارَةِ وَالْاِيْدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالْاِقْرَاضِ سَفِيْرٌ اَيْضًا لِاَنَّ الْحُكْمَ فِيْهَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ وَاَنَّهُ يُلَاقِيْ مَحَلًّا مَمْلُوْكًا لِلْغَيْرِ فَلَا يُجْعَلُ اَصِيْلًا وَكَذَا اِذَا كَانَ الْوَكِيْلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِسِ وَكَذَا الشِّرْكَةُ وَالْمُضَارَبَةِ اِلَّا اَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْاِسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ حَتّٰى لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الرِّسَالَةِ فِيْهِ ـ

অনুবাদ : আর দ্বিতীয় শ্রেণির সমগোত্রীয় হলো অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান করা এবং কিতাবাত করা এবং অস্বীকার সত্ত্বেও সমঝোতা করা। পক্ষান্তরে যে সমঝোতা বিক্রয়ের সদৃশ [অর্থাৎ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সমঝোতা] সেটা প্রথম প্রকারের সমগোত্রীয়। আর হেবা করার, সদকা করার, আরিয়াত দেওয়ার, মাল গচ্ছিত রাখার এবং কর্জ দান করার ব্যাপারে নিযুক্ত উকিলও নিছক দূত রূপে গণ্য হবে। কেননা এ সকল চুক্তির ক্ষেত্রে কবজা দ্বারা চুক্তির বিধান সাব্যস্ত হয়। আর কবজা তো যুক্ত হয় অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর সাথে। [সুতরাং চুক্তির বিধানও অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর সাথে যুক্ত হবে।] ফলে উকিলকে চুক্তির মূলপক্ষ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। একই হুকুম [উকিল প্রেরিত দূত বলে গণ্য হবে] যদি [দান, ঋণ, ভাড়া ইত্যাদির] প্রার্থীর পক্ষ থেকে উকিল হয়। তদ্রূপ এ হুকুম শরিকানার চুক্তি এবং মোদারাবার চুক্তির উকিলের জন্যও। তবে ঋণ গ্রহণ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বাতিল। তাই তাতে মুওয়াক্কিলের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহণের জন্য দূত প্রেরণের বিষয়টি ভিন্ন। [অর্থাৎ তাতে ঋণ প্রার্থী মুওয়াক্কিলের মালিকানা সাব্যস্ত হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ مِنْ اَخَوَاتِهِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, দ্বিতীয় শ্রেণির সমগোত্রীয় অনেক মাসআলা আছে। যেমন–

১. অর্থের বিনিময়ে নিজের গোলাম আজাদ করার জন্য কাউকে উকিল করা। যেমন– মনিব কাউকে বলল যে, তুমি আমার গোলামকে এ পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আজাদ করে দাও।

২. নিজের গোলামের সাথে কিতাবাত চুক্তি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন– মনিব নিজের গোলামের সাথে কিতাবাত চুক্তি করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করল।

৩. অস্বীকার সত্ত্বেও সমঝোতার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন– বাদী কোনো দাবি করল আর বিবাদী সেটাকে অস্বীকার করল; কিন্তু বিবাদী বাদীর সাথে সমঝোতার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়ে গেল এবং সমঝোতার জন্য কাউকে উকিল নির্ধারণ করল।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, এতো গেল অস্বীকার সত্ত্বেও সমঝোতার কথা যে, তা দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সমঝোতা ; সুতরাং সেটা যেহেতু বিক্রয় চুক্তির স্থলাভিষিক্ত তাই সেটা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সমঝোতার মাঝে হকসমূহ উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে- মুওয়াক্কিলের সাথে নয়। আর স্বীকারোক্তির সাথে সমঝোতা بَيْع তথা বিক্রয়ের স্থলাভিষিক্ত,এজন্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থের আদান-প্রদান হয়। তদ্রূপ স্বীকারোক্তির সাথে সমঝোতার মাঝেও অর্থের আদান-প্রদান হয়। বিধায় এর বিধান তাই হবে যা بَيْع -এর বিধান হয়, আর তা প্রথম প্রকারে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ চুক্তির হকসমূহ উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৪. হেবার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন- কেউ কাউকে বলল, তুমি আমার এ গোলাম অমুককে হেবা করে দাও!

৫. সদকা দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন কাউকে বলল, তুমি আমার অমুক গোলাম সদকা করে দাও!

৬. আরিয়াত দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন- একথা বলল যে, তুমি আমার এ কিতাব অমুক ব্যক্তিকে আরিয়াত হিসেবে দিয়ে দাও।

৭. মাল গচ্ছিত রাখার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন- এমন বলল যে. তুমি আমার মাল অমুকের কাছে গচ্ছিত রাখ।

৮. বন্ধক রাখার জন্য উকিল নিযুক্ত করা। যেমন- কেউ বলল যে, তুমি আমার ঘোড়া অমুকের কাছে বন্ধক রাখ।

৯. ঋণ দেওয়ার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা। যেমন- কেউ বলল যে, তুমি আমার এ টাকা অমুককে কর্জ দিয়ে দাও!

এ সকল মাসআলায় উকিল শুধু বার্তাবাহক হবে এবং হকসমূহ মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরবে।

প্রথম তিন মাসআলার দলিল হলো, এ তিন চুক্তি রহিতকরণ জাতীয়। এ ভিত্তিতে যে, অর্থের বিনিময়ে আজাদ করা এবং কিতাবাত চুক্তিতে মনিব নিজের স্বত্বাধিকার রহিত করে দেয়। আর অস্বীকার সত্ত্বেও সমঝোতার মাঝে বিবাদী ঝগড়াকে প্রতিহত এবং রহিত করে। সুতরাং যখন এ তিন চুক্তি রহিতকরণ জাতীয় হলো তখন এগুলোর বিধান দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিসমূহের মতো হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের মতো এর মাঝে উকিল শুধুমাত্র বার্তাবাহক হবে, আর তার সাথে হকসমূহ সম্পৃক্ত হবে না; বরং মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যখন এ তিন মাসআলার বিধান দ্বিতীয় প্রকারের বিধানের মতো হলো তখন এ মাসআলাগুলোকে দ্বিতীয় প্রকারের মতো বলা যথার্থ বিবেচ্য হয়। আর অবশিষ্ট ছয় মাসআলার দলিল হলো, এ সকল চুক্তিতে বিধান শুধু কবজার দ্বারা সাবেত হয়ে যায়। অর্থাৎ হেবার সুরতে হেবাকৃত বস্তুর উপর হেবাগ্রহীতার কবজার দ্বারা হেবার হুকুম অর্থাৎ হেবাগ্রহীতার মালিক হওয়া এবং হস্তক্ষেপের অধিকার অর্জন সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর সদকার সুরতে সদকার মালের উপর সদকাগ্রহীতার কবজার দ্বারা সদকার বিধান অর্থাৎ সদকাগ্রহীতার মালিকানা এবং হস্তক্ষেপের অধিকার অর্জিত হয়ে যায়। আর আরিয়াতের সুরতে যখন আরিয়াতগ্রহীতা আরিয়াত গৃহীত বস্তুর উপর কবজা করে নেয় তখন আরিয়াতের বিধান অর্থাৎ আরিয়াতকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার আরিয়াত গ্রহীতার অর্জিত হয়ে যায়। আর গচ্ছিত রাখার সুরতে اَمِيْن অর্থাৎ গচ্ছিত রাখা হবে যার কাছে তার কবজার সাথে সাথে ওদীয়াতের বিধান সাব্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ اَمِيْن -এর উপর ওদীয়াতের মালের হেফাজত আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং বাড়াবাড়ি ছাড়া গচ্ছিত রাখা অর্থ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না।

আর বন্ধকের সুরতে বন্ধককৃত বস্তুর উপর বন্ধক গ্রহণকারীর কবজার দ্বারা বন্ধকের হুকুম সাবেত হয়ে যায়। বন্ধকের বিধান হলো, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তুর সংরক্ষণ করবে এবং যদি বন্ধক দিয়ে ঋণ উসুল না হয় তাহলে বন্ধকগ্রহীতা কাজির মাধ্যমে গৃহীত বন্ধক থেকে ঋণ উসুল করার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। আর ঋণ দেওয়ার সুরতে ঋণগ্রহীতা কবজা করার সাথে সাথেই ঋণের অর্থের ভিতর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত। এটাই ঋণের বিধান। যাহোক উল্লিখিত চুক্তিসমূহে কবজা করার সঙ্গে সঙ্গে বিধান সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর কবজা এমন বস্তুর উপর হয় যা উকিলের নয় মুওয়াক্কিলের মালিকানাধীন। আর যখন কবজা এমন বস্তুর উপর হলো যা মুওয়াক্কিলের মালিকানাধীন তখন এই চুক্তিসমূহের বিধান এমন বস্তুতে সাব্যস্ত হয়েছে যা উকিলের নয় বরং মুওয়াক্কিলের মালিকানাধীন তখন এ সকল চুক্তিতে উকিল মূল ব্যক্তি হবে না। কেননা যে বস্তুর উপর কবজা

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই বস্তুর বিবেচনায় উকিল আজনবী বা অপরিচিত। আর যখন এ সকল চুক্তিতে উকিল মূল ব্যক্তি নয়, তখন সে বার্তাবাহক এবং মালিক তথা মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বক্তব্য নকলকারী মাত্র। আর উকিল যখন এ সকল চুক্তিতে শুধু বার্তাবাহক এবং ব্যক্তকারী তখন চুক্তির হকসমূহও উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এর বিপরীত ঐ সকল চুক্তি যেগুলো বক্তব্য দ্বারাই সম্পন্ন হয়; আর কবজার উপর মওকুফ থাকে না। যেমন– বেচাকেনা ইত্যাদি উকিল সেগুলোতে মূল ব্যক্তি। কেননা উকিল বক্তব্যদানে মূলব্যক্তি আর উকিলের বক্তব্য উকিলের অধিকারে। সুতরাং যখন উকিলের বক্তব্য তার অধিকারে এবং সে বক্তব্যদানের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি। আর বক্তব্যে মূল ব্যক্তি হওয়ার কারণে এ সকল চুক্তিতেও মূল ব্যক্তি। তাই এ সকল চুক্তিতে হকসমূহ উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে– মুওয়াক্কিলের সাথে নয়।

قوله وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْاِعَارَةِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, হেবা করার, সদকা করার, আরিয়াত দেওয়ার, মাল গচ্ছিত রাখার এবং করজ দান করার ব্যাপারে নিযুক্ত উকিলও নিছক দূত রূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ সকল সুরতেও হকসমূহ মুওয়াক্কিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে– উকিলের সাথে নয়। হ্যাঁ এতটুকু কথা অবশ্যই যে, ঋণ চাওয়ার জন্য উকিল নিযুক্তি বাতিল। অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার জন্য অমুকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এসো। ঋণ নিয়ে আসার জন্য তুমি আমার উকিল। তো এ উকিল নিযুক্তি বাতিল। কেননা এ সুরতে মুওয়াক্কিল উকিলকে অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপের আদেশ দিয়েছে। অথচ অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া বৈধ নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, ঋণগ্রহীতা ঋণের বিনিময় নিজের জিম্মায় আবশ্যক করে নেয়। সুতরাং ঋণ চাওয়ার জন্য উকিল বানানোর মর্মার্থ হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে বলবে যে, তুমি ঋণের বিনিময় উদাহরণত একশত টাকা নিজের জিম্মায় আবশ্যক কর। আর এর বদল অর্থাৎ ঋণের অর্থ আমার হবে। অর্থাৎ ঋণ তো আমার হবে, আর তার বিনিময় তোমার উপর আবশ্যক হবে। এতো এমনই হলো যেমন কেউ অন্যাকে বলল যে, অমুকের অমুক জিনিস বিক্রয় করে দাও এ শর্তের উপর যে, তার মূল্য আমার হবে। অথচ এ বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্তি বাতিল। সুতরাং এর উপর কিয়াস করে কর্জ গ্রহণের উকিল নিযুক্তিও বাতিল। আর যখন কর্জ চাওয়ার জন্য উকিল নিয়োগ বাতিল সাব্যস্ত হলো তখন যদি উকিল কর্জ চেয়েও ফেলে তো এর মালিক মুওয়াক্কিল হবে না; বরং স্বয়ং উকিল হবে। আর যদি উকিলের কাছে ঋণের অর্থ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উকিলের মালই নষ্ট হবে– মুওয়াক্কিলের মাল নয়। আর যদি ঋণের জন্য কাউকে বার্তাবাহক বানায় তাহলে শুদ্ধ হবে। যেমন– এক ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল, আমাকে অমুক তোমার কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে। তো এটা শুদ্ধ হবে। সুতরাং ঋণদাতা যদি ঋণের অর্থ প্রেরিত দূতের কাছে দিয়ে দেয়, তাহলে ঋণ প্রার্থী অর্থাৎ দূত প্রেরণকারীর জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, যদি শরিকানার চুক্তি এবং মোদারাবার চুক্তির জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে ঐ চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা জরুরি হবে। আর চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরবে– উকিলের দিকে নয়। আর উকিল শুধু বার্তাবাহক এবং ব্যক্তকারী হবে।

قَالَ : وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ وَحُقُوْقِهِ لِمَا أَنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى الْعَاقِدِ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ نَفْسَ الثَّمَنِ الْمَقْبُوْضِ حَقُّهُ وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَلَا فَائِدَةَ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعِ إِلَيْهِ وَلِهٰذَا لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ وَبِدَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لِمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عِنْدَهُمَا وَلٰكِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْفَصْلَيْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুওয়াক্কিল যদি ক্রেতার কাছে মূল্যের তাগাদা করে তাহলে তার অধিকার রয়েছে মূল্য তাকে প্রদান না করার। কারণ সে চুক্তি ও তার হকসমূহ সম্পর্কে অপরিচিত [বা অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি] কেননা যাবতীয় হক চুক্তিকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। তবে সে যদি মুওয়াক্কিলকে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে তা বৈধ হবে। আর উকিলের দ্বিতীয়বার তার কাছে মূল্য তাগাদা করা বৈধ নয়। কেননা উসুলকৃত মূল্য হুবহু মুওয়াক্কিলের হক, আর তা তার কাছে পৌঁছে গেছে। আর মুওয়াক্কিল থেকে নিয়ে উকিলকে প্রদানের কোনো ফলাফল নেই। এ কারণেই তো ক্রেতার যদি মুওয়াক্কিলের কাছে কোনো ঋণ পাওনা থাকে তাহলে কাটাকাটি হয়ে যায়। আর যদি উকিল ও মুওয়াক্কিল উভয়ের কাছে ক্রেতার ঋণ পাওনা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও শুধু মুওয়াক্কিলের ঋণের বিপরীতে কাটাকাটি হবে, উকিলের ঋণের বিপরীতে নয়। আর যদি শুধু উকিলের কাছে ঋণ পাওনা থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, কাটাকাটি সম্পন্ন হবে। কেননা তাঁদের মতে, উকিল ক্রেতাকে মূল্য থেকে দায়মুক্ত করে দিতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য মূল্যের ব্যাপারে জামিন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ الخ : মাসআলা হলো, যদি এক ব্যক্তি কাউকে বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করে। তারপর উকিল কারো কাছে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করে দেয় যা বিক্রয়ের উকিল তাকে বানানো হয়েছিল। এখন যদি মুওয়াক্কিল ক্রেতার কাছে মূল্যের জন্য তাগাদা করে তাহলে ক্রেতার এ স্বাধীনতা আছে যে, সে মূল্য দিতে অস্বীকার করবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে ক্রেতার অস্বীকারের স্বাধীনতা নেই। কেননা উক্ত ইমামত্রয় -এর মতে চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরে– উকিলের দিকে নয়। আর যখন তাঁদের মতে চুক্তির হকসমূহ মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরে তো মুওয়াক্কিলই ক্রেতা থেকে মূল্য উসুল করার অধিকার অর্জন করবে। আর যখন মুওয়াক্কিলই মূল্য উসুল করার অনুমতিপ্রাপ্ত তখন মুওয়াক্কিলের মূল্য প্রাপ্তির জন্য তাগাদা দেওয়ার পর ক্রেতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কোনো অবকাশ থাকবে না। আর আমাদের মতে চুক্তির হকসমূহ চুক্তি সম্পাদনকারী অর্থাৎ উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। আর মুওয়াক্কিল চুক্তি এবং চুক্তির হকসমূহের ব্যাপারে একদম অপরিচিতের মতো। এজন্য মুওয়াক্কিল ক্রেতা থেকে মূল্যের তলব করার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না। আর যখন মুওয়াক্কিল মূল্য তলব করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তলব করে, তো ক্রেতার অধিকার আছে যে, সে মূল্য দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি অজুরত ব্যক্তিকে সালাম করবে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ সালাম করে তাহলে অজুকারীর অধিকার আছে যে, সে উত্তর না দিয়ে চুপ থাকবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ الخ : ইমাম কুদূরী বলেন, যদি মুওয়াক্কিলের তলব করার পরে ক্রেতা মুওয়াক্কিলকে মূল্য দিয়ে দেয় তাহলে এও বৈধ। আর এ সুরতে উকিলের জন্য ক্রেতা থেকে দ্বিতীয়বার মূল্য তলব করার অধিকার থাকবে না। কিন্তু এটা খেয়াল থাকে যে, যদি কেউ কাউকে صَرْف তথা টাকা বদল চুক্তির উকিল নিযুক্ত করে তাহলে মুওয়াক্কিলের কবজা করা শুদ্ধ হবে না। কেননা টাকা বদলের চুক্তি টাকা বদলের দ্বারা জায়েজ হয়। সুতরাং عَقْد صَرْف বা টাকা বদলের চুক্তিতে কবজা ইজাব এবং কবুলের স্তরে। কাজেই যদি উকিলের জন্য কবুল করার অধিকার সাব্যস্ত হয় আর মুওয়াক্কিল কবুল করে, তাহলে এটা অবৈধ। তদ্রূপ যদি কবজার অধিকার উকিলের জন্য সাব্যস্ত হয় আর মুওয়াক্কিল কবজা করে নেয় তাহলে এটাও অবৈধ

হবে। আর عقد صرف ছাড়া অন্যান্য লেনদেনে মুওয়াক্কিলের কবজা শুদ্ধ হওয়ার দলিল হলো, ঐ মূল্য যেটাকে মুওয়াক্কিল কবজ করল, সেটা মুওয়াক্কিলের হক। আর তা মুওয়াক্কিলের কাছে পৌঁছে গেছে। আর যখন এমনই হলো তো এখন মুওয়াক্কিল থেকে নিয়ে পুনরায় আবার মুওয়াক্কিলকে দেওয়ার মাঝে কোনো ফায়দা নেই। যা উদ্দেশ্য ছিল তা অর্জিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের কাছে তার হক পৌঁছে গেছে। যেহেতু মূল্য– যার উপর মুওয়াক্কিলের কবজা আছে, তা মুওয়াক্কিলেরই হক। এজন্যই যদি ক্রেতার মূল্য পরিমাণ অর্থ মুওয়াক্কিলের কাছে পূর্ব পাওনা হয় তাহলে কাটাকাটি হয়ে যাবে। যেমন– ক্রেতার জিম্মায় একহাজার টাকা পণ্যের মূল্য। আর ক্রেতা মুওয়াক্কিলের কাছে একহাজার টাকা পায়, তাহলে সমান সমান হয়ে যাবে। অর্থাৎ না ক্রেতা মুওয়াক্কিলের কাছে কিছু পাবে আর না মুওয়াক্কিল ক্রেতার কাছে কিছু পাবে। আর মুওয়াক্কিলের উকিল থেকে মূল্য গ্রহণের অধিকার থাকবে না। তদ্রূপ যদি ক্রেতার মুওয়াক্কিল এবং উকিল দুজনের কাছেই পাওনা থাকে তাহলে মুওয়াক্কিলের কর্জের সাথে তা কাটাকাটি হবে– উকিলের কর্জের সাথে নয়। যেমন– ক্রেতার জিম্মায় একহাজার টাকা মূল্য। আর ক্রেতার একহাজার টাকা মুওয়াক্কিলের কাছে পাওনা, আরেক হাজার টাকা উকিলের কাছে পাওনা, তাহলে একহাজার টাকা দাম এবং ঐ এক হাজার টাকা যেটা মুওয়াক্কিলের কাছে পাওনা এ দুয়ের মাঝে কাটাকাটি হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল এবং ক্রেতা দুজন সমান সমান হয়ে যাবে। কেউ কারো কাছে কিছু পাবে না। আর মুওয়াক্কিলের উকিল থেকে মূল্য বাবদ কিছু গ্রহণের অধিকার থাকবে না।

এর দলিল হলো, কাটাকাটি বলতে বোঝায় বদলা নিয়ে মুক্ত করে দেওয়াকে আর এটাকে বদলাবিহীন মুক্ত করে দেওয়ার উপর কিয়াস করা হবে। সুতরাং যদি মুওয়াক্কিল এবং উকিল উভয়েই একসঙ্গে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ থেকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে ক্রেতা মুওয়াক্কিলের মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারা মুক্ত হয়ে যায়– উকিলের মুক্ত করার দ্বারা নয়। সুতরাং এ সুরতে মুওয়াক্কিল উকিল থেকে মূল্য ইত্যাদি কিছু ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় না। যাহোক, যখন বিনিময়বিহীন মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের মুক্ত করা ধর্তব্য হয়– উকিলের নয়, তখন বিনিময়ের দ্বারা মুক্ত করে দেওয়া তথা কাটাকাটি করার ক্ষেত্রেও মুওয়াক্কিলের ঋণের বদলে মুক্ত করা এবং কাটাকাটি ধর্তব্য হবে। উকিলের ঋণের বদলে কাটাকাটি ধর্তব্য হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, উল্লিখিত সুরতে যদি উকিলের ঋণের সাথে কাটাকাটি ধরা হয় তাহলে এ সুরতে এর প্রয়োজন পড়বে যে, উকিল নিজের কাছ থেকে মুওয়াক্কিলকে মূল্য পরিশোধ করবে। আর যদি মুওয়াক্কিলের ঋণের সাথে কাটাকাটি ধরা হয় তাহলে এর প্রয়োজন দেখা দেবে না। সুতরাং দূরত্ব কমানোর জন্য মুওয়াক্কিলের ঋণের সাথে কাটাকাটি হওয়া নির্ধারিত হলো।

আর যদি ক্রেতার পাওনা শুধু উকিলের কাছে হয় তাহলে এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ক্রেতাকে বিনিময়বিহীন মুক্ত করে দেওয়ার অধিকার অর্জিত হবে উকিলের। আর যখন উকিল বিনিময়বিহীন ক্রেতাকে মুক্ত করে দেওয়ার অধিকার রাখে তো কাটাকাটি অর্থাৎ বিনিময়ে মুক্ত করার মালিক তো আরও উত্তমরূপে হবে। সুতরাং বিনিময়ে মুক্তকরণকে বিনিময়বিহীন মুক্তকরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হ্যাঁ এতটুকু কথা অবশ্যই আছে যে, উকিল ক্রেতাকে বিনিময়বিহীন মুক্ত করুক অথবা বিনিময়ে মুক্ত করুক, উভয় সুরতে উকিল নিজের মুওয়াক্কিলের জন্য মূল্য পরিমাণ অর্থের জামিন হবে। রইল একথা যে, তরফাইনের মতে উকিল বিনিময়বিহীন ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অধিকার অর্জন করবে কেন? তো এর উত্তর হলো, উকিলের ক্ষেত্রে اِبرَاء বা মুক্তকরণ বলতে বোঝায় কবজার অধিকারকে রহিত করা। আর কবজা করা একান্ত উকিলের অধিকার। কাজেই মুওয়াক্কিল যদি উকিলকে কবজা করা থেকে বাধা দিতে চায় তাহলে তার এই অধিকার হবে না। অর্থাৎ সে বাধা দিতে পারবে না। আর যদি মুওয়াক্কিল নিজে কবজা করতে চায় তাহলে তার এ অধিকারও নেই। সুতরাং উকিল ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে একান্ত নিজের অধিকার রহিত করছে। আর নিজের হক রহিত করার প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখতিয়ার রয়েছে। কাজেই উকিল ক্রেতাকে মুক্ত করে দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত। আর যখন উকিল বদলহীন মুক্তকরণের মালিক হলো তো বদলে মুক্তকরণের তথা কাটাকাটি করার আরও উত্তমরূপে মালিক হবে। কিন্তু যেহেতু উকিল কবজা করার অধিকার রহিত করে দিয়েছে আর এ কারণে মুওয়াক্কিলের মূল্য উসুল করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, [কেননা মুয়াক্কিলের ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য কবজা করার কোনো অধিকার থাকে না] তাই উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য মূল্য পরিমাণ অর্থের জামিন হবে। যেমন– বন্ধক প্রদানকারী যদি নিজের বন্ধককৃত গোলামকে আজাদ করে দেয় তাহলে তা আজাদ হয়ে যাবে। কেননা বন্ধককৃত গোলাম বন্ধক প্রদানকারীরই মালিকানাধীন। যদিও তা বন্ধকগ্রহীতার কবজায় রয়েছে। কিন্তু যেহেতু গোলামের مَالِيَّت তথা আর্থিক বিষয় থেকে ঋণগ্রহীতার জন্য নিজের ঋণ উসুল করা অসম্ভব হয়ে গেছে তাই বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার জন্যে ঋণ পরিমাণ অর্থের জামিন হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উকিল ক্রেতাকে বিনিময়বিহীন মুক্ত করে দেওয়ার মালিক নয়। কেননা ক্রেতার জিম্মায় যে মূল্য তা মুওয়াক্কিলের মালিকানা। সুতরাং উকিলের ক্রেতাকে মুক্ত করে দেওয়া মুওয়াক্কিলের মালিকানায় অনুমতিহীন হস্তক্ষেপ। আর বিনা অনুমতিতে কারো মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। কাজেই উকিলের ক্রেতাকে মুক্ত করাও বৈধ হবে না। যেমন উকিলের মূল্যের উপর কবজা করে পুনরায় তা ক্রেতাকে হেবা করা জায়েজ নয়। মোটকথা, উকিলের জন্য বিনিময়বিহীন মুক্তকরণ বৈধ নয়। তাই বিনিময়ে মুক্তকরণ অর্থাৎ কাটাকাটি ও এর সাথে তুলনা করা বৈধ হবে না।

بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
পরিচ্ছেদ : বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে উকিল নিযুক্ত করা

فَصْلٌ فِى الشِّرَاءِ অনুচ্ছেদ : ক্রয় সংক্রান্ত

এ পরিচ্ছেদে ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে উকালতি প্রসঙ্গে। প্রথম অনুচ্ছেদ ক্রয় সম্পর্কে। যেহেতু উকালতের পরিচ্ছেদসমূহের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেখা দেয় ক্রয়-বিক্রয়ে উকিল নিযুক্তির তাই বিক্রয় ও ক্রয় সম্পর্কে উকিল নিযুক্ত করার বিধান প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, আর ক্রয়ের মাধ্যমে যেহেতু পণ্যের মালিকানা সাব্যস্ত হয়, আর বিক্রয়ের দ্বারা মালিকানা বিচ্ছিন্ন হয়, আর إِزَالَة বা কর্তন إِثْبَاتٌ বা সাব্যস্তকরণের পরে সংঘটিত হয়, এজন্য ক্রয় সংক্রান্ত বিধিবিধান আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আর বিক্রয় সংক্রান্ত ও উকালতের মাসায়েল পরে উল্লেখ করা হয়েছে। নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা বলেন, ব্যাখ্যাতাগণ যে কথা বললেন ক্রয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ দর্শাতে গিয়ে তা খুবই দুর্বল; বরং এ বক্তব্য وَهْمِى বা নিছক ধারণা নির্ভর খেয়ালি প্রকৃতির– মোটেও تَحْقِيقِى বা বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য নয়। কেননা ক্রয়ের মাঝে যেমন বিক্রীত পণ্যে মালিকানা সাব্যস্ত করার বিষয় থাকে তদ্রূপ মূল্য থেকে মালিকানা কর্তনের ব্যাপারও থাকে। আর বিক্রয়ের মাঝে বিক্রীত পণ্য থেকে মালিকানা কর্তন যেমন থাকে তেমনিই থাকে সেখানে মূল্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। এ কারণেই তো তারা বলেন, ক্রয় পণ্যকে আকর্ষণকারী, মূল্যকে বিকর্ষণকারী আর বিক্রয় এর বিপরীত। সুতরাং ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টিই সাব্যস্তকরণ ও কর্তনের ব্যাপারে সমান সমান। যখন দুটোই إِثْبَاتٌ এবং إِزَالَة-এর ক্ষেত্রে সমান হলো তখন ক্রয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ প্রথমে উল্লেখ করার কোনো কারণ নেই।

উপযোগী কারণ তো হলো, ক্রয়ের মাসায়েলও খুব বেশি আর তার প্রয়োজনও অধিক, কেননা অধিকাংশ মানুষ অন্যাকে নিজের পানাহার এবং পরিধানের বস্তুসমূহ ক্রয় করার জন উকিল নিযুক্ত করে, আর বিক্রয়ের জন্য তেমন উকিল নিয়োগ করে না। সুতরাং ক্রয় সংক্রান্ত উকালতের বিধিবিধান যেহেতু অধিক সংঘটিত হয় আর তার প্রয়োজনও বেশি দেখা দেয় তাই ক্রয় সংক্রান্ত উকালতের বিধানসমূহকে বিক্রয় সংক্রান্ত উকালতের বিধানসমূহের পূর্বে আনা হয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ اَوْ جِنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ لِيَصِيْرَ الْفِعْلُ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُوْمًا فَيُمْكِنُهُ الْاِئْتِمَارُ اِلَّا اَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُوْلُ اِبْتَعْ لِيْ بِمَا رَأَيْتَ لِاَنَّهُ فَوَّضَ الْاَمْرَ اِلٰى رَأْيِهِ فَاَيَّ شَيْءٍ يَشْتَرِيْهِ يَكُوْنُ مُمْتَثِلًا وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيْرَةَ تُتَحَمَّلُ فِى الْوَكَالَةِ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّ مَبْنَى التَّوْكِيْلِ عَلَى التَّوْسِعَةِ لِاَنَّهُ اِسْتِعَانَةٌ وَ فِىْ اِعْتِبَارِ هٰذَا الشَّرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوْعٌ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো জিনিস ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে ঐ জিনিসের শ্রেণি ও প্রকার উল্লেখ কারা কিংবা জিনিসের শ্রেণি এবং তার মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য, যাতে যে কাজের উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কাজটি সুপরিজ্ঞাত হয়ে যায় এবং তা পালন করা সম্ভব হয়। তবে যদি তাকে সাধারণ উকিল নিয়োগ করে। অর্থাৎ বলে যে, তুমি আমার জন্য যা ভালো মনে কর তা ক্রয় কর, [তাহলে শ্রেণি বা প্রকার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।] কেননা সে বিষয়টিকে তার মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং যাই সে ক্রয় করবে তাতে আদেশ পালনকারী হবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, সূক্ষ্ম কিয়াস মতে উকালত-এর ক্ষেত্রে সাধারণ ও সামান্য অজ্ঞতাকে মেনে নেওয়া হয়। যেমন [শ্রেণি জানা থাকার পর] গুণাগুণের অজ্ঞতা। কেননা উকিল নিযুক্তির অর্থ যেহেতু সাহায্য গ্রহণ, সেহেতু প্রসারতার উপরই ভিত্তি হবে। অথচ [সাধারণ অজ্ঞতা না থাকার] এ শর্ত বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে আর সে অসুবিধা অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো অনির্দিষ্ট জিনিস ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে ঐ জিনিসের শ্রেণি ও প্রকার উল্লেখ করা কিংবা জিনিসের শ্রেণি এবং তার মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ مَنْ وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ : এখানে شَيْءٍ দ্বারা شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ উদ্দেশ্য। কেননা নির্দিষ্ট বস্তুর শ্রেণি এবং প্রকার উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ الخ : অর্থাৎ এর প্রকার উল্লেখ করাও আবশ্যক। صِفَةٌ দ্বারা এখানে نَوْع বা প্রকার বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন এমন বলবে যে, গোলাম তুর্কিস্তানী কি হিন্দুস্তানী ইত্যাদি। অথবা মুওয়াক্কিল তার শ্রেণি এবং মূল্যের পরিমাণ বলে দেবে– যেমন এ কথা বলবে যে, পাঁচশত টাকার একটা গোলাম ক্রয় করে নিয়ে এসো।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে جِنْس বা শ্রেণি দ্বারা মানতেকীদের جِنْس উদ্দেশ্য নয়; বরং ফিকহবিদদের جِنْس উদ্দেশ্য। মানতেকীদের মতে যেটা نَوْع বা প্রকার হয় ফিকহবিদের মতে সেটা جِنْس বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মানতেকীদের পরিভাষায় جِنْس বলা হয় এমন শব্দকে যা ভিন্ন প্রকৃতির একাধিক বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন– حَيَوَانٌ

শব্দটি মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি সব কিছুর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, অথচ প্রত্যেকটির প্রকৃতি ও হাকীকত ভিন্ন। আর نَوْع বা প্রকার বলা হয় ঐ শব্দকে যা একই হাকীকত এবং প্রকৃতি বিশিষ্ট একাধিক বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- মানুষ শব্দটি যায়েদ, ওমর, বকর এবং খালেদ প্রমুখের উপর প্রযোজ্য হয়। এদের সকলের প্রকৃতিই এক অর্থাৎ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ বা বুদ্ধিমান প্রাণী। আর মানতেকীদের পরিভাষায় صِنْفٌ বলা হয় ঐ প্রকারকে যেটাকে কোনো সংযুক্ত বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। যেমন তুর্কী বা হিন্দুস্তানী। তো এখানে جِنْس বা শ্রেণি দ্বারা উদ্দেশ্য যা মানতেকীদের মতে সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর نَوْع দ্বারা উদ্দেশ্য اَلصِّنْفُ বা বিশেষিত প্রকার। সুতরাং যদি কেউ কাউকে কোনো বস্তু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে তাহলে হয়তো তা নির্দিষ্ট হবে অথবা অনির্দিষ্ট হবে। যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে جِنْس বা শ্রেণি এবং نَوْع বা প্রকার কিছুই উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যেমন কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনো গোলাম দেখিয়ে বলে যে, আমি তোমাকে এটা ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করলাম। তো এখন এক্ষেত্রে তার এভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে, আমি তোমাকে এই তুর্কি শক্তিশালী গোলাম ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করলাম। পক্ষান্তরে যদি অনির্দিষ্ট কোনো বস্তু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে তবে সেক্ষেত্রে তাকে সেই বস্তুর جِنْس তথা শ্রেণি এবং نَوْع তথা প্রকার উল্লেখ করতে হবে। উদাহরণত সে বলবে, একটি হিন্দুস্তানী গোলাম অথবা তার শ্রেণি এবং মূল্যমান যথা একথা বলবে পাঁচশত টাকা মূল্যের একটি গোলাম। যাতে যে কাজের উকিল নিয়োগ করা হচ্ছে সে কাজটি নির্ধারিত হয়। ফলে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব হয়। কেননা যদি মুওয়াক্কিল শুধু শ্রেণি উল্লেখ করে, প্রকার এবং বিশেষণ উল্লেখ ব্যতীত তাহলে সে ক্ষেত্রে উকিলের জন্য মুওয়াক্কিলের উদ্দিষ্ট বস্তু হাসিল করা সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি وَكَالَتْ عَامَّهْ তথা সাধারণ উকালত হয়। যেমন একথা বলল যে, যেমনটি তোমার কাছে ভালো মনে হয় আমার জন্য ক্রয় করে নিয়ে এসো, তো এ ক্ষেত্রে শ্রেণি উল্লেখ করারও প্রয়োজন নেই, প্রকার উল্লেখেরও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা মুআক্কিল এ ক্ষেত্রে সবকিছু উকিলের উপর সমর্পণ করে দিয়েছে। কাজেই উকিল এখন যাই ক্রয় করবে মুআক্কিল আদেশ পালনকারী হবে।

قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيْهِ اَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيْرَةَ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, উকালতের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো, উকালতের ব্যাপারে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে স্বল্প অজ্ঞতা বরদাশত করা হয়। অর্থাৎ যদি কোনো সামান্য কথা জানা না থাকে তাহলে উকালত ঠিক থাকে যেমন বিশেষণ অজ্ঞাত থাকে আর মুওয়াক্কিল এভাবে বলে যে, একটা গোলাম ক্রয় করে আন তো اِسْتِحْسَانٌ বা সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে বিশেষণ অনির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও উকালত শুদ্ধ থাকবে- যদিও বাহ্যিক যুক্তির ভিত্তিতে শুদ্ধ থাকে না। বাকি جَهَالَتْ فَاحِشَةْ তথা অতিরিক্ত অস্পষ্টতা উকালতের ক্ষেত্রে বরদাশত করা হয় না। বাহ্যিক যুক্তির ভিত্তিতে ও সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতেও।

সামান্য অস্পষ্টতা বা جَهَالَتْ يَسِيْرَهْ-এর ক্ষেত্রে قِيَاسٌ বা বাহ্যিক যুক্তির ব্যাখ্যা তো এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তিকরণকে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে তুলনা করা হবে। কেননা বিক্রয়ের উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বিক্রেতার মতোই হয়। তদ্রূপ ক্রয়ের উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে ক্রেতার মতো। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে অজ্ঞতা অস্পষ্টতা একদম বরদাশত করা হয় না। অতিরিক্ত অস্পষ্টতাও না, স্বল্প অস্পষ্টতাও না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের উকালতের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ جَهَالَتْ-কে একেবারে বরদাশত করা হবে না।

اِسْتِحْسَانٌ তথা সূক্ষ্মযুক্তির ব্যাখ্যা হলো, উকিল নিযুক্তির ভিত্তি প্রশস্ততার উপর। কেননা উকিল নিয়োগ মূলত নিজের কাজে অন্যের সাহায্য প্রর্থনা করা। আর সামান্য جَهَالَتْ ধর্তব্যে আনায় একপ্রকার জটিলতা ও সঙ্কট থাকে। অথবা ইসলামি শরিয়ত সঙ্কট, সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা নিরসন করে। কাজেই রাসূল ﷺ বলেন- لَا حَرَجَ فِى الدِّيْنِ সুতরাং জটিলতা দূর করার নিমিত্তে উকালতের মাঝে সামন্য جَهَالَتْ বরদাশত করা হয়।

ثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّفْظُ يَجْمَعُ اَجْنَاسًا اَوْ مَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَجْنَاسِ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيْلُ وَاِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ لِاَنَّ بِذٰلِكَ الثَّمَنِ يُوْجَدُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَلَا يُدْرٰى مُرَادُ الْاٰمِرِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ وَاِنْ كَانَ جِنْسًا يَجْمَعُ اَنْوَاعًا لَا يَصِحُّ اِلَّا بِبَيَانِ الثَّمَنِ اَوِ النَّوْعِ لِاَنَّهٗ بِتَقْدِيْرِ الثَّمَنِ يَصِيْرُ النَّوْعُ مَعْلُوْمًا وَبِذِكْرِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلَا يَمْنَعُ الْاِمْتِثَالُ مِثَالُهٗ اِذَا وَكَّلَهٗ بِشِرَاءِ عَبْدٍ اَوْ جَارِيَةٍ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهٗ يَشْمُلُ اَنْوَاعًا فَاِنْ بَيَّنَ النَّوْعَ كَالتُّرْكِيِّ اَوِ الْحَبْشِيِّ اَوِ الْهِنْدِيِّ اَوِ السِّنْدِيِّ اَوِ الْمُوَلَّدِ جَازَ وَكَذَا اِذَا بَيَّنَ الثَّمَنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ بَيَّنَ النَّوْعَ اَوِ الثَّمَنَ وَلَمْ يُبَيِّنْ صِفَةَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَالسَّطَةِ جَازَ لِاَنَّهٗ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ وَمُرَادُهٗ مِنَ الصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ كِتَابِ النَّوْعِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর কথিত শব্দটি যদি কয়েক শ্রেণির জিনিসকে কিংবা কয়েক শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে মূল্য বর্ণনা করা সত্ত্বেও নিযুক্ত করা বৈধ হবে না। কেননা ঐ মূল্য দ্বারা তো প্রতিটি শ্রেণির জিনিসই পাওয়া যাবে। সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে আদেশদাতার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। আর যদি শব্দটি এক শ্রেণিবাচক হয় যা কয়েকটি প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে মূল্যের পরিমাণ কিংবা প্রকার উল্লেখ করা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণে প্রকার পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। আর প্রকার উল্লেখে অজ্ঞতার মাত্রা হ্রাস পায়। ফলে এ সামান্য অজ্ঞতা আদেশ পালনকে বাধা দেয় না। এর উদাহরণ হলো, যদি তাকে দাস বা দাসী ক্রয় করায় উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা কয়েক প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে যদি প্রকার উল্লেখ করে দেয়, যেমন তুর্কি, হাবশি, হিন্দি, সিন্ধি কিংবা আরবে প্রতিপলিত অনারব [বা শংকর] তাহলে জায়েজ হবে। তদ্রূপ মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করলে আমাদের বর্ণিত কারণে বৈধ হবে। আর যদি প্রকার বা মূল্য উল্লেখ করে কিন্তু উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতা বা মধ্যমতার গুণ উল্লেখ না করে তাহলেও জায়েজ হবে। কেননা এটা এমন অজ্ঞতা, যা [মুওয়াক্কিলের অবস্থা বিবেচনা করে] পূরণ করা যায়। কিতাবে جِنْس [বা শ্রেণি] -এর বিপরীতে যে صِفَة শব্দ বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো 'প্রকার'।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِنْ كَانَ اللَّفْظُ الخ : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুওয়াক্কিল এ বস্তুর শ্রেণি, প্রকার এবং অবস্থা বর্ণনা করে দেয় যে বস্তু ক্রয়ের জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করেছে তাহলে এ উকালাত শুদ্ধ। আর যদি এসবের মাঝ থেকে কোনো একটাকে বর্ণনা না করে বরং এমন একটা শব্দ উল্লেখ করে যা অনেক جِنْس -কে অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ এমন বলল যে, তুমি চতুষ্পদ জন্তু অথবা কাপড় ক্রয় করে নিয়ে এস অথবা এমন শব্দ উল্লেখ করল যা অনেক শ্রেণিকে যদিও অন্তর্ভুক্ত করে না তথাপি বহু শ্রেণির অর্থ দেয়। যেমন– ঘর ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল অথবা গোলাম দাসী ক্রয়ের উকিল করল। তো এই

উকালত শুদ্ধ হবে না– যদিও সেই বস্তুর মূল্য উল্লেখ করে দিয়ে থাকে। কেননা মুওয়াক্কিল যে মূল্য উল্লেখ করেছে এতটুকু مَالِيَّتْ বা মূল্যমানের বস্তু সকল শ্রেণিতেই বিদ্যমান যেমন মুওয়াক্কিল বলল, এক হাজার টাকার মূল্যমানের চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে আন। তো চতুষ্পদের প্রয়োগ জমিনে চলমান প্রতিটি জন্তুর উপরই হয়। আর প্রত্যেক শ্রেণিতেই এক হাজার টাকা মূল্যমানের জন্তু বিদ্যমান। কাজেই এক হাজার টাকা মূল্যমানের গরুও হয়, বকরিও হয়, ঘোড়াও হয়, উটও হয় মহিষও হয়। সুতরাং যখন মূল্য বর্ণনা করার দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভূত হয় না; বরং পূর্ববৎ বাকি থাকে তখন এ মাত্রাতিরিক্ত জাহালতের কারণে উকিল মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয় না। আর যখন উকিল মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হলো না তখন উকিল যথাযথভাবে আদেশ পালনেও সক্ষম হবে না। তাই উল্লিখিত সুরতে উকিল নিযুক্ত শুদ্ধ হবে না। আর যদি মুওয়াক্কিল এমন শব্দ উল্লেখ করে যা বহু প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন গোলাম ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল অথবা দাসী ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল তো এ উকালতও শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি তার আনুমানিক মূল্য বর্ণনা করে দেয় অথবা তার প্রকার বর্ণনা করে দেয় তাহলে এ উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা মূল্য বর্ণনার দ্বারা প্রকার পরিজ্ঞাত হয়ে যায় আর প্রকার উল্লেখের দ্বারা অজ্ঞতা কমে যায়। সুতরাং যখন প্রকার উল্লেখের দ্বারা অজ্ঞতা কমে গেল তখন উকিল আদেশ পালনে সক্ষম হবে। আর যখন উকিল আদেশ পালনে সক্ষম হলো তখন উক্ত সুরতে উকালত শুদ্ধ হবে। হিদায়া প্রণেতা তার উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে গোলাম ক্রয়ের জন্য অথবা দাসী ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে এ উকালত সঠিক নয়। কেননা গোলাম ও বাঁদি শব্দ দুটি বিভিন্ন প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এজন্য যে, গোলাম ও বাঁদি তুর্কি হয়, হাবশিও হয়, হিন্দুস্তানি ও হয় সিন্ধিও হয়, আবার مُوَلَّدٌ -ও হয়। আর مُوَلَّدٌ বলা হয় ঐ গোলামকে যেটা ইসলামি রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, مُوَلَّدٌ ঐ অনারব ব্যক্তি যে আরবে লালিতপালিত হয়েছে। আর কেউ কেউ এও বলেছেন যে, مُوَلَّدٌ ঐ গোলামকে বলে যার পিতা হিন্দুস্তানি আর মাতা আরবি অর্থাৎ শংকর। যাহোক গোলাম এবং বাঁদি শব্দ দুটি যখন বিবিধ প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে তো মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতা এবং অস্পষ্টতার কারণে উকিল আদেশ পালনে সক্ষম হবে না। আর যখন উকিলের জন্য মুওয়াক্কিলের আদেশ পালন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে তখন উকালত শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ, যদি তার প্রকার বর্ণনা করে দেয়। যথা এরূপ বলে দেয় যে, তুর্কি গোলাম ক্রয় করে আন, অথবা হাবশি গোলাম ক্রয় করে আন ইত্যাদি, তাহলে এ উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ। তদ্রূপ যদি প্রকার তো বর্ণনা করল না কিন্তু আনুমানিক মূল্য বর্ণনা করে দেয় সেক্ষেত্রেও উল্লিখিত দলিলের ভিত্তিতে উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি মুওয়াক্কিল প্রকার বর্ণনা করে দেয় অথবা আনুমানিক মূল্য বলে দেয় কিন্তু ভালো হওয়া খারাপ হওয়া অথবা মধ্যম হওয়া বর্ণনা না করে তবুও উকিল নিযুক্তি বৈধ হবে। কেননা অজ্ঞতার এ পরিমাণ এত সামান্য যেটাকে উকালত বরদাশত করে। আর এতটুকু অজ্ঞতার উকালতের ক্ষেত্রে কোনো পরোয়া করা হয় না। তাই এ অজ্ঞতা সত্ত্বেও উকালত শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ مِنَ الصِّفَةِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, মূল ভাষ্যে صِفَتْ দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.)-এর উদ্দেশ্য نَوْع বা প্রকার। এখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, ক্রয়ের উকিল নিযুক্তির জন্য বস্তুর শ্রেণি এবং প্রকারের বর্ণনা আবশ্যক। আর একথা বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যাতে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য হিদায়া প্রণেতার বর্ণনাকৃত শরয়ী বিধানের অনুকূল হয়ে যায় এবং সমস্ত মাশায়েখের স্পষ্ট বর্ণনার অনুরূপ হয়ে যায়। কেননা মাশায়েখে কেরাম جِنْس এবং نَوْع বর্ণনা করাকেই আবশ্যক বলেছেন। صِفَتْ বর্ণনার কথা আলাদাভাবে কেউ উল্লেখ করেননি। সুতরাং এখানে ইমাম কুদূরী যে صِفَتْ বলে نَوْع বা প্রকার বুঝানোর চেষ্টা করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَنْ قَالَ لِاٰخَرَ إِشْتَرْ لِىْ ثَوْبًا اَوْ دَابَّةً اَوْ دَارًا فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ فَاِنَّ الدَّابَّةَ فِىْ حَقِيْقَةِ اللُّغَةِ اِسْمٌ لِمَا يَدِبُّ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ وَفِى الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَقَدْ جَمَعَ اَجْنَاسًا وَكَذَا الثَّوْبُ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمَلْبُوْسَ مِنَ الْاَطْلَسِ اِلَى الْكِسَاءِ وَلِهٰذَا لَايَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا وَكَذَا الدَّارُ تَشْمُلُ مَا هُوَ فِىْ مَعْنَى الْاَجْنَاسِ لِاَنَّهَا تَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا فَاحِشًا بِاِخْتِلَافِ الْاَغْرَاضِ وَالْجِيْرَانِ وَالْمَرَافِقِ وَالْمَحَالِ وَالْبُلْدَانِ فَيَتَعَذَّرُ الْاِمْتِثَالُ ـ

অনুবাদ : জামিউস সাগীর কিতাবে বলা হয়েছে, কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমার জন্য বস্ত্র বা পশু বা বাড়ি ক্রয় কর, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে উকালত বাতিল হবে। কেননা আরবি ভাষায় প্রকৃত অর্থে [دَابَّةٌ] পশু বলে ভূমিতে বিচরণশীল যে কোনো প্রাণীকে; আর লোক প্রচলনে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের উপর। সুতরাং শব্দটি কয়েকটি শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করল। আর বস্ত্র (ثَوْبٌ) শব্দটিও একই রকম। কেননা তা উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট পরিধেয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই মহর হিসেবে শুধু বস্ত্র উল্লেখ করা বৈধ নয়। তদ্রূপ دَارٌ বা বাড়ি শব্দটি গুণগতভাবে কয়েক শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা, প্রতিবেশীর বিভিন্নতা, সুযোগ-সুবিধার বিভিন্নতা, মহল্লার বিভিন্নতা এবং শহরের বিভিন্নতার কারণে তা বেশ পার্থক্যপূর্ণ হয়। সুতরাং আদেশ পালন করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الخ : হেদায়া প্রণেতা বলেন, মুওয়াক্কিল যদি এমন শব্দ উল্লেখ করে যা বহুবিধ শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে তো জামিউস সগীরে তার সুরত এভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যদি কেউ অন্য কাউকে বলে যে, তুমি আমার জন্য বস্ত্র ক্রয় করে নিয়ে এসো, অথবা চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে নিয়ে এসো, অথবা বাড়ি ক্রয় করে আন, তাহলে এ ক্রয় করা উকিলের নিজের জন্য হবে, মুওয়াক্কিলের জন্য হবে না।

দলিল হলো, পশু, বস্ত্র এবং বাড়ি এসব শব্দে মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্টতা এবং جَهَالَتْ রয়েছে। কেননা دَابَّة আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক ঐ প্রাণীর উপর প্রযোজ্য হয় যা ভূপৃষ্ঠে চলাচল করে। আর عُرْف এবং পরিভাষায় دَابَّة -এর প্রয়োগ ঘোড়া, গাধা এবং খচ্চরের উপর হয়, সর্বাবস্থায় دَابَّة -এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হোক বা পারিভাষিক অর্থ– উভয় সুরতে دَابَّةٌ শব্দটি বিভিন্ন শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর কোনো শব্দের বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্তিকরণ এ কথার বহিঃপ্রকাশ করে যে, শব্দটিতে মাত্রাতিরিক্ত جَهَالَتْ ও অজ্ঞতা রয়েছে। তদ্রূপ বস্ত্র শব্দটি যেহেতু উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট পর্যন্ত সব ধরনের পরিধেয় বস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই বস্ত্র শব্দেও মাত্রাতিরিক্ত جَهَالَتْ ও অজ্ঞতা বিদ্যমান। এ মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণেই বস্ত্রকে মহর ধার্য করা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ বস্ত্র শব্দ দ্বারা যদি মহর বর্ণনা করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং মহরে মিছিল আবশ্যক হবে। যাহোক বস্ত্র শব্দটিও যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই বস্ত্র শব্দেও মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

তদ্রূপ বাড়ি শব্দটি যদিও প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, তথাপি এমন সব বাড়িকে অন্তর্ভুক্ত করে যা বিভিন্ন শ্রেণির অর্থ বহন করে। কেননা ঘর-বাড়ির মূল্যমানের বিশাল ব্যবধান হয় তদ্রূপ বাড়িসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কোনো বাড়ি অফিস-আদালতের কাজের উপযোগী হয় কিন্তু বসবাসের উপযোগী হয় না এবং এর বিপরীতও হয়। আবার প্রতিবেশীর ভিন্নতার কারণেও বাড়ির মূল্যমানে তারতম্য দেখা যায়। যেমন একটা বাড়ি এমন যার প্রতিবেশী অত্যন্ত ভদ্র, সম্ভ্রান্ত এবং ভালো মানুষ আর অন্য বাড়ির প্রতিবেশী দেখা যায় অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির, অভদ্র এবং খারাপ মানুষ। তো এ দুই বাড়ির মূল্যের মাঝে তারতম্য হবে।

সুযোগ-সুবিধার বিভিন্নতার কারণেও বাড়ি ঘরের মূল্যমান বেশ পার্থক্যপূর্ণ হয়। যেমন– একটা বাড়ি এমন যাতে রোদ আসে, আলো-বাতাস সবই আসে, মসজিদেরও কাছে এবং মেইন রোডের নিকটে; আরেকটা বাড়ি এমন যেখানে এসব সুযোগ-সুবিধা নেই। তো এ দুই বাড়ির মূল্যমানের মাঝেও তারতম্য হবে। মহল্লার বিভিন্নতার কারণেও মূল্যমান পার্থক্যপূর্ণ হয়। যেমন– একটা বাড়ি এমন মহল্লায় অবস্থিত যেখানে ময়লা-আবর্জনা, অপরিচ্ছন্নতা এবং দুর্গন্ধ থাকে। আরেকটা বাড়ি এমন মহল্লায় অবস্থিত যেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুন্দর ব্যবস্থাপনা এবং শহরের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তো এ দুই বাড়ির মূল্যমানের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই তারতম্য হবে। আর শহরের বিভিন্নতার কারণেও পার্থক্যপূর্ণ হয়। কাজেই যে বাড়িটা ঢাকার মতো শহরে অবস্থিত সে বাড়ির মূল্যমান ঐ কোয়ালিটির আরেকটি বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি হবে যেটা যশোরে অথবা অন্য কোনো জেলা শহরে অবস্থিত। যাহোক যখন এসব দিক বিবেচনায় ঘরবাড়ির মূল্যমানের মাঝে তারতম্য হয় তো বাড়ি শব্দটি যেহেতু সব ধরনের বাড়িকেই অন্তর্ভুক্ত করে তাই বাড়ি শব্দটি যদিও প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে না তথাপি এসব বাড়ি মূল্যমানের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণির অর্থে তো নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। আর এ কারণেই বাড়ি শব্দটিতে মাত্রাতিরিক্ত অস্পষ্টতা এবং جَهَالَتْ বিদ্যমান। আর যখন পশু, বস্ত্র ও বাড়ি প্রভৃতি শব্দাবলি দ্বারা ক্রয় করার আদেশ করল মাঝে মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতা বিদ্যমান হলো তো এ মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে উকিলের পক্ষে আদেশ পালন দুঃসাধ্য এবং অসম্ভব হয়ে যাবে। আর যখান উকিলের জন্য আদেশ পালন দুঃসাধ্য হলো তখন এ উকালত বাতিল বলে গণ্য হবে। বাকি থাকল মূল্য উল্লেখ করে দেওয়া। তো এর দ্বারাও অজ্ঞতা দূরীভূত হয় না। কেননা এ মূল্যমানের বস্তু প্রত্যেক শ্রেণিতেই পাওয়া যায়। আর যেহেতু প্রত্যেক শ্রেণিতেই এ মূল্যমানের বস্তু বিদ্যমান তাই মূল্য বর্ণনার দ্বারা উকিল মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারবে না। আর যখন উকিল মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্যই বুঝতে পারবে না। তখন সে আদেশ পালনেও সক্ষম হবে না। আর যখন উকিল আদেশ পালনে সক্ষম হলো না, তখন মুওয়াক্কিলের মূল্য বর্ণনা সত্ত্বেও উকালত বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : اِنْ سُمِّيَ ثَمَنُ الدَّارِ وَوُصِفَ جِنْسُ الدَّارِ وَالثَّوْبِ جَازَ مَعْنَاهُ نَوْعَهُ وَكَذَا اِذَا سُمِّيَ نَوْعُ الدَّابَّةِ بِاَنْ قَالَ حِمَارٌ اَوْ نَحْوُهُ ـ

অনুবাদ : 'জামিউস সাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি বাড়ির মূল্য উল্লেখ করে এবং বাড়ি ও বস্ত্রের শ্রেণি উল্লেখ করে তাহলে জায়েজ হবে। এখানে শ্রেণি দ্বারা প্রকার উদ্দেশ্য। তদ্রূপ যদি পশুর প্রকার উল্লেখ করে, যেমন বলল, গাধা বা অন্য কিছু তাহলেও জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اِنْ سُمِّيَ الخ : 'যদি বাড়ির মূল্য উল্লেখ করে এবং বাড়ি ও বস্ত্রের শ্রেণি উল্লেখ করে তাহলে উকিল নিযুক্তি জায়েজ হবে।' এ ইবারত জামিউস সগীরের। হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে বলেছেন– 'বাড়ি ও বস্ত্রের শ্রেণি উল্লেখ করলে উকালত বৈধ হবে' এখানে جِنْس বা শ্রেণির দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকার বা نَوْع তাহলে অর্থ হবে যে, যদি মুওয়াক্কিল বাড়ি ও বস্ত্রের প্রকার বর্ণনা করে দেয় তাহলে উকালত জায়েজ হবে। যেমন মুওয়াক্কিল বলল, অমুক মহল্লায় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি মূল্যমানের একটা বাড়ি ক্রয় করে দাও, তো এ উকালত বৈধ। তদ্রূপ যদি বস্ত্র ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করে এবং বস্ত্রের প্রকার উল্লেখ করে দেয় তাহলে এ উকিল নিযুক্তি বৈধ। অনুরূপ যদি পশু ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করে আর পশুর প্রকার বর্ণনা করে দেয় যেমন বলে দেয় যে, আমার জন্য একটা ঘোড়া অথবা একটা গাধা ক্রয় কর, তাহলে এ উকিল নিযুক্তি বৈধ। কেননা যখন বাড়ি, বস্ত্র এবং পশুর প্রকার এবং نَوْع বর্ণনা করে দিল তখন তাতে جَهَالَتْ বা অজ্ঞতা একপ্রকারে দূরীভূত হয়ে যায়, সামান্য অজ্ঞতা থেকে যায়। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সামান্য جَهَالَتْ উকালতের বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কাজেই উল্লিখিত সুরতসমূহে প্রকার উল্লেখের পরে উকালত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

নাতায়িজুল আফকার প্রণেতা نِهَايَة -এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, জামিউস সাগীরের বর্ণনা 'মাবসূতের' বর্ণনার বিপরীত। কেননা মাবসূতে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেছেন, যদি মুওয়াক্কিল তাকে একটা বাড়ি ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে আর মূল্য উল্লেখ না করে তাহলে এ উকিল নিযুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা মূল্য উল্লেখ করার দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে যায়। সামান্য অজ্ঞতা বাকি থাকে যা উকালাতের বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

মাবসূতের বর্ণনা অনুযায়ী উকালতের বৈধতার জন্য বাড়ির মূল্য বর্ণনার পরে তার প্রকার উল্লেখ আবশ্যকীয় নয়; বরং মূল্যের বর্ণনাই যথেষ্ট। আর জামিউস সগীরের বর্ণনা মতে বাড়ির মূল্য উল্লেখই যথেষ্ট নয়; বরং তার প্রকার বর্ণনা করে দেওয়াও আবশ্যক।

قَالَ : وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اٰخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اِشْتَرِ لِي بِهَا طَعَامًا فَهُوَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا اِسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى كُلِّ مَطْعُوْمٍ اِعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ كَمَا فِي الْيَمِيْنِ عَلَى الْاَكْلِ اِذَا الطَّعَامُ اِسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ الْعُرْفَ اَمْلَكُ وَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ اِذَا ذُكِرَ مَقْرُوْنًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَا عُرْفَ فِي الْاَكْلِ فَبَقِيَ عَلَى الْوَضْعِ وَقِيْلَ اِنْ كَثُرَتِ الدَّرَاهِمُ فَعَلَى الْحِنْطَةِ وَاِنْ قَلَّتْ فَعَلَى الْخُبْزِ وَاِنْ كَانَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ فَعَلَى الدَّقِيْقِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সগীর কিতাবে] বলেন, কেউ যদি কাউকে [কম বা বেশি] কিছু দিরহাম দিয়ে বলে, এ দ্বারা আমার জন্য খাদ্য সামগ্রী ক্রয় কর, তাহলে গম বা আটা উদ্দেশ্য হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। পক্ষান্তরে প্রকৃত অর্থের বিবেচনায় কিয়াসের দাবি হবে– যে কোনো খাদ্যদ্রব্য। খাওয়ার ব্যাপারে ইয়ামীন বা কসম করার ক্ষেত্রে যেমন। কেননা খাওয়া যায় এমন যে কোনো কিছুকেই খাদ্য সামগ্রী বলে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো [কিয়াসের তুলনায়] লোকপ্রচলনই অগ্রগণ্য। আর খাদ্য সামগ্রী শব্দটিকে ক্রয় বা বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত রূপে উল্লেখ করলে আমরা যা বলেছি সেটাই উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে খাওয়ার কসমের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো লোকপ্রচলন নেই। সুতরাং তখন শব্দটি তার আদি অর্থেই বহাল থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন, দিরহামের পরিমাণ বেশি হলে গম উদ্দেশ্য হবে, আর অল্প হলে তৈরি রুটি উদ্দেশ্য হবে, আর মধ্যম পরিমাণ হলে আটা উদ্দেশ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اٰخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اِشْتَرِ لِي بِهَا طَعَامًا الخ : যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিছু টাকা দেয়– চাই অল্প টাকা হোক চাই বেশি আর টাকা দিয়ে বলে যে, এ টাকা দিয়ে আমার জন্য খাবার ক্রয় করে নিয়ে এসো। তো সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে এ উকালত গম এবং গমের আটার উপর ধার্য হবে। অর্থাৎ উকিল শুধু গম অথবা আটা ক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। এছাড়া সে অন্য খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের অনুমতি পাবে না। আর কিয়াসের দাবি হলো, উকালত প্রত্যেক ঐ খাদ্যদ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যেটাকে আহার্য রূপে গ্রহণ করা হয়। কিয়াস বা স্থূল যুক্তিতো এই যে, খাদ্য বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যেটাকে আহার্যরূপে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ খাওয়া হয়। সুতরাং খাদ্যের প্রকৃত অর্থ বিবেচনায় প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের উপরই উকালত সংঘটিত হবে। যেমন যদি কেউ এ শপথ করে যে, আমি খানা খাব না। তো এ ব্যক্তি যে কোনো খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের দ্বারাই শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। চাই গম বা গমের আটা হোক অথবা এছাড়া অন্য কোনো ফল অথবা যে কোনো খাদ্যদ্রব্য হোক। সুতরাং শপথের ক্ষেত্রে যেমন খাদ্য বলতে যে কোনো খাদ্যদ্রব্যকে বুঝায় তদ্রূপ উকালতের ক্ষেত্রেও খাদ্য বললে যে কোনো খাদ্যদ্রব্যকে বুঝাবে।

সূক্ষ্ম যুক্তি হলো, খাওয়ার শপথের সাথে তুলনা করে খাদ্য শব্দটি যদিও সব খাদ্যের উপর প্রযোজ্য হয় তথাপি লোকপ্রচলনে খাদ্য শব্দটিকে যখন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়, উদাহরণত এরূপ বলা হয় যে, খাদ্য ক্রয় করেছে অথবা খাদ্য

বিক্রয় করেছে তো সে সময় খাদ্য দ্বারা গম এবং আটাই উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং স্থূল যুক্তির বিবেচনায় খাদ্য শব্দের প্রয়োগ যে কোনো খাদ্যদ্রব্যের উপর হয়। আর লোকপ্রচলনের বিবেচনায় শুধু গম ও তার আটার উপর হয়। আর লোকপ্রচলন যেহেতু কিয়াস এবং যুক্তির তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং অগ্রাধিকার গণ্য হয়, তাই লোকপ্রচলন অনুযায়ী আমল করে খাদ্যের উকালত গম এবং তার আটার উপরেই সংঘটিত হবে। আর খাওয়ার যেহেতু কোনো লোকপ্রচলন নেই বরং সব আহারযোগ্য বস্তুই খাওয়া হয় তাই না খাওয়ার শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে খাদ্য শব্দটি তার নিজের প্রকৃতি এবং মৌলের উপরে দৃঢ় থাকবে এবং যে কোনো খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী গণ্য হবে। وَالتَّقْيِيْدُ الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ অর্থাৎ عُرْف এবং লোকপ্রচলনে স্বতঃসিদ্ধ বস্তু শরিয়তের স্পষ্ট ভাষ্যের মতো কার্যকর হয়। মাবসূতে এভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। কাফী গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, এ কারণেই যদি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় না করার শপথ করে তাহলে গম ও গমের আটা ক্রয়ের দ্বারাই কেবল শপথ ভঙ্গকারী হবে। অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খাদ্য শব্দটি ব্যবহৃত হলে সেখানে লোকপ্রচলনে গম ও তার আটাকেই বুঝায়, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বুঝায় না। কিন্তু খাওয়ার ক্ষেত্রে এমন কোনো লোকপ্রচলন নেই, তাই সে ক্ষেত্রে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাকেই খাওয়া বলা হয়। এমন নয় যে শুধু গম খেলে বলা হয় খেয়েছে, ফল খেলে বলা হয় না; বরং সব ক্ষেত্রে বলা হবে খেয়েছে।

নাতায়িজ তথা تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْقَدِيْرِ প্রণেতা বলেন, মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, খাদ্য ক্রয় সম্বন্ধে যা কিছু বলা হলো যে, খাদ্য বলতে গমকে বুঝায় অন্য কিছু নয় এটা কূফাবাসীদের লোকপ্রচলন মাত্র। কেননা গম ও গমের আটার বাজারকেই তাদের পরিভাষায় খাদ্যের বাজার বলা হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকপ্রচলনে যে কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করাতেই খাদ্যর ক্রয়কারী বলে বিবেচ্য হয়।

مَا وَرَاءُ النَّهْرِ বা ট্রান্স অক্সিয়ানা-এর কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, খাবার বলতে আমাদের দেশে প্রত্যেক ঐ খাবারকে বোঝায় যা শুরুয়া এবং ঝোল ছাড়া খাওয়া যায়। যেমন ভুনা করা মাংস ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্তি সংঘটিত হবে এর উপরে। অর্থাৎ যদি مَاوَرَاءُ النَّهْرِ-এ কেউ খাবার ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে তাহলে উকিল পাকানো মাংস ক্রয় করে আনবে। সাদরুশ শহীদ বলেন, এর উপরেই ফতোয়া।

বি. দ্র. আমাদের বাংলদেশে খাবার হিসেবে প্রচলিত হলো ভাত এবং তরকারি। অবস্থাভেদে অন্য কিছুর উপরও খাবারের প্রয়োগ হয়।

قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنْ كَثُرَتْ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, কেউ কেউ [যেমন- أَبُوْ جَعْفَرِ الْهِنْدَوَانِيُّ] বলেন, মুওয়াক্কিল যদি খাদ্য ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করে আর টাকা বেশি উল্লেখ করে তাহলে উকালত গমের উপর সংঘটিত হবে। আর যদি টাকার পরিমাণ কম উল্লেখ করা হয় তাহলে উকালত রুটির ব্যাপারে সংঘটিত হবে। আর যদি মাঝামাঝি পরিমাণের টাকা উল্লেখ করা হয় তাহলে উকালত আটার ব্যাপারেই সংঘটিত হবে। একথা স্পষ্ট থাকা আবশ্যক যে, টাকার কমবেশি এবং মধ্যম হওয়ার সিদ্ধান্তও عُرْف এবং প্রচলনের মাধ্যমে হবে। আর عُرْف ও প্রচলন সব জায়গায় সব জামানাতে ভিন্ন হয়।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ فَلَهُ اَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَادَامَ الْمَبِيْعُ فِىْ يَدِهٖ لِاَنَّهُ مِنْ حُقُوْقِ الْعَقْدِ وَهِىَ كُلُّهَا اِلَيْهِ فَاِنْ سَلَّمَهُ اِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ لِاَنَّهُ اِنْتَهٰى حُكْمُ الْوَكَالَةِ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِبْطَالُ يَدِهِ الْحَقِيْقِيَّةِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلِهٰذَا كَانَ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِىْ فِى الْمُشْتَرِىْ دَعْوًى كَالشَّفِيْعِ وَغَيْرِهٖ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ اِلَى الْمُوَكِّلِ لَا بَعْدَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিল যদি বস্তুটি ক্রয় করে এবং কবজা করে অতঃপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে বিক্রয় দ্রব্য তার হাতে থাকা পর্যন্ত দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা এটা হলো চুক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর [চুক্তি সংশ্লিষ্ট] সমস্ত অধিকার তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আর যদি মুওয়াক্কিলের কাছে অর্পণ করে দেয় তাহলে তার অনুমতি ছাড়া ফেরত দিতে পারবে না। কেননা [অর্পণের মাধ্যমে] উকালতের বিধান শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া তাতে মুওয়াক্কিলের প্রকৃত কবজা বাতিল করা হয়। সুতরাং তার অনুমতি ছাড় উকিল তা করতে পারবে না। এ কারণেই ক্রয়কৃত জমিতে কেউ যদি শুফ'আর ইত্যাদি কোনো দাবি উত্থাপন করে তাহলে মুওয়াক্কিলের হাতে অর্পণ করার পূর্বে উকিল মামলায় প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হয়, কিন্তু অর্পণের পরে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ الخ : মাসআলার স্বরূপ হলো, যদি কোনো ক্রয়ের উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশ মোতাবেক কোনো বস্তু ক্রয় করে কবজা করে নেয় অতঃপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তার দুই সুরত। বিক্রয় দ্রব্য উকিলের কবজায় হবে অথবা উকিল সেটাকে মুওয়াক্কিলের হাওয়ালা করে দিয়ে থাকবে। যদি বিক্রয় দ্রব্য উকিলের কবজায় থাকে তাহলে উকিল خِيَار عَيْب -এর ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের অনুমতি ছাড়া ঐ বিক্রীত দ্রব্যকে বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে। কেননা দোষের কারণে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়া চুক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর চুক্তি সংশ্লিষ্ট সমস্ত অধিকার উকিলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। কাজেই উকিল দোষের কারণে ক্রয়কৃত পণ্যকে বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। আর যদি উকিল পণ্য মুওয়াক্কিলের কাছে হস্তান্তর করে ফেলে তাহলে উকিল মুওয়াক্কিলের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কেননা বিক্রয় দ্রব্য মুওয়াক্কিলের কাছে সোপর্দ করার দ্বারা উকালতের বিধান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যখন উকালতের বিধান পুরো হয়ে গেল তখন উকালত শেষ হয়ে গেল আর উকিল একজন অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হলো তখন তার মুওয়াক্কিলের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রয় দ্রব্য যখন মুওয়াক্কিলের হস্তে অর্পণ করে দেওয়া হলো এখন যদি উকিল তা বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দেয় তাহলে এতে করে মুওয়াক্কিলের প্রকৃত কবজা বাতিল করা অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। অথচ কবজাকারীর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কবজা বাতিল করতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ সুরতে উকিল মুওয়াক্কিলের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا كَانَ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِىْ فِى الْمُشْتَرِىْ الخ : যেহেতু উকিল মুওয়াক্কিলের কাছে বিক্রয় দ্রব্য অর্পণের পরে ফিরিয়ে দিতে পারে না, এ কারণেই ক্রয়কৃত বস্তুতে যদি কেউ হক্কে শুফ'আহ অথবা অধিকারীত্বের দাবি করে তাহলে উকিল সে ক্ষেত্রে ঐ দাবিতে বিবাদী তখন সাব্যস্ত হবে যখন উকিল বিক্রয় দ্রব্য মুওয়াক্কিলে কাছে অর্পণ করেনি। আর যদি উকিল বিক্রয় দ্রব্য মুওয়াক্কিলের কাছে অর্পণ করে ফেলে তাহলে উকিল বিবাদী হবে না; বরং মুওয়াক্কিলের বিবাদী হবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ لِاَنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلُ بِهِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ عَلٰى مَا مَرَّ وَمُرَادُهُ التَّوْكِيلُ بِالْاِسْلَامِ دُوْنَ قَبُوْلِ السَّلَمِ لِاَنَّ ذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ فَاِنَّ الْوَكِيْلَ يَبِيْعُ طَعَامًا فِىْ ذِمَّتِهِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ الثَّمَنُ لِغَيْرِهِ وَهٰذَا لَا يَجُوْزُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বায় সারফ' ও 'বায় সালাম' চুক্তির ব্যাপারে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। কেননা এটা এমন চুক্তি যা মুওয়াক্কিল নিজে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঐ বিষয়ে উকিল নিযুক্ত করারও অধিকারী হবে। যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুদূরীর উদ্দেশ্য হলো [দাদন গ্রহীতার পক্ষ হতে] 'বায় সালাম' চুক্তি সম্পাদনের জন্য উকিল নিযুক্ত করা, দাদন গ্রহীতার পক্ষ থেকে বায় সালাম চুক্তি গ্রহণের জন্য উকিল নিযুক্ত করা নয়। কারণ তা জায়েজ নয়। কেননা এক্ষেত্রে উকিল তার জিম্মায় অনির্ধারিত রূপে সাব্যস্ত খাদ্য বিক্রি করছে এ শর্তে যে, মূল্যটা হবে অন্যের আর তা জায়েজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বায় সারফ' ও 'বায় সালাম' চুক্তির ব্যাপারে উকিল নিযুক্ত করা বৈধ। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি عَقْد صَرْف এবং عَقْد سَلَمْ সম্পাদনের জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে তা বৈধ। কেননা عَقْد صَرْف এবং عَقْد سَلَمْ এমন চুক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা মুওয়াক্কিল নিজে সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঐ বিষয়ে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করারও অধিকারী হবে, যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ التَّوْكِيلُ بِالْاِسْلَامِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, এক তো হলো عَقْد سَلَمْ সম্পাদন করা। আরেক হলো আকদে সালাম কবুল করা। আকদে সালাম সম্পাদন তো দাদনদাতার পক্ষ থেকে হয়, আর কবুল করা مُسْلَمْ اِلَيْه তথা দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য হলো, عَقْد سَلَمْ সম্পাদনের জন্য তো رَبُّ السَّلَم তথা দাদন [বা অগ্রিম মূল্য] প্রদানকারী উকিল নিযুক্ত করতে পারে। তথাপি عَقْد سَلَمْ কবুল করার জন্য দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্তি বৈধ নয়।

مُسْلَمْ اِلَيْه বা দাদন [অগ্রিম মূল্য] গ্রহীতার পক্ষ থেকে কাউকে عَقْد سَلَمْ কবুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা বৈধ না হওয়ার কারণ হলো, مُسْلَم فِيْه বা مُسْلَمْ اِلَيْه বা দাদনগ্রহীতার উকিল এক্ষেত্রে এমন খাদ্য বিক্রয় করছে যা তার জিম্মায় ঋণ থেকে যাচ্ছে। কেননা مُسْلَم فِيْه দাদনগ্রহীতার জিম্মায় বাকি থাকে। তো যখন দাদনগ্রহীতা উকিল নিযুক্ত করল আর উকিলই عَقْد سَلَمْ কবুল করল তখন مُسْلَم فِيْه উকিলের জিম্মায় ঋণ হয়ে যাবে। এ শর্তের উপর যে ثَمَن বা মূল্য অন্যের অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের হবে। অথচ এটা অবৈধ। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মালিকানাধীন বস্তু এই শর্তে বিক্রয় করে যে, মূল্য অন্যের হবে তাহলে এ বিক্রয় বৈধ হয় না। সুতরাং অদ্রূপ যদি مُسْلَمْ فِيْه টা উকিল নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে আর মূল্য মুওয়াক্কিলের হয় তাহলে এটাও অবৈধ হবে। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তির উপর এ আপত্তি হতে পারে যে, উকালত অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনাকৃত মূলনীতির ভিত্তিতে مُسْلَمْ اِلَيْه তথা দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করাও বৈধ হওয়া উচিত ছিল। কেননা মূলনীতি হলো, যে কাজ মানুষ নিজে করতে পারে সে কাজের জন্য অন্যকে উকিলও নিযুক্ত করতে পারে। সুতরাং যখন مُسْلَمْ اِلَيْه বা দানগ্রহীতা عَقْد مُسْلَمْ নিজে কবুল করতে পারে, তখন তা কবুল করার জন্য উকিল নিযুক্ত করাও বৈধ হওয়া উচিত ছিল। এ আপত্তির উত্তর হলো, যুক্তি এবং কিয়াসের দাবিতো হচ্ছে, مُسْلَمْ اِلَيْه তথা দাদনগ্রহীতা ও عَقْد سَلَمْ কবুল করার অনুমতি না পাওয়া, কেননা عَقْد سَلَمْ যেহেতু مُسْلَم فِيْه তথা বিক্রয় পণ্য অনুপস্থিত থাকে তাই مُسْلَم فِيْه [বিক্রয় পণ্য] অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে عَقْد سَلَمْ অবৈধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ অনুপস্থিত কোনো বস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু عَقْد سَلَمْ -এর অনুমতি দিয়েছেন, এ হাদীসের কারণে কিয়াস বহির্ভূত عَقْد مُسْلَمْ -কে বৈধ করা হয়েছে আর যে বিষয় خِلَاف قِيَاس বা বাহ্যিক যুক্তি বিরুদ্ধ হয় শুধুমাত্র কুরআন হাদীসের পরিষ্কার ভাষ্য তথা نَص -এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় সে বিষয় সেই نَص তথা ভাষ্যের উৎসস্থলে সীমাবদ্ধ থাকে। সেই ভাষ্যের উপর অন্য কিছুকে কিয়াস বা তুলনা করা ঠিক হয় না। কাজেই عَقْد سَلَمْ -কে খিলাফে কিয়াস যুক্তিবিরুদ্ধভাবে দাদনগ্রহীতা তো কবুল করতে পারবে কিন্তু এর জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারবে না।

فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِوُجُودِ الْاِفْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيلُ فَيَصِحُّ قَبْضُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّسُولَيْنِ لِاَنَّ الرِّسَالَةَ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ وَيَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْمُرْسِلِ فَصَارَ قَبْضُ الرَّسُولِ قَبْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَّ ـ

অনুবাদ : [সারফ ও সালামের ক্ষেত্রে] উকিল যদি [সারফের বিনিময় এবং দাদনের মূলধন] কবজা করার পূর্বেই প্রতিপক্ষ থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কবজা করা ছাড়া পৃথক হওয়া পাওয়া গেছে। মুওয়াক্কিলের পৃথক হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। কেননা সে তো চুক্তি সম্পাদনকারী নয়। আর চুক্তির কারণে চুক্তিকারীর প্রাপ্য হয়েছে। সে হলো উকিল; সুতরাং তার কবজা করা বৈধ হবে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তার সঙ্গে হকসমূহ সম্পৃক্ত হয় না। যেমন নাবালক ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দাস [যদি উকিল হয়।] পক্ষান্তরে 'বায় সারফ' ও 'বায় সালামের' বিষয়ে প্রেরিত দূতদ্বয় -এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের বার্তাবাহন হলো চুক্তির ক্ষেত্রে, কবজার ক্ষেত্রে নয়। আর তার বক্তব্য প্রেরকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং দূতের কবজা গ্রহণ হবে এরূপ যে চুক্তিকারী নয় তার কবজা গ্রহণ। সুতরাং তা বৈধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ الخ : মাসআলাটি এমন যে, যদি عَقْد صرف অথবা عَقْد سَلَمْ সম্পাদনকারী উকিল এবং তার ঐ সাথি যে তার সাথে عَقْد صَرْف অথবা عَقْد سَلَمْ করেছে কবজা করার পূর্বে উভয়েই পৃথক হয়ে যায়, তাহলে এ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা عَقْد صَرْف শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো, চুক্তির বৈঠকে উভয় বিনিময়ের উপর কবজা সাব্যস্ত হতে হবে। সুতরাং যখন উকিল এবং অপর চুক্তি সম্পাদনকারী কবজা করা ছাড়াই মজলিস থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন বায় সারফ ও সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল না। আর যখন শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল না তখন عَقْد صَرْف এবং عَقْد سَلَمْ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ الخ : ইমাম (র.) কুদূরী বলেন, কবজা করার পূর্বে চুক্তির বৈঠক থেকে মুওয়াক্কিলের পৃথক হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। এজন্য যে, মুওয়াক্কিল চুক্তি সম্পাদনকারী নয়। আর চুক্তির কারণে চুক্তিসম্পাদনকারী কবজার হকদার হয়। আর চুক্তিসম্পাদনকারী এক্ষেত্রে উকিল। কাজেই صَرْف-এর বদলের উপর উকিলের কবজা শুদ্ধ হবে– মুওয়াক্কিলের কবজা নয়। উকিল চাই ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হোক যাদের সাথে চুক্তির হকসমূহ সম্পৃক্ত হয়। যেমন– বালেগ, অনুমতিপ্রাপ্ত দাস ইত্যাদি অথবা ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হোক যাদের সাথে হকসমূহ সম্পৃক্ত হয় না। যেমন– নাবালেগ ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দাস।

আর কবজার হকদার চুক্তি সম্পাদনকারী এজন্য হয় যে, عَقْد صَرْف-এর ক্ষেত্রে কবজাটা চুক্তির পরিপূরক এবং সম্পূরক হয়। কাজেই যার পক্ষ থেকে চুক্তি প্রকাশ পায় তার পক্ষ থেকেই কবজা শুদ্ধ হবে। আর উল্লিখিত সুরতে যেহেতু عَقْد صَرْف উকিল থেকে প্রকাশিত হয় তাই কবজাও উকিলেরই শুদ্ধ হবে। আর যখন উকিলের কবজা শুদ্ধ হলো তখন চুক্তির বৈঠক থেকে তার পৃথক হওয়াই বিবেচ্য হবে; মুওয়াক্কিলের পৃথক হওয়া বিবেচ্য হবে না। এর বিপরীতে যদি কেউ عَقْد صَرْف অথবা عَقْد سَلَمْ সম্পাদনের জন্য কাউকে বার্তাবাহক বা দূত বানিয়ে দেয় তাহলে صَرْف-এর বদল বা বিনিময়ের উপর দূতের কবজা শুদ্ধ হবে না। সুতরাং দূতের কবজার দ্বারা عَقْد صَرْف শুদ্ধ হবে না। তার কারণ হলো, দূত তো শুধু চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যম– কবজা করার মাধ্যম সে নয়। আর যখন এমনটিই হলো তখন দূতের বক্তব্য প্রেরকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যখন দূতের বক্তব্য প্রেরকের দিকে ফিরবে তখন চুক্তি সম্পাদনকারী হবে প্রেরক, দূত নয়। আর যখন চুক্তি সম্পাদনকারী হলো প্রেরক– দূত নয়, তখন চুক্তি সম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রেরকের কবজা শুদ্ধ হবে। আর দূত যেহেতু চুক্তি সম্পাদনকারী নয়। তাই তার কবজা শুদ্ধ হবে না।

قَالَ : وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيْعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ اِنْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَلِهٰذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيْلِ وَقَدْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِيْ لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْحُقُوْقَ لَمَّا كَانَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُوَكِّلُ فَيَكُوْنُ رَاضِيًا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিল যদি তার নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করে এবং বিক্রীত দ্রব্য কবজা করে তাহলে মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে তার মূল্য ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে। [এটা তার পক্ষ থেকে দান হিসেবে গণ্য করা হবে না।] কেননা উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধিগতভাবে একটি বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণেই তো যদি [উকিল ও মুওয়াক্কিল] তারা দুজন মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে তাহলে উভয়কেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হয় [তদ্রূপ] মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে মূল্য ফিরিয়ে নেবে। এ কারণেও যে, হকসমূহ যখন উকিলের দিকে ফিরে আর মুওয়াক্কিল সে কথা জানেও, তো মুওয়াক্কিল মূল্য উকিলের সম্পদ থেকে দেওয়ার উপর সম্মত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি এমন হয় যে, ক্রয়ের উকিল নিজের সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় পণ্যের উপর কবজা করে ফেলে তাহলে এ মূল্য পরিশোধ উকিলের পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে না; বরং উকিল মূল্য সমপরিমাণ টাকা মুওয়াক্কিল থেকে বুঝে নেবে। অনুরূপ বক্তব্য ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর।

দলিল হলো, উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধিগতভাবে একটি বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। কেননা উকিল হলো বিক্রেতার মতো আর মুওয়াক্কিল হলো ক্রেতার মতো। আর বিধিগত বিনিময়ের নিদর্শন এই যে, যদি উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে মূল্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে উভয় থেকে শপথ গ্রহণ করা হয় আর উভয় পক্ষের শপথ গ্রহণ বিনিময়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যদি মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় আর উভয়ের কারো কাছেই প্রমাণ না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয় থেকেই শপথ গ্রহণ করা হবে। যদি কেউ শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে তার বিপরীতেই ফয়সালা করে দেওয়া হবে। যদি উভয়েই শপথ করে নেয় তাহলে কাজি ঐ চুক্তিকে বাতিল করে দেবে। যাহোক এ মাসআলায় উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে উভয় থেকেই শপথ গ্রহণ করাটা এ কথার আলামত বা নিদর্শন যে উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধিগতভাবে বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। আর যদি মুওয়াক্কিল বিক্রয় পণ্যের কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে সে ঐ দোষের কারণে পণ্য উকিলের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে। আর দোষ-ত্রুটির কারণে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়া এটাও বিনিময়ের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাহোক উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধিগত বিনিময়ের সূত্রে উকিল মুওয়াক্কিলকে বিক্রয় পণ্য বুঝিয়ে দিয়েছে তখন মুওয়াক্কিল থেকে উকিলের পরিশোধকৃত মূল্য নিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, উকিল মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বা অনুদানদাতা তখন সাব্যস্ত হতো যখন এ মূল্য মুওয়াক্কিলের সম্মতিতেই পরিশোধ করা হয়েছে। যদিও এখানে সম্মতি সরাসরি প্রাপ্ত নয় বরং লক্ষণ থেকে প্রাপ্ত। আর লক্ষণ থেকে এভাবে মুওয়াক্কিলের সম্মতিপ্রাপ্ত হয়েছে যে, বিক্রয়ের সমস্ত হক উকিলের দিকেই ফিরে আর মুওয়াক্কিলের সে কথা জানাও আছে। সুতরাং যখন বিক্রয়ের হক উকিলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয় তখন মূল্যের তাগিদ উকিলের কাছেই করা হবে। আর যখন মূল্যের তাগিত উকিল থেকে হবে আর মুওয়াক্কিলের সে কথা জানা আছে তখন যেন মুওয়াক্কিল এ কথার উপর সম্মত হয়ে গেল যে, উকিল নিজের সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধ করে নেবে। আর মুওয়াক্কিলের এ কথার উপর সম্মত হওয়া যেন তার পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের অনুমতিই হলো। সার কথা এই যে, উকিল নিজের সম্পদ থেকে যে মূল্য পরিশোধ করেছে তা মুওয়াক্কিলের অনুমতিক্রমেই করেছে। আর যখন মুওয়াক্কিলের অনুমতিক্রমে পরিশোধ করল তখন উকিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুদান দিয়েছে এ কথার অবকাশ থাকল না। সুতরাং যখন উকিল অনুদান প্রদানকারী নয় তখন তার মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য সমপরিমাণ টাকা বুঝে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এমনকি যদি মুওয়াক্কিল মূল্য পরিশোধে এদিক-সেদিক করে তাহলে উকিলের পণ্য আটকে রাখার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهٖ قَبْلَ حَبْسِهٖ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ لِأَنَّ يَدَهٗ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا لَمْ يَحْبِسْهُ يَصِيْرُ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا بِيَدِهٖ ـ

অনুবাদ : যদি আটক রাখা ছাড়া বিক্রয় দ্রব্য উকিলের হাতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে নষ্ট হবে। আর [মুওয়াক্কিল থেকে] মূল্য রহিত হবে না। কেননা উকিলের কবজা মুওয়াক্কিলের মতো। সুতরাং যখন উকিল মুওয়াক্কিলকে বাধা দেয়নি [অর্থাৎ বিক্রয় দ্রব্য তার চাওয়া সত্ত্বেও তাকে না দিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখেনি] তখন উকিলের কবজা দ্বারা মুওয়াক্কিল কবজাকারী সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهٖ قَبْلَ حَبْسِهٖ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রয়ের উকিল নিজের সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধের পর বিক্রয় দ্রব্যের উপর কবজা করে নেয় আর সেই দ্রব্য উকিলের কবজাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যে উকিল মূল্যে পরিশোধের কারণে বিক্রয় দ্রব্য নিজের কাছে আটকেও রাখেনি, তাহলে এ দ্রব্য মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে নষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের সম্পদ নষ্ট হয়েছে, উকিলের নয়। কাজেই মূল্য মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে রহিত হবে না এবং মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে উকিলের মূল্যে পরিমাণ টাকা বুঝে নেওয়ার যে অধিকার তা বাতিল হবে না; বরং নিজের সম্পদ থেকে পরিশোধ করা মূল্য মুওয়াক্কিল থেকে বুঝে নেওয়ার অধিকার উকিলের থাকবে। কেননা বিক্রয় পণ্যের উপর উকিলের কবজা এমনই যেন মুওয়াক্কিলের কবজা। সুতরাং যখন উকিল নিজের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধের কারণে বিক্রয় পণ্য আটকে না রাখে তখন উকিলের কবজার দ্বারা বিধিগতভাবে মুওয়াক্কিল কবজাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। আর উকিলের কবজায় বিক্রয় পণ্য নষ্ট হওয়া এমনই যেন তা মুওয়াক্কিলের কবজাতে নষ্ট হয়েছে। আর মুওয়াক্কিলের কবজাতে নষ্ট হওয়ার সুরতে উকিলের নিজের থেকে ব্যয়কৃত টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হয় না। কাজেই এ সুরতেও উকিলের মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে ব্যয়কৃত টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিনায়াতে আরেকটি দলিল লিখেছেন যার সারসংক্ষেপ হলো, বিক্রয় দ্রব্য উকিলের কবজায় আমানত হয়। কেননা উকিল বিক্রয় পণ্যের উপর যে কবজা করেছে তা নিজের জন্য করেনি বরং মুওয়াক্কিলের আদেশে বা অনুমতিতে মুওয়াক্কিলের জন্য কবজা করেছে। আর যখন মুওয়াক্কিলের অনুমতিতে মুওয়াক্কিলের জন্য কবজা করল তখন এ কবজাটা আমানতের ভিত্তিতে হবে। আর সীমালঙ্ঘন ছাড়া আমানত নষ্ট হয়ে গেলে আমীনের উপর যেহেতু ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, তাই এ মাসআলায়ও উকিলের উপর কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর আমীন হওয়ার কারণে যখন উকিলের উপরে কোনো জরিমানা ওয়াজিব হয় না তখন উকিল যে মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করেছে উকিল সেই মূল্য তার মুওয়াক্কিল থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে তা রহিত হবে না।

وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَارَ قَابِضًا بِيَدِهِ فَكَأَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ قُلْنَا هٰذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلَا يَكُوْنُ رَاضِيًا بِسُقُوْطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ عَلٰى أَنَّ قَبْضَهُ مَوْقُوْفٌ فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إِنْ لَمْ يَحْبِسْهُ وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ حَبْسِهِ .

অনুবাদ: উকিলের এ অধিকার আছে যে, সে মূল্য উসুল করে নেওয়া পর্যন্ত বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখবে। কারণ তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, উকিল মুওয়াক্কিলের কাছে বিক্রয়কারীর মতো। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার এ অধিকার নেই। কেননা মুওয়াক্কিল উকিলের কবজার দ্বারা কবজাকারী হয়ে গেছে। সুতরাং যেন উকিল বিক্রয় পণ্য মুওয়াক্কিলের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে। কাজেই আটকে রাখার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আমরা [উত্তরে] বলব যে, এটা এমন একটি কথা যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। সুতরাং উকিল বিক্রয় পণ্য আটকে রাখার ব্যাপারে নিজের হক রহিত করতে সম্মত হবে না। তাছাড়া উকিলের কবজা ঝুলন্ত। সুতরাং যদি সে বিক্রয় পণ্য আটক না রাখে তাহলে তা মুওয়াক্কিলের জন্য কবজা বলে সাব্যস্ত হবে। আর আটক করার ক্ষেত্রে নিজের জন্য কবজা গ্রহণ সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূল্য উসুল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উকিল বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে চাই উকিল বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করুক অথবা না করুক। সর্বাবস্থায় মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুলের জন্য উকিল বিক্রয়পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখার অনুমতি আছে। যাখীরা গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ছয় কিতাবের কোথাও একথা বলেননি যে, উকিল মূল্য পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে যদি পণ্য বিক্রেতা উকিলের হাওয়ালা করে দেয় তো সে ক্ষেত্রে উকিলের অধিকার থাকবে সে বিক্রয় পণ্য মুওয়াক্কিলকে না দিয়ে নিজের কাছে আটকে রাখার অনুমতি আছে [এমনটি কোথাও নেই।] যাখীরা প্রণেতা বলেন, হ্যাঁ, এ কথা শামসুল আয়েম্মা হুলওয়ানী থেকে বর্ণিত আছে, আর এ বক্তব্য সঠিকও। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে, এমনটি বলা ভুল। غَايَةُ الْبَيَانِ প্রণেতা বলেন, যাখীরা প্রণেতা থেকে এমন বক্তব্য বড়ই বিস্ময়কর। কিভাবে তার কাছে ইমাম মুহাম্মদের বক্তব্য অস্পষ্ট থাকল! অথচ তিনি أَصْل তথা মাবসূত গ্রন্থের اَلْوَكَالَةُ فِي الشِّرَاءِ অধ্যায়ে একথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন– وَإِنْ كَانَ الْوَكِيْلُ نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَنْقُدْ فَهُوَ سَوَاءٌ. اِنْتَهٰى অর্থাৎ উকিল মূল্য পরিশোধ করুক অথবা না করুক উভয় সুরতেই উকিল মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুলের পূর্ব পর্যন্ত নিজের কাছে বিক্রয় পণ্য আটকে রাখতে পারবে।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, কুদূরীতে বর্ণিত উল্লিখিত মাসআলার দলিল তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। হিদায়া প্রণেতার উদ্দেশ্য কিছু পূর্বে বর্ণনা করে আসা বক্তব্য لِأَنَّهُ إِنْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ الخ সহজীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা তার সারসংক্ষেপ আবার উল্লেখ করছি। সেই দলিলে বলা হয়েছিল যে, উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধিগতভাবে বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ক্রয়ের উকিল حُكْمًا বা বিধিগতভাবে বিক্রেতা হয় আর মুওয়াক্কিল ক্রেতা হয়। আর كِتَابُ الْبُيُوْعِ তে অতিবাহিত হয়েছে যে, মূল্য উসুল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রয় পণ্য বিক্রেতা

নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে। কাজেই এখানেও উকিল [যে বিধিগতভাবে বিক্রেতা] মূল্য উসুলের পূর্ব পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উকিলের পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই। অনুরূপ বক্তব্য ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও। −[আইনী]

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, পণ্যের উপর উকিলের কবজার দ্বারা حُكْمًا তথা বিধানগতভাবে মুওয়াক্কিল কবজাকারী হয়ে গেছে আর এমন হলো যেন উকিল পণ্য মুওয়াক্কিলের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে। আর যখন উকিল পণ্য মুওয়াক্কিলের কাছে সোপর্দ করেই দিয়েছে তখন তার আটকে রাখার অধিকারও রহিত হয়ে গেছে। কেননা বিক্রয় পণ্য যদি প্রকৃতপক্ষেই মুওয়াক্কিল-এর কবজায় এসে যেত তাহলে তো উকিলের জন্য আটকে রাখার অধিকার থাকত না। কাজেই তদ্রূপ যখন বিক্রয় পণ্য বিধিগতভাবে মুওয়াক্কিলের কবজায় এসে গেছে তখনও উকিলের আটকে রাখার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ قُلْنَا هٰذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الخ : আমাদের কাছে উপরিউক্ত দলিলের দুটি জবাব রয়েছে। একটার ভিত্তি তাদের একথা মেনে নেওয়ার উপর যে, মুওয়াক্কিল উকিলের কবজার দ্বারাই কবজাকারী বলে সাব্যস্ত হয়। আর অপরটির ভিত্তি একথাকে অস্বীকার করার উপর। প্রথম উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো− আমরা মেনে নিলাম, উকিলের কবজার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কবজা হয়ে যায়, কিন্তু এ মুওয়াক্কিলের বিধিগতভাবে কবজা হয়ে যাওয়া এমন غَيْرِ اخْتِيَارِىْ তথা এখতিয়ার বহির্ভূত যা থেকে বাঁচা অসম্ভব। কেননা উকিলের সামনে এমন কোনো পন্থা খোলা নেই যে পন্থায় কবজা করলে তাতে মুওয়াক্কিলের কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যেটা এমন এখতিয়ার বহির্ভূত হয় এবং তা থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না সেটাকে শরিয়তে ছাড় দেওয়া হয়। আর তা না থাকার হুকুমে হয়। সুতরাং যখন উকিলের কবজা করার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কবজা হওয়াটা না হওয়ার হুকুমে তখন এর দ্বারা উকিলের আটকে রাখার অধিকার রহিত হবে না। কেননা উকিলের আটকে রাখার অধিকার রহিত হওয়া তার সম্মতিতেই সম্ভব। আর যেখানে তার এখতিয়ারের কোনো দখল নেই এমন বিষয় দিয়ে তার সম্মতি প্রকাশ পায় না। আর যখন এমনই হলো তখন সে তার আটকে রাখার অধিকার রহিত করতে সম্মত হবে না। আর তার সম্মতি ছাড়া আটকে রাখার অধিকার রহিত হবে না; বরং সে মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুলের পূর্ব পর্যন্ত সেই বিক্রয় পণ্য আটকে রাখতে পারবে।

قَوْلُهُ عَلٰى اَنَّ قَبْضَهُ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় উত্তর উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হলো, আমরা একথা মানিই না যে, উকিলের কবজার দ্বারা বিধিগতভাবে মুওয়াক্কিলের কবজা সাব্যস্ত হয়; বরং শুরুতে উকিলের কবজা ঝুলন্ত থাকে। সুতরাং যদি উকিল বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে না রাখে তাহলে এ কবজা মুওয়াক্কিলের জন্যই হবে। আর যদি উকিল বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখে তাহলে এ কবজা উকিলের জন্য হবে। সুতরাং যখন উকিলের কবজা শুরুতে ঝুলন্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত থাকে তখন উকিলের কবজার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কবজা সাব্যস্ত হবে না। আর যখন উকিলের কবজার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কবজা সাব্যস্ত হলো না তখন উকিলের আটকে রাখার অধিকারও রহিত হবে না।

فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَضَمَانَ الْغَصَبِ عِنْدَ زُفَرَ (رحـ) لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لَهُمَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْهُ فَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ مَضْمُوْنٌ بِالْحَبْسِ لِلْاِسْتِيْفَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ الرَّهْنُ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ وَهٰهُنَا لَا يَنْفَسِخُ أَصْلُ الْعَقْدِ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِيْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيْلِ كَمَا إِذَا رَدَّهُ الْمُوَكِّلُ بِعَيْبٍ وَرَضِيَ الْوَكِيْلُ بِهِ .

অনুবাদ: যদি আটকে রাখার পর উকিলের কাছে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বস্তুটি বন্ধকিদ্রব্যের ক্ষতিপূরণের মতো দায়বদ্ধ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণের মতো দায়বদ্ধ হবে। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও মত, আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে গসবের মতো সে দায়বদ্ধ হবে। কেননা তাঁর মতে এটা হলো না-হকভাবে আটকে রাখা। তারফাইনের দলিল হলো– মুওয়াক্কিলের কাছে উকিল হলো বিক্রেতার মতো। সুতরাং তার আটক করাটা ছিল মূল্য উসুল করার জন্য। সুতরাং বিক্রয়দ্রব্য হালাক হলে মূল্য রহিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এটা হলো [নিজের পক্ষ হতে আদায়কৃত] মূল্য উসুল করার উদ্দেশ্যে আটক করার কারণে দায়বদ্ধ; অথচ আগে তা দায়বদ্ধ ছিল না। আর এটাই হুবহু বন্ধকি দ্রব্যের গুণ। বিক্রয় দ্রব্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা [বিক্রেতার নিকট] তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্রয় রহিত হয়ে যায়। অথচ এখানে [বিক্রেতা ও উকিলের মাঝে বিদ্যমান] মূল চুক্তি রহিত হয় না। আমাদের বক্তব্য হলো, মুওয়াক্কিল ও উকিলের ক্ষেত্রে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন মুওয়াক্কিল ত্রুটির কারণে ফেরত দিল আর উকিল তাতে সম্মত হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রয়ের উকিল মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুল করার জন্য বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখে এবং সেই বিক্রয় পণ্য উকিলের কবজাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় দ্রব্য বন্ধকি বস্তুর মতো ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ যেভাবে বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে মূল্য এবং ঋণের মধ্য থেকে যেটা কম হয় তার সাথে ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হয়। উদাহরণত বন্ধকি বস্তুর মূল্য পঞ্চাশ টাকা। আর বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধক প্রদানকারীর কাছে পায় [যা সে কর্জ নিয়েছিল] ষাট টাকা। তো বন্ধকি বস্তুর মূল্যের সাথে ক্ষতিপূরণ দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার উপর পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যেহেতু বন্ধকগ্রহীতা বন্ধক প্রদানকারীর কাছে ষাট টাকা পায়, তাই তা থেকে পঞ্চাশ টাকা বন্ধকি বস্তুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাটা যাবে আর শুধু দশ টাকা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধক প্রদানকারীর কাছ থেকে নিয়ে নেবে। আর যদি হয় উল্টা অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর মূল্য হয় ষাট টাকা আর বন্ধক প্রদানকারীর ঋণ হয় পঞ্চাশ টাকা তাহলে বন্ধকি বস্তু ঋণের সাথে ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ বন্ধকি বস্তুর ক্ষতিপূরণে বন্ধক প্রদানকারীর জিম্মা থেকে বন্ধকগ্রহীতার ঋণ রহিত হয়ে যাবে। আর বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত কোনো পয়সা চাইতে পারবে না। কেননা বাকি দশ টাকা বন্ধকগ্রহীতার কাছে আমানত ছিল। আর আমানতের কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। এজন্য বন্ধকগ্রহীতার উপর দশ টাকার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

তদ্রূপ উল্লিখিত মাসআলায় উকিলের কবজায় বিক্রয় পণ্য নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় পণ্য মূল্য এবং বাজারদরের ভেতর যেটা কম হবে ক্ষতিপূরণে তার সাথে দায়বদ্ধ হবে। উদাহরণত ক্রয়ের উকিল বিক্রেতা থেকে পনেরো টাকা মূল্যের উপর লেনদেন করল। আর নষ্ট হয়ে যাওয়া বিক্রয় পণ্যের বাজার মূল্য দশ টাকা, তাহলে বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ বাজারদরের সাথে দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের জিম্মায় উকিলের জন্য মূল্য অর্থাৎ পনেরো টাকা ওয়াজিব। আর মুওয়াক্কিলের জন্য উকিলের উপর বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ দশ টাকা ওয়াজিব। তো মূল্য থেকে ক্ষতিপূরণের দশ টাকা কাটার পরে উকিল মুওয়াক্কিল থেকে পাঁচ টাকা ফিরিয়ে নেবে। আর যদি মূল্য হয় দশ টাকা আর বিক্রয় দ্রব্যের বাজারদর হয় পনেরো টাকা, তাহলে বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ মূল্যের সাথে দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ উকিলের মুওয়াক্কিলের উপর দশ টাকার পরিমাণ মূল্য ওয়াজিব। আর মুওয়াক্কিলের জন্য উকিলের উপর বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ মূল্য পরিমাণ অর্থাৎ দশ টাকা ওয়াজিব। এ কারণে না উকিল মুওয়াক্কিল থেকে কিছু ফিরিয়ে নেবে। আর না মুওয়াক্কিল উকিল থেকে কিছু ফেরত পাবে। যাহোক উকিলের কবজায় থেকে বিক্রয়দ্রব্য নষ্ট হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় পণ্য বন্ধকি বস্তুর মতো ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণের মতো দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ যেভাবে বিক্রয় দ্রব্য যদি বিক্রেতার কবজায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার জিম্মা থেকে তার মূল্য রহিত হয়ে যায়, বিক্রয় দ্রব্যের বাজারদর চাই মূল্য থেকে কম হোক চাই বেশি হোক ঠিক সেভাবেই যখন উকিলের কবজায় থেকে বিক্রয় দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেল তখন মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হয়ে যাবে। চাই বিক্রয় দ্রব্যের বাজারদর মূল্য থেকে কম হোক চাই বেশি হোক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতও এটাই।

قَوْلُهُ وَضَمَانَ الْغَصَبِ عِنْدَ زُفَرَ (رحـ) الخ : আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উকিলের কবজায় থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া বিক্রয় দ্রব্য ক্ষতিপূরণে গসবের মতো দায়বদ্ধ হবে। অর্থাৎ বিক্রয় দ্রব্য যদি এমন বস্তুসমূহের মধ্য থেকে হয় যার অনুরূপ আরো বস্তু বিদ্যমান অর্থাৎ ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ-এর মধ্য থেকে হয় তাহলে উকিলের উপর ঐ পণ্যের অনুরূপ ওয়াজিব হবে, আর মুওয়াক্কিলের উপর মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি ذَوَاتُ الْقِيَمِ-এর মধ্য থেকে হয় অর্থাৎ এমন বস্তু যার সদৃশ বা অনুরূপ অন্য কোনো বস্তু নেই তাহলে তার অনুরূপ আরেকটি দেওয়া যেহেতু সম্ভব নয় তাই উকিল বিক্রয় পণ্যের মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। কাজেই যদি বিক্রয় পণ্যের বাজার মূল্য বেশি হয় আর তার ক্রয়মূল্য কম হয় যেমন বাজারদর পনেরো টাকা আর ক্রয় মূল্য দশ টাকা হয় তাহলে মুওয়াক্কিল ক্রয় মূল্য থেকে বেশি পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচ টাকা উকিল থেকে ফিরিয়ে নেবে। আর যদি ক্রয় মূল্য বেশি হয়, আর বাজার দর কম হয়, উদাহরণত ক্রয় মূল্য পনেরো টাকা হয় আর বাজারদর হয় দশ টাকা তাহলে বাজারদর থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচ টাকা উকিল মুওয়াক্কিল থেকে ফিরিয়ে নেবে। সদরুশশরীয়া (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থে এই বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে এই বিস্তারিত বিবরণই উপযোগী। কিন্তু ইনায়া প্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, যদি ক্রয়মূল্য বাজারদর থেকে বেশি হয় তাহলে উকিলের মুওয়াক্কিল থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। আর যদি বাজারদর ক্রয়মূল্য থেকে বেশি হয় তাহলে মুওয়াক্কিল অতিরিক্ত পরিমাণ টাকার অংকে উকিল থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। নাতায়িজুল আফকার প্রণেতার ভাষ্য অনুসারে অধিকাংশ শরাহ থেকে এটাই বুঝে আসে। কিন্তু নাতায়িজুল আফকার প্রণেতার মতে ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্যের উপর ঐ বিশদ বিবরণই প্রযোজ্য হয় যেটা সদরুশশরীয়া (র.) উল্লেখ করেছেন। কেননা যেমন বাজারদর অতিরিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত করা হয়েছে তদ্রূপ বিপরীত ক্ষেত্রে উকিলেরও মুওয়াক্কিল থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার না থাকাই উচিত। যাহোক ইমাম যুফার (র.) -এর মতে উকিলের কবজায় থেকে নষ্ট হওয়া বিক্রয় পণ্য গসবের মতো ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হবে। এ মতই পোষণ করেন ইমামত্রয় তথা ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, উকিলের নিজের কাছে বিক্রয় পণ্য আটকে রাখা অন্যায়ভাবে আটকে রাখা। কেননা উপরের মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে যে, ইমাম যুফারের মতে বিক্রয় পণ্যের উপর উকিলের কবজা করার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কবজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর উকিলের বিক্রয় পণ্য আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং যখন উকিলের বিক্রয় পণ্য আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই, তখন এ সত্ত্বেও উকিলের নিজের কাছে বিক্রয় পণ্য আটকে রাখা অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হবে আর কোনো কিছুকে অন্যায়ভাবে নিয়ে আটকে রাখার নামই তো গসব। কাজেই উকিল বিক্রয় পণ্য আটকে রেখে গসবকারী সাব্যস্ত হলো। আর বিক্রয় দ্রব্য গসবকৃত বস্তু সাব্যস্ত হলো। সুতরাং যখন এ গসবকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেল তখন উকিলের [গসবকারীর] উপর গসবের মতো ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ গসবকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে যেরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় তদ্রূপ এ বিক্রয় পণ্যের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যার বিস্তারিত বিবরণ ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে।

তরফাইনের দলিল হলো, উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে যেহেতু বিধিগতভাবে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয় তাই মুওয়াক্কিলের কাছে উকিল হলো বিক্রেতার মতো আর মুওয়াক্কিল হলো ক্রেতার মতো। বিক্রেতার নিজের মূল্য উসুল করার জন্য পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকে। কাজেই উকিলের বিক্রয় পণ্য আটকে রাখাও মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুলের জন্য হবে। আর বিক্রয় পণ্য যদি বিক্রেতার কাছে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হয়ে যায়। ক্রয়মূল্য চাই বাজারদর থেকে বেশি হোক অথবা কম হোক। সুতরাং তদ্রূপ যখন বিক্রয় পণ্য উকিলের কাছে থেকে নষ্ট হয়ে যায় তখন মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হয়ে যাবে। ক্রয়মূল্য বাজারদরের চেয়ে বেশি হোক অথবা কম হোক। যাহোক এ দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তরফাইনের মতে উকিলের কাছ থেকে পণ্য বিক্রয়ের মতো ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হবে।

নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা এবং ইনায়া প্রণেতা তরফাইনের উল্লিখিত দলিলের উপর একটি আপত্তি উল্লেখ করেছেন এবং তার জওয়াবও উল্লেখ করেছেন।

আপত্তিটি হলো, যদি প্রকৃতপক্ষেই উকিল বিক্রেতার মতো হয়ে থাকে, তাহলে তো বিক্রয় পণ্য নষ্ট হওয়ার সুরতে সর্বাবস্থায় তার উপর জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল, চাই উকিল বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখে; চাই আটকে না রাখে। কেননা বিক্রয় পণ্য যদি বিক্রেতার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা বিক্রেতার উপর ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হয়। অর্থাৎ বিক্রেতার সম্পদ থেকে নষ্ট হয়েছে বলে ধরা হয় যদিও বিক্রেতা তা আটকে না রাখে। এ কারণেই তো ক্রেতার জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হয়ে যায়। সুতরাং যখন উকিল বিক্রেতার মতো হলো তখন তার কাছ থেকে পণ্য নষ্ট হওয়ার সুরতেও বিক্রয় পণ্য তার উপর ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ বিক্রয় পণ্য উকিলের সম্পদ থেকে নষ্ট বলে ধরা উচিত ছিল চাই উকিল তা আটকে রাখুক চাই আটকে না রাখুক। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে যে, যদি উকিল বিক্রয় পণ্য আটকে না রাখে আর তা তার কাছেই নষ্ট হয় তাহলে বলা হয়েছে যে, এটা মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে নষ্ট হবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হবে না।

এ আপত্তির উত্তর হলো, উকিল যখন নিজের কাছে বিক্রয় পণ্য আটকে রাখল তখন এ কথা ঠিক হয়ে গেল যে, উকিল পণ্যের উপর নিজের জন্য কবজা করেছিল। আর যখন পণ্যের উপর নিজের জন্য কবজা করেছিল তখন তার বিক্রেতা হওয়া নিশ্চিত বিষয় হয়ে গেল। আর যখন উকিলের বিক্রেতা হওয়া নিশ্চিত হলো তখন বিক্রয় পণ্য নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উকিলের উপর সুনিশ্চিতভাবেই ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হয়ে যাবে। আর যখন উকিল নিজের কাছে বিক্রয় পণ্য আটকে না রাখে তখন উকিলের কবজা করা মুওয়াক্কিলের জন্য হবে। আর উকিল বার্তাবাহকের মতো হবে। আর তার কাছে থেকে বিক্রয় পণ্য নষ্ট হওয়া আমানত নষ্ট হওয়া বলে গণ্য হবে। আর আমানত নষ্ট হওয়ার দ্বারা আমীনের

উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়না। কাজেই ঐ বিক্রয় পণ্যের ক্ষতিপূরণ উকিলের উপর ওয়াজিব হবে না; বরং মুওয়াক্কিলের উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে নষ্ট হবে। আর মুওয়াক্কিলের জিম্মা থেকে মূল্য রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَبِي يُوسُفَ (رحـ) أَنَّهُ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উকিলের কবজায় থেকে নষ্ট হওয়া পণ্য মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য উসুল করার জন্য আটকে রাখার কারণে ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হয়েছে। কেননা আটকে রাখার পূর্বে বিক্রয় পণ্য ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ ছিল না যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি আটকে রাখার পূর্বে বিক্রয় পণ্য উকিলের কবজায় থাকা অবস্থায় যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে নষ্ট বলে গণ্য হয়। আর উকিলের উপর তার ক্ষতিপূরণ আসে না। যাহোক মূল্য উসুল করার উদ্দেশ্যে উকিলের পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখার কারণে বিক্রয় পণ্য ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হয়। আর এটাই বন্ধকিকরণের অর্থ। অর্থাৎ যেভাবে ঋণ উসুলের জন্য বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তু নিজের কাছে আটকে রাখে সেভাবেই মূল্য উসুলের জন্য উকিল বিক্রয় পণ্য নিজের কাছে আটকে রাখে ।

সারকথা হলো, নষ্ট হওয়া বিক্রয় পণ্য বন্ধকি বস্তুর মতো। আর যখন উকিলের কাছ থেকে নষ্ট হওয়া বিক্রয় দ্রব্য বন্ধকি বস্তুর মতো হলো তখন এ বিক্রয় পণ্য বন্ধকি দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের মতো দায়বদ্ধ হবে। আর বন্ধকি দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের বিস্তারিত বিবরণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব বর্ণনায় আ্যালোচিত হয়েছে।

হিদায়া প্রণেতা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে তরফাইনের মাযহাব রদ করে বলেন, উকিলের কাছে থেকে নষ্ট হওয়া বিক্রয় পণ্য বিক্রয় চুক্তির বিক্রয় পণ্যের মতো নয়। কেননা বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্রয় রহিত হয়ে যায় আর এখানে ক্রয়ের উকিল থেকে বিক্রয় দ্রব্য নষ্ট হওয়ার ফলে বিক্রেতা ও উকিলের মাঝে বিদ্যমান মূল চুক্তি রহিত হয় না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা বিক্রয় দ্রব্য নিজের কাছে না আটকায় বরং আটকানোর পূর্বেই বিক্রয় দ্রব্য বিক্রেতার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে শুধু চুক্তির কারণে ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হয়। অর্থাৎ বিক্রেতার সম্পদ থেকেই নষ্ট হয়। আর যদি ক্রয়ের উকিল আটকানোর পূর্বে বিক্রয় দ্রব্য তার কাছে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হয় না। অর্থাৎ উকিলের উপর তার কোনো ক্ষতিপূরণ আসে না। যাহোক যখন ক্রয়ের উকিলের কাছে থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া বিক্রয় দ্রব্য বিক্রয় চুক্তির বিক্রয় দ্রব্যের মতো হলো না তখন উকিলের কাছ থেকে নষ্ট হওয়া বিক্রয় দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণের মতো কিভাবে দায়বদ্ধ হতে পারে?

قَوْلُهُ قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِيْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ الخ : হেদায়া প্রণেতা তরফাইনের পক্ষ থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনাকৃত পার্থক্যের ব্যাপারে প্রথম দলিলের জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, উকিলের কাছে থেকে বিক্রয় দ্রব্য নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে যদিও উকিল এবং তার বিক্রেতার মাঝে চুক্তি বাতিল হয় না তথাপি উকিল এবং তার মুওয়াক্কিলের মাঝে বাতিল হয়ে যায়। যেমন যদি মুওয়াক্কিল বিক্রয় দ্রব্যের উপর কবজা করার পর বিক্রয় দ্রব্যের কোনো ক্রটির উপর অবগত হয় আর ক্রটির কারণে বিক্রয় দ্রব্য উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেয় আর উকিল ঐ ক্রটির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ বিক্রয় চুক্তি উকিলের উপর আবশ্যক হয়ে যাবে। আর উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যদিও উকিল এবং তার বিক্রেতার মধ্যকার বাতিল হয়নি। যাহোক যখন বিক্রয় চুক্তির সুরতেও বিক্রেতার কাছে বিক্রয় দ্রব্য নষ্ট হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় আর ক্রয়ের উকিলের কাছ থেকে নষ্ট হওয়ার সুরতেও উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় তখন দুটির মাঝে সাদৃশ্য পাওয়া গেল। আর যখন সাদৃশ্য পাওয়া গেল তখন উকিলের কাছে নষ্ট হওয়া বিক্রয় দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণের মতো দায়বদ্ধ হবে। যেমনটি তরফাইনের অভিমত।

قَالَ : وَاِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ اَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرٰى عِشْرِيْنَ رِطْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِنْهُ عَشَرَةُ اَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُوْنَ بِدِرْهَمٍ وَذُكِرَ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) مَعَ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) لَمْ يُذْكَرِ الْخِلَافُ فِى الْاَصْلِ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ اَمَرَهُ بِصَرْفِ الدِّرْهَمِ فِى اللَّحْمِ وَظَنَّ اَنَّ سِعْرَهُ عَشَرَةُ اَرْطَالٍ فَاِذَا اشْتَرٰى بِهٖ عِشْرِيْنَ فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَصَارَ كَمَا اِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهٖ بِاَلْفٍ فَبَاعَهُ بِاَلْفَيْنِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ اَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةٍ وَلَمْ يَامُرْهُ بِشِرَاءِ الزِّيَادَةِ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهَا عَلَيْهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهٖ لِاَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَاكَ بَدَلُ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ فَتَكُوْنُ لَهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا اشْتَرٰى مَا يُسَاوِىْ عِشْرِيْنَ رَطْلًا بِدِرْهَمٍ حَيْثُ يَصِيْرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهٖ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْاَمْرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِيْنَ وَهٰذَا مَهْزُوْلٌ فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُوْدُ الْاٰمِرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি তাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দশ রতল গোশত ক্রয় করতে উকিল নিযুক্ত করে আর সে এক দিরহাম দ্বারা বিশ রতল এমন গোশত ক্রয় করল যার দশ রতল এক দিরহামেই বিক্রি করা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুওয়াক্কিলের জন্য অর্ধ দিরহামে তা থেকে দশ রতল গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, এক দিরহামের বিনিময়ে বিশ রতল নেওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। ইমাম কুদূরী (র.) রচিত 'মুখতাসার'-এর কোনো কোনো অনুলিপিতে ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতপার্থক্য উল্লেখ করেননি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, সে প্রদত্ত দিরহাম গোশত বাবদ ব্যয় করার আদেশ করেছে আর তার ধারণা ছিল তার মূল্যমান দশ রতল গোশতের সমান। এমতাবস্থায় উকিল যদি এক দিরহাম দ্বারা বিশ রতল ক্রয় করে থাকে তাহলে সে তাকে অধিক কল্যাণ দান করেছে। আর বিষয়টা এমন হলো যেন সে তাকে এক হাজার দেরহামে তার গোলাম বিক্রি করে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করল আর সে দুই হাজারে তা বিক্রি করলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সে তো তাকে দশ রতল [অর্থাৎ নির্ধারিত একটা পরিমাণ] ক্রয় করার আদেশ করেছে, অতিরিক্ত অংশটুকু ক্রয় করার আদেশ করেনি। সুতরাং অতিরিক্ত অংশের ক্রয় তার নিজের জন্য হবে, আর দশ রতল ক্রয় মুওয়াক্কিলের পক্ষে কার্যকর হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ যে উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সেটা ভিন্ন। কেননা অতিরিক্ত অংশ সেখানে মুওয়াক্কিলের মালিকানার বিনিময়; সুতরাং তা তারই হবে। পক্ষান্তরে যদি এমন গোশত ক্রয় করে, যার বিশ রতল এক দিরহামে বিক্রি হয়, তাহলে সবার মতেই সে নিজের জন্য ক্রয়কারী বলে গণ্য হবে। কেননা মুওয়াক্কিলের আদেশ মোটাতাজা পশুর গোশতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অথচ এটা দুর্বল ক্ষীণ পশুর গোশত। সুতরাং আদেশদাতার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ اَرْطَالِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে এক টাকার বিনিময়ে দশ রতল গোশত ক্রয় করার উকিল বানায়; কিন্তু সে এক টাকার বিনিময়ে বিশ রতল গোশত ক্রয় করে আনে তাহলে এর দুই সুরত। হয়তো সেই গোশত এমন মোটাতাজা হবে যা এক টাকায় দশ রতলই বিক্রি হয়; কিন্তু উকিল নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এক টাকায় বিশ রতল ক্রয় করে এনেছে অথবা সেই গোশত এমন নিম্ন পর্যায়ের যা এক টাকায় বিশ

রতল বিক্রি হয়। সুতরাং যদি দ্বিতীয় সুরত হয় তাহলে পুরো গোশতের ক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরও হবে; কিন্তু মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না। কেননা এ সুরতে উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করেছে এভাবে যে, মুওয়াক্কিল মোটাতাজা গোশত খরিদ করার আদেশ দিয়েছিল আর সে পাতলা নিম্নমানের গোশত ক্রয় করেছে। আর একথা স্বীকৃত যে, উকিল যদি মুওয়াক্কিলের আদেশের বিপরীত কাজ করে তাহলে সেই লেনদেন উকিলের উপর কার্যকর হয়, মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হয় না। কাজেই উল্লিখিত সুরতেও পুরো গোশতের ক্রয় উকিলের উপর কার্যকর হবে মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না।

আর যদি প্রথম সুরত অর্থাৎ যে গোশত এক টাকায় দশ রতল বিক্রি হয় উকিল সেটা এক টাকায় বিশ রতল ক্রয় করে আনে তাহলে এতে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আট আনার বিনিময়ে দশ রতলের লেনদেন তো মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে এবং কার্যকর হবে আর অবশিষ্ট দশ রতলের লেনদেন উকিলের উপর কার্যকর হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, পুরো বিশ রতলের মুয়ামালা এ টাকার বিনিময়ে মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক এবং কার্যকর হবে। এই হলো কুদূরীর ভাষ্যের সারমর্ম। কিন্তু হিদায়া প্রণেতা বলেন, কুদূরীর কোনো কোনো অনুলিপিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে উল্লিখিত হয়েছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে নয়। আর স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবের كِتَابُ الْوَكَالَةِ-এ কোনো মতপার্থক্য উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইমাম কুদূরী (র.)-এর অনুলিপিসমূহের বিবেচনায় যখন ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর বক্তব্য দ্বিধাগ্রস্ত তখন মূল মতবিরোধ ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মধ্যে বাকি থাকল।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে গোশত ক্রয় করতে এক টাকা খরচ করার আদেশ দিয়েছে অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উকিল এক টাকার গোশত ক্রয় করে এনে দেবে। আর খেয়াল এই ছিল যে, এক টাকায় দশ রতল গোশত পাওয়া যাবে, আর এজন্য সে এক টাকার দশ রতল গোশত ক্রয় করার উকিল করেছে। কিন্তু উকিল এক টাকার বিশ রতল গোশত ক্রয় করে তা দ্বারা মুওয়াক্কিলের উপকার করেছে। অর্থাৎ এমনটি করে উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করেনি; বরং মুওয়াক্কিলের আদেশ অনুযায়ী আমল করেছে, অতিরিক্ত তার উপকার করেছে। কাজেই উকিলের পুরো মুয়ামালা মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক এবং কার্যকর হবে।

আর এটা এমন হলো যেমন এক ব্যক্তি নিজের গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করল; কিন্তু উকিল সেটাকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল, তো এ বিক্রয় করা সর্বসম্মতিক্রমে মুওয়াক্কিলের জন্য কার্যকর হবে। কেননা এখানেও মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য এক হাজার টাকা হাসিল করা নয়; বরং গোলাম বিক্রি করা উদ্দেশ্য। তবে মুওয়াক্কিলের খেয়াল ছিল, এ যে এই গোলাম এক হাজার টাকার মূল্য মানের। অথচ মুওয়াক্কিলের এ ধারণা বাস্তবসম্মত ছিল না। সুতরাং যেভাবে এখানে এ বিক্রয় চুক্তি দুই হাজার টাকার বিনিময়ে মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে, সেভাবেই কিতাবের উল্লিখিত মাসআলায় বিশ রতল গোশত ১ টাকার বিনিময়ে মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ أَمَرَهُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে দশ রতল গোশত ক্রয় করার আদেশ দিয়েছে। এর চেয়ে অতিরিক্ত ক্রয় করার আদেশ দেয়নি। আর মুওয়াক্কিলের ধারণা ছিল, দশ রতল গোশত এক টাকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার ধারণার বিপরীতে দশ রতল গোশত আট আনাতেই মিলে গেল, আর উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করে দশ রতলের স্থলে বিশ রতল গোশত ক্রয় করে ফেলল। সুতরাং দশ রতল গোশতের লেনদেন যেহেতু মুওয়াক্কিলের আদেশ অনুযায়ী হয়েছে তাই তা মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। আর দশ রতলের চেয়ে অতিরিক্ত মুয়ামালা যেহেতু মুওয়াক্কিলের আদেশের পরিপন্থি হয়েছে তাই তার কার্যকারিতা উকিলের উপর হবে; মুওয়াক্কিলের উপর হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর উদাহরণের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারমর্ম হলো, যখন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে নিজের গোলাম বিক্রয়ের উকিল করে; কিন্তু উকিলের সেটাকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তখন অতিরিক্ত এক হাজার টাকা এ কারণে মুওয়াক্কিলের জন্য হবে যে, এ এক হাজার টাকাও মুওয়াক্কিলের মালিকানা অর্থাৎ গোলামের বিনিময়। সুতরাং যখন এ এক হাজার টাকা মুওয়াক্কিলের মালিকানার বিনিময় হলো তখন এটাও মুওয়াক্কিলের জন্য মালিকানা হবে। উকিল ঐ অতিরিক্ত এক হাজার হকদার হবে না।

হেদায়া প্রণেতা বলেন যে, যদি উকিল এক টাকার বিনিময়ে বিশ রতল এমন গোশত ক্রয় করে যা সাধারণত ঐ মূল্যেই বিক্রি হয় তাহলে এ সুরতে উকিল সর্বসম্মতিক্রমে এ গোশত নিজের ক্রয়কারী সাব্যস্ত হবে। কেননা এ সুরতে উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করেছে। এভাবে যে, মুওয়াক্কিলের আদেশে এমন মোটাতাজা গোশত অন্তর্ভুক্ত ছিল যা এক টাকায় দশ রতল বিক্রি হয়; কিন্তু সে এমন নিম্নমানের গোশত ক্রয় করেছে যা এক টাকায় বিশ রতল বিক্রি হয়। তো এ সুরতে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। আর যখন মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য হাসিল হলো না তখন এই মুয়ামালা মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না; বরং উকিলের উপর হবে।

قَالَ : وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ لِاَنَّهُ يُؤَدِّيْ اِلٰى تَغْرِيْرِ الْاٰمِرِ حَيْثُ اِعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَلِاَنَّ فِيْهِ عَزْلَ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ عَلٰى مَا قِيْلَ اِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْمُوَكِّلِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمًّى فَاشْتَرٰى بِخِلَافِ جِنْسِهِ اَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى فَاشْتَرٰى بِغَيْرِ النُّقُوْدِ اَوْ وَكَّلَ وَكِيْلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَّانِيْ وَهُوَ غَائِبٌ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَكِيْلِ الْاَوَّلِ فِيْ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ لِاَنَّهُ خَالَفَ اَمْرَ الْاٰمِرِ فَنَفَذَ عَلَيْهِ وَلَوْ اِشْتَرَى الثَّانِيْ بِحَضْرَةِ الْوَكِيْلِ الْاَوَّلِ نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ حَضَرَهُ رَأْيُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুওয়াক্কিল যদি কাউকে নির্ধারিত কোনো বস্তু ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে সেটা নিজের জন্য ক্রয় করার অধিকার উকিলের নেই। কেননা এটা মুওয়াক্কিলকে ধোঁকাদানে পর্যবশিত হবে। কেননা সে তার উপর ভরসা করেছিল। তাছাড়া এতে নিজেকে উকিলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অথচ কারো কারো মতে মুওয়াক্কিলের উপস্থিতি ছাড়া সে তা করার অধিকার রাখে না। আর যদি মূল্য উল্লেখকৃত হয়ে থাকে, কিন্তু সে অন্য শ্রেণির মূল্য দ্বারা [যেমন– দিরহামের কথা ছিল, কিন্তু সে দিনার দ্বারা] ক্রয় করল, কিংবা উকিল অন্য একজনকে উক্ত বস্তু ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল আর দ্বিতীয়জন প্রথমজনের অনুপস্থিতিতে ক্রয় করল তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে প্রথম উকিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কেননা সে আদেশদাতার আদেশ লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং ক্রয় তার নিজের উপর কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন যদি প্রথম উকিলের উপস্থিতিতে ক্রয় করে তাহলে প্রথম মুওয়াক্কিলের অনুকূলে ক্রয় কার্যকর হবে। কেননা এ ক্রয় প্রথম উকিলের মতামত সংযুক্ত ছিল। সুতরাং সে আদেশ লঙ্ঘনকারী হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে উকিলের জন্য ঐ নির্দিষ্ট বস্তু নিজের জন্য ক্রয় করা বৈধ নয়। এমনকি যদি উকিল ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয়ও করে ফেলে তারপর এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের জন্যই হবে, উকিলের জন্য হবে না। চাই উকিল ক্রয় চুক্তির সময় নিজের জন্য ক্রয় করার নিয়ত করুক অথবা নিজের জন্য ক্রয় করার কথা স্পষ্ট করে বলুক। যেমন সে একথা বলল যে, লোক সকল! তোমরা সাক্ষ্য থেক যে, আমি এ বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করছি।

কিন্তু বিধান তখন হবে যখন মুওয়াক্কিল ক্রয় চুক্তির সময় অনুপস্থিত থাকে। আর যদি মুওয়াক্কিল ক্রয় চুক্তির সময় উপস্থিত থাকে আর উকিল নিজের জন্য ক্রয় করার কথা স্পষ্ট করে বলে তাহলে এ সুরতে ক্রয় উকিলের জন্য হবে।

মূল মাসআলার দলিল হলো, নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের ব্যাপারে মুওয়াক্কিল উকিলের উপর ভরসা করেছে। কিন্তু উকিল ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করে মুওয়াক্কিলকে ধোঁকা দিয়েছে। আর মুওয়াক্কিল একজন মুসলমান। আর মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া জায়েজ নেই। কাজেই উকিলের এ নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করা অবৈধ হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যখন উকিল ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করল। অথচ উকালতের বিধান অনুযায়ী মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করার ব্যাপারে সে আদিষ্ট ছিল, তো যেন সে নিজেই নিজেকে উকালত থেকে অব্যাহতি দিতে চায়। অথচ মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিদের উকিল নিজে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। যেমন মুওয়াক্কিল উকিলের অনুস্থিতিতে তাকে বরখাস্ত করতে পারে না। কেননা বরখাস্ত করা অথবা বরখাস্ত হওয়া চুক্তি বাতিলের নামান্তর। আর চুক্তি বাতিল করা অপর সাথির অজান্তে সঠিক হয় না। কাজেই উকিলের মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে নিজেকে নিজে অব্যাহতি দেওয়া শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ, যদি মুওয়াক্কিল উপস্থিত থাকে আর উকিল ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করার কথা স্পষ্ট করে বলে তাহলে এ সুরতে উকিলের নিজেকে নিজে বরখাস্ত করা যেহেতু মুওয়াক্কিলের উপস্থিতিতে হয়েছে তাই এটা শুদ্ধ হবে। আর এ নির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয় উকিলের জন্য হবে, মুওয়াক্কিলের জন্য নয়।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, যদি মুওয়াক্কিল কাউকে নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে এরপর সে মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে সেটাকে নিজের জন্য ক্রয় করে নেয় তাহলে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এ ক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্য হবে এবং মুওয়াক্কিলই ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটির স্বত্বাধিকারী হবে, উকিল মালিক হবে না। কিন্তু তিনটি সুরত এ থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ তিনটি সুরত এমন আছে যেসব সুরতে ক্রয় উকিলের জন্যই হয় এবং উকিল সেখানে মালিক হয়। যথা–

১. যদি মুওয়াক্কিল নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করতে উকিল নিযুক্ত করে কিন্তু উকিল নির্ধারিত মূল্যের শ্রেণির বিপরীত শ্রেণির বিনিময় ক্রয় করে। যেমন– মুওয়াক্কিল বাংলাদেশী টাকার কথা উল্লেখ করেছে আর উকিল আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করল, তো এ সুরতে ক্রয় উকিলের জন্য হবে। কেননা এ সুরতে উকিল মুওয়াক্কিলের হুকুমের বিরোধিতা করেছে যেমনটি স্পষ্ট। আর মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতার দ্বারা চুক্তি উকিলের উপর কার্যকর হয়, মুওয়াক্কিলের উপর হয় না, কাজেই এ ক্রয় চুক্তি উকিলের উপর কার্যকর হবে। আর উকিলই ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটির মালিক হবে।

২. দ্বিতীয় সুরত হলো, মুওয়াক্কিল মূল্য বর্ণনা করে দেয়নি বরং উকিলকে বলে দিয়েছে যে, অমুক বস্তু ক্রয় করে আনো। কিন্তু উকিল মুদ্রা অর্থাৎ টাকা, রুপি, ডলার ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো ওজনী বা কায়লী জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করল তো এ সুরতেও এ ক্রয় করা উকিলের জন্য হবে না। কেননা এ সুরতেও উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করেছে। তা এভাবে যে, মুওয়াক্কিলের মূল্য বর্ণনা না করার কারণে প্রচলিত মূল্যের দিকেই ফিরবে। আর প্রচলিত মূল্য বা বিনিময় মাধ্যম দেশীয় মুদ্রা, কাজেই মুওয়াক্কিলের আদেশ এ মুদ্রার দিকেই ফিরবে। আর এটা এমন হবে যেন মুওয়াক্কিল বলল যে, অমুক নির্দিষ্ট বস্তু দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে এসো। কিন্তু উকিল মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করল তো উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশ অমান্যকারী হলো। আর আদেশ অমান্য করার সুরতে ক্রয় চুক্তি উকিলের জন্য হয় আর ক্রয়কৃত বস্তুর মালিক উকিলই হয়– মুওয়াক্কিল নয়। এ কারণেই উল্লিখিত সুরতেও ক্রয়কৃত বস্তু উকিলের জন্য হবে।

৩. তৃতীয় সুরত হলো– মুওয়াক্কিল এক ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। এরপর ঐ উকিল অন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করল। এরপর দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের অনুপস্থিতিতে ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি ক্রয় করে ফেলল তো এ সুরতেও এ ক্রয়কৃত বস্তু প্রথম উকিলের হবে আর সেই এর মালিক হবে। কেননা এ সুরতেও প্রথম উকিল নিজের মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করেছে। এভাবে যে, যখন মুওয়াক্কিল তাকে উকিল বানিয়েছিল তখন যেন এ আদেশ দিয়েছিল যে, ঐ নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার সময় তোমার মতামত থাকা আবশ্যক। অথচ এ সুরতে প্রথম উকিলের অনুপস্থিতির কারণে প্রথম উকিলের মত পাওয়া যায়নি। আর যখন প্রথম উকিলের মত পাওয়া গেল না তখন প্রথম উকিলের পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের হুকুমের বিরোধিতা পাওয়া গেল। আর উকিলের নিজের মুওয়াক্কিলের হুকুমের বিরোধিতা করার দ্বারা যেহেতু চুক্তি উকিলের উপর কার্যকর হয়, মুওয়াক্কিলের উপর হয় না, এ কারণে এ সুরতে ক্রয় করা হবে প্রথম উকিলের জন্য, তার মুওয়াক্কিলের জন্য হবে না। আর যদি দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের উপস্থিতিতে ক্রয় করে তাহলে এ ক্রয় চুক্তি প্রথম মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। কেননা এ সুরতে ক্রয়ের সময় প্রথম উকিলের মতামত পাওয়া গেছে। আর যখন প্রথম উকিলের মতামত পাওয়া গেল তখন প্রথম উকিল তার মুওয়াক্কিলের বিরোধিতাকারী হলো না। আর যখন প্রথম উকিল নিজের মুওয়াক্কিলের বিরোধিতারকারী হলো না তখন এ ক্রয় করা তার মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে, প্রথম উকিলের উপর নয়।

قَالَ : وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرٰى عَبْدًا فَهُوَ لِلْوَكِيْلِ إِلَّا أَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يَشْتَرِيْهِ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى وُجُوْهٍ إِنْ اَضَافَ الْعَقْدَ إِلٰى دَرَاهِمِ الْاٰمِرِ كَانَ لِلْاٰمِرِ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدِيْ بِقَوْلِهٖ أَوْ يَشْتَرِيْهِ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ دُوْنَ النَّقْدِ مِنْ مَالِهٖ لِأَنَّ فِيْهِ تَفْصِيْلًا وَخِلَافًا وَهٰذَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَإِنْ اَضَافَهُ إِلٰى دَرَاهِمِ نَفْسِهٖ كَانَ لِنَفْسِهٖ حَمْلًا لِحَالِهٖ عَلٰى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا أَوْ يَفْعَلُهُ عَادَةً إِذِ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهٖ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلٰى دَرَاهِمِ غَيْرِهٖ مُسْتَنْكَرٌ شَرْعًا وَعُرْفًا وَإِنْ اَضَافَهُ إِلٰى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةٍ فَإِنْ نَوَاهَا لِلْاٰمِرِ فَهُوَ لِلْاٰمِرِ وَإِنْ نَوَاهَا لِنَفْسِهٖ فَلِنَفْسِهٖ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِنَفْسِهٖ وَيَعْمَلَ لِلْاٰمِرِ فِيْ هٰذَا التَّوْكِيْلِ وَإِنْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ يُحَكَّمُ النَّقْدُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ تَوَافَقَا عَلٰى أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) هُوَ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لِنَفْسِهٖ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ جَعْلُهُ لِغَيْرِهٖ وَلَمْ يَثْبُتْ وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) يُحَكَّمُ النَّقْدُ فِيْهِ لِأَنَّ مَا أَوْقَعَهُ مُطْلَقًا يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَيَبْقٰى مَوْقُوْفًا فَمِنْ أَيِّ الْمَالَيْنِ نَقَدَ فَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ الْمُحْتَمَلَ لِصَاحِبِهٖ وَلِأَنَّ مَعَ تَصَادُقِهِمَا يَحْتَمِلُ النِّيَّةُ لِلْاٰمِرِ وَ فِيْمَا قُلْنَاهُ حَمْلُ حَالِهٖ عَلَى الصَّلَاحِ كَمَا فِيْ حَالَةِ التَّكَاذُبِ وَالتَّوْكِيْلِ بِالْإِسْلَامِ فِي الطَّعَامِ عَلٰى هٰذِهِ الْوُجُوْهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি অনির্ধারিত কোনো গোলাম ক্রয় করার জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করে আর সে কোনো একটা গোলাম ক্রয় করে, তাহলে সেটা উকিলের হবে। তবে যদি বলে যে, মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করার নিয়ত করেছিলাম, কিংবা যদি মুওয়াক্কিলের মাল দ্বারা ক্রয় করে [তাহলে মুওয়াক্কিলের জন্য হবে]। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মাসআলাটির কয়েকটি সুরত রয়েছে। উকিল যদি আদেশদাতা মুওয়াক্কিলের দিরহামের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করে, তাহলে তা মুওয়াক্কিলেরই হবে। আমার মতে ইমাম কুদূরীর বক্তব্য 'কিংবা মুওয়াক্কিলের মাল দ্বারা ক্রয় করে' এর এটাই হলো উদ্দেশ্য। এ মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা পরিশোধের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ ও মতভিন্নতা রয়েছে। অথচ মুতাওয়াক্কিলের মালের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করার সুরতটি সর্বসম্মত, আর কিতাবে তা অনির্ধারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি নিজের দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে ক্রয় তার নিজের জন্য হবে। এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে উকিলের অবস্থাকে ঐ সুরতের উপর প্রয়োগ করার জন্য যা শরিয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য হালাল। কিংবা সাধারণত সে যা করে তার উপর প্রয়োগ করার জন্য। কেননা অন্যের দিরহামের সাথে চুক্তিকে সম্পৃক্ত করে নিজের জন্য ক্রয় করা শরিয়ত ও লোকপ্রচলন উভয় বিচারেই ঘৃণ্য। আর যদি

সাধারণ দিরহামের দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে মুওয়াক্কিলের জন্য নিয়ত করলে মুওয়াক্কিলের হবে, আর নিজের জন্য নিয়ত করলে নিজের হবে। কেননা এই [অনির্ধারিত বিষয়ে] উকিল নিযুক্তির ক্ষেত্রে সে নিজের জন্য কাজ করতে পারে এবং মুওয়াক্কিলের জন্যও কাজ করতে পারে। আর যদি নিয়তের ব্যাপারে পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে মূল্য পরিশোধকে বিচারক নিযুক্ত করা হবে। কেননা মূল্য পরিশোধ স্পষ্টভাবে আমাদের উল্লেখকৃত বক্তব্য প্রমাণ করে। আর যদি উভয়ে একমত পোষণ করে যে, [ক্রয় করার সময়] তার মনে নিয়ত উপস্থিত ছিল না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সেটা চুক্তি সম্পাদনকারীর জন্য হবে। কেননা মূল অবস্থা এই যে, প্রত্যেকে নিজের জন্য কাজ করে থাকে, তবে যদি অন্যের জন্য নির্ধারণ করা সাব্যস্ত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে তা প্রমাণিত হয়নি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এক্ষেত্রে পরিশোধকে বিচারক সাব্যস্ত করা হবে। কেননা যে চুক্তিটাকে সে নিয়তমুক্ত রেখেছে সেটা দুদিকেরই সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তার হুকুম স্থগিত থাকবে। দুই মালের যেটা থেকে পরিশোধ করবে, ধরা হবে যে, সেই সম্ভাব্যটাকে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য করেছে। তাছাড়া [নিয়ত না থাকার ব্যাপারে] উভয়ের একমত হওয়া সত্ত্বেও মুওয়াক্কিলের জন্য নিয়ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। [কেননা হতে পারে যে, নিয়ত করেছিল, পরে ভুলে গেছে।] আর আমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, তাতে তার অবস্থাকে সততার উপর প্রয়োগ করা হয় যেমন পরস্পরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের 'বায় সালাম' চুক্তি সম্পাদনের জন্য উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে এ সকল সুরত বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ الخ : ইমাম কুদূরী বলেন, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে এরপর উকিল একটা গোলাম ক্রয় করে ফেলে তাহলে এ ক্রয় করা উকিলের জন্য হবে। আর উকিলই এ গোলামের মালিক হবে। কিন্তু যদি উকিল একথা বলে যে, আমি মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করার নিয়ত করেছিলাম অথবা উকিল ঐ গোলামটিকে মুওয়াক্কিলের মাল দিয়ে ক্রয় করে তাহলে এ দুই সুরতে গোলাম মুওয়াক্কিলের হবে। হিদায়া গ্রন্থাকার (র.) বলেন, এ মাসআলায় তিন সুরত এজন্য যে, উকিল ক্রয় চুক্তিকে–

১. হয়তো মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে। যেমন– একথা বলবে যে, আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের টাকা দিয়ে ক্রয় করলাম।

২. অথবা, নিজের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে। যথা– এমন বলবে যে, আমি এ গোলাম নিজের টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম।

৩. অথবা, মুতলাক টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে। যেমন একথা বলবে যে, আমি এ গোলাম একশত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। অর্থাৎ টাকাকে নিজের অথবা মুওয়াক্কিল কারো দিকে সম্পৃক্ত করবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুদূরীর ইবারত أَوْ يَشْتَرِيْ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একতো এই যে, মূল্য মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে পরিশোধ করে চুক্তিকে তার দিকে সম্পৃক্ত না করা। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, উকিল ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে, অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার একটি মর্মার্থ হলো, উকিলে মুওয়াক্কিলের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে। আর দ্বিতীয় মর্মার্থ হলো, উকিল চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন, আমার মতে এখানে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই উদ্দেশ্য। কেননা প্রথম সম্ভাবনাতে কিছুটা তফসীলও আছে, আবার মতানৈক্যও আছে। যেমনটি সামনে আসছে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো, যদি উকিল চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে

সম্পৃক্ত করে তাহলে এ চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য সংঘটিত হবে। এটা সর্বসম্মত অভিমত। আর কুদূরীর ইবারত أَوْ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ বন্ধনহীন। অর্থাৎ তাতে কোনো মতানৈক্য উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং যখন তাতে কোনো মতানৈক্য উল্লেখ হয়নি তখন সেটাকে সর্বসম্মত মতের উপর প্রবাহিত করা হবে। আর্থাৎ একথা বলা হবে যে, কুদূরীর ইবারত أَوْ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ দ্বারা উদ্দেশ্য ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করা। মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে ক্রয় চুক্তিকে সম্পৃক্ত করা ছাড়া মুওয়াক্কিলের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করা উদ্দেশ্য নয়।

যাহোক তিন সুরতের প্রথম সুরত হলো, যদি উকিল ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে এ চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য হবে। আর ক্রয়কৃত গোলাম মুওয়াক্কিলের হবে, উকিলের হবে না। দ্বিতীয় সুরত হলো, যদি উকিল ক্রয় চুক্তিকে নিজের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে এ চুক্তি স্বয়ং উকিলের জন্য হবে এবং ক্রয়কৃত গোলাম উকিলের হবে, মুওয়াক্কিলের নয়।

হেদায়া প্রণেতা এ মাসআলার পরে حَمْلاً لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا أَوْ يَفْعَلُهُ عَادَةً থেকে দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন। এক দলিল হলো, عُرْف বা প্রচলন, আরেক দলিল হলো শরিয়ত। عُرْف-এর দলিল তো উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা লোক প্রচলনে এমনও আছে যে, চুক্তিকে নিজের টাকার দিকে সম্পৃক্তকারী নিজের জন্য ক্রয়কারী হয় আর মুওয়াক্কিলের টাকা দিয়ে ক্রয়কারী মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্তকারী হয়। সুতরাং এ লোকপ্রচলনের কারণে প্রথম সুরতে ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য হবে আর দ্বিতীয় সুরতে উকিলের জন্য হবে।

আর শরিয়তের দলিল বিশেষভাবে প্রথম সুরতের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে যে, প্রথম সুরতে হলো, যদি উকিল ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের টাকার দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য হবে। কেননা যদি ক্রয় চুক্তি অন্যের সম্পদের দিকে সম্পৃক্ত হয় আর ক্রয় নিজের জন্য হয় তাহলে এটা হারাম। এজন্য যে, এ সুরতে মুওয়াক্কিলের টাকা গসব করা আবশ্যকীয় হয় আর গসব হারাম হওয়া তো স্পষ্ট। আর যদি ক্রয় চুক্তি নিজের মালের দিকে সম্পৃক্ত হয় আর ক্রয় অন্যের জন্য হয় তাহলে এটা হারাম হয় না। কেননা এ সুরতে গসবে লিপ্ত হওয়া আবশ্যকীয় হয় না।

যাহোক হেদায়া গ্রন্থকার يَفْعَلُهُ عَادَةً حَمْلاً لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا থেকে শরয়ী দলিল বর্ণনা করেছেন এবং থেকে লোকপ্রচলনের দলিল বর্ণনা করেছেন। শরয়ী দলিল তো শুধু প্রথম সুরতের উপর আর লোক প্রচলন দুই সুরতের উপরেই। –[কেফায়া]

তৃতীয় সুরত হলো, উকিল ক্রয় চুক্তিকে মুতলাক টাকার দিকে সম্পৃক্ত করবে। যেমন এই বলল যে, আমি এই গোলাম একশত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি আর একথা উল্লেখ করল না যে, নিজের টাকা দিয়ে কিনেছে না মুওয়াক্কিলের টাকা দিয়ে। সুতরাং এ সুরতে যদি উকিল কয়েদমুক্ত টাকা দ্বারা মুওয়াক্কিলের জন্য খরিদ করার নিয়ত করে তাহলে এই ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য হবে। আর যদি নিজের জন্য ক্রয় করার নিয়ত করে তাহলে এ ক্রয়চুক্তি উকিলের জন্যই হবে। কেননা অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্তির সুরতে উকিলের দুই এখতিয়ার থাকে– সে নিজের জন্য ক্রয় করারও অনুমতিপ্রাপ্ত, আবার মুওয়াক্কিলের জন্যও ক্রয় করার অনুমতিপ্রাপ্ত। কাজেই ক্রয় করার সময় যার নিয়ত করবে গোলাম তারই হবে। আর যদি কয়েদমুক্ত টাকার সুরতে উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায় অর্থাৎ উকিল বলে যে, এ গোলাম আমি নিজের জন্য খরিদ করেছি আর মুওয়াক্কিল বলে যে, না বরং আমার জন্য ক্রয় করেছে তাহলে এ সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে মূল্য পরিশোধকে বিচারক ধরা হবে। অর্থাৎ যদি মূল্য উকিলের মাল থেকে পরিশোধ করা হয় তাহলে এ চুক্তি উকিলের জন্য হবে আর উকিল গোলামের মালিক হবে। আর যদি মুওয়াক্কিলের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে তাহলে এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলে জন্য হবে, আর মুওয়াক্কিল ঐ গোলামের মালিক হবে। কেননা মূল্য পরিশোধ করা এ কথার

বাহ্যিক দলিল যে, উকিলের অবস্থাকে সেদিকেই প্রবাহিত করা হবে যা তার জন্য শরিয়তে হালাল অথবা তা লোকপ্রচলনে করা হয়। অর্থাৎ যদি উকিল নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে এই নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করা এ কথার দলিল যে, এ ক্রয় করা স্বয়ং উকিলের জন্য। এজন্য যে, লোকপ্রচলনে এমন করা হয় না যে, মূল্য পরিশোধ তো নিজের টাকা দিয়ে করল আর ক্রয় করল অন্যের জন্য। আর যদি মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে এটা এ কথার দলিল যে, এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের জন্য। কেননা শরিয়তে এমনটি হারাম যে, মানুষ ক্রয় নিজের জন্য করবে আর মূল্য অন্যের সম্পদ থেকে পরিশোধ হবে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এ সুরতে উকিলের গসবকারী হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর যদি উকিল এবং মুওয়াক্কিল এ কথার উপর একমত হয়ে যায় যে, গোলাম ক্রয়ের সময় উকিলের কোনো নিয়ত ছিল না তাহলে এ সুরতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য আছে। সুতরাং ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, এই ক্রয় করা চুক্তি সম্পাদনকারী অর্থাৎ উকিলের জন্য হবে। কেননা এটাই আসল যে, মানুষ নিজের জন্য কাজ করে। [এছাড়া সে নিজের কাজ অন্য কারো জন্য তার মালের দিকে সম্পৃক্ত করে অথবা তার নিয়ত করে নির্ধারণ করে দেয়।] কিন্তু যেহেতু এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, উকিল নিজের ক্রয় চুক্তিকে অন্যের জন্য করেনি, এজন্য এ ক্রয় চুক্তিটি চুক্তি সম্পাদনকারী অর্থাৎ উকিলের জন্য হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ সুরতেও মূল্য পরিশোধকে বিচারক বানানো হবে। অর্থাৎ মূল্য যার মাল থেকে পরিশোধ করা হবে, ক্রয় করাটা তার জন্যই হবে। আর সেই গোলামের মালিক হবে। কেননা উকিল যে ক্রয় করেছে তা নিয়ত না থাকায় বন্ধনমুক্ত এবং তাতে উভয় সুরতের সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অর্থাৎ এ সম্ভাবনাও আছে যে, ক্রয় করা হয়েছে মুওয়াক্কিলের জন্য। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, ক্রয় করা হয়েছে খোদ উকিলের জন্য। সুতরাং উভয় সম্ভাবনার কারণে এ ক্রয় চুক্তি ঝুলন্ত থাকবে। অর্থাৎ না উকিলের জন্য হবে, না মুওয়াক্কিলের জন্য হবে; বরং এই দেখা হবে যে, মূল্য কার সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং যার সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধ করা হবে এ ক্রয় করা তার জন্যই হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যখন উকিল এবং মুওয়াক্কিল এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করল যে, ক্রয় করার সময় উকিলের কোনো নিয়ত ছিল না তখন এতে এ সম্ভাবনাও থেকে যায় যে, উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য নিয়ত করেছে কিন্তু ভুলে গেছে। আর যখন এ সম্ভাবনাও আছে তখন ক্রয় করা নিশ্চিতভাবে চুক্তি সম্পাদনকারী অর্থাৎ উকিলের জন্য কি করে হতে পারে? আর আমরা যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে বললাম, তাতে উকিলের অবস্থার যথাযথতার উপর নির্ভর করা হয়েছে। এভাবে যে, যদি মূল্য মুওয়াক্কিলের মাল দ্বারা পরিশোধ করা হয়ে থাকে আর ক্রয়ও উকিলের জন্য হয়ে থাকে যেমনটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, তাহলে উকিল গসবকারী হবে। আর যদি ক্রয় করাও মুওয়াক্কিলের জন্য হয় তাহলে উকিল গসবকারী হবে না। যাহোক মূল্য পরিশোধকে বিচারক মানার সুরতে যেহেতু উকিলের অবস্থার যথাযথতার উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে এজন্য ক্রয়ের সময় নিয়ত না থাকলে ঐকমত্য করে নেওয়ার সুরতে মূল্য পরিশোধকে বিচারক নির্ধারণ উপযোগী হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, খাদ্যদ্রব্যের بَيْعِ سَلَمْ চুক্তি সম্পাদনের জন্য উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে এ সকল সুরত বিবেচ্য হবে। কেননা بَيْعِ سَلَمْ-এ খাদ্যও অনির্দিষ্ট হয়। সুতরাং যখন উকিল بَيْعِ سَلَمْ করল তখন দেখা হবে যে, সে চুক্তিকে নিজের মালের দিকে সম্পৃক্ত করেছে, না মুওয়াক্কিলের মালের দিকে, নাকি কোনো দিকে সম্পৃক্ত করা ছাড়া মুতলাক টাকার দিকে? অতঃপর সম্পৃক্ত করা ছাড়া টাকা উল্লেখের ক্ষেত্রে তার কোনো নিয়ত আছে কি নেই? যদি নিয়ত থাকে তাহলে নিজের জন্য না মুওয়াক্কিলের জন্য, নাকি উভয়ে নিয়তের ব্যাপারে মতবিরোধ করে। আর যদি উকিল এবং মুওয়াক্কিলের ঐকমত্য থাকে যে নিয়ত ছিল না তাহলে আবার ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِاَلْفٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَمَاتَ عِنْدِيْ وَقَالَ الْاٰمِرُ اِشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْاٰمِرِ فَاِنْ كَانَ دَفَعَ اِلَيْهِ الْاَلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُوْرِ لِاَنَّ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ اَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ اِسْتِيْنَافَهُ وَهُوَ الرُّجُوْعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْاٰمِرِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ هُوَ اَمِيْنٌ يُرِيْدُ الْخُرُوْجَ عَنْ عُهْدَةِ الْاَمَانَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا حِيْنَ اخْتَلَفَا اِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُوْدًا فَالْقَوْلُ لِلْمَامُوْرِ لِاَنَّهُ اَمِيْنٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُوْدًا فَكَذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّهُ يَمْلِكُ اِسْتِيْنَافَ الشِّرَاءِ فَلَا يُتَّهَمُ فِى الْاِخْبَارِ عَنْهُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَلْقَوْلُ لِلْاٰمِرِ لِاَنَّهُ مَوْضِعُ تُهْمَةٍ بِاَنْ اِشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَاِذَا رَاَى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً اَلْزَمَهَا الْاٰمِرَ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُوْدًا لِاَنَّهُ اَمِيْنٌ فِيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ تَبْعًا لِذٰلِكَ وَلَا ثَمَنَ فِىْ يَدِهٖ هٰهُنَا ـ

অনুবাদ : 'জামিউস সাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম ক্রয় করতে বলে, আর উকিল বলে যে, আমি ক্রয় করেছি আর সে আমার কাছে মারা গেছে; কিন্তু মুওয়াক্কিল বলে যে, তুমি তাকে নিজের জন্য ক্রয় করেছ তাহলে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুওয়াক্কিল যদি উকিলকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করে থাকে তাহলে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা প্রথম সুরতে উকিল এমন একটি চুক্তি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে যা সে নতুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। আর তা হলো [চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে] মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে মূল্য উসুল করা; অন্য দিকে মুওয়াক্কিল তা অস্বীকার করছে, আর অস্বীকারকারীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে সে হলো আমানত রক্ষাকারী এবং আমানতের দায় থেকে সে মুক্ত হতে চায়, তাই তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যখন দুজনে মতপার্থক্য করছে তখন যদি গোলামটি জীবিত থাকে আর মূল্য যদি [মুওয়াক্কিলের পক্ষ হতে উকিলকে] দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে উকিলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে সে হলো আমানত রক্ষাকারী। [এবং আমানতের দায় থেকে মুক্ত হতে চায়।] আর যদি মূল্য প্রদত্ত না হয়ে থাকে তাহলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা এ অবস্থায় ক্রয়চুক্তি নতুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং খবর প্রদানের ব্যাপারে তাকে তোহমতগ্রস্ত করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুওয়াক্কিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে এই তোহমতের পাত্র হয়ে আছে যে, সে নিজের জন্য ক্রয় করেছিল। এখন চুক্তিটিকে লোকসানজনক মনে করে মুওয়াক্কিলের উপর চাপাতে চাচ্ছে। [মুওয়াক্কিলের পক্ষ হতে] মূল্য প্রদত্ত হলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঐ বিষয়ে সে আমানত রক্ষকারী। সুতরাং আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দাবির গ্রহণযোগ্যতার অনুগামী হিসেবে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করার দাবিও গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে তো তার হাতে মূল্য বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ الخ : মাসআলার স্বরূপ হলো, কেউ যদি কাউকে একহাজার টাকায় একটি গোলাম ক্রয় করতে বলে আর উকিল বলে যে, আমি ক্রয় করেছি কিন্তু সেই গোলাম আমার কাছে মারা গেছে। কিন্তু মুওয়াক্কিল বলে যে, তুমি তাকে নিজের জন্য ক্রয় করেছ। আর মুওয়াক্কিল এখনও পর্যন্ত উকিলকে এক হাজার টাকা দেয়নি তো এ সুরতে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ ক্রয় উকিলের জন্য হবে; মুওয়াক্কিলের জন্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এরূপ মত বর্ণিত আছে। আর মুওয়াক্কিল যদি উকিলকে এক হাজার টাকা প্রদান করে থাকে এরপর এমন মতপার্থক্য হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এ দুই সুরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, প্রথম সুরতে অর্থাৎ যে সুরতে মুওয়াক্কিল উকিলের কাছে মূল্য হস্তান্তর করেনি ঐ সুরতে উকিল এমন জিনিসের খবর দিয়েছে যার কারণে সে যদি নতুন করে উপস্থিত করতে চায় উপস্থিত করতে পারবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, উকিলের একথা বলা যে, আমি আপনার আদেশ মতো গোলাম ক্রয় করেছিলাম কিন্তু সে গোলাম মারা গেছে। এ কথার অর্থ এই যে, উকিল মুওয়াক্কিল থেকে ঐ মৃত গোলামের মূল্য নিতে চায়, আর মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য গ্রহণের মাধ্যম হলো চুক্তি, অথচ উকিল এখন ঐ গোলামের উপর চুক্তি করতে সক্ষম নয়। কেননা এখানে যে গোলামকে নিয়ে কথা হচ্ছে সেই গোলাম মৃত। আর মৃত গোলাম চুক্তির বস্তু হতে পারে না। কাজেই উকিল ঐ মৃত গোলামের ক্রয় চুক্তিতে সক্ষম নয়। আর যে ব্যক্তি বর্তমানে কোনো বস্তুকে উপস্থিত করতে সক্ষম নয় সে বস্তুর ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাজেই এ উকিলের বক্তব্য– আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছিলাম আর সেই গোলাম আমার কাছে মারা গেছে– এটাও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাকে রজয়ী দিল অতঃপর একথা বলল যে, আমি ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আর স্ত্রী বলল, তুমি ফিরিয়ে নাওনি। তো এ সুরতে যদি স্ত্রীর ইদ্দত বাকি থাকে তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ সুরতে স্বামী নতুন করে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ মতানৈক্য হয় তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্বামী নতুন করে এখন ফিরিয়ে নিতে পারে না। সুতরাং এখানেও যেহেতু উকিল গোলাম মরে যাওয়ার কারণে এখন নতুন করে চুক্তি করতে সক্ষম নয় এজন্য উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ দলিলটিকে এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, উকিলের মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য তলব না করা এ কথার সাথে খাস যে উকিল এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছে আর খোদ মুওয়াক্কিল তা অস্বীকার করছে। আর উকিলের কাছে নিজের দাবি প্রমাণিত করার জন্য দলিলও নেই। আর বাদীর কাছে দলিল না থাকলে যেহেতু অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় এজন্য এখানে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) এ দলিলের ইবারতের উপর একটি শাব্দিক আপত্তি উত্থাপন করে তার জওয়াব দিয়েছেন। আপত্তি হলো, ইবারতে اِسْتِئْنَافُ-এর দ্বারা ফেরত নেওয়ার কারণ অর্থাৎ ক্রয় চুক্তি উদ্দেশ্য যেমনটি দলিল বিশ্লেষণে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং যখন চুক্তিই উদ্দেশ্য তখন হিদায়া প্রণেতা اِسْتِئْنَافُ-এর যমীরের মারজি' উল্লেখ করতে গিয়ে وَهُوَ الرُّجُوْعُ بِالثَّمَنِ কেন বললেন? وَهُوَ الْعَقْدُ কেন বললেন না?

এ আপত্তির উত্তর হলো, নতুন করে ক্রয় চুক্তি করার দ্বারা উকিলের উদ্দেশ্য মুওয়াক্কিল থেকে মূল্য গ্রহণ, মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় চুক্তি করা নয়। এজন্যই হিদায়া প্রণেতা মাধ্যম অর্থাৎ চুক্তির কথা বাদ দিয়ে যা উদ্দেশ্য ছিল সেটাকেই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা سَبَبٌ [অর্থাৎ رُجُوْعٌ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُوَكِّلِ উল্লেখ করে سَبَبٌ [তথা ক্রয় চুক্তি] বুঝানোর শ্রেণিভুক্ত হবে। আর এটা জায়েজ। আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ যেই সুরতে মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে ঐ সুরতে উকিল 'আমীন'; আর সে এই বলে যে, "আমি তোমার জন্য গোলাম ক্রয় করেছিলাম কিন্তু তা আমার কাছে মরে গেছে" নিজেকে নিজে আমানতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়। আর আমানতের ব্যাপারে মালিক ও আমীনের মাঝে যদি এ মতবিরোধ হয়

যে, আমীন তার দায়িত্ব পালন করেছে কিনা তাহলে সে ক্ষেত্রে আমীনের কথা গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানেও যেহেতু মুওয়াক্কিল যে টাকার মালিক সে এই দাবি করে যে, তুমি গোলাম আমার জন্য ক্রয় করনি, বরং নিজের জন্য ক্রয় করেছ। কাজেই তুমি আমানতের দায়িত্ব পালন করনি। আর উকিল যে আমীন সে দাবি করে যে, আমি এ গোলাম তোমার জন্য ক্রয় করেছিলাম, কাজেই আমানতের জিম্মাদারি আদায় করেছিল। এজন্য এখানেও আমীন অর্থাৎ উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যখন মুওয়াক্কিল আর উকিলের মাঝে মতানৈক্য হলো অর্থাৎ উকিল বলল যে, আমি এ গোলাম তোমার জন্য ক্রয় করেছি আর মুওয়াক্কিল বলল যে, না, বরং তুমি নিজের জন্য ক্রয় করেছ, তখন যদি এ গোলাম জীবিত থাকে আর মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য দিয়ে ফেলেছে তাহলে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা উকিল আমীন। আমানতের জিম্মাদারি থেকে বের হতে চায়। আর প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আমীনের কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কাজেই এ সুরতেও উকিলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য না দিয়ে থাকে, তাহলে সাহেবাইনের মতে এ সুরতেও উকিলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মতে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, এ সুরতে উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় চুক্তি করতে সক্ষম। কেননা গোলাম জীবিত, আর জীবিত গোলাম ক্রয়ের মহল হয়। কাজেই উকিল এখনই ঐ গোলামকে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করতে সক্ষম। আর যখন উকিল ঐ গোলামকে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করতে সক্ষম তখন উকিল নিজের এ সংবাদে যে, আমি এ গোলামকে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি এ সংবাদে সে অপবাদপ্রাপ্ত হবে না। যখন উকিল নিজের খবরে অবিশ্বাসযোগ্য নয় তখন তার কথা নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি এর উপর এ আপত্তি করা হয় যে, যদি ক্রয় প্রথমে উকিলের জন্য হয় যেমনটি মুওয়াক্কিল বলে, তাহলে তারপর নতুন করে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় কিভাবে হতে পারে?

এ আপত্তির উত্তর এই দেওয়া হবে যে, উকিল নিজের বিক্রেতার সাথে ক্রয় চুক্তিকে বাতিল করে দেবে অতঃপর সেটাকে মুওয়াক্কিল ক্রয় করে নেবে এভাবে কোনো আপত্তি আসবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উকিলের এ সংবাদ দেওয়া যে, আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি অপবাদের স্থলে। এভাবে যে, উকিল ঐ গোলামকে তো মূলত নিজের জন্যই ক্রয় করেছে। কিন্তু যখন তাতে লোকসান দেখতে পেল তখন সেটাকে মুওয়াক্কিলের ঘাড়ে চাপানোর ইচ্ছা করে ফেলল। সুতরাং এ অপবাদের কারণে উকিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং মুওয়াক্কিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এর বিপরীতে যখন মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্যপরিশোধ করে দিয়েছে অতঃপর উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে তখন উকিলের বক্তব্য এজন্য গ্রহণযোগ্য হবে যে, এ সুরতে উকিল আমীন আর আমানতের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমীনের কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। আর এ সূত্র ধরে উকিলের এ কথাও গ্রহণযোগ্য হবে যে, গোলামের ক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্য। আর যে বস্তু অনুগামিতার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় তার বিশেষণের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় না। এ কারণেই উকিলের দোষী হওয়া না হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে না; বরং উকিলের কথা গ্রহণ করে নেওয়া হবে। আর এখানে অর্থাৎ যে সুরতে মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য পরিশোধ করেনি আর গোলাম জীবিত এ সুরতে উকিলের কবজায় যেহেতু মূল্য নেই এজন্য উকিল আমীন হবে না। আর যখন এ সুরতে উকিল আমীন নয় তখন তার কথাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَاِنْ كَانَ اَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا وَالْعَبْدُ حَيٌّ فَالْقَوْلُ لِلْمَامُوْرِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُوْدًا اَوْ غَيْرَ مَنْقُوْدٍ وَهٰذَا بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهُ اَخْبَرَ عَمَّا يَمْلِكُ اِسْتِيْنَافَهُ وَلَا تُهْمَةَ فِيْهِ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ الثَّمَنِ فِيْ حَالِ غَيْبَتِهِ عَلٰى مَا مَرَّ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) ـ

অনুবাদ : আর যদি নির্দিষ্ট কোনো গোলাম ক্রয় করার আদেশ করে থাকে অতঃপর মতপার্থক্য হয় আর গোলামও জীবিত আছে, তাহলে মূল্যপ্রদত্ত হোক কিংবা অপ্রদত্ত উভয় ক্ষেত্রে উকিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কেননা সে এমন চুক্তির খবর প্রদান করেছে, যা নতুনভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য তার রয়েছে, আর তাতে অপবাদের অবকাশ নেই। কেননা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিল মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে ঐ পরিমাণ মূল্যে ঐ বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে না যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অনির্দিষ্ট গোলামের বিষয়টি ভিন্ন, যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ اَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ الخ : পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার একটি সুরত হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে একটি নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের আদেশ দিল অতঃপর উভয়ের মাঝে মতানৈক্য হলো। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল বলল যে, এ গোলাম তুমি নিজের জন্য ক্রয় করেছ। আর উকিল বলল, না বরং আমি তোমার জন্য ক্রয় করেছি। আর এ মতানৈক্যের সময় গোলাম জীবিত, তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ ব্যাপারে একমত যে, এ সুরতে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে– মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য পরিশোধ করুক বা না করুক।

কারণ হলো, উকিল একথা বলে যে, আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি একথা বলে সে এমন জিনিসের সংবাদ দিয়েছে যেটা সে নতুনভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ মতানৈক্যের পরে উকিল ঐ গোলামকে মুওয়াক্কিলের জন্য নতুন করে ক্রয় করতে পারে এবং উকিল এ খবর দেওয়ার ক্ষেত্রে তোহমতপ্রাপ্তও হবে না। উকিলের উপর এজন্য তোহমত আসবে না যে, যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার উকিল হয় সে মুওয়াক্কিলের অনুপস্থিতিতে ঐ মূল্য পরিমাণ বিনিময়ে ঐ জিনিসটিই ক্রয় করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় না। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যখন উকিল ঐ নির্দিষ্ট গোলামকে নিজের জন্য ক্রয় করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয় তখন সে নিজের এ সংবাদে যে, আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি, নিশ্চিতভাবেই তোহমতপ্রাপ্ত হবে না।

এর বিপরীতে যদি অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে অতঃপর উকিল একথা বলে যে, আমি এ গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি তাহলে উকিল নিজের এ খবরে তোহমত পেতে পারে। যেমটি পূর্বে উল্লিখিত মাসআলা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْنِىْ هٰذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ اَنْكَرَ اَنْ يَكُوْنَ فُلَانٌ اَمَرَهُ ثُمَّ جَاءَ فُلَانٌ وَقَالَ اَنَا اَمَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَاِنَّ فُلَانًا يَاْخُذُهُ لِاَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ اِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَعُهُ الْاِنْكَارُ اللَّاحِقُ فَاِنْ قَالَ فُلَانٌ لَمْ اٰمُرْهُ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لَهُ لِاَنَّ الْاِقْرَارَ اِرْتَدَّ بِرَدِّهٖ قَالَ اِلَّا اَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرٰى لَهُ فَيَكُوْنُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ لِاَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِىْ كَمَنِ اشْتَرٰى لِغَيْرِهٖ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ حَتّٰى لَزِمَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرٰى لَهُ وَدَلَّتِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى اَنَّ التَّسْلِيْمَ عَلٰى وَجْهِ الْبَيْعِ يَكْفِىْ لِلتَّعَاطِىْ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ نَقْدُ الثَّمَنِ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ فِى النَّفِيْسِ وَالْخَسِيْسِ لِاِسْتِتْمَامِ التَّرَاضِىْ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِى الْبَابِ .

অনুবাদ. কেউ যদি কাউকে বলে, এ গোলামটি অমুকের জন্য আমার কাছে বিক্রি কর। তখন সে তার কাছে বিক্রি করল। অতঃপর সে অমুক যে তাকে আদেশ করেছে, তা অস্বীকার করল। পরে অমুক এসে বলল যে, আমি তাকে তা ক্রয় করার আদেশ করেছিলাম, তাহলে গোলামটি অমুকই নিয়ে নেবে। কেননা তার পূর্ববর্তী কথাটি ছিল তার পক্ষ থেকে অমুকের উকিল হওয়ার স্বীকারোক্তি। সুতরাং পরবর্তী অস্বীকার তার কোনো কাজে আসবে না। আর অমুক যদি বলে, আমি তাকে আদেশ করিনি, তাহলে গোলামকে নেওয়ার অধিকার তার হবে না। কেননা তার রদ করে দেওয়ার কারণে তার পূর্ববর্তী স্বীকারোক্তি রদ হয়ে গেছে। তবে যদি অমুকের জন্য ক্রয়কারী উক্ত গোলামটিকে অমুকের হাতে অর্পণ করে দেয় তখন এ অর্পণ হবে তার পক্ষ হতে বিক্রয়; আর অমুকের উপর মূল্যের দায় আসবে। কেননা কার্যত আদান-প্রদানের মাধ্যমে সে ক্রেতা হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের জন্য তার আদেশ ছাড়াই ক্রয় করল আর ক্রয় ক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। অতঃপর যার জন্য ক্রয় করা হয়েছে তার হাতে সে তা অর্পণ করেছিল [তখন এটা কার্যত আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল।] মাসআলাটি একথা প্রমাণ করছে যে, بَيْعُ التَّعَاطِىْ [বা আদান-প্রদান ভিত্তিক বিক্রয়] সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিক্রয় সূত্রের অর্পণই যথেষ্ট; যদিও মূল্য পরিশোধ পাওয়া না যায়। আর পরস্পর সম্মতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে মূল্যবান ও সাধারণ সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেই بَيْعُ التَّعَاطِىْ সাব্যস্ত হবে। এ বিক্রয় প্রসঙ্গে এটাই হলো বিবেচ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْنِىْ هٰذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ الخ : মাসআলাটির ধরন এমন যে, এক ব্যক্তি ধরা যাক সে খালিদ আরেক ব্যক্তিকে ধরা যাক হামিদকে বলল যে, আমি অমুক ধরা যাক শাহিদের পক্ষ থেকে তোমার এ গোলামটি ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত হয়েছি। কাজেই তুমি এ গোলাম আমার হাতে অমুক অর্থাৎ শাহিদের জন্য বিক্রি করে দাও। হামিদ ঐ গোলামটিকে খালিদের হাতে বিক্রি করে দিল। অতঃপর খালিদ বলল যে, শাহিদ আমাকে ঐ গোলাম ক্রয় করার আদেশ দেয়নি অর্থাৎ আমি শাহিদের উকিল নই; বরং আমি এ গোলাম নিজের জন্য ক্রয় করেছি। অতঃপর অমুক অর্থাৎ শাহিদ এসে বলল

যে, আমি খালিদকে এ গোলাম ক্রয় করার আদেশ দিয়েছিলাম আর খালিদ এ গোলাম আমার জন্য ক্রয় করেছে তো এ সুরতে অমুক অর্থাৎ শাহিদের এ অধিকার হবে যে সে ক্রেতা অর্থাৎ খালিদ থেকে ঐ গোলামটি নেয়ে নিবে আর মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

এর কারণ হলো, খালিদের প্রথম বক্তব্য যে, এ গোলাম আমার হাতে শাহিদের জন্য বিক্রি করে দাও– খালিদের পক্ষ থেকে এ কথার স্বীকারোক্তি যে, সে শাহিদের পক্ষ থেকে এ গোলাম ক্রয়ের উকিল। এরপর ক্রয়ের পরে খালিদের শাহিদের পক্ষ থেকে উকিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করল। অথচ পূর্ববর্তী স্বীকারোক্তি পরবর্তী অস্বীকারের কারণে বাতিল হয় না। অর্থাৎ স্বীকার করার পরে যদি অস্বীকার করে, তাহলে এ অস্বীকারের কারণে পূর্বে কৃত স্বীকারোক্তি তার পরবর্তী অস্বীকারের কারণে বাতিল হবে না। আর যখন খালিদের উকালতের স্বীকারোক্তি বাতিল হলো না তখন তার ক্রয়কৃত গোলাম মুওয়াক্কিল অর্থাৎ শাহিদের জন্য হবে, উকিল খালিদের জন্য নয়।

আর যদি অমুক অর্থাৎ শাহিদ একথা বলে যে, আমি খালিদকে উক্ত গোলাম ক্রয় করার আদেশ করিনি, তো এ সুরতে শাহিদের উক্ত গোলাম গ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেননা ক্রেতা অর্থাৎ খালিদ নিজের উকিল হওয়ার যে স্বীকারোক্তি করেছিল তা মুওয়াক্কিল অর্থাৎ শাহিদের রদ করার দ্বারা রদ হয়ে গেছে। আর যখন খালিদের উকালতের স্বীকারোক্তি রদ হয়ে গেল তখন উক্ত ক্রয়কৃত গোলাম খালিদের জন্যই থাকবে– শাহিদের জন্য নয়। এরপর যদি শাহিদ খালিদের স্বীকারোক্তির সত্যায়নও করে তো এ সত্যায়ন তার কোনো কাজে আসবে না। কেননা শাহিদের রদ করার দ্বারা যখন খালিদের স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে গেল এখন শাহিদের সত্যায়ন শুদ্ধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য "إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِى لَهُ" পূর্ববর্তী ইবারত لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لَهُ থেকে বর্জিত বা ব্যতিক্রম অর্থাৎ যদি অমুক অর্থাৎ শাহিদ একথা বলে যে, আমি খালিদকে উক্ত গোলাম ক্রয়ের আদেশ দেইনিতো এ সুরতে শাহিদের জন্য উক্ত গোলাম নেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না। কিন্তু এক সুরত এমন আছে যে ক্ষেত্রে একথা বলা সত্ত্বেও শাহিদের গোলামটি নেওয়ার অধিকার থাকে আর সেই সুরতটাকে أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِى لَهُ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাতায়িজুল আফকার প্রণেতা লিখেন, এখানে مُشْتَرِى শব্দটি দুই বর্ণনায় দুভাবে পড়া হয়েছে। এক বর্ণনায় রা-তে যেরের সাথে। আরেক বর্ণনায় রা-তে যবরের সাথে। যেরের সুরতে مُشْتَرِىْ শব্দটি اَنْ يُسَلِّمَ ফে'লের ফায়েল হবে। আর لَهُ-এর লাম اَجْل-এর অর্থে হবে। আর তার যমীর বা সর্বনাম অমুক তথা শাহিদের দিকে ফিরবে। আর يُسَلِّمَهُ-এর ه অর্থাৎ যমীরে মানসূব প্রথম মাফউল হবে আর তার মারজি' হবে উক্ত গোলাম। আর মাফউলে ছানী অর্থাৎ اِلَيْهِ হবে লুক্কায়িত আর اِلَيْهِ-এর যমীরের মারজি' অমুক [শাহিদ] এর জন্য ক্রয়কারী ব্যক্তি [খালিদ] ঐ গোলামকে অমুক [শাহিদের] কাছে সোপর্দ করে দেয় তাহলে অমুক অর্থাৎ শাহিদের এ অধিকার হবে যে, সে ঐ গোলামকে নিয়ে নেবে আর তার মূল্য খালিদকে দিয়ে দেবে।

আর রা-এর যবরের সুরতে اَنْ يُسَلِّمَهُ-এর ه অর্থাৎ যমীরে মানসূব হলো প্রথম মাফউল আর মারজি' হলো গোলাম আর اَلْمُشْتَرٰى لَهُ দ্বিতীয় মাফউল। আর مُشْتَرٰى لَهُ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ অমুক [শাহিদ] আর اَنْ يُسَلِّمَهُ-এর ফায়েল হলো যমীরে মারফূ' যেটা ক্রেতা [খালিদ]-এর দিকে ফিরেছে। এখন মর্মার্থ হবে এই যে, যদি ক্রেতা ঐ গোলামকে مُشْتَرٰى لَهُ অর্থাৎ অমুক [শাহিদের] কাছে সোপর্দ করে দেয় তাহলে শাহিদের এ অধিকার আছে যে, সে ঐ গোলাম নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করে দেবে। এখন পুরো ইবারতের খোলাসা এই হবে যে, যদি শাহিদ এই বলে যে, আমি খালিদকে উক্ত গোলাম ক্রয় করার আদেশ দেইনি, তাহলে শাহিদ ঐ গোলাম গ্রহণের হকদার হবে না। হ্যাঁ, যদি খালিদ এ গোলাম শাহিদের হাতে সোপর্দ করে

দেয় তাহলে এ সুরতে শাহিদ এ গোলাম নেওয়ার হকদার। কিন্তু এ নেওয়ার হকদার হওয়া এ কারণে নয় যে, খালিদ শাহিদের পক্ষ থেকে ক্রয়ের উকিল; বরং এ কারণে যে, খালিদ শাহিদের দিকে গোলাম সোপর্দ করা খালিদের দিক থেকে বিক্রয়ের নামান্তর। আর শাহিদের এ জিম্মাদারি যে, সে মূল্য পরিশোধ করে ঐ গোলামটি নিয়ে নেবে। হিদায়া প্রণেতা দলিল দিতে গিয়ে বলেন, খালিদ এবং শাহিদের মাঝে এ লেনদেন بَيْع تَعَاطِىْ -এর ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ খালিদ بَيْع تَعَاطِىْ -এর ভিত্তিতে বিক্রয়কারী হবে আর শাহিদ ক্রয়কারী হবে। আর بَيْع تَعَاطِىْ জায়েজ। যেমনটি কিতাবুল বুয়ূ'র শুরুতে অতিবাহিত হয়েছে কাজেই খালিদ এবং শাহিদের লেনদেনও জায়েজ হবে। আর তার উদাহরণ এমন যেমন এক অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন ওয়াসিফ অন্য কারো যেমন আরিফের জন্য আরেকজন মানুষের আদেশে কোনো জিনিস ক্রয় করল তো এ চুক্তি ক্রেতা অর্থাৎ ওয়াসিফ -এর জন্য আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি পুনরায় ক্রেতা [ওয়াসিফ] ঐ জিনিসটি আরিফের কাছে সোপর্দ করে দেয় তাহলে এটা بَيْع تَعَاطِىْ হবে। অর্থাৎ بَيْع تَعَاطِىْ -এর ভিত্তিতে ওয়াসিফ বিক্রেতা এবং আরিফ ক্রেতা হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, بَيْع تَعَاطِىْ -এর জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, বিক্রয়ের ভিত্তিতে কোনো জিনিস কারো কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হবে যদিও কবজাকারীর পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ না হয়ে থাকে অর্থাৎ بَيْع تَعَاطِىْ যেভাবে গ্রহণ ও প্রদান অর্থাৎ বিক্রয় দ্রব্য গ্রহণ করার দ্বারা সম্পন্ন হয় তদ্রূপ প্রদান ছাড়া গ্রহণ অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ ব্যতীত শুধু গ্রহণের দ্বারাও সম্পন্ন হয়, যেমন লোকদের প্রচলন আছে। কাজেই আপনি দেখে থাকবেন যে, যেসব লোকের দোকানে হিসাব কিতাব চলতেই থাকে তারা দোকান থেকে ইজাব কবুল ছাড়াই দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসে আর সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ করে না। আর ইজাব কবুল ছাড়া লেনদেন করাকেই তো بَيْع تَعَاطِىْ বলে। সুতরাং মানুষের পারস্পরিক আচরণ থেকে প্রমাণিত হলো যে. মূল্য পরিশোধ করা ছাড়াও بَيْع تَعَاطِىْ সম্পন্ন হয়।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, بَيْع تَعَاطِىْ দামি এবং সস্তা উভয় শ্রেণির পণ্যেই হতে পারে। অর্থাৎ بَيْع تَعَاطِىْ যেভাবে সস্তা দ্রব্য সামগ্রীতে বৈধ তদ্রূপ মূল্যবান সামগ্রীতেও বৈধ। কেননা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি শর্ত। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ আর পরস্পর সম্মতি কম দামি বা বেশি দামি উভয় শ্রেণির প্রতিটি بَيْع تَعَاطِىْ -এর ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান। কাজেই প্রতিটিরই بَيْع تَعَاطِىْ জায়েজ হবে। ইমাম কারখী (র.) বলেন, بَيْع تَعَاطِىْ শুধু কম দামি বস্তুতে জায়েজ। এর পুরো তফসীল কিতাবুল বুয়ূর শুরুতে অতিবাহিত হয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا اَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِاَعْيَانِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرٰى لَهُ اَحَدَهُمَا جَازَ لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِى الْبَيْعِ اِلَّا فِيْمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ لِاَنَّهٗ تَوْكِيْلٌ بِالشِّرَاءِ وَهٰذَا كُلُّهٗ بِالْاِجْمَاعِ .

অনুবাদ. ইমাম কুদূরী বলেন, যদি কেউ কাউকে এ আদেশ দেয় যে, সে তার জন্য দুটি নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করবে তার সামনে মূল্য বর্ণনা না করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য ঐ দুটির একটি গোলাম ক্রয় করে তাহলে তা বৈধ। কেননা উকিল নিযুক্তিটি ছিল শর্তমুক্ত। সুতরাং সেটা তার নিঃশর্ততার উপরই বহাল থাকবে। আর বিক্রয় চুক্তিতে দুটোকে একত্র করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে যেটুকু ক্ষতি মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে না, ঐ পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করলে বৈধ হবে না। কেননা এটা হলো ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্তকরণ। এসবই হলো সর্বসম্মত মত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا اَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ عَبْدَيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এক ব্যক্তি উদাহরণত খালিদ অন্য আরেক ব্যক্তিকে উদাহরণত শাহিদকে বলল যে, তুমি আমার জন্য এ দুটি নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করে আন। আর মুওয়াক্কিল [খালিদ] উকিল [শাহিদের] সামনে ঐ গোলাম দুটির মূল্যের কথা উল্লেখ করল না। অতঃপর উকিল ঐ দুই গোলামের ভেতর থেকে একটা গোলাম মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করে তাহলে এ ক্রয় করা বৈধ। কেননা এ সুরতে উকিল নিযুক্তি শর্তমুক্ত। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল ঐ দুটি গোলামকে আলাদা আলাদা ক্রয় করার কোনো শর্ত যুক্ত করেনি, একসাথে ক্রয় করার কথাও বলেনি; বরং শর্তমুক্ত রেখেছে। আর শর্তমুক্তকে তার নিঃশর্ততার উপরেই বহাল রাখা হয়। কাজেই উকিল ঐ দুই গোলামকে পৃথক পৃথক ক্রয় করুক অথবা একসাথে ক্রয় করুক উভয় সুরতই জায়েজ। অর্থাৎ উভয় সুরতেই ক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্য হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, কখনো দুই গোলাম একসাথে ক্রয় করা সম্ভব হয় না এজন্যও যদি উকিল একটি গোলাম ক্রয় করে তাহলে এ ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। হ্যাঁ, যদি উকিল একটা গোলাম সাধারণ মূল্য থেকে অত্যধিক বেশি মূল্য দিয়ে বিশাল ব্যবধানে ক্রয় করে তাহলে এ ক্রয় বৈধ হবে না। অর্থাৎ এর জিম্মাদার উকিল হবে। মুওয়াক্কিল এর জিম্মাদার হবে না।

দলিল হলো, এটা ক্রয়ের উকিল নিযুক্তি। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল তাকে ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করেছে আর ক্রয়ের উকিল নিযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে অধিক ক্ষতি বহনযোগ্য নয়। অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে ক্রয়ের উকিলকে অধিক ক্ষতির সাথে ক্রয় করার অনুমতি নেই। সুতরাং যখন ক্রয়ের উকিলের অধিক ক্ষতির সাথে ক্রয় করার অনুমতি হয় না তখন যদি ক্রয়ের উকিল ক্ষতি স্বীকার করে ক্রয় করে তাহলে মুওয়াক্কিলের হুকুমের বিরোধিতা হওয়ায় এ ক্রয় মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না; বরং উকিলের উপর কার্যকর হবে।

হেদায়া প্রণেতা বলেন, এ পুরো মাসআলাটি সর্বসম্মত মত অনুসারে। নাতায়িজুল আফকার প্রণেতা বলেন যে, হিদায়া গ্রন্থকার উকিল নিযুক্তিকে ক্রয়ের সাথে সংযুক্ত এজন্য করেছে যে, বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তির সুরতে যদি উকিল অধিক ক্ষতিতে বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ বিক্রয় করাটা জায়েজ। অর্থাৎ একটা গোলাম বিক্রি করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে আর গোলামের মূল্য ছিল দুশো টাকা কিন্তু উকিল সেটাকে একশত টাকায় বিক্রি করে দেয় তাহলে এ বিক্রয় জায়েজ।

وَلَوْ اَمَرَ بِاَنْ يَشْتَرِيَهُمَا بِالْاَلْفِ وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِنِ اشْتَرٰى اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ اَوْ اَقَلَّ جَازَ فَاِنِ اشْتَرٰى بِاَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْاٰمِرَ لِاَنَّهُ قَابَلَ الْاَلْفَ بِهِمَا وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ دَلَالَةً فَكَانَ اٰمِرًا بِشِرٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ الشِّرَاءُ بِهَا مُوَافِقَةٌ وَبِاَقَلَّ مِنْهَا مُخَالِفَةٌ اِلٰى خَيْرٍ وَبِالزِّيَادَةِ اِلٰى شَرٍّ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ اَوْ كَثُرَتْ فَلَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ بِبَقِيَّةِ الْاَلْفِ قَبْلَ اَنْ يَخْتَصِمَا اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّ شِرَى الْاَوَّلِ قَائِمٌ وَقَدْ حَصَلَ غَرْضُهُ الْمُصَرَّحُ بِهٖ وَهُوَ تَحْصِيْلُ الْعَبْدَيْنِ بِالْاَلْفِ مَا ثَبَتَ الْاِنْقِسَامُ اِلَّا دَلَالَةً وَالصَّرِيْحُ يَفُوْقُهَا ـ

অনুবাদ : আর যদি তাকে উভয় গোলামকে এক হাজার দ্বারা ক্রয় করতে বলে আর উভয়ের বাজার মূল্য সমান হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি দুটির একটিকে পাঁচশ দিরহাম বা তার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করে তাহলে জায়েজ হবে। আর যদি তার চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করে তাহলে আদেশদাতার জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা সে তো এক হাজারকে উভয়ের বিপরীতে উল্লেখ করেছে। আর উভয়ের বাজার মূল্য সমান। সুতরাং [স্পষ্ট বক্তব্যের অনুপস্থিতিতে] পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এক হাজারকে দুই ভাগ করা হবে। তাই সে যেন উভয় গোলামের প্রতিটিকে পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করার আদেশ দানকারী হলো। অতঃপর পাঁচশ দিরহামে ক্রয় করার অর্থ হলো আদেশ পালন, আর তার চেয়ে কমে খরিদ করার অর্থ হলো এমন বিরুদ্ধাচরণ, যাতে কল্যাণ রয়েছে। আর বেশিতে ক্রয় করার অর্থ এমন বিরুদ্ধাচরণ, যাতে অনিষ্ট রয়েছে। সেই বেশির পরিমাণ অল্প হোক কিংবা অধিক। সুতরাং তা জায়েজ হবে না। তবে যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার আগে সে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা অবশিষ্ট বস্তুটি খরিদ করে ফেলে [তাহলে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।] এ সিদ্ধান্তটি হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা প্রথমটির ক্রয় তো বিদ্যামান রয়েছে এবং তা দ্বারা স্পষ্ট উচ্চারণকৃত উদ্দেশ্যটিও অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো এক হাজার দ্বারা গোলাম দুটিকে লাভ করা। আর এক হাজারের সমান বিভক্তি তো পরোক্ষ প্রমাণে শুধু সাব্যস্ত হয়েছিল অথচ স্পষ্ট বক্তব্যের স্থান তার উপরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَمَرَ بِاَنْ يَشْتَرِيَهُمَا بِالْاَلْفِ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এমন দুটি গোলাম ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে যার মূল্য সমান সমান, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি উকিল ঐ দুই গোলামের একটাকে পাঁচশ টাকা অথবা পাঁচশ টাকার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করে তাহলে এ খরিদ করা জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। কিন্তু যদি পাঁচশ টাকার চেয়ে বেশির বিনিময়ে ক্রয় করে তাহলে এ ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না; বরং উকিলের উপর কার্যকর হবে। পাঁচশ টাকার অতিরিক্ত পরিমাণটা কম হোক বা বেশি হোক।

কারণ হলো, মুওয়াক্কিল এক হাজার টাকা উভয় গোলামের বিপরীতে উল্লেখ করেছে। আর উভয় গোলামের মূল্য এক। কাজেই পরোক্ষভাবে একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এক হাজার টাকা উভয় গোলামের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন করা হবে যেন মুওয়াক্কিল উভয় গোলামের প্রত্যেকটাকে পাঁচশ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছে। সুতরাং যদি উকিল একটি গোলাম পাঁচশ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে এ ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের আদেশ অনুযায়ীই হবে। আর যখন এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের আদেশের অনুকূল তখন এ ক্রয় করা জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। আর যদি উকিল এক গোলাম পাঁচশ টাকার কমে ক্রয় করে তাহলে এতে নিঃসন্দেহে মুওয়াক্কিলের হুকুমের বিরোধিতা হবে। কিন্তু এ বিরোধিতায় মুওয়াক্কিলের ফায়দা এবং কল্যাণ, তাই এ খরিদ করাও জায়েজ হবে। হ্যাঁ, যদি উকিল একটা গোলাম পাঁচশ টাকার চেয়ে বেশি দিয়ে ক্রয় করে। চাই সেই অতিরিক্তটা পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক, তাহলে এতে মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা এবং মুওয়াক্কিলের ক্ষতি। আর যখন মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা এবং তার ক্ষতি হয় তখন এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের জন্য জায়েজ হবে না। অর্থাৎ এ ক্রয় করার জিম্মাদার উকিল হবে, মুওয়াক্কিল কখনো জিম্মাদার হবে না। কিন্তু যদি উকিল একটা গোলাম পাঁচশ টাকার চেয়ে বেশি মূল্য যেমন ছয়শত টাকা দিয়ে ক্রয় করে অতঃপর উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে বাদানুবাদ হওয়ার পূর্বেই উকিল অপর গোলাম এক হাজার টাকার অবশিষ্ট টাকা দিয়ে দেয় অর্থাৎ চারশ টাকা দিয়ে ক্রয় করে ফেলে তাহলে এ ক্রয় করাটাও সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক ও কার্যকর হবে। যদিও বাহ্যযুক্তি বা কিয়াসের দাবি হলো, এ সুরতেও উক্ত ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে না। কেননা এ সুরতেও মুওয়াক্কিলের বিরোধিতা বিদ্যমান। আর যখন মুআক্কিলের বিরোধিতা পাওয়া গেল তখন উক্ত ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে না। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মত কিয়াসের মোতাবেক।

إِسْتِحْسَانٌ বা সূক্ষ্ম যুক্তি হলো, প্রথম গোলাম যেটাকে ছয়শ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছিল সেটার ক্রয় এখনও আছে বিবাদের কারণে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। অতঃপর যখন উকিল অপর গোলাম চারশ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করল তখন মুওয়াক্কিল ঐ উদ্দেশ্য যেটাকে সে স্পষ্ট বর্ণনা করেছিল যে, উভয় গোলাম এক হাজার টাকায় ক্রয় করতে হবে, তা অর্জিত হয়ে গেছে। আর এক হাজার টাকা উভয় গোলামের উপর সমানভাবে বণ্টিত হওয়া মুওয়াক্কিলের বক্তব্য থেকে পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত হয়েছে– স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে নয়।

সারকথা হলো, মুওয়াক্কিলের স্পষ্ট বক্তব্য তো এই যে উভয় গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে অর্জিত হবে আর পরোক্ষভাবে ঐ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক গোলামের বিনিময়ে পাঁচ'শ টাকা ধার্য করেছে। আর মূলনীতি হলো, যদি স্পষ্ট বক্তব্যের উপর আমল করা সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট বক্তব্য যেটা সেটা পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত বস্তুর চেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান পায় অর্থাৎ যখন স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান থাকে এবং তার উপর আমল করাও সম্ভব হয় তখন পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত যেটা, সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সেটা বিবেচ্য হবে না। সুতরাং যেহেতু এখানে উভয় গোলামের ক্রয় মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়েছে, এজন্য এ ক্রয় করা জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِنِ اشْتَرٰى اَحَدَهُمَا بِاَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ الْاَلْفِ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ وَقَدْ بَقِىَ مِنَ الْاَلْفِ مَا يُشْتَرٰى بِمِثْلِ الْبَاقِىْ جَازَ لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ لٰكِنَّهٗ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا وَلٰكِنْ لَابُدَّ اَنْ يَبْقٰى مِنَ الْاَلْفِ بَاقِيَةٌ يُشْتَرٰى بِمِثْلِهَا الْبَاقِىْ لِيُمْكِنَهٗ تَحْصِيْلُ غَرَضِ الْاٰمِرِ ـ

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দুটির একটিকে যদি অর্ধ সহস্রের চেয়ে এমন বেশি মূল্যে ক্রয় করে, যাতে যে পরিমাণ ক্ষতি মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে নেয় আর এক হাজার থেকে এ পরিমাণ বাকি থাকে, যা দ্বারা অবশিষ্ট গোলামটি ক্রয় করা যায়, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা উকিল নিযুক্তির বিষয়টি [পাঁচশ টাকার শর্ত থেকে] মুক্ত। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ। আর সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো সেই পরিমাণ ক্ষতি, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এক হাজার থেকে এই পরিমাণ অবশিষ্ট থাকতে হবে, যা দ্বারা অবশিষ্ট গোলামটি ক্রয় করা যায়, যাতে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) الخ : পূর্বের মাসআলাটিতে সাহেবাইনের অভিমত হলো, যদি উকিল একটি গোলাম পাঁচশ টাকার চেয়ে এ পরিমাণে বেশি মূল্য দিয়ে ক্রয় করে যা দ্বারা সাধারণভাবে লোকজন ধোঁকা খায় অর্থাৎ সামান্য লসে ক্রয় করে উদাহরণত পাঁচশ টাকা মূল্যের গোলামকে সোয়া পাঁচশ টাকায় ক্রয় করল আর এক হাজার টাকার এই পরিমাণে টাকা বেঁচে থাকে [যেমন– পৌনে পাঁচশ টাকা] যার বিনিময়ে অপর গোলাম ক্রয় করা যেতে পারে, তাহলে এ ক্রয় করাটা জায়েজ হবে এবং তা মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে।

কারণ হলো, মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে এ উকিল নিযুক্তির বিষয়টি পাঁচশ টাকার শর্ত থেকে মুক্ত, তবে তা সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া অর্থাৎ লোকপ্রচলনের বহির্ভূত না হওয়ার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ। আর এক্ষেত্রে লোকপ্রচলন তাই, যা আমরা বলেছি অর্থাৎ অল্প ক্ষতি। উদ্দেশ্য হলো, মুওয়াক্কিল দুটি গোলাম, যার মূল্য সমান সমান প্রায়, এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করার আদেশ দিয়েছেন, যেন এমন বলেছেন যে, এক গোলাম কমবেশি পাঁচশ টাকার হয় যেন। লোকপ্রচলনে এ কথার অর্থ এই হয় যে, যদি পাঁচশ টাকার চেয়ে এ পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয় যাতে সাধারণভাবে মানুষের ধোঁকা হয়েই যায় [একেই অল্প ক্ষতি বলে] তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ সামান্য লসের পরিমাণে অতিরিক্ত টাকা মুওয়াক্কিলের আদেশের মাঝে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এটাকে মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু এটা জরুরি যে, এক হাজার টাকার অবিশিষ্ট পরিমাণ এতটুকু হবে যে, এর বিনিময়ে দ্বিতীয় গোলাম ক্রয় করা যায়, যাতে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য সাধন অর্থাৎ এক হাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলামের মালিক হওয়া সম্ভব হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইনের মাযহাবের মাঝে পার্থক্য এই হলো যে, সাহেবাইনের মতে যদি একটি গোলাম পাঁচশ টাকার চেয়ে এ পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করে যেটাকে সামান্য লস বলা যায় তাহলে এ ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে। আর যদি এ পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যর বিনিময়ে ক্রয় করে যেটাকে সীমাতিরিক্ত লস বলা হয় তাহলে এ ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে না; বরং উকিলের উপর আবশ্যক হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পাঁচশ টাকার চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য সীমাতিরিক্ত সুরতে হোক অথবা সামান্য লসের সুরতে হোক উভয় সুরতে এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের উপর আব্যশ্যক হবে না; বরং উকিলের উপর আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَمَنْ لَهُ عَلٰى اٰخَرَ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَاَمَرَهُ بِاَنْ يَشْتَرِىَ بِهَا هٰذَا الْعَبْدَ فَاشْتَرَاهُ جَازَ لِاَنَّ فِىْ تَعْيِيْنِ الْمَبِيْعِ تَعْيِيْنُ الْبَائِعِ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعُ يَجُوْزُ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ. জামিউস সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কারো যদি অন্য কারো কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে, আর পাওনাদার তাকে ঐ এক হাজার দ্বারা এ [নির্ধারিত] গোলামটি ক্রয় করতে বলে, আর সে তা ক্রয় করে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা বিক্রয় দ্রব্য নির্ধারণ করার অর্থ হলো বিক্রেতা নির্ধারণ করে দেওয়া, আর বিক্রেতা নির্ধারণ করে দিলে তা জায়েজ হয়। যেমন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلٰى اٰخَرَ اَلْفُ دِرْهَمٍ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির কাছে পাওনা আছে এক হাজার টাকা। তো পাওনাদার ঐ ব্যক্তিকে ঐ এক হাজার টাকায় এ নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার আদেশ দিল, তো সেই ব্যক্তি ঐ নির্ধারিত গোলামটিকে খরিদ করল। এতো ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে। চাই মুওয়াক্কিল ঐ গোলামের উপর কবজা করুক অথবা সেই গোলাম মুওয়াক্কিলের কবজার পূর্বে উকিলের কবজাতে মরে যাক।

কারণ হলো, এখানে মুওয়াক্কিল ক্রয় দ্রব্য অর্থাৎ গোলামকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর ক্রয় দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা বিক্রেতাও নির্ধারিত হয়ে যায়। আর মুওয়াক্কিল যদি বিক্রেতা নির্ধারিত করে দেয় তাহলে তা জায়েজ হয় যেমনটি সামনে উল্লিখিত হবে। সুতরাং তদ্রূপ বিক্রয় দ্রব্য নির্ধারণের সুরতেও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ হবে।

وَاِنْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِيْ يَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهُ الْاٰمِرُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِيْ وَاِنْ قَبَضَهُ الْاٰمِرُ فَهُوَ لَهُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَقَالَا هُوَ لَازِمٌ لِلْاٰمِرِ اِذَا قَبَضَهُ الْمَامُوْرُ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا اَمَرَهُ اَنْ يُسَلِّمَ مَا عَلَيْهِ اَوْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ لَهُمَا اَنَّ الدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتْ اَوْ عَيْنًا اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَصَادَقَا اَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ .

অনুবাদ : আর যদি সে তাকে ঐ এক হাজার দ্বারা অনির্ধারিত গোলাম ক্রয় করতে বলে, আর সে তা ক্রয় করে এবং মুওয়াক্কিল তার কব্জার পূর্বেই তার হাতে মারা যায়, তাহলে ক্রেতার মাল হিসেবেই নষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি মুওয়াক্কিল তা কব্জা করে নেয়, তাহলে [উকিলের হাতে মারা গেলেও] তা তারই গোলাম মারা গেছে বলে গণ্য হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উকিল যদি তা কব্জা করে থাকে তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই তা মুওয়াক্কিলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। একই বিশদ বিবরণ সাব্যস্ত হবে, যদি পাওনাদার তাকে তার কাছে পাওনা মাল দ্বারা 'বায় সালাম' বা সারফ চুক্তি করতে বলে। সাহেবাঈন (র.)-এর দলিল হলো, [বিক্রয় ও অন্যান্য] বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে দিরহাম দিনার নির্ধারিত হয় না। চাই তা ঋণরূপে দেনাদারের জিম্মায় সাব্যস্ত হোক কিংবা ঋণরূপে [জিম্মায় সাব্যস্ত না হয়ে] বস্তুরূপে বিদ্যমান হোক। দেখুন না, যদি দুজনের ঋণরূপে সাব্যস্ত দিরহাম [বা দিনার]-এর বিনিময়ে স্থূলভাবে বিদ্যমান দিরহাম [বা দিনার] ক্রয়-বিক্রয় করে, তারপর উভয়ে একমত হয় যে ঋণ বিদ্যমান নেই, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না, [বরং কথিত ঋণের সম পরিমাণ ওয়াজিব হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِيَ الخ : মাসআলাটির সুরত হলো, যদি পাওনাদার দেনাদারকে আদেশ দেয় যে ঐ এক হাজার টাকা যা তোমার কাছে আমার পাওনা আছে তার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করে দাও, আর গোলাম নির্দিষ্ট করল না। অর্থাৎ পাওনাদার দেনাদারকে নিজের পাওনার বিনিময়ে একটা অনির্ধারিত গোলাম ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করল। আর যখন গোলাম [বিক্রয় দ্রব্য] অনির্ধারিত থাকল তখন বিক্রেতাও অনির্ধারিত থাকবে। তো দেনাদার একটা গোলাম ক্রয় করল, কিন্তু ঐ গোলামের উপর মুওয়াক্কিল কবজা করার আগেই দেনাদার [উকিলের] কবজাতেই ঐ গোলাম মারা গেল তো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ গোলাম ক্রেতা [উকিলের] সম্পদ থেকেই মরবে। অর্থাৎ উকিলের [দেনাদারের] উপর যে ঋণ ছিল তা বহাল থাকবে এবং মুওয়াক্কিলকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি মুওয়াক্কিল অর্থাৎ পাওনাদার ঐ গোলামের উপর কবজা করে নেয় এরপর ঐ গোলাম মারা যায় তাহলে এটা মুওয়াক্কিলের মাল থেকে মারা যাবে। অর্থাৎ উকিল [দেনাদারের] উপর যে দেনা ছিল তা তার জিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং এ ক্ষতির জিম্মাদার মুওয়াক্কিল হবে। কিন্তু এটা এজন্য নয় যে, এ ওয়াকালাহ সঠিক; বরং এজন্য যে, মুওয়াক্কিলের কবজা করার দ্বারা মুওয়াক্কিল এবং উকিলের মাঝে بَيْع تَعَاطِيْ তথা আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি বৈধ।

قَوْلُهُ وَقَالَا هُوَ لَازِمٌ لِلْاٰمِرِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মতে হুকুম হলো, যদি উকিল [দেনাদার] গোলামের উপর কবজা করে নেয়, তাহলে এ গোলাম মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হয়ে যাবে। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল [পাওনাদার]-ই তার মালিক হবে। চাই মুওয়াক্কিল তার উপর কবজা করুক চাই উকিলের কবজাতেই মারা যাক। অর্থাৎ উভয় সুরতেই উকিল [দেনাদারের] জিম্মা থেকে ঋণ রহিত হয়ে যাবে। এ মতেরই প্রবক্তা ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)। সারকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ উকিল নিযুক্তি সঠিক নয়। আর সাহেবাইন (র)-এর মতে সঠিক।

এ একই মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে যখন পাওনাদার দেনাদারকে এ আদেশ দেয় যে, আমার এক হাজার টাকা যা তোমার কাছে পাওনা আছে তুমি তার বিনিময়ে কারো কাছ থেকে দশ মণ গমের 'সালাম চুক্তি' করে দাও, অথবা ঐ এক হাজার টাকার বিনিময় 'সরফ চুক্তি' কর। তো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مُسْلَمٌ فِيْهِ এবং সারফের বিনিময় (بَدَل صَرْف) -এর

উপর পাওনাদার [মুওয়াক্কিল] যদি কবজা না করে থাকে, বরং দেনাদারের [উকিলের] কবজাতে নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এ উকিলের [দেনাদারের] মাল নষ্ট হবে, আর মুওয়াক্কিলের পাওনা যথারীতি দেনাদার [উকিলের] জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে। আর যদি মুওয়াক্কিল [পাওনাদার] مُسْلَمٌ فِيْهِ এবং بَدْلُ صَرْف -এর উপর কবজা করে নেয় তাহলে এখন পাওনাদারের মাল হয়ে গেল, এরপর যদি এ মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মুওয়াক্কিলের সম্পদই ধ্বংস হবে, আর উকিল ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে مُسْلَمٌ فِيْهِ এবং بَدْلُ صَرْف -এর উপর যদি উকিল [দেনাদার] কবজা করে নেয় তাহলে তা মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে। চাই মুওয়াক্কিলের কবজায় আসার পূর্বে নষ্ট হয়ে যাক। কিন্তু এ মতানৈক্য ঐ সুরতে যখন পাওনাদার مُسْلَمٌ إِلَيْهِ বা দাদন গ্রহীতাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে যার সাথে সারফ চুক্তি করার আদেশ দিয়েছে নির্দিষ্ট না করে থাকে। কাজেই পাওনাদার যদি তাকে নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এ উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ এবং দেনাদার [উকিলের] ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিল পাওনাদারের উপর আবশ্যক হবে। চাই মুওয়াক্কিল مُسْلَمٌ فِيْهِ এবং بَدْلُ صَرْف -এর উপর কবজা করুক অথবা মুওয়াক্কিলের কবজা করার পূর্বে উকিলের কবজায় নষ্ট হয়ে যাক।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ الدَّنَانِيْرَ لَاتَتَعَيَّنَانِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, দিরহাম দিনার টাকা পয়সা ইত্যাদি বিনিময় চুক্তিতে নির্ধারিত করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। চাই তা ঋণরূপে দেনাদারের জিম্মায় সাব্যস্ত হোক কিংবা ঋণরূপে [জিম্মায় সাব্যস্ত না হয়ে] বস্তুরূপে বিদ্যমান হোক। সুতরাং যদি শাহিদ বলে যে, আমার এক হাজার টাকা খালিদের কাছে পাওনা আছে। এরপর খালিদ [দেনাদার] ঋণের বিনিময়ে নিজের কাছে বিদ্যমান মাল থেকে উদাহরণত একশ দিনার পাওনাদারের হাতে বিক্রি করে দেয়। অতঃপর উভয়ের মাঝে ঐকমত্য হয়ে যায় যে, শাহিদের খালিদের কাছে কিছু পাওনা ছিল না তখন শাহিদ এবং খালিদের মাঝের উক্ত চুক্তি বাতিল হবে না; বরং শাহিদের উপর ঋণের مِثْل [অনুরূপ] অর্থাৎ এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। লক্ষ্য করুন! যদি দিরহাম দিনার নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যেত তাহলে খালিদের জিম্মায় ঋণ না থাকার উপর একমত হওয়ার সুরতে উক্ত চুক্তি বাতিল হয়ে যেত। কেননা চুক্তিতে যেই টাকাগুলোকে دَيْن -এর সুরতে নির্ধারিত করেছিল তা বাকি থাকেনি অথচ এখানে চুক্তি বাতিল হয় না। সুতরাং সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, দিরহাম দিনার دَيْن [বা ঋণ রূপে দেনাদারের জিম্মায়] সাব্যস্ত হোক অথবা عَيْن [তথা ঋণরূপে জিম্মায় সাব্যস্ত না হয়ে] বস্তুরূপে বিদ্যমান হোক বিনিময় চুক্তিতে নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আর যে জিনিস নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না সে বস্তুর ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত করা এবং শর্তমুক্ত রাখা উভয় সমান। শর্তমুক্ত রাখার সুরত তো হলো, পাওনাদার দেনাদারকে এই বলবে যে, আমার জন্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটা গোলাম ক্রয় করে আন। আর ঐ এক হাজার টাকাকে ঐ ঋণের দিকে সম্পৃক্ত করল না যেই ঋণ দেনাদারের উপর ওয়াজিব। আর تَقْيِيْد বা শর্তযুক্ত করার সুরত হলো, ঐ এক হাজার টাকাকে ঋণের দিকে সম্পৃক্ত করবে উদাহরণ পাওনাদার একথা বলল যে, আমার জন্য একটা গোলাম ঐ এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে এসো, যেই এক হাজার টাকা তোমার কাছে আমার পাওনা আছে। সুতরাং যখন দিরহাম দিনার টাকা পয়সা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না– আর যা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না তাতে শর্তমুক্ত রাখা আর শর্তযুক্ত রাখা উভয় সমান, তখন পাওনাদারের নিজের দেনাদারকে এই বলা যে, তুমি আমার জন্য একটি গোলাম ঐ এক হাজার টাকার বিনিময় ক্রয় করে নিয়ে এসো যা তোমার কাছে আমার পাওনা আছে, আর একথা বলা যে, এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে এসো উভয় সমান। আর পাওনাদার যদি এই বলে যে, তুমি আমার জন্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করবে, আর সেই এক হাজারকে ঋণের সাথে সম্পৃক্ত করবে না, তাহলে এ উকিল নিযুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে শুদ্ধ। কাজেই যদি এক হাজারকে ঋণের দিকে সম্পৃক্ত করে দেয় তো এ সুরতেও উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ হবে। আর যখন এ সূরতে উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ হলো তখন উকিল অর্থাৎ দেনাদারের ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিল অর্থাৎ পাওনাদারের উপর আবশ্যক হবে। সুতরাং যদি গোলাম পাওনাদারের [মুওয়াক্কিলের] কবজা করার পূর্বে উকিল [দেনাদারের] কবজাতে মারা যায় তাহলে এটা মুওয়াক্কিলের সম্পদ থেকে মারা গেছে বলে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ ঐ গোলামের মরা মুওয়াক্কিল [পাওনাদারের] লোকসান বলে গণ্য হবে– উকিলের নয়। কেননা উকিলের কবজা মুওয়াক্কিলের কবজার মতো হয়। অর্থাৎ উকিলের কবজায় গোলামের মৃত্যু এমনই কেমন যেন মুওয়াক্কিলের কবজায় মরেছে। আর মুওয়াক্কিলের কবজায় মৃত্যুর সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে মুওয়াক্কিলের লোকসান গণ্য করা হয়। সুতরাং উকিলের কবজায় মরার সুরতেও মুওয়াক্কিলেরই লোকসান পরিগণিত হবে– উকিলের নয়। আর এটা এমন হয়ে গেল যেমন পাওনাদার দেনাদারকে বলল যে, তোমার কাছে আমার যে পাওনা আছে তুমি সেটা মিসকিনদের উপর সদকা করে দাও তো এটা জায়েজ। তদ্রূপ যদি ঐ ঋণের বিনিমেয় গোলাম ক্রয় করার আদেশ দেয় তাহলে এটাও জায়েজ হবে।

فَصَارَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ سَوَاءٌ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيَلْزَمُ الْآمِرَ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِهِ وَلِأَبِيْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ الْوَكَالَةَ بِالْعَيْنِ مِنْهَا أَوْ بِالدَّيْنِ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَهْلَكَ الْعَيْنَ أَوْ أَسْقَطَ الدَّيْنَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ فَإِذَا تَعَيَّنَتْ كَانَ هٰذَا تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهِ وَذٰلِكَ لَا يَجُوزُ كَمَا إِذَا اشْتَرٰى بِدَيْنٍ عَلٰى غَيْرِ الْمُشْتَرِيْ أَوْ يَكُونُ أَمْرًا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالْقَبْضِ قَبْلَهُ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ كَمَا إِذَا قَالَ أَعْطِ مَالِيْ عَلَيْكَ مَنْ شِئْتَ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيَّنَ الْبَائِعَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَالَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مَعْلُومٌ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ نَفَذَ الشِّرٰى عَلَى الْمَأْمُورِ فَيَهْلِكُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا إِذَا قَبَضَهُ الْآمِرُ مِنْهُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ تَعَاطِيًا .

অনুবাদ : সুতরাং শর্তমুক্ত রেখে শুধু এক হাজার বলা আর পাওনা এক হাজারের শর্ত দ্বারা শর্তায়িত করা সমান হবে আর এভাবে উকিল রূপে নিযুক্ত করা বৈধ হবে এবং আদেশদাতার জন্য চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হবে। কেননা উকিলের কবজা মুওয়াক্কিলের কবজার সমান। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ওকালাতের ক্ষেত্রে দিরহাম দিনার [উকিলের হাতে অর্পণ করার পর] নির্ধারিত হয়ে যায়। দেখুন না, মুওয়াক্কিল যদি ওকালাতকে স্থূলভাবে বিদ্যমান মুদ্রার সাথে কিংবা ঋণরূপে [উকিলের জিম্মায়] বিদ্যমান মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট করে অতঃপর [মুওয়াক্কিল কিংবা উকিল] ঐ বস্তুগতভাবে বিদ্যমান মুদ্রা হালাক ও নষ্ট করে ফেলে কিংবা মুওয়াক্কিল [উকিলের জিম্মায় সাব্যস্ত] ঋণ রহিত করে দেয় সেক্ষেত্রে ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। তো দিরহাম দিনারের নির্ধারিত হওয়া যখন সাব্যস্ত হলো তখন উল্লিখিত এ উকিল বানানোর অর্থ হলো [পাওনাদার মুওয়াক্কিলের পক্ষ হতে] এমন ব্যক্তিকে [উকিলের নিকট প্রাপ্য] ঋণের মালিক বানানো যার উপর ঋণ সাব্যস্ত নয় [অর্থাৎ বিক্রেতাকে মালিক বানানো]। অথচ তাকে [অর্থাৎ বিক্রেতাকে] ঐ ঋণ কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয়নি। আর [অর্পণ করতে অপারগ হওয়ার কারণে] এ ধরনের মালিক বানানো জায়েজ নয়। যেমন যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে ক্রয় করে [তাহলে তা বৈধ হয় না] কিংবা এ উকিল বানানোর অর্থ হলো কবজার পূর্বে এমন মাল প্রদানের আদেশ করা, যা দখল গ্রহণ করা ছাড়া সে মালিক হয় না, আর তা বৈধ নয়। যেমন যদি বলে যে, তোমার কাছে আমার যা পাওনা তা থেকে তোমার যা ইচ্ছা দান কর। পক্ষান্তরে মুওয়াক্কিল যদি বিক্রেতা নির্ধারণ করে দেয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা তখন বিক্রেতা [অনিবার্যভাবে] পাওনাদার মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে কবজা করার উকিল হয়ে যাবে; অতঃপর সে তার মালিকানা লাভ করবে। তদ্রূপ যদি পাওনাদার দেনাদারকে ঋণের টাকা গরিব মিসকিনদের কেনাকাটা করার আদেশ করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা এক্ষেত্রে মালকে সে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছে। আর তা সুপরিজ্ঞাত। মোটকথা উকিল নিযুক্ত করা যখন বৈধ হলো না তখন এ ক্রয় উকিলের উপর কার্যকর হবে। সুতরাং তার মাল হিসাবেই গোলামটি হালাক হবে। তবে মুওয়াক্কিল যদি উকিলের কাছ থেকে গোলামকে কবজা করে নেয় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সেক্ষেত্রে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে [মুওয়াক্কিল ও উকিলের মাঝে] বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এ দলিল বুঝার পূর্বে একথা বুঝে নিতে হবে যে, ওকালতে টাকাপয়সা যতক্ষণ পর্যন্ত মুওয়াক্কিল উকিলের কাছে সোপর্দ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাপয়সা নির্ধারিত করা সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় না। উদাহরণত শাহিদ হামিদকে উকিল নিযুক্ত করতে গিয়ে বলল যে, তুমি আমার জন্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি বাঁদি ক্রয় কর। আর মুওয়াক্কিল [শাহিদ] ঐ এক হাজার টাকা উকিল [খালিদকে] দেখিয়ে নির্ধারিতও করে দিয়েছে, কিন্তু উকিলের কাছে সোপর্দ করেনি তো এখন যদি এ টাকা মুওয়াক্কিলের কবজা থেকে চুরি হয়ে যায় আর উকিল এক হাজার টাকার বিনিময়ে বাঁদি ক্রয় করে ফেলে তাহলে এ ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে। আর মুওয়াক্কিলের দ্বিতীয় আরেক হাজার টাকা উকিলকে পরিশোধ করে দেবে। এ মাসআলা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, ওকালতে উকিলের হাওয়ালা করার পূর্বে টাকাপয়সা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কেননা এ সুরতে যদি টাকাপয়সা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যেত তাহলে নির্ধারিত টাকা চুরি হওয়ার পরে ওকালাত বাতিল হয়ে যেত। অথচ এ সুরতে ওকালাত বাতিল হয় না। সুতরাং নির্ধারিত টাকা চুরি হওয়ার পর অন্য টাকার বিনিময়ে ওকালত বাকি থাকা এবং বাতিল না হওয়া এ কথার দলিল যে, উকিলের কাছে সোপর্দ করার পূর্বে ওকালতের মাঝে টাকাপয়সা নির্ধারণ সত্ত্বেও নির্ধারিত হয় না।

এর দলিল হলো, ওকালত যেহেতু ক্রয় চুক্তির মাধ্যম তাই ওকালতকে ক্রয় চুক্তির সাথে তুলনা করতে হবে। আর ক্রয় চুক্তিতে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করার পূর্বে টাকাপয়সা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কাজেই ওকালত যেটা ক্রয় চুক্তির মাধ্যম তাতেও উকিলের কাছে সোপর্দ করার পূর্বে টাকাপয়সা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

আর যদি মুওয়াক্কিল উকিলের কাছে টাকা সোপর্দ করে দেয় তাহলে এ সুরতে মতানৈক্য আছে। সুতরাং কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন যে, এ সুরতে টাকা নির্ধারিত হয়ে যায়। এমনকি যদি এ টাকা নষ্ট করে দেয় অথবা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওকালত বাতিল হয়ে যাবে।

এসব মাশায়েখের এক দলিল হলো, ওকালত ক্রয়ের মাধ্যম আর ক্রেতার কাছে সোপর্দ করার পরে ক্রয় চুক্তিতে টাকা নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই ওকালত যা ক্রয়ের মাধ্যম উকিলের কাছে সোপর্দ করার পর টাকা এখানেও নির্ধারিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, টাকার উপর উকিলের কবজা আমানতের কবজা। আর আমানতের ক্ষেত্রে টাকাপয়সা নির্ধারিত হয়। কাজেই উকিলের কাছে সোপর্দ করে দেওয়ার পর ওকালতেও টাকাপয়সা নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর অধিকাংশ মাশায়েখের মত হলো, উকিলের সোপর্দ করার পরেও টাকাপয়সা নির্ধারিত হয় না।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা বুঝে নিতে হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের ভিত্তি পূর্বোল্লিখিত কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্যের উপর। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যকে এমন কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত করা হচ্ছে যারা ইমাম সাহেবের দুশো বৎসর পরে জন্ম লাভ করেছে। অথচ এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যেমন ইহুদিরা বলে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন আর খ্রিস্টানরা বলে যে, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জমানা ইহুদিবাদ বা খ্রিস্টবাদের অস্তিত্বের হাজার বৎসর পূর্বে। সুতরাং খ্রিস্টবাদ এবং ইহুদিবাদের হাজার বৎসর পূর্বে ভূমিষ্ঠ মানব হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইহুদি এবং খ্রিস্টান বলাটা বড় ধরনের নির্বুদ্ধিতা। তদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যকে এমন কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত করা যারা ইমাম সাহেবের দু'শ বৎসর পর ভূমিষ্ট হয়েছে বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এ আপত্তির উত্তর হলো, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ঐ কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্যের পিছে পড়েননি; বরং হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ঐটার ভরসা করেছেন যেটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে زِيَادَاتْ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, টাকাপয়সা উকিলের কাছে সোপর্দ করার পর নির্ধারিত হয়ে যায়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে যা কিছু বর্ণিত তার সব ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরই বক্তব্য। কদাচিৎ এমন হয় যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে যা বর্ণিত তা কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য। এ উত্তরের পরে একথা বলা ঠিক হবে না যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের দলিলের ভিত্তি কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্যের উপর।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, ওকালত উকিলের কাছে সোপর্দ করার পরে টাকাপয়সা নির্ধারিত হওয়া ঐ সব কতিপয় মাশায়েখের বক্তব্য নয় যারা ইমাম সাহেবের দুশো বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন; বরং এসব কতিপয় মাশায়েখ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি থেকে এ মাসআলা বের করেছেন। এখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম সাহেবের বক্তব্যকে ইমাম সাহেবের মূলনীতি থেকে কতিপয় মাশায়েখের تَخْرِيْج -এর ভিত্তিতে সাবেত করেছেন। অর্থাৎ ইমাম সাহেবের বক্তব্যের ভিত্তি স্বয়ং ইমাম সাহেবের বর্ণনাকৃত মূলনীতি। কিন্তু তার تَخْرِيْج কতিপয় মাশায়েখ করেছেন। এ উত্তরের পর আর পূর্বের আপত্তি আপতিত হবে না। –[নাতায়িজুল আফকার]

এখন মূল মাসআলার উপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের সার হলো, ওকালতের ক্ষেত্রে টাকাপয়সা উকিলের কাছে সোপর্দ করার পরে নির্ধারিত হয়ে যায়। এ কারণেই তো যদি মুওয়াক্কিল ওকালতকে স্থূলভাবে বিদ্যমান মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট করে। [অর্থাৎ মুওয়াক্কিল হাতে মুদ্রা নিয়ে উকিলকে দেখিয়ে দেয় এবং তার হাতে সোপর্দ করে দেয়] অথবা ওকালতকে ঋণরূপে উকিলের জিম্মায় বিদ্যমান মুদ্রার সাথে বিশিষ্ট করে। [অর্থাৎ এই বলে যে, যে টাকা তোমার কাছে আমার পাওনা আছে তার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করে দাও।] স্থূলভাবে বিদ্যমান মুদ্রা অথবা ঋণরূপে উকিলের জিম্মায় বিদ্যমান মুদ্রার সাথে ওকালতকে বিশিষ্ট করার পর মুওয়াক্কিল কিংবা উকিল ঐ বস্তুগতভাবে বিদ্যমান মুদ্রা হালাক ও নষ্ট করে ফেলে কিংবা মুওয়াক্কিল উকিলের জিম্মায় সাব্যস্ত ঋণ রহিত করে দেয়, সে ক্ষেত্রে ওকালত বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং টাকা হালকা করার কারণে ওকালতের বাতিল হওয়া এ কথার দলিল যে, ওকালতে টাকা নির্ধারিত হয়। কেননা যদি টাকাপয়সা নির্ধারিত না হতো তাহলে ওকালত বাতিল হতো না; বরং মুওয়াক্কিলের হালাক করার সুরতে মুওয়াক্কিলের উপর অন্য টাকা পরিশোধ করা আবশ্যক হতো এবং উকিলের হালাক করার সুরতে উকিল জিম্মাদার হতো।

যাহোক এ কথা ছাবেত হয়ে গেল যে, উকিলের কাছে সোপর্দ করার পর টাকাপয়সা নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং যখন ওকালতে টাকাপয়সা নির্ধারিত হয়ে যায় তখন কিতাবের মাসআলা মোতাবেক পাওনাদার দেনাদারকে এই আদেশ দেওয়া যে, তোমার কাছে আমার যে পাওনা আছে তার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করে দাও– একথার উদ্দেশ্য হলো, পাওনাদার দেনাদার ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে অর্থাৎ গোলামের মালিককে ঋণের এ টাকার মালিক বানিয়ে দিয়েছে, অথচ পাওনাদার গোলামের মালিককে ঐ ঋণের উপর কবজা করার উকিল নিযুক্ত করেনি।

আর তা ছাড়া পাওনাদার কর্তৃক গোলামের মালিককে পাওনা টাকার মালিক বানানো নাজায়েজ। আর তা এজন্য নাজায়েজ যে, পাওনাদার যে গোলামের মালিককে দোনাদারের জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া টাকার মালিক বানিয়ে দিল সে ঐ পাওনা টাকা গোলামের মালিকের কাছে সোপর্দ করতে সক্ষম নয়। আর ব্যক্তি যে বস্তু সোপর্দ করতে সক্ষম নয় সে বস্তুকে অন্যের মালিকানায় দিতে পারে না। কাজেই পাওনাদার কর্তৃক গোলামের মালিককে পাওনা টাকার মালিক বানানোও জায়েজ হবে না। আর যখন এটা জায়েজ হলো না তখন পাওনাদারের জন্য দেনাদারকে দেনার বদলে গোলাম ক্রয় করার উকিল বানানোও জায়েজ হবে না।

আর যখন এ উকিল নিযুক্তি জায়েজ নয় তখন উকিলের গোলাম ক্রয় করার পরে যদি সেই গোলাম উকিলের কবজায় থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে এ গোলাম উকিলের সম্পদ থেকে মরল বলে ধরা হবে। কেননা উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ না হওয়ার কারণে এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিলের জন্য হয়নি; বরং উকিলের জন্য হয়েছে। আর যখন ক্রয় সম্পাদিত হলো উকিলের জন্য তখন উকিলই লাভ ক্ষতির জিম্মাদার হবে– মুওয়াক্কিল নয়। কিন্তু যখন মুওয়াক্কিল এ গোলামকে কব্জা করবে তখন মুওয়াক্কিল মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা এজন্য নয় যে, উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ; বরং এজন্য যে, যখন উকিল তথা দেনাদার পাওনাদার তথা মুওয়াক্কিলের কাছে গোলাম সোপর্দ করে দিল আর পাওনাদার তা কব্জা করে ফেলল তখন পাওনাদার এবং দেনাদারের মাঝে بَيْع تَعَاطِىْ তথা আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলো আর بَيْع تَعَاطِىْ সম্পন্ন হওয়ার ফলে পাওনাদার ঐ গোলামের মালিক হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ فَاِذَا تَعَيَّنَتْ كَانَ هٰذَا تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِنْ الخ : এটা উপরোল্লিখিত দলিলের تَتِمَّه বা পরিপূরক। সাহেবে হিদায়ার পূর্বের বক্তব্য اَنَّهَا تَتَعَيَّنُ الخ -এর সাথে সম্পৃক্ত।

হিদায়া প্রণেতার বক্তব্যের সারাংশ হলো, ওয়াকালতের ভেতর দিরহাম দিনার নির্ধারিত হয়ে যায়। আর যখন দিরহাম দীনারের নির্ধারিত হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন উল্লিখিত এ উকিল বানানোর অর্থ হলো, পাওনাদার মুওয়াক্কিলের পক্ষ হতে এমন ব্যক্তিকে উকিলের নিকট প্রাপ্য ঋণের মালিক বানানো, যার উপর ঋণ সাব্যস্ত নয়। অথচ তাকে ঐ ঋণ কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয়নি। আর এভাবে মালিক বানানো জায়েজ নয় কেননা সে তা হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ كَمَا إِذَا اشْتَرٰى بِدَيْنٍ عَلٰى غَيْرِ الْمُشْتَرِيْ ; এ ইবারতে হিদায়া প্রণেতা একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অর্পণ করতে অপারগ হলে এ ধরনের تَمْلِيْك বা মালিক বানানো জায়েজ নয়।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, যেমন যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে ক্রয় করে তাহলে তা বৈধ হয় না। হিদায়া প্রণেতার এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দুভাবে হতে পারে। إِذَا اشْتَرٰى-এর যমীরের مَرْجِعْ যদি ক্রেতা হয় তাহলে এক ব্যাখ্যা যেমনটি সাহেবে নেহায়া এবং হিদায়ার অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার অভিমত–

قَالَ فِى النِّهَايَةِ : تَقْدِيْرُهُ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِيْ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلٰى غَيْرِ نَفْسِهِ . اِنْتَهٰى

আর যদি إِذَا اشْتَرٰى-এর যমীরের مَرْجِعْ উকিল হয় যেমনটি বলেছেন সাহেবে غَايَة এবং আল্লামা إِتْقَانِىْ (র.) তাহলে আরেক ব্যাখ্যা হবে– قَالَ الْإِتْقَانِىْ : يَعْنِىْ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ بِدَيْنٍ عَلٰى غَيْرِهِ

নেহায়া প্রণেতার ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাসআলার সুরত এই হবে যে, উদাহরণ– যায়েদ আমরের কাছে কিছু টাকা পায়। তো যায়েদ আমরের কাছে যে টাকা পায় সেই টাকার বিনিময়ে বকরের কাছ থেকে একটা কিতাব ক্রয় করল তো যেন যায়েদ [পাওনাদার] দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে অর্থাৎ বকরকে পাওনার মালিক বানিয়ে দিল। অথচ তাকে ঐ পাওনা টাকা উসুল করার জন্য উকিল বানায়নি। তো এ লেনদেন চুক্তি উপরোল্লিখিত দলিলের কারণে না জায়েজ। নেহায়া প্রণেতার বর্ণনা অনুযায়ী عَلٰى غَيْرِ الْمُشْتَرِيْ এ ইবারত وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ-এর শ্রেণিভুক্ত হবে। অর্থাৎ মূল ইবারত এমন হওয়া উচিত ছিল عَلٰى غَيْرِ نَفْسِهِ কিন্তু عَلٰى غَيْرِ نَفْسِهِ না বলে হিদায়া প্রণেতা عَلٰى غَيْرِ الْمُشْتَرِيْ বলেছেন। উভয় ইবারতের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

صَاحِبِ غَايَة এবং আল্লামা ইতকানী (র.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাসআলার সুরত এই হবে যে, যায়েদ আমরের কাছে কিছু টাকা পায়। তো যায়েদ বকরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্রয়ের উকিল বানিয়ে বলল যে, আমি আমরের কাছে যেই টাকা পাই সেই টাকার বিনিময়ে তুমি আমর ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে একটা কিতাব ক্রয় করে এনে দাও। তো এটা জায়েজ হয় না। কেননা এ সুরতে উকিল এমন পাওনা টাকার বিনিময়ে কিতাব ক্রয় করছে যেই পাওনা ক্রেতা অর্থাৎ উকিল ব্যতীত অন্য কারো জিম্মায় অর্থাৎ আমরের জিম্মায়। আর এ সুরতে এটা লাজেম হয় যে, পাওনাদার অর্থাৎ যায়েদ কর্জের মালিক দেনাদার অর্থাৎ আমর ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থাৎ বকরকে বানিয়ে দিচ্ছে। আর এটা নাজায়েজ যেমনটি উপরে দলিল সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ يَكُوْنُ أَمْرًا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের আলোচনায় হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, মতনের মাসআলায় উল্লিখিত تَوْكِيْل দ্বারা হয়তো تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهِ লাজেম আসে যেটা নাজায়েজ। অথবা এটা লাজেম আসবে যে, পাওনাদার এখনও পাওনা টাকা কবজা করেনি; কিন্তু পাওনাদার দেনাদারকে আদেশ দেয় যে, সে যেন ঋণের টাকাটা গোলামের বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়। অথচ দেনাদারকে পাওনাদারের এই আদেশ দেওয়া যে, সে যেন ঋণের টাকা অমুক বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়– এমন জিনিসের আদেশ দেওয়া, পাওনাদার যার মালিক নয়। এজন্য যে, পাওনাদার কর্জের টাকার মালিক হয় কবজ করার পরে; কবজ করার পূর্বে নয়। আর তার কারণ হলো, কর্জ পরিশোধ করা হয় مِثْل দিয়ে; عَيْن দিয়ে নয়। অর্থাৎ দেনাদার ঠিক সেই টাকাগুলো ফিরিয়ে দেয় না যেগুলো সে কর্জ নিয়েছিল; বরং সেই টাকাগুলির মতো অন্য টাকা দেয়। আর সেই অন্য টাকা যতক্ষণ না পাওনাদার তা কবজ করে ততক্ষণ দেনাদারের মালিকানায় থাকে; পাওনাদারের মালিকানা থাকে না। সুতরাং দেনাদার যে টাকা বিক্রেতাকে দেবে সে টাকাতে দেনাদারের নিজের মালিকানা রয়েছে; পাওনাদার সে টাকার মালিক নয়। সুতরাং মতনের মাসআলায় দেনাদারকে পাওনাদারের এ আদেশ দেওয়া যে, পাওনা টাকার বিনিময়ে একটা গোলাম ক্রয় করে আনো, এখানে মূলত বিক্রেতাকে এমন

টাকা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে যার মালিক স্বয়ং পাওনাদার নয়। অথচ কোনো ব্যক্তির এমন টাকা দেওয়ার আদেশ দেওয়া সে যার মালিক নয় সম্পূর্ণ বাতিল।

যেমন পাওনাদার যদি দেনাদারকে এই বলে যে, আমার যে অর্থ তোমার কাছে পাওনা আছে তা তুমি যাকে চাও দিয়ে দাও। তো পাওনাদারের একথা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা এখানেও এমন মাল দেওয়ার হুকুম করা হয় স্বয়ং আদেশদাতা অর্থাৎ পাওনাদার যে মালের মালিক নয়। যাহোক যখন পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারকে এ আদেশ দেওয়া বাতিল হলো তখন উল্লিখিত উকিল নিযুক্তিও বাতিল হলো। আর যখন উকিল নিযুক্তি বাতিল হলো তখন ক্রয় করা হবে উকিলের নিজের জন্য, মুওয়াক্কিলের জন্য নয়। আর যখন ক্রয় উকিলের জন্য সাব্যস্ত হলো তখন ক্রয়কৃত গোলাম যদি উকিলের কব্জায় মারা যায় আর মুওয়াক্কিল এখনও কবজা না করে থাকে তাহলে এ গোলাম উকিলের মরবে, মুওয়াক্কিলের নয়। কিন্তু যদি উকিল গোলাম মুওয়াক্কিলের কাছে সোপর্দ করে দেয় আর মুওয়াক্কিল সেটা কব্জা করে নেয়, তাহলে গোলাম মুওয়াক্কিলের হবে কিন্তু এজন্য মুওয়াক্কিলের হবে না যে, এ উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ এবং উকিলের ক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত; বরং এজন্য হবে যে, গোলামকে উকিল কর্তৃক সোপর্দ করা এবং তার উপর মুওয়াক্কিলের কবজা করা بَيْع تَعَاطِيْ আর بَيْع تَعَاطِيْ তথা আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি বৈধ এবং মালিকানা সাব্যস্তকারী। কাজেই মুওয়াক্কিল কবজা করার পরে তার মালিক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَيَّنَ الْبَائِعَ الخ : এখান থেকে হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, যদি মুওয়াক্কিল অর্থাৎ পাওনাদার বিক্রেতাকে নির্ধারণ করে দেয় উদাহরণ পাওনাদার দেনাদারকে এই বলে যে, তুমি এ ঋণের বিনিময়ে অমুক থেকে গোলাম ক্রয় করে এনে দাও, তো এ উকিল নিযুক্তি ইমাম সাহেবের মতেও শুদ্ধ এবং মুওয়াক্কিলের জন্য আবশ্যক। চাই মুওয়াক্কিল তা কব্জা করুক অথবা না করুক। কেননা এ সুরতে বিক্রেতা পাওনাদারের পক্ষ থেকে প্রথমে ঋণ কবজা করার উকিল হবে অতঃপর বিক্রেতা হওয়ার কারণে সেটার মালিক হবে। আর যখন এমনই হলো তখন উল্লিখিত দুই খারাবির [تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ এবং أَمْرًا بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ এ দুয়ের] মধ্য থেকে কোনো খারাবি লাজিম আসবে না। আর যখন এ সুরতে দুই খারাবির কোনোটিই হচ্ছে না তখন উকিল নিযুক্তিও শুদ্ধ হবে। আর উকিল নিযুক্তি যখন শুদ্ধ, তখন ক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্য কার্যকর হবে। চাই মুওয়াক্কিল সেটা কবজা করুক বা না করুক।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ : এখান থেকে সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব বর্ণনা করা হচ্ছে। সাহেবাইনের কিয়াস যদিও হিদায়ার মুসান্নেফ উল্লেখ করেননি; কিন্তু যেহেতু তাঁদের পক্ষ থেকে কিয়াস উল্লেখ করা হয় [যেটা এ শরাহতেও উল্লিখিত হয়েছে] সেহেতু মুসান্নেফ (র.) সম্ভাব্য কিয়াসের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। জবাবের সারকথা হলো, যখন পাওনাদার দেনাদারকে একথা বলল যে, আমার যে মাল তোমার কাছে পাওনা আছে তুমি তা গরিবদেরকে সদকা করে দাও তো যেন সে আল্লাহর জন্য সম্পদ নির্ধারণ করল। আর গরিব মিসকিন আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহর নির্ধারিতও তো এটা এমন হয়ে গেল যেন পাওনাদার অর্থাৎ মুওয়াক্কিল বিক্রেতাকে নির্ধারিত করে দেয় আর বিক্রেতাকে নির্ধারিত করে দেওয়ার সুরতে উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ হয় কাজেই সদকা করার জন্য উকিল নিযুক্তিও শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيْلُ الخ : এখান থেকে হিদায়া প্রণেতা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের পরিশিষ্ট বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ যখন দেনাদারকে ঋণের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করে আনার আদেশে উল্লিখিত দুটি খারাবির [أَمْرُ بِصَرْفِ مَا لَا يَمْلِكُهُ এবং تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ] এ দুটির মধ্যে থেকে যে কোনো একটি খারাবি আবশ্যক হয় তখন এ উকিল নিযুক্তি অর্থাৎ পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারকে ঋণের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল বানানো শুদ্ধ হবে না। আর যখন এ উকিল নিযুক্তি শুদ্ধ নয় তখন উকিল অর্থাৎ দেনদারের ক্রয় উকিলের নিজের উপর কার্যকর হবে এবং গোলাম হালাক হওয়ার সুরতে উকিল অর্থাৎ দেনাদারের মাল নষ্ট হবে; মুওয়াক্কিলের নয়। হ্যাঁ, যদি মুওয়াক্কিল অর্থাৎ পাওনাদার ঐ গোলামের উপর উকিল অর্থাৎ দেনাদারের কাছ থেকে কবজ করে নেয় তাহলে এটা দেনাদার ও পাওনাদারের মাঝে بَيْع تَعَاطِيْ তথা আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। আর এ ভিত্তিতে পাওনাদার অর্থাৎ মুওয়াক্কিল এ গোলামের মালিক হবে এবং লাভ ক্ষতির দায়িত্বশীল হবে।

قَالَ : وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اٰخَرَ اَلْفًا وَاَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْاٰمِرُ اِشْتَرَيْتَهَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَقَالَ الْمَامُوْرُ اِشْتَرَيْتُهَا بِاَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُوْرِ وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِيْ اَلْفًا لِاَنَّهُ اَمِيْنٌ فِيْهِ وَقَدِ ادَّعَى الْخُرُوْجَ عَنْ عُهْدَةِ الْاَمَانَةِ وَالْاٰمِرُ يَدَّعِيْ عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ مِائَةٍ وَهُوَ يُنْكِرُ فَاِنْ كَانَتْ تُسَاوِيْ خَمْسَ مِائَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْاٰمِرِ لِاَنَّهُ خَالَفَ حَيْثُ اِشْتَرٰى جَارِيَةً تُسَاوِيْ خَمْسَ مِائَةٍ وَالْاَمْرُ تَنَاوَلَ مَا يُسَاوِيْ اَلْفًا فَيَضْمَنُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করতে আদেশ করে আর সে তা ক্রয় করে; কিন্তু আদেশদাতা বলে যে, তুমি তা পাঁচশ দিয়ে ক্রয় করেছ আর উকিল বলে যে, এক হাজার দিয়ে ক্রয় করেছি, এক্ষেত্রে [কসমসহ] উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, দাসীটি যদি এক হাজার দিরহাম মূল্যের সমান হয়। কেননা এ বিষয়ে সে আমানতদার [অর্থাৎ তার আমানতের উপর বিশ্বাস করা ছাড়া বিকল্প নেই] আর সে আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করছে। পক্ষান্তরে আদেশদাতা তার বিপক্ষে পাঁচশ দিরহামের দায় দাবি করছে, আর উকিল তা অস্বীকার করছে। তবে দাসী যদি পাঁচশ দিরহামের সমমূল্যের হয় তাহলে আদেশদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে পাঁচশ দিরহাম মূল্যের দাসী ক্রয় করে আদেশ লঙ্ঘন করেছে, কারণ আদেশ এক হাজার দিরহামের সমমূল্যের দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সুতরাং সে [পাঁচশ দিরহামের] দায় বহন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اٰخَرَ اَلْفًا الخ : উল্লিখিত মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করতে আদেশ দিল, সেই ব্যক্তি দাসী ক্রয় করল। অতঃপর মুওয়াক্কিল বলল যে, তুমি তো এ দাসী পাঁচশ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছ। আর উকিল বলল যে, না আমি এ দাসী এক হাজার টাকা দিয়েই ক্রয় করেছি। তো এক্ষেত্রে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِيْ اَلْفًا الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, মতনে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ভাষ্যের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন দাসীটি এক হাজার টাকা মূল্যের সমান হয়। অর্থাৎ যদি দাসীটির মূল্য এক হাজার টাকাই হয় আর উকিল বলে যে, আমি এক হাজার টাকা দিয়েই এ দাসী ক্রয় করেছি তাহলে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে সে আমানতদার আর সে আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করছে। আর আমানতের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু আমানতদারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয় সেহেতু এক্ষেত্রেও আমানতদার অর্থাৎ উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া এ মাসআলায় মুওয়াক্কিল উকিলের বিপক্ষে পাঁচশ দিরহামের দায় দাবি করছে, আর উকিল তা অস্বীকার করছে। আর দাবিকারীর পক্ষে প্রমাণ না থাকলে যেহেতু অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় আর এখানেও এমনটি মেনে নেওয়া হয়েছে যে, দাবিকারী বাদী তথা মুওয়াক্কিলের কাছে প্রমাণ অনুপস্থিত সেহেতু অস্বীকারকারী বিবাদী অর্থাৎ উকিলের কথা [কসমসহ] গ্রহণযোগ্য হবে।

কিন্তু যদি উকিলের ক্রয় করা দাসী পাঁচশ টাকা মূল্যমানের হয় এরপর এমন মতানৈক্য হয় যে, মুওয়াক্কিল বলে তুমি পাঁচশ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছ, আর উকিল বলে যে, আমি এক হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। তো এ সুরতে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে একটি দলিল তো এই যে, উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশ লঙ্ঘন করেছে। কেননা মুওয়াক্কিল তাকে আদেশ দিয়েছিল যে, এক হাজার টাকার বিনিময়ে এমন দাসী ক্রয় করবে যার মূল্যমান এক হাজার টাকার সমান। কিন্তু উকিল তার আদেশ লঙ্ঘন করে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এমন একটি দাসী ক্রয় করেছে যার মূল্য পাঁচশ টাকার সমান। সুতরাং উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশ এমনভাবে লঙ্ঘন করেছে যাতে মুওয়াক্কিলের লোকসান বা ক্ষতি। কাজেই উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য দায়ভার বহন করবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যখন উকিল পাঁচশ টাকা মূল্যের দাসী এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করল তখন এই ক্রয় করাটা غَبْن فَاحِش বা অত্যধিক ঠকের সাথে হলো। আর এমন হলে উকিলের নিজের জন্য ক্রয় করা হয়; মুওয়াক্কিলের জন্য নয়। আর যখন এ ক্রয় করা উকিলের জন্য হলো তখন উকিল মুওয়াক্কিলের জন্য দায় বহন করবে।

قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْأَلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ فَلِلْمُخَالَفَةِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلَ فِيْ هٰذَا يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ وَقَدْ وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَمُوْجَبُهُ التَّحَالُفُ ثُمَّ يَفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِيْ جَرٰى بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْمَأْمُوْرَ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি আদেশদাতা তাকে এক হাজার প্রদান না করে থাকে, তাহলে আদেশদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তার বাজার মূল্য পাঁচশ-এর সমান হয়ে থাকে তাহলে তার আদেশের বিরোধিতার কারণে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি এক হাজার দিরহামের সমমূল্যের হয়ে থাকে তাহলে আদেশদাতার বক্তব্য গ্রহণের অর্থ হলো, উভয়কে কসম করতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে মুওয়াক্কিল ও উকিল বিক্রেতা ও ক্রেতার পর্যায়ে নেমে আসবে। [কেননা উভয়ের মাঝে গুণগত বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে।] আর মূল সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। আর তার অনিবার্য ফল হলো পরস্পর কসম করা এবং কসমের পর তাদের মাঝে সংঘটিত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং দাসীটি উকিলের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الخ : পূর্বের মাসআলার দ্বিতীয় সুরত হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে এক হাজার টাকা দেয়নি তথাপি উকিল দাসী ক্রয় করে ফেলল। অতঃপর উভয়ের মাঝে মতানৈক্য হলো। সুতরাং মুওয়াক্কিল বলল যে, তুমি এ দাসী পাঁচশ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছ। আর উকিল বলল, আমি এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি। তখন মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। চাই দাসীর মূল্য পাঁচশ টাকা হোক, চাই এক হাজার টাকা হোক। যদি দাসীর মূল্য পাঁচশ টাকা হয় তাহলে মুওয়াক্কিলের কথা এজন্য গ্রহণযোগ্য হবে যে, উকিলের পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা পাওয়া গেছে। কেননা মুওয়াক্কিল এক হাজার টাকার বিনিময়ে এমন দাসী ক্রয় করার আদেশ দিয়েছিল যার মূল্যমান এক হাজার টাকা। আর সে এমন দাসী ক্রয় করেছে যার মূল্য পাঁচশ টাকা। তাছাড়া غَبْن فَاحِش তথা অত্যধিক বেশি মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। কাজেই এই ক্রয় করাটা উকিলের নিজের জন্য কার্যকর হবে; মুওয়াক্কিলের জন্য নয় এবং মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا الخ : আর যদি দাসীর মূল্যমান এবং বাজারদর এক হাজার টাকা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, মুওয়াক্কিল এবং উকিল উভয়েই শপথ করবে। কেননা উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে গুণগত বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তারা বিক্রেতা ও ক্রেতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। এভাবে যে, উকিল মুওয়াক্কিলকে পণ্য দেয় আর মুওয়াক্কিল উকিলকে মূল্য দেয়। কাজেই মুওয়াক্কিল এবং উকিল উভয়েই ক্রেতা বিক্রেতার মতো হবে এবং উভয়ের মাঝে মূল্য নিয়ে মতানৈক্য হবে যে, মুওয়াক্কিল অর্থাৎ ক্রেতা বলছে যে, দাসীর মূল্য পাঁচশ টাকা আর উকিল অর্থাৎ বিক্রেতা বলছে যে, দাসীর মূল্য এক হাজার টাকা। আর ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে মতানৈক্য হলে বিধান হলো সেখানে উভয় থেকেই শপথ নেওয়া হবে। যদি উভয়েই শপথ করে তাহলে ঐ চুক্তিতে فَسْخ করে দেওয়া হবে। সুতরাং এখানেও মুওয়াক্কিল এবং উকিল যদি উভয়েই শপথ করে তাহলে ঐ গুণগত বিনিময় চুক্তি যা উভয়ের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে সেটাকে فَسْخ করে দেওয়া হবে। আর যখন মুওয়াক্কিল ও উকিলের মাঝে গুণগত বিনিময় চুক্তি ফসখ হয়ে গেল তখন ঐ দাসী উকিলের হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেটার মালিক হবে উকিল, মুওয়াক্কিল মালিক হবে না। সুতরাং ফলাফলের দিকে তাকালে এ সুরতেও মুওয়াক্কিলের কথাই গ্রহণযোগ্য হলো।

قَالَ : وَلَوْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ هٰذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْاٰمِرُ اِشْتَرَيْتَهُ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَقَالَ الْمَامُوْرُ بِاَلْفٍ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَامُوْرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُوْرِ مَعَ يَمِيْنِهِ قِيْلَ لَا تَحَالُفَ هٰهُنَا لِاَنَّهُ اِرْتَفَعَ الْخِلَافُ بِتَصْدِيْقِ الْبَائِعِ اِذْ هُوَ حَاضِرٌ وَفِى الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى هُوَ غَائِبٌ فَاعْتُبِرَ الْاِخْتِلَافُ وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ ذُكِرَ مُعْظَمُ يَمِيْنِ التَّحَالُفِ وَهُوَ يَمِيْنُ الْبَائِعِ وَالْبَائِعُ بَعْدَ اِسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ اَجْنَبِىٌّ عَنْهُمَا وَقَبْلَهُ اَجْنَبِىٌّ عَنِ الْمُوَكِّلِ اِذْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَبَقِىَ الْخِلَافُ وَهٰذَا قَوْلُ الْاِمَامِ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ اَظْهَرُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি তাকে এ [নির্ধারিত] গোলামটি তার জন্য ক্রয় করতে বলে, আর কোনো মূল্য বেঁধে না দেয়, আর সে গোলামটি ক্রয় করে। এরপর আদেশদাতা বলে যে, পাঁচশ দিরহামে ক্রয় করেছ, আর উকিল এক হাজার দিরহামের কথা বলে আর বিক্রেতা উকিলকে সত্যায়িত করে। তাহলে কসমসহ উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারো কারো মতে, এখানে পরস্পর কসমের বিধান নেই। কেননা বিক্রেতা উপস্থিত থাকার কারণে তার সত্যায়নের দ্বারা মতপার্থক্য নাকচ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলায় বিক্রেতা অনুপস্থিত ছিল, তাই মতপার্থক্য বিবেচ্য হয়েছে। আর কোনো কোনো মতে আমাদের উল্লেখকৃত কারণে পরস্পরকে কসম করতে হবে। আর [বস্তুত উকিলের কসমের কথা বলে] তারপর কসমের মূল অংশটা উল্লেখ করা হয়ে গেছে। আর তা হলো বিক্রেতার কসম। আর [উকিলের কাছ থেকে] বিক্রেতা মূল্য উসুল করে নেওয়ার পর তাদের দুজনের বিষয়ে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে মূল্য উসুল করার পূর্বে মুওয়াক্কিলের বিষয়ে অপরিচিত ছিল। কেননা তাদের দুজনের মাঝে তো বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে তার সত্যায়ন গ্রহণ করা হবে না। ফলে মতপার্থক্য বহাল থাকবে। এটা হলো ইমাম আবূ মানসূর (র.)-এর অভিমত। আর [যুক্তির বিচারে] এটাই অধিকতর প্রকাশিত। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ لَهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, মুওয়াক্কিল উকিলকে একটি নির্ধারিত গোলাম ক্রয় করার আদেশ দিল কিন্তু সেই গোলামের মূল্য বর্ণনা করল না, তখন উকিল সেই গোলামটি ক্রয় করল। এরপর মুওয়াক্কিল এবং উকিলের মাঝে মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে মতানৈক্য হলো। সুতরাং মুওয়াক্কিল উকিলকে বলল, তুমি এ গোলাম পাঁচশ টাকায় ক্রয় করেছ। আর উকিল বলল যে, না এমন নয়; বরং আমি এ গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি। আর গোলাম বিক্রেতাও উকিলের কথা সমর্থন করে তাহলে উকিলের কথা [কসমসহ] গ্রহণযোগ্য হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, কারো কারো মতে, যেমন ফকীহ আবূ জা'ফর হিন্দাওয়ানীর অভিমত হলো, এ মাসআলায় পরস্পর কসমের বিধান নেই। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল এবং উকিল উভয় থেকেই শপথ গ্রহণ করে তাদের মাঝে সম্পাদিত গুণগত চুক্তিকে রহিত করা হবে না। যেমনটি হয়েছিল পূর্বের মাসআলায়। সেখানে পরস্পর শপথ করার পর চুক্তি রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এ মতের দলিল হলো– গোলামের বিক্রেতা উকিলের কথা সত্যায়ন করেছে। আর মাসআলায় বিক্রেতা যেহেতু উপস্থিত তাই তার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে। আর যখন বিক্রেতার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হলো তখন তার সত্যায়নের কারণে মুওয়াক্কিল ও উকিলের মাঝে বিদ্যমান মতানৈক্য দূর হয়ে যাবে। সুতরাং যখন মতানৈক্য দূর হয়ে গেল তখন গোলামের বিক্রেতা এবং উকিল উভয়ের মূল্যের পরিমাণ অর্থাৎ এক হাজার টাকার উপর ঐকমত্য পৌছা নতুন করে চুক্তি সম্পাদনের পর্যায়ে হবে। অর্থাৎ এমন হবে যেন গোলামের বিক্রেতা এবং উকিলের মাঝে এই এখন এক হাজার টাকার বিনিময়ে নতুন করে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলো। আর যদি গোলামের বিক্রেতা এবং উকিলের মাঝে এক হাজার টাকার বিনিময়ে নতুন করে চুক্তি হতো সে ক্ষেত্রে তো এ বিক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হতো। সুতরাং তদ্রূপ এখানেও মতানৈক্যের সুরতে উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং গোলামের বিক্রয় মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক ও কার্যকর হবে।

আর পূর্বের মাসআলায় যেহেতু বিক্রেতা বিদ্যমান ছিল না তাই তার সত্যায়নের প্রশ্নই ছিল না। আর যখন বিক্রেতার পক্ষ থেকে উকিলের কথার সত্যায়ন পাওয়া গেল না তখন উকিল এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং পরস্পর শপথ করা ওয়াজিব হবে। কেননা মূল্যের ব্যাপারে মতানৈক্য হলে বিধান এটাই যে, উভয় থেকে শপথ গ্রহণ করে চুক্তি রহিত করে দেওয়া হবে। তার বিস্তারিত বিবরণ যেমন উল্লিখিত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ যেমন শায়খ আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) বলেন যে, পূর্বের মাসআলার মতো এ মাসআলাতেও পরস্পর শপথ ওয়াজিব হবে। দলিল পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, উকিল এবং মুওয়াক্কিল উভয়েই ক্রেতা এবং বিক্রেতার পর্যায়ে। আর উভয়ের মাঝে মূল্যের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য হলে তার বিধান পরস্পর শপথ। কাজেই এ মাসআলাতেও উকিল এবং মুওয়াক্কিল উভয় থেকে শপথ গ্রহণ করে তাদের মাঝে সম্পাদিত গুণগত বিক্রয় চুক্তিকে রহিত করে দেওয়া হবে। আর এ রহিতকরণের ফল এই হবে যে, ক্রয়কৃত বস্তু মুওয়াক্কিলের হবে না; বরং উকিলের হবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذُكِرَ مُعْظَمُ يَمِيْنِ التَّحَالُفِ الخ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : হলো, জামিউস সাগীরের ভাষ্য وَلَوْ اَمَرَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ هٰذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا الخ এ ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, উকিলের কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। আর শায়খ আবূ মানসূর (র.) বললেন যে, পরস্পর শপথ ওয়াজিব হবে। অথচ পরস্পর শপথ গ্রহণ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্পষ্ট বর্ণনার বিরোধী। এজন্য যে, পরস্পর শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে উকিল এবং মুওয়াক্কিল উভয় থেকে শপথ গ্রহণ করে তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিকে রহিত করা হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উকিল থেকে শপথ গ্রহণ করে তার কথা গ্রহণযোগ্য ধরা হবে।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হলো, উল্লিখিত মাসআলায় উকিল বিক্রেতার পর্যায়ে এবং মুওয়াক্কিল ক্রেতার পর্যায়ে। আর পরস্পর শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে যদিও ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের উপর শপথ ওয়াজিব হয় কিন্তু বিক্রেতার শপথ সেখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিক্রেতার শপথটাই প্রধান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতা বাদী হয় আর ক্রেতা হয় বিবাদী। আর বাদীর উপর শুধু পরস্পর শপথ গ্রহণের সুরতে শপথ ওয়াজিব হয়। অন্য ক্ষেত্রে তার উপর শপথ ওয়াজিব হয় না। আর বিবাদীর উপর তো সর্বাবস্থায় শপথ ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ পরস্পর শপথ গ্রহণের সুরতেও এবং

পরস্পর শপথ গ্রহণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও। যাহোক বিক্রেতা অর্থাৎ উকিলের শপথ পরস্পর শপথ গ্রহণের সাথে বিশেষিত। আর যখন উকিলের শপথ تَحَالُفْ তথা পরস্পর শপথ গ্রহণের সাথে খাস হলো তখন তার শপথ মুওয়াক্কিলের শপথের মোকাবিলায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। সুতরাং যখন উকিল তথা বাদীর উপর শপথ ওয়াজিব হলো তখন মুওয়াক্কিল তথা বিবাদীর উপর তো শপথ ওয়াজিব হবেই।

সারকথা হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রধান শপথ অর্থাৎ উকিল তথা বিক্রেতার শপথের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন এবং একথার দিকে ইশারা করেছেন যে, যখন উকিল [যে বাদী] তার উপর শপথ ওয়াজিব হলো তখন মুওয়াক্কিল [যে বিবাদী] তার উপর তো শপথ ওয়াজিব হবেই। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) যদিও শুধু উকিলের শপথের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানে মুওয়াক্কিলের শপথও উদ্দেশ্য। আর যখন উভয় শপথ উদ্দেশ্য হলো তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উল্লিখিত ভাষ্য এবং শায়খ আবূ মানসূর মাতুরীদীর অভিমতের মাঝে কোনো পরস্পর বিরোধিতা হবে না।

কিন্তু এ উত্তরের উপরও আপত্তি আছে। আর তা হলো হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ভাষ্য فَالْقَوْلُ الْمَأْمُوْرِ مَعَ يَمِيْنِهٖ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, উকিল যা কিছু বলেছে যে, আমি এক হাজার টাকায় ক্রয় করেছি সে ব্যাপারে উকিলকে সত্যায়ন করা হবে। অথচ تَحَالُفْ তথা পরস্পর শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে কারো কথার সত্যায়ন করা হয় না; বরং চুক্তিকে রহিত করে দেওয়া হয়। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উদ্দেশ্য যদি تَحَالُفْ বা পরস্পর শপথ গ্রহণ হতো তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُوْرِ مَعَ يَمِيْنِهٖ বলতেন না। সারকথা হলো, শায়খ আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) -এর تَحَالُفْ বা পরস্পর শপথ গ্রহণের অভিমত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী।

قَوْلُهٗ وَالْبَائِعُ بَعْدَ اِسْتِيْفَاءِ الخ : এখান থেকে হিদায়া প্রণেতা শায়খ আবূ মানসূর মাতুরীদীর পক্ষ থেকে প্রথম অভিমতের দলিল لِاَنَّهٗ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ بِتَصْدِيْقِ الْبَائِعِ-এর জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারকথা হলো, গোলামের বিক্রেতা মূল্য উসুল করার পর মুওয়াক্কিল এবং উকিল উভয়ের বিষয়ে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত হয়ে গেছে। আর মূল্য উসুল করার পূর্বে মুওয়াক্কিলের বিষয়ে অপরিচিত ছিল। কেননা বিক্রেতা এবং মুওয়াক্কিলের মাঝে কোনো চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। মোটকথা, বিক্রেতা উভয় সুরতে মুওয়াক্কিলের বিষয়ে অপরিচিত। আর যখন বিক্রেতা মুওয়াক্কিলের বিষয়ে অপরিচিত তখন বিক্রেতার কথা মুওয়াক্কিলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা সত্যায়ন করা হবে না। আর যখন বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হলো না এবং তা সত্যায়নও করা হলো না তখন মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে মুওয়াক্কিল এবং উকিলের মাঝে মতানৈক্য বাকি থাকল। আর যখন মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য থেকে গেল তখন তাদের উভয়ের মাঝে تَحَالُفْ বা পরস্পর শপথ গ্রহণ আবশ্যক হবে এবং তাদের উভয়ের মাঝে সম্পন্ন হওয়া গুণগত চুক্তি রহিত করে দেওয়া হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فَصْلٌ فِى التَّوْكِيْلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

قَالَ : وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ إِشْتَرِ لِىْ نَفْسِىْ مِنْ مَوْلَاىَ بِأَلْفٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلٰى إِشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهٖ فَبَاعَهُ عَلٰى هٰذَا فَهُوَ حُرٌّ وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلٰى لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إِعْتَاقٌ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قُبُوْلُ الْإِعْتَاقِ بِبَدْلٍ وَالْمَأْمُوْرُ سَفِيْرٌ عَنْهُ إِذْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُوْقُ فَصَارَ كَأَنَّهُ إِشْتَرٰى بِنَفْسِهٖ وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا أَعْقَبَ الْوَلَاءَ .

অনুচ্ছেদ : গোলাম কর্তৃক আপন সত্তা ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্তকরণ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলাম যদি কোনো ব্যক্তিকে বলে যে, আমার মনিবের কাছ থেকে আমার অনুকূলে আমার সত্তাকে এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয় কর। অতঃপর সে তাকে এক হাজার প্রদান করল। এখন লোকটি যদি মনিবকে বলে থাকে যে, আমি গোলামটিকে তার নিজের জন্য ক্রয় করলাম। আর মনিব এ কথার উপর তাকে বিক্রি করে তাহলে গোলাম আজাদ বলে গণ্য হবে এবং ওয়ালা সম্পর্ক মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। কেননা মনিবের পক্ষ থেকে [গোলামের অনুকূলে] গোলামের দাস সত্তাকে বিক্রি করার অর্থ হলো আজাদ করা। আর গোলামের নিজের দাস সত্তা ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ বিনিময়ের ভিত্তিতে মুক্তিদানকে গ্রহণ করা আর আদিষ্ট ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বার্তাবহনকারী দূত মাত্র। কেননা চুক্তির হক ও দায়সমূহ তার উপর আরোপিত হয় না। সুতরাং এমনই হলো যেন গোলাম নিজে ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করেছে। আর এটা যখন মুক্তিদান বলে সাব্যস্ত হলো তখন তার ফলশ্রুতিরূপে 'ওয়ালা সম্পর্ক' সাব্যস্ত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَوْكِيْلٌ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ-এর দুই সুরত। এভাবে যে, اَلتَّوْكِيْلُ-এর اَلِفْ لَامْ মুযাফ ইলাইহি-এর পরিবর্তে আর تَوْكِيْلٌ মাসদার মুযাফ সুতরাং এক সুরত তো হলো, تَوْكِيْلٌ মাসদার فَاعِلْ-এর দিকে মুযাফ হবে আর মূল ইবারত এমন ধরা হবে– تَوْكِيْلُ الْعَبْدِ رَجُلًا لِيَشْتَرِ مِنْ مَوْلَاهُ অর্থাৎ 'গোলাম কাউকে এ মর্মে উকিল নিযুক্ত করবে যে, সে ঐ গোলামকে তার মনিব থেকে খরিদ করবে।' এ অনুচ্ছেদের প্রথম মাসআলা এটিই।

দ্বিতীয় সুরত হলো, تَوْكِيْلٌ মাসদার مَفْعُوْلٌ-এর দিকে মুযাফ হবে আর মূল ইবারত এমন ধরা হবে– فَصْلٌ فِىْ تَوْكِيْلِ الْعَبْدِ رَجُلٌ অথবা تَوْكِيْلُ رَجُلٍ الْعَبْدَ যার ব্যাখ্যা হলো, কেউ কোনো গোলামকে বলল যে, তুমি আমার অনুকূলে তোমার দেহ সত্তাকে তোমার মনিবের নিকট থেকে ক্রয় কর। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় মাসআলাটি এই।

প্রথম মাসআলায় গোলাম মুওয়াক্কিল আর দ্বিতীয় মাসআলায় গোলম উকিল। আর মুসান্নেফের ইবারত উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ : وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ الخ : মাসআলার সুরত হলো, একটি গোলাম কোনো ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি আমাকে আমার জন্য আমার মনিবের কাছ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় কর। এই বলে গোলাম ঐ ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা প্রদান করল। এখন লোকটি যদি মনিবকে বলে থাকে যে, আমি এ গোলামটি এ গোলামের জন্যই ক্রয় করলাম। আর মনিব একথার উপর তাকে বিক্রি করে। তাহলে এ গোলাম আজাদ বলে গণ্য হবে এবং এ গোলামের ওয়ালা সম্পর্ক মনিবের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা মনিবের পক্ষ থেকে গোলামের অনুকূলে গোলামের দাসসত্তাকে বিক্রি করার অর্থ হলো তাকে মালের বিনিময়ে আজাদ করা। অর্থাৎ যখন মনিব নিজের গোলামকে বলে যে, আমি তোমার কাছে তোমার সত্তাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম তখন এর উদ্দেশ্য হয় এই যে, আমি তোমাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আজাদ করে দিলাম। যাহোক মনিবের পক্ষ থেকে এ বিক্রয় إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ-এর নামান্তর। আর إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ তথা মালের বিনিময়ে আজাদ করা গোলামের কবুল করার মওকুফ হয়। কিন্তু যখন গোলাম নিজের সত্তাকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করল তখন এ ক্রয় করাটা গোলামের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আজাদি কবুল করার নামান্তর। বাকি থাকল আদিষ্ট ব্যক্তি। সে গোলামের পক্ষ থেকে বার্তাবহনকারী দূত মাত্র। এ কারণেই তো এ চুক্তির হক ও দায়সমূহ তার উপর আরোপিত হয় না। তার কারণ হলো, উকিল চুক্তিটিকে নিজের মুওয়াক্কিল তথা গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং যখন উকিল চুক্তিটিকে মুওয়াক্কিল অর্থাৎ গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করল তখন সে নিজেই নিজেকে বার্তাবাহক বা দূত সাব্যস্ত করল। আর যখন এমনই হলো তখন যেন গোলাম নিজেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজেই ক্রয় করল। যাহোক যখন মনিব কর্তৃক গোলামকে গোলামের নিজের হাতে বিক্রি করা আজাদ করার নামান্তর হলো তখন এ আজাদ করার পর ওয়ালার সম্পর্ক মনিবের জন্যই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ সুরতে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে এবং তার ওয়ালার সম্পর্ক তার মনিবের জন্য সাব্যস্ত হবে।

وَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْمَوْلٰى فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِىْ لِاَنَّ اللَّفْظَ حَقِيْقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَاَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا اِذَا لَمْ يُبَيِّنْ فَيُحَافَظُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ شِرَى الْعَبْدِ نَفْسَهُ لِاَنَّ الْمَجَازَ فِيْهِ مُتَعَيَّنٌ وَاِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ وَالْاَلْفُ لِلْمَوْلٰى لِاَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِىْ اَلْفٌ مِثْلُهُ ثَمَنًا لِلْعَبْدِ فَاِنَّهُ فِىْ ذِمَّتِهِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ الْاَدَاءُ بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِشِرَى الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ لِاَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَالِكَ عَلٰى نَمَطٍ وَاحِدٍ وَفِى الْحَالَيْنِ الْمُطَالَبَةُ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ الْعَاقِدِ اَمَّا هٰهُنَا فَاَحَدُهُمَا اِعْتَاقٌ مُعَقِّبٌ لِلْوَلَاءِ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيْلِ وَالْمَوْلٰى عَسَاهُ لَا يَرْضَاهُ وَيَرْغَبُ فِى الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَلَابُدَّ مِنَ الْبَيَانِ ـ

অনুবাদ : আর যদি লোকটি মনিবের কাছে বিষয়টি বর্ণনা না করে, তাহলে সে ক্রেতার গোলাম হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে ক্রয় শব্দটি বিনিময়ের জন্য তৈরি হয়েছে। আর উদ্দিষ্ট অর্থ বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে শব্দটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং বিনিময়ের প্রকৃত অর্থকে রক্ষা করা হবে। পক্ষান্তরে গোলামের নিজের আপন সত্তা ক্রয় করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থটি নির্ধারিত। সুতরাং এ ক্রয় যখন বিনিময় অর্থে গৃহীত হবে তখন ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর [উকিলের কাছে গোলামের প্রদত্ত] এক হাজার দিরহাম মনিবের প্রাপ্য হবে। কেননা সেটা তার গোলামের উপার্জিত অর্থ। আর ক্রেতার উপর অনুরূপ এক হাজার দিরহাম গোলামের মূল্য রূপে অবশ্য সাব্যস্ত হবে। কেননা উক্ত পরিশোধ যখন গ্রহণযোগ্য হয়নি তখন ক্রেতার জিম্মায় মূল্যের দায় বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে গোলাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে উক্ত গোলামকে ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিলের বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ সেখানকার জন্য ক্রয় করা হচ্ছে তা বর্ণনা করার শর্ত নেই। কেননা [উকিলের জন্য এবং মুওয়াক্কিলের জন্য সাব্যস্ত] উভয় চুক্তি একই সুরতে [অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সুরতে] সম্পন্ন হচ্ছে এবং উভয় ক্ষেত্রে মূল্যের তাগাদা চুক্তিকারীর অভিমুখী হবে। পক্ষান্তরে এখানে [অর্থাৎ গোলামের পক্ষ হতে উকিল নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে] একটি ক্রয় হচ্ছে মুক্তিদানের সমার্থক, যা ওয়ালা সম্পর্ক সাব্যস্ত করে। সে ক্ষেত্রে মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হয় না। আর এক্ষেত্রে হতে পারে যে, মনিব মুক্তিদানে সম্মত নয়; বরং সে নিছক বিনিময়ের প্রতি আগ্রহী হবে। সুতরাং বিষয়টি বর্ণনা করা অপরিহার্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْمَوْلٰى فَهُوَ الخ : পূর্বোল্লিখিত মাসআলার দ্বিতীয় সুরত হলো, যদি উকিল গোলামকে তার মনিব থেকে ক্রয় করে কিন্তু মনিবকে একথা না বলে যে, আমি এ গোলামকে তার নিজের জন্যই ক্রয় করছি; বরং শুধু বলে যে, আমি তোমার এ গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করছি, তাহলে এ সুরতে এ গোলাম ক্রেতা তথা উকিলের মালিকানা হবে এবং ঐ এক হাজার টাকা যা গোলাম তার উকিলকে দিয়েছিল মনিবের হবে এবং অনুরূপ অন্য এক হাজার টাকা অর্থাৎ গোলামের মূল্য ক্রেতা তথা উকিলের উপর ওয়াজিব হবে।

এই পুরো ভাষ্যের প্রথম অংশ অর্থাৎ 'গোলাম ক্রেতার মালিকানা হওয়া এর দলিল হলো, উকিলের কথা– اِشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ بِاَلْفٍ 'আমি তোমার গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি' এ বাক্যটি প্রকৃত অর্থে বিনিময়ের জন্য তৈরি হয়েছে।

অর্থাৎ إِشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ بِأَلْفٍ বিনিময় চুক্তির জন্য তৈরি হয়েছে, গোলাম আজাদ করার জন্য এ বাক্য ব্যবহৃত হয় না। আর একটা মূলনীতি সর্বজন স্বীকৃত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দের মূল অর্থের উপর আমল করা সম্ভব হয়, মূল অর্থের উপরই আমল করা ওয়াজিব হয়, مَجَازٌ বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হয় না। আর এখানে যেহেতু উকিল একথা বলেনি যে, আমি তোমার এ গোলাম স্বয়ং গোলামের অনুকূলে ক্রয় করছি সেহেতু উকিলের বক্তব্য إِشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ بِأَلْفٍ-এর মূল অর্থের উপর আমল করা সম্ভব। আর যখন এ কথার মূল অর্থের উপর আমল করা সম্ভব হলো তখন তার মূল অর্থের [অর্থাৎ বিনিময়ের] দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে। আর যখন উকিলের উল্লিখিত ক্রয় করা বিনিময় হলো এবং বিনিময়ের উপর আমল করা হলো তখন ঐ গোলামের উপর উকিলের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। উকিলই ঐ গোলামের মালিক হবে। কেননা এ বিনিময় চুক্তি উকিল এবং গোলামের বিক্রেতার মাঝেই সম্পন্ন হয়েছে। আর এ বিনিময় চুক্তিতে উকিল যেহেতু ক্রেতা, আর ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় সেহেতু উকিল পণ্য অর্থাৎ গোলামের মালিক হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَى الْعَبْدِ الخ : এর বিপরীত যদি গোলাম নিজের মনিবের কাছ থেকে নিজের সত্তাকে ক্রয় করে তো এ সুরতে যেহেতু মূল অর্থের উপর আমল করা অসম্ভব হয় এজন্য এটাকে مَجَازٌ তথা রূপক অর্থ অর্থাৎ আজাদ করার অর্থে গ্রহণ করতে হবে। আর এখানে মূল অর্থ গ্রহণ এজন্য অসম্ভব যে, গোলাম কোনো মালের মালিক হওয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং গোলামের নিজের সত্তাকে ক্রয় করা মালের মালিক না হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়। তাই রূপক অর্থে আজাদ করার অর্থ উদ্দেশিত হবে। অথবা এজন্য যে, গোলাম নিজে নিজের কাছে মাল হয় না, আর যখন গোলাম নিজের কাছে মাল হলো না তখন সে নিজের সত্তার মালিকও হতে পারে না। আর তার কারণ হচ্ছে, গোলাম নিজের কাছে মানুষ। এ কারণেই তো তার উপর হদ এবং কেসাস ওয়াজিব হয়। আর মাল মানুষের غَيْر হয়। যেটাকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যখন গোলাম নিজের কাছে মাল নয় তখন তার নিজের সত্তাকে ক্রয় করা বিনিময় হতে পারে না। আর যখন বিনিময় হতে পারে না তখন বিনিময়ের অর্থের উপর আমল করাও সম্ভব হবে না। আর যখন বিনিময় অর্থাৎ মূল অর্থের উপর আমল করা সম্ভব নয় তখন এ ক্রয়কে রূপক অর্থে সম্পদের শর্তে আজাদ করা তথা إِعْتَاقٌ عَلَى مَالٍ বলে ধরা হবে। আর এই দুই অর্থের পারস্পরিক যোগসূত্র এই যে, বিনিময় চুক্তি অর্থাৎ বিক্রয় এবং আজাদ করা উভয়টি মালিকানা শেষ করে দেয়। শুধু এ পার্থক্য যে, বিক্রয় মালিকানা দূর করে দেয় কিন্তু বিনিময়ের সাথে, আর আজাদ করা মালিকানা দূর করে দেয় কিন্তু তাতে বিনিময় জরুরি নয়।

আর দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, বিক্রয় বিক্রেতার মালিকানা দূর করে দেয় কিন্তু ক্রেতাকে মালিক বানিয়ে দেয়। আর আজাদ করা মনিবের মালিকানা শেষ করে দেয়। যাহোক সারকথা এই হলো যে, যদি গোলাম নিজে নিজের সত্তা ক্রয় করে তাহলে এটা রূপক অর্থে আজাদ করা হবে। আর যদি উকিল গোলামকে তার মনিবের কাছ থেকে ক্রয় করে একথা না বলে যে, আমি এ গোলাম খোদ গোলামের জন্য ক্রয় করছি তাহলে এটা বিনিময় চুক্তি হবে। অর্থাৎ উকিল [ক্রেতা] ঐ গোলামের মালিক হবে।

হিদায়া প্রণেতার বক্তব্য وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا-এর উপর একটি আপত্তি আছে আর তা হচ্ছে, আপনার এ কথা বলা যে, যদি উকিল إِشْتَرَيْتُ عَبْدَكَ بِأَلْفٍ বলে, আর একথা না বলে যে, আমি এ গোলামটি এ গোলামের অনুকূলে ক্রয় করছি, তবে এ সুরতে حَقِيْقَتْ তথা মূল অর্থের উপর আমল করা সম্ভব। আমরা একথা মানি না। কেননা গোলাম নিজের মনিবের কাছ থেকে নিজের সত্তাকে ক্রয় করার উকিল করেছে। আর নিজের সত্তাকে ক্রয় করার জন্য উকিল করার অর্থ হলো, নির্ধারিত গোলাম ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করা। আর যখন মুওয়াক্কিল নির্ধারিত গোলাম অথবা অন্য যে কোনো নির্ধারিত বস্তু ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তখন উকিল ঐ নির্ধারিত বস্তুটিকে নিজের জন্য ক্রয় করার অনুমতি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এখানেও উকিল ঐ নির্ধারিত গোলামকে নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। আর যখন উকিল ঐ গোলামকে নিজের জন্য ক্রয় করার অনুমতি প্রাপ্ত নয় তখন ঐ গোলামকে ক্রয় করা হবে স্বয়ং ঐ গোলামের জন্যই। আর যখন ঐ গোলামকে ক্রয় করা সেই গোলামের জন্যই হলো তখন এ চুক্তি বিনিময় চুক্তি হতে পারে না। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এখানে حَقِيْقَتْ অর্থাৎ বিনিময়ের অর্থের উপর আমল করা সম্ভব নয়।

উল্লিখিত আপত্তির উত্তর হলো, মুওয়াক্কিল অর্থাৎ গোলাম উকিলকে যে কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিল, উকিল সেই মোতাবেক কাজ করেনি বরং অন্য কাজ করেছে। এজন্য যে, গোলাম উকিলকে একথা বলেছিল– তুমি আমাকে আমার অনুকূলে আমার মনিবের কাছ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় কর। আর এটা তো إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ -এর সমপর্যায় ভুক্ত। যেমন পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু যখন উকিল মনিবের সামনে শুধু এই বলল যে, আমি তোমার গোলাম এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি আর একথা বলল না যে, ঐ গোলামের জন্যই ক্রয় করছি তাহলে এটা শুধু ক্রয় করাই হলো। অর্থাৎ উকিল বানানো হয়েছিল إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ-এর, আর সে তা না করে ক্রয় করে ফেলেছে। এ কাজ মুওয়াক্কিলের [গোলামের] আদেশের পরিপন্থি হলো। আর উকিল যখন মুআক্কিলের আদেশের বিপরীত কাজ করে তখন সেই কাজকে উকিলের উপর কার্যকর করা হয়; মুওয়াক্কিলের উপর নয়। সুতরাং যখন গোলামকে ক্রয় করার এ কাজ উকিলের উপর কার্যকর করা হলো তখন উকিল ঐ গোলামের মালিক হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় অংশ [যে এক হাজার টাকা গোলাম তার উকিলকে দিয়েছিল সেটা মনিবের হবে] -এর দলিল হলো, এ এক হাজার টাকা মনিবের গোলামের অর্জন। আর গোলামের সমস্ত অর্জন মনিবের হয়। কাজেই এ এক হাজার টাকাও মনিবেরই হবে।

আর তৃতীয় অংশের দলিল অর্থাৎ এ কথার দলিল যে, ক্রেতা তথা উকিলের উপর অন্য এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। এ বক্তব্যের দলিল হলো, ক্রেতার জিম্মায় মূল্য ওয়াজিব। আর ক্রেতা যে এক হাজার টাকা মনিবকে দিয়েছে তা যেহেতু তার গোলামের কামাই করা আর গোলামের কামাই মনিবের মালিকানা হয় সেহেতু এ এক হাজার টাকা গোলামের মূল্য ধরা হবে না এবং মূল্য হিসেবে এটা পরিশোধ করা শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যখন ক্রেতা [উকিলের] উপর মূল্য ওয়াজিব আর যে এক হাজার টাকা ক্রেতা মনিবকে দিয়েছে সেটাকে মূল্য রূপে পরিশোধ সঠিক নয়, তখন ক্রেতার উপর অনুরূপ অন্য এক হাজার টাকা গোলামের মূল্য হিসেবে ওয়াজিব হবে।

نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ এবং عِنَايَة এবং كِفَايَة প্রণেতাগণ বলেছেন যে, অন্য এক হাজার টাকা ক্রেতার উপর ওয়াজিব হওয়া ঐ সুরতে তো স্পষ্ট যখন ক্রয় করাটা ক্রেতার জন্য হয়। কিন্তু ক্রয় করা যখন গোলামের জন্য হয় এমনকি গোলাম আজাদ হয়ে যায় তখন সেই সুরতেও কি গোলামের উপর অন্য এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে?

জামিউস সাগীর কিতাবে قَاضِى خَانْ (র.) বলেন, এ কথা যদিও কিতাবে নেই কিন্তু সঙ্গত এটাই যে, গোলামের উপর অন্য এক হাজার টাকা মনিবের জন্য ওয়াজিব হবে। কেননা যে এক হাজার টাকা গোলাম নিজের উকিলকে আর উকিল গোলামের মনিবকে দিয়েছিল তা তো মনিবের গোলামের কামাই হওয়ার কারণে পূর্ব থেকেই মনিবের মালিকানা ছিল। কাজেই ঐ এক হাজার টাকা আজাদ করার বদল এবং বিনিময় হতে পারে না। তাই গোলামের উপর অন্য এক হাজার টাকা যেটা আজাদির বদলা হবে অবশ্যই ওয়াজিব হবে।

عِنَايَة প্রণেতা বলেন, মুসান্নেফ (র.) একথাটা যদিও স্পষ্ট বলেননি কিন্তু মুসান্নেফের কথায় এদিকে ইঙ্গিত অবশ্যই আছে। কেননা হেদায়া প্রণেতা গোলাম কর্তৃক নিজের সত্তা ক্রয় করাকে إِعْتَاقٌ بِبَدَلٍ বলে সাব্যস্ত করেছেন। إِعْتَاقٌ بِلَا بَدَلٍ অর্থাৎ বিনিময়বিহীন আজাদ বলে সাব্যস্ত করেননি। সুতরাং হিদায়া প্রণেতার شِرَاءُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهٖ -কে إِعْتَاقٌ بِبَدَلٍ সাব্যস্ত করা একথার দলিল যে, গোলামের উপর অন্য এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِشِرَاءِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الخ : এর বিপরীত যদি গোলাম ব্যতীত অন্য কেউ আরেক ব্যক্তিকে গোলাম ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে। উদাহরণত আসিফ শাহেদকে উকিল নিযুক্তি করল যে, আরিফ থেকে তার গোলামটা আমার জন্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় কর। উকিলের উপর ক্রয় করার সময় একথা বর্ণনা করা শর্ত নয় যে, আমি এ গোলাম আমার মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করছি। কেননা উকিল একথা বলুক না বলুক সর্বাবস্থায় ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্যই হবে। আর এ উভয় চুক্তি অর্থাৎ যেটাকে উকিল নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছে এবং যেটাকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করেছে উভয়টি বিক্রেতার জন্য একই রকম হবে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে এ চুক্তি বিক্রেতার জন্য বিক্রয় চুক্তিই হবে। কোনো সুরতেই বিক্রেতার পক্ষ থেকে গোলামকে আজাদ করা হবে না এবং উভয় সুরতে দাবিদাওয়া সবকিছু চুক্তিকারী অর্থাৎ উকিলের দিকে ফিরবে। সুতরাং যখন উভয় সুরতে চুক্তি একই রকমের হলো এবং উভয় সুরতে দাবিদাওয়া এবং চুক্তির হকসমূহ উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হলো তখন ক্রয় করার সময় একথা বর্ণনা করা যে, 'আমি এ গোলাম নিজের মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি, নিঃসন্দেহে জরুরি নয়।

রইল কিতাবের মতনের মাসআলা। অর্থাৎ যখন গোলাম নিজের অনুকূলে স্বীয় সত্তাকে ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তো এ সুরতে উকিলের উপর একথা বর্ণনা করা আবশ্যক যে, আমি এ গোলামটি খোদ এ গোলামের জন্য ক্রয় করছি। কেননা এ মাসআলায় বিক্রেতা অর্থাৎ মনিবের জন্য দুই চুক্তি দুই রকম হয়ে যায়। এজন্য এ মাসআলায় যদি উকিল ক্রয় করাকে নিজের মুওয়াক্কিল অর্থাৎ গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে এটা মনিব তথা বিক্রেতার জন্য إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ অর্থাৎ মালের বিনিময়ে আজাদ করা হবে এবং মনিবের জন্য وَلَاء সাব্যস্ত হবে। আর উকিলের কাছে মূল্যের দাবিদাওয়া থাকবে না। কেননা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এ সুরতে উকিল শুধু দূত হয়। চুক্তির হকসমূহ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। আর যদি উকিল ক্রয় চুক্তিকে নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত না করে তাহলে এ চুক্তি বিক্রেতা অর্থাৎ মনিবের জন্য বিক্রয় হবে। অর্থাৎ মনিব গোলাম বিক্রয়কারী হবে আর উকিল নিজের জন্য ক্রয়কারী হবে এবং উকিলের উপর মূল্য ইত্যাদির দাবিদাওয়া আপতিত হবে। মূল্যের তাগাদা এবং مُطَالَبَةٌ থেকে বাঁচতে হলে উকিলকে অবশ্যই চুক্তির সময় বলে দিতে হবে যে, আমার জন্য ক্রয় করছি না; বরং স্বয়ং গোলামের নিজের জন্যই ক্রয় করছি। কেননা অনেক সময় মনিব মালের বিনিময়ে মুক্তিদানে সম্মত হয় না; বরং সে নিছক বিনিময়ের প্রতি আগ্রহী হয়। إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ তথা মালের বিনিময় আজাদ করার ক্ষেত্রে বিনিময় পাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় যে, মনিব এটাকে অপছন্দ করে এবং আজাদ করা ছাড়া নিছক বিনিময়ে আগ্রহী হয় তার কারণ এই যে, যদিও আজাদ করার দ্বারা তার উপকার হয় কেননা সে ওয়ালা পায়। কিন্তু আজাদ করার মাঝে একটি ক্ষতির দিকও আছে, অনেকটা সেটার বিবেচনায় মনিব আজাদ করতে অনাগ্রহী হয়। আর সেই ক্ষতির দিকটি হলো, মনিব আজাদ করার দ্বারা যেহেতু আজাদকৃত গোলামের عَاقِلَة হয়ে যায় সেহেতু যদি ঐ আজাদ করা গোলাম কোনো অপরাধ করে তাহলে এর বোঝাটাও মনিবের উপর আপতিত হবে। সুতরাং যখন মনিব অনেক সময় إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ-কে পছন্দ করে না; বরং নিছক বিনিময় পছন্দ করে তখন উকিলের উপর আবশ্যক হবে যে, সে চুক্তির সময় মনিবের কাছে একথা স্পষ্ট করে দেবে যে, আমি এ গোলাম আমার জন্য নয়; বরং গোলামের জন্যই ক্রয় করছি অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার জন্য إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ হয়ে যাবে এখন ভেবে দেখ এ চুক্তিতে তুমি রাজি আছ কিনা। যাতে করে মনিব ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যদি উকিল এভাবে স্পষ্ট না করে দেয় তাহলে এ ক্রয় করা মুওয়াক্কিল অর্থাৎ গোলামের জন্য হবে না; বরং উকিলের জন্য হবে এবং মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হবে।

বি. দ্র. গোলামের পক্ষ হতে উকিল নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি উকিল একথা স্পষ্ট না করে দেয় যে, আমি গোলামের অনুকূলে ক্রয় করছি তাহলে সে ক্ষেত্রে তো মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হবে। অর্থাৎ মনিব মূল্যের টাকা উকিলের কাছ থেকে আদায় করবে। মুওয়াক্কিল অর্থাৎ গোলামের উপর মূল্যের তাগাদা আরোপিত হবে না। কিন্তু যদি উকিল চুক্তির সময় স্পষ্ট করে দেয় যে, আমি এ গোলাম ক্রয় করছি গোলামের অনুকূলে তাহলে এক্ষেত্রে মূল্যের তাগাদা কার উপরে আরোপিত হবে? হিদায়া প্রণেতার বক্তব্য وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيْلِ অনুসারে এটাই বুঝে আসে যে, إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ-এর সুরতে উকিলের উপর মূল্যের তাগাদা আরোপিত হবে না। কিন্তু نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ এবং كِفَايَة، بِنَايَة، عِنَايَة প্রণেতাগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নেফের বক্তব্য وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْوَكِيْلِ অর্থাৎ উকিলের উপর কোনো দায়দায়িত্ব আরোপিত হবে না। এটা بَابُ وَكَالَةِ এর- كِتَابُ الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ এর- بَابُ الْوَكَالَةِ-এর বর্ণনা। আর كِتَابُ الْوَكَالَةِ এর- مَبْسُوط -এর- اَلْمَأْذُوْنِ وَالْمُكَاتَبِ-এর বর্ণনা হলো, মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হবে। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ উকিলের উপর ওয়াজিব হবে। عِنَايَة প্রণেতা বলেন, প্রথম বর্ণনা অর্থাৎ উকিলের মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব না হওয়া এটা বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কেননা উকিল এ ক্ষেত্রে দূত মাত্র আর এখানে সে চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। مَبْسُوط-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অর্থাৎ মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হওয়ার বর্ণনা اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ-এর كِتَابُ الْوَكَالَةِ-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। সেখানেও অনুরূপ বক্তব্য বিদ্যমান। এ বর্ণনার স্বপক্ষে যুক্তি হলো, উকিল কর্তৃক গোলামের জন্য গোলাম ক্রয় করা গোলাম ছাড়া অন্য মানুষের জন্য ক্রয় করার মতোই। সুতরাং অন্য কোনো মানুষের জন্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেমন উকিলের উপর মূল্যের তাগাদা আরোপিত হয় তদ্রূপ গোলামের জন্য ক্রয় করার ক্ষেত্রেও মূল্যের তাগাদা উকিলের উপর আরোপিত হবে।

نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ প্রণেতা اَلْإِمَامُ الْمَحْبُوْبِيُّ-এর সূত্রে عِيْسَى بْنُ أَبَانٍ থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, মূল্যের তাগাদা গোলামের উপর আরোপিত হবে; উকিলের উপর নয়।

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدٍ اِشْتَرِ لِيْ نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِيْ نَفْسِيْ لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْآمِرِ لِاَنَّ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِيْ شِرَاءِ نَفْسِهِ لِاَنَّهُ اَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَّتِهِ وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَالٌ اِلَّا اَنَّ مَالِيَّتَهُ فِيْ يَدِهِ حَتّٰى لَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ الْحَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِاِسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ فَاِذَا اَضَافَهُ اِلَى الْاٰمِرِ صَلُحَ فِعْلُهُ اِمْتِثَالًا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْآمِرِ ـ

অনুবাদ : আর কেউ যদি কোনো গোলামকে বলে যে, তুমি আমার অনুকূলে তোমার দেহসত্তাকে তোমার মানিবের নিকট থেকে ক্রয় কর আর সে তার মনিবকে বলে যে, আপনি আমার দেহসত্তাকে অমুকের অনুকূলে এত দিরহামের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করুন; আর সে তাই করে। সে ক্ষেত্রে গোলামটি আদেশদাতার মালিকানায় যাবে। কেননা গোলাম আপন দেহসত্তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে অন্যের পক্ষ থেকে উকিল হতে পারে। কারণ তার অর্থমূল্য যেহেতু মনিবের মালিকানাধীন, সেহেতু সে তার অর্থমূল্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তি হবে এবং একটি সম্পদ হিসাবে তার উপর বিক্রয় চুক্তি সাব্যস্ত হবে। তবে [সে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার সুবাদে] তার অর্থমূল্য তার নিজের কব্জায় রয়েছে ফলে বিক্রেতা মনিব বিক্রয়ের পর মূল্য উসুল করার জন্য তাকে আটক রাখতে পারবে না।

এমতাবস্থায় বিক্রয় চুক্তিকে যখন সে আদেশদাতার দিকে সম্বন্ধিত করবে তখন তার ক্রয় কর্মটি আদেশ পালন রূপে গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে চুক্তিটি আদেশদাতার অনুকূলে সম্পন্ন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدٍ اِشْتَرِ لِيْ نَفْسَكَ الخ : চলমান অনুচ্ছেদে যে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হবে বলা হয়েছিল তার প্রথমটি এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় মাসআলা শুরু হচ্ছে যার সুরত হলো, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি একটি গোলামকে বলল যে, তুমি তোমার নিজ সত্তাকে তোমার মনিবের নিকট থেকে আমার জন্য এত টাকার বিনিময়ে ক্রয় কর। এখন উকিল [গোলাম] ক্রয় চুক্তিকে হয়তো নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্বন্ধিত করবে অথবা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করবে অথবা সেটাকে مُطْلَقْ বা কয়েদমুক্ত রাখবে। অর্থাৎ না সেটাকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করবে আর না নিজের দিকে সম্পৃক্ত করবে। সুতরাং যদি উকিল [গোলাম] ক্রয় চুক্তিকে নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে, অর্থাৎ উকিল [গোলাম] তার মনিবকে একথা বলে যে, আপনি আমার সত্তাকে আমার হাতে আমার অমুক মুওয়াক্কিলের জন্য এ পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। সুতরাং মনিব বিক্রি করে দিল আর গোলাম উকিল সেই চুক্তি কবুল করল তাহলে এ গোলাম মুওয়াক্কিলের হবে।

দলিল হলো, গোলাম নিজের সত্তাকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে অন্য মানুষের পক্ষ থেকে উকিল হতে পারে। এজন্য যে, গোলামের দুটি পদমর্যাদা রয়েছে। একটি তো হলো, সে মানুষ। দ্বিতীয়টি হলো, সে সম্পদ। আর তার সম্পদ হওয়াটা তার মনিবের জন্য। কিন্তু মানুষ হওয়ার ভিত্তিতে গোলামের উপর মনিবের কোনো অধিকার থাকে না। সুতরাং গোলামের এ দুই পদমর্যাদার মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। গোলামের মানুষের দিকটি তার সম্পদ হওয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পৃথক।

এ কারণেই তো যদি গোলাম অর্থমূল্যকে নিজের মনিব ছাড়া অন্য কারো স্বীকার করে এবং একথা বলে যে, আমি অমুকের গোলাম, তাহলে এ স্বীকারোক্তি হবে না। কেননা কোনো ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে অন্যের মাল অন্যের জন্য স্বীকার করবে। আর বিক্রয় গোলামের উপর তার মাল হওয়ার ভিত্তিতে হয়, তার মানুষ হওয়ার ভিত্তির উপর নয়। অর্থাৎ গোলামের ক্রয় বিক্রয় এজন্য হয় যে, সে মাল। এজন্য হয় না যে, সে মানুষ। সুতরাং যখন গোলামের মানুষ হওয়া এবং মাল হওয়া দুটি ভিন্ন বিষয় হলো তখন গোলামকে তার নিজের সত্তা ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা এমনই হলো যেন মনিবের মালসমূহের মধ্য থেকে অন্য কোনো মাল ক্রয় করার জন্য উকিল বানানো। অথবা গোলাম ব্যতীত অন্য কাউকে গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ করা। আর গোলামকে তার নিজসত্তা ছাড়া মনিবের অন্য কোনো মাল ক্রয় করার জন্য উকিল নিয়োগ করা এবং গোলাম ছাড়া অন্য কাউকে গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করা উভয়ই জায়েজ। সুতরাং গোলামকে তার নিজের সত্তা ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করাও জায়েজ হবে। যাহোক একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, গোলাম অন্য মানুষের পক্ষ থেকে নিজের সত্তা ক্রয় করার উকিল হতে পারে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ مَالِيَّتَهُ فِىْ يَدِهِ الخ : এখান থেকে হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, গোলামের মানুষ হওয়া এবং মাল হওয়া এ দুটির মাঝে যদিও বৈপরীত্য আছে কিন্তু যেহেতু গোলাম ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত তাই তার অর্থমূল্য তার কব্জায় রয়েছে ফলে বিক্রেতা মনিব বিক্রয়ের পর মূল্য উসুল করার জন্য তাকে আটক রাখতে পারবে না। কেননা যখন বিক্রেতা পণ্য সোপর্দ করে দেয় তখন পুনরায় মূল্য উসুলের জন্য পণ্য আটকে রাখার কোনো অধিকার থাকে না। যেমন– مُوْدَعْ [যার কাছে আমানত রাখা হয় সে] যদি মালিক থেকে আমানত ক্রয় করে নেয় আর আমানত مُوْدَعْ-এর কাছেই বিদ্যমান থাকে তাহলে বিক্রেতা অর্থাৎ মালিকের মূল্য উসুল করার জন্য وَدِيْعَتْ-এর সামগ্রী আটকে রাখার অধিকার থাকে না। কেননা وَدِيْعَتْ-এর সামগ্রী مُوْدَعْ-এর কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে উল্লিখিত মাসআলাতেও গোলামের অর্থমূল্য যেহেতু স্বয়ং গোলামের [ক্রেতার] কব্জায় বিদ্যমান সেহেতু মনিব তথা বিক্রেতার মূল্য উসুল করার জন্য গোলামকে বাঁধা দেওয়ার কোনো অধিকার হবে না।

قَوْلُهُ فَإِذَا اَضَافَهُ إِلَى الْاٰمِرِ صَلُحَ الخ : এখান থেকে দলিলের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, গোলাম অন্য কারো পক্ষ থেকে নিজের সত্তা ক্রয় করার উকিল হতে পারে। সুতরাং গোলাম [উকিল] যখন চুক্তিকে নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করল এবং নিজের মনিব [বিক্রেতা]-কে একথা বলল যে, আপনি আমার সত্তাকে আমার হাতে অমুকের জন্য এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিন। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, গোলামের এ কাজ অর্থাৎ নিজের সত্তাকে ক্রয় কর্ম তার মুওয়াক্কিলের আদেশ পালন রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর যে সুরতে উকিল চুক্তিকে নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং উকিলের কাজ মুওয়াক্কিলের আদেশ পালন রূপে গ্রহণযোগ্য হয় তো সেই সুরতে চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য সম্পন্ন হয়; উকিলের জন্য নয়। কাজেই এখানেও ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য হবে; উকিল তথা গোলামের জন্য নয়।

وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ إِعْتَاقٌ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ الْمَوْلٰى دُوْنَ الْمُعَاوَضَةِ وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيْلًا بِشَرَاءٍ مُعَيَّنٍ وَلٰكِنَّهُ اَتٰى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ اٰخَرَ وَفِيْ مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيْلِ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যদি সে চুক্তিটি নিজের জন্য করে তাহলে সে আজাদ হবে। কেননা গোলাম যেহেতু কোনো কিছুর মালিক নয়, যাতে সে উক্ত বস্তু দ্বারা ক্রয় সম্পন্ন করতে পারে; সেহেতু এটা হবে মনিবের পক্ষ হতে মুক্তিদান, বিনিময় নয়, আর মানিব তাতে সম্মত রয়েছে। আর গোলাম যদিও নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার উকিল ছিল, কিন্তু সে ওকালতপ্রাপ্ত কর্ম থেকে ভিন্ন অন্য একটি কর্ম সম্পন্ন করেছে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে উক্ত কর্ম উকিলের উপর কার্যকর হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرٌّ الخ : এ ইবারতে উপরোল্লিখিত তিন সুরতের মধ্য থেকে দ্বিতীয় সুরত উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গোলামকে এ কথার উপর উকিল নিযুক্ত করে যে, তুমি তোমার নিজ সত্তাকে নিজের মনিবের নিকট থেকে ক্রয় কর। সুতরাং গোলাম ক্রয় করতে গেল কিন্তু ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সমন্বিত করল না; বরং নিজের দিকে সমন্বিত করল এবং নিজের মানিবকে বলল যে, আপনি আমাকে আমার হাতে এ পরিমাণ মালের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। তো মনিব বলল যে, আমি বিক্রি করে দিলাম। তাহলে এ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা গোলাম কোনো কিছুর মালিক হয় না। আর যখন গোলাম কোনো কিছুর মালিক হয় না তখন গোলামের কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজেকে ক্রয় করার প্রশ্নও উঠে না। আর যখন এমনই হলো তখন এ চুক্তি গোলামের জন্য ক্রয় চুক্তি হবে না; বরং মনিব কর্তৃক গোলামের সত্তাকে গোলামের হাতে বিক্রি করা মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ করার নামান্তর হবে। আর গোলামের নিজেকে ক্রয় করা সেই আজাদি চুক্তিকে কবুল করা হবে।

যাহোক এ চুক্তি আজাদি চুক্তি। আর মনিব আজাদ করতে সম্মতও। কেননা মনিবের এ কথা জানা আছে যে, আমার গোলামের সত্তাকে তার নিজের হাতে বিক্রি করা আজাদ করার নামান্তর। আর মনিব বিনিময় চুক্তিতে সম্মত নয়। আর যখন মনিব বিনিময় চুক্তিতে সম্মত নয় তখন এ চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য সম্পন্ন হবে না। যাহোক যখন এটা আজাদ করার চুক্তি হলো, বিনিময় চুক্তি হলো না তখন গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيْلًا بِشَرَاءٍ مُعَيَّنٍ الخ :

প্রশ্ন : এখান থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন, এ মাসআলায় গোলাম নির্ধারিত বস্তু অর্থাৎ নিজের সত্তাকে খরিদ করার উকিল। আর যখন কেউ কোনো নির্ধারিত বস্তু ক্রয় করার উকিল হয় তখন সে তা নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে না। কাজেই এখানেও নিজেকে নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। এমনটিই হওয়া উচিত ছিল এবং এ ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের হওয়া উচিত ছিল। অথচ এ সুরতে গোলামের আজাদ হওয়া স্পষ্ট বিষয়।

উত্তর : প্রশ্নের উত্তর হলো, এ মাসআলায় উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশ অমান্য করেছে। এভাবে যে, গোলামকে এ কথার উকিল বানানো হয়েছিল যে, সে নিজেকে মালের বিনিময়ে ক্রয় করে মুওয়াক্কিলের মালিকানায় করে দেবে। কিন্তু গোলাম এমনটি করেনি; বরং সে মালের বিনিময়ে আজাদ করার চুক্তি করেছে অর্থাৎ নিজের মনিবকে এই বলেছে যে, আপনি আমাকে মালের বিনিময়ে আজাদ করে দেন। আর এ কথা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি উকিল মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা করে তাহলে ক্রয় করাটা খোদ উকিলের উপর কার্যকর হয়। কাজেই এ মাসআলাতে ক্রয় করাটা উকিল অর্থাৎ গোলামের উপর কার্যকর হবে। আর গোলাম যেহেতু কোনো কিছুর মালিক হয় না, তাই এ ক্রয় চুক্তি إِعْتَاقٌ عَلٰى مَالٍ হয়ে যাবে এবং গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِى نَفْسِىْ وَلَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ فَهُوَ حُرٌّ لِاَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَقَعُ اِمْتِثَالاً بِالشَّكِّ فَيَبْقَى التَّصَرُّفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهٖ ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি সে [শর্তহীনভাবে] বলে যে, আমার দেহসত্তাকে আমার কাছে বিক্রি করুন, 'অমুকের অনুকূলে' কথাটা যদি না বলে তাহলেও সে আজাদ হবে। কেননা শর্তহীন এ বক্তব্য দুটি দিকের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং সন্দেহবশত তা উকালতের আদেশ পালন বলে গণ্য হবে না, ফলে সম্পন্নকৃত কর্মটি তার নিজের অনুকূলে সম্পন্ন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِىْ نَفْسِىْ الخ : এ ইবারতে উপরোল্লিখিত তিন সুরতের তৃতীয় সুরতের উল্লেখ করা হয়েছে। যার সারকথা হলো, গোলাম চুক্তিটিকে مُطْلَقْ তথা শর্তহীন রাখল অর্থাৎ না নিজের দিকে সম্বন্ধিত করল আর না নিজের মুওয়াক্কিলের দিকে সম্বন্ধিত করল; বরং গোলাম নিজের মনিবকে এমন বলল যে, আপনি আমার সত্তাকে আমার কাছে বিক্রি করে দিন। আমার জন্য, না অমুকের জন্য এসব কিছু বলল না। এ সুরতেও গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

আর তার দলিল হচ্ছে, গোলামের একথা بِعْنِىْ نَفْسِىْ শর্তমুক্ত। উভয় দিকের সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ এ সম্ভাবনাও আছে যে, গোলাম নিজের সত্তাকে নিজের জন্য ক্রয় করেছে আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, নিজের মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছে। সুতরাং যখন উভয় সম্ভাবনা থাকল তখন গোলামের এ বক্তব্য সন্দেহপূর্ণ হলো। আর সন্দেহপূর্ণ কথা যেহেতু আদেশ পালন বলে গণ্য করা যায় না সেহেতু গোলামের এই কথাকে ওকালতের আদেশ পালন বলে গণ্য করা যাবে না। অর্থাৎ একথা বলা যাবে না যে, গোলাম মুওয়াক্কিলের আদেশ পালন করেছে এবং নিজের দাস সত্তাকে মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছে। আর যখন গোলামের এ কথা মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনে হলো না তখন গোলামের এ কাজ অর্থাৎ নিজের দাস সত্তাকে ক্রয় করা স্বয়ং গোলামের জন্যই হবে এবং গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কেননা এটাই প্রকাশ্য যে, মানুষ নিজের জন্য কাজ করবে বিশেষ করে এমন কাজ যার দ্বারা আজাদি অর্জিত হয়। যাহোক প্রমাণিত হলো যে, গোলাম এ তৃতীয় সুরতেও আজাদ হয়ে যাবে।

فَصْلٌ فِى الْبَيْعِ

قَالَ : وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَعْقِدَ مَعَ اَبِيْهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اِلَّا مِنْ عَبْدِهٖ اَوْ مُكَاتَبِهٖ لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةَ اِذِ الْاَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِاَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهٖ لِاَنَّ مَا فِىْ يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلٰى وَكَذَا لِلْمَوْلٰى حَقٌّ فِىْ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً بِالْعَجْزِ وَلَهُ اَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ وَهٰذَا مَوْضِعُ التُّهْمَةِ بِدَلِيْلِ عَدَمِ قُبُوْلِ الشَّهَادَةِ وَلِاَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهٖ مِنْ وَجْهٍ وَالْاِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ ـ

অনুচ্ছেদ : বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ প্রসঙ্গে

অনুবাদ: ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বা ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিলের পক্ষে বৈধ নয় যে, সে তার পিতা এবং দাদার সঙ্গে কিংবা এমন কারো সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে যাদের অনুকূলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বাজার মূল্যের সমপরিমাণ তাদের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে, তবে নিজের গোলামের কাছে কিংবা নিজের মোকাতাব গোলামের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কেননা উকিল নিয়োগ [প্রশ্নে] নিঃশর্ত হয়েছে; আর এতে তোহমতের কোনো অবকাশ নেই। কেননা তাদের মালিকানা শর্ত স্বতন্ত্র এবং উপকার লাভের বিসয়টিও পৃথক। গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা গোলামের কবজায় রক্ষিত সম্পদ যেহেতু মনিবের সেহেতু এটা হবে মনিবের নিজের কাছে বিক্রয় করা। তদ্রূপ মোকাতাব গোলামের উপার্জনে মনিবের হক রয়েছে এবং কিতাবতের বিনিময় পরিশোধে অক্ষমতার সময়ে তা প্রকৃত হক-এ রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া সাধারণত উপকার লাভ তাদের মাঝে মিলিত হয়ে থাকে, তাই এক প্রেক্ষিতে এটা নিজের কাছে বিক্রয় হবে। ইজারা চুক্তি এবং সারাফ [ও বায় সালাম] চুক্তি সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগের সমস্ত প্রকার বর্ণনা শেষ করে মুসান্নেফ (র.) এ অনুচ্ছেদ বিক্রেয়ের উকিল নিয়োগের বিধানসমূহ উল্লেখ শুরু করেছেন। ক্রয়ের উকিল নিয়োগ প্রসঙ্গকে বিক্রয়ের উকিল নিয়োগের পূর্বে আনার কারণ হলো, ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগের মঝে اِثْبَاتٌ-এর অর্থ বিদ্যমান। এভাবে যে, ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য হাসিল করা হয়। আর বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগের মাঝে اِزَالَہ-এর অর্থ পাওয়া যায়। এভাবে যে, বিক্রয়ের উকিল নিয়োগের মাধ্যমে পণ্যকে নিজের থেকে দূর করা উদ্দেশ্য হয়। আর অস্তিত্বে যেহেতু اِزَالَہ তথা দূরকরণের পূর্বে اِثْبَاتٌ তথা সাবেত করা হয়ে থাকে তাই বর্ণনার ক্ষেত্রে اِزَالَہ অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগের আলোচনা اِثْبَاتٌ অর্থাৎ ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে বিক্রি করে অথবা উভয়টার উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উকিলের জন্য বৈধ নয় যে সে তার পিতার অথবা দাদার কিংবা এমন কারো সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করবে, যাদের অনুকূলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন– পুত্র, নাতি, স্ত্রী এবং নিজের গোলাম ও নিজের মুকাতাব গোলাম। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একটি অভিমত। আরেক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)ও এ মতের প্রবক্তা। আর সাহেবাইন (র.) বলেন যে, উকিলের জন্য বাজার মূল্যের সমপরিমাণ তাদের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে, তবে নিজের গোলামের সাথে অথবা নিজের মোকাতাব গোলামের সাথে লেনদেন করা সাহেবাইনের মতেও নাজায়েজ।

হিদায়ার ইবারতের দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, উকিলের জন্য নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে বাজারদরে লেনদেন করা তো বৈধ কিন্তু غَبْنٍ يَسِيْرٍ অর্থাৎ সামান্য ক্ষতিতে লেনদেন করা বৈধ নয়। কিন্তু কেফায়া প্রণেতা ذَخِيْرَة কিতাবের বরাত দিয়ে লেখেন যে, সামান্য লোকসান বাজারদরের মতো। অর্থাৎ সাহেবাইনের মতে যেভাবে বাজারদরে তাদের সাথে লেনদেন করা বৈধ তদ্রূপ সামান্য লোকসানের সুরতেও তাদের সাথে লেনদেন বৈধ। একথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইনের মাঝে এ মতানৈক্য ঐ সময় যখন ওকালত مُطْلَقٌ তথা قَيْد মুক্ত হয়। আর যদি মুওয়াক্কিল এরূপ বলে যে, بِعْ مِمَّنْ شِئْتَ অর্থাৎ 'যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে বিক্রি করে দাও।' তাহলে এ সুরতে উল্লিখিত লোকদের সাথে উকিলের ক্রয় বিক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, এখানে উকিল নিয়োগ مُطْلَقٌ তথা শর্তমুক্ত। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল শর্তহীনভাবে বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করেছে আর এমন কিছু বলেনি যে, অমুকের সাথে চুক্তি করার অনুমতি আছে আর অমুকের সাথে অনুমতি নেই। সুতরাং যখন উকিল নিয়োগ مُطْلَقٌ তথা শর্তহীন হলো তখন এ উকিল নিয়োগে সব মানুষ শামিল হয়ে গেল। অর্থাৎ উকিলের নিজের পিতা দাদা এবং ঐ সকল নিকটাত্মীয়ের সাথেও চুক্তি করার অনুমতি হবে যাদের সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণ করা হয় না। আর এ ছাড়া অন্য মানুষদের সাথেও চুক্তি করার অনুমতি থাকবে। সর্বোচ্চ একথা বলা যায় যে, পিতা, পিতামহ এবং এ ধরনের অন্যান্য মানুষের সাথে চুক্তি করার সুরতে উকিলের উপর এ দোষারোপ করা যেতে পারে যে, উকিল নিজে কোনো উপকার পেতে চায়। সুতরাং এ দোষারোপের কারণে এ সকল মানুষের সাথে চুক্তি করা অবৈধ হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এখানে কোনো ধরনের কোনো দোষারোপ নেই। কেননা উকিল এবং তার পিতা ও পিতামহ এবং তার পুত্র ও পৌত্র তাদের সবার সম্পদ পরস্পর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেকের মালিকানা আলাদা আলাদা। এ কারণেই তো পুত্রের জন্য নিজের দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল কিন্তু নিজের পিতার দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল নয়। যদি পুত্রের মালিকানা পিতার মালিকানা থেকে ভিন্ন না হতো তাহলে পুত্রের দাসী তার ও তার পিতার মাঝে বিভক্ত হতো এবং পুত্রের জন্য ঐ দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল হতো না। যেমন পুত্রের জন্য পিতার দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল হয় না।

যাহোক পিতা-পুত্রের মালিকানা পরস্পর থেকে ভিন্ন। আর লাভও পরস্পর থেকে ভিন্ন। কেননা মালিকানার বিভিন্নতা مَنَافِعْ তথা লাভের বিভিন্নতা সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ যখন প্রত্যেকটার মালিকানা পৃথক তখন একজনের জন্য আরেকজনের মালিকানা থেকে অবৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই। আর যখন এমনই হলো, তখন উকিলের নিজের পিতা ও পিতামহ এবং তদ্রূপ অন্য নিকটাত্মীয়ের সাথে লেনদেনে উকিলের কোনো লাভ নেই, আর যখন উকিলের কোনো লাভ থাকলো না তখন তাদের সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে উকিল مُتَّهَمٌ তথা তুহমাতপ্রাপ্ত বা দোষী সাব্যস্ত হবে না। আর যখন উকিল নিয়োগ শর্তমুক্ত আর এ সকল লোকের সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে উকিল مُتَّهَمٌ ও নয় তখন তাদের সাথে চুক্তি করায় কোনো সমস্যা হবে না।

হ্যাঁ, উকিলের ঐ গোলামের কাছে বিক্রি করা জায়েজ হবে না যার জিম্মায় কোনো ঋণ নেই। কেননা উকিলের غَيْر مَدْيُوْن গোলামের কাছে বিক্রি করা নিজের কাছে বিক্রি করার নামান্তর। কেননা গোলাম এবং গোলামের কবজায় যা কিছু থাকে তা সব মনিবের মালিকানা হয়। সেখানে অন্য কারো কোনো অধিকার থাকে না। সুতরাং যখন গোলাম এবং গোলামের কবজার সমস্ত কিছু মনিবের মালিকানা তখন মনিব [উকিল] নিজের গোলামের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করা নিজের কাছে বিক্রি করার নামান্তর। আর উকিলের নিজের কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা এ সুরতে উকিল বিক্রয় চুক্তির দুই দিক অর্থাৎ প্রস্তাব এবং গ্রহণ اِيْجَابْ وَقَبُوْل উভয়টির মালিক হয়ে যাবে। অথবা এক ব্যক্তি বিক্রয় চুক্তির উভয় দিকের মালিক হতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ كِتَابُ النِّكَاحِ -এর শুরুতে অতিবাহিত হয়েছে।

তদ্রূপ উকিল নিজের মুকাতাবের কাছে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা মুকাতাবের উপার্জনে মনিবের হক রয়েছে। এ কারণেই তো মুকাতাব নিজের উপার্জন থেকে কাউকে দান স্বরূপ কিছু দিতে পারে না এবং নিজের গোলামের বিবাহ দিতে পারে না। আর যখন কিতাবতের বিনিময় পরিশোধে অক্ষম হয় তখন মনিবের এ হক প্রকৃত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কিতাবতের বিনিময় পরিশোধে অক্ষমতার সময় মুকাতাবকে নিয়ম মাফিক মনিবের গোলাম বানিয়ে দেওয়া হয়, আর যা কিছু তার কাছে উপার্জিত থাকে তা সব মনিবের মালিকানা হয়ে যায়। সুতরাং যখন গোলামের উপার্জনে মনিবের হক থাকল তখন মনিব [উকিল] এর নিজের মুকাতাবের কাছে বিক্রি করা খোদ নিজের হাতে বিক্রি করার নামান্তর। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, নিজের কাছে বিক্রি করা বৈধ নয়। কাজেই উকিলের নিজের মুকাতাবের কাছে বিক্রি করা নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এ কথাতো ঠিক আছে যে, উকিল নিয়োগ مُطْلَقْ বা শর্তমুক্ত; কিন্তু তোহমতের সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো ওকালত থেকে বাদ থাকে অর্থাৎ উকিল যেসব মানুষের সাথে লেনদেন করলে مُتَّهَمْ হয়, মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে তাদের সাথে লেনদেন করার তার অনুমতি হয় না। আর উল্লিখিত মাসআলায় এগুলো তোহমতের ক্ষেত্র। অর্থাৎ পিতা ও পিতামহের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে উকিল مُتَّهَمْ ; এক তো এ কারণে যে, পিতা, পিতামহ ও পুত্রের মাঝে একজনের পক্ষে আরেকজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, তাদের মাঝে সাধারণত উপকার লাভ মিলিত হয়ে থাকে। কেননা সাধারণত পিতা পুত্রের মাল দ্বারা এবং পুত্র পিতার মাল দ্বারা উপকৃত হয়। সুতরাং পিতার মাল এক প্রেক্ষিতে পুত্রের মাল এবং পুত্রের মাল একদিক বিবেচনায় পিতার মাল হলো। আর যখন এমন হলো তখন উকিলের নিজের পিতা, মাতামহ ইত্যাদির কাছে বিক্রি করা এক প্রেক্ষিতে নিজের কাছে বিক্রি করার নামান্তর। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, নিজের কাছে বিক্রি করা অবৈধ। কাজেই উকিলের নিজের পিতা, পিতামহ ইত্যাদির কাছে বিক্রি করাও অবৈধ হবে।

হেদায়া প্রণেতা বলেন ইজারা চুক্তি এবং সারাফ এবং বায় সলম চুক্তি সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি ইজারা চুক্তির জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে। উদাহরণত এই বলে যে, তুমি আমার এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে দাও অথবা আমার এ স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। সুতরাং যদি উকিল নিজের পিতা পিতামহ অথবা এমন ব্যক্তির সাথে ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করে অথবা সারাফ চুক্তি অথবা বায় সালাম চুক্তি সম্পন্ন করে যার সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে সাহেবাইনের মতে এ চুক্তি বৈধ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বৈধ নয়।

قَالَ : وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَالْعِوَضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ اِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ لِاَنَّ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ لِاَنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَيَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِالنُّقُوْدِ وَلِهٰذَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيْلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجَمَدِ وَالْاُضْحِيَّةِ بِزَمَانِ الْحَاجَةِ وَلِاَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ وَهِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَكَذَا الْمُقَايَضَةُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ وَشِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اِسْمِ الْبَيْعِ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُهُ الْاَبُ وَالْوَصِىُّ وَلَهُ اَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقٌ فَيَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ اَوْ بِالْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ اِلَى الثَّمَنِ وَالتَّبَرُّمِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوْعَةٌ عَلٰى قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) عَلٰى مَا هُوَ الْمَرْوِىُّ عَنْهُ وَاَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتّٰى اَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيْعُ يَحْنَثُ بِهٖ غَيْرَ اَنَّ الْاَبَ وَالْوَصِىَّ لَا يَمْلِكَانِهٖ مَعَ اَنَّهُ بَيْعٌ لِاَنَّ وِلَايَتَهُمَا نَظَرِيَّةٌ وَلَا نَظَرَ فِيْهِ الْمُقَايَضَةُ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِوُجُوْدِ حَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়ের উকিল অল্প মূল্যে এবং অধিক মূল্যে এবং দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। সাহেবাইন (র.) বলেন, এমন কম মূল্যে বিক্রি করতে পারে না যে পরিমাণ কম সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে না। আর দিরহাম দিনার ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা ওকালাহ-এর নিঃশর্ত আদেশ লোকপ্রচলিত অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। কারণ এ সমস্ত পদক্ষেপ হচ্ছে প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য। সুতরাং তা প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহের সাথে শর্তায়িত হবে। আর লোকপ্রচলিত রূপ হলো সমমূল্যে বিক্রয় করা এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা। এ কারণেই কয়লা, বরফ ও কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্তকরণ প্রয়োজন কালের সাথে বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রয় এক হিসেবে বিক্রয় এবং আরেক হিসেবে দান। তদ্রূপ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় এক হিসেবে বিক্রয় এবং আরেক হিসেবে ক্রয়। সুতরাং 'নিঃশর্ত বিক্রয়' শব্দটি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। এ কারণেই পিতা এবং অছি তা করতে পারে না। ইমাম আবূ হনীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয়ের উকিল নিয়োগকরণ নিঃশর্ত হয়েছে। সুতরাং তোহমতের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র সেটা নিজস্ব নিঃশর্ততার উপরই বহাল থাকবে। আর মুদ্রাদ্রব্যের অধিক প্রয়োজনের সময় এবং বস্তু বিশেষের প্রতি অনাগ্রহের কারণে অতিরিক্ত কম মূল্যের কিংবা দ্রব্যবিশেষের বিনিময়ে বিক্রয় করার লোকপ্রচলন রয়েছে। আর উল্লিখিত মাসআলাগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ বিক্রয় সর্বোতভাবে বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও বাপ বা অছি [অতিরিক্ত ঠকমূল্যে] বিক্রয় করতে পারে না। এ কারণে যে, তাদের অভিভাবকত্ব হলো তার কল্যাণভিত্তিক। আর এতে কল্যাণ নেই। আর পণ্য বিনিময় যেমন সর্বদিক থেকে ক্রয়, তেমনি সর্বদিক থেকে বিক্রয়ও। কেননা উভয়ের প্রতিটি সংজ্ঞা তাতে প্রযুক্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيْلِ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে কোনো কিছু বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের গোলাম বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল, এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উকিলের জায়েজ হবে যে, সে ঐ গোলামটিকে অল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে, অথবা বেশি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে, অথবা অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে যথা– শাকসবজি অথবা প্রাণির বিনিময়ে বিক্রি করবে।

আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উকিলের জন্য না অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ, আর না দিরহাম দিনার ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ। অতিরিক্ত কম মূল্য বলতে বুঝায় এত কম মূল্য যে পরিমাণ সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে না। আর যে পরিমাণ কম মূল্য সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে তাকে অতিরিক্ত কম মূল্য বা غَبْن فَاحِش বলে না। তাকে বলে غَبْن يَسِيْر ঈষৎ কম মূল্য। সুতরাং সাহেবাইনের মতে এত কম মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ নয়, যে পরিমাণ কম সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে না। হ্যাঁ, তবে غَبْن يَسِيْر তথা সামান্য লোকসানে বিক্রি করা জায়েজ আছে।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে, মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বিক্রির উকিলের জন্য বিক্রয়ের আদেশ مُطْلَقْ বা শর্তমুক্ত। আর নিঃশর্ত আদেশ লোকপ্রচলিত অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে পদ্ধতি মানুষের মাঝে প্রচলিত থাকে, শর্তমুক্ত আদেশ তার সাথে শর্তযুক্ত হয়ে যায়। কেননা এ সমস্ত تَصَرُّفَاتْ বা পদক্ষেপ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য। আর যখন এসব পদক্ষেপ প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য হলো তখন তা প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহের সাথে শর্তায়িত হবে এবং প্রচলিত হলো, বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য সমান সমান হবে এবং বিক্রয়টা টাকাপয়সা তথা মুদ্রার বিনিময়ে হবে। সুতরাং মুওয়াক্কিলের শর্তমুক্ত আদেশে বিক্রয়ের আদেশ করা প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ সমমূল্য এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রির আদেশ দেওয়ার নামান্তর। আর যখন মুওয়াক্কিলের এ আদেশ সমমূল্য এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করার আদেশের নামান্তর হলো তখন উকিলের জন্য এ আদেশের বিপরীতে غَبْن فَاحِش তথা অতিরিক্ত কম মূল্যে অথবা মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ হবে না। যেহেতু পদক্ষেপসমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহের সাথে শর্তায়িত হয় এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে কয়লা, বরফ অথবা কুরবানির পশু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে তাহলে এ উকিল নিয়োগ প্রয়োজন কালের সাথে বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ কয়লা ক্রয়ের উকিল নিয়োগ ঐ বৎসরের শীতের সময়ের সাথে বিশিষ্ট হবে এবং বরফ ক্রয়ের উকিল নিয়োগ ঐ বৎসরের গরম কালের সাথে বিশিষ্ট হবে এবং কুরবানির পশু ক্রয়ের উকিল নিয়োগ ঐ বৎসরের কুরবানির দিনসমূহের সাথে বিশিষ্ট হবে। এমনকি যদি উকিল এ সকল বস্তু পরের বৎসর ক্রয় করে তাহলে মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতার কারণে এ ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের জন্য আবশ্যক হবে না; বরং স্বয়ং উকিলের উপর আবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রয় এক হিসেবে বিক্রয় এবং আরেক হিসেবে দান। কেননা যখন এক হাজার টাকার দ্রব্যকে পাঁচশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হলো তখন যেন বিক্রেতা অর্ধেক দ্রব্য বিক্রি করল আর বাকি অর্ধেক দান করল। এ কারণেই যদি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি অতিরিক্ত কম মূল্যে কোনো কিছু বিক্রি করে তাহলে সেটাকে তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ যদি এ দ্রব্য তার মোট সম্পদের এক তৃতীয়ংশ অথবা তার চেয়ে কম হয় তাহলে এ বিক্রয় চুক্তিকে কার্যকর করা হবে। অন্যথায় কার্যকর করা হবে না।

অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করলে তা একদিক দিয়ে বিক্রয় কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দান। এ কারণেই তো ছোট বাচ্চার পিতা এবং অছি বাচ্চার কোনো দ্রব্য অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করার অধিকার রাখে না। কেননা পিতা এবং অছি নাবালেগ শিশুর সম্পদ দান করার অধিকার রাখে না। যাহোক অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি এক হিসেবে বিক্রি আরেক হিসেবে দান। আর বিক্রয়ের উকিল বিক্রয়ের জন্য উকিল নিযুক্ত হয়েছে, দান করার জন্য নয়। সুতরাং যখন বিক্রয়ের উকিল বিক্রয়ের জন্য উকিল

নিযুক্ত হলো দানের জন্য উকিল নিযুক্ত হলো না তখন অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করার অধিকার উকিলের থাকবে না। আর এমনটি করলে তা মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা হবে। আর উকিলের জন্যে মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা যেহেতু জায়েজ নেই তাই অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রয়ের উকিলের বিক্রয় করাও জায়েজ হবে না।

তদ্রূপ مُقَايَضَة অর্থাৎ পণ্যকে পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা এক হিসেবে বিক্রয় আরেক হিসেবে ক্রয়। বিক্রয় তো এজন্য যে, বিক্রেতা নিজের মালিকানা থেকে পণ্য বের করে দিয়েছে। আর ক্রয় এজন্য যে, আরেকটি পণ্য তার মালিকানায় প্রবেশ করেছে। সুতরাং পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় যখন এক হিসেবে বিক্রয় এবং আরেক হিসেবে ক্রয় হলো তখন শুধু বিক্রয় বললে بَيْع مُقَايَضَة বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যখন বিক্রয় শব্দটি بَيْع مُقَايَضَة-কে অন্তর্ভুক্ত করে না তখন উকিলের পক্ষ থেকে مُقَايَضَة-এর পদ্ধতিতে মুওয়াক্কিলের পণ্য অন্য পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা হবে। আর মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা যেহেতু উকিলের জন্য জায়েজ নেই সেহেতু উকিলের জন্য মুওয়াক্কিলের পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করাও জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, বিক্রয়ের উকিল নিয়োগ শর্তমুক্ত। অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে শর্তযুক্ত নয়। আর শর্তমুক্ত বিষয় তোহমতের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র নিজস্ব নিঃশর্ততার উপর বহাল থাকে। কাজেই এখানেও বিক্রয়ের উকিল নিযুক্তকরণ নিজের নিঃশর্ততার উপর বহাল থাকবে। অর্থাৎ যার উপরই বিক্রয়ের প্রয়োগ শুদ্ধ হবে এ উকিল নিযুক্তকরণ তাকে শামিল করবে। সুতরাং অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি এবং অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রিও যেহেতু একপ্রকারের বিক্রয় তাই এ উকিল নিযুক্তকরণ সেসব বিক্রয়কেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যখন উকিল নিযুক্তকরণ এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করা এবং অন্য কোনো পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করার দ্বারা মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরোধিতা হবে না। সুতরাং উকিলের জন্য অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করাও জায়েজ হবে এবং দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করাও জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ أَوْ بِالْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ الخ : এখান থেকে সাহেবাইনের দলিলের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। উত্তরের সারাংশ হলো, একথা তো স্বীকৃত যে, শর্তমুক্ত আদেশ প্রচলিত পদ্ধতির সাথে শর্তযুক্ত হয় কিন্তু সাহেবাইনের একথা বলা যে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি হলো, সমমূল্যের বিনিময়ে হতে হবে এবং মুদ্রার বিনিময়ে হতে হবে এটা ভুল। কেননা যদি টাকার খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে অতিরিক্ত কম মূল্যের বিক্রি করাও প্রচলিত আছে।

তদ্রূপ যদি বস্তুবিশেষের প্রতি অনাগ্রহ এসে যায় সে ক্ষেত্রে সেই বস্তুকে যে করে হোক বিক্রি করতে তৎপর হয়ে উঠে। চাই তা অন্য কোনো পণ্যের বিনিময়েই হোক না কেন। যাহোক এ সুরতে দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করাও প্রচলিত।

قَوْلُهُ وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوعَةٌ الخ : এখান থেকে সাহেবাইনের পক্ষ থেকে পেশ করা উদাহরণের উত্তর দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারাংশ হলো, কয়লা, বরফ এবং কুরবানির পশু ক্রয়ের উকিল নিয়োগ প্রয়োজনের সময়ের সাথে শর্তযুক্ত হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের ভিত্তিতে স্বীকৃত নয়। অর্থাৎ ইমাম সাহেবের মতে এসব বস্তুর উকিল নিয়োগও শর্তমুক্ত; প্রয়োজনের সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয়। উকিল যে কোনো সময় ক্রয় করার অধিকার রাখে। সুতরাং যখন ইমাম সাহেবের মতে এসব বস্তু ক্রয় করার উকিল নিয়োগও শর্তমুক্ত এবং কোনো সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয় তখন এসব মাসআলার দ্বারা ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে উদাহরণ পেশ করা কিভাবে ঠিক হবে।

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الخ : এখান থেকে সাহেবাইনের দ্বিতীয় দলিলের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সারকথা হলো, সাহেবাইনের একথা যে, অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি এবং দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি এক হিসেবে বিক্রি আরেক হিসেবে বিক্রি নয় একথা আমরা মানি না; বরং এ দুটি সর্বোতভাবে বিক্রয়।

আর দলিল হলো, যদি কেউ কসম খায় যে, আমি বিক্রি করব না। আর বলে, আল্লাহর কসম আমি বিক্রি করব না। অতঃপর সে অতিরিক্ত কম মূল্যে কোনো কিছু বিক্রি করে, অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রি করে তাহলে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায়। সুতরাং যদি অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করা এবং দ্রব্যের বিনিময়ে সব দিক দিয়ে বিক্রয় না হতো, তাহলে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হতো না। এ ব্যক্তির কসম ভঙ্গকারী হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এ উভয় বিক্রয় সম্পূর্ণ বিক্রয়। আর যখন এ দুটি অর্থাৎ অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করা এবং দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা কসমের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিক্রয় পরিগণিত হলো তখন ওকালতের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ الخ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে–

উত্তর : প্রশ্ন হলো, অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করা যদি পুরোপুরি বিক্রয় হয় তাহলে পিতা এবং অছির জন্য নাবালেগ শিশুর মাল অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করার অধিকার হওয়া উচিত অথচ তাদের এ অধিকার নেই।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হলো, নাবালেগ শিশুর উপর পিতা এবং অছির অভিভাবকত্ব হলো কল্যাণভিত্তিক। অর্থাৎ শিশুর উপর অভিভাবকত্ব হাসিল হওয়ার শর্ত হলো, অভিভাবক শিশুকে স্নেহ করবে এবং তার ব্যাপারে কল্যাণকামী হবে কিন্তু অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে পিতা এবং অছির পক্ষ থেকে যেহেতু শিশুর প্রতি কোনো ধরনের স্নেহ প্রকাশ পায় না, সেহেতু পিতা এবং অছির জন্য নাবালেগের মাল অতিরিক্ত কম মূল্যে বিক্রি করার কোনো অধিকার হাসিল হবে না।

قَوْلُهُ اَلْمُقَايَضَةُ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الخ : এখান থেকে সাহেবাইনের দ্বিতীয় দলিলের দ্বিতীয় অংশের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। সারকথা হলো, সাহেবাইনের একথা বলা যে, مُقَايَضَه অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি এক হিসেবে বিক্রি আরেক হিসেবে ক্রয়– আমরা এ কথা মানি না; বরং এটা পুরোপুরিভাবে বিক্রয় এবং পুরোপুরিভাবেই ক্রয়ও। কেননা তাতে ক্রয় ও বিক্রয় উভয়ের প্রতিটি সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। এজন্য যে, বিক্রয় বলে নিজের মালিকানা থেকে কোনো কিছুকে বের করে অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া।

আর ক্রয় বলে কোনো জিনিসকে নিজের মালিকানায় আনার জন্য নিজের মালিকানা থেকে কিছুকে বের করা। مُقَايَضَه -এর উপর যেহেতু এ উভয় সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয় সেহেতু مُقَايَضَه পুরোপুরি বিক্রয় আবার পুরোপুরি ক্রয়ও।

আর যখন مُقَايَضَه পুরোপুরি বিক্রয়ের হলো তখন বিক্রয়ের উকিলকে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে مُقَايَضَه চুক্তি করার পুরোপুরি অধিকার থাকবে। আর যখন বিক্রির উকিলের مُقَايَضَه -এর অধিকার থাকল তখন বিক্রির উকিলের জন্য মুওয়াক্কিলের মাল দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

قَالَ : وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يُنْفَذُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هٰذِهِ التُّهْمَةُ وَلَا كَذٰلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিল সমমূল্যে এবং এ পরিমাণ অধিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে, যে ধরনের পরিমাণে মানুষ সাধারণত স্বল্প ক্ষতি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণ অধিক মূল্যের ক্ষতি মানুষ গ্রহণ করে না, সে মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ নেই। কেননা 'অতি বেশি মূল্যে' ক্রয় করাতে তোহমত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, সে নিজের জন্য ক্রয় কবেছিল পরে যখন তার মন মতো হয়নি তখন সে সেটাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে। তবে যদি সে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু ক্রয় করার উকিল হয় তাহলে ফকীহগণ বলেছেন, আদেশদাতার উপর তা কার্যকর হবে। কেননা এটা সে নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে না। তদ্রূপ বিবাহ সম্পাদনের উকিল যদি মুওয়াক্কিলের কাছে কোনো নারীকে তার মহরে মেছেলের চেয়ে বেশি পরিমাণ মোহরে বিবাহ প্রদান করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে। কেননা বিবাহ চুক্তিতে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। সুতরাং সেখানে এ তোহমত সাব্যস্ত হতে পারে না। কিন্তু ক্রয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত উকিলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা চুক্তিকারী চুক্তিটিকে সম্বন্ধহীন ও মুক্ত রেখে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে কিছু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত করে। উদাহরণত এ কথা বলে যে, আমার জন্য একটি গোলাম ক্রয় কর, তাহলে সেই ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিলের জন্য বাজারদরের সমমূল্যে ক্রয় করা জায়েজ এবং সামান্য লোকসানে বাজারদরের চেয়ে কিছুটা বেশি মূল্যে ক্রয় করাও জায়েজ। পক্ষান্তরে সীমাতিরিক্ত লোকসানে বাজারদরের চেয়ে অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করা জায়েজ নয়। অর্থাৎ অল্প লোকসানে ক্রয় করার সুরতে ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে। আর অধিক লোকসানে ক্রয় করার সুরতে ক্রয় চুক্তি উকিলের জন্য কার্যকর হবে; মুওয়াক্কিলের উপর নয়। তবে এ হুকুম ঐ সময় যখন শহরবাসীর কাছে ক্রয়কৃত বস্তুর বাজারদর জানা না থাকে। পক্ষান্তরে যদি বাজারদর জানা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে উকিলের জন্য না অধিক লোকসানে ক্রয় করা জায়েজ হবে, আর না স্বল্প লোকসানে ক্রয় করা জায়েজ হবে।

বাজারদর অজ্ঞাত থাকার সুরতে অধিক লোকসানে ক্রয় করা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, অধিক লোকসানে ক্রয় করার সুরতে তোহমত বিদ্যমান। এভাবে যে, হতে পারে উকিল এ বস্তুটি নিজের জন্য ক্রয় করেছিল কিন্তু যখন দেখল যে এতে

লোকসান হচ্ছে সে সেটাকে তার মুওয়াক্কিলের উপর চাপিয়ে দিল অর্থাৎ এই বলে দিল যে, আমি এটা আমার মুওয়াক্কিলের জন্য ক্রয় করেছি। আর এরূপ তোহমতের সুরতে চুক্তি উকিলের উপর কার্যকর হয়, মুওয়াক্কিলের উপর নয়। সুতরাং এ কথা সাবেত হয়ে গেল যে, অধিক লোকসানে ক্রয় চুক্তি করা উকিলের জন্য নাজায়েজ, তা সত্ত্বেও উকিল যখন ক্রয় করে ফেলল তখন এ ক্রয় করাটা উকিলের জন্য হবে, মুওয়াক্কিলের জন্য হবে না। যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَىٰ مَا مَرَّ : অর্থাৎ এ বক্তব্য মূল কিতাবের আরো কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে অন্য একটি প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। মুসান্নেফের উদ্দেশ্য তিনি হেদায়ার মূল কিতাবের ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছেন–

وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَلْقَوْلُ لِلْاٰمِرِ لِاَنَّهُ مَوْضَعُ تُهْمَةٍ بِاَنْ اِشْتَرَاهُ لِنَفْسِهٖ فَاِذَا رَاٰى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً اَلْزَمَهَا الْاٰمِرَ اِنْتَهٰى ـ

অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং লোকসানটা উকিলের উপরে বর্তাবে। কেননা এটা তোহমতের জায়গা। এভাবে যে, হতে পারে উকিল গোলামটি নিজের জন্য ক্রয় করেছে পরে যখন লোকসান দেখেছে চুক্তিটাকে মুওয়াক্কিলের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর ওকালতের ক্ষেত্রে তোহমত ধর্তব্য হয়। কাজেই এখানে এ তোহমতের কারণে অধিক লোকসানে ক্রয়কৃত বস্তুটি উকিলের হবে, মুওয়াক্কিলের হবে না।

আর তাছাড়া অধিক লোকসানে ক্রয় করার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্তু উকিলের জন্য হওয়ার কারণ এটাও যে, ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিল ক্রয় বস্তুর মূল্য নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে এবং তার অনুরূপ অর্থ মুওয়াক্কিলের জিম্মায় নিজের জন্য ওয়াজিব করে। আর ব্যক্তি তার নিজের হকের ব্যাপারে তোহমত প্রাপ্ত হয়, কাজেই মুওয়াক্কিলের জিম্মায় ততক্ষণ পর্যন্ত মূল্য ওয়াজিব করতে পারবে না যতক্ষণ না তার মালিকানায় মূল্যের সমমানের কোনো বস্তু না এনে দেয় এ কারণেই তো যদি মুওয়াক্কিল একথা বলে যে, "আপনি আমাকে যা ক্রয় করতে বলেছিলেন তা ক্রয় করেছি, কবজাও করেছি, কিন্তু আমার কাছে তা নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমাকে মূল্য পরিশোধ করুন।" তার এ কথা গ্রহণ করা হবে না।

এর বিপরীত বিক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিল। কেননা সে যদি তার মুওয়াক্কিলকে বলে, "আপনার পণ্য আমি বিক্রি করেছি এবং মূল্য কবজা করেছি, কিন্তু তা আমার কাছে হালাক হয়ে গেছে।" সে ক্ষেত্রে উকিলের কথা গ্রহণ করা হবে। এমনকি সে মুওয়াক্কিলকে ضَمَانٌ দিতে বাধ্য থাকবে না। ক্রয়ের উকিল ও বিক্রয়ের উকিলের মাঝে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলের কোনো পণ্য ক্রয় করার আদেশ দেওয়া অন্যের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত। আর কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের মালিকানায় স্বাধীন ক্ষমতা নেই। সুতরাং তার শর্তমুক্ত আদেশের বিবেচনা করা হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রয় সম্পূর্ণ এর বিপরীত। কেননা মুওয়াক্কিলের আদেশ তার নিজের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত; আর ব্যক্তির নিজের মালিকানায় স্বাধীন হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রয়েছে।

ক্রয় এবং বিক্রয়ের উকিলের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মাসআলায় পার্থক্যের আরো একটি কারণ হলো, ক্রয়ের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্তহীন পূর্ণ স্বধীনতা অথবা ব্যাপকতার বিবেচনা করা অসম্ভব। কেননা যদি উকিলকে এমন স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপকতা বিবেচনা করা হয়, তাহলে সে ঐ পণ্যটিকে মুওয়াক্কিলের মালিকনাধীন সমস্ত মালের বিনিময়ে ক্রয় করে ফেললে সেটারও বৈধতা দিতে হয় অথচ এটা মুওয়াক্কিলের জন্য আদৌ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, মুওয়াক্কিলের শর্তমুক্ত ক্রয়ের আদেশকে একটা সহনীয় পর্যায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে আর তা হলো অল্প লোকসান তথা غَبْنِ يَسِيْر মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। আর বিক্রয়ের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের নির্দেশে ব্যাপকতা এবং اِطْلَاقٌ -এর বিবেচনা সম্ভব। কেননা উকিল পণ্য ছাড়া মুআক্কিলের অন্য কোনো মালের উপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না। আর মুওয়াক্কিল তো তার এ পণ্যটিকে তার মালিকানা থেকে বের করে দিতে রাজি হয়েছেই।

অতিরিক্ত লোকসানের চুক্তি সম্পাদন করার মাসআলায় ক্রয়ের উকিল এবং বিক্রয়ের উকিলের মাঝে এ পার্থক্যগুলো مَبْسُوْط -এর كِتَابُ الْبُيُوْع তে উল্লিখিত হয়েছে। نَتَائِجُ الْاَفْكَارْ প্রণেতা সেগুলোকে مَبْسُوْط থেকে নকল করেছেন।

বি. দ্র. হিদায়া প্রণেতা এখানে যা বললেন সে মতে উকিল যদি এতটুকু অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করে যাতে মানুষ সাধারণত ধোঁকা খেয়েই থাকে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুওয়াক্কিলকে সেই ক্রয়কৃত পণ্য গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইতকানী (র.) বলেন, শায়খ ইমাম বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বুখারী خَوَاهِرْ زَادَهْ [মৃত্যু ৪৮৩ হি.] উল্লেখ করেছেন যে, স্বল্প লোকসান মেনে নেওয়া হবে সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে যেসব পণ্যের দাম শহরবাসীর কাছে নির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে যেসব পণ্যের দাম তাদের কাছে নির্ধারিত যেমন– রুটি, [পরাটা] মাংস ইত্যাদি পণ্য যদি উকিল বাজারদরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করে তবে তা মুওয়াক্কিলের উপর লাযেম হবে না। লোকসান কম হোক আর বেশি হোক অর্থাৎ এক্ষেত্রে সামান্য ঠকও বরদাশত করা হবে না। খাওয়াহির যাদাহ বলেন, وَبِهٖ يُفْتٰى অর্থাৎ এর উপরেই ফতোয়া। আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলাঈও অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন, এ সকল বক্তব্য তখন, যখন পণ্যের দাম মানুষের অজানা থাকে এবং ক্রেতা বিক্রেতার দরদামের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে যদি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকে এবং সকলের জানা থাকে যেমন রুটি গোশত কলা এবং পনির তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো লোকসানের অবকাশ থাকবে না, যদিও তা সামান্য হয়। এমনকি এক পয়সাও না। যাইলাঈ [মৃত্যু ৭৪৩ হি.]-এর বক্তব্য শেষ হলো।

قَوْلُهٗ حَتّٰى لَوْ كَانَ وَكِيْلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهٖ قَالُوْا الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন, উপরে যে দলিলের ভিত্তিতে অধিক মূল্যে ক্রয় উকিলের উপর কার্যকর হয়েছে, সেই একই দলিলের ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো বস্তু ক্রয় করার উকিল নিযুক্ত হয় আর সে সেই নির্ধারিত বস্তুটিকে অধিক লোকসানে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, তাহলে এ ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে, উকিলের উপর কার্যকর হবে না। কেননা এ সুরতে উকিলকে এ তোহমত দেওয়া যাবে না যে, হতে পারে সে নিজের জন্য ক্রয় করেছে। এমন তোহমত দেওয়ার অবকাশ নেই, কেননা এ সুরতে উকিল ঐ বস্তুটিকে নিজের জন্য কেনার অধিকার রাখে না। সুতরাং এ সুরতে এ সম্ভাবনা থাকবে না যে, উকিল নিজের জন্য ক্রয় করেছিল, পরে লোকসান বুঝতে পেরে মুওয়াক্কিলের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। যাহোক যখন এ সুরতে উকিলের উপর কোনো তোহমত নেই তখন অধিক লোকসান সত্ত্বেও ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক এবং কার্যকর হবে।

قَوْلُهٗ وَكَذَا الْوَكِيْلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا زَوَّجَهٗ الخ : তদ্রূপ বিবাহ সম্পদের উকিল যদি কোনো নারীকে নিজের মুওয়াক্কিলের সাথে মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি পরিমাণ মহরে বিবাহ প্রদান করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ বিবাহ জায়েজ। এজন্য যে, বিবাহ চুক্তিতে বিবাহের সম্পর্ক মুওয়াক্কিলের দিকে করা অপরিহার্য। কাজেই এ তোহমতের অবকাশ নেই যে, উকিল প্রথমে নিজের জন্য বিবাহ করেছিল পরবর্তীতে মুওয়াক্কিলের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এর বিপরীত ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিল। কেননা সে ক্রয় চুক্তিকে قَيْد মুক্ত রাখে। সুতরাং সে শুধু বলে আমি ক্রয় করলাম। অমুকের জন্য ক্রয় করলাম একথা সে বলে না। অর্থাৎ ক্রয়ের উকিলের জন্য ক্রয় চুক্তিকে মুওয়াক্কিলের দিকে সম্পৃক্ত করা জরুরি নয়; বরং সে চুক্তিটিকে مُطْلَقْও রাখতে পারে। কাজেই সেখানে এ তোহমত হতেই পারে যে, সে নিজের জন্য ক্রয় করেছিল অতঃপর যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনে করেছে তখন সেটাকে তার মুওয়াক্কিলের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে বিবাহের উকিলের জন্য মহরে মিছিলের চেয়ে অধিক মহরে মুওয়াক্কিলের বিবাহ সম্পাদন জায়েজ। কিন্তু ক্রয়ের উকিলের জন্য অধিক লোকসানে ক্রয় করা জায়েজ নয়।

قَالَ : وَالَّذِيْ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ وَقِيْلَ فِي الْعُرُوْضِ دَه نِيْم وَفِي الْحَيَوَانَاتِ دَه يَازْدَهْ وَفِي الْعَقَارَاتِ دَه دُوَازْدَهْ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكْثُرُ وُجُوْدُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَقِلُّ فِي الْأَخِيْرِ وَيَتَوَسَّطُ فِي الْأَوْسَطِ وَكَثْرَةُ الْغَبْنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি মানুষ গ্রহণ করে না, তা হলো ঐ পরিমাণ যা মূল্য বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে আসে না। আর পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে কারো মতে সাধারণ ক্ষতির পরিমাণ হলো দশ দিরহামের স্থলে আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে সাড়ে দশ দিরহাম এবং পশুর ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থলে এগার দিরহাম আর ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থলে বারো দিরহাম। কেননা প্রথমটিতে লেনদেন প্রচুর হয় আর শেষটিতে অল্প লেনদেন হয়, পক্ষান্তরে মাঝেরটিতে মধ্যম ধরনের হয়, আর ক্ষতির আধিক্য হয় লেনদেনের অল্পতার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالَّذِيْ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) এ পাঠাংশে غَبْنٌ فَاحِشٌ তথা অধিক ক্ষতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে যে, যে পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে না সে পরিমাণ ক্ষতি অধিক ক্ষতি বলে বিবেচ্য। এরপর কি পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি মানুষ গ্রহণ করে না তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যে পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে না তা হলো ঐ পরিমাণ যা মূল্য বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে আসে না। অর্থাৎ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ তাদের কারো দৃষ্টিতেই ঐ পরিমাণ মালের ক্ষতি হতে পারে না বা তাদের কেউ সেটাকে মেনে নিতে পারে না। যাহোক যখন مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ হলো তখন এর বিপরীতে مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ অর্থাৎ যে ক্ষতি মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে এবং মেনে নেয় সে ক্ষতিকে غَبْنٌ يَسِيْرٌ বলা হবে। আর যখন مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ غَبْنٌ فَاحِشٌ-এর সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা হলো তখন غَبْنٌ يَسِيْرٌ-এর সংজ্ঞা مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ হবে। অর্থাৎ এমন ক্ষতি যা বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে আসে তাকে غَبْنٌ يَسِيْرٌ বলা হবে। সারকথা হলো, ইমাম কুদূরী (র.) এখানে غَبْنٌ فَاحِشٌ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করে সেটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। আর তাঁর এ সংজ্ঞা থেকে আমরা এর বিপরীতটা অর্থাৎ غَبْنٌ يَسِيْرٌ টাকেও উদ্ঘাটন করতে পারি। অর্থাৎ সংজ্ঞাটিকে উল্টে দিলেই غَبْنٌ يَسِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ পর্যন্ত তেমন কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এর পরবর্তী পাঠাংশে ইমাম কুদূরীর বক্তব্যে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ فِي الْعُرُوْضِ دَه نِيْم الخ : ইমাম কুদূরী (র.) ব্যাখ্যাটি غَبْنٌ فَاحِشٌ-এর ব্যাখ্যা, আর غَبْنٌ يَسِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা তা তাঁর ভাষ্য থেকে স্পষ্ট নয়। এ কারণে হিদায়ার ব্যাখ্যাতাগণের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন যে, এটা غَبْنٌ يَسِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা আবার কেউ বলেছেন, এটা غَبْنٌ فَاحِشٌ-এর ব্যাখ্যা। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে এটাকে غَبْنٌ فَاحِشٌ-এর تَفْسِيْرٌ বলে ভ্রম হয়। অর্থাৎ সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে غَبْنٌ فَاحِشٌ হলো দশ দিরহামের জায়গায় সাড়ে দশ দিরহাম হওয়া। পশুর ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থালে এগার দিরহাম হওয়া এবং জায়গা জমির ক্ষেত্রে দশ দিরহামের স্থলে বারো দিরহাম হওয়া غَبْنٌ فَاحِشٌ বলে বিবেচ্য হবে।

আর বাহ্যদৃষ্টিতে এমনটি ধারণা হওয়ার কারণ হলো, وَقِيْلَ فِى الْعُرُوْضِ الخ -এর আগে غَبْن فَاحِشْ -এর আলোচনাই অতীত হয়েছে, غَبْن يَسِيْر -এর কোনো আলোচনা হয়নি। কাজেই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইমাম কুদূরী (র.) وَقِيْلَ বলে পূর্বালোচিত غَبْن فَاحِشْ -এর ব্যাপারেই কোনো মতামত উল্লেখ করছেন। কিন্তু নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা شَمْسُ الدِّيْن اَحْمَدُ بْنُ قَوْدَرَ যিনি قَاضِىْ زَادَهْ নামে খ্যাত [মৃত্যু ৯৮৮ হি.] তিনি বলেন, আমার অভিমত হলো, এটা غَبْن يَسِيْر -এর ব্যাখ্যা। কেননা এ কথা অন্যান্য ফকীহ এবং সমস্ত মাশায়েখের বর্ণনার অনুকূলে। নেহায়া প্রণেতাও এমনটি বলেছেন। সুতরাং ক্ষতি যদি উল্লিখিত পরিমাণ মোতাবেক হয় তাহলে তা غَبْن يَسِيْر বলে বিবেচ্য হবে এবং ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক এবং কার্যকর হবে। আর যদি উল্লিখিত পরিমাণ থেকে বেশি হয় তাহলে তাকে غَبْن فَاحِشْ বলা হবে এবং ক্রয় চুক্তি উকিলের উপর আবশ্যক এবং কার্যকর হবে।

উল্লিখিত পরিমাণ যে غَبْن يَسِيْر এবং এর চেয়ে বেশি হলে غَبْن فَاحِشْ তার প্রমাণ হলো, غَبْن তথা ক্ষতি ঐ সময় বেশি হয় যখন মানুষের অভিজ্ঞতা কম হয়। আর যখন অভিজ্ঞতা বেশি হয় তখন ক্ষতি কম হয়। আর অভিজ্ঞতার কমবেশি লেনদেনের কমবেশি হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ লেনদেন এবং ব্যবসায়ের বেশি হওয়ার দ্বারা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, আর লেনদেন এবং ব্যবসার স্বল্পতার কারণে অভিজ্ঞতা কম হয়। আর একথা স্পষ্ট যে, আসবাবপত্রের লেনদেন বেশি হয় এবং জায়গা-জমির লেনদেন কম হয় এবং পশুর লেনদেন ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ মধ্যম ধরনের হয়। অতঃপর যেহেতু দশ দিরহাম এমন নিসাব যা চুরি হওয়ার দ্বারা চোরের হাত কাটা হয়, সেহেতু غَبْن يَسِيْر -এর ব্যাখ্যায় দশ দিরহামকে মূল রাখা হয়েছে। আর এক দিরহাম এমন সম্পদ যার কারণে ব্যক্তিকে কয়েদখানায় দিয়ে দেওয়া হয়। এ কারণেই তো অসচ্ছলতা এবং কার্পণ্যের স্থানসমূহে ব্যবসায় এক দিরহামের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় না। অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর এক দিরহাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না। এবং ক্রেতাও এক দিরহাম বেশি দিতে প্রস্তুত থাকে না।

যাহোক যখন এমনই হলো, তখন আসবাবপত্র যার ব্যবসা বেশি হয় তাতে এক দিরহামের ক্ষতি হওয়াকে সামান্য ক্ষতি বা غَبْن يَسِيْر ভাবা যায় না। হ্যাঁ, অর্ধ দিরহাম যেহেতু ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেহেতু পণ্যসামগ্রীর ব্যবসায়তে অর্ধ দিরহাম সামান্য ক্ষতি তথা غَبْن يَسِيْر বলে পরিগণিত হবে। আর পশুর লেনদেন যেহেতু সাধারণ পণ্য সামগ্রীর লেনদেনের তুলনায় কম তাই পশুর ব্যবসায়তে অর্ধ দিরহামের দ্বিগুণ অর্থাৎ এক দিরহাম অল্প ক্ষতি তথা غَبْن يَسِيْر বলে গণ্য হবে। আর জায়গা-জমি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির লেনদেন যেহেতু পশুর লেনদেনের তুলনায় আরও কম তাই জায়গা জমির লেনদেনের ক্ষেত্রে এক দিরহামের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই দিরহাম সামান্য ক্ষতি তথা غَبْن يَسِيْر বলে গণ্য হবে।

قَالَ : وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ مِنْ قَيْدِ الْاِفْتِرَاقِ وَالْاِجْتِمَاعِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِثَمَنِ النِّصْفِ يَجُوْزُ عِنْدَهُ فَاِذَا بَاعَ النِّصْفَ بِهِ اَوْلٰى وَقَالَا لَا يَجُوْزُ لِاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ ضَرَرِ الشِّرْكَةِ اِلَّا اَنْ يَبِيْعَ النِّصْفَ الْاٰخَرَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَصِمَا لِاَنَّ بَيْعَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيْلَةً اِلَى الْاِمْتِثَالِ بِاَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُفَرِّقَ فَاِذَا بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ الْاَوَّلِ تَبَيَّنَ اَنَّهُ وَقَعَ وَسِيْلَةً وَاِذَا لَمْ يَبِعْ ظَهَرَ اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَسِيْلَةً فَلَا يَجُوْزُ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি তাকে তার গোলাম বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে আর সে গোলামের অর্ধেক বিক্রি করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা বৈধ হবে। কেননা শব্দটি 'খণ্ডন ও অখণ্ডন।' এর শর্ত থেকে মুক্ত। দেখুন না, সে যদি সমগ্র গোলামকে অর্ধেকের মূল্যে বিক্রি করে তাহলে তার মতে তা জায়িজ হবে। সুতরাং যদি অর্ধেকের মূল্য দ্বারা অর্ধেক ক্রয় করে তাহলে তা আরো স্বাভাবিকভাবেই বৈধ হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কেননা অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা লোকপ্রচলিত নয়, তা ছাড়া তাতে অংশীদারিত্বের ক্ষতি রয়েছে। তবে উভয় বিবাদ করার পূর্বেই যদি বাকি অর্ধেক বিক্রি করে ফেলে তাহলে বৈধ হয়ে যাবে। কেননা অর্ধেক বিক্রি করা কখনো কখনো আদেশদাতার আদেশ পালনের মাধ্যম হতে পারে। যেমন পুরোটা ক্রয় করার মতো ক্রেতা পেল না, তখন ভাগ করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যখন প্রথম বিক্রয় বাতিল হওয়ার আগে অবশিষ্ট অংশ বিক্রি করল তখন প্রকাশ পেয়ে গেল যে, এটা [আদেশ পালনের] মাধ্যম হয়েছে। আর যদি বিক্রি না করে তাহলে প্রকাশ পাবে যে, তা আদেশ পালনের মাধ্যম হয়নি। সাহেবাইনের মতে এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ فَبَاعَ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে তার গোলাম বিক্রি করার উকিল নিযুক্ত করল, আর সম্পূর্ণ বা অর্ধেক কোনো শর্ত না করে অর্থাৎ তার উকিল নিয়োগ খণ্ডন অখণ্ডনের শর্ত থেকে মুক্ত থাকে। একথাও বলেনি যে, পুরো গোলাম বিক্রি করবে। আবার একথাও বলেনি যে, অর্ধেক গোলাম বিক্রি করবে। বরং শর্তমুক্তভাবে বলেছে আমার গোলামটা বিক্রি করে দাও। সুতরাং এখন যদি উকিল অর্ধেক গোলাম বিক্রয় করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ বিক্রয় জায়েজ এবং মুওয়াক্কিলের উপর তা কার্যকর হবে।

আর সাহেবাইনের মতে এ বিক্রয় জায়িজ নয় অর্থাৎ এ বিক্রয়ের কার্যকরিতা মুওয়াক্কিলের উপর হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুওয়াক্কিলের বক্তব্য অর্থাৎ গোলাম বিক্রয়ের আদেশ শর্তমুক্ত। তাতে সম্পূর্ণ গোলাম বিক্রয়ের কথাও নেই, অর্ধেকের কথাও নেই আর "শর্তমুক্ত কথাকে তার শর্তমুক্ততার উপরেই রাখতে হয়।" এ নীতির ভিত্তিতে উকিল পুরো গোলাম বিক্রি করার যেমন অধিকার রাখে, অর্ধেক গোলাম বিক্রিরও অধিকার রাখে। কাজেই ঐ অর্ধেক গোলাম বিক্রয় জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর তা কার্যকর হবে।

قَوْلُهُ اَلَا تَرَى اَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ الخ : এ দলিলটিকে আরো বেশি স্পষ্ট করার জন্য হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, যদি ঐ উকিল সম্পূর্ণ গোলামটিকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করে দেয় উদাহরণত এক হাজার টাকার গোলামকে পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ। সুতরাং যখন ইমাম সাহেবের মতে পুরো গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ হলো তখন অর্ধেক গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করা তো জায়েজ হবেই। কেননা অর্ধেক গোলামকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং বাকি অর্ধেক রেখে দেওয়ার মধ্যে মুওয়াক্কিলের বেশি লাভ রয়েছে। কেননা এ সুরতে মুওয়াক্কিলের অর্ধেক মূল্যও থাকবে এবং অর্ধেক গোলামও তার কাছে থাকবে আর যদি অর্ধেক মূল্যে পুরো গোলাম বিক্রি করে দেয় সেক্ষেত্রে অর্ধেক মূল্য তো তার কাছে আসে কিন্তু গোলামের কোনো অংশ তার কছে অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই প্রথম সুরত মুওয়াক্কিলের জন্য অধিক লাভজনক, আর দ্বিতীয় সুরত অলাভজনক। কাজেই যখন অলাভজনক সুরতে [অর্থাৎ সম্পূর্ণ গোলাম অর্ধেক মূল্যে বিক্রয়] জায়েজ হলো তখন অধিক লাভজনক সুরত অর্থাৎ অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে অর্ধেক গোলাম বিক্রয় তো জায়েজ হবেই।

কিন্তু যদি আপনি এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় এজন্য জায়েজ যে, এ বিক্রয়ে অংশীদারিত্বের ক্ষতি নেই। আর অর্ধেক গোলাম অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় এজন্য নাজায়েজ যে, তাতে অংশীদারিত্বের ক্ষতি রয়েছে। অর্থাৎ গোলামের মাঝে মুওয়াক্কিল এবং ক্রেতা উভয়ে অংশীদার হয়ে যাবে। অথচ অংশীদারিত্ব দোষ। সুতরাং অর্ধেক গোলাম অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেহেতু অংশীদারিত্বের ক্ষতি রয়েছে, সেহেতু এ বিক্রয় উকিলের পক্ষ থেকে নিজের মুওয়াক্কিলের বিরোধিতা করে অনিষ্ট করা হবে। আর উকিলের জন্য নিজের মুওয়াক্কিলের বিরোধিতা করে অনিষ্ট করা যেহেতু জায়েজ নয় সেহেতু উকিলের এ বিক্রয় জায়েজ হবে না এবং মুওয়াক্কিলের উপর তা কার্যকর হবে না। আর সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেহেতু অংশীদারিত্বের ক্ষতি পাওয়া যায় না, তাই এ বিক্রয়ে মুওয়াক্কিলের বিরোধিতা করে কোনো অনিষ্ট করা হবে না। কাজেই এ বিক্রয় জায়েজ হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপর তা কার্যকর হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এ আপত্তির উত্তর হলো, অর্ধেক গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে যদিও অংশীদারিত্বের ক্ষতি অবধারিত হয় এবং সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষতি থাকে না তথাপি সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের ক্ষতি বেশি হয়। এর তুলনায় অর্ধেক গোলাম অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের ক্ষতিটা অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং যখন ইমাম সাহেবের মতে গোলাম অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করা অর্থাৎ অধিক ক্ষতি বরদাশত করা জায়েজ হলো তখন অর্ধেক গোলামকে অর্ধেক দামে বিক্রি করা অর্থাৎ স্বল্প ক্ষতি বরদাশত করা তো জায়িজ হবেই।

একথা স্মর্তব্য যে, সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করা শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ। এ কারণেই يَجُوزُ عِنْدَهُ বলা হয়েছে। অন্যথায় সাহেবাইনের মতে নাজায়েজ। কেননা সম্পূর্ণ গোলামকে অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় غَبْنٌ فَاحِشٌ তথা অধিক লোকসানের শামিল। আর অধিক লোকসানে বিক্রি করা সাহেবাইনের মতে নাজায়েজ। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, মুওয়াক্কিলের নিজের গোলামকে বিক্রি করার উকিল নিয়োগ শর্তমুক্ত। যেমনটি ইমাম সাহেবের দলিলে অতিবাহিত হয়েছে। اَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ আর শর্তমুক্ত শব্দ দ্বারা লোকপ্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, আর অর্ধেক গোলাম বিক্রি অপ্রচলিত। কাজেই এ উকিল নিয়োগ অর্ধেক গোলাম বিক্রিকে শামিল করবে না। আর যখন এ উকিল নিয়োগ অর্ধেক গোলাম বিক্রয়কে শামিল করে না তখন উকিলের অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা মুওয়াক্কিলের আদেশ অমান্য করার নামান্তর হবে। আর উকিলের জন্য নিজের মুওয়াক্কিলের আদেশ অমান্য করা যেহেতু জায়েজ নয় সেহেতু উকিলের অর্ধেক গোলাম বিক্রি করাও জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, অর্ধেক গোলাম বিক্রি করার সুরতে মুওয়াক্কিল এবং ক্রেতা যেহেতু উভয়ে গোলামের মাঝে শরিক হয়ে যায় আর অংশীদারিত্ব একটি দোষ এজন্য এ অংশীদারিত্বের কারণে মুওয়াক্কিলের ক্ষতি হবে। আর উকিলের জন্য এমন কিছু করার অধিকার নিঃসন্দেহে নেই যাতে তার মুওয়াক্কিলের ক্ষতি সাধন হয়। কাজেই উকিল অর্ধেক গোলাম বিক্রি করার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না। এতদসত্ত্বেও যদি উকিল অর্ধেক গোলাম বিক্রি করে দেয় তাহলে এ বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ : এটা দ্বিতীয় দলিল তখন হবে যখন وَلِمَا فِيْهِ ওয়াও (وَاوْ) সহ পড়া হবে। আর যদি وَاوْ ছাড়া لِمَا فِيْهِ পড়া হয় যেমনটি হিদায়ার কোনো কোনো নুসখায় বিদ্যমান তাহলে এ পাঠাংশ মূল মাসআলায় সাহেবাইনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দলিল হবে না; বরং এ সুরতে এ পাঠাংশ অর্ধেক গোলাম বিক্রি প্রচলিত হওয়ার দলিল। আর একথা বলা হবে যে, অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা লোকপ্রচলিত নয়। এজন্য যে, তাতে অংশীদারিত্বের ক্ষতি রয়েছে।

যাইহোক অর্ধেক গোলাম বিক্রয় সাহেবাইনের মতে জায়েজ নয়। হ্যাঁ, যদি উকিল বাকি অর্ধেক উকিল মুওয়াক্কিলের বিবাদ করার পূর্বেই বিক্রি করে ফেলে তাহলে অর্ধেক গোলাম বিক্রয় সাহেবাইনের মতেও বৈধ হয়ে যাবে। কেননা অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা কখনো মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হয়ে যায়। এভাবে যে, উকিল এমন কাউকে পেল না যে একেবারে সম্পূর্ণ গোলাম ক্রয় করে ফেলবে, সে ক্ষেত্রে উকিলের প্রয়োজন দেখা দেয় অর্ধেক বিক্রি করার। সুতরাং যখন প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই উকিল বাকি অর্ধেকও বিক্রি করে দিল তখন প্রকাশ পেয়ে গেল যে, এটা আদেশ পালনের মাধ্যম হয়েছে। সুতরাং উকিলের জন্য প্রথম অর্ধেক বিক্রি করাও জায়েজ হবে। আর যখন উকিল অবশিষ্ট অর্ধক বিক্রি করল না তখন প্রকাশ পেয়ে গেল যে, প্রথম অর্ধেক বিক্রি করা মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম ছিল না। আর যখন এ সুরতে প্রথম অর্ধেক বিক্রি করা মুআক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হলো না তখন এই সুরতেও উকিলের জন্য প্রথম অর্ধেকের বিক্রয়ও জায়েজ হবে না। সারকথা হলো, মুওয়াক্কিলের মূল উদ্দেশ্য হলো, সম্পূর্ণ গোলাম বিক্রি করে দেবে। আর এ আদেশ দুভাবে পূর্ণ হতে পারে। একতো হলো, সম্পূর্ণ গোলাম ক্রয়কারী পাওয়া গেল তো উকিল সম্পূর্ণ গোলাম বিক্রি করে দিল। দ্বিতীয়ত হলো, সে অর্ধেক অর্ধেক করে বিক্রি করল। সুতরাং যদি সে উভয় অংশ বিক্রি করে চাই একবারে অথবা দুবারে তাহলে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য হাসিল হলো। আর যদি সে অর্ধেক গোলাম বিক্রি করে অতঃপর তার বিক্রয় ভেঙ্গে যায় তারপর সে অবশিষ্ট অর্ধেক বিক্রি করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। অথবা উকিল অর্ধেক বিক্রি করে বাকি অর্ধেক বিক্রি করতে না পারে এটাও জায়েজ হবে না। কেননা এ সুরতে মুওয়াক্কিলের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। হিদায়া প্রণেতা বলেন, সাহেবাইনের মতে এটা হলো সূক্ষ্ম যুক্তি তা না হলে قِيَاسٌ-এর দাবি হলো, অর্ধেক গোলাম বিক্রি জায়েজ হবে না। চাই দ্বিতীয় অর্ধেক গোলাম বিক্রি হোক, চাই না হোক।

وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرٰى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوْفٌ فَاِنِ اشْتَرٰى بَاقِيَةً لَزِمَ الْمُوَكِّلَ لِاَنَّ شِرَاءَ الْبَعْضِ قَدْ يَقَعُ وَسِيْلَةً اِلَى الْاِمْتِثَالِ بِاَنْ كَانَ مَوْرُوْثًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَحْتَاجُ اِلٰى شِرَائِهِ شِقْصًا شِقْصًا فَاِذَا اشْتَرٰى الْبَاقِيَ قَبْلَ رَدِّ الْاٰمِرِ الْبَيْعَ تَبَيَّنَ اَنَّهُ وَقَعَ وَسِيْلَةً فَيَنْفُذُ عَلَى الْاٰمِرِ وَهٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ وَالْفَرْقُ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ فِي الشِّرٰى يَتَحَقَّقُ التُّهْمَةُ عَلٰى مَا مَرَّ وَاٰخَرَانِ الْاَمْرِ بِالْبَيْعِ يُصَادِفُ مِلْكَهُ فَيَصِحُّ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ اِطْلَاقُهُ وَالْاَمْرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ فَلَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيْهِ التَّقْيِيْدُ وَالْاِطْلَاقُ.

অনুবাদ : আর যদি তাকে একটি গোলাম ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে আর সে গোলামের অর্ধেক ক্রয় করে তাহলে ক্রয় মওকুফ থাকবে। যদি সে অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করে তাহলে মুওয়াক্কিলের জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে। কেননা অর্ধেক অংশ ক্রয় করা কখনো কখনো আদেশ পালনের মাধ্যম হতে পারে। যেমন গোলামটি একদল লোকের মিরাসি মাল ছিল। ফলে ভাগে ভাগে ক্রয় করার প্রয়োজন হলো। সুতরাং আদেশদাতা বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের পূর্বে যদি অবশিষ্ট অংশ সে ক্রয় করে ফেলে তাহলে প্রকাশ পাবে যে, অর্ধেক অংশের ক্রয় আদেশদাতার আদেশ পালনের মাধ্যম হয়েছে। সুতরাং আদেশতার উপর এ বিক্রয় কার্যকর হবে। এটাই হলো আমাদের তিন ইমামের সর্বসম্মত অভিমত। বিক্রয় ও ক্রয়ের পার্থক্যের কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে এই যে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে তোহমত বিদ্যমান থাকে; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি পার্থক্য হলো, বিক্রয়ের আদেশ তার মালিকানার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং তার আদেশ বৈধতা লাভ করে। তাই সে ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিঃশর্ততা বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের আদেশ অন্যের মালিকানার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং তা বৈধ হতে পারে না। [কিন্তু প্রয়োজনের অনিবার্যতার কারণে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। আর লোকপ্রচলিত রূপ তথা পুরোটা ক্রয় দ্বারাই প্রয়োজন পুরো হয়।] সুতরাং শর্তাবদ্ধতা ও নিঃশর্ততা তাতে বিবেচ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرٰى نِصْفَهُ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি কাউকে গোলাম ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল, সুতরাং উকিল অর্ধেক গোলাম ক্রয় করল, এ ক্রয় সর্বসম্মতিক্রমে মওকুফ থাকবে। অর্থাৎ যদি উকিল গোলামের অবশিষ্টাংশও ক্রয় করে নেয় তবুও এ ক্রয় চুক্তি মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে না।

দলিল হলো, গোলামের একটা অংশ ক্রয় করা কখনো কখনো মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হয়ে যায় যেমন– একটি গোলাম কয়েকজন মানুষের মিরাস হলো, সেই কয়েকজন মানুষ এ গোলামের মালিক হবে। এখন যদি উকিল এ গোলাম ক্রয় করতে চায় তাহলে উকিলকে একেক অংশ করে সব মালিকের কাছ থেকেই ক্রয় করতে হবে। যাহোক যখন উকিল

মুওয়াক্কিলের অর্ধেক গোলামের বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের পূর্বেই গোলামের অবশিষ্টাংশও ক্রয় করে নিল তখন প্রকাশ পেয়ে গেল যে, প্রথম অর্ধেকের ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হয়েছিল। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, যেই সুরতে অর্ধেক গোলামের বিক্রয় মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হয় সে সুরতে বিক্রয়ের কার্যকারিতা মুওয়াক্কিলের উপর হয়। কাজেই ক্রয়ের সুরতেও যখন প্রথম অর্ধেকের ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের আদেশ পালনের মাধ্যম হলো তখন এ ক্রয় মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। কেননা এমন হলো যেন উকিল পুরো গোলাম ক্রয় করল।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, প্রথম অর্ধেকের ক্রয় যে মওকুফ থাকবে এ কথার উপর ইমাম সাহেব এবং সাহেবাইন সবাই একমত। কিন্তু ইমাম সাহেবের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হবে যে, ইমাম সাহেব এর পূর্বের মাসআলায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্ধেক গোলামের বিক্রয়কে স্থগিত রাখা ছাড়াই জায়েজ বলেছেন। আর এখানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্ধেক গোলামের ক্রয়কে মওকুফ রেখেছেন। কাজেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ কি?

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : হিদায়া প্রণেতা এর উত্তরে পার্থক্যের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম পার্থক্য হলো, ক্রয়ের মাসআলায় উকিলের ব্যাপারে তোহমত পাওয়া যায়। এভাবে যে, উকিল অর্ধেক গোলাম নিজের জন্য ক্রয় করেছিল কিন্তু যখন তাতে ক্ষতি অনুভূত হলো তখন সে ক্রয়টাকে মুওয়াক্কিলের জিম্মায় ফেলে দিল। সুতরাং এ তোহমতের কারণে অর্ধেক গোলামের ক্রয়কে স্থগিত রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যদি উকিল গোলামের অবশিষ্টাংশও ক্রয় করে নেয় তাহলে এ ক্রয় মুওয়াক্কিলের উপর কার্যকর হবে। আর যদি ক্রয় না করে তাহলে কার্যকর হবে না। কিন্তু বিক্রয়ের মাসআলায় এ তোহমত অনুপস্থিত এজন্য যে, অর্ধেক গোলামের বিক্রয় মুওয়াক্কিলের জন্যই হতে পারে, উকিলের জন্য নয়। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে বিক্রয়ের মাসআলায় অর্ধেক গোলামের বিক্রয়কে স্থগিত রাখা ছাড়াই জায়েজ বলা হয়েছে। আর ক্রয়ের মাসআলায় অর্ধেক গোলামের ক্রয়কে মওকুফ রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, বিক্রয়ের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের বিক্রয়ের নির্দেশ মুওয়াক্কিলের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ মুওয়াক্কিল নিজের মালিকানাধীন বস্তু বিক্রয়ের আদেশ দেয় আর মুওয়াক্কিলের যেহেতু নিজের মালিকানার উপর স্বাধীন ক্ষমতা আছে সেহেতু এ বিক্রয়ের নির্দেশ শুদ্ধ হবে। আর যখন মুওয়াক্কিলের বিক্রয়ের নির্দেশ শুদ্ধ হলো তখন তাতে নির্দেশের শর্তমুক্ততা বিবেচ্য হবে। আর যখন মুওয়াক্কিলের বিক্রয়ের আদেশের শর্তমুক্ততা বিবেচ্য হলো তখন উকিল সম্পূর্ণ গোলাম বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত যেমন হলো, অর্ধেক গোলাম বিক্রয়ের অধিকারও সে পেল। আর যখন উকিল অর্ধেক গোলাম বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হলো তখন তার অর্ধেক গোলাম বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের উকিল নিয়োগ ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের আদেশ নিজের মালিকানার বহির্ভূত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ মুওয়াক্কিল যে জিনিস ক্রয় করেছে সেটা মুওয়াক্কিলের মালিকানায় নেই; বরং বিক্রেতার মালিকানায় রয়েছে। আর নিজের মালিকানা বহির্ভূত বস্তুতে হস্তক্ষেপ শুদ্ধ নয়। সুতরাং তা ক্রয়ের আদেশও শুদ্ধ হওয়ার কথা না। হ্যাঁ, তবে এখানে যে ক্রয়ের আদেশ দান শুদ্ধ হয়েছে তা প্রয়োজনের কারণে। আর প্রয়োজনের কারণে যা সাব্যস্ত হয় তা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমিত থাকে। অর্থাৎ যতটুকুতে প্রয়োজন পুরো হয়ে যায় ততটুকুই জায়েজ হয় এর অতিরিক্ত জায়েজ হয় না। আর এখানে লোকপ্রচলিত পদ্ধতিতেই প্রয়োজন পূরণ হয়। আর লোকপ্রচলন হলো সম্পূর্ণ গোলাম ক্রয় করা। সুতরাং গোলাম ক্রয়ের আদেশ লোকপ্রচলনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ গোলাম ক্রয়ের আদেশ দানের নামান্তর হবে। আর যখন এমনই হলো তখন উকিল যে সুরতে সম্পূর্ণ গোলাম ক্রয় করবে [চাই একবারে অথবা কয়েক বারে] সেই সুরতে এ ক্রয় চুক্তি যেহেতু মুওয়াক্কিলের আদেশের অনুকূল সেহেতু মুওয়াক্কিলের উপর তা আবশ্যক হবে। আর যে সুরতে অর্ধেক গোলাম ক্রয় করবে সে সুরতে মুওয়াক্কিলের আদেশের অনুকূলে থাকার কারণে মুওয়াক্কিলের উপর আবশ্যক হবে না; বরং উকিলের উপর আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَمَنْ اَمَرَ رَجُلاً بِبَيْعِ عَبْدِهٖ فَبَاعَهٗ وَقَبَضَ الثَّمَنَ اَوْ لَمْ يَقْبِضْ فَرَدَّهٗ الْمُشْتَرِىْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ لاَ يَحْدُثُ مِثْلُهٗ بِقَضَاءِ الْقَاضِىْ بِبَيِّنَةٍ اَوْ بِاِبَاءِ يَمِيْنٍ اَوْ بِاِقْرَارِهٖ فَاِنَّهٗ يَرُدُّهٗ عَلَى الْاٰمِرِ لِاَنَّ الْقَاضِىَ تَيَقَّنَ بِحُدُوْثِ الْعَيْبِ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ فَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهٗ مُسْتَنِدًا اِلٰى هٰذِهِ الْحُجَجِ وَتَاوِيْلُ اِشْتِرَاطِهَا فِى الْكِتَابِ اَنَّ الْقَاضِىَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لاَ يَحْدُثُ مِثْلُهٗ فِىْ مُدَّةِ شَهْرٍ مَثَلاً لٰكِنَّهٗ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَارِيْخُ الْبَيْعِ فَيَحْتَاجُ اِلٰى هٰذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُوْرِ التَّارِيْخِ اَوْ كَانَ عَيْبًا لاَ يَعْرِفُهٗ اِلاَّ النِّسَاءُ اَوِ الْاَطِبَّاءُ وَقَوْلُهُنَّ وَقَوْلُ الطَّبِيْبِ حُجَّةٌ فِىْ تَوَجُّهِ الْخُصُوْمَةِ لاَ فِى الرَّدِّ فَيَفْتَقِرُ اِلَيْهَا فِى الرَّدِّ حَتّٰى لَوْ كَانَ الْقَاضِىْ عَايَنَ الْبَيْعَ وَالْعَيْبُ ظَاهِرٌ لاَ يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلاَ يَحْتَاجُ الْوَكِيْلُ اِلٰى رَدٍّ وَخُصُوْمَةٍ ـ

অনুবাদ : জামিউস সাগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে তার গোলামটিকে বিক্রি করে দেওয়ার আদেশ [ও দায়িত্ব] প্রদান করে, আর সেই ব্যক্তি সেটাকে বিক্রি করে, অতঃপর সে মূল্য উসুল করুক বা না করুক, ক্রেতা আদালতে রায়ের মাধ্যমে এমন কোনো দোষের কারণে গোলামটি ফেরত দেয় যা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয় না। আর আদালতের রায়ের ভিত্তি হলো, [বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত] সাক্ষী কিংবা [বিবাদীর] কসম করতে অস্বীকৃতি, কিংবা তার স্বীকারোক্তি। এমতাবস্থায় সে গোলামটি আদেশদাতার কাছে ফেরত দেবে। কেননা বিচারক বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় দোষ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। সুতরাং তার বিচার এ সকল প্রমাণের কোনোটির উপরই নির্ভরশীল হবে না। তবে জামিউস সাগীর কিতাবে এ সকল প্রমাণের কোনো একটি শর্ত আরোপের ব্যাখ্যা এই যে, কাজি এটা জানেন যে, এ ধরনের দোষ উদাহরণ স্বরূপ এক মাসের সময়সীমা উদ্ভূত হতে পারে না। তবে বিক্রয়ের তারিখ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে তারিখের বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানার জন্য তার এ সকল প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে। [আরেকটি ব্যাখ্যা হলো,] কিংবা ক্রেতা যে দোষের কারণে ফেরত দিতে চায় তা এমন দোষ, যা স্ত্রীলোকেরা ছাড়া কিংবা চিকিৎসকেরা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। আর স্ত্রীলোকের বক্তব্য এবং চিকিৎসকের মতামত বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপনের জন্য তা প্রমাণস্বরূপ বিবেচিত হবে, বিক্রেতার কাছে ফেরত প্রদানের জন্য প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে না। সুতরাং ফেরত প্রদানের জন্য এ সকল প্রমাণের মুখাপেক্ষী হবে। এজন্যই তো দোষটি যদি প্রকাশিত থাকে আর কাজি বিক্রয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাহলে কাজি এ সকল প্রমাণের কোনোটিরই মুখাপেক্ষী হবেন না। আর ফেরত প্রদানের এ ফয়সালা হচ্ছে মুওয়াক্কিলের উপর। সুতরাং উকিল মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে দাবি উত্থাপনের এবং ফেরত প্রদানের নতুন রায় লাভের মুখাপেক্ষী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে নিজের গোলাম বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। সুতরাং উকিল সেই গোলাম বিক্রি করে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে দিল। উকিল কবজা করুক আর না করুক, উভয় সুরতে যদি ক্রেতা ঐ গোলামকে উকিলের কাছে এমন কোনো দোষের কারণে ফিরিয়ে দেয়, যে ধরনের দোষ ক্রেতার কাছে হওয়া সম্ভব নয়। যেমন গোলামের হাতে অতিরিক্ত আঙ্গুল হওয়া অথবা এমন কোনো দোষের কারণে ফিরিয়ে দিয়েছে যেরূপ দোষ এতটুকু সময়ে হওয়া সম্ভব নয় যতটুকু সময় ক্রেতার কবজায় রয়েছে এবং ক্রেতার ঐ দোষযুক্ত গোলাম ফিরিয়ে দেওয়া কাজির মাধ্যমে হয়েছে এবং কাজির এ ফয়সালা ক্রেতার পেশকৃত প্রমাণের ভিত্তিতে হয়েছে অথবা প্রমাণ পেশ না করার সুরতে উকিলের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে হয়েছে অথবা উকিলের দোষ স্বীকার করার কারণে হয়েছে তিন সুরতেই উকিল এ গোলামকে মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে এবং এ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মামলা এবং কাজির ফয়সালার প্রয়োজন পড়বে না। কেননা কাজির ফয়সালার কারণে ক্রেতার পক্ষ থেকে গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এটাই তো মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পৃথক বিবাদ এবং মকদ্দমার প্রয়োজন নেই।

এর দলিল হলো, কথা যেহেতু ঐ দোষ সম্পর্কে যে দোষ ক্রেতার কাছে নতুন করে হতেই পারে না সেহেতু কাজির দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এ দোষ বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আর যখন কাজির এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তখন কাজি নিজের তথ্য-উপাত্য এবং বিশ্বাসের আলোকে ঐ দোষযুক্ত গোলামকে বক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা করতে পারে। আর এ ফয়সালার ভিত্তিতে গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়া যেমন উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ঠিক তেমনই তা মুওয়াক্কিলের কাছেও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু এ দলিলের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হবে যে, যখন দোষ এমন যে ক্রেতার কবজায় তা নতুন করে হতেই পারে না, তখন আবার কাজির ফয়সালাকে দলিল-প্রমাণের উপর মওকুফ রাখা হয়েছে কেন? কাজি তো নিজেই নিজের কাছের তথ্য এবং নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অন্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই ফয়সালা করে দিতে পারেন।

قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهُ مُسْتَنِدًا الخ : হেদায়া প্রণেতা এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়েই বলেন– فَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهُ مُسْتَنِدًا اِلٰى هٰذِهِ الْحُجَجِ الخ অর্থাৎ কাজির দোষযুক্ত গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা এসব প্রমাণের উপর মওকুফ নয়। এখানে ইবারতে فَلَمْ يَكُنْ -এর স্থলে وَلَمْ يَكُنْ অর্থাৎ فَاءْ -এর জায়গায় وَاوْ হলে ইবারত আরও বেশি স্পষ্ট হতো। কিন্তু এখানে এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হবে যে, যখন কাজির এ কথার বিশ্বাস আছে যে, এ দোষ বিক্রেতার কবজাতে থাকা অবস্থায় ছিল, ক্রেতার কবজায় এসে হয়নি। আর কাজির ফয়সালা উল্লিখিত প্রমাণসমূহের উপর মওকুফ নয় তখন মতনে [জামিউস সগীরে] এ প্রমাণের কথা উল্লেখ করা এবং তা শর্ত করার ফায়দা কি হলো?

এর উত্তর হলো, কাজির একথা তো জানা আছে যে, এ ধরনের দোষ উদাহরণত এক মাস সময়ে সৃষ্টি হতে পারে না কিন্তু কাজির তো আর একথা জানা নেই যে, বিক্রয় কখন সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা যদি দুই চার মাস পূর্বে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে এ দোষ ক্রেতার কব্জায় সৃষ্টি হতে পারে। আর এ দোষের কারণে তো ক্রেতা গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না। আর যদি এক মাসের কম সময়ে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে এ দোষ বিক্রেতার কবজায় সৃষ্ট এবং ক্রেতা সেই দোষের কারণে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। সুতরাং ক্রেতা বিক্রয়ের তারিখ নির্ধারণের জন্য উল্লিখিত তিন

প্রমাণের যে কোনো একটির মুখাপেক্ষী হবে। অর্থাৎ হয়তো ক্রেতা এ কথার প্রমাণ দেবে যে, বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়নি কাজেই এ দোষ বিক্রেতার কবজায় সৃষ্ট। অথবা বিক্রেতা শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। অথবা বিক্রেতা [উকিল] সেই দোষের কথা স্বীকার করবে। সুতরাং যেহেতু বিক্রয়ের তারিখ প্রকাশের জন্য এসব প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে সেহেতু জামিউস সাগীরে এসব প্রমাণের শর্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, কখনো ক্রেতা যে দোষের কারণে ফেরত দিতে চায় তা এমন দোষ, যা স্ত্রীলোকেরা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। যেমন– পণ্য দাসী হয় আর তার লজ্জাস্থানে কোনো অসুখ হয় অথবা সেই দোষ এমন হয় যা শুধু চিকিৎসকরাই জানতে পারে। যেমন– পুরনো কাশি। আর স্ত্রীলোক এবং চিকিৎসকের কথা এ ব্যপারে তো দলিল হতে পারে যে, ক্রেতা নিজের বিক্রেতার সাথে বিবাদ এবং ঝগড়া করবে কিন্তু স্ত্রীলোক এবং চিকিৎসকের কথার কারণে পণ্যকে বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উল্লিখিত প্রমাণসমূহের প্রয়োজন দেখা দেবে। এ কারণেই জামিউস সাগীরে উল্লিখিত প্রমাণসমূহ শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু যদি কাজি বিক্রয়ের সময় সামনে থেকে থাকে অর্থাৎ বিক্রয় চুক্তি তার সম্মুখেই সম্পন্ন হয়, আর তার সেই তারিখও স্মরণ থাকে আর দোষ একেবারে স্পষ্ট হয় তাহলে এ সুরতে কাজি উল্লিখিত প্রমাণসমূহের কোনোটির মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং কোনো প্রমাণ ছাড়াই গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা করে দেবেন। আর কাজির এ ফয়সালার কারণে ক্রেতার উকিলের কাছে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়াই মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ উকিলকে নিজের মুওয়াক্কিলের সাথে কোনো বিবাদ করতে হবে না এবং গোলামে মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না; বরং ক্রেতার পক্ষ থেকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারাই গোলাম মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত এসে যাবে।

এখানে এ আপত্তি হতে পারে যে, যখন উকিল দোষের কথা স্বীকার করল তখন সেই সুরতে কাজির ফয়সালার কি প্রয়োজন? স্বীকার করার কারণে উকিল তো দোষযুক্ত গোলামকে এমনিতেই গ্রহণ করবে। অথচ মতনে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও কাজির ফয়সালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বীকারোক্তির সুরতেও কাজির ফয়সালা করা আবশ্যক।

এর উত্তর হলো, এমন তো হতে পারে যে, উকিল দোষ তো স্বীকার করল কিন্তু তারপর সেই দোষযুক্ত গোলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাল। সেক্ষেত্রে কাজির ফয়সালা তাকে ঐ গোলাম ফেরত গ্রহণে বাধ্য করবে। অর্থাৎ এ সুরতে উকিলকে ফেরত নিতে বাধ্য করার জন্য কাজির ফয়সালার প্রয়োজন দেখা দেবে।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ اِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِبَيِّنَةٍ اَوْ بِاِبَاءِ يَمِيْنٍ لِاَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَالْوَكِيْلُ مُضْطَرٌّ فِى النُّكُوْلِ لِبُعْدِ الْعَيْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ مُمَارَسَةِ الْمَبِيْعِ فَلَزِمَ الْاٰمِرَ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অদ্রূপ যদি ক্রেতা উকিলের কাছে এমন কোনো দোষের কারণে ফেরত প্রদান করে যা হঠাৎ উদ্ভূত হতে পারে, বাইয়েনাহ -এর দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে কিংবা উকিলের কসম অস্বীকার করার কারণে। কেননা বাইয়েনাহ হলো পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ আর উকিল কসম অস্বীকার করতে বাধ্য। কেননা বিক্রীত গোলামের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকার কারণে দোষ সম্পর্কে তার অবগতি নেই। সুতরাং এ গোলাম আদেশদাতার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَكَذٰلِكَ اِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি ক্রেতা উকিলের কাছে গোলামকে এমন দোষের কারণে ফিরিয়ে দেয় যা হঠাৎ উদ্ভূত হতে পারে, আর গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা বাইয়েনাহর কারণে হয়, অথবা উকিলের শপথ অস্বীকার করার কারণে হয় উভয় সুরতে এ ফেরত দান মুওয়াক্কিলের দিকে হবে। মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দিতে উকিল বিবাদের মুখাপেক্ষী হবে না।

কারণ হলো, যদি ক্রেতা এ কথার উপর বাইয়েনাহ পেশ করে যে, এ দোষ বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল আর কাজি সেই বাইয়েনাহ-এর ভিত্তিতে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয়, তাহলে এ ফেরত আসা মুওয়াক্কিলের উপর হবে। এজন্য যে, বাইয়েনাহ পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ হয়। সুতরাং বাইয়েনাহ-এর কারণে দোষের সৃষ্টি যে, মুওয়াক্কিলের কাছে থাকা অবস্থায় তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যখন এটা সাব্যস্ত হলো গোলামের ফেরত আসা মুওয়াক্কিলের দিকেই হবে।

আর উকিলের শপথ অস্বীকারের সুরতে মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত আসার কারণ হলো, উকিল শপথ অস্বীকার করতে বাধ্য। এ কারণে বাধ্য যে, বিক্রীত গোলামের সাথে উকিলের ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকার কারণে দোষ সম্পর্কে তার অবগতি নেই। আর যখন উকিল গোলামের দোষ সম্পর্কে অধিক অবগত নয় তখন সে মিথ্যা শপথ গ্রহণে ভয় পাবে আর তার ফলশ্রুতিতে সে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। আর উকিল এ মসিবত মুওয়াক্কিলই ফেলেছে। কাজেই তাকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও মুওয়াক্কিলের কাজ। অর্থাৎ উকিলের উপর যে দায়িত্ব আসবে তা মুওয়াক্কিলের দিকেই ফিরে যাবে। সুতরাং শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে মুওয়াক্কিলের কাছেই গোলাম ফিরে আসবে। আর গোলাম ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উকিলের বিবাদ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না।

قَالَ : فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْمَأْمُوْرَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِهِ السُّكُوْتَ وَالنُّكُوْلَ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ فَيُلْزِمَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِنُكُوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُوْنُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِيْ حَقِّ ثَالِثٍ وَالْبَائِعُ ثَالِثُهُمَا وَالرَّدُّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ لِعُمُوْمِ وِلَايَةِ الْقَاضِيْ غَيْرَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَاصِرَةٌ وَهِيَ الْإِقْرَارُ فَمِنْ حَيْثُ الْفَسْخِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ وَمِنْ حَيْثُ الْقُصُوْرِ فِي الْحُجَّةِ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَالرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارِهِ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ مِنْ غَيْرِ خُصُوْمَةٍ فِيْ رِوَايَةٍ لِأَنَّ الرَّدَّ مُتَعَيِّنٌ وَفِيْ عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْحَقُّ فِيْ وَصْفِ السَّلَامَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الرَّدِّ ثُمَّ إِلَى الرُّجُوْعِ بِالنُّقْصَانِ فَلَمْ يَتَعَيَّنِ الرَّدُّ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْكِفَايَةِ بِأَطْوَلَ مِنْ هٰذَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দোষ জনিত ফেরত দানের ফয়সালা উকিলের স্বীকারোক্তির কারণে হয়, তাহলে এ ফেরত দান শুধু আদিষ্ট উকিলের উপর সাব্যস্ত হবে। কেননা স্বীকারোক্তি হলো ক্রটিপূর্ণ প্রমাণ। আর যেহেতু নীরবতা অবলম্বন কিংবা কসম অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল সেহেতু স্বীকারোক্তি করতে সে বাধ্য ছিল না। তবে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে সে এই মর্মে দাবি উত্থাপন করতে পারবে যে, [দোষটি মুওয়াক্কিলের কাছে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল] তখন তার উপস্থাপিত বাইয়েনাহ দ্বারা কিংবা মুওয়াক্কিলের কসম অস্বীকার করা দ্বারা মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ফেরত প্রদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফেরত প্রদান যদি উকিলের স্বীকারোক্তি দ্বারা, কিংবা আদালতের ফয়সালা ছাড়া হয়, আর দোষটি এমন হয় যা যে কোনো সময় উদ্ভূত হতে পারে, তাহলে উকিল তার বিক্রেতার [অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের] বিপক্ষে দাবি উত্থাপন করতে পারবে না। কেননা আদালতি ফয়সালা ছাড়া শুধু স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ফেরত প্রদান তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হবে। আর মূল বিক্রেতার [তথা মুওয়াক্কিল] এখানে তৃতীয় ব্যক্তি। পক্ষান্তরে [স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে] আদালতি ফয়সালার মাধ্যমে ফেরত প্রদানের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী বিক্রয় বাতিল করা। কেননা কাজির [উকিল মুওয়াক্কিল সবার উপর] পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। তবে স্বীকারোক্তিগত প্রমাণটি হলো ক্রটিপূর্ণ। সুতরাং এটা পূর্ববর্তী বিক্রয়ের রহিতকরণ হিসেবে উকিলের অধিকার থাকবে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে দাবি উত্থাপনের। পক্ষান্তরে প্রমাণটি ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কারণে এ ফেরত প্রদান উকিলের পক্ষ হতে উত্থাপিত প্রমাণ ছাড়া কিংবা উকিলের সাথে অস্বীকার ছাড়া মুওয়াক্কিলের উপর সাব্যস্ত হবে না। আর দোষ যদি

এমন হয় যা যে কোনো সময় উদ্ভূত হয় না এবং ফেরত প্রদান যদি উকিলের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালতি ফয়সালার মাধ্যমে হয়, তাহলে এক বর্ণনা মতে উকিলের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন ছাড়াই মুওয়াক্কিলের উপর তা আবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে ফেরত প্রদান নির্ধারিত। তবে [মাবসূত কিতাবের] সাধারণ বর্ণনা মতে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে দাবি উত্থাপনের অধিকার উকিলের থাকবে না। কারণ আমরা উল্লেখ করেছি [যে, তৃতীয়জনের ক্ষেত্রে এটা হলো নতুন বিক্রয়।] আর [বিক্রয়ের কারণে ক্রেতার প্রথম] হক বা অধিকার হলো বিক্রীত দ্রব্যের দোষমুক্ততার গুণ। অতঃপর তার অধিকার ফেরত প্রদানের দিকে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর [ফেরত প্রদান থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে] তার হক ক্ষতিপূরণের দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং ফেরত প্রদানের বিষয়টি অবধারিত হলো না। 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে বিষয়টি আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ بِإِقْرَارٍ لَزِمَ الْمَأْمُوْرَ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি উকিল গোলামের দোষ স্বীকার করে নেয় আর সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কাজির ফয়সালাতে ক্রেতা দোষযুক্ত গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেয় তাহলে এ গোলাম উকিলের জিম্মায় আবশ্যক হবে। অর্থাৎ এটা উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। মুওয়াক্কিলের কছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

কারণ হচ্ছে, স্বীকারোক্তি ত্রুটিযুক্ত প্রমাণ। কাজেই তার প্রতিক্রিয়া স্বীকারকারীর ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাবে, অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। অর্থাৎ স্বীকার করার কারণে স্বীকারকারী উকিলের কাছে গোলাম ফিরে আসবে; মুওয়াক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। আর উকিল স্বীকার করতে বাধ্যও ছিল না। কেননা তার পক্ষে চুপ থাকাও সম্ভব ছিল এবং শপথ চাওয়ার সুরতে শপথ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল। সুতরাং যদি স্বীকার না করত বরং চুপ থাকত, অথবা শপথ চাইলে শপথ করতে অস্বীকার করত তাহলে নীরবতা এবং অস্বীকৃতির জন্য ফয়সালা হয়ে যেত; স্বীকারোক্তির কারণে ফয়সালা হতো না। যাহোক উকিল দোষ স্বীকার করতে বাধ্য ছিল না; বরং স্বাধীন ছিল। আর যখন উকিল দোষ স্বীকার করতে বাধ্য ছিল না এতদসত্ত্বেও সে স্বীকার করেছে, তখন তার এ স্বীকারোক্তির ক্রিয়া শুধু তার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ তার কাছে গোলাম ফেরত আসবে। আর তার স্বীকারোক্তি মুওয়াক্কিলের উপর চাপানো হবে না। অর্থাৎ দোষযুক্ত গোলামের এ প্রত্যাবর্তন মুওয়াক্কিলের দিকে হবে না। তবে উকিলের জন্য নিজের মুওয়াক্কিলের সাথে বিবাদ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে অর্থাৎ উকিল কাজির আদালতে দাবি পেশ করে প্রমাণ পেশ করবে যে, গোলামের এ দোষ মুওয়াক্কিলের কাছে থাকা অবস্থায়ও ছিল। যদি উকিল এমন কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে গোলামের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে অর্থাৎ উকিল সেই গোলামকে মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেবে। আর যদি উকিল প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে মুওয়াক্কিলকে শপথ করতে বলা হবে। যদি মুওয়াক্কিল শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলেও গোলাম মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত আসবে।

এর বিপরীত যদি উকিল দোষ স্বীকার করে আর কাজির ফয়সালা ছাড়া শুধু উকিলের স্বীকারোক্তির কারণে গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আর দোষও এমন যার অনুরূপ দোষ যে কোনো সময় উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। এ সুরতে উকিলের জন্য তার মুওয়াক্কিলের সাথে বিবাদ করার অধিকারও থাকবে না। কেননা কাজির ফয়সালা ছাড়া শুধু উকিলের স্বীকারোক্তির কারণে গোলামের উকিলের কাছে ফেরত আসা উকিল এবং ক্রেতার মাঝে যদিও তা চুক্তি বাতিলের নামান্তর কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির জন্য তা নতুন চুক্তি বলে পরিগণিত। আর মুওয়াক্কিল তো এখানে ক্রেতা বিক্রেতার বাইরে তৃতীয় ব্যক্তি। যাহোক গোলামের এ ফিরে আসা যখন মুওয়াক্কিলের জন্য নতুন বিক্রয় হলো তখন উকিলের ঐ গোলামের ব্যাপারে তার মুওয়াক্কিলের সাথে বিবাদের

আর কোনো অবকাশ থাকবে না। আর কাজির ফয়সালার ভিত্তিতে দোষযুক্ত গোলাম উকিলের কাছে ফেরত দেওয়া বিক্রয় চুক্তিকে ফসখ করার সমতুল্য। এজন্য যে, কাজির সাধারণ ক্ষমতা থাকে কিন্তু এ 'ফসখ' ক্রটিযুক্ত প্রমাণ অর্থাৎ স্বীকারোক্তির কারণে হয়েছে। সুতরাং প্রমাণ ক্রটিযুক্ত হওয়ার কারণে দোষযুক্ত গোলামকে উকিলের কাছে ফেরত দেওয়া মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত দেওয়া হবে না। অর্থাৎ উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা এ গোলাম মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত আসবে না। তবে যদি উকিল প্রমাণ পেশ করে অথবা মুওয়াক্কিল শপথ অস্বীকার করে। আর এ ফিরে আসা যেহেতু বিক্রয় ফসখ করার নামান্তর সেহেতু এ ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিলের সাথে উকিলের বিবাদ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। কেননা বিক্রয় ফসখ করার সুরতে উকিল নিজের মুওয়াক্কিলের সাথে বিবাদের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। আর যদি গোলামের ভেতর এমন দোষ পাওয়া যায় যা যে কোনো সময় উদ্ভূত হতে পারে না, আর ক্রেতা গোলামকে উকিলের কাছে শুধু তার স্বীকারোক্তির কারণে কাজির ফয়সালা ছাড়া ফেরত দেয় তাহলে মাবসূতের কিতাবুল বুয়ূর এক বর্ণনা মতে এ ফেরত হওয়া বিবাদ ছাড়াই মুওয়াক্কিলের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্রেতার দোষযুক্ত গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারাই মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত এসে যাবে। আর এর জন্য উকিলের বিবাদ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। কেননা দোষ যখন এমন যা ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হতে পারে না, তখন সেই দোষের কারণে গোলাম ফিরিয়ে দেওয়া তো নির্ধারিত। অর্থাৎ উকিল এবং ক্রেতা উভয়ই ঠিক সেই কাজই করেছে যা কাজি করত। অর্থাৎ উকিল এবং ক্রেতা কাজির আদালতে এরূপ দোষের ব্যাপারে মকদ্দমা ওঠালে কাজি সেই গোলামকে উকিলের কাছে ফেরত দিত, আর সেই ফয়সালার ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের কাছে তা ফিরে আসত। উকিলের তখন মুওয়াক্কিলের সাথে সাথে বিবাদ করার ঝামেলা হতো না। যাহোক যখন উকিল এবং ক্রেতা ঠিক সেই কাজটিই করল যে কাজ কাজি করত তখন যেভাবে কাজির গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা মুওয়াক্কিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে যেত, তদ্রূপ ফয়সালা ছাড়া শুধু উকিলের স্বীকারোক্তির দ্বারা গোলামকে উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারাও মুওয়াক্কিলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য উকিল বিবাদের মুখাপেক্ষী হবে না।

আর মাবসূতের সাধারণ বর্ণনা হলো, এ সুরতে গোলাম শুধু উকিলের কাছে ফিরে আসবে মুওয়াক্কিলের কাছে ফেরত যাবে না, এবং উকিলের নিজের মুওয়াক্কিলের সাথে বিবাদের অধিকার থাকবে না।

এর দলিল পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, স্বীকারোক্তির কারণে ফয়সালা ছাড়া গোলামের প্রত্যাবর্তন উকিল এবং ক্রেতার জন্য যদিও ফসখের সমতুল্য তথাপি অন্যের জন্য তা নতুন চুক্তি। আর মুওয়াক্কিল তো তাদের দুজনের বাইরের মানুষ। সুতরাং তাদের দুজনের মাঝে সংগঠিত বিক্রয় তাদের বাইরে মুওয়াক্কিলের উপর কেন আবশ্যক হবে? অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের উপর তা আবশ্যক হবে না।

হেদায়া প্রণেতা لِأَنَّ الرَّدَّ مُتَعَيِّنٌ এর জওয়াব দিতে গিয়ে বলেন যে, 'গোলামের ফিরে আসা নির্ধারিত' সম্পূর্ণ ভুল। এজন্য যে, বিক্রয়ের কারণে ক্রেতার প্রথম হক বা অধিকার হলো বিক্রীত দ্রব্যের দোষমুক্ততার গুণ। অর্থাৎ ক্রেতা দোষমুক্ত পণ্যের হকদার হয় কিন্তু যখন পণ্য দোষমুক্ত না হয়; বরং তাতে দোষ পাওয়া যায়, তখন তার অধিকার ফেরত প্রদানের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যদি পূর্বের দোষ ছাড়া পণ্যের মাঝে ক্রেতার কাছে নতুন দোষও সৃষ্টি হয়, অথবা পূর্বের দোষ আরো বেড়ে যায় তাহলে এ সুরতে ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না; বরং ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ হিসেবে মূল্য ফেরত নিতে পারে। অর্থাৎ যে দোষ বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল তার কারণে গোলামের মূল্য যতটুকু কমত ক্রেতা বিক্রেতা থেকে সেই পরিমাণ ফেরত নিতে পারবে। যাহোক এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, দোষের কারণে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়া নির্ধারিত নয়। আর যখন ফেরত দেওয়া নির্ধারিত হলো না তখন আপনার বর্ণনাকৃত দলিল لِأَنَّ الرَّدَّ يَتَعَيَّنُ ও শুদ্ধ হবে না।

হেদায়া প্রণেতা বলেন যে, এ মাসআলাটিকে আমার আরেকটি কিতাব কিফায়াতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

قَالَ : وَمَنْ قَالَ لِاٰخَرَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِ عَبْدِيْ بِنَقْدٍ فَبِعْتَهُ بِنَسِيْئَةٍ وَقَالَ الْمَامُوْرُ اَمَرْتَنِيْ بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْاٰمِرِ لِاَنَّ الْاَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلاَ دَلاَلَةَ عَلَى الْاِطْلَاقِ . قَالَ : وَاِنِ اخْتَلَفَ فِيْ ذٰلِكَ الْمُضَارِبُ وَرَبُّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُوْمُ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِذِكْرِ لَفْظَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلَالَةُ الْاِطْلَاقِ بِخِلَافِ مَا اِذَا ادَّعٰى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِيْ نَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِيْ نَوْعٍ اٰخَرَ حَيْثُ يَكُوْنُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِاَنَّهُ سَقَطَ الْاِطْلَاقُ فِيْهِ بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ اِلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ مُطْلَقُ الْاَمْرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقْدًا وَنَسِيْئَةً اِلٰى اَيِّ اَجَلٍ كَانَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِاَجَلٍ مُتَعَارِفٍ وَالْوَجْهُ قَدْ تَقَدَّمَ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে নগদ মূল্যে আমার গোলাম বিক্রি করার আদেশ দিয়ে দিলাম। আর তুমি বাকি মূল্যে বিক্রি করছ পক্ষান্তরে আদিষ্ট উকিল বলে যে, তুমি আমাকে শুধু বিক্রি করতে বলেছ, নগদ-বাকির কথা কিছুই বলনি, তাহলে আদেশদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আদেশ তো তার পক্ষ থেকে এসেছে, সুতরাং তার আদেশ সম্পর্কে সেই ভালো জানবে। আর বক্তব্যের নিঃশর্ততার কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ বিষয়ে যদি মুযারিব ও মূলধনদাতা মতবিরোধ করে তাহলে মুযারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মুযারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে নিঃশর্ততাই হলো আসল অবস্থা। দেখুন না, শুধু মুযারাবা শব্দ ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে মুযারিব সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপের অধিকারী হয়ে থাকে। সুতরাং নিঃশর্ততার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে মূলধনদাতা যদি নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে মুযারাবা চুক্তির কথা দাবি করে আর মুযারিব অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুযারাবার কথা বলে, তখন মূলধনদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা পরস্পরের সত্যায়ন দ্বারা নিঃশর্ততার বিষয়টি তো রহিত হয়ে গেল। সুতরাং বিষয়টি নিছক ওকালাহ্ [যা উকিল নিয়োগের] পর্যায়ে পর্যবসিত হলো। আর ওকালাহ-এর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিঃশর্ত আদেশ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নগদ বিক্রি এবং যে কোনো মেয়াদের বিক্রি সবটাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে লোকপ্রচলিত মেয়াদকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে। উভয় পক্ষের দলিল পূর্বে [বিক্রয়ের উকিল নিয়োগ প্রসঙ্গে] বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِاٰخَرَ اَمَرْتُكَ بِبَيْعِ عَبْدِيْ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি মুওয়াক্কিল এবং উকিলের মাঝে মতানৈক্য হয়। মুওয়াক্কিল বলে যে, আমি তোমাকে নগদ বিক্রি করার আদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি তা বাকিতে বিক্রি করে দিয়েছ। আর উকিল বলে যে, না, এমন নয়; বরং আপনি চুক্তিকে শর্তমুক্ত রেখেছিলেন অর্থাৎ শুধু গোলাম বিক্রয়ের উকিল বানিয়ে

ছিলেন এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। নগদের কথাও বলেননি, বাকির কথাও বলেননি। এ সুরতে মুওয়াক্কিলের কথা ধর্তব্য হবে। কেননা আদেশ মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকেই আসে, আর যার কাছ থেকে আদেশ আসে সে সেই আদেশ সম্পর্কে অধিক অবগত হয়। কাজেই তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর এখানে বিক্রয়ের আদেশের নিঃশর্ততার উপর কোনো প্রমাণ নেই তাই তার আদেশকে নিঃশর্ত ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنِ اخْتَلَفَ فِىْ ذٰلِكَ الْمُضَارِبُ الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি মুযারাবা চুক্তিকে নিঃশর্ত রাখা এবং নগদের শর্ত রাখার ব্যাপারে মূলধনদাতা এবং মুযারিবের মাঝে পরস্পরে মতানৈক্য হয়। যথা- মূলধনদাতা দাবি করল যে, আমি মুযারিবকে এ মাল এ শর্তে দিয়েছিলাম যে, সে এটাকে নগদ বিক্রি করবে। আর মুযারিব বলল যে, নগদের শর্ত ছিল না; বরং শুধু মুযারাবার কথা হয়েছিল। তো এ সুরতে মুযারিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

দলিল হলো, মুযারাবার আদেশ যদিও মূলধনদাতার পক্ষ থেকে এসেছে তথাপি মূলধনদাতার দাবির বিপরীতে মুযারাবার নিঃর্শততার ইঙ্গিত এবং প্রমাণ রয়েছে। আর মুযারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে আসল হলো, তা নিঃশর্ত এবং ব্যাপক হবে। এ কারণেই তো যদি মূলধনদাতা এই বলে যে, আমি এ মাল মুযারাবার জন্য দিয়ে দিলাম তাহলে শুধু এতটুকু বলার দ্বারাই মুযারাবা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং মুযারিবের স্বাধীন হস্তক্ষেপের অধিকার অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং মুযারিব যে নিঃশর্ততার দাবি করে তার বক্তব্য আসল অবস্থার অনুকূল হবে। আর যার বক্তব্য আসল অবস্থার সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে তাকে فِقْه -এর পরিভাষায় مُدَّعٰى عَلَيْهِ তথা বিবাদী বলে। কাজেই মুযারিব مُدَّعٰى عَلَيْهِ তথা বিবাদী হবে। আর মূলধনদাতা مُدَّعِىْ তথা বাদী হবে। আর এই মাসআলাতো সেই সুরতে যখন বাদীর কাছে প্রমাণ অনুপস্থিত। আর বাইয়েনাহ বা প্রমাণ না থাকার সুরতে যেহেতু বিবাদীর কথা গ্রহণ করা হয় সেহেতু এখানে মুযারিব [যে বিবাদী বা مُدَّعٰى عَلَيْهِ] তার কথাই গ্রহণ করা হবে।

এর বিপরীত যদি মূলধনদাতা কাপড়ের একপ্রকারে মুযারাবা চুক্তির দাবি করল আর মুযারাবা অন্য এক কাপড়ে মুযারাবা চুক্তির দাবি করল, উদাহরণত মূলধনদাতা বলল যে, আমি সুতি কাপড়ের মুযারাবার জন্য টাকা দিয়েছিলাম আর মুযারিব বলে যে, আপনি পলেস্টার কাপড়ে মুযারাবার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এ সুরতে মূলধনদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মূলধনদাতার এবং মুযারিব উভয়ে এ কথার উপর একমত যে মুযারাবা শর্তমুক্ত নয়। এজন্য যে, তাদের উভয়ের প্রত্যেকেই এক বিশেষ প্রকারে মুযারাবার দাবি করেছে। সুতরাং যখন মুযারাবার শর্তমুক্ততা বিলুপ্ত হলো তখন ঐ মুযারাবা চুক্তিকে নিছক ওকালতে নামিয়ে আনা হবে। অর্থাৎ মূলধনদাতা মুওয়াক্কিল হবে আর মুযারিব উকিল হবে। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, মুওয়াক্কিল এবং উকিলের মাঝে মতানৈক্যের সুরতে মুওয়াক্কিলের কথা গ্রহণ করা হয় কাজেই এখানেও মূলধনতাদা যে মুওয়াক্কিলের অবস্থানে আছে তার বক্তব্য বিবেচ্য হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ مُطْلَقُ الْاَمْرِ بِالْبَيْعِ الخ : হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, ওকালতের সুরতে বিক্রয়ের শর্তমুক্ত নির্দেশ নগদ এবং বাকি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ যদি নগদ বিক্রির কথাও উল্লেখ না করে, বাকি বিক্রির কথাও উল্লেখ না করে, তাহলে এ সুরতে উকিল নগদ এবং বাকি উভয় পদ্ধতিতে বিক্রয় করতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বাকির সুরতে নির্ধারিত সময় যাই হোক- লোকপ্রচলিত হোক অথবা না হোক উভয় সুরতই জায়েজ। আর সাহেবাইনের মতে বাকির সুরতে নির্ধারিত সময় অবশ্যই লোকপ্রচলিত হতে হবে। অর্থাৎ সাহেবাইনের মতে বাকির সুরতে উকিল লোকপ্রচলিত সময় নির্ধারণ করে বাকিতে বিক্রি করতে পারে। কাজেই যদি উকিল অপ্রচলিত সময় সীমা নির্ধারণ করে বাকিতে মাল বিক্রি করে উদাহরণত পঞ্চাশ বৎসর বাকিতে বিক্রি করে তাহলে ইমাম সাহেবের মতে জায়েজ হবে কিন্তু সাহেবাইনের মতে জায়েজ হবে না।

قَالَ : وَمَنْ اَمَرَ رَجُلاً بِبَيْعِ عَبْدِهٖ فَبَاعَهُ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا فَضَاعَ فِىْ يَدِهٖ اَوْ اَخَذَ بِهٖ كَفِيْلاً فَتَوِى الْمَالُ عَلَيْهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ اَصِيْلٌ فِى الْحُقُوْقِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ مِنْهَا وَالْكَفَالَةُ تُوْثَقُ بِهٖ وَالْاِرْتِهَانُ وَثِيْقَةٌ لِجَانِبِ الْاِسْتِيْفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِاَنَّهٗ يَفْعَلُ نِيَابَةً وَقَدْ اَنَابَهٗ فِىْ قَبْضِ الدَّيْنِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ وَاَخْذِ الرَّهْنِ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَقْبِضُ اِصَالَةً وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ حَجْرَهٗ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো লোককে তার গোলাম বিক্রি করার দায়িত্ব প্রদান করে আর সে ঐ গোলাম বিক্রি করে এবং মূল্যের পরিবর্তে বন্ধক গ্রহণ করে, কিন্তু বন্ধক দ্রব্য তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা সে মূল্যের বিপরীতে কাফালাহ [ও জিম্মাদারি] গ্রহণ করেছিল কিন্তু মূল্য তার হাতছাড়া হয়ে গেল; এমতাবস্থায় তার উপর [আদিষ্ট উকিলের উপর] ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা [ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত] যাবতীয় হক-এর ক্ষেত্রে উকিলই হলো মূল ব্যক্তি। আর মূল্য কবজা করা উপরিউক্ত 'হক' এরই অন্তর্ভুক্ত। কাফালাহ [বা জিম্মাদারি] গ্রহণ করার অর্থ হলো মূল্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিতকরণ এবং বন্ধক গ্রহণের অর্থ হলো মূল্য উসুলের দিকটিকে নিশ্চিত করা। সুতরাং উকিল এ দুটির অধিকারী হবে। ঋণ উসুল করার উকিলের বিষয়টি ভিন্ন। [সে ঋণের বিপরীতে কাফিল বা বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে না।] কেননা সে তো পাওনাদারের স্থলবর্তী রূপে কাজ করে। আর সে তাকে শুধু ঋণ উসুলের ব্যাপারে স্থলবর্তী করেছে; কাফিল গ্রহণ কিংবা বন্ধক গ্রহণের জন্য নয়। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের উকিল মূল ব্যক্তি হিসেবে মূল্য গ্রহণ করে। এ কারণেই মুওয়াক্কিল তাকে মূল্য গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ اَمَرَ رَجُلاً بِبَيْعِ عَبْدِهٖ الخ : মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে তার গোলাম বিক্রি করার উকিল নিযুক্ত করল। সুতরাং উকিল সে গোলাম বিক্রি করে দিল। কিন্তু মূল্যের পরিবর্তে উকিল ক্রেতার কাছে থেকে বন্ধক গ্রহণ করল, আর সে বন্ধক উকিলের হাতে নষ্ট হয়ে গেল অথবা উকিল ক্রেতার কাছ থেকে মূল্যের জিম্মাদারি বা কাফালাহ গ্রহণ করল কিন্তু কাফালাত নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে যে, কাফালাহ এবং ক্রেতা উভয়ে কপর্দকহীন হয়ে মৃত্যুবরণ করল অথবা কাফালাহ মৃত্যুবরণ করল আর مَكْفُوْلٌ عَنْهُ অর্থাৎ ক্রেতা এমনভাবে হারিয়ে গেল যে, তার ঠিকানা জানা সম্ভব হলো না। অথবা কাফালাহ মৃত্যুবরণ করল আর مَكْفُوْلٌ عَنْهُ তথা ক্রেতা জীবিত, কিন্তু যখন এ মকদ্দমা কাজির আদালতে পেশ হলো তখন কাজিকে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুসারে কাফালতের কারণে اَصِيْل তথা মূল চুক্তি সম্পাদনকারী ক্রেতার দায়মুক্তির অভিমত পোষণকারী হিসেবে দেখা গেল। সুতরাং সেই কাজি নিজের বিশ্বাস এবং মাযহাব মোতাবেক মূল্য ক্রেতার দায়মুক্ততার আদেশ দিয়ে দিলেন। এ তিন সুরতে সেই মাল নষ্ট হয়ে গেল যেটা ক্রেতার উপর মূল্য হিসেবে ওয়াজিব ছিল। অর্থাৎ এ তিন সুরতে মূল্য উসুল করা অসম্ভব হয়ে গেল। যাহোক বন্ধক এবং কাফালাহ উভয় সুরতে উকিলের উপরে মুওয়াক্কিলের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা উকিল চুক্তির হকসমূহের ক্ষেত্রে اَصِيْل তথা মূল ব্যক্তি হয়। অর্থাৎ চুক্তির হকসমূহ মৌলিকভাবে উকিলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আর মূল্যের উপর কবজা করা এটাও চুক্তির

হকসমূহের মধ্য থেকে। আর মূল্য উসুল করার জন্য ক্রেতার কাছ থেকে কাফালাহ গ্রহণ এবং বন্ধক গ্রহণ মূল্য উসুলের দিকটিকে নিশ্চিতকরণের জন্য। অর্থাৎ কাফালাহ গ্রহণ এবং বন্ধক গ্রহণ এ উভয়টিই মূল্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সুতরাং যখন মূল্য উসুল করা উকিলের হক হলো তখন কাফালাহ গ্রহণ এবং বন্ধক রাখা যা সেই হককে দৃঢ় করে, সেটাও উকিলের হক হবে। আর উকিলই সেটার মালিক হবে। আর উকিলের কবজা থেকে যদি মূল্যের অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উকিলের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কেননা মূল্যের উপর উকিলের কবজা আমানতের কবজা হয়, আর আমানতের কবজা নষ্ট হওয়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কাজেই উকিলের উপর মূল্যের ক্ষতিপূরণও ওয়াজিব হবে না। সুতরাং বন্ধক যেহেতু মূল্যের বদল এবং স্থলাভিষিক্ত সেহেতু তা নষ্ট হওয়ার কারণেও উকিলের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ কাফালার সুরতেও উকিলের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা এ সুরতে মূল্যই নষ্ট হয়ে গেছে। আর মূল্য নষ্ট হওয়ার সুরতে উকিলের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কাজেই এ সুরতেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخ : পক্ষান্তরে যদি কেউ তার ঋণ উসুল করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে এরপর উকিল ঋণের পরিবর্তে দেনাদার থেকে বন্ধক রাখল তাহলে উকিলের এ বন্ধক গ্রহণ এবং কাফালাহ গ্রহণ জায়েজ হবে না। কাজেই যদি বন্ধক উকিলের কবজায় নষ্ট হয়ে যায় অথবা কাফালাহ এবং দেনাদার উভয়ে কাপর্দকহীন হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে উকিল ক্ষতিপূরণ থেকে দায়মুক্ত হবে না; বরং উকিলের উপর ঋণের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা ঋণ উসুল করার জন্য নিযুক্ত উকিল মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী হয়ে ঋণ উসুল করে এ কারণেই তো যদি মুওয়াক্কিল উকিলকে ঋণ উসুল করতে বাধা দেয় তাহলে তার এ বাধা দেওয়া শুদ্ধ। যাহোক যখন উকিল মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী হয়ে ঋণ উসুল করে তখন সে শুধু মুওয়াক্কিলের ঋণ উসুল করারই অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। কেননা মুওয়াক্কিল তাকে শুধু ঋণ উসুলের স্থলবর্তী করেছে, কাফীল এবং বন্ধক গ্রহণের স্থলবর্তী করেনি। কাজেই সে দেনাদার থেকে কাফালাহ এবং বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে না। আর বিক্রয়ের উকিল যেহেতু বিক্রয়ের হকসমূহে মূল ব্যক্তি হয় তাই সে মূল্যের উপর মূল হিসাবেই কবজা করে স্থলবর্তী হিসাবে নয়। এ কারণেই মুওয়াক্কিল তাকে মূল্যের উপর কবজা করা থেকে বাধা প্রদান করতে পারে না। সুতরাং উকিল এ সুরতে মালিকের স্তরে হবে। আর মালিক যদি মূল্যের বিনিময় গ্রহণ করে অথবা মূল্যের জন্য কাফালাহ গ্রহণ করে তাহলে তা জায়েজ হয়। কাজেই বিক্রয়ের উকিলও বন্ধক এবং কাফালাহ গ্রহণে আনুমতিপ্রাপ্ত হবে

فَصْلٌ : وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ فَلَيْسَ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا وُكِّلَا بِهٖ دُوْنَ الْاٰخَرِ وَ هٰذَا فِيْ تَصَرُّفٍ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الرَّاْيِ كَالْبَيْعِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِىَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَاْيِ اَحَدِهِمَا وَالْبَدَلُ وَاِنْ كَانَ مُقَدَّرًا وَلٰكِنَّ التَّقْدِيْرَ لَا يَمْنَعُ اِسْتِعْمَالَ الرَّأْيِ فِى الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِىْ ـ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি দুজনকে উকিল নিয়োগ করে, তাহলে যে বিষয়ে তাদের দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এটা হলো এমন হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে, যাতে মতামত প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন– বিক্রয়, খোলা ইত্যাদি। কেননা মুওয়াক্কিল তাদের উভয়ের মতামতের প্রতি সম্মত রয়েছে; একজনের মতামতের প্রতি নয়। আর [বিনিময় সুনির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান কেননা] বিনিময় সুনির্ধারিত হলেও এ নির্ধারণ মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং আদর্শ ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও মতামত প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ فَلَيْسَ لِاَحَدِهِمَا الخ : মাসআলার সুরত হলো, যদি কোনো ব্যক্তি দুজনকে এক কথায় উকিল নিযুক্ত করে উহাদরণত এমন বলে যে, আমি এ দুজনকে আমার গোলাম বিক্রয়ের অথবা স্ত্রীর সাথে খুলা করার উকিল নিযুক্ত করলাম তাহলে যে বিষয়ে তাদের দুজনকে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, এটা হলো এমন হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে যাতে মতামত প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন– বিক্রয়, খোলা ইত্যাদি। কেননা মুওয়াক্কিল যখন দুই ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করল তখন এর অর্থ হলো, মুওয়াক্কিল তাদের উভয়ের মতামতের প্রতি সম্মত রয়েছে, শুধু একজনের মতামতের প্রতি নয়। আর যখন মুওয়াক্কিল তাদের উভয়ের সম্মিলিত মতামতে সম্মত তখন একজনের হস্তক্ষেপে মুওয়াক্কিল সম্মত হবে না। আর যখন মুওয়াক্কিল একজনের হস্তক্ষেপে সম্মত নয় তখন শুধু একজনের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে না বরং উভয়ের ঐকমত্যে সম্মিলিত হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

قَوْلُهٗ وَالْبَدَلُ وَاِنْ كَانَ مُقَدَّرًا الخ : এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে–

প্রশ্ন : হলো, যদি বিনিময় নির্ধারিত থাকে উদাহরণত মুওয়াক্কিল একহাজার টাকার বিনিময়ে গোলাম বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল, অথবা এক হাজার টাকায় খোলা করার উকিল নিযুক্ত করল– এক্ষেত্রে উভয় উকিলের মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং যখন তাতে মতামতের প্রয়োজন নেই তখন উভয় উকিলের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই অন্য উকিল ছাড়া এ হস্তক্ষেপের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল। অথচ আপনি বলছেন, এ সুরতেও উভয়ের সম্মিলিত মতামত আবশ্যক।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিনিময় নির্ধারিত হওয়ার সুরতে যদিও নির্ধারিত বিনিময়ে কম করা সম্ভব নয়, কিন্তু বেশি করাতো সম্ভব। অর্থাৎ বিনিময় নির্ধারণ যদিও কম করার জন্য প্রতিবন্ধক কিন্তু বেশি করার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং উভয় উকিলের মতামত মিলিত হওয়ার দ্বারা অনেক সময় মূল্যের বৃদ্ধি হতে পারে। যাহোক এটা সাব্যস্ত হলো যে, এ সুরতেও উভয়ের মতামত মিলিত হওয়া উপকারী এবং কার্যকরি। তাছাড়া ক্রেতা কখনো কখনো গড়িমসি করে তার কাছ থেকে মূল্য উসুল করা কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং এমন ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধে গড়িমসি করে না [এমন আদর্শ ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে] বিচক্ষণতা এবং মতামতের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং এর দ্বারাও উভয় উকিলের মতামতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হবে। আর যখন উভয় উকিলের মতামতের প্রয়োজন আছে তখন শুধু এক উকিলের হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার হবে না।

قَالَ : اِلَّا اَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُوْمَةِ لِاَنَّ الْاِجْتِمَاعَ فِيْهَا مُتَعَذِّرٌ لِلْاِفْضَاءِ اِلَى الشَّغَبِ فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَّأْىُ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ سَابِقًا لِتَقْوِيْمِ الْخُصُوْمَةِ قَالَ : اَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهٖ بِغَيْرِ عِوَضٍ اَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهٖ بِغَيْرِ عِوَضٍ اَوْ بِرَدِّ وَدِيْعَةٍ عِنْدَهٗ اَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ لَا يَحْتَاجُ فِيْهَا اِلَى الرَّأْىِ بَلْ هُوَ تَعْبِيْرٌ مَحْضٌ وَعِبَارَةُ الْمُثَنّٰى وَالْوَاحِدِ سَوَاءٌ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لَهُمَا طَلِّقَاهَا اِنْ شِئْتُمَا اَوْ قَالَ اَمْرُهَا بِاَيْدِيْكُمَا لِاَنَّهٗ تَفْوِيْضٌ اِلٰى رَأْيِهِمَا اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ تَمْلِيْكٌ مُقْتَصَرٌ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلِاَنَّهٗ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبَرَهٗ بِدُخُوْلِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে যদি উভয়কে আদালতে দাবি উত্থাপন [বা দাবি রোধ] করার ব্যাপারে উকিল নিয়োগ করে [সে ক্ষেত্রে যে কোনো জন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।] কেননা আদালতের একত্র হওয়া কঠিন এজন্য যে, এতে কাজির মজলিসে শোরগোল সৃষ্টি হবে। আর মতামতের প্রয়োজন পড়ে বিচারকের মজলিস বসার পূর্বে, যাতে মামলা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিংবা স্ত্রীকে বিনিময় ছাড়া তালাক প্রদানের কিংবা গোলামকে বিনিময় ছাড়া আজাদ করার কিংবা তার কাছে বিদ্যমান আমানত ফেরত দেওয়ার কিংবা তার কাছে পাওনা ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে [উভয়কে একত্রিত হওয়া শর্ত নয়] কেননা এ সকল ক্ষেত্রে মতামত প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না; বরং এ ওকালাহ হচ্ছে নিছক [মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে] বক্তব্য উচ্চারণ। আর দুজনের কথা এবং একজনের কথা এক সমান। পক্ষান্তরে যদি উভয়কে বলে যে, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে পার কিংবা আমার স্ত্রীর বিষয়টি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম, [সে ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মিলিত মতামত অপরিহার্য।] কেননা বিষয়টিকে উভয়ের মতামতের উপর সোপর্দ করা হয়েছে। তাছাড়া দেখুন না, [মুওয়াক্কিলের] এ বক্তব্যের দ্বারা এমন মালিকানা প্রকাশ করা হয়, যা সে মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে। তাছাড়া মুওয়াক্কিল তালাককে উভয়ের কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং বিষয়টি উভয়ের গৃহে প্রবেশের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করার সাথে তুলনীয় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ اِلَّا اَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُوْمَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছিলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দুজনকে উকিল নিযুক্ত করে তো সে ক্ষেত্রে দুজনের জন্য অন্যজনের অনুমতি ছাড়া কোনো হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই। এখন এখানে বলছেন যে, কিন্তু কয়েকটি সুরত এমন আছে যেখানে দুজনকে উকিল নিযুক্ত করা সত্ত্বেও একজনের হস্তক্ষেপ বৈধ এবং যথেষ্ট।

তন্মধ্য হতে এক সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি কাজির আদালতে মকদ্দমা পেশ করার জন্য দু ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করল কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন অন্যজনকে ছাড়াই মকদ্দমা পেশ করে দিল তো এটা জায়েজ। তার কারণ হলো, মকদ্দামা পেশ করার সময় কাজির মজলিসে লোকজনের সমাবেশ অসম্ভব। কেননা কাজির মজলিসকে হৈচৈ থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। আর কাজির মাজলিসকে শোরগোল থেকে মুক্ত রাখা এজন্য আবশ্যক যে, মকদ্দমা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সত্যপ্রকাশ, আর শোরগোল হলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, শোরগোলের কারণে কাজির মজলিসের ভীতি দূর হয়ে যাবে। অথচ তা বাকি রাখাও আবশ্যক। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি মকদ্দমা পেশ করার জন্য দুজনকে উকিল নিযুক্ত করল অথচ তার জানা আছে যে, তাদের দুজনকে একত্র

করা অসম্ভব তখন যেন সে তাদের দুজনের একজনের মকদ্দমা পেশ করায় সম্মত হলো। আর যখন মুওয়াক্কিল একজনের মকদ্দমা পেশ করায় সম্মত হলো তখন তাদের মধ্যে থেকে শুধু এক উকিলের কাজির আদালতে মকদ্দমা পেশ করা শুদ্ধ এবং যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ وَالرَّأْيُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَابِقًا الخ : এখান থেকে ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু এক উকিলের মকদ্দমা পেশ করা জায়েজ নয়। কেননা মজবুতভাবে পেশ করার জন্য বিচক্ষণতা এবং পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর মুওয়াক্কিল তাদের উভয়ের মতে সম্মত। কাজেই তাদের মধ্য থেকে শুধু একজনের মতের উপর নির্ভর করা শুদ্ধ হবে না; বরং উভয়ের মাতামত একত্র হওয়া আবশ্যক। এর জবাব হলো, উভয়ের মতামত একত্রিত হওয়া মকদ্দমা পেশ হওয়ার পূর্বে জরুরি, যাতে মকদ্দমা মজবুতভাবে দাঁড় করানো যায়। আর যখন এমনই হলো তখন উভয় উকিল মকদ্দমা পেশ করার পূর্বে পরামর্শের মাধ্যমে মকদ্দমাকে মজবুত করবে। অতঃপর একজন উকিল কাজির মজলিসে গিয়ে তা পেশ করবে। যাহোক এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কাজির মজলিসে মকদ্দমা পেশ করার জন্য একজন উকিল যথেষ্ট দুজনের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় সুরত হলো, দুই ব্যক্তিকে এ কথার উপর উকিল নিযুক্ত করল যে, তারা উভয়ে কোনো বিনিময় ছাড়া তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। এ সুরতেও তাদের দুজনের একজনের তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে।

তৃতীয় সুরত হলো, যদি নিজের গোলামকে বিনিময় ছাড়া আজাদ করার জন্য দুই ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলেও তাদের দুজনের একজনের আজাদ করার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ সুরত হলো, যদি কারো কাছে কারো সম্পদ গচ্ছিত থাকে আর এ ব্যক্তি দুজনকে সেই গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে শুধু একজন উকিল এ গচ্ছিত সম্পদকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

পঞ্চম সুরত হলো, মুওয়াক্কিলের জিম্মায় যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করার জন্য মুওয়াক্কিল দুই ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করা তো দুজনের মধ্য থেকে শুধু একজনও ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يَحْتَاجُ الخ : শেষ চার সুরতের দলিল হলো, এ চার সুরতে পরামর্শ এবং মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং উকিল নিয়োগ শুধু কথা বলা বা কথা পৌছে দেওয়া অর্থাৎ তালাক দেওয়া, আজাদ করা, গচ্ছিত সম্পদ পৌছে দেওয়া এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উকিলের কাজ শুধু এতটুকু যে, সে মুওয়াক্কিলের কথাটাকে পৌঁছে দেবে। আর কথা পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন আর দুজন দুটোই সমান। কেননা উদ্দেশ্যে কোনো তারতম্য নেই। সুতরাং যেভাবে দুজন ব্যক্তি মুওয়াক্কিলের কথার প্রতিনিধিত্ব করবে, সেভাবে একজনও করবে। এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি দুই উকিলকে একথা বলে যে, আমার স্ত্রীকে যদি চাও তালাক দিয়ে দাও, অথবা একথা বলে যে, ঐ স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারটা তোমাদের দুজনের ইচ্ছাধীন, তাহলে এ দুই সুরতে শুধু এক উকিলের হস্তক্ষেপে যথেষ্ট হবে না; বরং উভয়ের সম্মিলিত হস্তক্ষেপ আবশ্যক। কেননা মুওয়াক্কিল তালাকের বিষয়টাকে তাদের দুজনের মতামতের উপর সোপর্দ করেছে, কাজেই তাদের উভয়ের মতামত একত্রিত হওয়া জরুরি। তাছাড়া মুওয়াক্কিলের এ কথা বলা "তোমরা দুজন চাইলে তাকে তালাক দিয়ে দাও", বা একথা বলা "আমার স্ত্রীর তালাকের বিষয় তোমাদের ইচ্ছাধীন" মূলত এটা তাদের উভয়কে তালাকের মালিক বানানোর নামান্তর। আর মালিক বানানো যেহেতু মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই এটাও মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর উভয় উকিল মজলিসের ভেতরেই তালাক দেওয়ার অধিকার রাখবে।

যাহোক যখন এ দুই সুরতে দুই উকিলকে তালাকের মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো তখন তালাক দেওয়াটা তদের দুজনেরই অধিকার হয়ে গেল। কাজেই তাদের দুজনের একজন আরেকজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না; বরং উভয়ের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মুওয়াক্কিল তালাককে দুই উকিলের কাজের সাথে বুলিয়ে রেখেছে, কাজেই তালাক তখনই হবে যখন দুই উকিলের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়ার কাজটা পাওয়া যাবে। আর এটা এমন হলো যেমন কেউ দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল যে, যদি তোমরা দুজন ঘরে প্রবেশ কর তাহলে সে তালাক। এ সুরতে তো তখনই তালাক হবে যখন তারা দুজনই ঘরে প্রবেশ করবে। অনুরূপ এ মাসআলাতেও তখনই তালাক হবে যখন দুই উকিলই তালাক দেবে।

قَالَ : وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُوَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهٖ لِاَنَّهٗ فُوِّضَ اِلَيْهِ التَّصَرُّفُ دُوْنَ التَّوْكِيْلِ بِهٖ وَهٰذَا لِاَنَّهٗ رَضِىَ بِرَأْيِهٖ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُوْنَ فِى الْاٰرَاءِ قَالَ : اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ لِوُجُوْدِ الرِّضَاءِ اَوْ يَقُوْلَ لَهٗ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ لِاِطْلَاقِ التَّفْوِيْضِ اِلٰى رَأْيِهٖ وَاِذَا جَازَ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ يَكُوْنُ الثَّانِىْ وَكِيْلًا عَنِ الْمُوَكِّلِ حَتّٰى لَا يَمْلِكَ الْاَوَّلُ عَزْلَهٗ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهٖ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْاَوَّلِ وَقَدْ مَرَّ نَظِيْرُهٗ فِىْ اَدَبِ الْقَاضِىْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে বিষয়ে তাকে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে অন্যকে উকিল নিয়োগ করার অধিকার তার নেই। কেননা মুওয়াক্কিল তার হাতে এ ব্যাপারটি অর্পণ করেছে। এ ব্যাপারে অন্যকে উকিল নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করেনি, আর এটি [উকিলের উকিল নিয়োগের এ অবৈধতা] এ কারণে যে, মুওয়াক্কিল তার মতামতে সম্মত হয়েছে। আর মতামতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে যদি মুওয়াক্কিল এ বিষয়ে তাকে অনুমতি প্রদান করে। কেননা তখন সম্মতি বিদ্যমান রয়েছে। কিংবা যদি তাকে বলে যে, তুমি তোমার মত অনুযায়ী কাজ কর। কেননা তার মতামতের উপর অর্পণকে নিঃশর্ত করা হয়েছে। এ সুরতে যখন উকিলের উকিল নিয়োগ বৈধ হলো তখন দ্বিতীয়জন মূল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকেই উকিল হবে। সুতরাং প্রথম উকিল দ্বিতীয় উকিলকে বরখাস্ত করার অধিকারী হবে না এবং প্রথমজনের মৃত্যুতে দ্বিতীয়জন অপসারিত হবে না। আবার মূল মুওয়াক্কিলের মৃত্যুর কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় উকিল অপসারিত হবে। কাজির আচরণ বিধি প্রসঙ্গে এর সদৃশ মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُوَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهٖ الخ : মাসআলার সুরত হলো, উকিলকে যে কাজের উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে, উকিল সেই কাজে দ্বিতীয় কাউকে উকিল নিযুক্ত করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। কেননা মুওয়াক্কিল উকিলের হাতে শুধু ঐ কাজটি অর্পণ করেছে। সেই কাজে অন্যকে উকিল নিয়োগের ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করেনি। সুতরাং যখন অন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করার দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়নি তখন সে অন্যকে উকিল নিয়োগের অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। আর উকিলের উকিল নিয়োগের এ অবৈধতা এ কারণে যে, মুওয়াক্কিল শুধু উকিলের মতামতে সম্মত হয়েছে। আর মতামতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই তার মতামতে সম্মত হওয়ার দ্বারা অন্যদের মতামতের সম্মত হওয়া জরুরি নয়।

আর যখন এমনই হলো তখন উকিলের নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ঐ কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করা মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হবে। আর মুওয়াক্কিলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ জায়েজ নয়। কাজেই উকিলের জন্য অন্য কাউকে উকিল নিয়োগও জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি মুওয়াক্কিল নিজের উকিলকে এ কথার অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে উকিলের জন্য উকিল নিয়োগ বৈধ হবে। কেননা তখন উকিলের উকিল নিয়োগদানে মুওয়াক্কিলের সম্মতি আছে। অথবা মুওয়াক্কিল নিজের উকিলকে একথা বলে যে, তুমি তোমার মতো কাজ কর, তো এ সুরতেও তার উকিল নিয়োগের অনুমতি হবে। কেননা এ সুরতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা শর্তমুক্তভাবে উকিলের মতের উপর সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মুওয়াক্কিলের অনুমতি এবং আদেশ অনুযায়ী উকিল অন্যকে উকিল নিয়োগ করতে পারবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, যখন উল্লিখিত দুই সুরতে উকিলের উকিল নিয়োগ জায়েজ হলো তখন দ্বিতীয় উকিল মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিল হবে; প্রথম উকিলের পক্ষ থেকে নয়। কাজেই প্রথম উকিল দ্বিতীয় উকিলকে বরখাস্ত করতে পারবে না এবং প্রথম উকিলের মৃত্যুতে দ্বিতীয় উকিল বরখাস্ত হবে না। হ্যাঁ, তবে মুওয়াক্কিলের মৃত্যুতে উভয় উকিল বরখাস্ত হয়ে যাবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, এ মাসআলার সদৃশ কাজির আচরণ বিধি অর্থাৎ اَدَبُ الْقَاضِىْ অধ্যায়ের بَابُ التَّحْكِيْمِ পরিচ্ছেদের পূর্বে فَصْلٌ اٰخَرُ -এর আলোচনায় হিদায়ার মূল কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১৪১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে হিদায়া প্রণেতা বলেছেন যে, কাজির অধিকার নেই ওজর বশত কিংবা বিনা ওজরে বিচারকার্যে অন্য কাউকে স্থলবর্তী করা। তবে যদি সে ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করা হয়ে থাকে। কেননা তাকে বিচার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, বিচারক নিয়োগের দায়িত্বভার নয়। সুতরাং উকিল কর্তৃক অন্যকে উকিল নিয়োগের মতো হলো।

قَالَ : فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيْلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ حُضُوْرُ رَأْيِ الْأَوَّلِ وَقَدْ حَضَرَ وَتَكَلَّمُوْا فِيْ حُقُوْقِهِ وَإِنْ عَقَدَ فِيْ حَالِ غَيْبَتِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ فَاتَ رَأْيُهُ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ فَيُجِيْزَهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْوَكِيْلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ لِأَنَّهُ حَضَرَ رَأْيُهُ وَلَوْ قَدَّرَ الْأَوَّلُ الثَّمَنَ لِلثَّانِيْ فَعَقَدَ بِغَيْبَتِهِ يَجُوْزُ لِأَنَّ الرَّأْيَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهِ لِتَقْدِيْرِ الثَّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدْ حَصَلَ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِمَا مَعَ تَقْدِيْرِ الثَّمَنِ ظَهَرَ أَنَّ غَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِيْ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ الثَّمَنَ وَفَوَّضَ إِلَى الْأَوَّلِ كَانَ غَرَضُهُ رَأْيَهُ فِيْ مُعْظَمِ الْأَمْرِ وَهُوَ التَّقْدِيْرُ فِي الثَّمَنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুওয়াক্কিলের অনুমতি ছাড়া সে যদি কাউকে উকিল নিয়োগ করে আর দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের উপস্থিতিতে কোনো চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা উদ্দেশ্য হলো প্রথমজনের মতামত বিদ্যমান থাকা, আর তা বিদ্যমান আছে। আর উক্ত চুক্তির হক বা দায়দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হবে, [প্রথম উকিলের উপর না দ্বিতীয় উকিলের উপর] সে সম্পর্কে মাশায়েখগণ আলোচনা করেছেন। আর যদি তার অনুপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদন করে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা তার মতামত অনুপস্থিত রয়েছে। তবে যদি তার কাছে খবর পৌঁছে আর সে অনুমোদন করে, [তাহলে জায়েজ হবে।] একই বিধান হবে যদি উকিল ছাড়া অন্য কেউ চুক্তি সম্পাদন করে আর উকিল খবর পেয়ে তা অনুমোদন করে। কেননা তার মতামত বিদ্যমান হয়েছে। আর যদি প্রথমজন দ্বিতীয়জনের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেয় আর দ্বিতীয়জন প্রথমজনের অনুপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে জায়েজ হবে। কেননা বাহ্যত মূল্য নির্ধারণের জন্যই চুক্তিতে তার মতামতের প্রয়োজন পড়ে। আর তা তো হয়েছেই। পক্ষান্তরে যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে দুজন উকিল নিয়োগ করে তাহলে দুজনের কেউ ঐ নির্ধারিত মূল্য এককভাবে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা মূল্য নির্ধারণের পরও যখন বিষয়টি তাদের দুজনের হাতে অর্পণ করেছে তখন পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, তার উদ্দেশ্য হলো বর্ধিত মূল্যের ক্ষেত্রেও ক্রেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত একত্র হওয়া। যেমন আমরা বলে এসেছি। পক্ষান্তরে মুওয়াক্কিল যদি মূল্য নির্ধারণ না করে চুক্তির দায়িত্ব প্রথম উকিলের উপর অর্পণ করে, তখন বোঝা যায় যে, মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে চুক্তির প্রধান বিষয় তথা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার মতামতের উপর নির্ভর করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ الخ : মাসআলার সুরত হচ্ছে, যদি উকিল নিজের মুওয়াক্কিলের অনুমতি ব্যতীত কাউকে সে ব্যাপারে উকিল বানিয়ে দেয় যে ব্যাপারে তাকে উকিল বানানো হয়েছিল, আর দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের উপস্থিতিতে চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলে তাহলে এ চুক্তি কার্যকর হবে। কেননা মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, প্রথম

উকিলের মত থাকে যেন। আর উল্লিখিত সুরতে তো তার মত বিদ্যমান হলোই। সুতরাং যখন প্রথম উকিলের মত পাওয়া গেল তখন মুওয়াক্কিলের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেল। আর যখন মুওয়াক্কিলের লক্ষ্য অর্জিত হলো তখন দ্বিতীয় উকিলের সম্পাদিত চুক্তিও বৈধ হবে। হ্যাঁ, তবে ওলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, দ্বিতীয় উকিলের সম্পাদিত চুক্তির হকসমূহ বা দায়দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হবে। এ ব্যাপারে মতানৈক্য এজন্য হয়েছে যে. ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর' কিতাবে এ মাসআলার কোনো হুকুম উল্লেখ করেননি। যাহোক তবে কতিপয় আলেম বলেছেন যে, উক্ত চুক্তির দায়দায়িত্ব প্রথম উকিলের উপর অর্পিত হবে। কেননা মুওয়াক্কিল এ কথাতেই সম্মত হয়েছে যে, দায় দায়িত্ব এবং হকসমূহ প্রথম উকিলের উপর অর্পিত হবে।

আর কিছু আলেম বলেছেন যে, এ চুক্তির হকসমূহ দ্বিতীয় উকিলের উপর অর্পিত হবে। কেননা চুক্তি দ্বিতীয় উকিলই সম্পন্ন করেছে, প্রথম উকিল সম্পন্ন করেনি। আর যে চুক্তি সম্পাদন করে তার উপরই হকসমূহ অর্পিত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উকিলের উপরই হকসমূহ অর্পিত হবে। আর যদি দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের অনুপস্থিতিতে চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে এ চুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা এ সুরতে প্রথম উকিলের মতামত অনুপস্থিত।

হ্যাঁ, যদি দ্বিতীয় উকিলের চুক্তির সংবাদ প্রথম উকিলের কাছে পৌছে যায় আর প্রথম উকিল সেই চুক্তির অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে প্রথম উকিলের মতামত প্রাপ্তির কারণে এ চুক্তি কার্যকর হবে। তদ্রূপ যদি উকিল ছাড়া অন্য কেউ চুক্তি সম্পন্ন করে আর উকিল যখন সেই চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে তার অনুমতি দেয় তাহলে এ সুরতেও চুক্তি কার্যকর হবে।

আর যদি প্রথম উকিল দ্বিতীয় উকিলের কাছে ঐ বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে দেয় যে বস্তু বিক্রি করার জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় উকিল প্রথম উকিলের অনুপস্থিতিতে সেটাকে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল তো এ বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা বাহ্যত চুক্তির মূল্য নির্ধারণের জন্যই মতামতের প্রয়োজন পড়ে। আর এ উদ্দেশ্য অর্থাৎ মূল্যের নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। আর যখন উদ্দেশ্য সাধিত হলো তখন প্রথম উকিলের উপস্থিতি আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সামান বিক্রি করতে দুই উকিল নিয়োগ করে, আর মুওয়াক্কিল সেই সামানের মূল্যও নির্ধারণ করে দেয় তথাপি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে এক উকিলের বিক্রয় সম্পাদন সঠিক হবে না; বরং উভয় উকিলের মতামত একত্র হওয়া আবশ্যক। কারণ হলো, মুওয়াক্কিলের মূল্য নির্ধারণ সত্ত্বেও উক্ত বস্তুটিকে বিক্রয়ের জন্য দুই উকিল নির্ধারণ করা এ কথার দলিল যে, মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য হলো, দুই উকিলের মত একত্রিত হওয়ার দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। অথবা উভয় উকিল মিলে এমন ক্রেতা নির্বাচন করবে যে মূল্য পরিশোধে গড়িমসি করবে না। যাহোক যখন মূল্য নির্ধারণ সত্ত্বেও দুই উকিল নির্ধারণে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য এই হলো তখন শুধু এক উকিলের বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যখন মুওয়াক্কিলের মূল্য নির্ধারণ না করে; বরং বিক্রয় চুক্তিকে প্রথম উকিলের উপর অর্পণ করে দিল তখন সে সুরতে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্য এই থাকে যে, বিক্রয় চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মূল্য নির্ধারণে প্রথম উকিলের মতামত বিদ্যমান থাকুক। সুতরাং যখন প্রথম উকিল বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ করে দিল তখন তাতে তার মতামত প্রাপ্ত হলো। আর যখন প্রথম উকিলের মতামত প্রাপ্ত হলো তখন দ্বিতীয় উকিলের জন্য অনুপস্থিতিতেও বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَالَ : وَاِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ اَوِ الْعَبْدُ اَوِ الَّذِىْ اِبْنَتَهُ وَهِىَ صَغِيْرَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ اَوْ بَاعَ اَوْ اشْتَرٰى لَهَا لَمْ يَجُزْ مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فِىْ مَالِهَا لِاَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ يَقْطَعَانِ الْوِلَايَةَ اِلَا يَرٰى اَنَّ الْمَرْقُوْقَ لَا يَمْلِكُ اِنْكَاحَ نَفْسِهٖ فَكَيْفَ يَمْلِكُ اِنْكَاحَ غَيْرِهٖ وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتّٰى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلِاَنَّ هٰذِهٖ وِلَايَةٌ نَظْرِيَّةٌ فَلَابُدَّ مِنَ التَّفْوِيْضِ اِلَى الْقَادِرِ الْمُشْفِقِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى النَّظْرِ وَالرِّقُّ يُزِيْلُ الْقُدْرَةَ وَالْكُفْرُ يَقْطَعُ الشَّفْقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا تُفَوَّضُ اِلَيْهِمَا .

অনুবাদ: ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুকাতাব কিংবা গোলাম জিম্মি যদি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ও মুসলিম কন্যাকে বিবাহ দেয় কিংবা তার অনুকূলে ক্রয়বিক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। ক্রয়বিক্রয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত কন্যার মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ। কেননা দাসত্ব ও কুফরি কর্তৃত্বকে রহিত করে দেয়। দেখুন না, গোলাম তো নিজেকে বিবাহ প্রদানের [অর্থাৎ নিজে বিবাহ করার] অধিকারী নয়। সুতরাং সে কিভাবে অন্যকে বিবাহ দিতে পারে। তদ্রূপ কাফিরের তো মুসলমানের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তাই মুসলমানের বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। তাছাড়া এ কর্তৃত্ব হলো কাল্যাণমূলক। সুতরাং তা এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা জরুরি যার সক্ষমতা রয়েছে এবং স্নেহ রয়েছে, যাতে কল্যাণের গুণটি সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ দাসত্ব সক্ষমতাকে রহিত করে আর কুফরি মুসলমানের প্রতি স্নেহকে রহিত করে। সুতরাং এ কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ اَوِ الْعَبْدُ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি মুকাতাব অথবা গোলাম অথবা জিম্মি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান, স্বাধীন মেয়েকে বিবাহ দেয় অথবা তার অনুকূলে ক্রয়বিক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। হিদায়া প্রণেতা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ক্রয়বিক্রয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত কন্যার মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ।

ইনায়া প্রণেতা বলেন, হিদায়া প্রণেতার এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এজন্য হলো যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যে اَوِ اشْتَرٰى لَهَا এই পাঠাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, সে অর্থাৎ মুকাতাব কিংবা গোলাম কিংবা জিম্মি তাদের নিজের সম্পদের বিনিময়ে তাদের নাবালেগ স্বাধীন মেয়েদের জন্য কিছু ক্রয় করেছে। আরেকটি অর্থ হলো, মুকাতাব গোলাম বা জিম্মি তাদের নাবালেগ স্বাধীন মুসলিম মেয়ের জন্য সেই মেয়ের মাল থেকে ক্রয়বিক্রয় করবে। আর প্রথম সুরত যেহেতু সংশয়হীনভাবে জায়েজ, তাই এখানে দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ মুকাতাব, গোলাম অথবা জিম্মি যদি তার স্বাধীন, নাবালেগ, মুসলিম মেয়ের অনুকূলে সেই মেয়েরই সম্পদে কোনো হস্তক্ষেপ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য এবং জায়েজ হবে না। তার কারণ হলো, সন্তানের মালে পিতার হস্তক্ষেপের অধিকার সন্তানের উপর তার وِلَايَةٌ বা কর্তৃত্বের কারণে। আর মুকাতাব, গোলাম এবং জিম্মির তাদের সন্তানের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। কেননা দাসত্ব এবং কুফরি কর্তৃত্বকে রহিত করে দেয়। তার প্রমাণ হলো, দাস নিজেই নিজেকে বিবাহ দিতে পারে না। আর যখন সে নিজের বিবাহই সম্পন্ন করতে পারে না তখন অন্যের বিবাহ কিভাবে সম্পাদন করবে? আর সম্পদের হস্তক্ষেপেও সে مَحْجُوْرٌ বা বারণকৃত। আর জিম্মির কর্তৃত্ব মুসলমান স্বাধীনের উপর রহিত এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ মু'মিনদের উপর কাফিরদেরকে আল্লাহ কখনোই কর্তৃত্ব দেবেন না। [সূরা নিসা : আয়াত- ১৪১] এ কারণেই তো মুসলমানের বিরুদ্ধে জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না এবং মুসলমান ও জিম্মি একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো, সন্তানের উপর পিতার এ কর্তৃত্ব হলো কল্যাণমূলক। সুতরাং তা এমন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা জরুরি, যার সক্ষমতা রয়েছে এবং স্নেহ রয়েছে, যাতে কল্যাণের গুণটি সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ দাসত্ব সক্ষমতাকে রহিত করে, আর কুফরি মুসলমানের প্রতি স্নেহকে রহিত করে। সুতরাং এ কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ করা যাবে না।

وَقَالَ : اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اَلْمُرْتَدُّ اِذَا قُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهٖ وَالْحَرْبِيُّ كَذٰلِكَ لِاَنَّ الْحَرْبِيَّ اَبْعَدُ مِنَ الذِّمِّيِّ فَاَوْلٰى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ وَاَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتَصَرُّفُهٗ فِىْ مَالِهٖ اِنْ كَانَ نَافِذًا عِنْدَهُمَا لٰكِنَّهٗ مَوْقُوْفٌ عَلٰى وَلَدِهٖ وَمَالِ وَلَدِهٖ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهَا وِلَايَةٌ نَظْرِيَّةٌ وَذٰلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمِلَّةِ وَهِىَ مُتَرَدِّدَةٌ ثُمَّ تَسْتَقِرُّ جِهَةُ الْاِنْقِطَاعِ اِذَا قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ فَبَطَلَ وَبِالْاِسْلَامِ يُجْعَلُ كَاَنَّهٗ لَمْ يَزَلْ كَانَ مُسْلِمًا فَيَصِحُّ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুরতাদ হওয়ার কারণে কতলকৃত মুরতাদ এবং হারবীর হুকুমও অনুরূপ। কেননা [মুসলমানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে] হারবী জিম্মি থেকে আরো দূরবর্তী। সুতরাং কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার ব্যাপারে সে অধিক যোগ্য। পক্ষান্তরে নিজের মালের ক্ষেত্রে মুরতাদের হস্তক্ষেপ সাহেবাইনের মতে যদিও কার্যকর, কিন্তু তার সন্তানের ব্যাপারে এবং সন্তানের মালের ব্যাপারে সর্বসম্মতি ক্রমে তার হস্তক্ষেপ স্থগিত থাকবে। [যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কার্যকর হবে। অন্যথায় রহিত হবে।] কেননা এটা হলো কল্যাণমূলক কর্তৃত্ব আর কল্যাণ বিদ্যমান হবে ধর্মের অভিন্নতা দ্বারা, আর তা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যখন রিদ্দাতের কারণে জেল হয়ে যায় তখন কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার দিকটি স্থির হয়ে যাবে। ফলে তার হস্তক্ষেপ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে, যেন সে অব্যাহতভাবেই মুসলমান ছিল। সুতরাং তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) مُحَمَّدٌ وَالْمُرْتَدُّ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুরতাদ হওয়ার কারণে কতলকৃত মুরতাদ এবং হারবীর হুকুমও অনুরূপ। মাসআলার সুরত হলো, এক ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেল। তার ছোট একটি মেয়ে আছে। সে মুরতাদ অবস্থায় তার সেই ছোট মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দিল। এর পরে তাকে রিদ্দাতের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো অথবা কোনো হারবী তার মুসলমান নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দিল তো এ বিবাহ কার্যকর হবে না। অদ্রূপ তার মালের মাঝে হারবী অথবা মুরতাদ পিতার কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা হারবী এবং মুরতাদ পিতার তাদের সন্তানের উপর কর্তৃত্ব থাকে না। হারবীর কর্তৃত্ব থাকে না তার কারণ হলো, মুসলমানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হারবী জিম্মি থেকে আরো দূরবর্তী যদিও সে আমান নিয়ে আসে। মুসলমানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জিম্মির তুলনায় হারবীর দূরবর্তী হওয়ার কারণ হলো, জিম্মি আমাদের দিনের অনুসারী না হলেও আমাদের দেশের অধিবাসী। পক্ষান্তরে হারবী আমাদের দীনের অনুসারীও নয় এবং আমাদের দেশের অধিবাসীও নয়। সুতরাং যখন জিম্মির কর্তৃত্ব রহিত হলো তখন হারবীর কর্তৃত্ব তো রহিত হবেই।

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتَصَرُّفُهٗ فِىْ مَالِهٖ اِنْ كَانَ نَافِذًا الخ : নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা বলেন, মুরতাদের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন যে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষের কাছে এ কথাও অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, এখানে মুসান্নেফের ভাষ্যে সুকঠিন জট রয়েছে। টেনেটুনে ব্যাখ্যা করা ছাড়া যার অস্পষ্টতা দূর হওয়ার নয়। আমার

বিস্ময় লাগে যে, ব্যাখ্যাতাগণ এ জট খুলতে কোনো রকম প্রয়াস পাননি অথচ অনেক ছোটখাটো টুকিটাকি সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ আলোচনা করেন। এখানে ইবারতটা হওয়া উচিত ছিল এমন– وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِنَّ وَلَايَتَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ أَمْوَالِهِمْ مَوْقُوفَةٌ بِالْإِجْمَاعِ নাতায়েজ প্রণেতার বক্তব্য এখানেই শেষ হলো [ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে]। নাতায়েজুল আফকার প্রণেতার উল্লিখিত ইবারতের অর্থ হলো, মুরতাদ যদি তার সন্তানের বিবাহ দেয় কিংবা তার মালে কোনো হস্তক্ষেপ করে তাহলে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হলো, মুরতাদের সন্তান ও সন্তানের সম্পদের উপর সর্বসম্মতিক্রমে তার কর্তৃত্ব স্থগিত থাকে। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কার্যকর হয় অন্যথায় রহিত হয়।

মুরতাদের কর্তৃত্ব স্থগিত থাকার কারণ হলো, এটা হচ্ছে কল্যাণমূলক কর্তৃত্ব। আর কল্যাণ বিদ্যমান হবে ধর্মের অভিন্নতা দ্বারা। আর এ ক্ষেত্রে তার ধর্ম দোদুল্যমান তাই স্থগিত রাখা আবশ্যক হলো। সুতরাং যদি হত্যা করা হয় তাহলে কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার দিকটি স্থির হবে। সুতরাং তার চুক্তিসমূহ বাতিল হবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করে ধরা হবে যেন সে মুসলমানই ছিল, সুতরাং তার হস্তক্ষেপ শুদ্ধ হবে।

বি. দ্র. মুরতাদের হস্তক্ষেপ তার নাবালেগ সন্তানের ব্যাপারে স্থগিত হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শুধু সাহেবাইনের নাম উল্লেখ করার কারণ তাঁদের দুজনের মতে মুরতাদের নিজের মালের ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার নিজের মালেও কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং সাহেবাইনের কথা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন হলো যে, সাহেবাইনের মতে যদিও মুরতাদের নিজের ব্যাপারে গৃহীত হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয় তথাপি তার সন্তানের ব্যাপারে গৃহীত তার হস্তক্ষেপসমূহ তাঁদের মতেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতো স্থগিত থাকবে। তবে মুরতাদের প্রসঙ্গে সাহেবাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ স্পষ্ট হলেও হারবীর প্রসঙ্গে সাহেবাইনকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ মোটেও বোধগম্য নয়।

ফায়দা : নাতায়েজুল আফকার প্রণেতা বলেন, একটি কথা বাকি রয়ে গেল। আর তা হলো হলো, লেখক وَإِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْعَبْدُ أَوِ الذِّمِّيُّ اِبْنَتَهُ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করলেন এগুলো কখনোই ওকালতের সাথে সম্পর্কিত মাসআলা নয়। আর ঠিক এই পাঠাংশই আরেকবার كِتَابُ النِّكَاحِ-এর بَابُ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَكْفَاءِ তে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটাকে পুনর্বার উল্লেখ করা তাও আবার কিতাবুল ওকালাহতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অপ্রাসঙ্গিক, যোগসূত্রহীন ও অসঙ্গত।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

قَالَ : اَلْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) هُوَ يَقُولُ اَنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ وَلَنَا اَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ اِتْمَامَهُ وَتَمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ (رحـ) لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى اَصْلِ الرِّوَايَةِ لِاَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا اِلَّا اَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ فَالْفَتْوَى عَلَى اَنْ لَا يَمْلِكَ ـ

পরিচ্ছেদ : দাবি উত্থাপন এবং কবজা করার জন্য উকিল নিয়োগ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাবি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত উকিল কবজা করার জন্যও উকিল বলে গণ্য হবে- আমাদের মতে। ইমাম যুফার (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মুওয়াক্কিল তো দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। আর কবজা করা তো উত্থাপন থেকে ভিন্ন বিষয়। আর সে ব্যাপারে মুওয়াক্কিল সম্মত হয়নি। আমাদের দলিল হলো, কেউ যদি কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করে, তবে সে তাকে পূর্ণতা দানেরও মালিক হবে। আর দাবি উত্থাপনের পূর্ণতা ও সমাপ্তি কবজার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে বর্তমান যুগে উকিলদের মাঝে খেয়ানতের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইমাম যুফার (র.) -এর মত অনুযায়ী ফতোয়া হবে। এছাড়া কখনো কখনো এমন ব্যক্তিকেও দাবি উত্থাপনের [মামলা পরিচালনার] ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, যাকে কোনো মালের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা যায় না। এর উদাহরণ হলো, ঋণের তাগাদা করার জন্য নিযুক্ত উকিল- মাবসূতের বর্ণনা অনুসারে- এ ঋণের টাকা উসুল ও কবজা করার অধিকার রাখে। কেননা আরবি শব্দ تَقَاضِيْ আভিধানিকভাবে قَبْض -এর সমার্থক। কিন্তু [উরফ] প্রচলিত নীতি [অনুসারে বিষয়টি] এর বিপরীত। তাই [উরফ] প্রচলিত নীতিকে আভিধানিক অর্থের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ভিত্তিতে ফতোয়া হলো ঋণের তাগাদার জন্য নিযুক্ত উকিল কবজা করার অধিকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মামলা মকদ্দমায় দাবি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত উকিলের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে বাদীর দাবি প্রমাণিত করার জন্য কাজির সামনে যে সকল বিষয়াদি উপস্থাপন করা আবশ্যক, উকিল নিযুক্ত করা হলে বাদীর পক্ষ থেকে তার উকিলকেই দাবি প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সব বিষয়াদি সম্পাদন করে যেতে হবে। এক পর্যায়ে দাবি প্রমাণিত হয়ে গেলে সে অধিকারকে হস্তগত [কবজা] করে দেওয়া সে উকিলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়টিই উপরিউক্ত ইবারতের প্রতিপাদ্য বিষয় মাসআলাটিতে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে কবজা করে দেওয়াও উকিলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই দাবি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত উকিল কবজা করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে।

এ অভিমতের বিপরীতে মত পেশ করেন ইমাম যুফার (র.)। তিনি বলেন, দাবি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত উকিল কবজা করার জন্য উকিল বলে সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ অভিমত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রা.) থেকে এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের স্বপক্ষেই অভিমত পাওয়া যায়। তবে যে মতটি সর্ব প্রসিদ্ধ তা হলো ইমাম যুফার (র.)-এর স্বপক্ষে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল : ইমাম যুফার (র.) তাঁর দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, خُصُوْمَتٌ [তথা মামলা-মকদ্দমায় দাবি উত্থাপন করা] এবং قَبْض [অধিকারকে হস্তগত করা] দুটি আলাদা বিষয়। কারণ خُصُوْمَتٌ বা মামলা। পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের দাবিকে প্রমাণিত করার জন্য উকিল গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তির চালাক চতুর হওয়া এবং সতর্কতার সাথে কথা বলার যোগ্যতাটাই হয় মৌলিকভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তির বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির ব্যাপারটা এক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে قَبْض বা অধিকারকে হস্তগত করার জন্য উকিল নিয়োগের বিষয়টি হলো এমন যেখানে উকিলের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার বিষয়টিই হয়ে থাকে মৌলিকভাবে লক্ষণীয়। তাইতো মামলা পরিচালনা করার জন্যে মানুষ এমন অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও উকিল বানাতে প্রস্তুত থাকে যাকে সে কোনো মাল কবজা করার জন্য উকিল বানাতে সম্মত নয়। ফলেই খুসূমতের [মামলায় দাবি উত্থাপনের] জন্য নিযুক্ত উকিলের ক্ষেত্রে যেহেতু মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে খুসূমতের বিষয়েই তার ওকালতি গ্রহণের সম্মতি সুনিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে, তাই কেবল এক্ষেত্রেই তাকে উকিল বলে সাব্যস্ত করা হবে। দাবি প্রমাণিত হয়ে গেলে সে মাল কবজা করে দেওয়া এ উকিলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ কবজা করা খুসূমত ব্যতীত একটি আলাদা বিষয় যে বিষয়ে তাকে উকিল বানানোর ব্যাপারে মুওয়াক্কিলের সুস্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا :

ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : উপরে আলোচিত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছুর মালিক হয় তখন তার পরিপূর্ণতা এবং সমাপ্তিকরণের দায়িত্ব তার ঘাড়েই বর্তায়। আর মামলা-মকদ্দমায় দাবি উত্থাপনের বিষয়টির পরিসমাপ্তি যেহেতু অধিকারকে [কবজা] হস্তগত করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তাই দাবি প্রমাণিত হয়ে গেলে তা কবজা করে দেওয়াও উক্ত উকিলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ মানুষ যখন আপন বিবদমান কোনো অধিকারের চূড়ান্ত ফয়সালা বের করা নিজের জন্য দুঃসাধ্য মনে করে, তখনই সে ব্যাপারে ফয়সালা চূড়ান্ত করার জন্য তার পক্ষে কোনো উকিলের সাহযোগিতা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে। এ ভিত্তিতে যেমনিভাবে কাজির দরবারে মৌলিক সত্যতা ও বাস্তবসম্মত দাবি উপস্থাপনের মধ্যমে মুআক্কিলের পক্ষ থেকে কাজির কাছে ফয়সালা তলব করা উকিলের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, তেমনিভাবে তার মুওয়াক্কিলের পক্ষে কাজির ফয়সালা এসে গেলে বিবাদীর হাত থেকে অধিকারটিকে উসুল করে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে তার মুওয়াক্কিলের হাতে পৌঁছানোও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ তাৎক্ষণিকভাবে অধিকারটিকে [কবজা] উসুল না করা হলে, পরবর্তীতে বিবাদী এ ফয়সালাকে অস্বীকার করা অথবা দাবি আদায়ে গড়িমসি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাই দাবি উসুল [কবজা] করার আগেই যদি উকিল তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, তারপর বিবাদী উক্ত অধিকারকে আদায় করতে অস্বীকার করে বসে তাহলে আবারো বাদীর জন্য বিষয়টির সুরাহা করার উদ্দেশ্যে কাজির শরণাপন্ন হতে হবে। অথচ এ ভেজাল থেকে মুক্ত থেকে বিষয়টির পরিপূর্ণ সুরাহা করার উদ্দেশ্যেই সে প্রথমবার উকিলের সাহযোগিতা চেয়েছিল। আর উসুল [কবজা] করার দায়িত্ব উকিলের উপর হলেই মামলার পরিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মুওয়াক্কিলের সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব। তাই এদিক বিবেচনা করেই ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) বলেন যে, মামলায় দাবি উত্থাপনের জন্য নিযুক্ত উকিল [কবজা] উসুল করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে। -[তাযিজুল আফকার]

قَوْلُهُ وَالْفَتْوٰى الْيَوْمَ عَلٰى قَوْلِ زُفَرَ (رحـ) : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, "কিন্তু বর্তমান যুগে উকিলের মাঝে খিয়ানতের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ইমাম যুফার (র.)-এর মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেওয়া হয়।" একথা বলে লেখক মাশায়েখে বলখের ফতোয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। মাশায়েখে বলখের ফতোয়া এরূপ। কারণ "খুসূমতের [মামলায় দাবি উত্থাপনের] জন্য নিযুক্ত

উকিল কবজা করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে।" একথাটি دَلَالَةُ النَّصِّ কিংবা صَرَاحَةُ النَّصِّ কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়। صَرَاحَةُ النَّصِّ থেকে প্রমাণিত না হওয়ার বিষয়টি তো খুবই স্পষ্ট, কারণ কুরআন বা হাদীসের সরাসরি কোনো বিধান থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিল নিযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দের মাঝেও কবজা করার জন্য ওকালতির বিষয়ে বলা হয়নি। আর دَلَالَةُ النَّصِّ থেকে বিষয়টি এজন্য প্রমাণিত নয় যে, কারণ মানুষ কখনো এমন ব্যক্তিকেও খুসূমতের জন্য উকিল বানাতে সম্মত যার আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়ার কারণে তার দ্বারা দাবি উসুল [কবজা] করাতে সম্মত হয় না; বরং উকিল কর্তৃক কোনো প্রকার খিয়ানতের ভয়ে কবজা করার কাজটি নিজেই সম্পাদন করতে চায়। এ ছাড়াও সেকালের উকিলদের মাঝে প্রকাশ্যভাবে খেয়ানতের প্রবণতা দেখা দেওয়ার কারণে মাশায়েখে বলখ এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতকে বর্জন করে ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেন। ইমাম মাহবূবীর 'জামে' নামক কিতাবে এবং হিদায়ার অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সদরুশ শাহীদ (র.)-এর ফতোয়াও এরূপই। -[নাতায়িজুল আফকার]

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُهُ الْوَكِيْلُ بِالتَّقَاضِيْ الخ : এ ইবারতে লেখক উপরিউক্ত মাসআলায় বর্ণিত ফতোয়ার পক্ষে আরেকটি মাসআলার উদাহরণ পেশ করে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'উরফ' তথা সামাজিক প্রচলন ও অবস্থার পরিপেক্ষিতে জাহেরী রেওয়ায়েতকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বর্ণনা মতে ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারটি শুধু কেবল এ মাসআলাই নয়; বরং অন্যান্য মাসআলার মাঝেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন- وَكِيْلٌ بِالتَّقَاضِيْ-এর মাসআলায়। অর্থাৎ "ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল ঋণ উসুল করতে পারবে কিনা?" এ ব্যাপারে 'মাবসূত' গ্রন্থের বর্ণনা মতে জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান হলো, ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল সে ঋণ উসুল করতে পারবে। কারণ আরবি [তাকাযা] تَقَاضِيْ শব্দের আভিধানিকভাবে মৌলিক অর্থ হলো, 'কবজা করা বা উসুল করা।' কিন্তু সামাজিকভাবে শব্দটি তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন না থাকায় এ মাসআলায় জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয় না; বরং এ ক্ষেত্রে مُتَاخِّرِيْنَ উলামায়ে কেরামের ফতোয়া হলো, "ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল সে ঋণ [কবজা] উসুল করতে পারবে না।" কারণ উসূলে ফিক্হের নির্ভরযোগ্য ধারা- اَلْعُرْفُ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ [সমাজ প্রচলন শব্দের মৌলিক অর্থকে রহিত করে] -এর ভিত্তিতে শব্দের মৌলিক অর্থের উপর উরফে ব্যবহৃত রূপক অর্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কেননা মানুষের প্রয়োজনার্থেই শব্দকে কোনো একটি মৌলিক অর্থ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কিন্তু কালের বিবর্তনে যখন শব্দটি তার সেই (حَقِيْقِيْ) মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য একটি (مَجَازِيْ) রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে, এমনকি শব্দটি বললে মানুষ তার মৌলিক অর্থ না বুঝে তার مَجَازِيْ রূপক অর্থই বুঝতে থাকে, তখন তার রূপক অর্থটাই সহজভাবে মানুষ বুঝে নেওয়ার কারণে حَقِيْقَتْ عُرْفِيَّةْ তথা প্রচালিত মৌলিক অর্থের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং এ ভিত্তিতেই তার উপর হুকুম আরোপিত হয়। সুতরাং আরবি تَقَاضِيْ [তাকাযা] শব্দটিকে যদিও মৌলিকভাবে ঋণ কবজা করার অর্থে নির্বাচিত করা হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে শব্দটি যেহেতু তার মৌলিক অর্থ বাদ দিয়ে مَجَازِيْ রূপক অর্থে [অর্থাৎ ঋণের দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের তাগাদা দেওয়া] ব্যবহৃত হতে থাকে এবং মানুষ শব্দটি বলতেই তাৎক্ষণিকভাবে শব্দটির মূল [হাকীকী] অর্থ না বুঝে তার [মাজাযী] রূপক অর্থটাই বুঝতে থাকে, তাই مُتَاخِّرِيْنَ فُقَهَاءُ পরবর্তী কালের হানাফী মাযহাব অনুসারী ফুকাহায়ে কেরামের اَلْعُرْفُ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ ধারার ভিত্তিতে এই মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন যে, "ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল সে ঋণকে উসুল করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে না।" যদিও জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান অনুযায়ী "সে ঋণ উসুল করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার কথা" মৌলিকভাবে তারা শব্দটির উরফে ব্যবহৃত অর্থটির যথাযথ মূল্যায়ন করতে গিয়েই জাহেরী রেওয়ায়েতের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন।

প্রখ্যাত শারেহ আল্লামা কাযী যাদাহ আফনাদী (রা.) তাঁর নাতায়িজুল আফকার নামক গ্রন্থে উল্লিখিত মাসআলায় মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন ফকীহদের ফতোয়ায় এ ব্যবধানের একটি সুন্দর কারণ বিশ্লেষণ করেন, তাহলো اَلتَّوْكِيْلُ بِالتَّقَاضِىْ অর্থাৎ ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য উকিল নির্বাচনের ব্যাপারে تَقَاضِىْ শব্দটি প্রাথমিক কালের উরফে তার মৌলিক অর্থ [উসুল করা] ই ব্যবহৃত হতো এবং সে কালের সমাজে শব্দটি তার মৌলিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন ছিল না। তাই সেকালে ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল ওরফ অনুসারেই ফিকহ বিশারদদের সর্ব সম্মতিক্রমে [কবজা] উসূল করার জন্য উকিল বলে সাব্যস্ত হতো।

এ কারণেই মাবসূতের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, وَكِيْلٌ بِالتَّقَاضِىْ তথা ঋণের তাগাদা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিল কবজা করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু কালক্রমে যখন উকিলদের মাঝে খেয়ানত ও আত্মসাৎ করার মানসিকতা দেখা যেতে লাগল এবং দিনদিন উকিলদের উপর থেকে মানুষের আস্থা ও বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার কারণে মানুষ ঋণ উসুল করার দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে শুধু তাগাদা দেওয়ার জন্যই কেবল উকিল গ্রহণ করতে শুরু করল, এক পর্যায়ে এটাই উরফে রূপান্তরিত হওয়ায় মানুষ وَكِيْلٌ بِالتَّقَاضِىْ বলতে তার হাকীকী অর্থকে বাদ দিয়ে কবজা করার দায়িত্ববিহীন কেবল তাগাদার জন্যই ওকালতির কথা বুঝতে লাগল, তখনই মুতাআখখিরীন ফকীহগণ وَكِيْلٌ بِالتَّقَاضِىْ কবজা করার মালিক হবে না বলে ফতোয়া প্রদান করেন। কারণ এমতাবস্থায় وَكِيْلٌ بِالتَّقَاضِىْ-এর হাকীকী অর্থটা হলো حَقِيْقَتْ مَهْجُوْرَةْ [বর্জিত মূল অর্থ] -এর নামান্তর। আর প্রচলিত অর্থই হলো مَجَازْ مُتَعَارِفْ [প্রচলিত রূপক অর্থ] আর উসূলে ফিকহের ধারা হলো- اَلْمَجَازُ الْمُتَعَارِفُ اَوْلٰى مِنَ الْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ অর্থাৎ কোনো শব্দের বর্জিত মূল অর্থের তুলনায় উরফে প্রচলিত রূপক অর্থই উত্তম। -[নাতাইজুল আফকার- খ. ৮/ পৃ. ১১৪]

কতিপয় উসূল : প্রকাশ থাকে যে, আলোচিত মাসআলার সাথে সম্পর্কিত উসূলে ফিকহের কয়েকটি ধারা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১. যদি কোনো শব্দ দুটি অর্থের ধারক হয় যার মাঝে একটি হাকীকী [মূল অর্থ] এবং অপরটি মাজাযী [রূপক অর্থ] এবং শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন সমাজে বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রথমোক্ত অর্থটিকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় حَقِيْقَتْ مُسْتَعْمَلَهْ আর দ্বিতীয়টিকে مَجَازْ مُتَعَارِفْ বলা হয়। এমতাবস্থায় সেই শব্দের অনুকরণে ফিকহী মাসায়েল ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اَصْلْ [নীতি] হলো- اَلْحَقِيْقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ اَوْلٰى مِنَ الْمَجَازِ الْمُتَعَارِفِ অর্থাৎ 'শব্দের ব্যবহৃত হাকীকী অর্থটাই উরফ প্রচলিত মাজাযী অর্থ মুরাদ নেওয়ার তুলনায় উত্তম।' কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর اَصْلْ [নীতি] এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপরীত। তাঁরা বলেন, এক্ষেত্রে اَلْمَجَازُ الْمُتَعَارِفُ اَوْلٰى مِنَ الْحَقِيْقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ অর্থাৎ শব্দের মূল অর্থ উদ্দিষ্ট হওয়ার তুলনায় উরফ প্রচলিত রূপক অর্থই উত্তম।

প্রখ্যাত হানাফী উসূলবিদ আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.) বলেন, সাহেবাইনের মতে مَجَازْ مُتَعَارِفْ টা حَقِيْقَتْ -এর উপর [তারজীহ] প্রাধান্য পাওয়ার শর্ত হলো মাজাযী [রূপক] অর্থটা তার হাকীকী [মূল] অর্থের عُمُوْمْ তথা ব্যাপকতার মাঝে শামিল হতে হবে।

২. আর যদি শব্দটি মাজাযী [রূপক] অর্থের অধিক প্রচলনের কারণে হাকীকী [মূল] অর্থের প্রচলন একেবারেই বাদ পড়ে যায়, তাহলে হাকীকী অর্থটাকে حَقِيْقَتْ مَهْجُوْرَةْ [বর্জিতমূল অর্থ] বলা হয়। এমতাবস্থায় ফিকহ বিশারদদের সর্বসম্মতিক্রমে اَصْلْ [নীতি] হলো- اَلْمَجَازُ الْمُتَعَارِفُ اَوْلٰى مِنَ الْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ অর্থাৎ ব্যবহার বর্জিত মূল অর্থের তুলনায় উরফে প্রচলিত রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াই উত্তম।

قَالَ : فَإِنْ كَانَا وَكِيْلَيْنِ بِالْخُصُوْمَةِ لَا يَقْبِضَانِ إِلَّا مَعًا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا لَا بِأَمَانَةِ أَحَدِهِمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمْكِنٌ بِخِلَافِ الْخُصُوْمَةِ عَلٰى مَا مَرَّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দুজন দাবি উত্থাপনের জন্য উকিল নিযুক্ত হয় তাহলে দুজন একসঙ্গে ছাড়া কবজা করার অধিকারী হবে না। কারণ মুওয়াক্কিল উভয়ের সম্মিলিত আমানতদারির প্রতি সম্মত হয়েছে। শুধু একজনের একক আমানতদারির উপর সম্মত হয়নি। আর কবজা করার ক্ষেত্রে দুজনের একত্র হওয়া সম্ভব তবে মামলা উত্থাপনের বিষয়টি ভিন্ন যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ كَانَا وَكِيْلَيْنِ الخ : পূর্বে বলা হয়েছে যে, জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী দাবি উত্থাপনের জন্যে নিযুক্ত উকিল কবজা করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সেই ভিত্তিতে যদি দাবি উত্থাপনের জন্য দুজন ব্যক্তিকে যৌথভাবে উকিল নিযুক্ত করা হয় তাহলে উভয়েই যৌথভাবে কবজা করার জন্য উকিল সাব্যস্ত হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় উভয়ের উপরই সম্মিলিতভাবে দুটি দয়িত্ব আরোপিত হয়–

১. খুসূমত বা কাজির সামনে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা।

২. কবজা করা বা কাজির সামনে দাবি প্রমাণিত হয়ে গেলে বিবাদীর হাত থেকে তা উসুল করা।

সুতরাং যেহেতু উভয় দায়িত্ব পালনের জন্য দুজনকেই সম্মিলিতভাবে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাই দুটি বিষয়ের কোনোটির ক্ষেত্রেই একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের একক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য না হওয়াই যুক্তিযুক্ত [কারণ মুওয়াক্কিল উভয়ের যৌথ বিশ্বস্ততায় সম্মত, কারো একক বিশ্বস্ততার প্রতি সম্মত হয়নি,] কিন্তু প্রথমোক্ত খুসূমত বা কাজির দরবারে দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে যদি উভয় উকিল একই সাথে কাজির সামনে দাবি উত্থাপন করতে চায় তাহলে কাজির মজলিসে হট্টগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শরয়ী প্রতিবন্ধকতার দরুন যে কোনো একজন উকিলের দাবি উপস্থাপনকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে করার বিষয়ে উভয় উকিলের যৌথ উপস্থিতির মাঝে শরয়ী কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকায় উপরোল্লিখিত যুক্তি অনুসারে কবজা করার জন্য উভয় উকিলের যৌথ উপস্থিতিকে শর্ত করা হয়েছে। তাই যে কোনো একজন উকিল এককভাবে কবজা করতে পারবে না। উপরিউক্ত ইবারতে লেখক একথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخُصُوْمَةِ عَلٰى مَا مَرَّ : এখানে লেখক عَلٰى مَا مَرَّ বলে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শুরু অংশে আলোচিত নিম্নোল্লিখিত ইবারতের প্রতি ইঙ্গিত করেন–

وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهِ دُوْنَ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُوْمَةِ لِأَنَّ الْاِجْتِمَاعَ مُتَعَذِّرٌ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى الشَّغَبِ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ .

অর্থাৎ যদি কোনো বিষয়ে দুজন ব্যক্তিকে যৌথভাবে উকিল বানানো হয় তাহলে এক উকিলের জন্য অপরকে বাদ দিয়ে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। তবে যদি দাবি উত্থাপনের জন্য দুজনকে উকিল বানানো হয়, তাহলে একজনের উপস্থাপনই যথেষ্ট হবে। কারণ কাজির মজলিসে দুজন একই সাথে দাবি উপস্থাপনের জন্য একত্রিত হওয়ার মাঝে কাজির মজলিসে হট্টগোল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। –[আল বিনায়াহ পৃ. ৩৫৬]

قَالَ : وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُ الدَّيْنِ يَكُوْنُ وَكِيلًا بِالْخُصُوْمَةِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) حَتّٰى لَوْ اُقِيْمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلٰى اِسْتِيْفَاءِ الْمُوَكِّلِ اَوْ اِبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهٗ وَقَالَا لَا يَكُوْنُ خَصْمًا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ لِاَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُوْمَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِىْ فِى الْخُصُوْمَاتِ فَلَمْ يَكُنِ الرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ رِضًا بِهَا وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهٗ وَكَّلَهٗ بِالتَّمَلُّكِ لِاَنَّ الدُّيُوْنَ تُقْضٰى بِاَمْثَالِهَا اِذْ قَبْضُ الدَّيْنِ نَفْسَهٗ لَا يَتَصَوَّرُ اِلَّا اَنَّهٗ جُعِلَ اِسْتِيْفَاءً لِعَيْنِ حَقِّهٖ مِنْ وَجْهٍ فَاَشْبَهَ الْوَكِيْلَ بِاَخْذِ الشُّفْعَةِ وَالرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بِالشِّرَاءِ وَالْقِسْمَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَهٰذِهٖ اَشْبَهُ بِاَخْذِ الشُّفْعَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ خَصْمًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَكُوْنُ خَصْمًا قَبْلَ الْاَخْذِ هُنَالِكَ وَالْوَكِيْلَ بِالشِّرَاءِ لَا يَكُوْنُ خَصْمًا قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الشِّرَاءِ هٰذَا لِاَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَقْتَضِىْ حُقُوْقًا وَهُوَ اَصِيْلٌ فِيْهَا فَيَكُوْنُ خَصْمًا فِيْهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমত-এর জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যদি এ উকিলের বিপক্ষে এ মর্মে বায়্যিনাহ [দলিল] পেশ করা হয় যে মুওয়াক্কিল সে দাইন উসুল করে নিয়েছে বা দেনাদারকে দাইন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা গ্রহণ করা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সে মামলার কোনো পক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তার সামনে প্রতিপক্ষের কোনো ধরনের বায়্যিনাহ গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি অভিমত। কারণ কবজা করা খুসূমত থেকে আলাদা একটি বিষয়। এছাড়াও মালের ব্যাপারে যাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই খুসূমত বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পারদর্শী হয় না বিধায় কবজা করার ব্যাপারে সম্মতি মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সম্মতিকে আবশ্যক করে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, মুওয়াক্কিল তাকে মালিক হওয়ার জন্য উকিল বানিয়েছে, কেননা দাইন [হুবহু আদায় করা হয় না। বরং] তার সদৃশ দ্বারা আদায় করা হয়ে থাকে। কারণ হুবহু দাইনকে কবজা করার কল্পনাও করা যায় না। তবে এক হিসেবে সেটাকেই মূল পাওনা উসূল করা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে শুফ'আর ভিত্তিতে বাড়ির দখল গ্রহণ, হেবাকৃত সম্পদ রুজু করা [বা ফেরত নেওয়া], কোনো কিছু ক্রয় করা, এজমালি সম্পত্তির বণ্টন ভিত্তিতে অংশগ্রহণ ও দোষের কারণে বিক্রীত দ্রব্য ফেরত প্রদান, ইত্যাকার বিষয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের সাদৃশ হলো। তবে আলোচ্য মাসআলাটি [ক্রয়ের উকিলের তুলনায়] শুফ'আর অধিকার গ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিলের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এমনকি দাইন উসুল করার জন্য নিযুক্ত উকিল তা উসুল করার পূর্বেই দেনাদারের প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হয় যেমনিভাবে শুফ'আহ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিল শুফ'আহ গ্রহণ করার পূর্বেই ক্রেতার প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিল তার ক্রয় কার্য সম্পাদনের পূর্বে প্রতিপক্ষ বলে গণ্য হয় না। আর এটা [অর্থাৎ দাইন কবজা করার উকিল দাবি উত্থাপনের জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হওয়া] এজন্য যে, পরস্পর বিনিময় কিছু হক ও দায়দায়িত্বের দাবি রাখে। আর এ সকল বিনিময় সম্পাদনের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি [উকিল]-ই বিনিময়ের সকল হক ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে আসীল [মূল ব্যক্তি] বলে বিবেচিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সে প্রতিপক্ষ রূপেও সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخ : আলোচ্য ইবারতে উল্লিখিত মাসআলাটি বুঝার জন্য ভূমিকা স্বরূপ চারটি বিষয় জানা আবশ্যক–

১. আলোচ্য ইবারতের বিষয়বস্তু ও পূর্বের মাসআলার সাথে এর সম্পর্ক।

২. عَيْن ও دَيْن -এর মাঝে পার্থক্য।

৩. সূরতে মাসআলা ও ইমামদের মতভেদ।

৪. একটি মূলনীতি ও উপরিউক্ত মতভেদের ফলাফল।

প্রথমত বিষয়বস্তু ও পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পর্ক : পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, মামলায় খুসূমত করা বা পক্ষ হওয়ার জন্য যদি কাউকে উকিল বানানো হয় তাহলে সে কবজা করার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কবজা করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা হয় তাহলে সে মামলায় খুসূমত করা বা মুওয়াক্কিলের পক্ষ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উকিল বলে বিবেচিত হবে কিনা সে বিষয়টিই হলো উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়।

জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান মতে এ ক্ষেত্রে عَيْن ও دَيْن -এর ভিত্তিতে মাসআলায় বিধানগত পার্থক্য হবে। যদি عَيْن কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয় তাহলে কবজার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্য উকিল বলে সাব্যস্ত হবে না। [এ বিষয়ের দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী ইবারতে করা হবে] আর যদি دين কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয় তাহলে কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমত করা বা মুওয়াক্কিলের পক্ষ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উকিল বলে বিবেচিত হবে। উপরিউক্ত ইবারতে এ বিষয়টিই আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, عَيْن ও دَيْن -এর মাঝে পারস্পর কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণেই এ মাসআলায় عَيْن ও دَيْن -এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধানগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত عَيْن ও دَيْن -এর পার্থক্য :

১. عَيْن বলা হয় এমন সব বস্তুকে যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে دَيْن বলা হয় এমন সব বস্তুকে যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না; বরং তা ব্যক্তির জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– কিতাব এটাকে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় বলে এটা عَيْن পক্ষান্তরে টাকাপয়সা বা মুদ্রা জাতীয় জিনিস নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না বলে তা دَيْن সুতরাং যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমাকে এ কিতাবটি দেব তাহলে কিতাবটি নির্দিষ্ট হওয়ায় সেটাই দেওয়া আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে আমি তোমাকে একশত টাকা দেব তাহলে টাকা নির্দিষ্ট হয় না, বিধায় যে কোনো একটি একশত টাকা দেওয়া তার জিম্মায় আবশ্যক হবে।

২. যে সকল বস্তু হুবহু ফেরত দেওয়া / নেওয়া কিংবা আদায় করা সম্ভব তাকে عَيْن বলে। পক্ষান্তরে সেসব বস্তু হুবহু ফেরত নেওয়া বা আদায় করা সম্ভব হয় না; রবং তার সদৃশ বস্তু দিয়ে আদায় করা হয়ে থাকে তাকে دَيْن বলা হয়। যেমন– কেউ কারো কাছ থেকে একটি গ্লাস গসব করে নিয়ে গেল। এখানে গ্লাসটাকে হুবহু ফেরত দেওয়া / নেওয়া সম্ভব হওয়ায় সেটা عَيْن সুতরাং গ্লাসের মালিক যদি ঐ গ্লাসটাই তার কাছ থেকে যে কোনো পন্থায় নিয়ে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি এর স্থলে গসবকারীর অন্য একটা অনুরূপ গ্লাস রেখে দেয় তা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ কারো কাছ থেকে একশত টাকা গসব করে নেয়, এমতাবস্থায় টাকা তার সদৃশ বস্তু দ্বারা আদায় করা হয় বিধায় টাকার মালিক যদি গসবকারীর কাছ থেকে যে কোনো পন্থায় একশত টাকা নিয়ে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে এবং গসবকারীও গসবের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

৩. عَيْن কারো হস্তগত হলে তা মালিকানা সূত্রে হস্তগত হয় না বিধায় হুবহু সেই বস্তুটাই ফেরত দিতে হয়। পক্ষান্তরে دَيْن কারো হস্তগত হলে তা মালিকানা সূত্রে হস্তগত হয়ে থাকে। বিধায় তা হুবহু ফেরত দেওয়া আবশ্যক হয় না; বরং তার সদৃশ বস্তু ফেরত দেওয়া হস্তগতকারীর জিম্মায় আবশ্যক হয়।

তৃতীয়ত : সূত্রতে মাসআলা ও ইমামদের মতভেদ :

قَوْلُهُ اَلْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الخ : কেউ যদি কাউকে কোনো دَيْن কবজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে কবজা করার জন্য নিযুক্ত এ উকিল খুসূমতের জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে কিনা এক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, دَيْن কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে।

আর এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের অভিমত হলো, دين কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্য উকিল হিসেবে গণ্য হবে না। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধ অভিমতও একটিই, আর জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতও এরূপই।

চতুর্থত একটি মূলনীতি ও উপরিউক্ত মতভেদের ফলাফল : উল্লিখিত মতভেদের ফলাফল বুঝার পূর্বে প্রথমে এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, কোনো বিবদমান জিনিসের ফয়সালা দেওয়ার জন্য একটি মূলনীতি হলো, বিবাদের দুই পক্ষের মধ্যে থেকে কারো দলিল-প্রমাণই ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে দলিল তার প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে উত্থাপিত হবে।

এ ভিত্তিতে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল যদি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী খুসূমতের জন্যও উকিল হিসেবে সাব্যস্ত হয় তাহলে সে উকিল তার মুওয়াক্কিলের পক্ষে মামলার [খসম বা] পক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। তাই দেনাদার যদি উক্ত উকিলের সামনে এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, তোমার মুওয়াক্কিল এ দাইন পূর্বেই আদায় করে নিয়েছে, কিংবা আমাকে সে দাইন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, তাহলে দেনাদারের এ দলিলটি তার প্রতিপক্ষের সামনে উত্থাপিত হওয়ার কারণে তা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতানুযায়ী যদি দাইন কবজার উকিল খুসূমতের জন্য উকিল সাব্যস্ত না হয়, তাহলে উকিল উক্ত দাইন নিয়ে সংগঠিত মামলার পক্ষ সাব্যস্ত না হওয়ায় দেনাদার যদি সে উকিলের সামনে তার মুওয়াক্কিলের বিরুদ্ধে এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, তোমার মুওয়াক্কিল উক্ত দেনা আদায় করে নিয়েছে, কিংবা এ দেনা থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে, তাহলে দেনাদারের এ দলিল তার প্রতিপক্ষের [মুওয়াক্কিলের] সামনে উত্থাপিত না হওয়ার কারণে তা গ্রহণ করা হবে না।

সাহেবাইনের দলিল :

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُوْمَةِ الخ : দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের [মামলায় পক্ষ হওয়ার] জন্য উকিল সাব্যস্ত হবে না। সাহেবাইনের এ দাবির পক্ষে দলিল হলো, এখানে কবজা করা আর মামলার পক্ষ হওয়া দুটি আলাদা বিষয়। তাই এক বিষয়ে উকিল বানানোর ব্যাপারে মুওয়াক্কিলের সম্মতি অপরটির ব্যাপারে সম্মতিকে আবশ্যক করবে না। কারণ কবজা করার জন্য উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তির আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার দিকটাই বেশির ভাগ লক্ষণীয় হয়। ব্যক্তির বাকপটুতা ও মামলা পরিচালনার যোগ্যতাটা এক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য না হওয়ায় কবজা করার জন্য নিযুক্ত সব উকিলই মামলা পরিচালনায় পারদর্শী হয়ে উঠে না। এমতাবস্থায় যেহেতু মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে কবজার উকিল কর্তৃক খুসূমত বা মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যায়নি; বরং কবজা করার ক্ষেত্রেই কেবল তার ওকালতির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে তাই তার ওকালতকে এক্ষেত্রেই সীমিত রাখা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالتَّمَلُّكِ الخ : دَيْن ও عَيْن-এর উপরোল্লিখিত পার্থক্য অনুযায়ী, দাইনকে হুবহু কবজা করা অকল্পনীয় হওয়ার কারণে যেহেতু তার সদৃশ দিয়ে আদায় করা হয়, তাই দাইন কবজা করার জন্য কাউকে উকিল বানানোর অর্থই হলো তাকে কবজার মাধ্যমে তার সাময়িক মালিকানা লাভ করতে বলা। আর মালিকানা লাভ করার জন্য নিযুক্ত উকিল সে মালের জন্য খুসূমতের মালিক হয়ে থাকে বলেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) "দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমত বা মামলা পরিচালনার জন্যও উকিল বলে সাব্যস্ত হবে।" এ মর্মে মত পোষণ করেন।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ جُعِلَ اِسْتِيْفَاءً لِعَيْنِ حَقِّهِ : ইবারতে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল থেকে যার উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, দাইনকে হুবহু কবজা করা যদি অকল্পনীয়ই হয় তাহলে তার সদৃশ বস্তু কবজা করার দ্বারা পাওনাদারের মূল পাওনা কি করে আদায় করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন- اِلَّا اَنَّهُ جُعِلَ اِسْتِيْفَاءً لِعَيْنِ حَقِّهِ مِنْ وَجْهٍ অর্থাৎ "অন্যদিক বিবেচনায় দাইনের সদৃশ বস্তু কবজা করানোই মূল পাওনা আদায় করার নামান্তর ধরা হয়েছে।" কথাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তা হলো, দাইনকে হুবহু কবজা করা অসম্ভব হওয়ায় তার পাওনাদার যদি তার সদৃশ

কোনো বস্তু গ্রহণ করে তাহলে একদিক বিবেচনা করলে এতে পাওনাদারের মূল পাওনা যথাযথ আদায় হয় না। কিন্তু বিষয়টিকে যদি আমরা এভাবে লক্ষ্য করি যে, পাওনাদার তার পাওনা [উদাহরণ স্বরূপ একশত টাকা]-এর বিনিময়ে দেনাদারের কাছ থেকে এর সদৃশ [অন্য একটি একশত টাকা] গ্রহণ করল, তাহলে বিষয়টি একপ্রকারের (مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ) বিনিময়মূলক লেনদেনের রূপ ধারণ করায় এভাবে পাওনাদারের পাওনা যথাযথই আদায় হওয়া সম্ভব। কারণ এখানে কেমন যেন পাওনাদার তার মূল পাওনা [একশত টাকা]-কে দেনাদারের কাছে বিক্রি করে তার মূল্য হিসেবে তার সদৃশ [একশত টাকা] গ্রহণ করেছে। আর ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত মালের মূল্যটাই [عَيْنُ حَقٍّ বা] মূল পাওনা বলে সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ فَاشْبَهَ الْوَكِيْلَ بِاَخْذِ الشُّفْعَةِ الخ : সুতরাং উপরিউক্ত দলিলের ভিত্তিতে আলোচ্য [দাইন কবজা করার জন্য উকিল নিয়োগের] মাসআলাটি নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ হলো–

প্রথম বিষয় : শুফ'আর অধিকার গ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো। অর্থাৎ শুফ'আহ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিল যেমনিভাবে ক্রেতার বিপক্ষে খুসূমতের অধিকারী হয় তেমনিভাবে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিলও তার দেনাদারের বিপক্ষে খুসূমতের অধিকারী হবে।

দ্বিতীয় বিষয় : হেবা ফেরত নেওয়ার জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো। অর্থাৎ হিবাকৃত কোনো বস্তু ফেরত নিয়ে আসার জন্য যদি কাউকে উকিল বানানো হয় এমতাবস্থায় مَوْهُوْبٌ لَهُ [যাকে হিবা করা হয়েছে সে] যদি উক্ত উকিলের সামনে এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, তোমার মুওয়াক্কিল এ হিবাকৃত বস্তুর বিনিময় গ্রহণ করেছে, তাহলে যেমনিভাবে এ উকিলের সামনে উক্ত দলিল গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনিভাবে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিলের সামনে যদি দোনাদার তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে দলিল পেশ করে তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে।

তৃতীয় বিষয় : কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো। অর্থাৎ ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিল যেমনিভাবে খুসুমতের মালিক হয়, ফলে আকদের সকল দায়দায়িত্ব তার উপরই বর্তায় তেমনিভাবে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিলও খুসূমতে মালিক হবে।

চতুর্থ বিষয় : এজমালি সম্পত্তির বণ্টন ভিত্তিতে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো। অর্থাৎ এজমালি সম্পত্তির বণ্টন ভিত্তিতে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত উকিল যেমনিভাবে খুসূমতের অধিকারী হয় বিধায় অন্যান্য অংশীদাররা যদি এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, মুওয়াক্কিল তার নিজ অংশ পূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছে তাহলে এ উকিলের সামনে তা গ্রহণযোগ্য হয়, তেমনিভাবে দাইন কবজার জন্য নিযুক্ত উকিলও খুসূমতের অধিকারী হবে এবং তার সমনে দেনাদারের দলিল গ্রহণযোগ্য হবে।

পঞ্চম বিষয় : দোষের কারণে বিক্রীত পণ্য ফেরত প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো অর্থাৎ দোষের কারণে বিক্রীত পণ্য ফেরত প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিল যেমনিভাবে খুসূমতের অধিকারী হওয়ায় তার সামনে বিক্রেতা [যদি এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, ক্রেতা এ দোষসহ পণ্যটি ক্রয় করে নিতে প্রস্তুত ছিল]-এর দলিল গ্রহণযোগ্য হয়। তেমনিভাবে দাইন কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিলও খুসূমতের অধিকারী হবে এবং তার সামনে দেনাদারের পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে উত্থাপিত দলিল গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ اَشْبَهُ بِاَخْذِ الشُّفْعَةِ : উপরোল্লিখিত পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে থেকে শুফ'আর জন্য নিযুক্ত উকিলের মাসআলার সাথে আলোচ্য [দাইন কবজা করার উকিলের] মাসআলাটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মাসআলায় উকিল দাইনকে কবজা করার পূর্বেই প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয় যেমনিভাবে শুফ'আর মাসআলায় শুফ'আহ গ্রহণ করার পূর্বে উকিল প্রতিপক্ষ রূপে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে ক্রয় করার জন্য নিযুক্ত উকিলের সাথে আলোচ্য মাসআলার তেমন সামঞ্জস্য নেই, কারণ ক্রয়ের উকিল ক্রয়কার্য সম্পাদনের পূর্বে বিক্রেতার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ هٰذَا لِاَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَقْتَضِىْ : এখান থেকে লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে উল্লিখিত দলিলের একটি রহস্য বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। তা হলো দাইন যেহেতু হুবহু কবজা করা যায় না বিধায় তার সদৃশ কবজা করতে হয় এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক প্রকারের (مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ) বিনিময়মূলক লেনদেন। আর مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ তথা বিনিময়মূলক লেনদেনের মাঝে চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দায়দায়িত্বের [যথা– পণ্য হস্তান্তর করা ও মূল্য গ্রহণ করা ইত্যাদি] ক্ষেত্রে উকিলই আসীল (اَصِيْل) -এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। আর মালের জন্য খুসূমত বা মামলায় পক্ষপাতিত্ব করা যেহেতু অসীলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত তাই এক্ষেত্রে তা উকিলের দায়িত্বেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَالَ : وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُوْنُ وَكِيْلًا بِالْخُصُوْمَةِ لِاَنَّهُ اَمِيْنٌ مَحْضٌ وَالْقَبْضُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةٍ فَاَشْبَهَ الرَّسُوْلَ حَتّٰى اَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيْلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ، فَاَقَامَ الَّذِىْ هُوَ فِىْ يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلٰى اَنَّ الْمُوَكِّلَ بَاعَهُ اِيَّاهُ وَقَفَ الْاَمْرُ حَتّٰى يَحْضُرَ الْغَائِبُ فِىْ هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى الْوَكِيْلِ لِاَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ لَا عَلٰى خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبَرْ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهُ خَصْمٌ فِىْ قَصْرِ يَدِهٖ لِقِيَامِ الْمُوَكِّلِ فِى الْقَبْضِ فَيُقْتَصَرُ يَدُهُ وَاِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْبَيْعُ حَتّٰى لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ تُعَادُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَيْعِ فَصَارَ كَمَا اِذَا اَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلٰى اَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ فِىْ قَصْرِ يَدِهٖ كَذَا هُنَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আইন [নির্দিষ্ট বস্তু] কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্য উকিল বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ সে কেবল আমানতদার মাত্র। আর [যেহেতু এখানে মুওয়াক্কিলের হুবহু প্রাপ্য বস্তুকে কবজা করা হয়েছে তার সদৃশ বস্তুকে নয়, তাই] কবজা করাটা এখানে বিনিময়মূলক কোনো লেনদেন নয় বিধায় সে [উকিল] এখানে বার্তাবাহকের সদৃশ হলো। কাজেই কেউ যদি কাউকে তার একটি গোলাম কবজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, আর গোলামটি যার হাতে আছে– সে যদি এই মর্মে দলিল পেশ করে যে, মুওয়াক্কিল তার কাছে তা বিক্রি করেছে তাহলে অনুপস্থিত মুওয়াক্কিল উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত থাকবে। এটা হলো ইসতেহসানের দাবি। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবি হলো, উকিলের হাতে গোলাম দিয়ে দেওয়া। কেননা এখানে অপ্রতিপক্ষের সামনে দলিল উত্থাপিত হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর ইসতেহসানের দলিল হলো, আইন কবজা করার উকিল তার কবজা করার অধিকার রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ। কেননা কবজা করার ক্ষেত্রে সে মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং বিক্রয় সাব্যস্ত না হলেও উকিলের কবজার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং অনুপস্থিত মুওয়াক্কিল যখন উপস্থিত হবে তখন বিক্রয়ের স্বপক্ষে দলিল পুনরায় উত্থাপন করতে হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, গোলামের দখলদার এ মর্মে দলিল পেশ করল যে, মুওয়াক্কিল এ উকিলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছে। কবজার অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে এ দলিল গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্য উকিল সাব্যস্ত হবে কিনা বিষয়টির ফয়সালা হবে دَيْن ও عَيْن -এর ভিত্তিতে। دَيْن সংক্রান্ত বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যে, دَيْن কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের জন্যও উকিল সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে عَيْن [নির্দিষ্ট বস্তু] কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল হানাফী মাযহাবের ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে খুসূমতের জন্য উকিল সাব্যস্ত হবে না। কারণ এমতাবস্থায় উকিল যেহেতু নির্দিষ্ট বস্তুর মাঝে মুওয়াক্কিলের পাওনাকে হুবহু কবজা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাই এটা কোনো প্রকার (مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ) বিনিময়মূলক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উকিল এক্ষেত্রে

কেবল আমানতদারের ভূমিকা পালন করছে। আর আমানতদার কখনো খুসূমতের অধিকারী হয় না। কারণ কোনো ব্যক্তি কোনো মালের ব্যাপারে খুসূমতের অধিকারী তখনই হয়ে থাকে যখন সে ঐ মালের [আসীলের] মূল মালিক হয়, কিংবা মালের সাথে সম্পৃক্ত দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে মূল মালিকের [আসীলের] স্থলাভিষিক্ত [উকিল] হয়। আর مُبَادَلَة مَالِيَّة তথা বিনিময়মূলক লেনদেনের মাঝে উকিল দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে আসীলের স্থলাভিষিক্ত বিধায় دَيْن কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল খুসূমতের মালিক হবে। কারণ دَيْن কবজা করা একপ্রকারের বিনিময় গ্রহণ করার মতো। পক্ষান্তরে عَيْن কব্জা করা যেহেতু مُبَادَلَة مَالِيَّة তথা বিনিময়মূলক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এ ক্ষেত্রে মালের দায়দায়িত্বের ব্যাপারে উকিল আসীলের স্থলাভিষিক্ত না হওয়ায় সে মালের জন্য খুসূমতের অধিকারী হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে একজন বার্তাবাহকের সদৃশ হলো। অর্থাৎ যেমনিভাবে মামলায় তার প্রেরকের দিক থেকে খসম বা পক্ষ সাব্যস্ত হয় না, তেমনিভাবে আইন কবজা করার উকিলও মামলায় তার মুওয়াক্কিলের পক্ষ সাব্যস্ত হবে না। আর পূর্বেই বলা হয়েছে মামলায় প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ব্যতিরেকে শুধু এক পক্ষের দলিল কখনো গ্রাহ্য হয় না।

قَوْلُهُ حَتّٰى اَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيْلًا بِقَبْضِ : তাই যদি কেউ তার একটি গোলাম কবজা করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, আর গোলামটি যার হাতে আছে সে যদি এ উকিলের উপস্থিতিতে কাজির সামনে এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, মুওয়াক্কিল এ গোলামটি আমার কাছে বিক্রি করেছে। তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত উকিল তার মুওয়াক্কিলের পক্ষ সাব্যস্ত না হওয়ায় প্রতিপক্ষের বিনা উপস্থিতিতে দলিল উথাপিত হওয়ার কারণে দলিল অগ্রাহ্য হওয়া এবং গোলামটিকে উকিলের হাতে হস্তান্তর করাই ছিল কিয়াসের দাবি। কিন্তু এসতেহসানের ভিত্তিতে এখানে জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান হলো গোলামটিকে উকিলের হাতে হস্তান্তর করা হবে না, বরং অনুপস্থিত মুওয়াক্কিলের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ের ফয়সালাকে স্থগিত রাখা হবে।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهُ الخ : ইসতেহসানের দলিল হলো, এখানে গোলামের দখলদারের পক্ষ থেকে পেশকৃত দলিলটি মৌলিকভাবে একই সঙ্গে দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে উথাপিত হয়েছে। এক হলো, এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, গোলামটি মুওয়াক্কিলের বিক্রীত পণ্য বিধায় মুওয়াক্কিল তার মালিক নয়। আর দ্বিতীয় হলো, মুওয়াক্কিলের উকিল তা কবজা করার অধিকার রাখে না। আর এ দুটি বিষয়ের দলিলের মাঝে প্রথমটির প্রতিপক্ষ হলো মুওয়াক্কিল নিজেই। তাই তার অনুপস্থিতিতে উথাপিত দলিল গোলাম থেকে তার মালিকানা রহিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিষয় তথা গোলাম কবজা করার ব্যাপারে উকিল তার মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে এখানে উকিল নিজেই মামলার খসম বা পক্ষ সাব্যস্ত হওয়ায় তার সামনে উথাপিত দলিল উকিলের কবজা করার অধিকারকে রহিত করার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই গোলামের দখলদারের এ দলিলের দ্বারা বিক্রয় প্রমাণিত না হলেও এর দ্বারা উকিলের কবজা করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে এবং অনুপস্থিত মুওয়াক্কিল উপস্থিত হলে তার সামনে বিক্রয় প্রমাণ করার জন্য আবারো দলিল পেশ করতে হবে।

সুতরাং এ মাসআলাটি যেন ঐ মাসআলার মতো হলো যেখানে গোলামের দখলদার এই মর্মে দলিল পেশ করল যে, মুওয়াক্কিল এ উকিলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছে। কবজার অধিকারকে রহিত করার জন্য যেমনিভাবে এ দলিল গ্রহণযোগ্য হয় তেমনিভাবে এখানেও হবে।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مَعْنَاهُ إِذَا اَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَبْدُ وَالْاَمَةُ عَلَى الْعِتَاقِ عَلَى الْوَكِيْلِ بِنَقْلِهِمْ تُقْبَلُ فِيْ قَصْرِ يَدِهِ حَتّٰى يَحْضُرَ الْغَائِبُ اِسْتِحْسَانًا دُوْنَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আজাদ করা, তালাক দেওয়া এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে, অর্থাৎ স্ত্রী যদি তালাকের উপর এবং দাস-দাসী যদি মুক্তির স্বপক্ষে ঐ ব্যক্তির সামনে দলিল পেশ করে যাকে স্ত্রী বা দাস-দাসীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছে, তাহলে ইসতেহসানের ভিত্তিতে তাদের এ দলিল উকিলের [কব্জা] নিয়ে যাওয়ার অধিকারকে রহিত করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। যতক্ষণ না অনুপস্থিত মুওয়াক্কিল উপস্থিত হবে। কিন্তু মুক্তি বা তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَكَذٰلِكَ الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রী কিংবা গোলামকে কবজা করে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য কাউকে উকিল বানিয়ে পাঠাল এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি এ উকিলের সামনে এ মর্মে দলিল পেশ করে যে, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। অথবা গোলাম উকিলের সামনে এ মর্মে দলিল পেশ করল যে, আমার মনিব আমাকে আজাদ করে দিয়েছে। তাহলে স্ত্রী কিংবা গোলামের উত্থাপিত দলিল তাদের প্রতিপক্ষ [স্বামী কিংবা গোলামের মানিব]-এর উপস্থিতিতে না হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ভিত্তিতে স্ত্রী কিংবা গোলাম উক্ত উকিলের সাথে তাদের স্বামী বা মনিবের কাছে চলে যেতে বাধ্য থাকাটাই ছিল কিয়াসের দাবি। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার মতো এখানেও ইসতেহসানের ভিত্তিতে স্ত্রী বা গোলামের উত্থাপিত দলিলের ভিত্তিতে উকিলের নিয়ে যাওয়ার অধিকারকে রহিত করা হবে। যদিও এ দলিল স্ত্রীর তালাক কিংবা গোলামের আজাদ হওয়াকে প্রমাণিত করবে না। কারণ পূর্বের মাসআলার মতো এখানেও স্ত্রী কিংবা গোলামের দলিলটি দুটি বিষয়কে প্রমাণ করে, এক হলো মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া কিংবা আজাদ করা। এক্ষেত্রে উকিল প্রতিপক্ষ নয়, তাই এ দলিলটি অপ্রতিপক্ষের সামনে উত্থাপিত হওয়ায় তা অগ্রাহ্য হবে। আর দ্বিতীয় হলো উকিলের নিয়ে যাওয়ার অধিকারকে রহিত করা, আর এক্ষেত্রে উকিল নিজেই প্রতিপক্ষ বিধায় এ দলিলটি তার প্রতিপক্ষের সামনে উত্থাপিত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে এবং মুওয়াক্কিলের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত উকিলের নিয়ে যাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا اَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ عَلٰى مُوَكِّلِهٖ عِنْدَ الْقَاضِىْ جَازَ اِقْرَارُهٗ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِىْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) اِسْتِحْسَانًا اِلَّا اَنَّهٗ يَخْرُجُ مِنَ الْوَكَالَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَجُوْزُ اِقْرَارُهٗ عَلَيْهِ وَاِنْ اَقَرَّ فِىْ غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِىُّ (رح) لَا يَجُوْزُ فِى الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَوَّلًا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِاَنَّهٗ مَاْمُوْرٌ بِالْخُصُوْمَةِ وَهِىَ مُنَازَعَةٌ وَالْاِقْرَارُ يُضَادُّهٗ لِاَنَّهٗ مُسَالَمَةٌ وَالْاَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهٗ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الصُّلْحَ وَالْاِبْرَاءَ وَيَصِحُّ اِذَا اسْتَثْنَى الْاِقْرَارَ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهٗ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا يَتَقَيَّدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُوْمَةٌ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذٰلِكَ وَلِهٰذَا يَخْتَارُ فِيْهِ الْاَهْدٰى فَالْاَهْدٰى ۔

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খুসূমতের [মামলা পরিচালনার] উকিল যদি তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে কাজির কাছে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে তার বিপক্ষে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, কাজির আদালতের বাইরে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা ইসতেহসানের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। তবে এ কারণে সে ওকালতির দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কাজির মজলিসের বাইরেও তার বিপক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর প্রথম দিকের মত এটাই, আর এটাই কিয়াসের দাবি। কারণ সে মুওয়াক্কিলের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদিষ্ট। যার অর্থ হলো প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করা। আর স্বীকারোক্তি হলো এর বিপরীত। কারণ তার অর্থ হলো প্রতিপক্ষের দাবি মেনে নেওয়া। আর কোনো বিষয়ের আদেশ তার বিপরীতকে শামিল করে না। আর এ কারণেই সে [মামলায়] আপস করা ও দায়মুক্ত করার অধিকারী নয় এবং স্বীকারোক্তির অধিকারকে হরণ করে উকিল নিয়োগ করা বৈধ হয়। তদ্রূপ যদি নিঃশর্তভাবে কেবল মামলায় প্রতিউত্তর করার জন্য উকিল নিয়োগ করে তাহলে তা এমন প্রতিউত্তরের দ্বারা শর্তায়িত হয় যা মুওয়াক্কিলের আত্মপক্ষ সমর্থন বলে গণ্য। কেননা এরকমই লোকপ্রচলন রয়েছে। আর এ কারণেই তো মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পারদর্শীর চেয়েও পারদর্শী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَاِذَا اَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ الخ : মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োজিত ক্ষেত্রে উকিল আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, সাধারণত মুওয়াক্কিলের এটাই কাম্য হয়ে থাকে। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থলে যদি উকিলের কাছ থেকে কাজির সামনে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে কোনো স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তাহলে এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ বিষয়টির ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি কাজির বিচারের মজলিসে এ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু যদি কাজির বিচার মজলিসের বাহিরে অন্য কোথাও এ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না তবে এ স্বীকারোক্তির কারণে উকিল তার ওকালতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবে। তাই যদি কাজির

মজলিসের বাইরে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদানের পর কাজির কাছে গিয়ে পুনরায় তার মুওয়াক্কিলের দাবি প্রমাণে সার্থক হয়ে যায় তাহলে এ উকিলের হাতে মুওয়াক্কিলের মাল হস্তান্তর করা যাবে না। কারণ উকিলের পূর্বের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার মুওয়াক্কিল এ মালের অধিকারী নয়।

* ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ ব্যাপারে অভিমত হলো, উকিলের স্বীকারোক্তি কাজির মজলিসে হোক কিংবা মজলিস ব্যতীত অন্য কোথাও হোক সর্বাবস্থায়ই তা গ্রহণযোগ্য হবে।

* ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উকিলের এ স্বীকারোক্তি কাজির বিচার মজলিসে হোক কিংবা অন্য কোথাও হোক কোনো অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও হযরত ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর অভিমতও এরূপই। প্রাথমিকভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)ও একই অভিমত পোষণ করতেন। আর এটাই কিয়াসের দাবি। কারণ মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তিকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে কাজির মজলিসে হোক বা না হোক উভয় অবস্থাই তা গৃহীত হওয়ার কথা। যেমনটি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেছেন। আর যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে উভয় অবস্থাতে গৃহীত না হওয়ার কথা, যেমনটি ইমাম যুফার (র.) বলেছেন। কিন্তু কাজির মজলিসে হওয়া ও না হওয়ার ভিত্তিতে মাসআলার বিধানগত ব্যবধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি এক্ষেত্রে ইসতেহসানের উপর নির্ভরশীল।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল :

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُوْمَةِ الخ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এ মাসআলায় কিয়াসের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলো, এখানে উকিল খুসূমত [বা আত্মপক্ষ সমর্থন] এর জন্য আদিষ্ট। আর খুসূমত বলা হয় পরস্পরের মাঝে চলমান বিরোধিতামূলক বাকবিতণ্ডাকে। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি [ইক্বরার] হলো এর বিপরীত। কারণ ইক্বরার বা স্বীকারোক্তির মাঝে প্রতিপক্ষের কোনো বিরোধিতা হয় না; বরং তাতে প্রতিপক্ষের সমর্থন করা হয়। আর কোনো বিষয়ের আদেশ তার বিপরীত বিষয়কে শামিল করে না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الصُّلْحَ الخ : আর এ কারণেই উকিল প্রতিপক্ষের সাথে [সুলাহ] আপস করা বা প্রতিপক্ষকে দায়মুক্ত করার অধিকারী হয় না। কারণ আপস করার অর্থ হলো দাবির কিছু অংশকে ছেড়ে দেওয়া যাতে বাকি অংশ সহজে আদায় করতে সক্ষম হয়। আর দায়মুক্ত করার অর্থ হলো পরিপূর্ণ দাবি ছেড়ে দেওয়া। আর দুটোই উকিল যে বিষয়ে আদিষ্ট তার বিপরীত। কারণ উকিল তার মুওয়াক্কিলের দাবিকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য আদিষ্ট। সুতরাং যেমনিভাবে প্রতিপক্ষের সাথে আপস করা খুসূমতের আদেশের বিপরীত হওয়ার কারণে উকিল আপস করার অধিকারী হয় না এবং প্রতিপক্ষকে দায়মুক্ত করার বিষয়টিও খুসূমতের আদেশের বিপরীত হওয়ার কারণে উকিল প্রতিপক্ষকে দায়মুক্ত করতে পারেনা, তেমনিভাবে ইকরার বা মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদানের বিষয়টিও খুসূমতের বিপরীত হওয়ার কারণে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। এটাই যুক্তির দাবি।

قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إِذَا اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ : এছাড়াও যদি খুসূমতের জন্য নিযুক্ত উকিলের অধিকার সমূহের মাঝে মুআক্কিলে বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদানের বিষয়টিও শামিল হতো তাহলে স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকারকে রহিত করে খুসূমতের উকিল নিযুক্ত করা বৈধ হতো না। যেমনি ভাবে প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করার অধিকার কে রহিত করে উকিল নিয়োগ করা বৈধ নয় এবং পণ্যপ্রদান করা ও মূল্য কবজা করার অধিকারকে রহিত করে বিক্রয়ের উকিল নিয়োগ করা বৈধ নয়। সুতরাং যেহেতু স্বীকারোক্তি প্রদান [ইক্বরার] করার অধিকারকে রহিত করে ও খুসূমতের উকিল নিযুক্ত করা বৈধ তাই এর দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, খুসূমতের উকিল স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকার রাখে না। বিধায় সে যদি তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا : এমনিভাবে যদি খুসূমত বা আত্মপক্ষ সমর্থনের শর্ত ব্যতীত স্বাভাবিক প্রতিউত্তর করার জন্য কাউকে উকিল বানানো হয় তাহলেও সামাজিক প্রচলনের কারণে তা আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক প্রতিউত্তরের শর্তে শর্তায়িত হয়ে যায়, তাহলে যেখানে সরাসরি খুসূমতের [আত্মপক্ষ সমর্থনের] জন্যই উকিল বানানো হয়েছে সেখানে খুসূমতের বিপরীত ইকরার [মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি] কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, অথচ মুওয়াক্কিলের স্বপক্ষের দাবি প্রমাণিত করার জন্যই খুসূমতের উকিল নিয়োগ করার ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় পারদর্শীর চেয়েও অধিক পারদর্শী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ التَّوْكِيْلَ صَحِيْحٌ قَطْعًا وَصِحَّتُهُ بِتَنَاوُلِهِ مَا يَمْلِكُهُ قَطْعًا وَذٰلِكَ مُطْلَقُ الْجَوَابِ دُوْنَ اَحَدِهِمَا عَيْنًا وَطَرِيْقُ الْمَجَازِ مَوْجُوْدٌ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيُصْرَفُ اِلَيْهِ تَحَرِّيًا لِلصِّحَّةِ قَطْعًا وَلَوِ اسْتَثْنَى الْاِقْرَارَ فَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهُ يَصِحُّ لِاَنَّ لِلتَّنْصِيْصِ زِيَادَةُ دَلَالَةٍ عَلٰى مِلْكِهِ اِيَّاهُ وَعِنْدَ الْاِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْاَوْلٰى وَعَنْهُ اَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ وَلَمْ يَصِحَّهُ فِى الثَّانِىْ لِكَوْنِهِ مَجْبُوْرًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيْهِ .

অনুবাদ : ইসতিহসানের দলিল হলো, এখানে মামলা পরিচালনার জন্য উকিল নিয়োগ অকাট্যভাবে বৈধ হয়েছে। আর এ বৈধতা [উকিলের জন্য কাজির সামনে] ঐরূপ উত্তর প্রদানের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে মুওয়াক্কিল অকাট্যভাবে [কাজির সামনে] যেরূপ উত্তর প্রদানের অধিকারী। আর তা হলো নিঃশর্ত উত্তর, নির্দিষ্টভাবে দুটির কোনো একটি নয়। আর রূপক অর্থ প্রদানের যোগ্যতা এখানে বিদ্যমান রয়েছে– যা আমরা সামনে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ। বিধায় এ ব্যাপারে রূপক অর্থটাই গ্রহণ করা হবে, যাতে উকিল নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বৈধতা লাভ করে। আর যদি মুওয়াক্কিল স্বীকারোক্তি অধিকারকে রহিত করে তাহলে তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে বৈধ হবে না। কারণ মুওয়াক্কিল নিজেই তা রহিত করার অধিকার রাখে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বীকারোক্তির অধিকারকে রহিত করার বৈধতা রয়েছে। কেননা স্বীকারোক্তির অধিকার রহিত কারার সুস্পষ্ট ঘোষণা মুওয়াক্কিলের নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করার অধিকারকে অধিক জোরদারভাবে প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে যেখানে উকিল নিয়োগের বিষয়টি নিঃশর্ত থাকে সেখানে বিষয়টিকে উত্তম অবস্থা ধরে নেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে প্রাপ্ত অন্য এক বর্ণনামতে, তিনি বাদী ও বিবাদীর মাঝে পার্থক্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিবাদীর উকিলের থেকে স্বীকারোক্তির অধিকারকে রহিত করা তিনি বৈধ মনে করেন না। কারণ সে স্বীকারোক্তির উপর বাধ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে বাদীর উকিলের জন্য এক্ষেত্রে উভয় বিষয়ের অধিকার থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল আলোচনা করেন যা ইসতিহসানের উপর নির্ভরশীল ছিল। দলিলের তাফসীল বুঝার পূর্বে একটি ভূমিকা জেনে রাখা আবশ্যক। তা হলো কাজির সামনে বাদী ও বিবাদীর উত্তর দু প্রকার। যথা–

১. ইনকার বা অস্বীকারমূলক উত্তর, যেখানে প্রতিপক্ষের দাবির বিরোধিতা করার মাধ্যমে আত্মপক্ষের সমর্থন করা হয়।

২. ইকরার বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর, যেখানে প্রতিপক্ষের দাবিকে মেনে নেওয়া হয়। সুতরাং বাদী কিংবা বিবাদী যদি নিজেই মামলা পরিচালনা করার জন্য কাজির সামনে উপস্থিত হয় তাহলে সে উপরিউক্ত দুপ্রকার উত্তরের মধ্য থেকে নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে যে কোনো একপ্রকারের উত্তর প্রদান করার অধিকার রাখে। তাই যদি সে এ মামলা পরিচালনার জন্য নিজের স্থলে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করে তাহলে উকিলের ওকালতিও বৈধতা তার মুওয়াক্কিলের সার্বিক অধিকারকে সমন্বয়কারী হওয়ার দরুন মুওয়াক্কিলের জন্য যেমনিভাবে দু প্রকারের উত্তরের মধ্য থেকে নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে যে কোনো একপ্রকারের মাধ্যমে উত্তর প্রদানের বৈধতা রয়েছে তেমনিভাবে উকিলের জন্যও নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে যে

কোনো একপ্রকারের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা বৈধ হওয়া উচিত এ ভিত্তিতেই ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উকিলের জন্য স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদান করা বৈধ হওয়ার কারণে কাজির সামনে উকিলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে বলে অভিমত পোষণ করেন।

এখানে প্রশ্ন হলো, উকিল যদি নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে উত্তর প্রদানের জন্য নিযুক্ত হয় তাহলে উপরিউক্ত দলিল মেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আলোচ্য মাসআলাতো নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে উত্তর প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিলের ব্যাপারে নয়; বরং খুসূমতের জন্য নিযুক্ত উকিলের ব্যাপারে। আর খুসূমত শব্দটির মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে তা নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে উত্তর প্রদানের বিষয়টিকে শামিল করে না; বরং প্রথম প্রকার তথা ইনকারমূলক উত্তরকেই শামিল করে। এ ভিত্তিতে এখানে খুসূমতের উকিলের জন্য ইকরারমূলক উত্তর বৈধ না হওয়া উচিত। এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন– وَطَرِيقُ الْمَجَازِ مَوْجُودٌ অর্থাৎ খুসূমত শব্দটি মৌলিক [হাকীকী] ভাবে নিঃশর্ত [মুতলাক] উত্তর প্রদানের অর্থে প্রদান না করলেও রূপক [মাজাযী] ভাবে তাকে নিঃশর্ত [মুতলাক] উত্তর প্রদানের অর্থে ধরে নেওয়া সম্ভব। কারণ শব্দটির এরূপ রূপক অর্থ প্রদানের যোগ্যতা এখানে বিদ্যমান আছে যা সামনে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ যে, عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْشَاءَ اللّٰهُ [যা সামনে বর্ণনা করব] বলে মুসান্নিফ (র.) কয়েক লাইন পরে উল্লিখিত وَالْإِقْرَارُ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُوْمَةٌ مَجَازًا إِمَّا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِيْ مُقَابَلَةِ الْخُصُوْمَةِ أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ এ ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ খুসূমত (خُصُوْمَتٌ) শব্দটি মূল [হাকীকী] অর্থে শুধু اَلْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ অস্বীকারমূলক উত্তরকে শামিল করলেও [নিম্নোক্ত] দুটি কারণের কোনো এক কারণে اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরও তার রূপক অর্থের মাঝে শামিল।

১. اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরটা যেহেতু খুসূমত (خُصُوْمَتٌ) -এর (مُقَابَلَه) বিপরীতে বের হয় তাই খুসূমত শব্দ বলে রূপক অর্থে (اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ) স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরকে উদ্দেশ্য করা সম্ভব। কারণ আরবি ভাষায় রূপক (مَجَازِىْ) ভাবে (أَحَدُ الْمُتَقَابِلَيْنِ) পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি শব্দের একটিকে অপরটির অর্থে ব্যবহার করার বৈধতা রয়েছে। যেমন কুরআনের ভাষায়– فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ [তোমাদের উপর যেরূপ সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরাও তাদের উপর সেরূপ সীমালঙ্ঘন কর।] এখানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রাথমিক অত্যাচারটাই হলো মৌলিবভাবে عُدْوَانٌ বা সীমালঙ্ঘন, কিন্তু তার প্রতিউত্তরে মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়াটা عُدْوَانٌ বা সীমালঙ্ঘন না হলেও عُدْوَانٌ -এর [মোকাবিলায়] বিপরীতে আসার কারণে [মাজাযী রূপক অর্থে তাকে عُدْوَانٌ বলা হয়েছে। তেমনিভাবে অন্য আয়াতে جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا -এর মাঝে অপরাধের পরিবর্তে যে শাস্তি দেওয়া হয় সেটা মৌলিক অর্থে অপরাধ নয়, কিন্তু (سَيِّئَة) অপরাধের (مُقَابَلَه) বিপরীতে আসার কারণে তাকেও রূপক অর্থে (سَيِّئَة) অপরাধ বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ টা خُصُوْمَتٌ -এর [মোকাবিলায়] প্রতিউত্তরে আসার কারণে রূপক অর্থে خُصُوْمَتٌ শব্দকে اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ অর্থে ধরে নেওয়া সম্ভব।

২. খুসূমতটা হলো কাজির মজলিসে উত্তর প্রদান করার سَبَبٌ বা কারণ। আর কাজির মজলিসে বাদী বা বিবাদীর উত্তর হয়তো না বাচক [তথা اَلْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ] হবে, কিংবা হ্যাঁ বাচক [তথা اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ] হবে। আর سَبَبٌ [অর্থাৎ এখানে خُصُوْمَتٌ] বলে রূপক অর্থে مُسَبَّبٌ [যথা– اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ] -কে উদ্দেশ্য করার বৈধতা আরবি ভাষায় রয়েছে। সুতরাং خُصُوْمَتٌ শব্দটি যেহেতু মৌলিক [হাকীকী] অর্থে (اَلْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ) অস্বীকারমূলক উত্তরকে শামিল করে, আর [মাজাযী] রূপক অর্থে (اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ) স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরকে শামিল করে, আর এ উভয় প্রকারের (جَوَابٌ) উত্তরের সমন্বয় হলো (مُطْلَقُ الْجَوَابِ) নিঃশর্ত উত্তর, তাই (مُطْلَقُ الْجَوَابِ) 'নিঃশর্ত উত্তর প্রদান' এটা হলো খুসূমত শব্দের একটি (مَجَازٌ عَامٌ) ব্যাপকতা সম্পন্ন রূপক অর্থ।

মোটকথা ইমাম যুফার (র.) (خُصُوْمَتٌ) খুসূমত শব্দটিকে [হাকীকী] মূল অর্থে ধরে নিয়ে এ অভিমত পোষণ করেন যে, খুসূমতের জন্য নিযুক্ত উকিলের পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ইকরার বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ খুসূমত শব্দের [হাকীকী] মূল অর্থ কেবল ইনকার বা অস্বীকারমূলক উত্তরকেই বুঝায়। আর শব্দটা [হাকীকী] মূল অর্থে ব্যবহৃত হবে এটাই কিয়াসের দাবি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ কিয়াসের বিপরীতে ইসতিহসানকে অবলম্বন করার কারণে খুসূমত শব্দটিকে তার [মাজাযী] রূপক অর্থে ধরে নিয়ে এ মর্মে অভিমত পোষণ করেন যে, খুসূমতের উকিল কর্তৃক তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ইকরার বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরও গ্রহণযোগ্য হবে।

বাকি থাকল একটি বিষয়, তা হলো খুসূমত শব্দটিকে তার [হাকীকী] মূল অর্থে না ধরে নিয়ে যদি [মাজাযী] রূপক অর্থে ধরা হয় তাহলে এর মাঝে ইসতিহসান কি করে হলো?

বিষয়টির তাফসীল জানার পূর্বে এখানে একথা জেনে নেওয়া উচিত যে, কোনো একটি বিষয়ে কিয়াসের দাবিকে মেনে নেওয়ার মাঝে যদি সূক্ষ্ম চিন্তার দিক থেকে কোনো প্রকারের জটিলতা থাকে কিংবা কিয়াসের বিপরীত ফতোয়ার মাঝে কোনো ধরনের উপকার নিহিত থাকে তাহলে তাকে [সূক্ষ্ম কিয়াস বা] ইসতিহসান বলা হয়।

উপরিউক্ত মাসআলায় খুসূমত শব্দটি তার হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই ছিল কিয়াসের দাবি। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এখানে শব্দটিকে তার হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত করার মাঝে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। কারণ খুসূমত শব্দটির হাকীকী অর্থের বিচারে উকিল কেবল (اَلْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ) অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ সত্যবাদী হলে উকিলের জন্য তার বিপক্ষে অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদান করা হারাম হয় এবং ওকালত বৈধ হয় না। আর প্রতিপক্ষ মিথ্যাবাদী হলে উকিলের জন্য তার বিপক্ষে অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদান করা হালাল হয় এবং ওকালত বৈধ হয়। তাই এ সুরতে প্রতিপক্ষ সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী হোক উভয় অবস্থাতেই ওকালত নিশ্চিতভাবে সহীহ হয় না। পক্ষান্তরে যদি শব্দটিকে তার মাজাযী অর্থে ধরা হয় তাহলে উকিল নিঃশর্ত [মুতলাক] ভাবে اَلْجَوَابُ (اَلْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ ও بِالْإِنْكَارِ) অস্বীকারমূলক ও স্বীকারোক্তিমূলক উভয় প্রকারের মধ্য থেকে যে কোনো একপ্রকারের উত্তর প্রদানের অধিকার রাখার কারণে প্রতিপক্ষ সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী হোক উভয় অবস্থাতেই ওকালত নিশ্চিতভাবে সহীহ হয়। এদিক বিবেচনায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক শব্দটির মাজাযী অর্থ গ্রহণ করাকে ইসতিহসান বলা হয়েছে। কারণ এ সুরতে একজন বিবেকবান মুসলমানের কথাকে বাতিল সাব্যস্ত না করে তার যথাযথ মূল্য দেওয়া সম্ভব, যা হাকীকী অর্থ গ্রহণ করার সুরতে সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ وَلَوْ اِسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মাসআলায় উল্লিখিত ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলকে খণ্ডন করার জন্য তার উত্তর দিচ্ছেন। ইমাম যুফারের দলিলে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, খুসূমতের উকিল থেকে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করা বৈধ আছে। আর খুসূমতের উকিল থেকে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিতকরণের বৈধতা একথা প্রমাণ করে যে, খুসূমতের উকিল স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে না। তাই মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে তার স্বীকারোক্তি কাজির মজলিসে হোক কিংবা কাজির মজলিসের বাইরে হোক কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর এ দলিলের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, খুসূমতের উকিল থেকে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করা বৈধ আছে, একথাটি সঠিক নয়। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মতে তা বৈধ নয়। তাই একথার উপর ভিত্তি করে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল প্রদান করা সঠিক হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা বৈধ না হওয়ার কারণ হলো, যদি স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর দেওয়ার অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ করা মুওয়াক্কিলের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয় তাহলে উকিলের জন্য সর্বদা কেবল অস্বীকারমূলক উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হয়ে যাবে। অথচ সবসময় উকিলের জন্য অস্বীকারমূলক উত্তর দেওয়া জায়েজ হয় না। তাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এটাকে বৈধ মনে করেন না।

হ্যাঁ, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে [অর্থাৎ اِسْتِثْنَاءُ الْاِقْرَارِ বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর দেওয়ার অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে] দুটি অভিমত পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে তিনি তা বৈধ মনে করেন, যেমনটি জাহেরী রেওয়ায়েতে রয়েছে। আর অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি এ ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদীর উকিলের মাঝে পার্থক্য করেন। বাদীর উকিলের ক্ষেত্রে তা বৈধ মনে করেন, আর বিবাদীর উকিলের ক্ষেত্রে তা বৈধ মনে করেন না। কেননা বিবাদীর জন্য কখনো কখনো স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানে বাধ্য হতে হয়। তাই তার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করার মাঝে বিশেষ কোনো উপকার বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে বাদীর উকিল যেহেতু কখনো স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানে বাধ্য হয় না; বরং সর্বদাই সমানভাবে দু প্রকারের কোনো এক প্রকারের উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে তাই তার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করার মাঝে বিশেষ ফায়দা আছে বিধায় তা বৈধ হবে।

সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ দুটি অভিমতের আলোকে বিচার করলেও ইমাম যুফার (র.)-এর উপরিউক্ত দলিল সঠিক হয় না। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক [اِسْتِثْنَاءُ الْاِقْرَارِ তথা] স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগের বিষয়টির বৈধতা সংক্রান্ত অভিমতের অর্থ এই নয় যে, উকিল ইকরার বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে না; বরং স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ করার বৈধতা সংক্রান্ত অভিমত তিনি এ দৃষ্টিকোণ থেকে পেশ করেন যে, قَوْلُهُ لِاَنَّ لِلتَّنْصِيْصِ زِيَادَةُ دَلَالَةٍ... : মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলের ইকরার [স্বীকারোক্তি] মূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে দওয়া দৃঢ়ভাবে এ কথার প্রমাণ করে যে, মুওয়াক্কিল এখানে নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার প্রতিপক্ষ এ মামলায় মিথ্যাবাদী, ফলে উকিল এখানে কেবল ইনকার বা অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানেরই অধিকারী হবে। মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ইকরারমূলক উত্তর প্রদান করা তার জন্য কোনোক্রমেই জায়েজ হবে না। তাই সে উকিলের ইকরারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে কেবল ইনকারমূলক উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রেই তার অধিকারটিকে [تَنْصِيْص বা] নির্ধারিত করে দিয়েছে বিধায় তার এ রহিতকরণ ও নির্ধারণ বৈধ হবে।

–[নাতায়িজুল আফকারের সমন্বয়ে প্রান্তটিকা ৩ ও ৪ থেকে গৃহীত]

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْاِطْلَاقِ الخ : পক্ষান্তরে যদি এরূপ নির্ধারণ না করে মুতলাকভাবে খুসূমতের উকিল নিয়োগ করা হয় তাহলে একজন মুসলমানের উত্তম অবস্থার বিবেচনায় উকিলকে কাজির সামনে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত [মুতলাক] অধিকার দেওয়াই অধিক উপযোগী। কারণ নিঃশর্ত [মুতলাক] অধিকার থাকলে উকিলের জন্য কাজির সামনে উত্তর প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই হারাম হয় না; বরং প্রতিপক্ষ মিথ্যাবাদী হলে সে তার মুওয়াক্কিলের পক্ষে [ইনকার] অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের যেমন অধিকার রাখে তেমনিভাবে প্রতিপক্ষ সত্যবাদী হলে সে তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ইকরার বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানেরও অধিকারে রাখে। কিন্তু যদি উকিলের উত্তর প্রদানের অধিকারটাকে এমতাবস্থায় [মুতলাক] নিঃশর্ত না রেখে কেবল ইনকার বা অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের সাথেই শর্তায়িত করে দেওয়া হয় তাহলে প্রতিপক্ষ সত্যবাদী হওয়ার সূরতে উকিলের জন্য তার বিপক্ষে অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদান করা হারাম হয়। আর হারাম কাজ করার জন্য উকিল বানানো হারাম হওয়ায় তা একজন মুসলমানের উত্তম অবস্থার পরিপন্থি হওয়ার কারণে মুতলাকভাবে নিয়োজিত খুসূমতের উকিলকে [মাজাযী] রূপক অর্থে নিঃশর্ত [মুতলাক] উত্তর প্রদানকারী বলে মেনে নেওয়া উচিত। [প্রান্তটীকা ৫]

মোটকথা হলো, ইমাম যুফার (র.) আলোচ্য মাসআলায় খুসূমত শব্দটিকে তার হাকীকী অর্থে ধরে নিয়ে উকিলের জন্য তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে ইকরারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকার নেই বলে মত পোষণ করেন এবং মাসআলাটিকে তিনি নিম্নোক্ত তিনটি মাসআলার সাথে কিয়াস করেন, যার প্রত্যেকটিই এ কায়দার অন্তর্ভুক্ত যে, ইকরার হলো খুসূমতের ضِدّ [বিপরীত] আর اَلْاَمْرُ بِالشَّئِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ [কোনো বিষয়ের আদেশ তার বিপরীতকে শামিল করে না।]

১. মুওয়াক্কিলের জন্য اِسْتِثْنَاءُ الْاِقْرَارِ বা ইকরারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ করা জায়েজ হওয়া।

২. উকিল তার প্রতিপক্ষের صُلْح বা আপস করার অধিকারী না হওয়া।

৩. উকিল তার প্রতিপক্ষকে দায়মুক্ত করার অধিকারী না হওয়া।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে এ তিনটি কিয়াসের উত্তর হলো,

* প্রথম মাসআলাটির সাথে এ মাসআলাকে কিয়াস করা সঠিক নয়। কারণ,

১. কিয়াস সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো مَقِيْس عَلَيْه [যার সাথে কিয়াস করা হচ্ছে] এটি সকলের নিকট স্বীকৃত হতে হবে। কিন্তু এখানে مَقِيْس عَلَيْه টি সকলের নিকট স্বীকৃত নয়; বরং মতবিরোধপূর্ণ।

২. তদুপরি কিয়াসকে সঠিক মেনে নেওয়া হলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে এ কিয়াস দলিল হতে পারে না। কেননা তিনি কোনো অবস্থাতেই اِسْتِثْنَاءُ الْاِقْرَارِ -কে জায়েজ মনে করেন না।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিপক্ষে যদিও এ কিয়াস বাহ্যিকভাবে দলিল বলে মনে হয় কিন্তু সূক্ষ্ম চিন্তার বিচারে তা দলিল বলে বিবেচিত নয়। কারণ ইমাম যুফার (র.) যে দৃষ্টিকোণ থেকে তা জায়েজ মনে করেছিলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) সে কারণে তাকে জায়েজ বলেননি।

* আর ২য় ও ৩য় মাসআলার সাথে ইমাম যুফার (র.)-এর কিয়াসের উত্তর মুসান্নিফ (র.) সরাসরি আলোচনা করেননি। তাই কেউ কেউ এর উত্তরে বলেন– আলোচ্য মাসআলা [খুসূমতের উকিল ইকরারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারী হবে কিনা]-কে صُلْح আপস করা ও اِبْرَاء [দায়মুক্ত করা]-এর মাসআলাদ্বয়ের সাথে কিয়াস করা সঠিক হবে না। কারণ صُلْح এবং اِبْرَاء এ দুটি খুসূমত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, যা বাদী ও বিবাদী উভয়ের যৌথ এখতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত। আর রূপকভাবে খুসূমত শব্দটিকে এ দুটির কোনো একটির অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; বিধায় উকিল صُلْح ও اِبْرَاء -এর অধিকারী হয় না। সুতরাং মাসআলা দুটি উপরে উল্লিখিত কায়দা اَلْاَمْرُ بِالشَّئِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ -এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে اِقْرَارٌ [তথা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর] টা তার হাকীকী অর্থে খুসূমত থেকে আলাদা বিষয় হলেও রূপক অর্থে খুসূমতকে اِقْرَارٌ -এর অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব, যা পূর্বে বলা হয়েছে। তাই এটা اَلْاَمْرُ بِالشَّئِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবরতী (র.) তাঁর اَلْعِنَايَةُ 'আল ইনায়াহ' নামক গ্রন্থে উপরিউক্ত উত্তরটি উল্লেখ করার পর বলেন, এক্ষেত্রে উত্তম জওয়াব হলো, খুসূমতের উকিল সাধারণত নিঃশর্ত উত্তর প্রদানের অধিকারী হয়ে থাকে। আর নিঃশর্ত উত্তরটা হয়তো হ্যাঁ বাচক হবে [যথা– اِقْرَارٌ] কিংবা না বাচক হবে [যথা– اِنْكَارٌ] আর صُلْح ও اِبْرَاء এ দু প্রকার উত্তরের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এর জন্য নতুন চুক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে বিধায় উকিল صُلْح ও اِبْرَاء -এর অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে اِقْرَارٌ নিঃশর্ত উত্তরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত বিধায় উকিল اِقْرَارٌ -এর অধিকারী হয়, তাই اِقْرَارٌ -এর মাসআলাকে صُلْح ও اِبْرَاء -এর উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না। নাতায়িজুল আফকার গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা কাজি যাদাহ আল আফন্দী (র.) এ দুটি উত্তরের মাঝে প্রথম উত্তরটিকেই এখানে অধিক প্রযোজ্য বলে মনে করেন। –[নাতায়িজুল আফকার : পৃ. ১২৬, খ. ৮]

فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اِنَّ الْوَكِيْلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ وَاِقْرَارُهٗ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا اِقْرَارُ نَائِبِهٖ وَهُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّ التَّوْكِيْلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابًا يُسَمّٰى خُصُوْمَةً حَقِيْقَةً اَوْ مَجَازًا وَالْاِقْرَارُ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُوْمَةٌ مَجَازًا اِمَّا لِاَنَّهٗ خَرَجَ فِيْ مُقَابَلَةِ الْخُصُوْمَةِ اَوْ لِاَنَّهٗ سَبَبٌ لَهٗ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اِتْيَانُهٗ بِالْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ الْجَوَابُ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهٖ لٰكِنْ اِذَا اُقِيْمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلٰى اِقْرَارِهٖ فِيْ غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخْرُجُ مِنَ الْوَكَالَةِ حَتّٰى لَا يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْمَالِ اِلَيْهِ لِاَنَّهٗ صَارَ مُنَاقِضًا وَصَارَ كَالْاَبِ اَوِ الْوَصِيِّ اِذَا اَقَرَّ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ : খুসূমতের উকিল নিঃশর্ত উত্তর প্রদানের অধিকারী হয় একথা প্রমাণিত হওয়ার পর ইমাম ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর বক্তব্য হলো, উকিল যেহেতু এক্ষেত্রে তার মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত আর মুওয়াক্কিলের স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরের বৈধতা কাজির মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, তাই তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের বৈধতাও তেমনি হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খুসূমতের জন্য উকিল নিয়োগ এমন উত্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে যা প্রকৃত অর্থে কিংবা রূপক অর্থে খুসূমত বলে গণ্য হয়। আর স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর [প্রকৃত অর্থে খুসূমত হয় না; বরং তা] কাজির মজলিসে হলে রূপক অর্থে খুসূমত বলে গণ্য হবে। স্বীকারোক্তিটি খুসূমতের বিপরীতে আসার কারণে কিংবা খুসূমতটা স্বীকারোক্তির কারণ হওয়ার দরুন। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, হকদার যখন হক তলব করে তখন প্রাপ্য হকটাই সে [তার সামনে] পেশ করবে। আর প্রাপ্য হক হলো কাজির মজলিসে উত্তর প্রদান। তাই কাজির মজলিসের সাথেই তা সীমাবদ্ধ হবে। তবে যদি কাজির আদালতের বাইরে উকিল স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এ মর্মে কোনো দলিল পেশ করা হয় তাহলে এ কারণে উকিল তার ওকালতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তার হাতে মাল প্রদানের আদেশ জারি করা হবে না। কেননা সে এর দ্বারা স্ববিরোধী বক্তব্য দানকারী বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যেন সে ঐ পিতা বা অছির মতো হয়ে গেল, যে কাজির মজলিসে [তার বালক সন্তান বা যার ব্যাপারে অসিয়তকৃত তার বিপক্ষে] স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এই স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না এবং তার হাতে মালও সোপর্দ করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইখতিলাফ সংক্রান্ত দলিল নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ তিনজন ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপরীতে এ ব্যাপারে একমত যে, খুসূমতের উকিল তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত স্বীকারোক্তি কাজির মজলিসে হলেই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ গ্রহণযোগ্যতাকে কাজির মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ করেন না; বরং তা সর্বাবস্থাই গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে যখন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, খুসূমতের উকিল তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে, তাই এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য হলো, উকিল এখানে তার মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত, আর মুওয়াক্কিলের স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা যেহেতু কাজির মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, তাই তার উকিলের স্বীকারোক্তিমূলক উত্তরের গ্রহণযোগ্যতাও কাজির মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ না হওয়া উচিত।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, تَوْكِيْلٌ بِالْخُصُوْمَةِ তথা খুসূমতের জন্য উকিল নিয়োগটি হলো مَجَازٌ عَامٌّ [ব্যাপক রূপক অর্থবোধক শব্দ] যা তার عُمُوْمٌ ব্যাপকতার মাঝে এমন সব ধরনের উত্তরকে শামিল করে যাকে প্রকৃত অর্থে কিংবা রূপক অর্থে খুসূমত বলা চলে। আর 'স্বীকারোক্তি' এটা প্রকৃত অর্থে খুসূমত নয়; বরং তা কেবল রূপক অর্থে তখনই খুসূমত হয়ে থাকে যখন তা কাজির মজলিসে প্রদান করা হয়। আর কাজির মজলিসের বাইরে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হলে তা রূপক অর্থেও খুসূমত বলে গণ্য হবে না বিধায় উকিল কাজির মজলিসের বাইরে স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকারী নয়। তাই উকিল যদি কাজির মজলিসের বাইরে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর স্বীকারোক্তিটা কাজির মজলিসে প্রদান করা হলে তা রূপক অর্থে এজন্য খুসূমতের অন্তর্ভুক্ত হয়, কারণ–

১. স্বীকারোক্তিটা কাজির মজলিসে হলে তা খুসূমতের বিপরীতে প্রদান করা হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় [إِقْرَارٌ বা] স্বীকারোক্তিটা হয় খুসূমতের مُقَابِلٌ আর أَحَدُ الْمُتَقَابِلَيْنِ -এর একটিকে রূপক অর্থে অপরটির নামে নামকরণ করার বৈধতা রয়েছে।

২. অথবা যেহেতু খুসূমতের কারণেই প্রতিপক্ষ কাজির মজলিসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয়, তাই খুসূমতটা হলো إِقْرَارٌ -এর سَبَبٌ আর مُسَبَّبٌ -কে سَبَبٌ -এর নামে নামকরণ করা যেতে পারে।

পক্ষান্তরে কাজির মজলিসের বাইরের স্বীকারোক্তি না খুসূমতের বিপরীতে প্রদত্ত হয়, না খুসূমতটা সে স্বীকারোক্তির কারণ হয়। তাই সেই স্বীকারোক্তিকে রূপক অর্থে খুসূমত বলা চলে না। কারণ বাস্তবতা এটাই যে, হকদার তার হক তলব করলেই প্রতিপক্ষ তার হক দিতে বাধ্য হয়। আর এ বাধ্যবাধকতা কাজির মজলিসে উত্তর প্রদানের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়, যার প্রকৃত নাম হলো খুসূমত বা মামলা। তাই রূপক অর্থে যাকে খুসূমত বলা হবে তাও কাজির মজলিসেই হতে হবে।

قَوْلُهُ لٰكِنْ إِذَا أُقِيْمَتِ الْبَيِّنَةُ عَلٰى إِقْرَارِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচনার উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্ন হলো, কাজির মজলিসের বাইরের স্বীকারোক্তি যদি রূপক অর্থে খুসূমত সাব্যস্ত না হয় তাহলে এ স্বীকারোক্তির কারণে উকিল তার ওকালতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয় কেন? যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কাজির মজলিসের বাইরে স্বীকারোক্তি প্রদানের দরুন উকিল তার ওকালতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হওয়ার কারণ হলো, কাজির মজলিসের বাইরে উকিল তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এমন কোনো দলিল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে উকিল কাজির দরবারে গিয়ে পুনরায় বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ অস্বীকার করলে সে এ বিষয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য প্রদানকারী সাব্যস্ত হবে, যেন সে তার দ্বিতীয় বক্তব্যের দ্বারা প্রথম বক্তব্যের ক্ষেত্রে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, আর মিথ্যাবাদীর কোনো দাবিই শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এ উকিলকে তার দায়িত্বে বহাল রাখা হলে মুওয়াক্কিলের এতে কোনো উপকার নিহিত থাকে না বিধায় উকিলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং যে কোনো পন্থায় তার মুওয়াক্কিলের দাবি প্রমাণিত হয়ে গেলে তার প্রতিপক্ষকে এ উকিলের হাতে মাল সোপর্দ করার জন্য আদেশ করা যাবে না।

আল্লামা হাকিম শহীদ (র.) তাঁর 'আল-কাফী' নামক গ্রন্থে লিখেন, যে উকিল যদি কাজির মজলিসের বাইরে তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তার হাতে মুওয়াক্কিলের মাল সোপর্দ করা যাবে না। কারণ এমতাবস্থায় সে কাজির সামনে নিঃশর্ত উত্তর প্রদানের অধিকার রাখে না। কারণ সে তার মুওয়াক্কিলের পক্ষে অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদান করলে স্ববিরোধী বক্তব্য প্রদানকারী সাব্যস্ত হবে। তাই যদি তাকে উকিল হিসেবে বহাল থাকতে হয় তাহলে কেবল স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্য উকিল হিসেবে বহাল থাকতে পারবে। অথচ মুওয়াক্কিল তাকে কেবল স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্য উকিল নিয়োগ করেনি; বরং নিঃশর্ত উত্তর প্রদানের জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিল। –[নাতায়িজুল আফকার– খ. ৮, পৃ. ১২৮]

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْأَبِ أَوِ الْوَصِيِّ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কাজির মজলিসের বাইরে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী উকিলের একটি উদাহরণ পেশ করছেন। উদাহরণটির তাফসীল হলো, কোনো পিতা [যে তার বালক সন্তানের প্রকৃত অলী বা অভিভাবক]

কিংবা অছি [যে অলীর অসিয়ত সূত্রে তার মৃত্যুর পর কোনো বালক সন্তানের অভিভাবক হয়েছে] যদি তাদের অধীনস্থ বালক সন্তানের জন্য কোনো অধিকার দাবি করে, অতঃপর তাদের প্রতিপক্ষ সে অধিকারকে অস্বীকার করলে যদি ঐ পিতা কিংবা অছি তার সত্যায়ন করে তাহলে বালক সন্তানের বিপক্ষে তাদের এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং ঐ বালকের অধিকার যে কোনো পন্থায় প্রমাণিত হয়ে গেলে উক্ত পিতা কিংবা অছির হাতে তা অর্পণ করা হবে না। কারণ বালক সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষি হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অলী বা অভিভাবক বানানো হয়েছিল, আর বালক সন্তানের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করা তার হিতকামনায় প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে তারা এ স্বীকারোক্তির দরুন তার অভিভাবকের দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেছে। সুতরাং এ মাসআলায় যেমনিভাবে অলী কিংবা অছির স্বীকারোক্তি তাদের অধীনস্ত [مُوْصٰى لَهٗ কিংবা مَوْلٰى]-এর বিপক্ষে সহীহ না হওয়া সত্ত্বেও এ স্বীকারোক্তির কারণে তারা অলী কিংবা অছির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয়ে যায় তেমনিভাবে কাজির মজলিসের বাইরে মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী উকিলের স্বীকারোক্তি সহীহ না হওয়া সত্ত্বেও সে তার ওকালতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : আলোচ্য মাসআলা তথা খুসূমতের জন্য উকিল নিয়োগ সংক্রান্ত মাসআলার সারকথা হিসেবে এখানে বিশেষভাবে একথা জেনে নেওয়া উচিত যে, খুসূমত বা মামলা পরিচালনার জন্য উকিল নিয়োগের বিষয়টি সম্ভাব্য পাঁচ প্রকারের হতে পারে–

প্রথম প্রকার : শুধুমাত্র খুসূমত [মামলা পরিবচালনার]। এর জন্য উকিল নিয়োগ করা এবং সাথে অন্য কোনো প্রকারের শর্ত উল্লেখ করা ব্যতীত। এমতাবস্থায় উকিল সর্বসম্মতিক্রমে অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারী হবে। আর আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন ইমাম [অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর মতে اقرار বা স্বীকারোক্তিমূলক উত্তর প্রদানেরও অধিকারী হবে।

দ্বিতীয় : স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকার ব্যতীত শুধুমাত্র খুসূমতের জন্য উকিল নিয়োগ করা। এমতাবস্থায় উকিল শুধুমাত্র অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারী হবে। তবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী কর্তৃক জামিউস সাগীরের শরাহ-এ উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ করাই বৈধ হবে না। হ্যাঁ, ইমাম মুহাম্মদের নিকট তা বৈধ হবে। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী কর্তৃক মাবসূতের কিতাবুল ওকালাহ -এর শরাহতেও অনুরূপ বর্ণনা উল্লিখিত আছে।

তৃতীয় প্রকার : অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে খুসূমতের উকিল নিয়োগ করা। এমতাবস্থায় উকিল শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি প্রাদানের অধিকারী হবে। আর জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে এরূপ অস্বীকারমূলক উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে উকিল নিয়োগ করা বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা অনুসারে তা বৈধ হবে না।

চতুর্থ প্রকার : স্বীকারোক্তি প্রদানের অধিকার দিয়ে খুসূমতের উকিল নিয়োগ করা। এমতাবস্থায় উকিল স্বীকারোক্তিমূলক ও অস্বীকারমূলক উভয় প্রকারের উত্তর প্রদানের অধিকারী হবে। তাই এ উকিল যদি তার মুওয়াক্কিলের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করে আমাদের মতে তা সহীহ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা সহীহ হবে না। এখানে একথাও জানা উচিত যে, শুধু কেবল স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্যও উকিল নিয়োগ করা আমাদের মতে বৈধ আছে। তবে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র উকিল নিয়োগের দ্বারাই মুওয়াক্কিল স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মাসআলাটি بَابُ الْوَكَالَةِ بِالصُّلْحِ-এর মাঝে উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম প্রকার : স্বীকারোক্তি প্রদান ও অস্বীকার কারা উভয় প্রকারের উত্তর প্রদানের অধিকারকে রহিত করে খুসূমতের উকিল নিয়োগ করা। এরূপ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের মুতাকাদ্দিম উলামার পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালের উলামাদের থেকে এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়– কারো কারো মতে এরূপ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে না। কারণ খুসূমতের জন্য উকিল নিয়োগের অর্থই হলো উকিলকে মামলায় প্রতিউত্তর করার অধিকার প্রদান করা। আর প্রতিউত্তরটা হয়তো অস্বীকারের মাধ্যমে হবে কিংবা স্বীকারোক্তি প্রদানের মাধ্যমে হবে। যেহেতু উকিলের উভয় প্রকারের অধিকারই রহিত করা হয়েছে, তাই এরূপ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে না। তবে কাজি ইমাম সায়্যেদ নিশাপুরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এরূপ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে। আর এমতাবস্থায় উকিল কাজির মজলিসে উপস্থিত হয়ে চুপ থাকবে এবং তার বিপক্ষে যে দলিল পেশ করা হবে তা শ্রবণ করবে। আর এরূপ উকিল নিয়োগ বৈধ হওয়ার কারণ হলো, প্রতিপক্ষের এখানে উদ্দেশ্য হলো কাজির সামনে দলিল-প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে নিজের অধিকারকে উসুল করা। আর এরূপ উকিলের উপস্থিতিতে তা উসুল করা সম্ভব। -[নাতায়িজুল আফকার- খ. ৮, পৃ. ১২৮ ও ১২৯]

قَالَ : وَمَنْ كَفَلَ بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ فَوَكَّلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنِ الْغَرِيمِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي ذٰلِكَ اَبَدًا لِاَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي اِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ وَلِاَنَّ قُبُولَ قَوْلِهِ مُلَازِمٌ لِلْوَكَالَةِ لِكَوْنِهِ اَمِينًا وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكَوْنِهِ مُبَرِّئًا نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَازِمِهِ وَهُوَ نَظِيرُ عَبْدٍ مَاذُوْنٍ مَدْيُوْنٍ اَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ حَتّٰى ضَمِنَ قِيْمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنِ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمَا بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কারো পক্ষ হতে মালের কফীল হয় আর মালের মালিক [তথা পাওনাদার] দেনাদার থেকে সে মাল কবজা করার জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে সে কখনো এ বিষয়ে উকিল হবে না। কেননা উকিল হলো ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পক্ষে কাজ করে অথচ যদি তার উকিল হওয়াকে আমরা বৈধ বলি তাহলে সে নিজের দায়মুক্তির জন্য কর্ম সম্পাদনকারী হবে। [অন্যের পক্ষে নয়] ফলে ওয়াকালাহ-এর মূল রোকন অবিদ্যমান হবে। তাছাড়া উকিলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়া ওয়াকালাহ-এর অনিবার্য অঙ্গ। কেননা এ বিষয়ে তাকে আমানতদার গণ্য করা হয়েছে, অথচ যদি তার ওয়াকালাহকে আমরা বৈধ বলি তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণাকারী হচ্ছে। সুতরাং ওয়াকালাহ-এর অনিবার্য অঙ্গ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ওয়াকালাহ বিলুপ্ত হবে। এটা সেই মাসআলার সদৃশ যেখানে ঋণগ্রস্ত অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে মনিব আজাদ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে মনিব পাওনাদারদের অনুকূলে গোলামের মূল্যের জামিন হবে এবং গোলামের কাছে পুরো ঋণের তাগাদা করবে। এমতাবস্থায় যদি পাওনাদার গোলামের কাছ থেকে মাল কবজা করার জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে এ ওয়াকালাহ বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ كَفَلَ بِمَالٍ الخ : এতক্ষণ যাবৎ মুসান্নিফ (র.) খুসূমত ও কবজা করার উকিলের দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করে আসছিলেন। এখান থেকে তিনি উকিল শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত মাসআলা-মাসাইল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। এ ইবারতে আলোচিত মাসআলাটি হলো, কোনো মালের কফীলকে যদি সে মাল কবজা করে দেওয়ার জন্য উকিল নিয়োগ করা হয় তাহলে এ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে কিনা এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীর নামক গ্রন্থে লিখেন, যে ব্যক্তি কোনো মালের কফীল হয়েছে, মালের পাওনাদার যদি দেনাদারের কাছ থেকে উক্ত মাল কবজা করে দেওয়ার জন্য তাকে উকিল নিযুক্ত করে তাহলে এ উকিল নিয়োগ বৈধ হবে না। তাই সে ব্যক্তি কখনো এ মালের জন্য উকিল সাব্যস্ত হবে না। ফলে উকিল নিয়োগ বৈধ হলে যেমনিভাবে উকিলের হাতে কোনো মাল নষ্ট হলে তা তার মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে যায়, উকিলকে তার কোনো ভর্তুকি দিতে হয় না, এখানে তেমনটি হবে না। বরং এ কফীলের হাতে যদি মালটি কোনোরূপ নষ্ট হয় তাহলে তাকে এ মালের ভর্তুকি দিতে হবে।

قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي ذٰلِكَ اَبَدًا : এখানে اَبَدًا শব্দটি দিয়ে একথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কফীল তার কাফালাহর দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পূর্বেও সে এ মালের জন্য উকিল সাব্যস্ত হবে না এবং দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পরও নয়।

মাসআলার দলিল :

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْوَكِيْلَ مَنْ يَعْمَلُ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন–

১. উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াকালাহ-এর রুকন পাওয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। আলোচ্য মাসআলায় যদি মালের কফীলকে উক্ত মাল কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয় তাহলে তাতে ওকালাহ-এর রুকন বিদ্যমান থাকে না বিধায় এ উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ উকিল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের পক্ষে কর্মসম্পাদন করে, এটা হলো ওয়াকালাহর রুকন। আর কফীলকে উকিল বানানো হলে সে তার কবজা করার মাধ্যমে যেহেতু নিজের কাফালাহ-এর দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে তাই সে এ কবজার মাধ্যমে অন্যের পক্ষে কর্মসম্পাদনকারী হতে পারে না; বরং নিজের কর্মসম্পাদনকারী হয়ে যায়। ফলে এখানে ওয়াকালাহ-এর রুকন বিদ্যমান না থাকায় এ উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হবে না।

২. উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হওয়ার জন্য উকিলের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। এটা ওয়াকালাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তও বটে। কারণ উকিল হলো মালের জন্য আমানতদার। উকিলের হাতে মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে গেলে তা মুওয়াক্কিলের হাত থেকে হারিয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হওয়ার নামান্তর। উকিলকে এর কোনো জরিমানা বা ভর্তুকি দিতে হয় না। বরং উকিল যদি এরূপ মাল নষ্ট হওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়ার দাবি করে তাহলে তা গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। সুতরাং যদি মালের কফীলকে উক্ত মাল কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয় আর সে এ মর্মে দাবি করে যে, দেনাদার তার দেনা আদায় করে দিয়েছিল, কিন্তু আমার হাতে তা নষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমার হাত থেকে তা হারিয়ে গেছে। তাহলে উকিল হিসেবে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু সে এ দাবির মাধ্যমে তার কাফালাহ-এর দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভকারী হচ্ছে, তাই তার এ দাবি গ্রহণ করা সম্ভব নয়, বিধায় এখানে ওকালাহর শর্তের অবিদ্যমানে উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হয়নি বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ نَظِيْرُ عَبْدٍ مَاذُوْنٍ الخ : আলোচ্য মাসআলার উদাহরণ হলো ঐ (عَبْد مَاذُوْن) ঋণগ্রস্ত [মনিবের পক্ষ থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মাসআলার মতো, যার মনিব তাকে আজাদ করে দেওয়ার কারণে সে [মনিব পাওনাদারদেরকে গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ নিজের পক্ষ থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করা সহ বাকি সম্পূর্ণ ঋণের অর্থ গোলামের কাছ থেকে উসুল করে পাওনাদারদেরকে আদায় করতে বাধ্য হয়েছে। এ মনিবকে যদি পাওনাদারগণ তাদের ঋণ কবজা করে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে এ উকিল নিয়োগ অশুদ্ধ হবে।

সুতরাং এ মাসআলায় যেমনিভাবে গোলামের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে পাওনাদারদের পাওনা আদায়ে বাধ্য মনিবকে উক্ত পাওনা কবজা করার জন্য উকিল বানানো অশুদ্ধ হয়েছে, তেমনিভাবে দেনাদার পাওনা আদায়ের অসম্মতি জ্ঞাপন করলে নিজের পক্ষ থেকে পাওনা পরিশোধ করতে বাধ্য কফীলকেও যদি উক্ত পাওনা কবজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা হয় তাহলে সেই উকিল নিয়োগ অশুদ্ধ হবে। কারণ উভয় অবস্থাতেই মনিব এবং কফীল পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। তাই তাদেরকে সে পাওনা কবজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা হলে তারা অন্যের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী হবে না এবং উকিল হিসেবে তাদের কথাকে গ্রহণ করাও সম্ভব হবে না। অথচ উকিল নিয়োগ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক।

অতএব উপরিউক্ত দলিল ও উদাহরণ-এর আলোকে ইবারতে উল্লিখিত মাসআলায় মালের কফীলকে যদি সে মাল কবজা করার জন্য উকিল বানানো হয়, তাহলে কফীল তার কাফালাহ-এর দায়িত্বে বহাল থাকা অবস্থায় সে এ মালের উকিল সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ খুবই স্পষ্ট। আর কাফালাহ -এর দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার পর সে এ মালের উকিল সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো যখন তাকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলোর কারণে তাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ করাই অশুদ্ধ ছিল। তাই সে সমস্যাগুলো দূরীভূত হওয়ার কারণে এ নিয়োগ বিশুদ্ধতে রূপান্তরিত হবে না। বরং কাউকে কোনো বিষয়ে উকিল সাব্যস্ত করার জন্য বিশুদ্ধভাবে নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে কোনো মালের ব্যাপারে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির কাফীল হয়েছে, তাহলে এরূপ কফীল হওয়া বৈধ হবে না। কারণ এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া যায়নি অথচ কাফালাহ সহীহ হওয়ার জন্য যার পক্ষে কাফীল হচ্ছে তার সম্মতি পাওয়া যাওয়া শর্ত। অতঃপর যদি সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ কাফালাহর সংবাদ পৌছলে সে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে এ মালের কফীল সাব্যস্ত হবে না।

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّهُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فِىْ قَبْضِ دَيْنِهٖ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيْمُ اُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ اِقْرَارٌ عَلٰى نَفْسِهٖ لِاَنَّ مَا يَقْضِيْهِ خَالِصُ مَالِهٖ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, কেউ যদি দাবি করে যে, সে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে তার উকিল, আর দেনাদার তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তার হাতে ঋণ অর্পণের আদেশ জারি করা হবে। কেননা এটা হলো দেনাদারের নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তি। কারণ সে যা পরিশোধ করবে সেটা তার নিজস্ব মাল

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّهُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের জন্য নিজেকে তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিল বলে দাবি করে এবং এ দাবির ভিত্তিতে দেনাদার তার হাতে ঋণেরে অর্থ অর্পণ করে তাহলে মাসআলাটির সম্ভাব্য তিনটি সুরত হতে পারে–

১. হয়তো দাবিদার উকিলকে উকিল হিসেবে সত্যায়ন করে নিয়ে তার হাতে ঋণ অর্পণ করবে।
২. অথবা সত্যায়ন ব্যতীত কেবল তার দাবির ভিত্তিতেই তার হাতে ঋণ অর্পণ করবে।
৩. কিংবা উকিল হিসাবে তাকে মিথ্যারোপ করা সত্ত্বেও তার হাতে ঋণ অর্পণ করবে।

প্রথম সুরতের বর্ণনা :
এ তিন সুরতের মধ্য থেকে প্রথম সুরতে অর্থাৎ দেনাদার যদি দাবিদার উকিলকে তার পাওনাদারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিল হিসেবেই সত্যায়ন করে নিয়ে ঋণমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার হাতে ঋণের অর্থ অর্পণ করে তাহলে হয়তো সে উক্ত উকিলের হাতে ঋণ অর্পণ করার সময় তাকে উক্ত ঋণের ব্যাপারে জামিন বানিয়ে তার কাছে হস্তান্তর করবে কিংবা জামিন বানানো ব্যতিরেকেই তা হস্তান্তর করবে। উভয় সুরতেই অনুপস্থিত ব্যক্তি এসে যদি উক্ত উকিলের নিয়োগের বিষয়টিকে সত্যায়ন করে নেয় এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তো ভালো, অন্যথায় দেনাদারের জন্য তার পাওনাদারের কাছে পুনরায় ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।
এমতাবস্থায় দাবিদার উকিলের হাতে দেওয়া ঋণের অর্থ যদি তার হাতে বহাল থাকে তাহলে দেনাদার তার কাছ থেকে উক্ত অর্থ ফেরত নিয়ে নেবে। কিন্তু যদি দাবিদার উকিলের হাত থেকে উক্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায়, তাহলে দেনাদার কেবল জামিন বানিয়ে ঋণ অর্পণ করার সুরতেই উক্ত উকিলের কাছ থেকে তার দেওয়া মাল [ঋণ] ফেরত আনার জন্য রুজু করতে পারবে। জামিন বানানো ব্যতিরেকে ঋণ অর্পণ করে থাকলে তার [জরিমানা] ফেরত আনার জন্য উক্ত উকিলের কাছে রুজু করতে পারবে না।
উল্লেখ্য যে, দেনাদার যদি দাবিদার উকিলকে তার পাওনাদারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিল হিসেবে সত্যায়ন করে নেয়, তাহলে শুধু কেবল এ সত্যায়নের কারণেই দেনাদার উক্ত উকিলের হাতে ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হবে এবং সত্যায়ন করা সত্ত্বেও তার কাছে ঋণ আদায় করতে না চাইলে কাজির পক্ষ থেকে তাকে উক্ত উকিলের হাতে ঋণ পরিশোধ করার জন্য আদেশ করা হবে।

মাসআলার দলিল :

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اِقْرَارٌ عَلٰى الخ : দেনাদার দাবিদার উকিলকে উকিল হিসেবে সত্যায়ন করে নিলে কাজির পক্ষ থেকে তাকে এ উকিলের হাতে ঋণ হস্তান্তর করতে আদেশ জারি করার বিষয়টির দলিল হিসেবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, لِاَنَّهُ اِقْرَارٌ عَلٰى نَفْسِهٖ الخ অর্থাৎ ঋণ যেহেতু তার সদৃশ দিয়ে আদায় করা হয়ে থাকে, তাই দেনাদার উকিলের হাতে ঋণ আদায় বাবদ যা অর্পণ করবে তা হলো তার নিজস্ব মাল– পাওনাদারের হুবহু মাল নয়। ফলে দেনাদার যদি তার পাওনাদারের পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত বলে দাবিদার ব্যক্তিকে তার কাছ থেকে ঋণ উসুল করার জন্য উকিল হিসেবে সত্যায়ন করে নেয়, তাহলে তার এ সত্যায়নটি নিজের ব্যাপারে এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদানের নামান্তর হবে যে, "এ ব্যক্তি আমার কাছে এত টাকা ঋণ বাবদ পাবে।" আর যে ব্যক্তি নিজের কাছে কারো পাওনার ব্যাপারে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে, সে নীতিগতভাবে আপন স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উক্ত প্রাপকের হাতে স্বীকারকৃত ঋণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। কারণ কায়দা হলো– اَلْمَرْأُ يُؤْخَذُ بِاِقْرَارِهٖ [মানুষকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পাকড়াও করা হয়ে থাকে।] সুতরাং এ কায়দার ভিত্তিতে যেহেতু দেনাদার তার পাওনাদারের পক্ষ থেকে ঋণ কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিল হিসেবে দাবিদার ব্যক্তিকে সত্যায়ন করার মাধ্যমে তাকে উকালতির ভিত্তিতে নিজের কাছে ঋণের পাওনাদার হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে, তাই কাজির পক্ষ থেকে দেনাদারকে এ ব্যক্তির হাতে ঋণ হস্তান্তর করার জন্য আদেশ করা হবে।

فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيْمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْإِسْتِيْفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَالْقَوْلُ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِيْ يَدِهِ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنَ الدَّفْعِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ قَبْضَهُ .

অনুবাদ : এরপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাকে সত্যায়ন করে [তাহলে তো ভালো]। অন্যাথায় দেনাদার দ্বিতীয়বার তাকে ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ পাওনাদার উকিল নিয়োগের ব্যাপারটি অস্বীকার করার দরুন এখানে ঋণ উসুল করা সাব্যস্ত হয়নি, আর এক্ষেত্রে কসম সাপেক্ষে [মুওয়াক্কিলের] কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে [কথিত উকিলের হাতে] উক্ত ঋণ পরিশোধ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর দেনাদার কথিত উকিলের কাছে পরিশোধকৃত ঋণের ব্যাপারে রুজু করবে, যদি মাল তার হাতে বহাল থাকে। কেননা দেনাদারের মাল প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল দায়মুক্ত হওয়া অথচ সেটা অর্জিত হয়নি। সুতরাং তার অধিকার আছে উকিলের কবজা ভঙ্গ করার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْإِسْتِيْفَاءُ الخ : দাবিদার উকিলের হাতে ঋণ আদায়ের পর অনুপস্থিত পাওনাদার উপস্থিত হয়ে যদি তাকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাহলে দেনাদার তার পাওনাদারের হাতে পুনরায় ঋণ আদায়ে বাধ্য থাকবে। এ বিষয়টির দলিল হিসেবে মুসান্নিফ (র.) বলেন– لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ অর্থাৎ যেহেতু পাওনাদার উকিল নিয়োগের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে, তাই এর দ্বারা দাবিদার উকিল তার দাবিতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ায় তার কাছে অর্পিত ঋণের দ্বারা পাওনাদারের পাওনা আদায় হয়নি, বিধায় এ আদায় বাতিল বলে গণ্য হবে। ফলে দেনাদারের উপর তার পাওনাদারের পাওনা পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হবে।

উল্লেখ্য যে, দাবিদার উকিলকে সত্যিকার অর্থেই উকিল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে কসম খাওয়ার শর্তে পাওনাদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এখানে দেনাদার দাবিদার উকিলকে সত্যিকার অর্থে উকিল মেনে নিয়ে তার হাতে ঋণ আদায় করে ঋণের দায়মুক্তির ব্যাপারে দাবি করছে, তাই সে এক্ষেত্রে مُدَّعِيْ কিংবা বাদী। আর পাওনাদার উক্ত ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ থেকে কবজা করার জন্য উকিল হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে দেনাদার কর্তৃক উক্ত উকিলের হাতে ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ঋণের দায় মুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করছে, তাই সে এক্ষেত্রে مُنْكِرْ কিংবা বিবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। আর এরূপ মতবিরোধের মাঝে নীতিগতভাবে কসম খাওয়ার শর্তে مُنْكِرْ বা বিবাদীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنَ الدَّفْعِ الخ : দেনাদার তার পাওনাদারের হাতে দ্বিতীয়বার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার পর, প্রথমে দাবিদার উকিলের হাতে ঋণ পরিশোধ বাবদ প্রদত্ত টাকা সে ফিরত নিতে পারবে। এ কথার দলিল দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন– لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنَ الدَّفْعِ الخ অর্থাৎ দাবিদার উকিলের কাছে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণের অর্থ হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে দেনাদারের মৌলিক উদ্দেশ্যই ছিল তার ঋণের দায় থেকে মুক্তি লাভ করা। সুতরাং যেহেতু দাবিদার উকিলের এ কবজার দ্বারা দেনাদারের মৌলিক উদ্দেশ্যই সফল হয়নি তাই দেনাদারের জন্য দাবিদার উকিলের উক্ত কবজাকে ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে। তাই দেনাদার দাবিদার উকিলের হাতে তার ঋণ আদায় বাবদ প্রদত্ত টাকা বাকি থাকলে তার কাছ থেকে তা ফিরত নিতে পারবে।

وَإِنْ كَانَ ضَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِتَصْدِيقِهِ اِعْتَرَفَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْقَبْضِ وَهُوَ مَظْلُومٌ فِي هٰذَا الْأَخْذِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ ثَانِيًا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا وَهٰذِهِ كَفَالَةٌ أُضِيفَتْ إِلَى حَالَةِ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى اِدِّعَائِهِ فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْغَرِيمِ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي الْوَكَالَةِ وَإِنَّمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى تَكْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ وَهٰذَا أَظْهَرُ لِمَا قُلْنَا وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ حَتّٰى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لِأَنَّ الْمُؤَدّٰى صَارَ حَقًّا لِلْغَائِبِ إِمَّا ظَاهِرًا أَوْ مُحْتَمَلًا فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَى فُضُولِيٍّ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ لَمْ يَمْلِكِ الْاِسْتِرْدَادَ لِاحْتِمَالِ الْإِجَازَةِ وَلِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التَّصَرُّفَ لِغَرَضٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ مَا لَمْ يَقَعِ الْيَأْسُ عَنْ غَرَضِهِ .

অনুবাদ : আর যদি মাল উকিলের হাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে উকিলের রুজু করতে পারবে না। কেননা দেনাদার তার সত্যায়ন দ্বারা স্বীকার করে নিয়েছে যে, উকিল তার কবজার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ছিল। আর [দ্বিতীয়বার] এ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সে তার পাওনাদারের পক্ষ থেকে মজলুম হয়েছে, আর মজলুম ব্যক্তি অন্যের উপর জুলুম করার অধিকার রাখে না। গ্রন্থকার বলেন, তবে যদি পরিশোধের সময় দেনাদার উকিলকে জামিন সাব্যস্ত করে থাকে। কেননা দ্বিতীয়বার গৃহীত অর্থ উভয়ের ধারণা মতেই পাওনাদারের বিপক্ষে ক্ষতিপূরণের দায়যুক্ত। আর এটা হলো একপ্রকারের কাফালাহ, যাকে [পাওনাদারের দ্বিতীয়বার] কবজা করার অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই এটা বৈধ হবে, ঐ কাফালাহর মতো যেখানে কেউ কারো অনুকূলে অমুকের জন্য তার বিপক্ষে যা কিছু অবশ্য সাব্যস্ত হয় তার কাফিল হলো। আর যদি দেনাদার উকিল হওয়ার ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন না করে, এবং তার দাবির ভিত্তিতে তার কাছে ঋণ পরিশোধ করে, এ ক্ষেত্রে পাওনাদার যদি দেনাদারের কাছ থেকে ঋণ পুনঃ উসুল করে তাহলে দেনাদার উকিলের কাছে রুজু করবে। কারণ ওয়াকালাহ -এর বিষয়ে সে তাকে সত্যায়ন করেনি; বরং পাওনাদারের অনুমোদনের ধারণা করে পরিশোধ করেছে। সুতরাং এ ধারণা যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল তাই তার কাছে রুজু করতে পারবে। এমনিভাবে ওয়াকালাহ-এর বিষয়ে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন সত্ত্বেও যদি তার কাছে ঋণ পরিশোধ করে তাহলেও রুজু করতে পারবে। আমাদের বর্ণিত কারণে এটা আরো সুস্পষ্ট। আর বর্ণিত সকল সুরতেই অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত দেনাদার প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা আদায়কৃত অর্থ অনুপস্থিত ব্যক্তির হক হয়ে গেছে। বাস্তবেই কিংবা সম্ভাবনাগতভাবে। সুতরাং মাসআলাটি ঐ ব্যক্তির মতো হলো যে কোনো ফুজুলী ব্যক্তির কাছে এই আশায় ঋণ পরিশোধ করল যে পাওনাদার তার অনুমোদন করবে। এক্ষেত্রে অনুমোদনের সম্ভাবনা থাকায় সে তা ফেরত নিতে পারবে না। তাছাড়াও কেউ যদি কোনো উদ্দেশ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন ঐ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার আগে সেটাকে বাতিল করতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِتَصْدِيْقِهِ الخ : দাবিদার উকিলের কাছে প্রদত্ত ঋণ যদি তার হাত থেকে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায়, তাহলে দেনাদার পাওনাদারকে দ্বিতীয়বার ঋণ পরিশোধ করার পর ঐ উকিলের হাতে প্রদত্ত ঋণের জরিমানা ফেরত পাওয়ার জন্য রুজু করতে পারবে না। এর দলিল হিসেবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে দেনাদার দাবিদার উকিলকে তার পাওনাদারের প্রকৃত উকিল হিসেবে সত্যায়ন করার দ্বারা দুটি বিষয়ের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে–

১. এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করল যে, এ উকিল তার মুওয়াক্কিলের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঋণ আদায় বাবদ আমার কাছ থেকে যা কবজা করছে এ ব্যাপারে সে সত্যবাদী।

২. এবং এ মর্মেও স্বীকারোক্তি প্রদান করল যে, এ উকিলের হাতে দেনা পরিশোধ করা সত্ত্বেও যদি পাওনাদার আমার [দেনাদার] কাছ থেকে দ্বিতীয়বার তার পাওনা গ্রহণ করে তাহলে আমি তার পক্ষ থেকে মাজলুম হব।

এখানে প্রথম স্বীকারোক্তির বিচারের দেনাদারের ধারণা মতে উকিল যেহেতু তার মুওয়াক্কিলের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে ঋণ কবজা করার ব্যাপারে সত্যবাদী, তাই এক্ষেত্রে এ উকিলের অবস্থান হলো একজন আমানতদারের মতো। আর আমানতদারের হাতে আমানতের মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে গেলে আমানতদারকে এর ভর্তুকি কিংবা জরিমানা দিতে হয় না। সুতরাং দেনাদারের ধারণা মতে যেহেতু দাবিদার উকিল তার কাছ থেকে ঋণ উসুলবাবদ যা গ্রহণ করেছে সে ক্ষেত্রে সে একজন আমানতদার মাত্র, তাই তার কাছ থেকে এ মালের জরিমানা গ্রহণ করা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির বিচারে দেনাদার যেহেতু তার ধারণা মতে পাওনাদার কর্তৃক দ্বিতীয়বার তার কাছ থেকে ঋণ উসুল করার দরুন মজলুম হয়েছে, তাই এ কারণে তার জন্য অন্যের উপর জুলুম করা বৈধ হবে না। কেননা মজলুমের জন্য কারোর উপর জুলুম করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ضَمَّنَهُ الخ : কিন্তু যদি দেনাদার উক্ত দাবিদার উকিলের কাছে ঋণ অর্পণ করার সময় তাকে এ মর্মে জামিন বানায় যে, "পাওনাদার যদি আমার নিকট থেকে দ্বিতীয়বার তার পাওনা আদায় করে তাহলে এই গৃহীত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।" তাহলে উক্ত উকিলের হাতে ঋণ আদায় বাবদ অর্পিত মাল নষ্ট হয়ে গেলেও দেনাদার তার কাছ থেকে এর ভর্তুকি বা জরিমানা নিতে পারবে।

কারণ দেনাদার উকিলের কাছে প্রথম ঋণ আদায় বাবদ যা পরিশোধ করেছে উকিল ও দেনাদার উভয়ের ধারণা মতে সেটাই ছিল মৌলিকভাবে ঋণ আদায়। তাই পাওনাদার পরবর্তীতে দেনাদারের কাছ থেকে যা আদায় করেছে দাবিদার উকিল ও দেনাদার উভয়ের ধারণামতে তা ছিল [গসব] অবশ্যই ফেরতযোগ্য। কিন্তু পাওনাদার যেহেতু দাবিদার উকিলকে অস্বীকার করার মাধ্যমে একদিক থেকে দেনাদারের ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকেই অস্বীকার করছে তাই তার ধারণা মতে দ্বিতীয়বার গৃহীত ঋণ গসব নয় এবং তা অফেরতযোগ্য। অপরদিকে উকিল যেহেতু পাওনাদার কর্তৃক দ্বিতীয়বার দেনাদার থেকে ঋণ গৃহীত হবে না এ শর্তে তার থেকে ঋণ পরিশোধ করেছিল এবং তার জামিন হয়েছিল তাই তার হাতে গৃহীত ঋণ নষ্ট হয়ে গেলেও জামানতের কারণে তাকে এর ভর্তুকি দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذِهٖ كَفَالَةٌ أُضِيْفَتْ الخ : সুতরাং বিষয়টি ঐ প্রকারের কাফালাহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে যাকে পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের কাছ থেকে দ্বিতীয়বার ঋণ কবজা করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই এ কাফালাহ সঠিক হবে যেমনিভাবে ঐ কাফালাহকে সঠিক মনে করা হয় যেখানে কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষে এই মর্মে কাফীল হলো যে, এ ব্যক্তির উপর অমুকের জন্য যা কিছুই হক প্রমাণিত হবে সেটা উসুল করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর হবে। মোটকথা মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দেনাদার যদি দাবিদার উকিলের কাছে ঋণ আদায় করার সময় তা এ বিষয়ে জামিন বানিয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ উকিলের অবস্থান হবে একজন কাফীলের মতো যে এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করছে যে, তুমি আমার কাছে যে ঋণ আদায় করছ এর দ্বারা তুমি প্রকৃত অর্থেই ঋণের দায়মুক্ত হয়ে যাচ্ছ। তাই যদি আমার মুওয়াক্কিল তোমার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার ঋণ আদায় করে তাহলে সেটা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমি তার কাফীল হলাম। এমতাবস্থায় পাওনাদার যেহেতু উকালাহকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তার স্বহস্তে আদায়কৃত পাওনা ফেরত দিতে অসম্মত হলো তাই কাফীল হওয়ার

ভিত্তিতে উকিল নিজের পক্ষ থেকে দেনাদারকে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। চাই ওকালাহর ভিত্তিতে গৃহীত ঋণ তার হাতে বহাল থাকুক কিংবা না থাকুক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতের বর্ণনা :

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ الخ : আর যদি দেনাদার উকিলকে সত্যিকার অর্থে তার পাওনাদারের উকিল হিসেবে সত্যায়ন না করে কিংবা মিথ্যারোপ করা সত্ত্বেও তার দাবির ভিত্তিতে তার হাতে ঋণ আদায় করে থাকে, তাহলে পাওনাদার তার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার তার পাওনা উসুল করলে সে উক্ত উকিলের হাতে উসুলকৃত ঋণের অর্থ ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। কারণ সে উক্ত উকিলকে উকিল হিসেবে সত্যায়ন করেনি। তাই এ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে দাবিদার উকিলের এ অবস্থান একজন আমানতদারের মতো নয়; বরং দেনাদার এখানে দেনা পরিশোধ করতে তার পাওনাদার মেনে নেবে, এ আশায় উক্ত উকিলের হাতে দেনা পরিশোধ করেছিল, কিন্তু পাওনাদার কর্তৃক তার কাছ থেকে পুনরায় তার পাওনা পরিশোধ করার মাধ্যমে যেহেতু তার উক্ত আশা অবাস্তব প্রমাণিত হলো তাই সে উক্ত উকিলের কাছে পরিশোধকৃত টাকা ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত সকল সুরতে দেনাদার উকিলের কাছ থেকে তার পরিশোধিত অর্থ ফেরত পাওয়ার যোগ্য হলেও অনুপস্থিত ব্যক্তি [অর্থাৎ পাওনাদার] উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তা ফেরত নিতে পারবে না। এ বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য তিনি দুটি দলিল পেশ করেন।

প্রথম দলিলে তিনি বলেন, এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত উকিলের হাতে আদায়কৃত মালের মাঝে বাহ্যিক কিংবা সম্ভাবনামূলকভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির অধিকার সব্যাস্ত হয়। তাই অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাতে দেনাদারের অধিকার নিশ্চিত না হওয়ার কারণে সে তা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা দেনাদার যদি উকিলকে সত্যায়ন করে থাকে তাহলে তার ধারণামতে ঐ মালে পাওনাদারের হক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আর যদি তাকে সত্যায়ন করা ব্যতীত কিংবা মিথ্যারোপ করা সত্ত্বেও তার হাতে ঋণ পরিশোধ করে থাকে, তাহলে এ মাল পাওনাদারের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অর্থাৎ পাওনাদার এ আদায়ে সন্তুষ্ট থাকলে তা পাওনাদারের হক হবে যা অফেরতযোগ্য, আর যদি সে এ ব্যাপারে অসম্মত হয় তাহলেই কেবল সে উকিলের কাছ থেকে তা ফেরত পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং সর্বাবস্থাতেই বিষয়টির বাস্তবতা অনুপস্থিত [পাওনাদার] ব্যক্তির উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তার উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেনাদার উকিলের হাত থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না।

অতএব এ মাসআলাটির উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পাওনাদারের সম্মতির আশায় কোনো ফুজূলী ব্যক্তির হাতে ঋণ পরিশোধ করল। সে ব্যক্তি যেমনিভাবে তার পাওনাদারের সম্মতির সম্ভাবনা থাকার কারণে পাওনাদারের উপস্থিতির পূর্বে উক্ত ফুজূলীর হাতে অর্পিত ঋণকে ফেরত নিতে পারে না, তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও অনুপস্থিত পাওনাদারের উপস্থিতির পূর্বে উকিলের হাতে অর্পিত টাকা দেনাদার ফেরত নিতে পারবে না।

আর দ্বিতীয় দলিলে মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো লেনদেনের পদক্ষেপ নেয় তাহলে সে উদ্দেশ্য হাসিলে নিরাশ হওয়ার আগে সে তাকে বাতিল করতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দেনাদার যেহেতু তার ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে উকিলের হাতে ঋণ অর্পণ করল তাই তার এ উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হওয়ার পূর্বে উকিলের কাছে অর্পিত টাকা ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে এ পদক্ষেপকে বাতিল করতে পারবে না। আর যেহেতু পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত [পাওনাদার] ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, তাই তার উপস্থিত হওয়ার পূর্বে দেনাদার উকিলের হাতে প্রদত্ত টাকা ফেরত নিতে পরবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আলোচ্য ইবারতে উল্লিখিত فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا -এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এখানে উপরে মাসআলার তফসীলে আলোচিত চারটি সুরতের দিকে ইঙ্গিত করেন। সুরত চারটি হলো–

১. উকিলকে সত্যায়ন করা অবস্থায় জামিন না বানিয়ে তার হাতে ঋণ অর্পণ করা।
২. উকিলকে সত্যায়ন করা অবস্থায় তাকে জামিন বানিয়ে তার হাতে ঋণ অর্পণ করা।
৩. উকিলকে সত্যায়ন কিংবা মিথ্যারোপ করা ব্যতীতই তার হতে ঋণ অর্পণ করা।
৪. উকিলকে মিথ্যারোপ করা অবস্থায় তার হাতে ঋণ অর্পণ করা। –[নাতায়িজুল আফকার– ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪]

وَمَنْ قَالَ إِنِّيْ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيْمِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَمَنِ ادَّعٰى أَنَّهُ مَاتَ أَبُوْهُ وَتَرَكَ الْوَدِيْعَةَ مِيْرَاثًا لَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقٰى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهٖ فَقَدْ إِتَّفَقَا عَلٰى أَنَّهُ مَالُ الْوَارِثِ وَلَوْ إِدَّعٰى أَنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيْعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مَادَامَ حَيًّا كَانَ إِقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهٖ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِيْ دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন,] কেউ যদি বলে যে, আমি [অমুকের] আমানতের মাল কবজা করার উকিল, আর যার কাছে আমানত গচ্ছিত রয়েছে সে তাকে সত্যায়ন করল, তবে তাকে তার হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না। কারণ এটা হলো অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি। তবে ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। আর কেউ যদি দাবি করে যে, তার বাবা মারা গেছে এবং [অমুকের কাছে] আমানতি মাল তার জন্য মিরাস হিসেবে রেখে গেছে এমতাবস্থায় যে, সে ছাড়া তার অন্য কোনো ওয়ারিশও নেই, আর যার কাছে আমানত গচ্ছিত রয়েছে সে তাকে সত্যায়ন করল, সে ক্ষেত্রে তাকে তার হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে। কারণ আমানতকারীর মৃত্যুর পর সেটা তার মাল থাকে না। সুতরাং তারা উভয়ে একমত হলো যে এটা ওয়ারিশের মাল। আর যদি কেউ এ মর্মে দাবি করে যে, সে আমানতকারীর কাছ থেকে আমানতের মাল ক্রয় করেছে, আর আমানতগ্রহীতা তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তাকে তার হাতে সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না। কেননা যতক্ষণ আমানতকারী জীবিত ছিল ততক্ষণ এই সত্যায়নের অর্থ হবে অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করা। কেননা আমানতকারীর মালিকানার যোগ্যতা বহাল রয়েছে। সুতরাং তার বিপক্ষে বিক্রয়ের দাবির ক্ষেত্রে তাদের দুজনকে সত্যাবাদী গণ্য করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ إِنِّيْ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الخ: مُوْدَعٌ শব্দটি وَدِيْعَةٌ শব্দ থেকে নির্গত। আমানতের মালকে وَدِيْعَةٌ [অদিয়ত] বলা হয়, যার কাছে আমানত রাখা হয় তাকে (بِفَتْحِ الدَّالِ) مُوْدَعٌ [মূদা'] বলা হয়, আর যে আমানত রাখে তাকে مُوْدِعٌ (بِكَسْرِ الدَّالِ) [মূদি'] বলা হয়।

নিজের মালের ব্যাপারে কেউ কোনো স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তাকে তা প্রদানের বাধ্য করা হয়, কিন্তু অন্যের কোনো মালের ব্যাপারে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তাকে তা আদায়ে বাধ্য করা হয় না। এ ধারাটির প্রথম অংশকে কেন্দ্র করে মুসান্নিফ (র.) পূর্বোক্ত মাসআলার উদ্ধৃতি টেনেছিলেন। আর ধারাটির দ্বিতীয় অংশ হলো আলোচ্য ইবারতের উৎস। এখানে মুসান্নিফ (র.) ধারাটির এ অংশের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি মাসআলা উল্লেখ করেন।

প্রথম মাসআলা : কেউ যদি কারো কাছে গিয়ে এ মর্মে দাবি করে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত হিসেবে যে মাল গচ্ছিত রেখেছে, তা কবজা করার জন্য আমি তার উকিল এবং আমানতদার যদি তার সত্যায়ন করে তাহলেও কাজির পক্ষ থেকে এ আমানতদারকে উক্ত উকিলের হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না।

কারণ আমানতদার এখানে উকিলকে সত্যায়ন করার মধ্যমে উকিলের মাল কবজা করার অধিকারকে স্বীকার করে নিলেও যেহেতু এ স্বীকারোক্তিটি তার নিজস্ব মালের ব্যাপারে নয়; বরং অন্যের [আমানতকারীর] মালের ব্যাপারে প্রদত্ত হয়েছে তাই অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করার কারণে আমানতদারকে উক্ত মাল উকিলের হাতে সোর্পদ করতে বাধ্য করা যাবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ : তবে ঋণের ব্যাপারটি ভিন্ন। অর্থাৎ ঋণ কবজা করার জন্য ওয়াকালাহর দাবিদার ব্যক্তিকে যদি (مَدْيُوْن) দেনাদার সত্যায়ন করে তাহলে দেনাদার সে উকিলের হাতে উক্ত ঋণ আদায় করতে বাধ্য থাকে। যেমনটি পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছে।

মাসআলাদ্বয়ের মাঝে [অর্থাৎ وَدِيْعَةٌ ও دَيْنٌ] বিধানগত এ পার্থক্যের কারণ হলো (دَيْنٌ) ঋণ আদায় বাবদ (مَدْيُوْنٌ) দেনাদার উকিলকে যে মাল প্রদান করে এটা তার নিজস্ব মাল। [কারণ ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে পাওনাদার থেকে গৃহীত মালকে হুবহু ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না।] তাই ঋণ কবজা করার জন্য কাউকে উকিল স্বীকার করার অর্থ হলো নিজের মালের মাঝে তার অধিকার স্বীকার করা। আর নিজের মালে কারো অধিকার স্বীকার করলে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি অধিকারীকে সে মাল দিতে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে আমানতের মাল ফেরত প্রদান বাবদ আমানতদার উকিলকে যা প্রদান করে, তা হলো مُوْدِعٌ অর্থাৎ আমানত গচ্ছিতকারীর মাল– আমানতদারের নিজস্ব মাল নয়। তাই এ মাল কবজা করার জন্য কাউকে উকিল হিসেবে সত্যায়ন করার অর্থ হলো অন্যের মালের মাঝে তার কবজা করার অধিকার স্বীকার করা। আর অন্যের মালে কারো অধিকার স্বীকার করলে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি অধিকারীর হাতে সে মাল সোপর্দ করতে বাধ্য থাকে না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় (مُوْدَعٌ) আমানতদার যদি ওয়াকালাহর দাবিদার ব্যক্তির দাবি অনুসারে তার হাতে আমানতের মাল অর্পণ করে দেয় এমতাবস্থায় আমানত প্রদানকারী যদি উক্ত উকিলকে ওয়াকালাহর ব্যাপারে সত্যায়ন করে তাহলে উকিল ও আমানতদার উভয়ই তাদের দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি আমানত প্রদানকারী উক্ত উকিলের ওয়াকালাহর ব্যাপারটি কসম খাওয়ার সাথে অস্বীকার করে, তাহলে আমানত প্রদানকারীর জন্য আমানতদার (مُوْدَعٌ) -এর কাছ থেকে আমানতকৃত মালের জরিমানা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। সুতরাং আমানত প্রদানকারী আমানতদারের কাছ থেকে তার আমানতকৃত মালের জরিমানা গ্রহণ করলে আমানতদার উকিলের হাতে প্রদত্ত মাল ফেরত নিয়ে নেবে, যদি উকিলের হাতে সে মাল বহাল থাকে। আর যদি উকিলের হাত থেকে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা হারিয়ে যায় তাহলে مُوْدَعٌ বা আমানতদার উকিলের কাছে প্রদত্ত মালের জরিমানা নিতে পারবে কিনা সেদিক বিবেচনায় পূর্বের মাসআলার মতো এখানেও সম্ভাব্য চারটি অবস্থা হতে পারে।

১. উকিলকে সত্যায়ন করা অবস্থায় জামিন না বানিয়ে তার হাতে মাল অর্পণ করে থাকলে আমানতদার তার জরিমানা গ্রহণ করতে পারবে না।
২. আর যদি সত্যায়ন করা অবস্থায় উকিলকে জামিন বানিয়ে তার হাতে মাল অর্পণ করে,
৩. কিংবা সত্যায়ন ও মিথ্যারোপ ব্যতীতই তার হাতে মাল অর্পণ করে,
৪. অথবা মিথ্যারোপ করা অবস্থায় তার হাতে মাল অর্পণ করে থাকে– এ তিন অবস্থায় আমানতদার আমানত প্রদানকারীকে জরিমানা দিয়ে থাকলে উকিলের কাছ থেকে ও তার জরিমানা নিতে পারে। –[আল বিনায়াহ]

قَوْلُهُ وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّهُ مَاتَ الخ :

দ্বিতীয় মাসআলা : কেউ যদি এ মর্মে দাবি করে যে, আমার বাবা মারা গেছেন এবং অমুক আমানতদারের কাছে তার যে মালটি আমানত রাখা আছে তা তিনি আমার জন্য মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন। আর আমি ছাড়া তাঁর অন্য কোনো ওয়ারিশও নেই। এখন আমানতদারও যদি তার এ দাবিকে সত্যায়ন করে থাকে, তাহলে তার হাতে উক্ত আমানতের মাল অর্পণ করার জন্য কাজির পক্ষ থেকে আমানতদারকে আদেশ করা হবে। কারণ আমানত প্রদানকারীর ইন্তেকালের পর আমানতের মালের তার মালিকানা বাকি থাকে না, বরং তাতে তার ওয়ারিশদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদসত্ত্বেও যেহেতু মিরাসের দাবিদার ও আমানতদার উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, এটা ওয়ারিশের মাল তাই মিরাসের দাবিদারের হাতে তা অর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে তাসহীল গ্রন্থকারের মতে যেহেতু এখানে অন্যের উপর মৃত্যুর ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছে তাই কাজির নিকট তার মৃত্যুর ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওয়ারিশের হাতে মাল অর্পণ করার আদেশ না করা উচিত।

قَوْلُهُ وَلَوْ اِدَّعٰى اَنَّهُ اشْتَرٰى الخ :

তৃতীয় মাসআলা : যদি কেউ এ মর্মে দাবি করে যে, আমানত প্রদানকারীর কাছ থেকে আমি আমানতের মালটি কিনে নিয়েছি। আর আমানতদার ব্যক্তিও যদি এ ক্রয়ের দাবিদার ব্যক্তিকে সত্যায়ন করে ফেলে তাহলেও আমানতদার ব্যক্তিকে ক্রয়ের দবিদার ব্যক্তির কাছে মালটি অর্পণ করার জন্য আদেশ করা হবে না। কারণ আমানত প্রচারকারী (مُوْدِعٌ) জীবদ্দশায় সেই তার আমানতকৃত মালের মালিক। তাই সে মালের মাঝে আমানতদার কর্তৃক ক্রয়ের দাবিদার ব্যক্তিকে সত্যায়ন করা অন্যের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান বলে গণ্য হবে। আর কেউ যদি অন্যের মালের ব্যাপারে কারো অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহলে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী অধিকারীর হাতে উক্ত মাল প্রদান করতে বাধ্য হয় না। তাই আমানত প্রদানকারীর বিপক্ষে ক্রয়ের দাবিদার ও আমানতদারের দাবিকে সত্যায়ন করা হবে না এবং আমানতদারকেও ক্রয়ের দাবিদার ব্যক্তির হাতে মাল সোপর্দ করার আদেশ করা হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত তিনটি মাসআলার মাঝে প্রথম মাসআলাটিই বাহ্যিকভাবে كِتَابُ الْوَكَالَةِ -এর সাথে সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসআলাদ্বয় বাহ্যিকভাবে كِتَابُ الْوَكَالَةِ -এর সাথে সম্পৃক্ত না হলেও প্রথম মাসআলাটির সাথে উসূলগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা (مُشْتَبَهٌ) সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (র.) প্রথম মাসআলার সাথে এ দুই মাসআলারও সমাধান উল্লেখ করেছেন, যাতে পাঠকের মনে এ বিষয়ে সমাধান নিয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

قَالَ : فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِهِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ يَثْبُتُ بِالتَّصَادُقِ وَالْاِسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ . قَالَ : وَيَتَّبِعُ رَبَّ الْمَالِ فَيَسْتَحْلِفُهُ رِعَايَةً لِجَانِبِهِ وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে তার মাল কবজা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, আর দেনাদার দাবি করে যে, পাওনাদার তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে , তাহলেও তাকে উকিলের কাছে দেনা পরিশোধ করতে হবে। কেননা পারস্পরিক সত্যায়ন দ্বারা ওকালাহ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ শুধু তার দাবির দ্বারা ঋণ উসুল সাব্যস্ত হয়নি। তাই উকিলের কবজা করার হক বিলম্বিত করা হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, দেনাদার মালের মূল মালিকের অনুসরণ করবে এবং তাকে হলফ করাবে। এ বিধান হলো দেনাদারের স্বার্থ রক্ষার জন্য। উকিলকে হলফ করানো যাবে না। কারণ সে তো হলো তার মুওয়াক্কিলের স্থলবর্তী মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ তার উকিলকে নিজের কোনো মাল কারো কাছ থেকে কবজা [দখল] করার জন্য পাঠাল এমতাবস্থায় দেনাদার যদি উকিলের সামনে এ মর্মে কোনো দাবি তোলে যার দ্বারা উক্ত মাল থেকে তার মুওয়াক্কিলের অধিকার বাতিল হয়ে গেছে এমনটি বুঝে আসে। যথা– পাওনাদার তার পাওনা উসুল করার জন্য তার উকিলকে দেনাদারের কাছে পাঠালে দেনাদার বলল, তোমার মুওয়াক্কিল তো তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে। অথবা এরূপ বলল যে, তোমার মুওয়াক্কিল তো এই দেনা থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। অথবা কোনো ইজারাদারের কাছ থেকে ইজারার মেয়াদ শেষে জমির মালিক জমি কবজা করার জন্য তার উকিল পাঠালে ইজারাদার বলল যে, তোমার মুওয়াক্কিলতো আমাকে এ জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছে। তাহলে এরূপ সকল সুরতে দেনাদার উকিলের হাতে মাল হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে, যদি সে তার এ দাবির পক্ষে গ্রহণযোগ্য দলিল পেশ করতে না পারে।

এ মাসআলার দলিল হলো, [ইবারতের বর্ণনা অনুযায়ী] যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় উকিলের ওয়াকালাহর বিষয়টি পরস্পরের সত্যায়নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে আছে, অপর দিকে মুওয়াক্কিল তার অধিকার সত্যিকার অর্থেই আদায় করে নিয়েছে কিনা? এ বিষয়টি বিনা দলিলে শুধু কেবল দেনাদারের দাবির মধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে না। তাই এ কারণে কবজা করার ব্যাপারে উকিলের প্রমাণিত হক আদায়ে বিলম্ব করা যাবে না। ফলেই দেনাদার উক্ত উকিলের হাতে সে মাল হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। তবে দেনাদারের দাবিটি দলিলবিহীন হওয়ার কারণে যদিও অগ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু সেদিক বিবেচনা করেই তার জন্য এতটুকু অধিকার থাকবে যে, সে উকিলের কাছে মাল হস্তান্তর করার পর তার মুওয়াক্কিল তথা মালের মূল মালিকের কাছে হলফ [কসম] চইতে পারবে। সুতরাং যদি সে এ মর্মে কসম করে যে, আমি যে মাল কবজা করার জন্য আমার উকিলকে পাঠিয়েছি সে ক্ষেত্রে আমি সত্যবাদী, তাহলে তো সে ঐ মালের মালিক হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে দেনাদার উকিলের কাছ থেকে তার প্রদত্ত মাল ফেরত নিয়ে নেবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, দেনাদারের জন্য তার পাওনাদারের পরিবর্তে তার উকিলের কসম-এর দাবি করার অধিকার থাকবে না। কারণ উকিল হলো তার মুওয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত। আর কসমের ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্তকরণ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ يَثْبُتُ الخ : এখানে আমাদের কাছে হিদায়া গ্রন্থের যে অনুলিপিটি রয়েছে لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ يَثْبُتُ بِالتَّصَادُقِ তবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) কর্তৃক 'আল বিনায়াহ' গ্রন্থের অনুলিপির ইবারতও তেমনি। তবে সেখানে قَدْ يَثْبُتُ-এর স্থলে قَدْ ثَبَتَتْ রয়েছে। সে অনুকরণেই এখানে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কাজি যাদাহ আল আফনাদী কর্তৃক নাতায়িজুল আফকার ও আকমালুদ্দীন বাবরতী কর্তৃক আল-ইনায়াহ গ্রন্থের অনুসরণীয় অনুলিপিতে بِالتَّصَادُقِ শব্দটি বিদ্যমান নেই। সেখানে রয়েছে– لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ এ অনুযায়ী এখানে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উকিলের ওয়াকালাহ কিসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে? এর উত্তরে আল ইনায়াহ গ্রন্থকার বলেন, আসলে এখানে মূল ইবারতের সাথে بِالْبَيِّنَةِ শব্দটি উহ্য আছে। যার আসল রূপ হলো– لِأَنَّ الْوَكَالَةَ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ অর্থাৎ যেহেতু দলিলের ভিত্তিতে উকিলের ওয়াকালাহ প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর মুওয়াক্কিল কর্তৃক তার হক উসুল করে নেওয়ার বিষয়টি বিনা দলিলে কেবলমাত্র দেনাদারের দাবির দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না, তাই সে কারণে উকিলের কবজা করার ব্যাপারে প্রমাণিত অধিকার আদায়ে বিলম্ব করা যাবে না।

আর এ কারণেই তিনি দলিলের মাধ্যমে উকিলের ওয়াকালাহ প্রমাণিত হওয়া অবস্থাতে আলোচ্য ইবারতের সূরতে মাসআলা নির্ধারণ করাকে আবশ্যক মনে করেন। তবে হিদায়াহ গ্রন্থের অন্য কোনো শারেহ যেহেতু اَلْبَيِّنَةُ-কে উহ্য ধরে নিয়ে সূরতে মাসআলা নির্ধারণ করেননি, তাই আল ইনায়াহ গ্রন্থকারের এ প্রয়াসটিও সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

[দ্রষ্টব্য : নাতায়িজুল আফকার– খ. ৮, পৃ. ১৩৮, ১৩৯]

ফলে উল্লিখিত দলিলের মাঝে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকেই যায়। আর এ কারণে اَلْبَدَائِعُ الصَّنَائِعُ ও دُرُّ الْمُخْتَارِ গ্রন্থে মাসআলাটির দলিল এভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মোটকথা উল্লিখিত দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, উল্লিখিত সূরতে মাসআলা অনুযায়ী। দেনাদারের দাবি হলো, পাওনাদার তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে। তার এ দাবির মাঝে এ কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, পাওনাদার তার পাওনার দাবিতে সত্যবাদী। কিন্তু সে তার উক্ত পাওনা উসুল করে নিয়েও এখন তা অস্বীকার করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে দেনাদার হলো উসূল করে নেওয়ার দাবিতে مُدَّعِيْ [বা বাদী] আর পাওনাদার [মুওয়াক্কিল] হলো এক্ষেত্রে مُدَّعٰى عَلَيْهِ [বা বিবাদী]। তাই হাদীসের ভাষ্য মতে "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ" [দেনাদার] مُدَّعِيْ যদি দলিলের মাধ্যমে তার দাবিকে প্রমাণিত করতে না পারে, তাহলে [পাওনাদার] مُدَّعٰى عَلَيْهِ-এর কাছ থেকে হলফ নেওয়ার মাধ্যমে তাকে হক দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।"

কিন্তু হলফের ব্যাপারে যেহেতু কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা বৈধ নয়, তাই দেনাদার উকিলের কাছ থেকে হলফ চাইতে পারবে না।

قَالَ : وَمَنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِيْ جَارِيَةٍ فَادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِيْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِيْ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لِاَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَالِكَ بِاِسْتِرْدَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيْلُ إِذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ نُكُوْلِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِاَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَاِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) كَمَا هُوَ مَذْهَبُهٗ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِيْ عِنْدَهٗ بَعْدَ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ لَا يُفِيْدُ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا قَالُوْا يَجِبُ اَنْ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ عَلٰى هٰذَا فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِاَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ عِنْدَهُمَا لِبُطْلَانِ الْقَضَاءِ وَقِيْلَ الْاَصَحُّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْفَصْلَيْنِ لِاَنَّهٗ يَعْتَبِرُ النَّظَرَ حَتّٰى يَسْتَحْلِفَ الْمُشْتَرِيْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْبَائِعِ فَيَنْتَظِرُ لِلنَّظَرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে দোষের ভিত্তিতে দাসী ফেরত দেওয়ার জন্য উকিল নিয়োগ করে, আর বিক্রেতা ক্রেতার সম্মতি ছিল বলে দাবি করে তাহলে ক্রেতা কসম না করা পর্যন্ত উকিল বিক্রেতার কাছে দাসী ফেরত দিতে পারবে না। তবে ঋণের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা পাওনাদার [ঋণ উসুল করেনি মর্মে] কসম করতে অস্বীকার করার কারণে যখন ভুল প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন উকিল যা কবজা করেছিল সেটা ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি সুরাহা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব মতে চুক্তি রহিতকরণের ব্যাপারে আদালতি ফয়সালা তার বৈধতার উপরই বহাল থাকে। যদিও [পরবর্তীতে] তা ভুল প্রমাণিত হয় এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চুক্তি রহিতকরণের ফায়সালা কার্যকর হওয়ার পর তার ক্রেতাকে কসম করানো যাবে না। কেননা [চুক্তি রহিতকরণের পর] তাতে কোনো ফায়দা থাকে না। তবে মাশায়েখগণ বলেন, বর্ণিত এ নীতির ভিত্তিতে সাহেবাইনের মতে উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা অর্থাৎ ক্রেতার কসম করার অপেক্ষায় দাসী ফেরত দেওয়ার আদেশ বিলম্বিত করা হবে না। কেননা তাদের মতে আদালতের রায় ভুল প্রমাণিত হলে তা বাতিল করা যায় বিধায় পরবর্তীতেও বিষয়টির সুরাহা করা সম্ভব। কারো কারো মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিশুদ্ধতম মত হলো, উভয় ক্ষেত্রে [ঋণ আদায় ও বিক্রীত দাসীকে] ফেরত প্রদান [পাওনাদার ও ক্রেতার কসম করা পর্যন্ত] বিলম্বিত করা হবে। কেননা তিনি দেনাদার ও বিক্রেতার স্বার্থের দিকটি বিবেচনা করেন। এমনকি ক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তিনি ক্রেতাকে কসম করাতে বলেন, যদিও বিক্রেতা কসম করানোর দাবি না জানান। সুতরাং এ স্বার্থগত দিক বিবেচনা করে [ক্রেতা কিংবা পাওনাদারের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে তার কসমের জন্য] অপেক্ষা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি তার ক্রয়কৃত পণ্য যথা– দাসীর সাথে কোনো দোষ জনিত কারণে [خِيَارِ عَيْبٍ-এর ভিত্তিতে] তা বিক্রেতার কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে আর বিক্রেতা যদি ক্রেতার ব্যাপারে এমন কোনো দাবি করে যার দ্বারা ক্রেতার خِيَار عَيْب বাতিল সাব্যস্ত হয়। যথা– এই মর্মে দাবি করল যে, ক্রেতা এ [পণ্য] দাসী ক্রয় করার সময় তার উক্ত দোষ সম্পর্কে অবগত ছিল এবং এ দোষ সহকারে তাকে ক্রয় করতে সম্মত ছিল। তাহলে ক্রেতা স্বয়ং এসে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে কসম করা পর্যন্ত কাজি বিক্রেতাকে উক্ত দাসী ফেরত নিতে বাধ্য করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ঋণের বিষয়টি এর বিপরীত। অর্থাৎ ঋণ কবজা করার জন্য নিযুক্ত উকিলের কাছে যদি দোনাদার এমন কোনো দাবি উত্থাপন করে যার দ্বারা পাওনাদারের অধিকার বাতিল হয়ে গেছে এমনটি বুঝে আসে, তাহলেও পাওনাদার স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এ বিষয়টি অস্বীকার করে কসম করা ব্যতীতই কাজি দেনাদারকে উক্ত উকিলের হাতে ঋণ আদায় করার প্রতি বাধ্য করতে পরবেন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাসআলা দুটি একই রকম। কারণ উভয় সুরতেই পাওনাদার ও ক্রেতার দাবিটি বাস্তব সম্মত হওয়ার পর দেনাদার ও বিক্রেতার পক্ষ থেকে এমন একটি দাবি উত্থাপন করা হচ্ছে যার পক্ষে তার কোনো দলিল না থাকায় সে পাওনাদার ও ক্রেতার কাছ থেকে কসম গ্রহণের হকদার হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি পাওনাদার ও ক্রেতার পক্ষ থেকে কসম গ্রহণ করা পর্যন্ত কাজির ফয়সালাকে বিলম্বিত করা হয় তাহলে উভয় সুরতেই তা বিলম্বিত করা উচিত। কিন্তু তেমনটি না করে উপরিউক্ত বর্ণনা মতে শুধু কেবল خِيَار عَيْب-এর সুরতেই কাজির ফয়সালাকে ক্রেতার কসম করা পর্যন্ত বিলম্বিত করার বিধান দেওয়া হলো কেন? একজন পাঠকের মনে এ প্রশ্নটি নিতান্তই জেগে উঠে। তাই এ প্রশ্নের নিরসন কল্পে মুসান্নিফ (র.) বলেন,

لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَالِكَ الخ : অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাসআলা দুটি একই রকম দেখা গেলেও তার মাঝে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। আর সেই পার্থক্যের দিক বিবেচনা করেই মাসআলা দুটির মাঝে বিধানগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। সূক্ষ্ম পার্থক্যটি হলো, دَيْن [ঋণ] কবজা করার ব্যাপারটি হলো– أَمْلَاك مُرْسَلَة-এর অন্তর্ভুক্ত। সে ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালাটি ظَاهِرًا وَبَاطِنًا [বাহ্যিক ও মৌলিক] উভয়ভাবে কার্যকারী নয়; বরং [বাহ্যিকভাবেই] ظَاهِرًا-ই কেবল তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়। ফলে পাওনাদারের কসমের অপেক্ষা না করে যদি কাজি উকিলের কাছে ঋণ হস্তান্তর করার জন্য দেনাদারের প্রতি আদেশ জারি করে দেয়, তাহলে পরবর্তীতে পাওনাদার কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার মাধ্যমে যদি কাজির ফয়সালা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে উকিলের কাছে আদায়কৃত ঋণ তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা সম্ভব।

পক্ষান্তরে خِيَار عَيْب-এর ভিত্তিতে দাসী ফেরত দেওয়ার বিষয়টি أَمْلَاك مُرْسَلَة নয়, বরং أَمْلَاك غَيْر مُرْسَلَة বা عُقُوْد ও فُسُوْخ [চুক্তিকরণ ও চুক্তি বাতিলকরণ]-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালাটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ظَاهِرًا ও بَاطِنًا [বাহ্যিক ও মৌলিক] উভয়ভাবেই কার্যকরী হয়। যেমনটি (كِتَابُ النِّكَاحِ) বিবাহ অধ্যায় ও (كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِيْ) বিচারকের শিষ্টাচার অধ্যায়ে বলা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কাজি যদি ক্রেতার কসম করার অপেক্ষা না করেই বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দিয়ে বিক্রেতাকে তার দাসী ফেরত নেওয়ার ফয়সালা করে দেয় এমতাবস্থায় পরবর্তীতে যদি ক্রেতা সে বিষয়ে কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার মাধ্যমে কাজির ফয়সালা ভুল প্রমাণিত হয় তাহলেও চুক্তি বাতিলকরণের ব্যাপারে কাজির ফয়সালার ব্যতিক্রম করা অসম্ভব হওয়ায় এ সুরতে বিষয়টির সুরাহা করা সম্ভব হবে না; বরং চুক্তি বাতিলকরণের ব্যাপারে কাজির ফয়সালা এসে যাওয়ায় ক্রেতাকে কসম করানোর মাঝে কোনো উপকার নিহিত না থাকায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে কসম নেওয়ার কামনাই করতে পরবে না।

সুতরাং উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে যেহেতু ঋণের মাসআলায় পাওনাদারের কসমের অপেক্ষা না করে দেনাদারের বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান করলেও দেনাদার এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই এ ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালাকে পাওনাদারের কসমের জন্য বিলম্বিত করার বিধান দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে দাসী ফেরত দেওয়ার মাসআলায় যেহেতু ক্রেতার কসমের অপেক্ষা না করে বিক্রেতার বিপক্ষে চুক্তি বাতিলের ফয়সালা দেওয়া হলে এ দ্বারা বিক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাই এ ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালাকে ক্রেতার কসম করা পর্যন্ত বিলম্বিত করার বিধান আরোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا قَالُوْا الخ : উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলাদ্বয়ের মাঝে উল্লিখিত নিয়মে পার্থক্য বিধান করা এটা শুধু কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে মাশায়েখগণ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে উভয় মাসআলার ক্ষেত্রে একই বিধান হওয়া উচিত অর্থাৎ উভয় মাসআলার মাঝেই পাওনাদার কিংবা ক্রেতার কসম করার অপেক্ষায় কাজির ফয়সালাকে বিলম্বিত করা হবে না। কারণ তাদের মতে। أَمْلَاك غَيْر مُرْسَلَة ও أَمْلَاك مُرْسَلَة উভয় ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালা শুধুমাত্র ظَاهِرًا [বাহ্যিকভাবে] গ্রহণযোগ্য হয়। بَاطِنًا [মৌলিক অর্থে] তা কার্যকর নয়। তাই উভয় সুরতেই কাজির ফয়সালা ভুল প্রমাণিত হলে তাদের মাতানুযায়ী বিষয়টির সুরাহা করা সম্ভব। কেননা সাহেবাইনের মতানুযায়ী তখন কাজির ফয়সালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اَلْأَصَحُّ عِنْدَ الخ : আর কারো কারো মতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, উভয় মাসআলায় কাজির ফয়সালাকে পাওনাদার ও ক্রেতার কসমের জন্য বিলম্বিত করা হবে। কারণ এতে দেনাদার ও বিক্রেতার প্রতি কল্যাণ কামনা হয়ে থাকে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর নীতিই হলো তাদের কল্যাণের দিক লক্ষ্য করে ফতোয়া প্রদান করা। ফলেই তিনি ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রেতা পক্ষের দাবি ছাড়াই ক্রেতার কাছ থেকে কসম গ্রহণ করে থাকেন। তাই এক্ষেত্রেও বিক্রেতা দেনাদারের কল্যাণ কামনার্থে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর সঠিক মাজহাব অনুযায়ী ক্রেতা ও পাওনাদারের কসম করা পর্যন্ত কাজির ফয়সালাকে বিলম্বিত করা উচিত।

قَالَ : وَمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا عَلَى أَهْلِهِ فَأَنْفَقَ عَشَرَةً عَلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِهِ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فَهٰذَا كَذٰلِكَ وَقِيلَ هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ وَيَصِيرُ مُتَبَرِّعًا وَقِيلَ الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشِرَاءٍ وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ يَتَضَمَّنُ الشِّرَاءَ فَلَا يَدْخُلَانِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি নিজের পরিবারের জন্য খরচ করার উদ্দেশ্যে কারো হাতে দশ দিরহাম প্রদান করে, অতঃপর সে নিজের তহবিল থেকে দশ দিরহাম খরচ করল, তাহলে দশ দিরহামে কাটাকাটি হয়ে যাবে। কেননা পরিবারে জন্য খরচ করার উকিল মূলত ক্রয় করার উকিল। আর ক্রয়ের উকিলের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সেটাই, যা আমারা আলোচনা করে এসেছি। এবং তা আমরা প্রমাণিত করেও এসেছি। সুতরাং এখানেও তাই হবে। কারো কারো মতে এটা হলো ইসতিহসান, আর কিয়াসের দাবি অনুসারে তার জন্য কাটাকাটি করার অধিকার থাকবে না. বরং এ ক্ষেত্রে সে [ঐ দশ দিরহাম] স্বেচ্ছাদানকারী হবে। আর কারো কারো মতে, কিয়াস ও ইসতিহসানের মাঝে ব্যবধান হলো ঋণ পরিশোধের মাসআলায়। কারণ সেটা ক্রয় নয়। পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচ করার দায়িত্ব ক্রয়ের দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে বিধায় কিয়াস ও ইসতিহসানের ব্যবধানের বিষয়টি এতে প্রবেশ করবে না। সঠিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ عَشَرَةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি কারো হাতে [উদাহরণস্বরূপ] দশ দিরহাম দিয়ে তাকে এ মর্মে পাঠায় যে, এ টাকা আমার পরিবারের জন্য খরচ করে আস। এমতাবস্থায় সেই উকিল যদি তার মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য এ টাকা খরচ না করে তার নিজের তহবিল থেকে দশ দিরহাম খরচ করে তাহলে উকিলের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচকৃত এ দশ দিরহাম তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত হিসাবে গণ্য হবে না; বরং এ দশ দিরহাম তার মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দশ দিরহামের দ্বারা কাটাকাটি হয়ে যাবে। সুতরাং নিজের তহবিল থেকে দশ দিরহাম খরচ করার কারণে মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে যে দশ দিরহাম গ্রহণ করেছিল সে তার মালিক হয়ে যাবে।

আল্লামা তামারতাশী (র.) বলেন, আলোচ্য বিধানটি কেবল ঐ সুরতের জন্যই নির্ধারিত যখন মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য খরচ করার সময় উকিলের কাছে তার মুওয়াক্কিলের প্রদত্ত টাকা বিদ্যমান থাকবে এবং নিজের তহবিল থেকে সে খরচ করার সময় মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে খরচ করার ইচ্ছা করবে। কিন্তু যদি মুওয়াক্কিলের প্রদত্ত টাকা তার কাছ থেকে হারিয়ে যায়, কিংবা নিজের তহবিল থেকে খরচ করার সময় নিজের পক্ষ থেকে খরচ করার নিয়ত করে থাকে তাহলে তার এ খরচকৃত টাকা নিজের জন্য খরচ করেছে বলে মনে করা হবে এবং তার পক্ষ থেকে মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য স্বেচ্ছা প্রদত্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ফলে উকিল তার মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে এ টাকা ফেরত নিতে পারবে না। কারণ ওয়াকালাহ-এর ক্ষেত্রে দিরহাম দিনার নির্ধারিত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। –[নাতায়িজুল আফকার : খ. ৮, পৃ. ১৪১]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার দলিল উল্লেখ করতে চাচ্ছেন, যার সার কথা হলো, এখানে পরিবারের জন্য খরচ করার উকিল মূলত ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো। কারণ পরিবারের জন্য খরচ করার উকিল সাধারণত এমন সকল জিনিস ক্রয় করতে বাধ্য হয় যা তার মুওয়াক্কিলের পরিবারের ভরণপোষণ হতে পারে। আর এ সকল জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে উকিলকে কখনো এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয় যেখানে মুওয়াক্কিলের দেওয়া টাকা তাৎক্ষণিকভাবে উকিলের হাতে মজুদ না থাকায় সে নিজ তহবিল থেকে মূল্য আদায় করে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য কিনে নিতে বাধ্য হয়। যে অবস্থার সম্মুখীন সাধারণত ক্রয়বিক্রয়ের উকিল হয়ে থাকে, তাই ক্রয়বিক্রয়ের উকিল যেমনিভাবে নিজ তাহবিল থেকে টাকা দিয়ে তার মুওয়াক্কিলের জন্য কিছু ক্রয় করলে পরবর্তীতে মুওয়াক্কিলের কাছ

থেকে সে টাকা পরিশোধ করে নিতে পারে যেমনটি পূর্বে (بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) 'ক্রয়বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ' পরিচ্ছেদে-বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনিভাবে পরিবারের জন্য খরচ করার উকিলও যদি নিজ তহবিল থেকে টাকা দিয়ে মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য কিছু ক্রয় করে তাহলে মুওয়াক্কিলের প্রদত্ত টাকা থেকে সেও তা পরিশোধ করে নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কোনো কোনো মাশায়েখের মতে আলোচ্য মাসআলায় উল্লিখিত বিধানটি ইসতিহসানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কিয়াসের দৃষ্টিতে আলোচ্য মাসআলার বিধানটি এমন হওয়ার কথা নয়; বরং কিয়াসের বিধান অনুযায়ী উকিল যদি মুওয়াক্কিলের প্রদত্ত টাকা খরচ না করে মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য নিজ তহবিল থেকে খরচ করে থাকে, তাহলে তার নিজ তহবিল থেকে খরচকৃত টাকা তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাদান বলে সাব্যস্ত হবে। মুওয়াক্কিলের দেওয়া টাকা থেকে তা কাটাকাটি করে নিতে পারবে না; বরং মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে গৃহীত টাকা তার হাতে ফেরত দিতে হবে। আর যদি তা হারিয়ে যায় তাহলে তার ভর্তুকি দিতে হবে। কারণ ওয়াকালাহ-এর ক্ষেত্রে দিরহাম দিনার নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাই উকিলের দায়িত্ব ছিল তার মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে গ্রহণকৃত টাকা থেকে তার পরিবারের জন্য খরচ করা। সুতরাং যেহেতু সে নির্ধারিত টাকা থেকে খরচ করেনি, তাই মুওয়াক্কিলকে সে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। আর যে টাকা উকিল তার নিজের তহবিল থেকে খরচ করেছে সেটা যেহেতু মুওয়াক্কিলের অনুমতি ছাড়া খরচ করেছে তাই তা স্বেচ্ছাপ্রদান বলে গণ্য হবে। -[আল ইনায়াহ : পৃ. ৩৭৪]

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ الخ : তবে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে কিয়াস ও ইসতিহসানের মাঝে বিধানগত উপরোল্লিখিত পার্থক্যটা আলোচ্য মাসআলার সাথে প্রযোজ্য নয়। কারণ পরিবারের জন্য খরচ করার আদেশের অর্থ হলো তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে দেওয়ার জন্য আদেশ করা। আর উকিল কর্তৃক মুওয়াক্কিলের জন্য কোনো কিছু ক্রয় করাটা মুওয়াক্কিলের তরফ থেকে দেওয়া টাকার সাথে সম্পৃক্ত হয় না কেননা পণ্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে উকিলের উপর হুবহু মুওয়াক্কিলের দেওয়া টাকা দিয়ে মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক নয়; বরং নিজের পক্ষ থেকে তার সদৃশ দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে তা নিয়ে নেওয়ার অধিকার উকিলের থাকে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে উকিল যদি নিজ তহবিল থেকে মুওয়াক্কিলের পরিবারের জন্য খরচ করে তাহলে তা কিয়াসের দৃষ্টিতেও স্বেচ্ছাদান বলে সাব্যস্ত হবে না, আর ইসতিহসান তো বটেই। তাই আলোচ্য মাসআলাটিতে কিয়াস ও ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিধানগত পার্থক্য নির্ণয় করা সঠিক নয়। হ্যাঁ, তবে ঋণ আদায়ের মাসআলায় কিয়াস ও ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিধানগত উপরিউক্ত পার্থক্যটি নির্ণয় করা বাস্তব সম্মত। কারণ তাতে উকিলের প্রতি ক্রয়ের নির্দেশ বিদ্যমান নেই। সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কারো হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বলল, আমার অমুক পাওনাদারের কাছে ঋণ আদায় বাবদ এ টাকা পৌঁছে দাও, এমতাবস্থায় এ উকিল যদি তার মুওয়াক্কিলের ঐ টাকা পাওনাদারকে না দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা পাওনাদারকে আদায় করে দেয় তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে উকিলের জন্য তা বৈধ হবে এবং তার বদলে মুওয়াক্কিলের দেওয়া এক হাজার টাকা নিজে রেখে দিতে পারবে। তবে কিয়াসের দৃষ্টিতে উকিলের নিজের তহবিল থেকে আদায়কৃত এক হাজার টাকা স্বেচ্ছাদান বলে সাব্যস্ত হবে, তাই তার বদলে মুওয়াক্কিলের দেওয়া এক হাজার টাকা নিজে রেখে দিতে পারবে না; বরং তাকে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। কারণ উকিল এখানে মুওয়াক্কিলের কাছ থেকে যে টাকা গ্রহণ করেছে ঠিক তা দিয়েই তার ঋণ পরিশোধ করতে আদিষ্ট; মুওয়াক্কিলের জন্য কোনো কিছু ক্রয় করার প্রতি আদিষ্ট নয়। সুতরাং উকিল যেহেতু মুআক্কিলের কাছ থেকে নেওয়াটাই হুবহু আদায় করতে বাধ্য ছিল তাই উকিলের নিজ তহবিল থেকে ঋণ আদায় করাটা মুওয়াক্কিলের অনুমতি ক্রমে না হওয়ায় এ আদায়ে উকিল স্বেচ্ছাদানকারী সাব্যস্ত হবে। ফলে সে মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে তা উসুল করে নেওয়ার অধিকারী হবে না।

আর ইসতিহসানের দলিল হলো, এখানে ঋণ আদায়ের জন্য নিযুক্ত উকিলকে সামাজিক প্রচলন ও প্রয়োজনের তাগিদে নিজের তহবিলের টাকা দিয়ে তার মুওয়াক্কিলের জিম্মার ঋণটি ক্রয় করার উকিল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণ আদায়ের উকিল ক্রয়ের উকিলের মতো হলো। আর ক্রয়ের উকিল যেহেতু মুওয়াক্কিলের জন্য কিছু কিনে নিজের তহবিল থেকে মূল্য আদায় করলে মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে তাই ঋণ আদায়ের উকিলও নিজের তহবিল থেকে ঋণ আদায় করে দিলে মুওয়াক্কিলের টাকা থেকে তা ফেরত নেওয়ার অধিকারী হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

بَابُ عَزْلِ الْوَكِيْلِ

পরিচ্ছেদ : উকিলের অপসারণ

এ পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) মুওয়াক্কিলের জন্য উকিলকে অপসারণ করার অধিকার ও এ অপসারণ কার্যকর হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, মুওয়াক্কিল কর্তৃক অপসারণের মাধ্যমে যেমনিভাবে উকিল অপসারিত হয় তেমনি ওকালত বাতিল হওয়ার কারণেও উকিল অপসারিত সাব্যস্ত হয়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল কারণে ওকালত বাতিল হয় সে সংক্রান্ত আলোচনাও এ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা উকিল অপসারিত হওয়ার মৌলিক পন্থা দুটি। যথা–

১. মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে অপসারণ করা কিংবা উকিলকে কর্ম সম্পাদনে নিষেধ করা। দুটি শর্ত সাপেক্ষে এ পন্থায় উকিল অপসারিত হতে পারে। প্রথম শর্ত হলো, অপসারণের ব্যাপারে উকিলের অবগতি। অতএব মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলের অপসারণ যদি উকিলের উপস্থিতিতে হয় কিংবা তার অনুপস্থিতিতে হলো কিন্তু মুওয়াক্কিল উকিলের কাছে কোনো চিঠিপত্র, টেলিফোন কিংবা কোনো লোক মাধ্যমে এ অপসারণের বার্তা পৌছে দিল অথবা মুওয়াক্কিল কর্তৃক প্রেরণ ব্যতীতই একজন বিশ্বস্ত লোক কিংবা দুজন লোকের মারফতে উকিলের নিকট সংবাদ পৌছে যায় তাহলে এ উকিল অপসারিত সাব্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, ওকালার সাথে অন্যের হক সম্পৃক্ত না হতে হবে। এ দুটি শর্ত না পাওয়া গেলে মুওয়াক্কিল কর্তৃক অপসারণের মাধ্যমে উকিল অপসারিত হবে না।

২. উকিল অপসারিত হওয়ার দ্বিতীয় মৌলিক পন্থাটি হলো ওকালাহ্ বাতিল হওয়া। ওকালাহ্ বাতিল হওয়ার কয়েকটি উপদান রয়েছে। যথা–

ক. মুওয়াক্কিলের ইন্তেকাল।

খ. মুওয়াক্কিলের স্থায়ী সূত্রে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা।

গ. মুওয়াক্কিলের মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়া।

ঘ. মুওয়াক্কিল কিতাবাতের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে।

ঙ. গোলাম মুওয়াক্কিল তার মনিবের পক্ষ থেকে লেনদেনে বাধাগ্রস্ত হলে।

চ. উকিলের ইন্তেকাল।

ছ. উকিলের স্থায়ী সূত্রে পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে।

জ. উকিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেলে [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে] এ আটটি উপাদানের প্রত্যেকটির মাধ্যমেই ব্যক্তির কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায় বিধায় এর দ্বারা ওকালত বাতিল সাব্যস্ত হয়।

ঝ. মুওয়াক্কিল নিজেই যদি কাজ সম্পাদন করে ফেলে।

ঞ. ওকালার مَحَلّ বাতিল হয়ে গেলে, যথা– কোনো একটি বকরি বিক্রয়ের জন্য কাউকে উকিল বানানো হলো অতঃপর বিক্রয়ের পূর্বেই যদি ঐ বকরিটা মারা যায় তাহলে উকিলের ওকালত বাতিল হয়ে যাবে।

–[বাদাইউস সানাই : খ. ৫ পৃ. ৪৩ – ৪৬]

قَالَ : وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ كَانَ وَكِيْلًا بِالْخُصُوْمَةِ بِطَلَبٍ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَصَارَ كَالْوَكَالَةِ الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিলকে ওকালত থেকে অপসারণের অধিকার মুওয়াক্কিলের রয়েছে। কেননা ওকালত হলো মুওয়াক্কিলের হক, সুতরাং এটা বাতিল করার অধিকার তার রয়েছে। তবে যদি এ ওকালত-এর সঙ্গে অন্যের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায় [তাহলে অপসারণের অধিকার থাকবে না।] যেমন কেউ বাদীর পক্ষ থেকে দাবির প্রেক্ষিতে বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য উকিল নিযুক্ত হলো। কেননা এতে অন্যের [তথা বাদীর] হক নষ্ট করা হয়। আর এটা রাহন চুক্তির অন্তর্গত ওকালত-এর মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلِلْمُوَكِّلِ اَنْ يَعْزِلَ الخ : যেহেতু উকিল নিয়োগ না করা হলে উকিলের অপসারণের প্রসঙ্গই আসে না, তাই উকিল নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর মুসান্নিফ (র.) এ পরিচ্ছেদে উকিলের অপসারণ সংক্রান্ত মাসাইল এর আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর উদ্ধৃতিতে উকিলের অপসারণের অধিকার সংক্রান্ত একটি মূলনীতি বর্ণনা করেন । তা হলো– وَلِلْمُوَكِّلِ اَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ اِلَّا اِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ অর্থাৎ মুওয়াক্কিলের জন্য সর্বদাই তার উকিলকে অপসারণ করার অধিকার থাকবে। তবে যদি ওকালত -এর সাথে অন্য কারো হক সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে সেই হকদারের অনুমতি ব্যতিরেকে মুওয়াক্কিল তার উকিলকে অপসারণ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ بِاَنْ كَانَ وَكِيْلًا بِالْخُصُوْمَةِ الخ : ওকালার সাথে অন্যের হক সম্পৃক্ত হওয়ার একটি উদাহরণ হলো যেমন, (مُدَّعِیْ) বাদীর পক্ষ থেকে আবেদনের ভিত্তিতে (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) বিবাদীর পক্ষ হয়ে কাজির দরবারে মামলা পরিচালনা করার জন্য কাউকে উকিল বানানো হলো। এমতাবস্থায় এ উকিলের মুওয়াক্কিল তথা (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) বিবাদী (مُدَّعِیْ) বাদীর অনুমতি ছাড়া এ উকিলকে ওকালত থেকে অপসারণ করতে পারবে না। কারণ এ উকালার সাথে (مُدَّعِیْ) বাদীর হক সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কেননা যেহেতু কাজির দরবারে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া কারো দাবি কিংবা দলিল গ্রহণযোগ্য হয় না, তাই এ উকিলের অনুপস্থিতিতে বাদী তার দাবিকে কাজির দরবারে প্রমাণিত করতে সক্ষম নয়। ফলে এ উকিলের কাজির দরবারে উপস্থিতি ও (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) বিবাদীর পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনার মাধ্যমে বাদীকে কাজির দরবারে তার দাবি প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়াটা বাদীর অধিকার। তাই মুওয়াক্কিল কর্তৃক [বাদীর অনুমতি ছাড়া] এ উকিলকে অপসারণ করা হলে এতে অন্যের অধিকার হরণ হয় বলে এ অপসারণ বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, তিনটি শর্ত সাপেক্ষে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলাটিকে ওকালার সাথে অন্যের হক সম্পৃক্ত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম শর্তটি হলো ওকালার নিয়োগটা কারো আবেদনের ভিত্তিতে হতে হবে।

দ্বিতীয় হলো আবেদন (مُدَّعِیْ) বাদীর পক্ষ থেকে হতে হবে, আর তৃতীয় শর্ত হলো উকিলের অপসারণ বাদীর অনুপস্থিতিতে হতে হবে। এ তিনটি শর্তের কোনো একটি শর্ত না পওয়া গেলে খুসূমতের উকিলকে অপসারণ করা তার মুওয়াক্কিলের জন্য অবৈধ হবে না।

খুসূমতের জন্য নিযুক্ত উকিলকে কখন অপসারণ করা বৈধ হবে আর কখন হবে না? এ ক্ষেত্রে আযযাখীরাহ গ্রন্থকার এতে সুন্দর একটি ধারা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুওয়াক্কিল যদি তার খুসূমতের উকিলকে অপসারণ করে তাহলে তার দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে বাদী পক্ষের উকিল হবে কিংবা বিবাদী পক্ষের উকিল হবে। সুতরাং যদি সে বাদী পক্ষের উকিল হয় তাহলে এ অপসারণ বৈধ হবে, যদিও তা বিবাদীর অনুপস্থিতিতে হোক না কেন। কারণ উকিলের মাধ্যমে মামলা উত্থাপন করানো– এটা হলো বাদীর অধিকার এ ভিত্তিতে মুওয়াক্কিল [বাদী] যেন এ অপসারণের মাধ্যমে নিজের অধিকারকে নষ্ট করল, আর কোনো ব্যক্তির জন্য নিজের অধিকারকে নষ্ট করার বৈধতা রয়েছে, এক্ষেত্রে অন্যের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির কোনো দখল নেই।

আর যদি সে বিবাদী পক্ষের উকিল হয় তাহলে এ উকিলের নিয়োগটা হয়তো কারো আবেদনের ভিত্তিতে হবে কিংবা কারো আবেদন ছাড়া হবে। উকিল যদি কারো আবেদন ছাড়া নিয়োজিত হয়ে থাকে তাহলে বাদীর অনুপস্থিতিতে তাকে অপসারণ করা হলেও এ অপসারণ বৈধ হবে।

আর যদি কারো আবেদনের ভিত্তিতে উকিলকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে হয়তো বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে তাকে নিয়োগ করা হবে কিংবা কাজির আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। উভয় অবস্থাতেই যদি উকিলকে তার অনুপস্থিতিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং উকিল এ ওকালত-এর ব্যাপারে অবহিত না হয় তাহলে সর্বাবস্থাতেই তাকে অপসারণ করা বৈধ হবে। কারণ ওকালার ব্যাপারে উকিলকে অবহিত করা পর্যন্ত উকিল নিয়োগ সম্পন্ন হয় না, তাই এর পূর্বে উকিলকে অপসারণ করা উকিল নিয়োগ না করারই নামান্তর।

আর যদি বাদী কিংবা কাজির আবেদনের ভিত্তিতে উকিলের উপস্থিতিতে তাকে ওকালার জন্য নিয়োগ করা হয় অথবা তার অনুপস্থিতিতে নিয়োগ করার পর তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে সে তা গ্রহণ করল, তাহলে বাদীর (مُدَّعِىْ) অনুপস্থিতিতে এ উকিলকে অপসারণ করা বৈধ হবে না তবে বাদী উপস্থিত থাকলে তার সামনে এ উকিলকে অপসারণ করা যাবে, বাদী এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকুক কিংবা অসন্তুষ্ট হোক। কারণ যেহেতু বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে উকিলকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাই এ উকিলের সাথে তার অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তাই তার অনুপস্থিতিতে উকিলকে অপসারণ করা হলে এতে তার কাজির সামনে মামলা উত্থাপনের অধিকার নষ্ট হয়। আর অন্যের অধিকারকে নষ্ট করে উকিলকে অপসারণ করা মুওয়াক্কিলের জন্য বৈধ নয়। [মুসান্নিফ (র.) এ সুরতটির কথাই কিতাবে আলোচনা করেছেন।] কিন্তু বাদীর উপস্থিতিতে উকিলকে অপসারণ করা হলে যেহেতু বাদী বিবাদীর কাছে অন্য কোনো উকিল নিয়োগ করার আবেদন করতে পারে কিংবা সরাসরি বিবাদীকে নিয়ে কাজির দরবারে মামলা উত্থাপনের সুযোগ রাখে, তাই এ অপসারণের মাঝে বাদীর কোনো অধিকার নষ্ট হয় না বিধায় তাকে বৈধ বলা হয়েছে। –[নতায়িজুল আফকার : খ. ৭, পৃ. ১৪৪]

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْوَكَالَةِ الَّتِىْ تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ : সুতরাং বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে বিবাদীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিলকে অপসারণের বিষয়টি বন্ধকি চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত ওকালার মতো হলো। যেমন কেউ কারো কাছ থেকে নিজের কোনো বাগান বন্ধক রেখে দশ হাজার টাকা ঋণ নিল এবং বন্ধকদাতা ও গ্রহিতা উভয়ের সম্মতিতে বাগানটিকে একজন তৃতীয় ব্যক্তির ওকালায় এ মর্মে হস্তান্তর করল যে, নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সে উকিল এ বাগান বিক্রি করে দিয়ে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করে দেবে। এমতাবস্থায় বন্ধকদাতা যদি তার পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া উক্ত উকিলকে অপসারণ করতে চায় তাহলে তার এ অপসারণ বৈধ হবে না, কারণ এ ওকালার সাথে পাওনাদারের হক সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সুতরাং পাওনাদারের হক সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে যেমনিভাবে বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকের উকিলকে বরখাস্ত করা বৈধ নয়, তেমনিভাবে বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে বিবাদীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিলের সাথেও বাদীর হক সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বিবাদী কর্তৃক সেই উকিলকে বরখাস্ত করা বৈধ হবে না। কেননা উভয় প্রকার ওকালাহর মাঝেই উকিলকে বরখাস্তকরণ বৈধ করা হলে এতে অন্যের হক নষ্ট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা নাজায়েজ।

এ কায়দার ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের কোনো (عَيْن) নির্ধারিত বস্তুর সাথে যদি উকিলের হক সম্পৃক্ত হয় তাহলে মুওয়াক্কিল কর্তৃক সে উকিলকে বরখাস্তকরণ বৈধ হবে না। যেমন– কেউ তার পাওনাদারকে নিজস্ব কোনো একটি বস্তু বিক্রি করা পর্যন্ত তাকে ওকালত থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না।

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ إِضْرَارًا بِهِ مِنْ حَيْثُ إِبْطَالِ وِلَايَتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ رُجُوعِ الْحُقُوقِ إِلَيْهِ فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ فَيَضْمَنُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَيَسْتَوِي الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لِلْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا اِشْتِرَاطَ الْعَدَدِ أَوِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ فَلَا نُعِيدُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি উকিলের কাছে অপসারণের খবর না পৌছে তাহলে তার ওকালত বহাল থাকবে এবং অবগতি লাভ করা পর্যন্ত তার কার্য বৈধ হবে। কেননা [এমতাবস্থায়] অপসারণের মাধ্যমে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, তার কর্তৃত্ব বাতিল করার দিক থেকে, কিংবা চুক্তির দায়দায়িত্ব তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার দিক থেকে, কারণ [অপসারণের খবর না পৌছার কারণে] সে [ক্রয়ের উকিল হলে] মুওয়াক্কিলের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে। কিংবা [বিক্রয়ের উকিল হলে] বিক্রীত দ্রব্য সে ক্রেতার হাতে অর্পণ করে দেবে এরপর তাকে উক্ত মূল্য বা বিক্রীত দ্রব্য-এর দায় বহন করতে হবে। ফলে তাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রথমোক্ত কারণটির বিচারে বিবাহ [তালাক, দাসমুক্তি] ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত উকিলের বিধান একই। আর অপসারণের খবরদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি । সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الخ : অপসারণের খবর উকিলের কাছে না পৌছা পর্যন্ত এ অপসারণ সঠিক বলে গণ্য হবে না। ফলে অপসারণের খবর পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উকিল তার ওকালতে বহাল থাকবে এবং ওকালার বিধান অনুযায়ী তার সকল লেনদেন মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে সম্পদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। তবে হ্যাঁ অপসারণের খবর পৌছে যাওয়ার পর সে আর উকিল হিসেবে বহাল থাকবে না এবং মুওয়াক্কিলের পক্ষে তার কোনো লেনদেনই গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সকল অনুসারীদের মাযহাব এটাই। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এরূপ অভিমত পাওয়া যায়। তবে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) থেকে অপর এক বর্ণনা অনুসারে এক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত হলো, মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে অপসারণ করার সাথে সাথেই সে ওকালাহর দায়িত্ব থেকে অপসারিত বলে গণ্য হবে তার কাছে এ সংবাদ পৌছুক কিংবা না পৌছুক সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমতও এটাই।

এ অভিমতের স্বপক্ষে তাঁদের দলিল হলো, কাউকে উকিল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া এটা মুওয়াক্কিলের একটি অধিকার, উকিলকে ওকালত থেকে বরখাস্ত করার মাধ্যমে যেন মুওয়াক্কিল নিজের একটি অধিকারকে রহিত করল। আর ব্যক্তি স্বীয় অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার কারণে যার উপর থেকে অধিকারটি রহিত করা হচ্ছে তাকে এ ব্যাপারে অবগত করার প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। কাজেই মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে অপসারণ করা হলে এ অপসারণের কার্যকারিতা উকিলের এ ব্যাপারে অবগতি পর্যন্ত স্থগিত করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে উকিলের অবগতির পূর্বেই এ অপসারণ কার্যকর হবে। যেমনটি তালাক এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এছাড়া সাধারণত মানুষ উকিল নিয়োগ করে থাকে নিজের উপকারের জন্যই, তাই এ উকিলকে অপসারণের অধিকারে যদি সে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তাহলে এ ওকালাহ তা. অপকারও বয়ে আনতে পারে যা হওয়া অনুচিত। সমূহ কারণে এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী (র.) মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে অপসারণের সাথে সাথে এ অপসারণ কার্যকারী হওয়ার কথা বলেন।

পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসারী আলেমদের বক্তব্য হলো, উকিল অপসারণের বিষয়টি শুধু কেবল মুওয়াক্কিল কর্তৃক আপন অধিকার হরণই নয়; বরং তা মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিলের প্রতি একটি (خِطَاب مُلْزِم) আবশ্যককারী সম্বোধনও বটে, যার দ্বারা উকিলের জন্য তার মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের লেনদেন বর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ (خِطَابٌ) সম্বোধনের বিধান (مُخَاطَبٌ) সম্বোধিত ব্যক্তির উপর তখনই কার্যকর করা হয় যখন সে এ [خِطَابٌ -এর] ব্যাপারে অবগত হয়। خِطَابٌ -এর ব্যাপারে অবগত হওয়ার পূর্বে শরিয়ত কোনো নতুন বিধানই ব্যক্তির উপর কার্যকর করে না। তার উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই কুবা'র অধিবাসীদের ঘটনায়। বুখারী [৪৪০৩, ৪৪৯১ নং হাদীস] মুসলিম [৫২৬ নং হাদীস] সহ হাদীসের অধিকাংশ কিতাবেই সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন বায়তুল মাকদাস থেকে ক্বিবলাকে পরিবর্তন করে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার বিধান আসল তখনও কুবা'র অধিবাসীরা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়ছিল। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসের প্রায় অর্ধেকের দিকে কোনো এক জোহরের নামাজের সময় কিবলা পরিবর্তনের বিধান আসে। আল্লামা বগভী (র.)-এর বর্ণনা অনুসারে কাবা শরীফের দিকে ফিরে হুজুর ﷺ সর্বপ্রথম আসরের নামজ আদায় করেন। পরদিন ফজরের নামাজ চলাকালে কুবা অধিবাসীদের কাছে কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌছে, নামাজ চলাকালেই তারা কাবা শরীফের দিকে ফিরে যান। পূর্বের তিন ওয়াক্ত নামাজ তারা কেউই পুনরায় কাজা করেননি। অতএব, কোনো বিধানের (خِطَابٌ) সম্বোধন আসার সাথে সাথেই যদি তাঁর হুকুম কার্যকর করা আবশ্যক হতো তাহলে কুবাবাসীদের উপর কিবলা পরিবর্তনের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে আদায়কৃত নামাজগুলো পুনরায় কাজা করা আবশ্যক হতো।

এমনিভাবে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাজিল হওয়ার পরও বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনেক সাহাবীই মদ পানে লিপ্ত ছিলেন। এ কারণে তাঁরা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম কার্য করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হননি; বরং তাঁদের ব্যাপারেই সূরা মায়েদা-এর ৯৩ নং আয়াত لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا নাজিল হয়েছে। বুখারী [৫৫৮৩ নং হাদীস] ও মুসলিম [১৯৮০ নং হাদীস] শরীফে সহীহ সূত্রে হযরত আনাস (রা.) থেকে এ হাদীসটি উল্লিখিত আছে।

সুতরাং এ দুটি হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিধান সম্পর্কে (مُخَاطَبٌ) সম্বোধিত ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করতে তখনই বাধ্য হয় যখন বিধানটির সংবাদ তার কাছে পৌছে। অতএব উকিলকে বরখাস্তকরণ যেহেতু মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিলের প্রতি একটি (خِطَابٌ) সম্বোধন তাই উকিলের জন্য সে অনুযায়ী আমল করা তখনই আবশ্যক হবে, যখন তার কাছে বরখাস্তকরণের সংবাদ পৌছবে। ফলে সংবাদ পৌছার পূর্বে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্যে উকিলের সার্বিক লেনদেনই মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়টিকেই কিয়াস ও যুক্তির আলোকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন, অপসারণের সংবাদ উকিলের কাছে পৌছার পূর্বেই যদি উকিলের অপসারণ হয়ে গেছে বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা উকিল দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে–

১. মুওয়াক্কিলের মাল থেকে উকিলের কর্তৃত্ব বাতিল করার দিক থেকে। কারণ উকিল সাধারণত ওকালার ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের মালের উপর আপন কর্তৃত্বের দাবি করে থাকে। তাই উকিলের অবগতি ছাড়াই যদি সে ওকালত থেকে অপসারিত সাব্যস্ত হয় তাহলে সে কর্তৃত্বের দাবিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। আর কাউকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মাঝে তার বড় ধরনের ক্ষতি নিহিত রয়েছে।

২. লেনদেনের দায়দায়িত্ব উকিলের দিকে ফিরার দিক থেকে। কারণ উকিলের অবগতি ছাড়াই যদি উকিল অপসারিত সাব্যস্ত হয় তাহলে সে অপসারণের খবর না পাওয়ার কারণে মুওয়াক্কিলের উদ্দেশ্যে কোনো লেনদেন করে ফেললে তাকে এর ভর্তুকি দিতে হবে। আর এরূপ ভর্তুকি দেওয়ার মাঝে অবশ্যই তার ক্ষতি নিহিত আছে।

সুতরাং যেহেতু উকিলের অবগতির পূর্বেই তাকে অপসারিত ধরা হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এ ক্ষেত্রে উসূলে ফিকহের (اصل) নীতি হলো (اَلضَّرَرُ مَدْفُوعٌ) কোনো লেনদেনের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। তাই এ নীতির অনুসরণে উকিলের ক্ষতির দিকগুলো দূর করার লক্ষ্যে হানাফী আলেমগণ এ মত পোষণ করেন যে, অপসারণের খবর না পৌছা পর্যন্ত উকিল অপসারিত সাব্যস্ত হবে না। আর দাস মুক্তির ক্ষেত্রে যেহেতু দাসের কাছে মুক্তির সংবাদ পৌছার পূর্বে তাকে মুক্ত সাব্যস্ত করা হয়ে এতে সে কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই দাসমুক্তির বিধানকে দাসের কাছে মুক্তির সংবাদ পৌছা পর্যন্ত স্থগিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর তালাকের মাধ্যম যদিও স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে কিন্তু মহর আদায়ের মাধ্যমে তাঁর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় বিধায় তালাকের সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌছা পর্যন্ত তার বিধানও স্থগিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক ও দাসমুক্তির সাথে উকিল অপসারণের বিষয়টিকে কিয়াস না করাই সমীচীন। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَيَسْتَوِى الْوَكِيْلُ بِالنِّكَاحِ الخ : হিদায়া গ্রন্থাকার বলেন, উকিল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কারণে সাধারণত বিবাহ-শাদি, তালাক প্রদান, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি সব ধরনের উকিলই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে সে কারণে শুধু ঐ সকল লেনদেনে নিযুক্ত উকিলই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে সকল লেনদেনের সার্বিক দায়দায়িত্ব তথা ক্রয়বিক্রয় উকিলের উপর বর্তায়।

মোটকথা উকিল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অজুহাতে তার অবগত হওয়া ছাড়া অপসারণ কার্যকর হবে না। এ বিধানটি যেমন ক্রয়বিক্রয়ের উকিলের সাথে প্রযোজ্য তেমনিভাবে অন্যান্য এমন সকল বিষয়ে প্রযোজ্য হবে যে সকল বিষয়ে দায়দায়িত্ব উকিলের দিকে বর্তায় না। কেননা সেসব উকিলও প্রথমোক্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا اِشْتِرَاطَ الْعَدَدِ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উকিলের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার অপসারণের সংবাদ পৌছার জন্যে সংবাদদাতার গুণাগুণ কি হওয়া দরকার? সে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছেন। সে অপসারণের সংবাদদাতার জন্য ন্যায়পরায়ণতা কিংবা সংখ্যা শর্ত। অর্থাৎ যদি সংবাদদাতা একজন হয় তাহলে সে ন্যায়পরায়ণ (عَادِلٌ) হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় দুজন ব্যক্তি সংবাদ দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়টি (كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ) বিচারকের শিষ্টাচার অধ্যায়ে (فَصْلُ الْقَضَاءِ بِالْمَوَارِيْثِ) মিরাস সংক্রান্ত ফয়সালা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে আসছেন বিধায় তা এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছেন না। উল্লেখ্য যে, এখানে উকিল অপসারণের ব্যাপারে সংবাদদাতার যে গুণ শর্ত করা হয়েছে এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুসারে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতানুযায়ী এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শর্ত ছাড়া যে কেউ সংবাদ দিলেই তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ মতবিরোধটা হলো শুধু ঐ ক্ষেত্রে যদি বার্তাবাহক মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে প্রেরিত না হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে বার্তাবাহককে অপসারণের সংবাদ দিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই এ ব্যক্তির সংবাদের দ্বারা অপসারণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বার্তাবাহকের সততা, স্বাধীন নাকি দাস, প্রাপ্তবয়স্ক নাকি অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো কিছুই লক্ষ্য করা হবে না। যেমনটি বাদাইউস সানায়েই গ্রন্থে উল্লেখ আছে। –[নাতায়িজুল আফকার : খ. ৭, পৃ. ১৪৬]

قَالَ : وَيَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُوْنِهِ جُنُوْنًا مُطْبِقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَيَكُوْنُ لِدَوَامِهِ حُكْمُ اِبْتِدَائِهِ فَلَابُدَّ مِنْ قِيَامِ الْاَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِهٰذِهِ الْعَوَارِضِ وَشُرِطَ اَنْ يَكُوْنَ الْجُنُوْنُ مُطْبِقًا لِاَنَّ قَلِيْلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْاِغْمَاءِ وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اِعْتِبَارًا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ وَعَنْهُ اَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِاَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَصَارَ كَالْمَيِّتِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) حَوْلٌ كَامِلٌ لِاَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِيْعُ الْعِبَادَاتِ فَقُدِّرَ بِهِ اِحْتِيَاطًا قَالُوْا اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ فِى اللِّحَاقِ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوْفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ فَاِنْ اَسْلَمَ نَفَذَ وَاِنْ قُتِلَ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ فَاَمَّا عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ فَلَا يَبْطُلُ وَكَالَتُهُ اِلَّا اَنْ يَمُوْتَ اَوْ يُقْتَلَ عَلٰى رِدَّتِهِ اَوْ يَحْكُمَ بِلِحَاقِهِ وَقَدْ مَرَّ فِى السِّيَرِ وَاِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ اِمْرَأَةً فَارْتَدَّتْ فَالْوَكِيْلُ عَلٰى وَكَالَتِهِ حَتّٰى تَمُوْتَ اَوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِاَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِىْ عُقُوْدِهَا عَلٰى مَا عُرِفَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুওয়াক্কিলের মৃত্যুরে কারণে তার পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে এবং মুরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে ওকালাহ্ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা উকিল নিয়োগ হচ্ছে এমন একটি পদক্ষেপ, যা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং তার স্থায়িত্বের জন্য তার সূচনার বিধান কার্যকর হবে। সুতরাং আদেশ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য, অথচ এসব উপসর্গের কারণে আদেশের অব্যাহত থাকাটা বাতিল হয়ে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতি স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্ত এজন্য যে, সামান্য মাত্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি সংজ্ঞাহীনতার অন্তর্ভুক্ত। আর স্থায়িত্বে পরিমাণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একমাস, তিনি ঐ মস্তিষ্ক বিকৃতির উপর কিয়াস করেছেন, যা দ্বারা রমজানের সিয়াম রহিত হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এক দিন এক রাতের অধিক সময়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ সময়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সে মৃত ব্যক্তির মতো হয়ে গেল। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এক বছরের কথা বলেছেন। কেননা এক বছর সময়ে সমস্ত ইবাদত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং সতর্কতার ভিত্তিতে এক বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, দারুল হরবে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। কেননা তাঁর মতে মুরতাদদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকে, সুতরাং তার ওকালাহও স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা কার্যকর হবে। আর যদি তাকে কতল করা হয় কিংবা দারুল হরবে চলে যায় তাহলে তার ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, মুরতাদদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কার্যকর। সুতরাং মৃত্যু ছাড়া কিংবা মুরতাদ হওয়ার অপরাধে কতল ছাড়া কিংবা তার দারুল হরবে পলায়নের সরকারি ঘোষণা ছাড়া তার উকিল নিয়োগ বাতিল হবে না। (كِتَابُ السِّيَرِ) সমরনীতি অধ্যায়ে (بَابُ اَحْكَامِ الْمُرْتَدِّيْنَ) মুরতাদদের বিধিমালা, পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। আর যদি মুওয়াক্কিল নারী হয় আর সে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে

[সর্বসম্মতিক্রমে] উকিলের ওকালাহ্ বহাল থাকবে যতক্ষণ সে মারা না যায় কিংবা দারুল হারবে পলায়ন না করে। কারণ তার ধর্মত্যাগ তার সম্পাদিত চুক্তিকে প্রভাবিত করে না, যা পূর্বে [সমরনীতি অধ্যায়ে] জানা গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উকিলের ওকালাহ বাতিল হওয়ার সুরতসমূহ উল্লেখ করেন।

পূর্বে একথা আলোচনা হয়েছে যে, ওকালাহর কিছু কিছু সুরত এমন আছে যাতে মুওয়াক্কিল তার উকিলকে অপসারণের অধিকার রাখে এবং এ ক্ষেত্রে অন্যের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। আর কিছু ওকালাহ এমনও আছে যাতে বাদীর সম্মতি ছাড়া মুওয়াক্কিল তার উকিলকে অপসারণ করতে পারে না।

সুতরাং যে সকল অবস্থায় মুওয়াক্কিল তার উকিলকে অন্যের সম্মতি ছাড়াই অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে, সে সকল অবস্থাতে যদি মুওয়াক্কিল মারা যায়, কিংবা তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, কিংবা সে মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় তাহলে ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার দলিল উল্লেখ করেন। দলিলটি তিনটি উসূলী ধারার সাথে সম্পৃক্ত, তা হলো–

১. إِنَّ التَّوْكِيْلَ تَصَرُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ : ওকালাহ এমন একটি চুক্তি যাতে কারো উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তাতে মুওয়াক্কিল যে কোনো সময় উকিলকে ওকালাহ থেকে বরখাস্ত করার অধিকার রাখে, এমনিভাবে উকিলও যে কোনো সময় তার মুওয়াক্কেলের সম্মতি ছাড়াই ওকালাহ বর্জন করার অধিকার রাখে।

২. কায়দা হলো– যে সকল চুক্তিতে চুক্তি সম্পাদনকারী কোনো পক্ষের উপর কোনো প্রকারের বাধ্যবাধকতা নেই সে সকল চুক্তির স্থায়িত্বের প্রতিটি মুহূর্তের হুকুম তার সূচনালগ্নের মতো। অর্থাৎ এসব চুক্তি সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদনকালে উভয় পক্ষের মাঝে যে সকল গুণাগুণ বিদ্যমান থাকা শর্ত, চুক্তি স্থায়িত্বশীল হওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তেই চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের সাথে সে সকল গুণাগুণ বিদ্যমান থাকা শর্ত। সেগুলোর কোনো একটি গুণ কোনো সময় অনুপস্থিত হলে সে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ কায়দার পেছনে রহস্য হলো, বাধ্যবাধকতাহীন চুক্তির সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের যেহেতু যে কোনো সময় চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকে, তাই প্রতিটি মুহূর্তের অতিক্রমের মাধ্যমেই মৌলিকভাবে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, তবে ঐ চুক্তি বাতিলের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে যেন বারবার সে চুক্তিকে নবায়ন করে যাচ্ছে। তাই এসব চুক্তির স্থায়িত্বের প্রতিটি মুহূর্তই নতুন নতুন চুক্তির নামান্তর। আর যেহেতু এসব সম্পাদনকালে সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের সাথে কিছু শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তাই এসব চুক্তি স্থায়ী হলে তার স্থায়িত্বের প্রতিটি মুহূর্তে ঐ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হবে। ঐ সকল শর্তের অনুপস্থিতিতে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. ওকালাহ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য ব্যক্তির أَمْر [তথা আদেশদানের ক্ষমতা বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা] আবশ্যক। أَمْر না থাকলে ওকালাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃত হলে, অথবা কাফের হয়ে দারুল হরবে চলে গেলে উক্ত ব্যক্তির أَمْر বাতিল হয়ে যায়। তাই উকিল কিংবা মুওয়াক্কিলের মাঝে এ তিনটি উপাদানের কোনো একটি পাওয়া গেলে এর দ্বারা ওকালাহও বাতিল হয়ে যাবে।

আর যেহেতু ওকালাটা বাধ্যবাধকতাহীন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তাই ২নং ধারা অনুসারে উকিল কিংবা মুওয়াক্কিল কারো মাঝে এ তিনটি কোনো একটি উপাদান যে কোনো সময় পাওয়া গেলেই ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَشَرْطُ اَنْ يَكُوْنَ الْجُنُوْنُ الخ : মুসান্নিফ (র.) ওকালাহ বাতিল হওয়ার যে তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন এই ইবারতে এর ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। তিনটি উপাদানের মধ্য থেকে প্রথমটি হলো اَلْجُنُوْنُ الْمُطْبِقُ এখানে اَلْمُطْبِقُ শব্দটি بَا ,হরফটিকে [যের] كَسْرَه -এর সাথে পড়া হবে। তা اَلْإِطْبَاقُ থেকে নির্গত اِسْم فَاعِلْ -এর শব্দ, যার অর্থ হলো اَلدَّائِمُ তথা স্থায়ী।

মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে (اِطْبَاقْ) স্থায়ী সূত্রে বিকৃতি হওয়ার শর্ত করার কারণ হলো সাধারণ মাত্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়া এটা সংজ্ঞাহীনতার অন্তর্ভুক্ত আর সংজ্ঞাহীনতার দ্বারা ব্যক্তির কর্তৃত্ব বাতিল হয় না, ফলে এর কারণে ওকালাহ বাতিল হতে পারে না। তবে যদি পূর্ণাঙ্গ মাস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তার মেয়াদ স্থায়ী হয় তাহলে এ বিকৃতির কারণে ব্যক্তির কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায় বিধায় এর কারণে ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যক্তি মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় কতক্ষণ থাকলে তাকে পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী বিকৃতি ধরা হবে, এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ইমামদের থেকে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

১. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে جُنُوْن مُطْبِقْ -এর মেয়াদ হলো এক মাস।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় একদিন এক রাতের কিছু বেশি সময়কে جُنُوْن مُطْبِقْ -এর মেয়াদ বলা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়।

৩. অপর এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে جُنُوْن مُطْبِقْ -এর মেয়াদ হলো এক বছর।

প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে রমজানের রোজার সাথে কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির যদি রমজানের পূর্ণ মাসেই মস্তিষ্ক বিকৃত থাকে তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর উক্ত মাসের রোজা কাজা করা আবশ্যক নয়। অতএব এক মাস মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে যদি রোজার মতো আল্লাহ তা'আলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তার জিম্মা থেকে রহিত হতে পারে তাহলে ওকালাহর মতো সাধারণ একটি দুনিয়াবি লেনদেন এ কারণে তার থেকে রহিত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর দ্বিতীয় মতটিতে এ বিষয়টিকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ কেউ যদি এক দিন এক রাত পরিমাণ সময় অচেতন থাকে তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান তার থেকে রহিত হয়ে যায়। অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাকে কাজা করতে হয় না। অতএব এ পরিমাণ সময় অচেতন থাকার কারণে নামাজের মতো ইবাদাতে ইলাহী ব্যক্তির জিম্মা থেকে রহিত হওয়ার মাধ্যমে, এ পরিমাণ সময় অচেতন থাকার দ্বারা ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

আর তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক جُنُوْن مُطْبِقْ -এর মেয়াদ এক বছর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়টির ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো ইবাদতের সাথে তাকে কিয়াস না করে এমন একটি মেয়াদ নির্বাচন করেছেন যার দ্বারা সব ধরনের ইবাদত ব্যক্তির জিম্মা থেকে রহিত হয়। আর তা হলো এক বছর সময়। আল্লামা হাকিম শহীদ (র.) তাঁর আল-কাফী (اَلْكَافِيْ) নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ অভিমতটিকেই সর্ববিশুদ্ধ মত বলে নির্বাচন করেছেন। –[নাতায়িজুল আফকার– খ. ৮, পৃ. ১৪৮]

قَوْلُهُ قَالَ اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ فِى اللِّحَاقِ الخ : মাশায়েখে কেরাম বলেন, কুদূরীর উল্লিখিত ইবারত অনুসারে মুওয়াক্কিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেলে ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিধানটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে বলা হয়েছে। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তার সকল প্রকার লেনদেন মওকুফ [স্থগিত] হয়ে যায়। যদি সে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে তাহলে সে সকল লেনদেন চুক্তি সম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে। নতুবা তা বাতিল হয়ে যাবে। এ ভিত্তিতে মুরতাদ ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে ফিরে না এসে যদি দারুল হরবে চলে যায় তাহলে তার ওকালাহর চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে

তবে সাহেবাইন (র.)-এর মতে মুরতাদ কর্তৃক সকল লেনদেনই বৈধ এবং সঠিক হয়ে থাকে ফলে তার ওকালাহও সঠিক এবং বৈধ হবে। অতএব সাহেবাইনের মতানুসারে মুরতাদ ব্যক্তি যদি মারা যায় কিংবা মুরতাদ হওয়ার অপরাধে তাকে হত্যা করা হয় অথবা কাজি কর্তৃক সে হরবী হিসেবে ফরমান জারি করা হয় তাহলেই কেবল তার ওকালাহ বাতিল হবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ فِى السِّيَرِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন- كِتَابُ السِّيَرِ [তথা ইসলামের সমরনীতি সংক্রান্ত অধ্যায়ে] এ সংক্রান্ত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। একথাটির দ্বারা মুসান্নিফ (র.) হিদায়া ২য় খণ্ডের ৬০৩ নং পৃষ্ঠার নীচের দিকে উল্লিখিত নিম্নোক্ত ইবারতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন-

قَالَ وَمَا بَاعَهُ (اَيِ الْمُرْتَدُّ) اَوِ اشْتَرَاهُ اَوْ اَعْتَقَهُ اَوْ وَهَبَهُ اَوْ رَهَنَهُ اَوْ تَصَرَّفَ فِيْهِ مِنْ اَمْوَالِهِ فِىْ حَالِ رِدَّتِهِ فَهُوَ مَوْقُوْفٌ، فَاِنْ اَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُوْدُهُ وَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح) يَجُوْزُ مَا صَنَعَ فِى الْوَجْهَيْنِ ...... الخ -

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ اِمْرَاَةً الخ : মহিলা যদি মুওয়াক্কিল হয় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে গেলেও তার উকিল ওকালায় বহাল থাকবে। ফলে মহিলার মৃত্যু কিংবা দারুল হরবে গিয়ে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে উক্ত উকিলের সকল লেনদেন বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে পুরুষ মুওয়াক্কিল যদি মুরতাদ হয় তাহলে তার মৃত্যু কিংবা দারুল হরবে গিয়ে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে তার উকিলের কোনো প্রকার লেনদেনই বৈধ নয়; বরং এমতাবস্থায় উকিলের সকল লেনদেনকে মওকুফ [স্থগিত] ধরা হবে। মুরতাদ মুওয়াক্কিল যদি পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে তাহলে সে সকল লেনদেনকে বৈধতার হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি ইসলাম ধর্মে ফিরে না এসে দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয় কিংবা মুরতাদ হওয়ার অপরাধে নিহত হয় কিংবা এমনিতেই মারা যায় তাহলে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকেই ওকালাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব এমতাবস্থায় মুরতাদ হওয়ার পরে উকিল কোনো লেনদেন করে থাকলে তা বাতিল ধরা হবে।

মহিলা মুওয়াক্কিল ও পুরুষ মুওয়াক্কিলের মাঝে মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে বিধানগত এ পার্থক্য নির্ণয়ের কারণ হিসেবে মুসান্নিফ (র.) বলেন- لِاَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِىْ عُقُوْدِهَا অর্থাৎ মহিলা যদি মুরতাদ হয় তাহলে তার মুরতাদ হওয়াটা তার সার্বিক লেনদেনের বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। ফলে মুরতাদ হওয়ার পর মহিলা যদি কোনো লেনদেন করে তা যেমন বৈধ হয় তেমনিভাবে তার পক্ষ থেকে তার উকিল যদি কোনো লেনদেন করে তাও বৈধ হবে। পক্ষান্তরে পুরুষ যদি মুরতাদ হয় তাহলে তার নিজের মালের মাঝে তার (تَصَرُّفٌ) হস্তক্ষেপে স্থগিতাদেশ আসার দরুন তার পক্ষ থেকে তার উকিলের সকল (تَصَرُّفَاتٌ) হস্তক্ষেপ ও লেনদেনের বৈধতার বিধানকেও স্থগিত (مَوْقُوْفٌ) রাখা হবে।

আর মুরতাদ হওয়ার পর মহিলা কোনো লেনদেন করলে তা বৈধ হবে- একথাটি এর থেকে বুঝা যায় যে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে মহিলাকে হত্যা করা হয় না। আর এ কারণেই মুসান্নিফ (র.) বলেন- لِاَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِىْ عُقُوْدِهَا এখানে على مَا عُرِفَ [যা পূর্বে জানা গেছে] ইবারতটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) [كِتَابُ السِّيَرِ] সমরনীতি অধ্যায়ে [بَابُ اَحْكَامِ الْمُرْتَدِّيْنَ] মুরতাদের বিধান সংক্রান্ত আলোচনায় হিদায়া ২য় খণ্ডের ৬০০ পৃষ্ঠার শেষ লাইন اَمَّا الْمُرْتَدَّةُ فَلَا تُقْتَلُ ... الخ ইবারতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَالَ : وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ اَوِ الْمَاذُوْنُ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَالشَّرِيْكَانِ فَافْتَرَقَا فَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ عَلَى الْوَكِيْلِ عَلِمَ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ بَقَاءَ الْوَكَالَةِ يَعْتَمِدُ قِيَامَ الْاَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِالْحَجْرِ وَالْعَجْزِ وَالْاِفْتِرَاقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ لِاَنَّ هٰذَا عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ اِذَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে উকিল নিযুক্ত করে এরপর কিতাবাতের অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে, কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম উকিল নিয়োগের পর নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, অথবা দুই শরিকের মধ্যে থেকে কেউ উকিল নিয়োগের পর তারা শরিকানা থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এ সকল কারণে উকিলের ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে, উকিল এসব ব্যাপারে অবগত হোক কিংবা না হোক। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, ওকালাহ-এর স্থায়িত্ব নিয়োগাদেশ ক্ষমতার বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে, আর ব্যবসা করতে নিষেধাজ্ঞা কিংবা কিতাবতের অর্থ পরিশোধে অক্ষমতার [কারণে দাসের] এবং শরিকানা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে [শরিকের] আদেশদানের ক্ষমতা বাতিল হয়ে গেছে। আর অবগতি ও অনবগতির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা এটা হলো শরিয়তের বিধানগত অপসারণ। সুতরাং তা অবগতির উপর নির্ভর করবে না যেমন বিক্রয়ের উকিলের ক্ষেত্রে মুওয়াক্কিল নিজেই যদি তা বিক্রয় করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ الخ : পূর্বে বলা হয়েছে যে, ওকালাহ -এর চুক্তি সম্পাদন এবং তা স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য মুওয়াক্কিলের সার্বক্ষণিকভাবে (ذَوِى الْاَمْرِ) আপন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আদেশদানের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। মুওয়াক্কিল যদি কোনো কারণে তার (اَمْر) আপন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা আদেশদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে ঐ ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এ নীতির ভিত্তিতে ওকালাহ বাতিল হয়ে যায় এমন তিনটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। মাসআলা তিনটির সূরতে মাসআলা হলো−

১. মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে উকিল নিয়োগ করার পর কিতাবতের দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে ঐ ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ গোলাম মৌলিকভাবে নিজের ব্যাপারে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ারই অধিকার রাখে না। তবে যদি সে তার মনিবের সাথে মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে মুক্ত হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে এ চুক্তির মাধ্যমে সে اَمْر আপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। ফলে সে উকিল নিয়োগ করলে নিয়োগ বৈধ হয়। শরিয়তের পরিভাষায় এমন গোলামকে মুকাতাব গোলাম বলে। মুক্তিপণ আদায়ের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুকাতাব গোলাম (ذَوِى الْاَمْرِ) আপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার মুক্তিপণ আদায়ে সে অক্ষম হলে তার কিতাবাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং সে পূর্বের মতো অধিকারহীন গোলামে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তার (اَمْر) সিদ্ধান্তের অধিকার রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তার নিয়োগকৃত উকিলের ওকালত বাতিল হয়ে যাবে।

২. (عَبْد مَاذُوْن) অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, অর্থাৎ যে গোলামকে তার মালিক ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়ার কারণে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার লাভ করেছে, সে গোলাম যদি তার মালিকের পক্ষ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তার নিয়োগকৃত উকিলের ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সে (عَبْد مَاذُوْن) অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল ততক্ষণ সে (ذَوِى الْاَمْر) সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়ার কারণে তার উকিল নিয়োগ বৈধ ছিল। কিন্তু বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর তার [اَمْر] সিদ্ধান্তের অধিকার বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে তার ওকালাহও বাতিল হয়ে যাবে।

৩. শরিকানা ভিত্তিতে ব্যবসা করে এমন দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই একে অপরের মাল বিনিয়োগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। ফলে শরিকানা চুক্তিতে বহাল থাকা অবস্থায় উভয়ের যৌথ মালিকানার মাল বিনিয়োগ দেওয়ার জন্য দুই শরিকের মধ্য থেকে যে কোনো একজন যদি কাউকে ওকীল নিয়োগ করে তাহলে এই ওকালাহ বৈধ হয়। কিন্তু যখন তারা শরিকানা থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তখন তাদের পরস্পরের মালের মাঝে অন্যের (اَمْر) বিনিয়োগের অধিকার রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সকল সুরতে মুকাতাব গোলাম তার কিতাবতের দেনা পরিশোধে অক্ষম হওয়া, (عبد ماذون) অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তার মনিবের পক্ষ থেকে ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং শরিক দুই ব্যক্তির শরিকানা বাতিল হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উকিল অবহিত হোক বা না হোক এর দ্বারা ওকালাহ বাতিল হওয়ার কারণে উকিলের যে অপসারণ হয় তা হলো নীতিগত অপসারণ, যাতে মুওয়াক্কিল কিংবা উকিলের মোটেও এখতিয়ার থাকে না, ফলে এরূপ অপসারণ উকিলের অবগতি পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে, উকিলের অপসারণ দুধরনের হয়ে থাকে। এক হলো [عَزْل قَصْدِىْ وَاخْتِيَارِىْ] এখতিয়ারভুক্ত অপসারণ। যেখানে উকিলের অপসারণটা মুওয়াক্কিলের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল হয়। এরূপ অপসারণের জন্য উকিলের অবগতি শর্ত। উকিল অপসারণের ব্যাপারে অবগত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ অপসারণ [مَوْقُوْف] স্থগিত থাকে।

আর দ্বিতীয় হলো- [عَزْل حُكْمِىْ] নীতিগত অপসারণ, যেখানে উকিলের অপসারণটা মুওয়াক্কিলের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের উপর নির্ভশীল নয়। এরূপ অপসারণের জন্য উকিলের অবগতি শর্ত নয়।

উল্লেখ্য যে, [وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ] উকিলের অবগতি ও অনবগতির মাঝে বিধানগত পার্থক্য না হওয়ার বিষয়টি কেবল উল্লিখিত তিনটি মাসআলার সাথেই যুক্ত নয়; বরং যে সকল স্থানে মুওয়াক্কিলের [اَمْر] স্বয়ংসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের অধিকার বাতিল হওয়ার কারণে ওকালাহ বাতিল হয় সেসব স্থানেই এ বিধানটি প্রযোজ্য।

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيْلُ أَوْ جُنَّ جُنُوْنًا مُطْبِقًا بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ لِاَنَّهُ لَا يَصِحُّ اَمْرُهُ بَعْدَ جُنُوْنِهِ وَمَوْتِهِ وَاِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ اِلَّا اَنْ يَعُوْدَ مُسْلِمًا قَالَ (رض) وَهٰذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ(رحـ) فَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَعُوْدُ الْوَكَالَةُ لِمُحَمَّدٍ(رحـ) اَنَّ الْوَكَالَةَ اِطْلَاقٌ لِاَنَّهُ رَفْعُ الْمَانِعِ اَمَّا الْوَكِيْلُ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ وَاِنَّمَا عَجَزَ بِعَارِضِ اللِّحَاقِ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ فَاِذَا زَالَ الْعَجْزُ وَالْاِطْلَاقُ بَاقٍ عَادَ وَكِيْلًا وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ اِثْبَاتُ وِلَايَةِ التَّنْفِيْذِ لِاَنَّ وِلَايَةَ اَصْلِ التَّصَرُّفِ بِاَهْلِيَّةٍ وَوِلَايَةُ التَّنْفِيْذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللِّحَاقِ لَحِقَ بِالْاَمْوَاتِ وَبَطَلَتِ الْوِلَايَةُ فَلَا تَعُوْدُ كَمِلْكِهِ فِىْ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَا تَعُوْدُ الْوَكَالَةُ فِى الظَّاهِرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهَا تَعُوْدُ كَمَا قَالَ فِى الْوَكِيْلِ وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ اَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِىْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ وَفِىْ حَقِّ الْوَكِيْلِ عَلٰى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزُلْ بِاللِّحَاقِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উকিল যদি মারা যায়, কিংবা স্থায়ী মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয় তাহলে ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মস্তিষ্ক বিকৃতির পর এবং মৃত্যুর পর তার আদিষ্ট হওয়া সিদ্ধ হয় না। আর যদি উকিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে পলায়ন করে তাহলে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কর্ম সম্পাদন জায়েজ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ওকালাহ পুনর্বহাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, উকিল নিয়োগের অর্থ হলো অবাধ কর্ম সম্পাদনের অধিকার প্রদান, কারণ তার উদ্দেশ্যই হলো বাধা দূরীকরণ। আর উকিল তো এমন কিছু গুণাবলি বলেই কর্ম সম্পাদন করে থাকে যা তার সত্তায় বিদ্যমান। মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোনো যোগ্যতার বলে নয়] তবে পলায়নের ফলে দুই আবাসভূমির ভিন্নতার উপসর্গের আবর্তনে সে কর্ম সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সুতরাং মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে দেওয়া অবাধ কর্ম সম্পাদনের অধিকার বহাল থাকা অবস্থায় যখন এ অক্ষমতা দূর হয়ে যাবে তখন [স্বাভাবিকভাবেই] সে উকিল রূপে যথাপূর্ব বহাল থাকবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো উকিল নিয়োগ করার অর্থ হলো কর্ম সম্পাদন কার্যকর করার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা। কেননা কর্মসম্পাদনের মূল কর্তৃত্ব অর্জিত হয় তার নিজস্ব যোগ্যতা বলে, আর কার্যকর করার কর্তৃত্ব অর্জিত হয় মালিকানা বলে আর দারুল হরবে চলে যাওয়ার দ্বারা সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং তার কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে গেল। সুতরাং তা আর পুনরায় ফিরে আসবে না। যেমনিভাবে উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের ক্ষেত্রে তার [মুরতাদের] মালিকানা [রহিত হওয়ার পর তা] পুনরায় ফিরে আসে না। আর মুওয়াক্কিল যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে ফিরে আসে তাহলে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে উকিলের ওকালাহ পুনর্বহাল হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)

থেকে প্রাপ্ত অন্য এক বর্ণনা মতে, ওকালাহ [এক্ষেত্রেও] পুনর্বহাল হবে যেমনটি তিনি উকিলের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে [উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে] তাঁর পার্থক্যকরণে যুক্তি হলো, মুওয়াক্কিলের ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগের ভিত্তি হলো তার মালিকানা আর তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে উকিলের ক্ষেত্রে [ওকালাহর] ভিত্তি হলো তার ঐ গুণ যা তার সত্তার সঙ্গে বিদ্যমান, আর দারুল হরবে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তা বিলুপ্ত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيْلُ الخ : পূর্বের ইবারতে মুওয়াক্কিলের সাথে সংযুক্ত যে সকল উপসর্গের কারণে ওকালাহ বাতিল হয়, সেগুলোর আলোচনার পর আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উকিলের সাথে সম্পর্কিত ওকালাহ বাতিল হওয়ার উপসর্গসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উকিলের সাথে সম্পর্কিত তিনটি উপসর্গের কথা আলোচনা করেছেন যার দ্বারা উকিলের ওকালাহ বাতিল হয়ে যায়, উপসর্গ তিনটি হলো–

১. উকিলের মৃত্যু।

২. উকিলের স্থায়ীসূত্রে পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা।

৩. উকিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়া।

উল্লিখিত তিনটি উপসর্গের মধ্য হতে প্রথম দুটির মাধ্যমে ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টি ইত্তেফাকী, অর্থাৎ এর দ্বারা ওকালাহ বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো দ্বিমত নেই। আর তৃতীয়টির মাধ্যমে ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টি হলো ইখতিলাফী অর্থাৎ এর দ্বারা ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিছুটা দ্বিমত রয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ بَعْدَ جُنُوْنِهِ وَمَوْتِهِ : প্রথম দুটি উপসর্গের দ্বারা ওকালাহ বাতিল হওয়ার পক্ষে যৌক্তিক কারণ দর্শাতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন– لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْرُهُ الخ অর্থাৎ ব্যক্তি পাগল হলে কিংবা মারা গেলে তাকে আদেশ করা সঠিক হয় না। দলিলটির বিশ্লেষণ হলো, ওকালাহ একটি বাধ্যবাধকতাহীন এমন অস্থায়ী চুক্তি যা স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিলের প্রতি নিয়োগাদেশ প্রয়োজন। যাতে করে বাধ্যবাধকতা না থাকার দরুন প্রতিটি মুহূর্তেই ওয়াকালাহ বাতিল হওয়ার স্থলে নিয়োগাদেশের মাধ্যমে তার নবায়ন হতে পারে। আর এ নিয়োগাদেশের জন্য মুওয়াক্কিলের মাঝে যেমনিভাবে সর্বদা আদেশদানের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক তেমনিভাবে উকিলের মাঝেও সেই আদেশ গ্রহণের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকাও আবশ্যক। অতএব উকিলের মৃত্যু হয়ে গেলে কিংবা তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে যেহেতু তার আদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাই এ দুটি উপসর্গের দ্বারা ওকালাহ এর চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا الخ : উকিলের সাথে সম্পর্কিত ওকালাহ বাতিল হওয়ার তৃতীয় উপসর্গটি হলো, উকিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়া। এক্ষেত্রে কাজি যদি তাকে দারুল হরবের অধিবাসী হিসেবে ফরমান জারি করে তখনই কেবল এর দ্বারা ওকালাহ বাতিল সাব্যস্ত হবে। তবে কাজির ফরমান জারি করার পূর্ব পর্যন্ত মুরতাদ থাকাকালে উকিল হিসেবে তার কোনো লেনদেনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

হ্যাঁ, উকিল যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করত ইসলামি রাষ্ট্রে চলে আসে, তাহলে পূর্বের নিয়োগের ভিত্তিতে মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে উকিল হিসেবে তার লেনদেন বৈধ হবে কিনা এ বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তখন উকিল হিসেবে পূর্ববর্তী মুওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে তার লেনদেন বৈধ হবে এবং সে আগের ওকালায় বহাল থাকবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে [কাজির ফয়সালার মাধ্যমে] একবার ওকালাহ বাতিল হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে ফিরে এলে তার ওকালাহ পুনর্বহাল হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যকার এ মতবিরোধের ভিত্তি হলো ওকালাহ-এর উদ্দেশ্য কি তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের পারস্পরিক নীতিগত মতবিরোধের উপর। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মনে করেন যে, উকিল তার নিজের মাঝে অন্তর্নিহিত কিছু যোগ্যতা বলে কোনো কাজ সম্পাদন করে থাকে। ওকালাহ-এর চুক্তি তার মাঝে কাজ সম্পাদন করার জন্য নতুন এমন কোনো যোগ্যতার সৃষ্টি করে না যা বিলুপ্ত হয়ে গেলে এ চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। তবে ওকালাহর চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে মুওয়াক্কিলের সম্পত্তিতে উকিলের যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে একটি বাধা ছিল। অন্যের মালের মাঝে [বেচাকেনা, হিবা, সদকামূলক] কারো কোনো হস্তক্ষেপকে শরিয়ত অবৈধ ঘোষণা করত, ওকালাহর চুক্তির মাধ্যমে উকিলের উপর থেকে শরিয়ত কর্তৃক উক্ত বাধাটুকু দূর হয়ে যায় এবং উকিলের জন্য তার মুওয়াক্কিলের মাল দিয়ে (تَصَرُّفٌ) কর্মসম্পাদন করার দ্বার খুলে যায়। ফলে মুওয়াক্কিলের মাল দিয়ে সে অবাধে মুওয়াক্কিলের পক্ষে কাজ করে যেতে পারে। এরই মধ্যে যদি সে উকিল মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে পাড়ি জমায়, রাষ্ট্রের ভিন্নতার কারণে সে থাকাকালীন সে মুওয়াক্কিলের কর্ম সম্পাদনে অক্ষম হয়। সুতরাং মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসলে যেহেতু সে অক্ষমতা কেটে যায় তাই দারুল ইসলামে মুসলমান হয়ে ফিরে আসার পর সে মুওয়াক্কিলের মাল দিয়ে তার পক্ষে কর্ম সম্পাদন করতে পারাটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ মুওয়াক্কিলের মালে [تَصَرُّفٌ] হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ওকালাহ চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত তার অবাধ অধিকার এখনো রহিত হয়নি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মনে করেন, ব্যক্তির মাঝে কর্ম সম্পাদনের মৌলিক যোগ্যতা অন্তর্নিহিত থাকলেও অন্যের সম্পদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করার ক্ষমতা তার মাঝে থাকে না। আর ওকালাহর চুক্তি ব্যক্তির জন্য অন্যের [মুওয়াক্কিলের] সম্পদে তার মাঝে অন্তর্নিহিত কর্ম সম্পাদন যোগ্যতাকে কার্যকর করার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করে যার ফলে উকিল তার মুওয়াক্কিলের মাল দিয়ে কোনো লেনদেন করলে তা কার্যকর হয়। আর ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে পাড়ি জমালে যেহেতু তার উক্ত কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে সে মৃতদের কাতারে সাব্যস্ত হয়, তাই দারুল ইসলামে ফিরে আসার দ্বারা তার সে হৃত অধিকার আর ফিরে আসবে না।

قَوْلُهُ كَمِلْكِهِ فِىْ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ : মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে ওকালাহ বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মুরতাদ ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার গোলামের মালিকানা বাতিল হওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। বিষয় দুটির মাঝে মিল খুঁজে পাওয়ার দিক হলো, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মাঝে যেমনিভাবে ব্যক্তির অস্থায়ী সূত্রে মালিকানা থাকে, তেমনিভাবে ওকালাহ চুক্তির মাধ্যমেও উকিল তার মুওয়াক্কিলের মালের মাঝে হস্তক্ষেপের মালিকানা অর্জন করে থাকে। অতএব মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেলে যেমনিভাবে ব্যক্তির মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আজাদ হয়ে যায় এবং মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে আসলে তাদের উপর তার মালিকানা পুনরায় ফিরে আসে না তেমনি ওকালাহর ভিত্তিতে অর্জিত হস্তক্ষেপ করার অস্থায়ী মালিকানাও মুরতাদ হওয়ার অপরাধে বাতিল হওয়ার পর পুনরায় ফিরে না আসা উচিত।

قَوْلُهُ وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ الخ : মুওয়াক্কিল যদি দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে আসে তাহলে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে ওকালাহ পুনরায় বহাল হবে না। পক্ষান্তরে উকিল যদি দারুল হরব থেকে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে তার ওকালাহ পুনর্বহাল হয়ে যায়। উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে বিধানগত এ পার্থক্য নির্ণয়ের কারণ কি? তা বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন– মুআক্কিলের ক্ষেত্রে ওকালাহর ভিত্তি হলো মালের মাঝে তার মালিকানা। আর মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেলে যেহেতু ব্যক্তির সকল মালের মালিকানা বাতিল হয়ে যায় তাই মালিকানা বাতিল হওয়ার কারণে ওকালাহও বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে উকিলের ক্ষেত্রে [ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে] ওকালাহর ভিত্তি হলো ব্যক্তির মাঝে অন্তর্নিহিত যোগ্যতা, আর মুরতাদ হওয়ার দ্বারা যেহেতু ব্যক্তির সেই যোগ্যতা বিলুপ্ত হয় না তাই ওকালাহও বাতিল হবে না।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে [নাওয়াদিরের] অপ্রসিদ্ধ একটি বর্ণনা মতে, এক্ষেত্রে উকিল ও মুওয়াক্কিলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে ফিরে এলে উকিলের ওকালাহ যেমনিভাবে পুনর্বহাল হয়, তেমনিভাবে মুওয়াক্কিলের ওকালাহও পুনর্বহাল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنْ وَكَّلَ اٰخَرَ بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ بِنَفْسِهٖ فِيْمَا وَكَّلَ بِهٖ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ وَهٰذَا اللَّفْظُ يَنْتَظِمُ وُجُوْهًا مِثْلُ اَنْ يُوَكِّلَهُ بِاِعْتَاقِ عَبْدِهٖ اَوْ بِكِتَابَتِهٖ فَاَعْتَقَهُ اَوْ كَاتَبَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهٖ اَوْ يُوَكِّلَهُ بِتَزْوِيْجِ اِمْرَأَةٍ اَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ بِنَفْسِهٖ اَوْ يُوَكِّلُ بِطَلَاقٍ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثَلٰثًا اَوْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا اَوْ بِالْخُلْعِ فَخَالَعَهَا بِنَفْسِهٖ لِاَنَّهُ لَمَّا تَصَرَّفَ بِنَفْسِهٖ تَعَذَّرَ عَلَى الْوَكِيْلِ التَّصَرُّفُ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে কোনো বিষয়ে উকিল নিয়োগ করে এরপর ঐ বিষয়ে সে নিজেই কর্ম সম্পাদন করে ফেলে, তাহলে ওকালাহ্ বাতিল হয়ে যাবে। এ বক্তব্য বেশ কয়েকটি সুরতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, গোলামকে আজাদ করার জন্য কিংবা গোলামের সঙ্গে কিতাবত চুক্তি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। পরে মুওয়াক্কিল নিজেই তাকে আজাদ করল কিংবা তার সঙ্গে কিতাবত চুক্তি করল। অথবা কোনো নির্দিষ্ট মহিলার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়া বা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু ক্রয় করে দেওয়ার জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করল এবং পরে সে নিজেই তা করে ফেলল। অথবা তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করল তারপর [সেই মুওয়াক্কিল] স্বামী নিজেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলল কিংবা এক তালাক দিল আর ইদ্দত পার হয়ে গেল, অথবা স্ত্রীর সাথে খোলা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল তারপর সে নিজেই তার সাথে খোলা করল [এসব সুরত উপরিউক্ত বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।] কেননা যখন সে নিজেই কর্ম সম্পাদন করে ফেলল, তখন উকিলের পক্ষে পুনঃ কর্ম সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার ফলে ওকালাহ্ বাতিল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ وَكَّلَ اٰخَرَ بِشَيْءٍ اِلخ : 'কেউ কাউকে উকিল নিয়োগ করার পর যদি সে [মুওয়াক্কিল] নিজেই উক্ত কার্য সম্পাদন করে ফেলে তাহলে ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে।' ইমাম কুদূরী (র.) এ ইবারতটি ওকালাহ বাতিল হওয়ার একটি বড় ধরনের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা ওকালাহ সংক্রান্ত অসংখ্য মাসআলার সামাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

মুসান্নিফ (র.) এখানে এ নীতির আওতায় ছয়টি মাসআলা উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কেউ নিজের কোনো গোলাম আজাদ করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করার পর নিজেই আজাদ করে ফেলে।
২. যদি কেউ নিজের কোনো গোলামের সাথে কিতাবতের চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য কাউকে উকিল বানানোর পর নিজেই সে চুক্তিসম্পন্ন করে ফেলে ।
৩. যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট নারীকে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করানোর জন্য উকিল বানানোর পর নিজেই তকে বিয়ে করে ফেলে।
৪. যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করার জন্য কাউকে উকিল নিয়াগ করার পর নিজেই তা ক্রয় করে ফেলে।
৫. যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করার পর নিজেই তাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। অথবা এক তালাক প্রদান করে এবং তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়।
৬. যদি কেউ স্ত্রীর সাথে খোলা'র চুক্তি সম্পাদন করানোর জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করার পর নিজেই 'খোলা' চুক্তি সম্পাদন করে ফেলে।

এসব সুরতে মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলের কার্য সম্পাদন হয়ে যাওয়ার কারণে উকিলের ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ মুওয়াক্কিল যখন নিজেই তার কার্য সম্পাদন করে ফেলল, তখন তার উক্ত কাজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় উকিল পুনরায় উক্ত কাজ করতে অক্ষম, কাজেই এমতাবস্থায় উকিলের ওয়াকালাহ বাতিল হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

حَتّٰى لَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهٖ وَاَبَانَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِاَنَّ الْحَاجَةَ قَدِ انْقَضَتْ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَزَوَّجَهَا الْوَكِيْلُ وَاَبَانَهَا لَهٗ اَنْ يُزَوِّجَ الْمُوَكِّلَ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهٗ بِبَيْعِ عَبْدِهٖ فَبَاعَهٗ بِنَفْسِهٖ فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ فَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهٗ لَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يَبِيْعَهٗ مَرَّةً اُخْرٰى لِاَنَّ بَيْعَهٗ بِنَفْسِهٖ مَنْعٌ لَهٗ مِنَ التَّصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَزْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَهٗ اَنْ يَبِيْعَهٗ مَرَّةً اُخْرٰى لِاَنَّ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ لِاَنَّهٗ اِطْلَاقٌ وَالْعَجْزُ قَدْ زَالَ بِخِلَافِ مَا اِذَا وَكَّلَهٗ بِالْهِبَةِ فَوَهَبَ بِنَفْسِهٖ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يَهَبَ ثَانِيًا لِاَنَّهٗ مُخْتَارٌ فِى الرُّجُوْعِ فَكَانَ دَلِيْلُ عَدَمِ الْحَاجَةِ اَمَّا الرَّدُّ بِقَضَاءٍ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِهٖ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيْلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ فَاِذَا عَادَ اِلَيْهِ قَدِيْمُ مِلْكِهٖ كَانَ لَهٗ اَنْ يَبِيْعَهٗ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : এমনকি যদি সে নিজেই ঐ মহিলাকে বিবাহ করে ফেলে অতঃপর তাকে বায়েন তালাক প্রদান করে, তখন উকিল তাকে দ্বিতীয়বার তার কাছে বিবাহ সম্পাদন করতে পারবে না। কেননা বিবাহের প্রয়োজনপূর্ণ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি উকিল নিজেই ঐ মহিলাকে বিবাহ করে থাকে এবং তাকে বায়েন তালাক প্রদান করে, তাহলে সে তাকে মুওয়াক্কিলের কাছে বিবাহ সম্পাদন করতে পারবে। কারণ মুওয়াক্কিলের বিবাহের প্রয়োজন রয়ে গেছে। অদ্রূপ উকালাহ বাতিল হয়ে যাবে] যদি সে তার গোলামকে বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে অতঃপর নিজেই তাকে বিক্রি করে। তবে বিক্রির পর যদি দোষের কারণে আদালতের মাধ্যমে গোলামটি তার কাছে ফেরত দেওয়া হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দ্বিতীয়বার বিক্রি করার অধিকার উকিলের নেই। কারণ তার নিজের বিক্রি করার অর্থ ছিল উকিলকে কর্ম সম্পাদন থেকে বাধা দেওয়া। সুতরাং এটা তাকে অপসারণের মতো হলো। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উকিল তাকে দ্বিতীয়বার বিক্রি করতে পারবে। কারণ উকিল নিয়োগের অর্থ যেহেতু কর্ম সম্পাদনে বাধা প্রত্যাহার করা [আর তা বহাল রয়েছে] তাই ওকালাহ এখনো বহাল রয়েছে। আর বিক্রয়ের অক্ষমতা দূরীভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি গোলামকে হেবা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে অতঃপর নিজেই হেবা করে দেয় তারপর যদি গোলামকে রুজু করে ফেরত নিয়ে আসে তাহলে উকিলের জন্য দ্বিতীয়বার হেবা করার অধিকার থাকবে না। কারণ মুওয়াক্কিল ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্ত, সুতরাং তা হেবা করার প্রয়োজন না থাকা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে আদালতের মাধ্যমে দোষজনিত কারণে ফেরত আসা তার ইচ্ছা ছাড়া হয়ে থাকে, ফলে তা প্রয়োজন না থাকার প্রমাণ হয় না। সুতরাং যখন তার কাছে তার গোলামের পূর্ব মালিকানা ফেরত আসে, তখন উকিলের বিক্রয় করার ক্ষমতাও ফিরে আসবে। [আল্লাহ অধিক অবগত।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى لَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهٖ : উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (রহ:) তাঁর উল্লিখিত মাসআলা ছয়টির মধ্য থেকে তৃতীয়টির বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছেন, তিনি বলেন, যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট নারীকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য উকিল বানানোর পর নিজেই তাকে বিয়ে করে নেয় তাহলে সে উক্ত মহিলাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিলেও উকিলের জন্য তার সাথে উক্ত মহিলাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার অধিকার ফিরে আসবে না। পক্ষান্তরে যদি ঐ মহিলাটি উকীল নিজে বিবাহ করে থাকে পরে

বাকি থাকবে। কারণ প্রথম সুরতে মহিলাটিকে মুওয়াক্কিল নিজেই বিয়ে করে নেওয়ার কারণে মুওয়াক্কিলের বিবাহের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফলে মুওয়াক্কিল তাকে তালাক দেওয়ার পর উকিল কর্তৃক উক্ত মহিলাকে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দূর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উকিল তাকে পুনরায় বিয়ে দিতে পারবে না।

এছাড়া মুওয়াক্কিল কর্তৃক উকিলকে কোনো নির্দিষ্ট নারীর সাথে বিবাহ করিয়ে দিতে আদেশ দেওয়াটা اَلْاَمْرُ بِالشَّيْءِ-এর অর্ন্তভুক্ত, আর ফায়দা হলো- اَلْاَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ অর্থাৎ [কোনো বিষয়ের আদেশ] বারংবার সংঘটিত হওয়ার দাবি রাখে না। এ কায়দার ভিত্তিতে মুওয়াক্কিল কর্তৃক বিবাহের কাজটি একবার সংঘটিত হওয়ার পর উকিলের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার তা সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে উকিল নিজে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার কারণে সে মহিলাকে তার মুওয়াক্কিলের কাছে বিবাহ দিতে অক্ষম। অক্ষম হওয়ার পর বায়েন তালাকের মাধ্যমে এ অক্ষমতা কেটে যাওয়ার দরুন এখন মুওয়াক্কিলের সাথে তাকে বিবাহ দিতে কোনো জটিলতা নেই। কারণ মুওয়াক্কিলের বিবাহের প্রয়োজন এক্ষেত্রে এখনো ফুরায়নি। বরং اَلْاَمْرُ بِالشَّيْءِ এমতাবস্থায় বারংবার পালিত হওয়াও আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকে সপ্তম আরেকটি মাসআলা আলোচনা করছেন। তা হলো, যদি কেউ তার নির্দিষ্ট কোনো [মাল বস্তু ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি বা গোলাম বিক্রি করার জন্য কাউকে উকিল বানায় এরপর নিজেই তা বিক্রি করে দেয়, তাহলেও ওকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে যদি বিক্রীত [মাল] বস্তুটি কোনো দোষ জনিত কারণে আদালতের মাধ্যমে বিক্রয় বাতিল হয়ে মালিকের কাছে তা ফেরত আসে, তাহলে এমতাবস্থায় পূর্বের ওকালাহর ভিত্তিতে উকিল তাকে এবার বিক্রি করতে পারবে কিনা, বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধপূর্ণ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উকিলের জন্য তা পুনরায় বিক্রি করার অধিকার থাকবে না। কারণ উকিল নিয়োগ করার পর মুওয়াক্কিল নিজে তাকে বিক্রি করার অর্থ হলো উকিলকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বাধা প্রদান। সুতরাং মুওয়াক্কিল নিজে বিক্রি করার মাধ্যমে সে যেন উকিলকে ওকালাহ থেকে বরখাস্ত করল, তাই মালটি দোষজনিত কারণে ফিরে আসলে এ উকিল তা বিক্রি করতে পারবে না।

এ ছাড়া মুওয়াক্কিল কর্তৃক বিক্রয়ের আদেশ স্বয়ং মুওয়াক্কিলের মাধ্যমে একবার পালিত হওয়ার পর উকিলের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার পালিত হওয়ার অবকাশ রাখে না। কারণ কায়দা হলো- اَلْاَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ

তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রায় হলো, আদালতের মাধ্যমে দোষ জনিত কারণে মুওয়াক্কিলের কাছে মালটি ফিরে আসলে উকিলের জন্য তা পুনরায় বিক্রি করার অধিকার থাকবে। কারণ ওকালার অর্থ হলো, অবাধ অধিকার প্রদান, ফলে উকিল প্রথমেই তা বিক্রি করার অধিকারী ছিল। মুওয়াক্কিল বিক্রয় করার মাধ্যমে উকিলের সেই অধিকার রহিত হয়নি, বরং উকিল আদেশ পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছে কেবল। সুতরাং দোষজনিত কারণে আদালতের মাধ্যমে মুওয়াক্কিলের কাছে মালটি ফিরে আসার মাধ্যমে যেহেতু উক্ত বাধা দূর হয়ে গেছে তাই উকিলের জন্য এখন তা বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নাই।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ মতের উপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কেউ যদি কাউকে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু [মাল] হিবাহ [দান] করার জন্য উকিল নিয়োগ করার পর নিজেই তা হিবা করে দেয় এবং এরপর মালটি আবার হিবাহকৃত ব্যক্তি থেকে ফেরত নিয়ে নেয়, তাহলে তো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী উকিলের জন্য ঐ বস্তুটি পুনরায় হিবাহ করার অধিকার থাকে না, তাহলে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উকিল পুনরায় বিক্রি করার অধিকার পাবে কেন? অথচ মাসআলা দুটি একই ধরনের?

এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, হিবা-এর মাসআলাটি বিক্রয়ের মাসআলার বিপরীত, কারণ হিবাকৃত বস্তুকে হিবাকারী ব্যক্তির জন্য ফেরত নিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে। ফলে হিবাকৃত বস্তু মালিকের কাছে ফিরে আসা হিবা করার প্রয়োজন রহিত হয়ে যাওয়াকে প্রমাণ করে। তাই উকিলের জন্য পুনরায় হিবা করার অধিকার থাকে না।

পক্ষান্তরে আদালতের মাধ্যমে দোষজনিত কারণে বিক্রীত মাল ফিরে আসাটা যেহেতু মুওয়াক্কিলের এখতিয়ারভুক্ত নয় তাই এ পন্থায় মালটি তার পূর্ব মালিকের কাছে ফিরে আসাটা বিক্রয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াকে প্রমাণ করে না, ফলে মুওয়াক্কিলের কাছে মালটি তার পূর্ব মালিকানার ভিত্তিতে ফিরে আসার কারণে উকিলের জন্য তা বিক্রয় করার পুনরায় অধিকার সাব্যস্ত হবে।

৬ষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত